মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা

(১৫৫৬-১৭০৭)

ইরফান হবিব
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়

কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী
১৯৫৮

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৮
কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী
২৮৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০১২

[A Bengali translation of *The Agrarian System of Mughal India (1556-1707)* by Irfan Habib. Complete and unabridged.]

অনুবাদ : স্নেহোৎপল দত্ত তরুণ পাইন সৌমিত্র পালিত

সম্পাদনা : রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

সুরেশ দত্ত কর্তৃক মডার্ন প্রিন্টার্স, ১২ উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা ৭০০ ০৬৭ থেকে মুদ্রিত ও কনক বাগচী কর্তৃক কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, ২৮৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০১২ থেকে প্রকাশিত।

আমার বাবা
অধ্যাপক মহম্মদ হবিব-কে

ভূমিকা

১৯৫৮ সালে এই একই শিরোনামায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট-এর জন্য যে-গবেষণাপত্র দাখিল করা হয়েছিল, বইটি তারই পরিমার্জিত রূপ। অক্সফোর্ডে যাওয়ার আগেই আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের গবেষণা প্রকল্পে আমায় এ বিষয়ে কাজ করতে বলা হয়েছিল ; গবেষণাপত্র জমা দেওয়ার পরেও আরও অনেক উৎসস্থানীয় উপাদান চর্চা করে কাজটির পরিমার্জনা করেছি। গবেষণা প্রকল্পের সুবাদেই সেসব তথ্য আমার হাতে এসেছিল। পরিমার্জনার সময়ে চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম অধ্যায় পুরোপুরি নতুন করে লেখা হয়েছে।

বইটির বিষয়-পরিধি ব্যাখ্যা করতে অল্প কয়েকটি কথাই যথেষ্ট। শিরোনামে 'কৃষি ব্যবস্থা' শব্দটি দিয়ে আমি জোর দিতে চেয়েছি যে বইটি শুধু ভূমিরাজস্ব প্রশাসন সংক্রান্ত নয় (যদিও এককভাবে সে বিষয়টিরও গুরুত্ব আছে), কৃষি অর্থনীতি ও সামাজিক গড়নও এর আলোচ্যবস্তু। আলোচনার ভৌগোলিক সীমা নির্দেশ করা হয়েছে 'মুঘল ভারত' এই শব্দদুটি দিয়ে। সিন্ধুনদের ওপারে মুঘল-অধিকৃত এলাকা (যা নিয়ে কাবুল, এবং কখনও কখনও কান্দাহার প্রদেশ গঠিত হয়েছিল) এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য (১৬৮৬ ও ১৬৮৭-র আগে এই দুটি রাজ্য সাম্রাজ্যের অধীনে আসেনি) এর আওতায় পড়ছে না। অন্যভাবে বলতে গেলে, আলোচনায় এসেছে উত্তর ভারত ও আমি যাকে বলেছি 'মুঘল দখিন', বেরার, খান্দেশ, আহ্‌মদ-নগর ও বিদার রাজ্যভুক্ত অঞ্চল (১৬৩৬, বা নিদেনপক্ষে ১৬৫৭-র মধ্যে সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত)। শিরোনামে দুটি সাল দেওয়া আছে : ১৫৫৬ ও ১৭০৭—প্রথমটি আকবরের তখ্‌তে বসার বছর, দ্বিতীয়টি আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর। এই দুটি সাল দিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের সেরা পর্বের মধ্যেই আলোচনার সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই সীমাদুটিকে আক্ষরিকভাবে নেওয়াটা ঠিক হবে না, ১৬ শতক ও ১৮ শতকের গোড়ার দিকের সাক্ষ্যপ্রমাণও আমি যথেচ্ছ ব্যবহার করেছি।

এ কাজে আমি হাত দিয়েছিলাম দুটি বিশ্বাস থেকে। প্রথমত, কৃষি-ইতিহাসের সমস্যাগুলির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এই পর্বের সাধারণ ইতিহাস, বিশেষ করে রাজনৈতিক ইতিহাস আরও ভালোভাবে বুঝতে সাধারণভাবে সাহায্য করবে। দ্বিতীয়ত, এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত আমাদের যা জানা আছে তার সঙ্গে, ইউরোপীয় সূত্র ও সুপরিচিত ঐতিহাসিক রচনাগুলি ছাড়াও, ফার্সী পাণ্ডুলিপি সূত্র (যেমন, সমসাময়িক নথি, চিঠিপত্র, প্রশাসনিক ও হিসাবপত্র সংক্রান্ত পুস্তিকা এবং অল্প পরিচিত ইতিহাসগ্রন্থ) থেকে অনেক কিছু যোগ করা যায়। এইসব উৎস নিয়ে চর্চা করার ফলে ডব্লু. এইচ. মোরল্যাণ্ড ও ডঃ পি. শরণের সঙ্গে বহু জায়গায় আমার মতের মিল হয়নি, কিন্তু এ কথাও বলা উচিত যে এই পর্বের অর্থব্যবস্থা ও প্রশাসন বিষয়ে তাঁদের কাজই পথ দেখিয়েছিল। তাঁদের সাহায্য না পেলে আমার পক্ষে এসব উপাদান ব্যবহার করাই সম্ভব হতো না।

যে সব শিক্ষক ও বন্ধুর সাহায্য ও পরামর্শ পেয়ে উপকৃত হয়েছি তাঁদের অনুগ্রহের কথা স্বীকার করা আমার কর্তব্য। এ কর্তব্য খুবই সুখের। অক্সফোর্ডে আমার গবেষণা-নির্দেশক ডঃ সি. কলিন ডেভিস-এর কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

মতামতের ক্ষেত্রে তিনি আমায় দিয়েছিলেন অবাধ স্বাধীনতা, কিন্তু উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ সমেত ঠিকমতো লেখার ব্যাপারেই তিনি বেশি জোর দেন। যে বিবেচনা ও যত্ন নিয়ে আমার কাজটি তিনি বিচার করেছিলেন তা কখনও ভুলব না। আলীগড়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক এস. এ. রশিদের কাছেই আমার এ বিষয়ে হাতেখড়ি। তাঁর কাছ থেকে আমি সর্বদাই উৎসাহ পেয়েছি। অধ্যাপক রশিদ অনুগ্রহ করে এই বই এর টাইপ-কপিটি পড়েন এবং মূল লেখায় বেশ কিছু অদলবদল করার পরামর্শ দেন। উত্তরপ্রদেশ কেন্দ্রীয় নথি দপ্তর, এলাহাবাদ-এ রক্ষিত ফার্সী নথিপত্রের যেসব অনুলিপি ও আলোকচিত্র তাঁর কাছে ছিল, সেগুলোও তিনি আমায় দেখতে দেন। অধ্যাপক এস. নুরুল হাসান আমায় পথ দেখিয়েছেন ও সাহায্য করেছেন। তাঁর ছাত্র বলে নিজেকে গণ্য করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আলীগড়ের ইতিহাস বিভাগের সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করে আনন্দ ও প্রেরণা পেয়েছি। আমার বিষয় সম্পর্কিত ক্ষেত্রে তাঁদের কাজ থেকেও লাভবান হয়েছি—সে বিষয়ে তাঁরা অনুমতিও দিয়েছেন। বিশেষত আমার বন্ধু ও সহকর্মী ডঃ এম. আতাহার আলী আমার ধন্যবাদভাজন—বই ছাপার কাজে তিনি আমায় প্রচুর সাহায্য করেছেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীবি. আর. গ্রোভার (এখন [১৯৬২] তিনি মুঘল রাজস্ব-প্রশাসন বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণায় রত)-এর সঙ্গে আলোচনা করে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। গবেষণাপত্র লেখার সময়ে যে তিন বছর ইংল্যাণ্ডে ছিলাম, তখন শ্রীমতী ওয়েনোনা কীন ও ডঃ ব্রিজিড কীন-এর কাছ থেকে আমি ও আমার স্ত্রী যে স্নেহ ও অনুগ্রহ পেয়েছি তার সুখস্মৃতি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রাখব। সবশেষে আমি আমার স্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ; তিনিই পুরো টাইপ-কপিটি সংশোধন করেছেন এবং অর্থনীতি বিষয়ক পারিভাষিক শব্দ ও ধারণা ব্যাখ্যা করে সাহায্য করেছেন। বইএ যেসব ভুল রয়ে গেল তার জন্য অবশ্য যাঁরা আমার সাহায্য করেছেন তাঁদের কেউই দায়ী নন।

বোডলিআন গ্রন্থাগার (অক্সফোর্ড), বৃটিশ মিউজিয়াম (লণ্ডন), কেন্দ্রীয় নথি দপ্তর (উত্তরপ্রদেশ) (এলাহাবাদ), ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগার (লণ্ডন), ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিট্যুট গ্রন্থাগার (অক্সফোর্ড), জন রাইল্যাণ্ডস্ গ্রন্থাগার (ম্যাঞ্চেস্টর), মৌলানা আজাদ গ্রন্থাগার (আলীগড়), গবেষণা গ্রন্থাগার, ইতিহাস বিভাগ (আলীগড়) ও রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি (লণ্ডন)-এর কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের কাছে তাঁদের গ্রন্থসংগ্রহ ব্যবহার করতে অনুমতি দেওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁদের কয়েকটি পাণ্ডুলিপি আমার ব্যবহারের জন্য বোডলিআন-এ ধার দিয়েছিলেন—তার জন্যও তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বন্ধুর মতো সহযোগিতা ও যত্ন করে ছাপার জন্য মাদ্রাজের জি. এস. প্রেস-এর পরিচালকমণ্ডলী ও কর্মীরাও আমার ধন্যবাদভাজন।

ইরফান হবিব

পুনশ্চ: অধ্যাপক এস. নুরুল হাসান, শ্রী মুনিস রাজা ও শ্রীমতী কে. এন. হাসান তাঁদের গবেষণার ভিত্তিতে তৈরি '১৬০৫-এ মুঘল সাম্রাজ্যের মানচিত্র'টি আমার বইএ দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তাঁদের কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ।

বাংলা সংস্করণের ভূমিকা

লেখক হিসেবে আমার পক্ষে এটা খুবই আনন্দের যে বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে এ বইটির এখনও যথেষ্ট চাহিদা আছে, আর প্রকাশকরাও তাই বর্তমান তর্জমাটি প্রকাশ করতে পারলেন। মনে হয়, মূলত যে-বিষয় নিয়ে বইটি লেখা তার জন্যই এটা হতে পেরেছে, কাজটির গুণপনার জন্য নয়। এর বিষয় হলো: কৃষকদের কাজ ও জীবনের চারধারের বস্তুগত ও সামাজিক অবস্থা, আর এই বনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে-থাকা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো। আমাদের সামনে এখন মৌলিক কৃষি-সংস্কারের প্রশ্ন, অতীতের কৃষি-সম্পর্কের ইতিহাস সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ থাকা তাই স্বাভাবিক। পশ্চিম বাংলার আছে জ্ঞানচর্চার সম্পন্ন ঐতিহ্য ও শক্তিশালী কৃষক-আন্দোলন। এই আগ্রহ তাই সেখানেই সবচেয়ে প্রাণবন্ত হতে পারে।

কুড়ি বছরেরও আগে, ১৯৬৩ সালে যে লেখা বেরিয়েছিল, বাংলা সংস্করণে পাঠকরা সেই পাঠটিই পাবেন। তারপর অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণ আবিষ্কার হয়েছে, অনেক বিতর্ক হয়েছে, অনেক পুরনো মত পরিত্যক্ত হয়েছে ও অনেক নতুন প্রশ্ন উঠেছে। আজ যদি আমি এই বইটি লিখতাম তাহলেও ঠিক একইভাবে লেখা হতো—এমন ভাণ করার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু এর মূল প্রতিপাদ্যগুলো এখনও আমি সঠিক বলে মনে করি: খাজনার বিকল্প হিসেবে ভূমিরাজস্ব, ভূমিরাজস্ব আদায়ের ভিত্তিতে [গড়ে ওঠা] শাসক শ্রেণী, ক্রমবর্ধমান মুদ্রা ব্যবহারের শক্তিতে বলীয়ান পরগাছা শহুরে অর্থব্যবস্থা; কৃষকদের অতিমাত্রায় শোষণ যা নিয়ে গেল কৃষি-সঙ্কটের দিকে; জমিনদারের অভ্যুত্থানের সঙ্গে মিশে যাওয়া কৃষক-বিদ্রোহ—মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পেছনে যা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু এখন বইটি লিখলে গৌণ অংশগুলোয় যেসব অদলবদল করতাম, তার সংখ্যাও হতো অনেক। আমার মূল অবস্থান থেকে যেখানে আমি সরে এসেছি তারই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নীচে উল্লেখ করা হলো।

'মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা' আমি যখন লিখেছিলাম, ১৭ শতকের গ্রামের ভেতরকার কাঠামো তখন পাওয়া যেত শুধু কিছু ফার্সী দলিলপত্রে ও অন্যান্য সূত্রের কয়েকটি সাধারণ বিবৃতিতে। তারপর প্রচুর মূল্যবান রাজস্থানী নথিপত্র নিয়ে চর্চা করেছেন সতীশ চন্দ্র, এস. পি. গুপ্ত, দিলবাগ সিং ও অন্যান্যরা।[১] বিষয়টি আরও গভীরে বুঝতে সাহায্য করেছে তাঁদের কাজ। গ্রামের মধ্যে [শ্রেণীগত] পার্থক্যের মাত্রাও তার থেকে অনেকটাই সমর্থিত হয়েছে (১৯৬৩ সালে এ বাবদে আমি খুব বেশি সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করতে পারিনি, পৃ. ১২৮-১৩১ দ্র.)। গ্রামাঞ্চলেও যে বাজারের মুখ চেয়ে উৎপাদন করা হতো ও নগদ-সম্পর্ক চালু ছিল তারও সমর্থন পাওয়া গেছে। আমার বইএ আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে, এই সব ঘটনাই 'গ্রাম-সমাজ'কে খর্ব করেছিল। তখন মনে করেছিলাম, গ্রাম-সমাজ কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ

১, বাছাই করে দুটি গবেষণানিবন্ধের কথা বলা যায় যেখানে এ বিষয়ে কৌতূহলজনক তথ্য পাওয়া যাবে: সতীশ চন্দ্র, 'ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রিভিউ', ৩(১), পৃ. ৮৩-৯৮; এবং এস. পি. গুপ্ত, 'মেডিয়েভাল ইণ্ডিয়া—এ মিসেলানি', ৪, পৃ. ১৬৮-৭৬।

কাজকর্মের আদি সংগঠনের প্রতিনিধি। তাদের মধ্যে একটা ছোট গোষ্ঠী ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলে "গ্রাম-সমাজ হয়তো···সম্পূর্ণভাবেই হারিয়ে যেত" (পৃ. ১৩৮)।

এই শেষ ধারণাটির ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। এখন আমার মনে হয়, গ্রাম-সমাজের চেহারাটা যতদূর ধরা যায় তাতে এটি ছিল গ্রামের "বড় লোক"দের ছোট ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী মারফৎ গ্রামকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রতিষ্ঠান (তার উৎপত্তিও হয়তো হয়েছিল এইভাবেই)। 'মিলিন্দপঞ্হো'র একটি অসাধারণ অংশে বলা আছে খৃস্টীয় প্রথম শতকের গোড়ায় গ্রাম-সমাজ কেমন ছিল।[২] চোলদের ব্রাহ্মণ সমাজ-গ্রামের কথাও পাওয়া যায়, যেখানে ব্রাহ্মণরাই ছিল অ-কৃষক মালিক। ১৮ ও ১৯ শতকের বৃটিশ সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকেও প্রায় সর্বত্রই এই ছবিটির সমর্থন মেলে, যখনই আমরা সরকারী তত্ত্ববিলাস ছেড়ে প্রকৃত অবস্থার বিবরণে যাই। ১৮৫৩-য় 'নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন'-এর প্রবন্ধে মার্কস যে-ছবি হাজির করেছিলেন তার সঙ্গে এর তফাৎ আছে, কিন্তু সাধারণভাবে প্রাগ্-ঔপনিবেশিক সমাজ সম্পর্কে তাঁর মতের সঙ্গে অন্যথা এর কোন অসঙ্গতি নেই। কৃষকদের হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় আগে ও পরে তাদের উদ্বৃত্তকে পণ্যে পরিণত করা যেত—একথা তিনি স্বীকার করেছিলেন।[৩] গ্রাম-সমাজ তাই ততদিন বাঁচতে পারত যতদিন "কেবলমাত্র" উদ্বৃত্তকেই পণ্যে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। অন্যান্য অধিকার ও উপরিলাভের সঙ্গে অসম কর-বণ্টন পাওয়ার উদ্দেশ্যে "গ্রাম-সমাজ"ই ছিল গ্রামের ওপরতলার লোকদের অর্থনীতি-বহির্ভূত বাধ্যবাধকতার কৌশল। তা বলে কোন স্বায়ত্ত-শাসিত একক ছিল না গ্রাম-সমাজ, এটি ছিল কর আদায়ের সংগঠনেরই প্রয়োজনীয় অংশ, যার ফলে গ্রামের ওপরতলার লোকরা হয়ে উঠেছিল, বলতে গেলে, প্রধান শোষক শ্রেণীগুলোর দালাল (এজেণ্ট)।

এইসব শোষিত শ্রেণীর নিম্নতর ও স্থানীয় অংশ তৈরি হয়েছিল জমিনদারদের নিয়ে। ১৯১৩ সালে বইটি যখন বেরিয়েছিল তখন জমিনদার বিষয়ক অধ্যায়ে আমি যা লিখেছিলাম (পৃ. ১৪৭-২০১) সেটাকে ডবু. এইচ. মোরল্যাণ্ড ও পি. শরণের মতো প্রামাণ্য লেখকদের সমালোচনা বলেই মনে হয়েছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের নিয়মিত প্রশাসনের এলাকায় এই ধরনের একটি শ্রেণীর অস্তিত্ব সম্পর্কেই তাঁরা আপত্তি তুলেছিলেন। আজ অবশ্য মনে হয় না যে আমার বিবরণের বেশির ভাগ জায়গা সম্পর্কে আর কোন আপত্তি হতে পারে।

জমিনদারদের আয়ের উৎস বর্ণনা প্রসঙ্গে (পৃ. ১৫৫-১৬২) যতটা স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল আমি ততটা হতে পারিনি। বলা উচিত ছিল যে, জমিনদাররা যেসব অধিকার ও উপরিপাওনা দাবি করতেন তার সঙ্গে ভূমিরাজস্বের কোন সম্পর্ক ছিল না, ভূমিরাজস্ব থেকে এগুলো ছিল আলাদা। যেমন, অযোধ্যায় চাষ-করা জমিতে বিঘা পিছু দশ সের শস্য ও একটা করে তামার পয়সা, মাথা পিছু কর, বন ও জলজাত উৎপন্নের ওপর উপকর ইত্যাদি। জমিনদারকে সরিয়ে দেওয়ার পর এইসব দাবিদাওয়াকে

মিলিতভাবে বলা হতো মালিকানা বা গুজরাটে বাঁঠ (এলাকার মোট রাজস্বের যথাক্রমে ১০% ও ২৫%)। এর ওপর ছিল নানকার, ভূমিরাজস্ব আদায়ে সাহায্য করার জন্য সংগৃহীত ভূমিরাজস্ব থেকে দেওয়া একটা ভাতা। এই দুটো উৎস মিলে হয়ে দাঁড়াত উদ্‌বৃত্তের একটা বড় অংশ, আমার বর্ণনা থেকে যা মনে হয় তার চেয়ে অনেক বড়। ভূমিরাজস্বের সঙ্গে জমিনদারীর বিক্রয়মূল্যের তুলনা করার সময় (পৃ. ১৬২-১৬৬) আমি লক্ষ্য করিনি যে দামটা শুধু জমিনদারী স্বত্বের প্রত্যাশিত নীট আয়েরই পুঁজিকৃত মূল্য হতে পারত, মোট আয়ের নয়। শিরীন মুসবী তাই ঠিকই বলেছেন যে উদ্‌বৃত্তের ওপর জমিনদারের ভাগকে গড়ে $\frac{1}{8}$ বা $\frac{1}{6}$ বলে ধরা উচিত, কার্যত যদিও এটা ছিল নিশ্চয়ই আরও বেশি।[৪]

কাজী মুহম্মদ আলা-র গুরুত্বপূর্ণ রচনা, 'রিসালা অহকাম আল-আরাজী, (আনু. ১৭০০)[৫] পড়া থাকলে কৃষকদের সঙ্গে জমিনদারের সম্পর্ক বিষয়ে আমার বিবরণ হয়তো আরও স্বচ্ছ হতে পারত। এই রচনায় বলা হয়েছে, কৃষকরা মেনে নিয়েছিল যে জমিনদারই স্বত্বাধিকারী এবং তাদের উচ্ছেদ করার অধিকার তাঁর আছে। এ অধিকার আইনসঙ্গত কিনা—লেখক সে প্রশ্ন তুলেছেন, কারণ ভূমি-করের প্রাথমিক প্রদাতা নন বলে জমিনদার স্বত্বাধিকারী হতে পারেন না। আমাদের পক্ষে আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো : তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী, কৃষকের ওপর জমিনদারের নিয়ন্ত্রণ ছিল সত্যিই কতখানি।

ভূমিরাজস্বের তাৎপর্য সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার জন্যও বইটি গুরুত্বপূর্ণ। লেখক বলেছেন যে, 'খরাজ' বা ভূমি-কর বলা হলেও এর হার এত চড়া ছিল যে এটি শুধু খাজনা ('উজরত')-এরই সামিল। এর জন্যই মনে করা হতো যে জমির মালিকানা রাষ্ট্রীয় কোষাগারেই ন্যস্ত হয়ে আছে, আর ভারতে সব জমিই ছিল "রাজার দখলে" (তসর্‌রুফ')। এখানে আমরা খাজনা-প্রাপক রাষ্ট্রের খুব কাছাকাছি একটা স্বীকৃতি পাই। রাজাই জমির স্বত্বাধিকারী—এই ইউরোপীয় বক্তব্যের সঙ্গে তুলনীয় কোন ভারতীয় মত নেই এ কথা বলা (পৃ. ১২০) নিশ্চয়ই ভুল হয়েছিল।[৬]

অনেক নতুন গবেষণার পরেও মুঘল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার বিবরণ (ষষ্ঠ অধ্যায়) মোটামুটি ঠিকই আছে বলে মনে হয়। তবে ভূমি-করের মাত্রা ছাড়াও তার ক্রমহ্রাসশীল ধরনের দিকেও হয়তো জোর দেওয়া উচিত ছিল, কারণ এটা চাপানো হতো উৎপন্নের একটা বাঁধা ভাগ হিসেবে, বা বিঘা পিছু হারে। ফলে উৎপন্নের মোট পরিমাণ যাই হোক না কেন, কর হিসেবে নেওয়া অনুপাত একই থাকত।[৭] ক্রমহ্রাসশীলতার চাপ নিশ্চয়ই আরও তীব্র করা হয়েছিল যখন গ্রামের ওপরতলার লোকদের—জাত বা

৪. 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিক অ্যাণ্ড সোশ্যাল হিস্‌ট্রি রিভিউ', ১১(৩), পৃ. ৩৫৯-৭৪।

৫. আলীগড়ের মৌলানা আজাদ গ্রন্থাগারে বইটির দুটি পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে, আব্দুস সালাম আরাবিয়া ৩৩১-১০১ ; ও লিটন আরাবিয়া (২) মজহাব ৬২।

৬. ১৮ শতকের সুপরিচিত অভিধান, টেকচাঁদের 'বহার-এ আজম'-এও এই ধারণাটিই প্রকাশ পেয়েছে। 'খরাজ' দ্র.।

৭. 'এনকোয়ারি' পত্রিকায় আমার প্রবন্ধ 'পোটেনশিয়ালিটিজ অব ক্যাপিট্যালিস্ট ডেভেলপমেন্ট ইন মুঘল ইণ্ডিয়া' তুলনীয়।

'কওল'-এর সুবাদে যাঁরা ছিলেন অন্যদের থেকে আলাদা—সাধারণ চাষীর তুলনায় কম হারে কর দিতে হতো।[৮] স্পষ্টতই একই সঙ্গে নিঃসম্বল হয়ে পড়া ও বহুভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার একটা ধারা এইভাবেই শুরু করা গিয়েছিল। কিন্তু ক্রমহ্রাসশীল হওয়া ছাড়াও ভূমিরাজস্ব দাবি যদি বেড়েই চলতে থাকে, তাতে কৃষিভিত্তিক সমাজের সব অংশেই—ক্ষুদে চাষী ('রেজা রিআয়া') থেকে জমিনদার পর্যন্ত—তার প্রভাব পড়বে। আমার যুক্তি ছিল এই যে, এই বৃদ্ধিও ছিল অনিবার্য, কারণ কেন্দ্রীভূত কোন ব্যবস্থার অধীনে না থাকলে উঁচু হারে উদ্‌বৃত্ত আদায় করা যায় না, আর অভিজাত শ্রেণীর জাগীরগুলো পুরোপুরি হস্তান্তরযোগ্য হলে তবেই এই কেন্দ্রীকরণ সম্ভব, এবং এই সব হস্তান্তর, বার্নিয়ে যেমন ভেবেছিলেন, শোষণের মাত্রাকেই আরও বাড়িয়ে তোলে, যেহেতু জাগীরের রাজস্বপ্রদায়ী ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য জাগীরদারের কোন দীর্ঘকালীন আগ্রহই থাকতে পারে না। এই প্রবণতা নিশ্চয়ই কোন এক সময়ে নিয়ে যেত সঙ্কটের দিকে, যার লক্ষণই হলো রাজস্ব হ্রাস ও কৃষি-অভ্যুত্থান (নবম অধ্যায়)।

সমসাময়িক বহু বক্তব্য থেকে এই বিশ্লেষণ সমর্থন করা যায়। বইএর মধ্যেই পাঠক এ ধরনের অনেক কটি উৎসের উল্লেখ ও উদ্ধৃতি পাবেন। অন্যদিকে, পরিসংখ্যানগত সাক্ষ্য (বিশেষ করে, 'জমা' বা সম্ভাব্য নীট রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত) নিশ্চিত নয়। দাম যত বাড়ে, 'জমা' তত বাড়ে না। তার অর্থ কি এই যে, এখানে সঙ্কটের একটা সূচক পাচ্ছি আমরা—কৃষিজাত উৎপাদনের হ্রাসের ফলে প্রকৃত রাজস্বেরও হ্রাস? নাকি, এর তাৎপর্য ঠিক উল্টো: রাজস্ব সংগ্রহ স্বভাবতই দামের পেছনে পড়ে থাকত, যার ফলে ভারতীয় 'দাম বিপ্লব' থেকে উপকৃত হয়েছিল কৃষক? পাঠকই এ বিষয়ে তাঁর নিজের মত স্থির করবেন, যদিও আমি এখনও মনে করি যে 'সঙ্কটে'র পক্ষে যুক্তিই অনেক জোরালো।

নবম অধ্যায়ে যেসব কৃষিবিদ্রোহের কথা আছে তার সঙ্গে অনেক খুঁটিনাটি তথ্য যোগ করা যেতে পারে; কিন্তু বিদ্রোহ সম্বন্ধে আমার ধারণা মোটের ওপর একই আছে। শুধু একটা কথাই তোলা উচিত ছিল: এসব বিদ্রোহে কৃষকদের শ্রেণী-চেতনার স্তর ছিল নীচু। চীনে বা ১৩৮১-র ইংল্যাণ্ডে বা ১৬ শতকের জার্মানিতে কৃষকবিদ্রোহীরা তাঁদের শ্রেণীর হয়ে স্পষ্ট ভাষায় দাবি তুলেছিলেন, কিন্তু ভারতের বিদ্রোহীরা কৃষকদের সম্পর্কে কোন সাধারণ দাবিদাওয়া গুছিয়ে হাজির করতে পেরেছিলেন বলে জানা যায় না। আত্ম-সচেতনার ক্ষেত্রে কৃষকদের এই আপাত-পশ্চাৎপদতা নিয়ে অনুসন্ধান চালানো দরকার; কারণ কৃষকদের নিজ ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল সর্বদাই সেটা হবে ভারতের 'গণ-ইতিহাসে'র সারবস্তু।

৮. দ্র. দিলবাগ সিং, 'ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রিভিউ', ২(২), পৃ. ৩০১-২।

সম্পাদকের নিবেদন

মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনায় বিস্তর পারিভাষিক শব্দ আসে। রাজস্ব প্রশাসন ও হিসাবপত্রের ক্ষেত্রে তো ফার্সী শব্দের ছড়াছড়ি। লোকের নাম ও জায়গার নাম নিয়েও একই সমস্যা : বাংলা হরফে কী বানান লিখব। ডঃ মহম্মদ সাবীর খান ও জাতীয় গ্রন্থাগারের জনাব মজহারুল ইসলাম-এর সাহায্য নিয়ে মোটামুটি উচ্চারণ অনুযায়ী সেগুলো লেখার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সবই নির্ভুল হয়েছে এমন দাবি করতে পারব না। ভুলের দায়িত্ব অবশ্যই সম্পাদকের একার। যে সব ফার্সী, আরবী বা তুর্কী শব্দ বাংলায় অল্পবিস্তর চালু ছিল বা আছে তাদের বেলায় আর নতুন করে সমস্যা বাড়াইনি।

অনুবাদের বিভিন্ন অধ্যায় পড়ে অনেক দোষত্রুটি শুধরে দিয়েছেন শ্রীদেবব্রত পাণ্ডা, শ্রীতন্ময় ভট্টাচার্য ও শ্রীপ্রণবরঞ্জন রায়। তাহলেও সম্পাদকের দোষে হয়তো কিছু ভুল রয়ে গেল। সহৃদয় পাঠক সেগুলো ধরিয়ে দিলে পরের সংস্করণে নিশ্চয়ই ঠিক করে নেব।

অনেক গাছপালা ফলফুলের নাম সনাক্ত করে দিয়েছেন ডঃ বসন্ত ঘড়া। নবম অধ্যায়ের শেষে সাদীর তর্জমার জন্য শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ঋণী। কপি মেলানো ও প্রুফ দেখার কাজে প্রচুর সাহায্য করেছেন শ্রীশ্যামল চট্টোপাধ্যায়। এঁদের সকলকেই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বুঝতে সুবিধা হতে পারে এই বিবেচনায় কিছু কিছু পারিভাষিক শব্দের তর্জমা ও ইংরেজি নাম নীচে দেওয়া হলো :

অনুদান/মঞ্জুরি	Grant
অর্থকরী ফসল	Cash Crop
ইজারা	Revenue farming
এলাকা পরিসংখ্যান	Area Statistics
গ্রাম-সমাজ	Village Community
নির্ধারণ	Assessment
পূর্বব্যাপী হার	Retrospective rate
পৃষ্ঠলেখ	Endorsement
বরাত	Assignment
বরাতী	Assignee
বিক্রয় কোবালা	Deed of Sale
রাজস্ব দাবি	Revenue Demand
লাখেরাজ জমি	Revenue-free land
সমূহ নির্ধারণ	Group Assessment
সারণি	Table

মুঘল আমলের ক্ষেত্রে সর্বদাই 'জমিনদার' লেখা হয়েছে। 'জমিদার' বলতে বোঝাবে বৃটিশদের তৈরি নতুন landlord, যদিও তাকে Zamindar-ও বলা হতো।

সূচিপত্র

মানচিত্র : বই-এর শেষে : ১৬০৫-এ মুঘল সাম্রাজ্য

প্রথম অধ্যায়

কৃষিজ উৎপাদন

১. চাষবাসের বিস্তার

হাজার হাজার বছর ধরে প্রকৃতির বিরুদ্ধে দুর্জয় সংগ্রাম করেছে ভারতের কৃষক। কৃষির বিস্তার ঘটেছে বিরাট সমভূমি, উপত্যকা আর পাহাড়ী ঢালে। তার নিড়ানি আর লাঙলের মুখে পড়ে বারে বারে পিছু হটেছে অরণ্য আর অহল্যাভূমি, আবার ঘুরে এগিয়ে এসেছে, আবার ফিরে গেছে। ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি পর্বেই তাই রাজনৈতিক ও সামরিক সীমারেখার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-স্থান পেয়েছে তার 'অরণ্যরেখা' আর মরু সীমান্ত। মানুষের রাজ্য আর প্রকৃতির মধ্যে এই সীমারেখাটি ভারতীয় ইতিহাসের যে কোন দিক চর্চার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই রেখাই বারবার নির্দেশ করেছে আবাদী জমির এলাকা যা সর্বদাই দেশের বিভিন্ন অংশে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সূচক। শুধু তাই নয়, বিশেষ বিশেষ উৎপাদন ব্যবস্থা বা অর্থনৈতিক সংগঠনের সঙ্গেও এই সীমারেখাকে সমানভাবে যুক্ত করা যায়। উৎপাদন-কৌশলের বিবর্তনে নিড়ানি চাষ, জায়গা বদ্‌লে চাষ বা স্থায়ী ব্যবস্থায় চাষ—এ সবই এক-একটি ঐতিহাসিক স্তর। তবে কীভাবে চাষ হবে তার অনেকটাই নির্ধারিত হতো কোন্ পর্বে কতটা অকর্ষিত জমি নতুন করে দখল করা গেছে তার ওপর।

মুঘল আমলে ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার আলোচনা তাই শুরু করতে হবে আমাদের আলোচ্য পর্বে আবাদী এলাকার সমীক্ষা থেকে। দুর্ভাগ্যবশত এ বিষয়ে সমসাময়িক লেখকদের সাধারণ বিবৃতিগুলি খুব একটা সাহায্য করে না, কারণ সেগুলি হয় অস্পষ্ট নয়তো অতিরঞ্জিত এবং প্রায়ই পরস্পরবিরোধী।[১] আমাদের প্রাপ্ত তথ্যগুলিতে যখন

১. আকবরের আমলের তিনজন ঐতিহাসিক একবাক্যে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর সাম্রাজ্যের সমস্ত জমিই ছিল চাষের উপযোগী (আরিফ কান্দাহারী, ১৩১ ; 'তবাকৎ-এ আকবরী', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৫ ; 'আইন', ২য় খণ্ড, পৃ. ৫-৬)। ১৭ শতকের পরের দিকের আরেকজন লেখক সুজান রায় (পৃ. ১১) আরেকটু সতর্ক হয়ে বলেছেন, ভারতের "অধিকাংশ জমি" ছিল আবাদযোগ্য। কিন্তু আকবরের মৃত্যুকালীন মুঘল সাম্রাজ্যের বর্ণনাপ্রসঙ্গে মুতামদ খান বলেছেন যে "জ্ঞানীদের কথা অনুযায়ী" মোট এলাকার কেবলমাত্র একের-তিন ভাগ আবাদযোগ্য বলে ধরা হতো। এর ভিত্তিতে তিনি আবাদযোগ্য এলাকার একটি আনুমানিক হিসেব পর্যন্ত দিয়েছেন। কিন্তু, এ কাজ তিনি না করলেও পারতেন। কারণ, প্রথমত সাম্রাজ্যের মোট এলাকা তিনি বের করেছেন এই ধরে নিয়ে যে, আকারে এটি একটি আয়তক্ষেত্র ও সাম্রাজ্যের সবচেয়ে দূরবর্তী দুটি বিন্দুর দূরত্ব সেই আয়তনের বাহু। এর থেকে ক্ষেত্রফল বের করতে গিয়ে তিনি আরও ভুল করেছেন, ১২,০০০ 'কুরোহ্'-কে ১২,০০০ গজ ধরে। আসলে হবে ৫,০০০ গজ। ('ইকবালনামা', ২য় খণ্ড, Or. 1834, পৃ. ২৩১ খ)।

কোন নির্দিষ্ট এলাকায় চাষের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাই, সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো আরও নিশ্চিত হতে পারি। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ঐ সময়ে জরিপ-হওয়া এলাকা ও গ্রামের সংখ্যার পরিসংখ্যানগত নথিপত্র যা এখনও টি'কে আছে। আমাদের সমীক্ষার ভিত্তি হিসেবে এগুলি ব্যবহার করা যায়।

আবুল ফজল-এর 'আইন-এ আকবরী'-তে "বারোটি প্রদেশের বিবরণ" শীর্ষক অধ্যায়ে সমগ্র উত্তর ভারতের (বাংলা, থাট্টা এবং কাশ্মীর বাদে) বিশদ এলাকা-ভিত্তিক পরিসংখ্যান দেওয়া আছে। এই পরিসংখ্যানের সময়কাল আকবরের রাজত্বের ৪০তম বর্ষ, অর্থাৎ ১৫৯৫-৯৬ খৃস্টাব্দ। প্রত্যেক প্রদেশের জন্য এই পরিসংখ্যানে বিঘা হিসেবে মাপা জমির উল্লেখ আছে। একে বলা হয়েছে 'জমিন্-এ পইমূদা' বা 'মাপা জমি'। এই হিসেবের মধ্যে কয়েকটি সারণির শিরনামা 'আরাজী' বা 'জমি'। এই শিরনামায় প্রতি 'সরকার' [এখানে 'সরকার' অর্থে প্রদেশ বা 'সুবা'র তৎকালীন আঞ্চলিক বিভাগ বোঝানো হয়েছে] অনুযায়ী জমির পরিমাণ এবং যে যে 'মহাল' বা 'পরগনা' নিয়ে 'সরকার'গুলি গঠিত তার পৃথক অঙ্ক দেওয়া আছে।[২] 'আইন'-এর বিরাট তথ্য মুঘল আমলে অদ্বিতীয়ই থেকে গিয়েছিল, তবে আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দিকেও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়েছিল, যদিও সেগুলি খুবই সংক্ষিপ্ত ধরনের। সেই সময়কার দু-তিনটি পুঁথিতে একটি সারণি পাওয়া যায়। তাতে আছে 'রকৃবা' বা প্রতি প্রদেশের এলাকাভিত্তিক পরিসংখ্যান এবং প্রতি প্রদেশের গ্রামের সংখ্যা, জরিপ-হওয়া

১৫৭৫-এ আকবরের প্রশাসনিক রদবদলের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রকৃত আবাদী এলাকা প্রসঙ্গে নিজামুদ্দীন আহ্মদ বলেছেন, "হিন্দুস্তানের বিশাল বসতিহীন এলাকার অধিকাংশই অনাবাদী পড়ে ছিল" ('তবাকৎ-এ আকবরী', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০০)। অথচ শাহ্জাহানের আমলের শেষের দিকে লিখতে বসে চন্দ্রভান বলেছেন যে, হিন্দুস্তানের বেশির ভাগ আবাদযোগ্য এলাকাতেই লাঙল পড়েছিল ('চার চমন', Add. 16,863, পৃ. ৩২ ক)।

২. "বারোটি প্রদেশের বিবরণ" ও তার পরিসংখ্যান-সারণি পাওয়া যাবে ব্লথমান-সম্পাদিত 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮৬-৫৯৫ এ। পরিসংখ্যান কোন্ বছরের তা বলা আছে পৃ. ৩৮৬-তে। কিন্তু এই পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে ব্লথমান-সম্পাদিত সংস্করণ ব্যবহার করার সময় দুটি কথা মনে রাখতে হবে। প্রথমত, তিনি সারণিগুলি হুবহু ছাপেননি এবং শীর্ষক সমেত বহু স্তম্ভ বাদ দিয়েছেন। তাই তাঁর সম্পাদিত পাঠে প্রত্যেক 'সরকার' ও পরগনার পাশে বিঘায় প্রকাশিত যে-অঙ্কগুলি দেওয়া আছে, সেগুলি যে আসলে কী বোঝাচ্ছে, তার কোন স্পষ্ট হদিশ নেই। দ্বিতীয়ত, যেসব পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে তিনি পাঠ নির্ধারণ করেছেন তার মধ্যে মাত্র একটি ছিল ভালো পাণ্ডুলিপি। তাঁর ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপিগুলিতে যেসব ভুল ছিল, তা ছাড়াও তাঁর উদ্ধৃত অঙ্কগুলিতে বেশ ক-টি ছাপার ভুলও আছে। আমি তাই সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান অংশের পাঠ 'আইন'-এর আগের দুটি ভালো পাণ্ডুলিপির (Add. 7652 এবং Add. 6552) সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি। তার ফলে যেসব ভুল বেরিয়েছে, এই বই-এ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা নিঃশব্দে শুধরে দেওয়া হয়েছে, যদি-না কোন রদবদল এতই বড় হয় যে ব্যাখ্যা না করলে চলে না।

এবং না-হওয়া—এই দু-ভাগে ভাগ করে।[৩] এ ছাড়া ১৭৫৯-৬০এ লেখা রায় চতুরমনের 'চাহার গুলশন' থেকে প্রতিটি 'সরকার'-এর নির্দিষ্ট এলাকা ও তাদের অন্তর্গত গ্রামগুলির বিবরণ পাওয়া যায়।[৪] আওরঙ্গজেবের আমলে পরিসংখ্যান-সারণির প্রাদেশিক অঙ্কের সঙ্গে 'গুলশন'-এর অঙ্ক প্রায়ই মিলে যায়। তাই নিশ্চিত মনে হয় 'চাহার গুলশন'-এ আসলে আওরঙ্গজেবের শেষ কয়েক বছর বা তার সামান্য পরে সঙ্কলিত পরিসংখ্যানই উদ্ধৃত হয়েছে।

'আইন-এ আকবরী'তে এলাকার অঙ্কগুলি দেওয়া আছে 'বিঘা-এ ইলাহী'-র এককে। কিন্তু পরবর্তী পরিসংখ্যানে বোধহয় ব্যবহার করা হয়েছে 'বিঘা এ দফ্তরী' একক। 'বিঘা-এ দফ্তরী' 'বিঘা-এ ইলাহী'র দু-এর তিন ভাগ। এর প্রচলন হয় শাহ্জাহানের আমলে। এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট 'ক'-তে সঙ্কলিত প্রমাণ থেকে বোঝা যাবে 'বিঘা-এ ইলাহী' ছিল এক একরের ০.৫৯ অংশ, অর্থাৎ সাধারণভাবে এক একরের তিনের-পাঁচ ভাগ।

মুঘল আমল এবং সাম্প্রতিক কালের বিভিন্ন এলাকার অঙ্ককে তাই এলাকার একটি সাধারণ একককে নিয়ে আসা যায়। তবে মুঘল পরিসংখ্যানে 'জরিপ-করা জমি' বলতে কী বোঝানো হতো তা কিছুটা নিশ্চিতভাবে না জানা থাকলে সঠিক তুলনা করা অসম্ভব। মুঘল প্রশাসন প্রধানত রাজস্ব নির্ধারণের জন্যই জমি জরিপ করত। তবে পরের একটি অধ্যায়ে (ষষ্ঠ) দেখা যাবে জরিপ করে রাজস্ব নির্ধারণের এই পদ্ধতি সর্বত্র প্রচলিত ছিল না। আওরঙ্গজেবের আমলের পরিসংখ্যানে জমির এলাকার অঙ্ক সাধারণত 'আইন'-এর অঙ্কের চেয়ে যথেষ্ট বড়, যদিও সব প্রদেশেই বহুসংখ্যক গ্রামকে জরিপ-না-হওয়ার তালিকায় রাখা হয়েছে। এর থেকেই বোঝা যায়, কি এই পরিসংখ্যান সঙ্কলনের সময়ে, কি 'আইন'-এর আমলে, কখনই কোন প্রদেশের সমস্ত রাজস্বপ্রদায়ী জমি জরিপের আওতায় আসেনি। অর্থাৎ, এই দুই পরিসংখ্যানই অসম্পূর্ণ। কেবলমাত্র পরবর্তী পরিসংখ্যানটির ক্ষেত্রে, জরিপ হওয়া ও না-হওয়া জমির প্রদত্ত অনুপাত

৩. এই নথি রক্ষিত আছে দুটি পাণ্ডুলিপিতে, Bodl. Fraser 86, পৃ. ৫৭ খ-৬০ খ এবং Edinburgh 224, পৃ. ১ খ-৩ খ, ৮ ক-১১ খ। এর থেকে অঙ্কগুলি নিয়ে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হয়েছে Or. 1286, পৃ. ৩১০ খ-৩৪৩ ক-য়।

পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে যে পরিসংখ্যান স্থির করা গেছে, সারণি আকারে সেটি দেওয়া হলো পৃ. ৪-এ।

৪. 'চাহার গুলশন' বইটি ছাপা হয়নি, কিন্তু যদুনাথ সরকারের 'ইণ্ডিয়া অফ আওরঙ্গজেব'-এ এর ভৌগোলিক ও পরিসংখ্যানগত অংশের তর্জমা দেওয়া আছে। তালিকাভুক্ত পাণ্ডুলিপিগুলির (তুলনীয় স্টোরি, নং ৬৩১) মধ্যে Bodl. Elliot 366 শুধু সবচেয়ে পুরনোই নয়, সম্ভবত সবচেয়ে প্রামাণিক, কেননা এটি মূল রচনারই অনুলিপি, পরবর্তী কোন পাঠের নকল নয়। আমাদের বই-এ সাধারণত যদুনাথ সরকারের 'ইণ্ডিয়া অফ আওরঙ্গজেব'-এর পাঠের বদলে পাণ্ডুলিপির পাঠই গ্রহণ করা হয়েছে। অনুবাদক নিজেই স্বীকার করেছেন যে, দায়সারাভাবে নকল-করা একটি পাণ্ডুলিপিই ছিল তাঁর অনুবাদের ভিত্তি এবং পরিসংখ্যানের অংশগুলিতে অনেক ভুল আছে।

আওরঙ্গজেবের আমলের গ্রাম ও এলাকা পরিসংখ্যান

প্রদেশ	মোট গ্রামের সংখ্যা	জরিপ না-হওয়া গ্রাম	জরিপ হওয়া গ্রাম	বিঘায় ('দফ্‌তরী') জরিপ হওয়া এলাকা
সাম্রাজ্য (বিজাপুর ও হায়দরাবাদ বাদে)…	৪,০১,৫৬৭	২,০১,৫৬৪	(২,০০,০০৩)	২৯,৫৭,৪২,৩৩৭
বাংলা …	১,১২,৭৮৮	১,১১,২৫০	১,৫৩৮	৩,৩৪,৭৭৫
ওড়িশা …			২৬,৭৬৮	৫,৯৫,৩৭৯
বিহার …	৫৫,৩৭৬	২৪,০৩৬	৩১,৩৪০	১,২৭,৫৩,১৫৬
এলাহাবাদ …	৪৭,৬০৭	২,২৬২	৪৫,৩৪৫	১,৯৭,০৭,৭৮৩
অযোধ্যা …	(৫২,৬৯১)	১৮,৮৪৯	৩৩,৮৪২	১,৯০,২৭,৩০৮
আগ্রা …	৩০,১৮০	২,৮৭৭	২৭,৩০৩	৪,০১,০০,৫৫১
দিল্লী …	৪৫,০৮৮	১,৫৭৬	৪৩,৫১২	৬,০১,৪২,৩৭৫
লাহোর …	২৭,৭৬১	৩,১৯২	২৪,৫৬৯	২,৪৩,১৯,৩৭৬
মূলতান …	(৯,২৫৬)	৪,৫৫৯	৪,৬৯৭	৪৪,৫৪,২০৩
থাট্টা …	১,৩২৪	১,৩২৪		
কাবুল …	১,৩১৬	১,৩১৬		
কাশ্মীর …	৫,৩৫২	৫,৩৫২		
আজমীর …	৭,৯০৫	২ ৮৭৩	৫,০৩২	১,৭৪,০৯,৬৮৪
গুজরাট …	০,৩৭০	৬,৪২৬	৩,৯২৪	১,২৭,৬৯,৩৭৪
মালব …	১৮,৬৭৮	১১,৭৪২	৬,৯৩৬	১,২৯,৬৪,৫৩৮
খান্দেশ …	৬,৩৩৯	৩,৫০৭	২,৮৩২	৮৮,৫৯,৩২৫
বেরার …	১০,৮৭৮	১৩৭	১০,৭৪১	২,০০,১৮.১১৩
আওরঙ্গাবাদ …	৮,২৬৩	৭১৮	৭,৫৪৫	২,৩৪,৭৩.২৯৫
বিদর …	৪,৫২৬	১,০০৭	৩,৫১৯	৭৯,০৬,১৯৬

টীকা : এই সারণির অঙ্কগুলি নেওয়া হয়েছে Fraser 86, পৃ. ৫৭ খ-৬০ খ এবং Edinburgh 224, পৃ. ১ খ-৩ খ, ৮ ক-১১ খ থেকে। অঙ্কের হেরফের থাকলে মূল অঙ্ক স্থির করার জন্য Or. 1286, পৃ. ৩১০ খ-৩৪৩ ক এবং 'চাহার গুলশন', Bodl. Elliot 336 ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রাম পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে, পাণ্ডুলিপিগুলিতে দেওয়া মোট অঙ্কের সঙ্গে তুলনা করে আলাদা আলাদা অঙ্কগুলি মিলিয়ে নেওয়া যায়। জরিপ হওয়া ও না হওয়া গ্রামের সংখ্যা সেখানে একসঙ্গে দেওয়া আছে। প্রায় সব হেরফেরের জন্য পাণ্ডুলিপিতে লেখার ভুল বা 'রকম' [অঙ্করাশি] চিহ্ন লেখার শিথিলতাই দায়ী, তাই বিশদভাবে সেগুলি উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে হয়। গ্রামের সংখ্যা সাধারণভাবে প্রামাণিক বলে ধরা যেতে পারে, তবে এলাকার রাশিগুলিতে শেষ পাঁচটি অঙ্কের সম্ভাব্য হেরফেরের জন্য ছাড় দিতে হবে।

থেকে, সেই সময়কার মান অনুযায়ী, মোট জমির কতটা জরিপ হয়ে থাকতে পারে তার কিছুটা নির্দেশ পাওয়া যায়।[৫]

মোরল্যাণ্ড প্রস্তাব করেছেন, মুঘল যুগের জরিপ-করা জমিকে আধুনিক পরিসংখ্যানের পরিভাষার 'মোট ফসলী এলাকা' হিসেবে গণ্য করা উচিত।[৬] মোট ফসলী জমিকে নিশ্চয়ই এর মধ্যে ধরা হয়েছে ; কিন্তু আরও যথাযথভাবে এগুলিকে হয়তো বলা উচিত মোট ধান-বোনা জমি, কেননা 'নাবৃদ' বা শস্যহানির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাও জরিপের আওতায় পড়ত।[৭] কিন্তু জরিপে সম্ভবত শুধু আবাদী জমিই নয়, আবাদযোগ্য জমিও

৫. শুধু প্রদেশগুলির ক্ষেত্রেই এমন হওয়া সম্ভব। 'চাহার গুলশন'-এ 'সরকার'-প্রতি গ্রামের এলাকা বা পরিসংখ্যান—কিছুই দেওয়া নেই, শুধু 'সরকার'-প্রতি মোট গ্রামসংখ্যা দেওয়া আছে, তাও এর মধ্যে কতগুলি জরিপ করা হয়েছিল সে কথা বলা নেই। অবশ্য যেসব 'মহাল'-এর ক্ষেত্রে গ্রাম বা এলাকা পরিসংখ্যানের বিবরণ নেই, সেখানে অনেক সময়েই আলাদা আলাদা 'সরকার'-এর ক্ষেত্রে তার নির্দেশ দেওয়া আছে।

যুক্তপ্রদেশের পূর্ব ও পশ্চিমের জেলাগুলির ক্ষেত্রে, আধুনিক আবাদী এলাকার পরিসংখ্যানের সঙ্গে 'আইন'-এর পরিসংখ্যানের খুঁটিয়ে তুলনা করে মোরল্যাণ্ড কয়েকটি সিদ্ধান্ত করেছিলেন ('জার্নাল অফ ইউ. পি. হিস্টরিক্যাল সোসাইটি', ২য় খণ্ড, ১৯১৯, ১ম ভাগ, পৃ. ১-৩৯)। 'ইণ্ডিয়া অ্যাট দা ডেথ অফ আকবর', পৃ. ২০-২২-এ উত্তর ভারতের অন্যান্য অংশের সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে দেওয়া আছে। কিন্তু সবই এই ধারণার ভিত্তিতে যে 'আইন'-এর অঙ্কগুলিতে সে-সময়ের সমস্ত আবাদী এলাকা ধরা হয়েছে। সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্তের অনেক রদবদল করা প্রয়োজন। যদি কোন অঞ্চলের ক্ষেত্রে বড় এলাকার অঙ্ক না দেওয়া থাকে, তার দ্বারা এই বোঝায় না যে সেই অঞ্চল চাষ-আবাদের ব্যাপারে পিছিয়ে ছিল, অন্তত এমন সম্ভাবনাও থাকে যে সেখানকার আবাদী এলাকা জরিপই করা হয়নি।

৬. 'জার্নাল অফ ইউ. পি. হিস্টরিক্যাল সোসাইটি', ২য় খণ্ড, ১৯১৯, ১ম ভাগ, পৃ ৩, ১৭। প্রত্যেক মরশুমী ফসলের জন্য বছরে যে পরিমাণ জমিতে কাজ হয়েছে তা যোগ করে মোট ফসলী এলাকা পাওয়া গেছে। নীট ফসলী এলাকা বের করার জন্য এই যোগফল থেকে 'একাধিকবার ফসল হওয়া এলাকা' বাদ দেওয়া হয়েছে।

৭. আবাদী জমির জরিপ বিষয়ে, আকবরের ২৭তম বছরে তোডর মলের মুসাবিদা-করা নিয়মাবলী দ্রষ্টব্য : "এ কথা জানা আছে যে 'খালিসা' পরগনাগুলিতে (নথিভুক্ত) এলাকা ('আরাজী') প্রতি বছরই কমে যায়। (সুতরাং) আবাদী এলাকা একবার জরিপ হয়ে গেলে, তারা অবশ্যই এটিকে (জরিপ করা এলাকা) বছর বছর বাড়িয়ে, আংশিক 'নসক' করবে।" ('আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮২, Add. 27,247, পৃ. ৩৩১ খ)। 'নাবুদ'-এর অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে 'আইন'-এ (১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৮) 'বিতিকচি'র [সরকারী কর্মচারী বিশেষ] জন্য তৈরি নিয়মাবলী দ্রষ্টব্য।

এ কথাও বলা যায় যে আরও আধুনিক পরিসংখ্যানে ফসলী এলাকার অঙ্ক দেওয়া থাকে না, দেওয়া থাকে বীজবোনা এলাকার অঙ্ক।

ধরা হতো।[৮] আওরঙ্গজেবের আমলে এ সম্পর্কে প্রায় স্থায়ী অভিযোগ শোনা যায়: স্থানীয় আমলারা প্রকৃত আবাদী জমির পৃথক হিসেব না পাঠিয়ে মোট আবাদযোগ্য জমির হিসেব পাঠায়।[৯] কিছু অনাবাদযোগ্য জমি, যেমন বসবাসের জায়গা, পুকুর, নালা ও জঙ্গলও জরিপ করা হতো।[১০] কিন্তু আমরা ধরে নিতে পারি এই জরিপ শুধু গ্রাম ও বসতির সীমাতেই থেমে যেত, বিস্তৃত অরণ্য ও অহল্যাভূমি অবধি যেত না। সাধারণত মোট জরিপ-করা এলাকার অতি অল্প অংশই তাই এর মধ্যে পড়ত।

মুঘল আমলের জরিপ-করা এলাকার মধ্যে আধুনিক কৃষি-পরিসংখ্যানের মোটামুটি তিন ধরনের জমি নেওয়া হতো: 'চষা (বা ধান-বোনা) জমি', 'তখনকার মতো পতিত জমি' এবং 'পতিত ছাড়া আবাদযোগ্য অহল্যাভূমি'। চষা জমির পরিমাণ অবশ্যই ঠিকমতো বের করা যায়, কিন্তু 'আবাদযোগ্য' শব্দটির নানা সংজ্ঞা হতে পারে। এটি নির্ধারণের জন্য মুঘল ও আধুনিক পরিসংখ্যানবিদ্‌রা একই মাপকাঠি ব্যবহার করতেন কিনা বলা শক্ত, অবশ্য যদি তাঁরা আগে আদৌ কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি ব্যবহার

৮. আবাদযোগ্য জমি জরিপের ইঙ্গিত পাওয়া যায় 'দস্তুর-আল-আমল-এ আলমগীরী', পৃ. ৩৬ খ-এ, 'মুওয়াজানা-এ দহ্‌সালা'-র খসড়ায় এবং ১৬৮২-৮৩ খৃষ্টাব্দে (১০৯০ ফসলী) পপল (বেরার)-এর গ্রাম ও পরগনার বিদ্যমান নথিপত্রে। ওয়াই. কে. দেশপাণ্ডে, *IHRC*, ১৯২৯, পৃ. ৮৪-৮৬-তে এর বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেছেন। এছাড়াও 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫-এর অঙ্কগুলি দ্রষ্টব্য। বলা হয়েছে এগুলি তোডর মল-এর গুজরাট সমীক্ষা থেকে নেওয়া। এখানে আবাদযোগ্য এলাকাই দেওয়া আছে, আবাদী এলাকা নয়।

৯. রসিকদাস করোড়ীর কাছে আওরঙ্গজেবের ফরমান, এবং 'নিগরনামা-এ মুনশী'র পরওয়ানা (পৃ. ৯৯ ক, Bodl. পৃ. ৭৪ খ-৭৫ ক, Ed. 77)।

১০. যেসব ধরনের জমিকে আবাদযোগ্য বলে উপরে উল্লেখ করা হলো, সেগুলো নির্দিষ্ট করে বলা আছে 'দস্তুর-আল-আমল-এ আলমগীরী', পৃ. ৩৬ খ-এ। এগুলির সঙ্গে সেখানে যোগ করা হয়েছে বাগিচার জমি। বাগিচার জমি বাদ দিয়ে, অনাবাদযোগ্য শ্রেণীর এলাকা মোট জরিপ-করা এলাকার ঠিক শতকরা ৪১ ভাগ হবে। অবশ্য পপল পরগনার নথিতে অনাবাদযোগ্য জমিকে মোট এলাকার একের-চার ভাগ হিসেবে দেখানো আছে। কিন্তু এর বেশির ভাগই (৫০৫ 'নেতন্'-এর মধ্যে ৪৩০) ছিল চারণভূমি (*IHRC*, ১৯২৯, পৃ. ৮৪-৮৫)। চারণভূমি হয়তো সত্যি আবাদের অযোগ্য ছিল না, কিন্তু তাকে এই পর্যায়ে ফেলার কারণ এই যে, জবরদখলের হাত থেকে ঐ ধরনের জমি রক্ষা করা হতো। প্রামাণিক হিসাবে দেখা যায়, আধুনিক পরিসংখ্যানে যে-ধরনের জমিকে 'কর্ষণযোগ্য অহল্যাভূমি' বলে ধরা হয়, চারণভূমি ছিল তার তিনের-চার ভাগ, আর চাষের কাজে পাওয়া যাবে না এমন অহল্যাভূমির মাত্র একের-চার ভাগ। (রয়্যাল কমিশন অন এগ্রিকালচার ইন ইণ্ডিয়া, 'রিপোর্ট', পৃ. ১৭৭)। 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫-এ জরিপ-করা জমির অনাবাদযোগ্য অংশ (যার মধ্যে "বসতি এলাকা, জঙ্গল ইত্যাদি" পড়ে) মোট জরিপ-করা এলাকার প্রায় একের-তিন ভাগ বলে দেখানো আছে। চারণভূমিও এর ভিতরে ধরা হয়েছে কিনা তা ঠিক বোঝা যায় না। না হলে এত বিরাট অহল্যাভূমির এলাকা জরিপ করার কোন কারণ ছিল বলেও মনে হয় না।

করে থাকেন।[১১] মুঘল ও বৃটিশ যুগে স্থানীয় কর্মচারীদের এই ঝোঁকই হওয়া সম্ভব যে কেবলমাত্র সেই অহল্যাভূমিকেই আবাদযোগ্য শ্রেণীতে ধরা হবে যা তৎকালীন পরিস্থিতিতে আবাদ হওয়ার প্রান্তিক অবস্থায় আছে। বিরাট জঙ্গল সাফ করে বা দূর থেকে খাল কেটে এনে তবে আবাদযোগ্য করা যাবে—এমন জমিকে নিশ্চয়ই তাঁরা ঐ শ্রেণীতে ফেলতেন না। সুতরাং বলা চলে, এইভাবে নিরূপিত আবাদযোগ্য অহল্যা-ভূমি আর যথার্থ আবাদী জমির এলাকা সাধারণভাবে একটা বাঁধা অনুপাতে থাকবে। এই মত গৃহীত হলে, মুঘল যুগে জরিপ-করা এলাকার পরিসংখ্যানের সঙ্গে সাম্প্রতিক-কালের আবাদযোগ্য এলাকার পরিসংখ্যান তুলনা করলে সেটি কাজে আসবে। কারণ, এই দুই যুগের মধ্যবর্তী সময়ে চাষ-আবাদের প্রসারের ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন হয়েছে—এর থেকেই তার একটা মোটামুটি হদিশ পাওয়া যাবে।

এই দুই পর্বের পরিসংখ্যানে দেওয়া গ্রামের সংখ্যা তুলনা করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার ভয়ও অনেক কম। গ্রামগুলি যেহেতু দৃশ্যতই সুনির্দিষ্ট একক, তাই আশা করা যায় যে নির্ভুলভাবে সেগুলি গোনা যাবে।[১২] তাহলেও, এলাকা ও লোকসংখ্যা অনুযায়ী গ্রামের গড় আয়তনে হেরফের হতে পারে অঞ্চলে অঞ্চলে, বা, যা আরও গুরুত্বপূর্ণ, শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে। তাই মুঘল যুগে আবাদী এলাকার হিসেব করতে শুধুমাত্র গ্রামগুলির তুলনামূলক পরিসংখ্যান সরাসরি কোন সাহায্য করতে পারে না। তবে এই হিসেবের সঙ্গে যদি সহায়ক তথ্য—বিশেষত এলাকার পরিসংখ্যান—যোগ করা হয়, তখন এর কিছু সমর্থকমূল্য থাকতে পারে।

মুঘল ও আধুনিক পরিসংখ্যানের কোন তুলনামূলক আলোচনা করতে গেলে মুঘল সাম্রাজ্যের আঞ্চলিক এককগুলির সীমানা নিখুঁতভাবে স্থির করা অবশ্য প্রয়োজন। গাঙ্গেয় উপত্যকার যে সব প্রদেশ 'আইন'-এর তালিকাভুক্ত ছিল তাদের 'মহাল'গুলির অবস্থান সম্পর্কে বিশদ আলোচনা এখন আমাদের হাতে আছে।[১৩] তবে 'আইন'-এর

১১. দা রয়্যাল কমিশন অন এগ্রিকালচার ইন ইণ্ডিয়া, 'রিপোর্ট', ৬০৪-৫-এ দেখানো হয়েছে যে আধুনিক পরিসংখ্যানে নেহাৎ মর্জিমাফিক 'কর্ষণযোগ্য অহল্যাভূমি' এবং 'যে জমি চাষের কাজে পাওয়া যাবে না' এই বিভাগ করা হয়েছে। প্রথমটিতে অনেক সময়েই এমন জমি ধরা থাকে যা বাস্তবিকই আবাদযোগ্য নয়

১২. গ্রামগুলি সর্বদাই হতো সুনির্দিষ্ট একক—এ কথা বোধহয় ভারতের সব অংশের ক্ষেত্রে সত্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাই হয়তো ব্যতিক্রম ছিল। আধুনিক আদমশুমারীতেও রাজস্ব-প্রদায়ী গ্রাম আর প্রকৃত গ্রামের মধ্যে তফাৎ করা হয়; কিন্তু সেখানেও শুধু প্রকৃত গ্রামের অঙ্কই দেওয়া থাকে।

১৩. বৃটিশ আমলের 'উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহ' ('ঔধ' বাদে)-এর অন্তর্ভুক্ত মুঘল প্রদেশ দিল্লী, আগ্রা, এলাহাবাদ এবং অযোধ্যার জন্য দ্রষ্টব্য এলিয়ট, 'মেমোয়ার্স···অফ দা নর্থ-ওয়েস্টার্ন প্রভিন্সেস', বীমস্ সম্পাদিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮২-১৪৬ এবং ২০৩-৬ (২০৩ পৃষ্ঠার পাশে মানচিত্র)।

অযোধ্যার জন্য: জে. বীমস্, 'অন দা জিওগ্রাফি অফ ইণ্ডিয়া ইন্ দা রেন অফ আকবর', ১ম ভাগ, *JASB*, খণ্ড ৫৩ (১৮৮৪), পৃ. ২১৫-৩২ (মানচিত্রসহ)।

তালিকায় বেশি পরিচিত অথবা সহজে সনাক্তযোগ্য জায়গাগুলির উপর ভিত্তি করে সাম্রাজ্যের বাকি অংশের প্রদেশ এবং 'সরকার'গুলির সীমানা নেহাৎই মোটামুটিভাবে এবং কখনও কখনও আন্দাজেও ঠিক করা যায়।[১৪] দখিনের প্রদেশগুলির বিবরণের জন্য এখানে ১৮ শতকে লেখা 'দস্তুর-আল-আমল-এ শাহীনশাহী'র[১৫] সাহায্য নেওয়া হয়েছে, কারণ 'আইন'-এর পরবর্তীকালে যে সব 'মহাল' মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তার তালিকা এতে দেওয়া আছে।

অবশ্য এও মনে রাখতে হবে যে মুঘল আঞ্চলিক বিভাগগুলির সীমানা এক থাকত না। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছিল বলে জানা যায়, যদিও ক্রমাগত সামরিক অভিযান আর টুকরো টুকরো জায়গাদখল চলত বলে উত্তর ভারতের চেয়ে দখিনেই এই পরিবর্তন ঘটেছিল বেশি।[১৬] আওরঙ্গজেবের আমলের পরিসংখ্যান প্রসঙ্গে এই ঘটনাকে হিসেবে ধরতেই হবে।

বিহারের জন্য : পূর্বোক্ত সূত্র, ২য় ভাগ, *JASB*, খণ্ড ৫৪ (১৮৮৫), পৃ. ১৬২-৮২ (মানচিত্র-সহ)।

বাংলার জন্য : ব্লথমান, 'কনট্রিবিউশনস্ টু দা জিওগ্রাফি অ্যাণ্ড হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল' (মহামেডান পিরিয়ড), ১ম ভাগ, *JASB*, খণ্ড ১৩ (১৮৭৩), পৃ. ২০৯-৩১০ ; জে. বীমস্, 'নোটস্ অন আকবরস্ সুবাস', *JRAS*, ১৮৯৬, পৃ. ৮৩-১৩৬ (মানচিত্রসহ)।

ওড়িশার জন্য : জে. বীমস্, *JRAS*, ১৮৯৬, পৃ. ৭৪৩-৬৫ (মানচিত্রসহ) এবং মনোমোহন চক্রবর্তী, *JASB*, N.S., খণ্ড ১২, পৃ. ২৯-৫৬।

১৪. পাঞ্জাবের জন্য ডঃ আই. আর. খান-এর 'হিস্টরিক্যাল জিওগ্রাফি অফ দা পাঞ্জাব অ্যাণ্ড সিন্ধ', 'মুস্লিম ইউনিভার্সিটি জার্নাল', ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৩৪, পৃ. ৩১-৫৫, প্রবন্ধটি কাজে লাগে, যদিও লেখাটি শেষ হয়নি আর উল্লিখিত মানচিত্রগুলিও ছাপা হয়নি।

এখন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে, অধ্যাপক এস. এন. হাসান ও শ্রীমুনীস রাজার তত্ত্বাবধানে আকবরের আমলের সমস্ত প্রদেশগুলির এক প্রস্থ মানচিত্র আঁকানো হয়েছে। 'আইন'-এর 'মহাল'-তালিকার ভিত্তিতে প্রদেশ এবং 'সরকার'-এর সীমানাও সেখানে দেখানো আছে। শীঘ্রই পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র হিসেবে এগুলি প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায়।

১৫. Add. 22,831. এতে গ্রাম ও রাজস্বের 'মহাল'-ওয়ারি পরিসংখ্যান দেওয়া আছে। প্রশাসনিক ইতিহাসের এমন কিছু ঘটনারও উল্লেখ আছে যা সহজে অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

১৬. নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

সম্ভবত, বাংলার সঙ্গে কামরূপ 'সরকার' যোগ করা হয়েছিল মীরজুমলার আসাম-অভিযানের পর (তুলনীয়, 'চাহার গুলশন', পৃ. ৫৩ক, যদুনাথ সরকার ১৩৩)। ১৬৬৬-তে শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম বিজয়ের ফলে আনুষ্ঠানিক কোন পরিবর্তন হয়নি, কারণ মুঘল সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে 'সরকার' বলে এই অঞ্চলের ওপর স্বত্ব দাবি করা আছে 'আইন'-এই। ওড়িশাকে 'আইন'-এ বাংলার 'সরকার' (আসলে অধীনস্থ-সুবা) হিসেবে দেখানো আছে।

মুঘল যুগের সমস্ত বা প্রায় সমস্ত 'মহাল' ও পরগনাগুলিকে মানচিত্রে না বসানো পর্যন্ত হয়তো একেবারে নির্ভুল হওয়া যাবে না। তবে ভুলের মাত্রা অনেক কমানো যায় যদি আমরা শুধুমাত্র অপেক্ষাকৃত সঠিকভাবে নির্দেশ্য সীমার মধ্যবর্তী সুবৃহৎ ভূখণ্ডগুলিকে বিবেচনায় রাখি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুটি বৃহৎ ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী অনির্দিষ্ট এলাকাকে এমনভাবে বসানো যেতে পারে যাতে অনির্দিষ্ট অঞ্চলের এলাকার পরিমাণ ঐ দুই বৃহৎ

আলাদা প্রদেশ হিসেবে ওড়িশার প্রথম দেখা পাওয়া যায় শাহ্‌জাহানের আমলের রাজস্ব বিষয়ক নথিপত্রে 'মজালিসুস সালাতীন', পৃ. ১১৪ ক-১১৫ খ-এর পরে।

মনে হয় কিছুদিনের জন্য জৌনপুর 'সরকার'কে এলাহাবাদ প্রদেশ থেকে বিহারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল (তুলনীয়: পূর্বোক্ত সূত্র, এবং 'সিলেক্টেড ডকুমেন্ট্‌স্ অফ শাহ্‌জাহানস্ রেন', পৃ. ১১২)। কিন্তু আনুমানিক ১৬৫৯ নাগাদ একে আবার এলাহাবাদেই ফিরিয়ে দেওয়া হয় (তুলনীয় 'দস্তুর-আল-আমল-এ আলমগীরী', পৃ. ১১৪ ক)।

শাহ্‌জাহানের আমল শেষ হওয়ার আগেই তিজারা এবং নরনাউল 'সরকার'দুটি আগ্রা প্রদেশ থেকে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল (পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ১০৯ ক-খ, 'চাহার গুলশন', পৃ. ৩৫ খ, সরকার ১২৫-৬)।

থাট্টা 'সরকার' (বা অধীনস্থ-সুবা) 'মজালিসুস সালাতীন'-এর সময় পর্যন্ত মুলতান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তী নথিপত্রে, ওড়িশার মতো, থাট্টা একটি আলাদা প্রদেশ হিসেবে দেখা দিতে থাকে। সিবিস্তান বলে এর একটি পুরনো 'সরকার' অবশ্য মুলতানেই রয়ে যায় (তুলনীয় 'দস্তুর-আল-আমল-এ আলমগীরী', পৃ. ১১০ খ-১১১ ক; 'চাহার গুলশন', পৃ. ৪৪ ক-খ, সরকার, ১৩০-১৩১)।

মনে হয়, কাবুলের 'সরকার' বা অধীনস্থ-সুবা হিসেবে কাশ্মীরের অবস্থান গোড়া থেকেই ছিল নেহাৎই আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। কিন্তু 'মজালিসুস সালাতীন'-এর রাজস্ব সারণিই ঐ ধরনের শেষ নথি যাতে কাশ্মীরকে কাবুলের সঙ্গে যুক্ত করে দেখানো আছে।

'আইন'-এর সময়ে সিরোহী 'সরকার' ছিল আজমীর প্রদেশের অংশ। কখন যে এই 'সরকার' ভেঙে বনসবল্লা, ডোঙ্গারপুর আর সিরোহী 'সরকার' তৈরি হলো ও সবগুলিকেই গুজরাটে পাঠিয়ে দেওয়া হলো তা ঠিক বলা যায় না। (তুলনীয় 'মিরাৎ', সাপ্লিমেণ্টারী, ২২৫-৬)।

রাজত্বের ৮ম বছরে শাহ্‌জাহান নর্মদা নদীর দক্ষিণে মালবের সমস্ত অঞ্চল, অর্থাৎ বইজাগড় এবং নন্দুরবার 'সরকার' এবং হন্দিয়ার প্রায় সব 'মহাল' খান্দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন (লাহোরী, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ. ৬২-৩; সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ৬০ ক-৬১ ক, Or. 1671, পৃ. ৩৩ খ-৩৪ ক; 'দস্তুর-আল-আমল-এ শাহীনশাহী', পৃ. ২৯ ক, ৩২ ক, ৩৪ খ)। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে অধিকৃত হবার পর বগলানা কিছুদিনের জন্য একটি আলাদা একক (মুল্‌ক্) হিসেবে গণ্য হয়েছিল। কিন্তু ১৬৫৮-র মধ্যে বা ঐ বছরেই একটি 'সরকার' হিসেবে এই জায়গাটি খান্দেশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় (সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ৬০ খ-৬১ ক, ৮৭ খ-৮৮ ক; Or. 1671, পৃ. ৩৩ খ-৩৪ ক, ৪৮ ক; 'দস্তুর-আল-আমল-এ শাহীনশাহী', পৃ. ২৯ খ)।

ভূখণ্ডের কোন একটির আওতাভুক্ত বলে পরিচিত এলাকার তুলনায় একেবারেই নগণ্য হয়ে পড়ে। যেমন, এখন মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত লাহোর ও মূলতানের মধ্যের সীমানা সঠিকভাবে বের করা কঠিন। তবে লাহোর প্রদেশ এবং মূলতান প্রদেশের মূলতান ও দীপালপুর 'সরকার'-এর অধীনস্থ এলাকার সীমা কাজ চালানোর মতো নিশ্চিতভাবে স্থির করা যায়। এই উদাহরণটি ব্যতিক্রম হলেও মুঘল প্রশাসনের অধিকাংশ প্রদেশ ও 'সরকার'সমষ্টিকে পৃথক ভূখণ্ড বলে গণ্য করা যায়। আর এইভাবে স্থিরীকৃত সীমানাগুলি মানচিত্রে বসালে খুব বড় রকমের ভুল হওয়ার ভয় কম থাকে।

আধুনিক পরিসংখ্যান বিশদ ও সম্পূর্ণ হবে এমন দাবি নিশ্চয়ই করা চলে। জেলা স্তরের নীচের বিভাগের কৃষি-পরিসংখ্যান ও আদমশুমারীর বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।[১৭] যেহেতু বর্তমান আলোচনার জন্য আমরা শুধু বড় এলাকাই ধরছি তাই যে-'কৃষি পরিসংখ্যান'মালায় জেলাগুলির বার্ষিক বিবরণ দেওয়া আছে সেগুলিই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।[১৮] গ্রামের ক্ষেত্রে, আদমশুমারীর বিবরণে প্রদত্ত জেলাওয়ারি সংখ্যাই ব্যবহার করা হয়েছে। করদ রাজ্যগুলির আলোচনায়, বিশেষত গোড়ার দিকের বছরগুলিতে, কৃষি-পরিসংখ্যান এবং আদমশুমারীর বিবরণ দুই-ই প্রায়শই অসম্পূর্ণ। সেক্ষেত্রে, পরবর্তীকালের বিবরণ অথবা 'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার' থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। দেখা যাবে, আমরা সাধারণভাবে বর্তমান শতকের গোড়ার দিককার পরিসংখ্যানের অঙ্কগুলি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি।[১৯] তার আংশিক কারণ এই যে, এ ধরনের তুলনামূলক আলোচনার পথিকৃৎ মোরল্যাণ্ড এই অঙ্কগুলি নিয়েই কাজ করেছিলেন ; অংশত এই বিশ্বাস থেকেও যে, ভারত এই সময়েই বৃটিশ শাসনের পুরো অর্থনৈতিক ফলাফল সবচেয়ে আকাঁড়া চেহারায় অনুভব করেছিল। তাই পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যের সেরা দিনগুলির সঙ্গে তুলনা করার জন্য এই অঙ্কগুলিই সবথেকে সুবিধাজনক।

সম্ভবত, রাজত্বের অষ্টম বছরে শাহ্জাহান বেরার থেকে আলাদা করে তেলিঙ্গানা 'সরকার'টিকে একটি পৃথক প্রদেশ করে দিয়েছিলেন (লাহোরী, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, ৬২-৬৩, ২০৫) ; কিন্তু, তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে বিদরপ্রদেশ গঠন করার জন্য একে সদ্য-অধিকৃত বিদর অঞ্চলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। ('দস্তুর-আল-আমল-এ শাহীনশাহী', পৃ. ৮০ ক)।

আহ্মদনগর চূড়ান্তভাবে জয় করার পর উত্তর-কোঙ্কণকে (বা তালকোকন-এ নিজামুল মুল্কী) বিজাপুরের মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বিজাপুরের বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেবের ১৬৫৭-র অভিযানের পরই, মনে হয়, এটিকে আওরঙ্গাবাদ প্রদেশে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল (পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ৭৭ খ-৭৮ ক ; 'আমল-এ সালিহ্', ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬২-৬৩)।

১৭. নির্দিষ্ট কোন বছরের পরিসংখ্যানে আগ্রহ না থাকলে এই সব তথ্য পাওয়ার সবচেয়ে ভালো সূত্র হলো 'ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার'।

১৮. ভারত সরকারের রাজস্ব ও কৃষি বিভাগ (এবং তাদের পরবর্তী বিভাগীয় মন্ত্রক) প্রকাশিত 'দি এগ্রিকালচারাল স্ট্যাটিস্টিকস্ অফ ইণ্ডিয়া' (অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত)।

১৯. এখানে প্রধানত ব্যবহৃত হয়েছে ১৮৯৯-১৯০০, ১৯০৯-১০ এবং ১৯২০-২১-এর কৃষি-পরিসংখ্যান আর ১৮৮১, ১৮৯১ এবং ১৯০১-এর আদমশুমারী। আগেরগুলি অসম্পূর্ণ হলে, বা সহজে না পাওয়া গেলে পরের বিবরণীই ব্যবহার করা হয়েছে।

আঞ্চলিক সমীক্ষার জন্য সাম্রাজ্যের পূর্বপ্রান্তিক প্রদেশ বাংলা-ই শুরু করার পক্ষে সব থেকে ভালো জায়গা হতে পারে। 'আইন'-এ এই প্রদেশটির জন্য কোন এলাকা-পরিসংখ্যান দেওয়া নেই। আওরঙ্গজেবের আমলের পরিসংখ্যানে শুধু এর অল্প কয়েকটি মাত্র গ্রামকে 'জরিপ-করা'র তালিকায় রাখা হয়েছে। আওরঙ্গজেবের অধীনে কামরূপ বাদে ১০৯,৯২৩টি গ্রাম ছিল,[২০] অথচ ১৮৮১-তে ঐ একই অঞ্চলে গ্রামের সংখ্যা ১১৬,১৫৩। সমসাময়িক বিবরণ থেকে অবশ্যই মনে হবে যে এই প্রদেশের বেশির ভাগ অংশই পুরোপুরি মুঘলদের দখলে ছিল।[২১] 'আইন'-এর তালিকাভুক্ত 'মহাল'গুলি পরীক্ষা করে ব্লখমান এই সিদ্ধান্তে আসেন,যে তখনও চাষ আবাদের বিস্তার ঘটেছিল তাঁর নিজের সময়ের (১৮৭৩) মতো সুন্দরবনের ব-দ্বীপ অঞ্চল পর্যন্ত।[২২] আলোচ্য পর্বের বৃহত্তর অংশ জুড়েই অবশ্য মগ জলদস্যুদের হাতে পড়ে এই ব-দ্বীপের পূর্বাংশ নির্মমভাবে ধ্বংস ও জনশূন্য হয়ে পড়েছিল।[২৩] কেবলমাত্র আরাকানের বিরুদ্ধে ১৬৬৫-৬র সফল অভিযানের পর বাখরগঞ্জ জেলায় ব্যাপক পুনর্বাসন শুরু হয়.[২৪] যদিও সন্দীপের চরে এই সময়ের মধ্যেই একজন বিদ্রোহী দলপতি ঘাঁটি গেড়ে বসেছিলেন।[২৫] আরও পূর্বদিকের জঙ্গল সম্ভবত ছিল এখনকার চেয়ে আরও নিবিড়। মগদের দখলে ঘন বনে ছেয়ে যাওয়া চাটগাঁ অঞ্চলে[২৬] মুঘল প্রশাসন খুব অল্প জমিই পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিল।[২৭] ১৮ শতক অবধি শিলেট জেলায় ছিল ঘন জঙ্গল :[২৮] আর সম্ভবত ভাওয়াল বা মধুপুরের জঙ্গলও ছিল আরও বড় এলাকা জুড়ে।[২৯]

দুর্ভাগ্যবশত, ওড়িশার ক্ষেত্রে আস্থাসহকারে বলার মতো কিছু পাওয়া যায়নি। মুঘল যুগে এর নির্দিষ্ট সীমানা কী ছিল তা বলা যায় না ; আর আধুনিক পরিসংখ্যানও হয় অসম্পূর্ণ, নয়তো সেগুলির মুদ্রিত রূপ এই অঞ্চলের অজস্র ছোট ছোট রাজ্যের পক্ষে যথেষ্ট বিশদ নয়।

২০. এই প্রদেশের মোট গ্রামের সংখ্যা ১১২,৭৮৮—এ বাবদে আওরঙ্গজেবের পরিসংখ্যান আর 'চাহার গুলশন' দুই-ই একমত। 'চাহার গুলশন'-এ (Bodl. পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৫৩ ক) কামরূপ 'সরকার' (সীমানা অনিশ্চিত)-এর ক্ষেত্রে যে অঙ্ক দেওয়া আছে তা এর থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

২১. মানুচ্চি, ২য় খণ্ড, ১২৩ ; বার্নিয়ে ২০২, ৪৪১-২।

২২. *JASB*, খণ্ড ৪২, ১৮৭৩, পৃ. ২২৭, ২২৮, ২৩১-২।

২৩. 'ফথিয়া ইব্রিয়া', পৃ. ১২২ খ, ১২৩ খ, ১৬৪ ক-খ, ১৭৩ খ ; বার্নিয়ে ১৭৫ , মাস্টার, ২য় খণ্ড, ৬৬।

২৪. *JASB*, খণ্ড ৪২, ১৮৭৩, পৃ. ২২৮, ২২৯, ২৩২।

২৫. 'ফথিয়া ইব্রিয়া', পৃ. ১৪২ ক-খ, ১৪৩ খ, ১৪৪ ক, ১৫০ ক।

২৬. ঐ, পৃ. ১৬৪ ক-খ।

২৭. *JRAS*, ১৮৯৬, পৃ. ১২৭।

২৮. 'আইন', ১ম খণ্ড, ৩৯১ ; এবং *JRAS*, ১৮৯৬, পৃ. ১৩১।

২৯. এই বন ছিল বজুহা 'সরকার'-এ। তুলনীয় 'আইন', ১ম খণ্ড, ৩৯০ ; *JRAS*, ১৮৯৬, পৃ. ১২৭।

আওরঙ্গজেবের পরিসংখ্যানে বিহারের জন্য যে জরিপ-করা এলাকা দেখানো আছে, তাকে 'বিঘা-এ দফ্‌তরী' থেকে 'বিঘা-এ ইলাহী'তে নিয়ে এলে 'আইন'-এ দেখানো এলাকার তিনগুণের বেশি হয়ে যায়। যদিও মোট গ্রামসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি জরিপ হয়েছে বলে দেখানো আছে, তবুও আওরঙ্গজেবের অধীনে এর এলাকা দাঁড়ায় ১৮৯৯-১৯০০-এ নথিবদ্ধ মোট আবাদযোগ্য এলাকার একের-চার ভাগ। ব্যাপারটি অংশত ব্যাখ্যা করা যায় এই সম্ভাবনা দিয়ে যে মুঘলরা তাদের জরিপ সীমাবদ্ধ রেখেছিল গঙ্গার ধার ঘেঁষা সরু ঘনবসতিপূর্ণ গণ্ডির গ্রামগুলিতে। ঐ গণ্ডির বাইরের গ্রামগুলির চেয়ে আকারে এগুলির ছোট হওয়ারই কথা। কিন্তু তবুও এলাকার ফারাক খুব বেশি ছিল বলেই মনে হয়। এই প্রদেশে বরাদ্দ মোট গ্রামের সংখ্যা ১৮৮১-র আদমশুমারীর গণনার সঙ্গে কার্যত সমান। 'চাহার গুলশন'-এ দেখা যায় গঙ্গার পুরোপুরি উত্তরে অবস্থিত চারটি 'সরকার'-এর ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য, যদিও সবচেয়ে পূর্বদিকের 'সরকার' মুঙ্গেরের (যেটি ছিল নদী পেরিয়ে তরাই অবধি বিস্তৃত) অঙ্কটি অনেক ছোট। তবে এমন ভাবা ঠিক নয় যে, তরাই-এর জঙ্গল এই অঞ্চলে অবাধে বিস্তৃত ছিল। 'আইন'-এ তালিকাভুক্ত কিছু 'মহাল' নেপালের পাহাড়তলীর খুব কাছে, তবে আরও দক্ষিণের বড় এলাকাগুলির কোন হিসেবই পাওয়া যায় না। সম্ভবত সেগুলি ছিল জঙ্গলের মধ্যে। আগে জঙ্গল ছিল এমন বিরাট এলাকা হাসিল করা হয়েছে, কিন্তু অনেক হাসিল করা এলাকাও পরে জঙ্গল হয়ে গেছে।[৩০]

বিহারের পশ্চিমে ছিল দুটি প্রদেশ—ইলাহাবাদ ('এলাহাবাদ') এবং অযোধ্যা। প্রথমটি গঙ্গার দুই তীরের বিরাট জায়গা জোড়া অঞ্চল, বাঘেলখণ্ড এবং বুন্দেলখণ্ড-এর গভীরে প্রসারিত। গঙ্গা-যমুনা দোআব এবং গঙ্গা-ঘাগরা (ঘর্ঘরা) দোআবের নীচের দিকও এর মধ্যেই পড়ত। অযোধ্যা বিস্তৃত ছিল এর উত্তরে, পূর্বে গণ্ডক নদী থেকে পশ্চিমে গঙ্গা পর্যন্ত। 'আইন'-এর সময়ে এই দুই প্রদেশের খুব অল্প আবাদী এলাকাই জরিপ হয়েছিল।[৩১] কিন্তু মনে হয় জরিপের কাজ বেশ এগিয়েছিল পরের শতকে।

৩০. তুলনীয় বিম্‌স্, *JASB*, খণ্ড ৫৪, পৃ. ১৭৭। চম্পারণ 'সরকার'-এর সিমরাঁও 'মহাল'টি নেপাল পর্যন্ত চলে গেছে। তার রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ এখন "ঘন জঙ্গলের মধ্যে"। অন্যদিকে, বেট্টিয়া-র চারপাশের অঞ্চল আরও পরে হাসিল করা হয়েছে বলা হয়।

৩১. ব্যাপারটি বোঝা যায় এই ঘটনা থেকেই যে 'আইন'-এ এলাহাবাদ প্রদেশের ক্ষেত্রে ৪০ লক্ষ বিঘার কথা আছে, আর অযোধ্যার ক্ষেত্রে ১ কোটি বিঘার সামান্য বেশি। আওরঙ্গজেবের আমলের ঐ একই এলাকার পরিসংখ্যানকে একই এককে পরিণত করলে দাঁড়ায় ১ কোটি ৩১ লক্ষ এবং ১ কোটি ২৭ লক্ষ বিঘা। তবু আওরঙ্গজেবের সময়ে অযোধ্যার একের-তিন ভাগেরও বেশি গ্রাম জরিপ হয়নি।

'আইন'-এর এলাকার অঙ্ককে মোরল্যাণ্ড গোটা ফসলী এলাকার সূচক ধরে নিয়েছিলেন। তার সিদ্ধান্ত এই যে, তারপর থেকে ঘাগরা-গঙ্গা দোআবে আবাদী এলাকা বেড়েছে পাঁচগুণ এবং ঘাগরা ছাড়িয়ে যে ভূখণ্ড সেখানে সতেরোগুণ বা হয়তো চল্লিশগুণ ('জার্নাল…ইউ. পি. হিস্টরিক্যাল সোসাইটি', ২য় খণ্ড (১৯১৯), পৃ. ১৮ ইত্যাদি)। স্পষ্টতই মোরল্যাণ্ড এ ক্ষেত্রে ভুল করেছিলেন।

আওরঙ্গজেবের পরিসংখ্যানে দেখা যায় কার্যত এলাহাবাদ প্রদেশের সব গ্রামই জরিপের আওতায় এসেছিল। তখনকার জরিপ-করা এলাকা ১৯০৯-১০এ বিবৃত আবাদযোগ্য এলাকার প্রায় অর্ধেক। অযোধ্যায় একের-তিন ভাগেরও বেশি গ্রামে জরিপ করা হয়নি এবং জরিপ করা এলাকা এসে দাঁড়ায় ১৯০৯-১০এর অঙ্কের দুএর-পাঁচ-ভাগে।

১৮৮১-র আদমশুমারীতে নথিভুক্ত সংখ্যার চেয়ে এই দুই প্রদেশের নামে বরাদ্দ গ্রামের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি—এলাহাবাদের ক্ষেত্রে একের-তিন ভাগ, অযোধ্যার ক্ষেত্রে একের-দুই ভাগ। কিন্তু গোরখপুর 'সরকার'-এর অন্তর্ভুক্ত গ্রামের সংখ্যা ঐ একই অঞ্চলে ১৮৮১-র গণনার প্রায় সমান। অর্থাৎ অযোধ্যার অন্যান্য অংশের মতো, গোরখপুরে গ্রামের সংখ্যা এখনকার চেয়ে বেশি ছিল না।[৩২] সুতরাং চাষ-আবাদের ক্ষেত্রে জায়গাটি সম্ভবত আরও পেছিয়ে পড়েছিল। এ কথা ঠিক যে আওরঙ্গজেবের রাজত্বের ৪৭তম বছরে অযোধ্যার সুবাদার এই 'সরকার'কে 'একেবারেই জনশূন্য' বলে বর্ণনা করেছেন।[৩৩] এর অনেকটাই নিশ্চয়ই ঢাকা ছিল তরাইএর জঙ্গলে। তাভার্নিয়ে-র একটি বিবৃতি থেকে মনে হয় গোরখপুর শহরের উত্তরে সবই ছিল জঙ্গল।[৩৪] আমরা এও জানি যে গত শতকের গোড়া পর্যন্ত জঙ্গলই তার পুরনো রাজত্ব কায়েম রেখেছিল। তারপর এই অঞ্চলে সাধারণভাবে বন পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়।[৩৫] ঘাগরা পেরিয়ে দক্ষিণ দিকে, আজমগড় জেলার পূর্ব অংশে টন্স্ নদীর তীর জুড়ে ছিল ঘন জঙ্গল, এখন যেখানে তার কোন চিহ্নই নেই।[৩৬] কিন্তু মূল নজিরটি ভুল বোঝার জন্য এই বিশ্বাস তৈরি হয়েছে যে বনভূমি বিস্তৃত ছিল জৌনপুর ও এলাহাবাদের মধ্যভাগ পর্যন্ত। অন্য-ভাবেও জানা যায় যে কখনই তা ছিল না।[৩৭]

৩২. 'চাহার গুলশন', পৃ. ৫৯ ক-এ, গোরখপুর 'সরকার'-এর গ্রামসংখ্যা দেওয়া আছে। কিন্তু যদুনাথ সরকারের তর্জমায় (পৃ. ১৩৭) এই সংখ্যাটি লখনউ-এর সঙ্গে পাল্টাপাল্টি হয়ে গেছে। 'চাহার'-এ গোরখপুরের অধীনস্থ এলাকার কোন অঙ্ক নেই

৩৩. 'অখবারাৎ', ৪৭/৩২০। গোরখপুর 'সরকার'-এর নাম বদলে রাখা হয় মুয়জ্জমাবাদ-গোরখপুর বা, কেবল মুয়জ্জমাবাদ।

৩৪. তাভার্নিয়ে, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৫।

৩৫. ১৮১০ বা তার আগে ফার্সীতে লেখা গোরখপুর জেলার স্মৃতিকথায় মুফ্তী গুলাম হজরৎ বলেছেন যে, গোরখপুর শহরটি ছিল দুদিকে জঙ্গল দিয়ে ঘেরা; "রানোলা, বংশী, সিলহট, বস্তী, মঘর এবং গোরখপুর পরগনার কয়েকটি 'টপ্পা'র গ্রামাঞ্চল ছিল একেবারেই জনশূন্য; চাষীর অভাবে বা জঙ্গলের দরুন, বা বুনো হাতি ঢুকে পড়ায় এসব এলাকায় কোন বসতি হয়নি।" (I. O. 4540, পৃ. ১ ক)। অবশ্য, তিনি আরও বলেছেন যে কম রাজস্ব-হার ঘোষিত হওয়ায় আশপাশের এলাকা থেকে চাষীরা এর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল (পৃ. ৯ খ-১০ক)। এও লক্ষ্য করা যেতে পারে যে বর্তমান বস্তী এবং গোণ্ডা জেলাও তখন গোরখপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩৬. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৬-৭। এই অংশ থেকে মনে হবে জঙ্গলটি ছিল সরয়ার নদীর (অর্থাৎ ছোটী সরযূ বা পূর্ব-টন্স্) দক্ষিণ তীর জুড়ে, মুহম্মদাবাদ ও মউ-এর মধ্যে।

৩৭. জঙ্গলের ব্যাপারে মূল নজির হলো নানান ভ্রমণপথ প্রসঙ্গে ফিঞ্চ-এর বক্তব্য: "এই পথে [অর্থাৎ লখনউ এবং অযোধ্যা হয়ে] আগ্রা থেকে জৌনপুর অবধি এই পর্যন্ত; সেখান থেকে

মধ্য দোআব এবং যমুনার দক্ষিণে একটি বড় ভূখণ্ড নিয়ে চম্বল নদীর উত্তর ও দক্ষিণের দুই তীরে বিস্তৃত ছিল আগ্রা প্রদেশ। আওরঙ্গজেবের আমলে এর প্রায় সবকটি গ্রামই জরিপের আওতায় এসেছিল, যদিও নথিভুক্ত এলাকা 'আইন'-এ দেওয়া এলাকার প্রায় সমান (দিল্লীর ভাগে পাঠানো তিজারা ও নরনাউল-এর এলাকা ছাড় দিয়ে)।[৩৮] ১৯০৯-১০এ ঐ একই অঞ্চলের আবাদযোগ্য এলাকার যে বিবরণ আছে এটি প্রায়

(সেই পথে আগ্রা ফিরে) অলবাস (এলাহাবাদ) অবধি ১১০ 'কোশ', যার ৩০ 'কোশ'ই একটানা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে" ('আর্লি ট্রাভেলস্', ১৭৭)। এই বক্তব্যের এমন ব্যাখ্যা করা সম্ভব যে জৌনপুর থেকে এলাহাবাদ অবধি দূরত্ব ছিল ১১০ 'কোশ', যার মধ্যে ৩০ 'কোশ' ছিল জঙ্গলে ঢাকা। ফিঞ্চ-এর অনুলিপি করতে গিয়ে ত্য লেং (পৃ. ৬৫) এইভাবেই পড়েছিলেন। 'আর্লি ট্রাভেলস্'-এর সম্পাদক এবং মোরল্যাণ্ড অবশ্য এর ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে যে, ১১০ 'কোশ' অবধি হলো জৌনপুর থেকে এলাহাবাদ হয়ে আগ্রার যাত্রাপথের দূরত্ব এবং এর ৩০ 'কোশ' হলো সে পথে জৌনপুর এবং এলাহাবাদের মধ্যবর্তী অংশটুকু। মূল পাঠে এই ব্যাখ্যার কোন সমর্থন আছে বলে মনে হয় না। দুটি ব্যাখ্যার যে কোনটির ক্ষেত্রেই দূরত্বের হিসেবে ১১০ 'কোশ' একটা অবিশ্বাস্য রকমের ভুল: জৌনপুর থেকে এলাহাবাদের দূরত্ব হিসেবে এটি হবে অত্যধিক, আর জৌনপুর থেকে আগ্রার ক্ষেত্রে "অতিরিক্ত মাত্রায় কম"। একটাই সম্ভাব্য ব্যাখ্যা পড়ে থাকে "সেই পথে আগ্রা ফিরে" এই বন্ধনীভুক্ত বাক্যাংশ, হয়তো, পরে যে-যাত্রাপথের বর্ণনা দেওয়া হবে তার কথা বোঝাচ্ছে না। এটি হয়তো এই কথারই সংক্ষিপ্ত রূপ যে, আমরা ইতিমধ্যেই যে-পথের বর্ণনা দিয়েছি, সেই পথেই আগ্রা ফিরব, যাতে সেখান থেকে একটা নতুন ভ্রমণ শুরু করা যায়। তাহলে, "সেখান থেকে"-র মানে হবে 'আগ্রা থেকে' এবং ১১০ 'কোশ' হবে আগ্রা থেকে এলাহাবাদের দূরত্ব—যা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। এই অর্থে ধরলে, ৩০ 'কোশ' জঙ্গলকে এই পথেরই কোথাও বসাতে হবে। ভোগনীপুর থেকে ফতেপুর যাওয়ার বাঁধা পথে যেসব গিরিখাত ও ঊষর অঞ্চল পড়ত এ হয়তো তারই অতিরঞ্জিত বর্ণনা (মাণ্ডি, ৮৯, ৯২)।

মাণ্ডির সাক্ষ্য থেকে এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে এলাহাবাদ থেকে জৌনপুর অবধি রাস্তাটি একটানা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতেই পারে না। তিনি (পৃ. ১১০) এই পথটির প্রশংসা করেছেন, আর পথের দু-পাশে যে জঙ্গল ছিল এমন কোন আভাসই দেননি। এলাহাবাদ থেকে পাটনা যাওয়ার বেলায় গঙ্গার দক্ষিণে বিকল্প পথ ধরে যেতে হয়েছিল বলে তিনি দুঃখ করেছেন।

৩৮. লক্ষণীয় এই যে, আগ্রা 'সরকার'-এর ক্ষেত্রে ব্লখমান-এর অঙ্কটি ভুল। Add. 7652-এ দেখা যায় অঙ্কটি ৯১ লক্ষ বিঘা হওয়া উচিত, ৯ কোটি ১০ লক্ষ বিঘা নয়। কলপী 'সরকার'-এর ক্ষেত্রে 'আইন'-এর অঙ্কটি তার অধীনস্থ পরগনাগুলির মোট অঙ্কের চেয়ে প্রায় ১৪ 'লাখ' কম। 'চাহার গুলশন'-এ আগ্রা 'সরকার'-এর ক্ষেত্রে যদুনাথ সরকার (পৃ. ১২৬-৭) পড়েছেন 'দুই করোর', যেখানে Bodl. পাণ্ডুলিপি পৃ. ৩৯ ক-তে আছে মাত্র 'এক করোর'। পরেরটিই নিঃসন্দেহে ঠিক। যদুনাথ সরকার গোয়ালিয়র এবং কোলির অঙ্কও পাল্টাপাল্টি করে ফেলেছেন।

তার পাঁচের-ছয় ভাগ। 'আইন' এবং আধুনিক 'ফসলী এলাকা'র পরিসংখ্যানের তুলনামূলক আলোচনা করে মোরল্যাণ্ড মধ্য দোআব সম্পর্কে যে-সিদ্ধান্ত করেছিলেন, গোটা প্রদেশের হিসেবও কার্যত একই।[৩৯] আওরঙ্গজেবের আমলের নথিপত্রে এই প্রদেশটির নামে বরাদ্দ গ্রামসংখ্যা, ১৮৮১ এবং তার পরের আদমশুমারীগুলি থেকে পাওয়া সংখ্যার প্রায় একের-তিন ভাগ বেশি।[৪০]

জমির প্রায় পুরো অধিকারের যে-চিত্র এইসব পরিসংখ্যান দেয়, পেলসার্ট-ও তাকে সমর্থন করেন। তিনি বলেছেন, আগ্রা এলাকায় জ্বালানি কাঠের খুব অভাব ছিল, আর গাছের সংখ্যাও ছিল খুব কম।[৪১] যমুনার কাছে একটি জনশূন্য এলাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে চলত বাঘ-শিকার[৪২] আর আশ্রয় পেত বিদ্রোহী কৃষকেরা।[৪৩] এই সেই বিখ্যাত গিরিখাত, এখনও এর পরিবেশ বোধহয় তখনকার মতোই বন্য।

নির্দিষ্ট তিনটি ভৌগোলিক একক নিয়ে গঠিত ছিল দিল্লী প্রদেশ। এখন তাদের নাম রোহিলখণ্ড, উচ্চ দোআব এবং হরিয়ানা ভূখণ্ড। আওরঙ্গজেবের আমল শেষ হওয়ার আগেই কার্যত সব গ্রামই জরিপ হয়ে গিয়েছিল, আর নথিভুক্ত এলাকার অঙ্ক বেড়ে দাঁড়িয়েছিল 'আইন'-এর অঙ্কের প্রায় তিন গুণ (তিজারা ও নরনাউল ধরে)। ১৯০৯-১০-এর দাখিল হিসেব অনুযায়ী আবাদযোগ্য এলাকার এটি প্রায় $\frac{8}{৫}$ ভাগ। আওরঙ্গজেবের পরিসংখ্যানে গ্রামের সংখ্যা ১৮৮১-র আদমশুমারীতে নথিভুক্ত সংখ্যার চেয়ে একের-দুই গুণ বেশি। 'চাহার গুলশন'-এ দেখা যায় যে আজকের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে, দোআব ও রোহিলখণ্ডের মধ্যে বিশেষ কোন বৈষম্য ছিল না—'আইন'-এর পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনায় মোরল্যাণ্ড যদিও সেইরকমই আভাস দিয়েছেন।[৪৪] সমসাময়িক লেখাপত্রের কিছু কিছু ইঙ্গিত থেকে উত্তরের 'অরণ্যরেখা' মোটামুটিভাবে

৩৯. 'জার্নাল…ইউ. পি. হিস্টরিক্যাল সোসাইটি', ২য় খণ্ড (১৯১৯), পৃ. ১৯।

৪০. ১৮৮১-র আদমশুমারীর বিবরণ যেখানে 'করদ রাজ্য'গুলির ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিশদ নয়, কেবল সেখানেই পরবর্তী আদমশুমারীগুলির বিবরণ ব্যবহার করা হয়েছে।

৪১. পেলসার্ট ৪৮।

৪২. 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ২৭৯; লাহোরী, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ. ৫।

৪৩. 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ৩৭৫-৬।

৪৪. দোআব জেলাগুলিতে মোরল্যাণ্ড 'সামান্য বৃদ্ধি' লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে 'বদাউন ইত্যাদি'-তে ফসলী এলাকা বেড়েছে দেড়গুণ, বেরিলীতে দুগুণ, আর বিজনোর জেলার কোন অংশে প্রায় দুগুণ ('জার্নাল…ইউ. পি. হিস্টরিক্যাল সোসাইটি', ২য় খণ্ড (১৯১৯), পৃ. ১৮-১৯)। বর্তমান বদাউন এবং বেরিলী জেলা বদাউন 'সরকার'-এর মধ্যে পড়ত। 'চাহার গুলশন'-এ বদাউন 'সরকার'-এর যে-এলাকা দেওয়া আছে তা 'আইন'-এর দুগুণ (সাধারণ এককে নিয়ে আসার পর)। তার মানে: মোরল্যাণ্ডের সিদ্ধান্তমতো বৃদ্ধির পুরোটাই ঘটেছিল ১৭ শতকে, বা, যা আরও সম্ভবপর বলে মনে হয়, 'আইন'-এর সময়ে সমস্ত আবাদী এলাকা পুরোপুরি জরিপ হয়নি। বদাউন 'সরকার' এবং দিল্লীর অন্যান্য 'সরকার'-এর ক্ষেত্রে শুধু 'চাহার গুলশন'-এর Bodl. পাণ্ডুলিপি, ৩৫ ক-৬৬ ক-ই ব্যবহার করা উচিত। যদুনাথ সরকারের [illegible] (পৃ. [illegible]) অনেক ভুল আছে, সেগুলি অবশ্যই বর্জনীয়।

চিহ্নিত করা যায়। আমরা জানি যে বদাউন 'সরকার'-এর গোলা 'মহাল'টি গঠিত হয়েছিল বর্তমান শাহ্‌জাহানপুর জেলার একটি বড় অংশ আর খেরীর ভেতরের কিছুটা জায়গা জুড়ে। 'আইন'-এর সময়ে এখানে জরিপ হয়নি বললেই চলে। কিন্তু ১১১৯ 'ফসলী' বা আনুমানিক ১৭১১ খৃস্টাব্দের মধ্যে এর অন্তর্ভুক্ত হয় ১৪৮৪টি গ্রাম সমেত দশটি 'টপ্পা'।[৪৫] এর ব্যাখ্যা হতে পারে এই যে, আগে স্থানীয় সর্দারদের হাতে-থাকা এলাকা এখন কেড়ে নিয়ে যথাযথ প্রশাসনের আওতায় আনা হয়েছে।[৪৬] আবার এও বোঝাতে পারে যে, ঘটনাটি বন কেটে চাষ-আবাদের প্রকৃত অগ্রগতি নির্দেশ করছে। ঘটনা যাই হোক, পরবর্তী আমলের নথিপত্রে এই 'মহাল'-এর নামে যে বিরাট সংখ্যক গ্রাম বরাদ্দ করা আছে তার থেকেই বোঝা যায় যে আলোচ্য পর্বের শেষদিকে এখানে জমি পুনরুদ্ধারের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল।[৪৬ক] তবে আরও উত্তর-পশ্চিমে আওনলার চারদিক ঘিরে ছিল জঙ্গল,[৪৭] যা এখন প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে।[৪৮] মনে হয় রামপুর অঞ্চলে ভালোভাবে জঙ্গল সাফ করা হয়েছিল,[৪৯] কিন্তু ১৮ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত নৈনিতাল জেলার সমভূমিতে ছিল ঘন অরণ্য।[৫০]

৪৫ এলিয়ট, 'মেমোয়ার্স', ২য় ভাগ, পৃ. ১৬৭-৮তে উদ্ধৃত 'কানুনগোর কাগজপত্র'।

৪৬. শাহ্‌জাহানের আমলে গোলা বা কান্ত (শাহ্‌জাহানপুর) 'জিলা' বা দেশের জমিনদার এবং স্থানীয় জাগীরদারদের মধ্যে যে-যুদ্ধ হয়েছিল, তার উল্লেখ আছে সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ১৮৩ খ, Or. 1671, পৃ. ৯০ক-য়।

৪৬ক. 'বেঙ্গল অ্যাটলাস'-এ রেনেল-এর 'অযোধ্যা ও এলাহাবাদের মানচিত্র', ১৭৮০ থেকে দেখা যায়, শাহ্‌জাহানপুরের চারধারের অঞ্চল সে-সময়ে বেশ ভালোভাবেই জঙ্গলমুক্ত হয়ে গিয়েছিল, যদিও গোমতী ও তার উপনদীদের দুই বাঁকের মধ্যবর্তী অংশের ওপরদিকে তখনও ছিল জঙ্গল।

৪৭. এলিয়ট, ২য় ভাগ, পৃ. ১৫০-এ উদ্ধৃত বদাউনীর বক্তব্য। বদাউনীর মূল রচনায় আমি এই বক্তব্য খুঁজে পাইনি কারণ এলিয়ট যে-পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেছিলেন, তার কোন পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করেননি। তিনি লক্ষ্য করেছেন, আওনলার চারদিকে ২৪ 'কুরোহ্' অবধি জঙ্গলে ঘেরা—বদাউনীর এ কথা নিশ্চয়ই খুবই অতিরঞ্জিত। 'আইন'-এ আওনলা ও তার চারপাশের 'মহাল'গুলির জন্য যে-পরিমাণ জরিপ-করা এলাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তার থেকেও এমন ধারণার পক্ষে কোন সমর্থন মেলে না যে এই এলাকায় একদা বিরাট জঙ্গল ছিল।

৪৮. অবশ্য নামে এটি রয়ে গেছে, কারণ আওনলা পরগনার তৃতীয় মণ্ডল 'আওনলা জঙ্গল' নামে পরিচিত। সেখানে এখন আছে "ঢাক [পলাশ গাছ] জঙ্গলের বিশাল এলাকা"। (মোরল্যাণ্ড, 'এগ্রিকালচারাল কনডিশনস্ অফ দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস অ্যাণ্ড ডিস্ট্রিক্টস্', পৃ. ৫-এ বেরিলীর উপর টীকা)।

৪৯. এলিয়ট, ঐ, ২য় ভাগ, পৃ. ১৩৮।

৫০. এলিয়ট, ঐ, ২য় ভাগ, পৃ. ১৫০-১৫১। কাশীপুর এবং রুদরপুরের কাছাকাছি এলাকা এবং সেটি ছাড়িয়ে যে গ্রামাঞ্চল ছিল সে সম্বন্ধে ইয়ার মহম্মদ ও টিয়েফেন্থালের নামে সেই যুগের দুজন পর্যটকের বক্তব্য থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। লক্ষণীয় এই যে, এলিয়ট যখন বলেন, 'মুসলিম ইতিহাসে' "অমরোহা, লখনর এবং আওনলা ছাড়িয়ে সব জায়গাকেই বলা হয় মরুভূমি (!), বাদশাহী বাহিনী সেখানে ঢুকতে ভয় পায়" তখন তাঁর মাথায় নিশ্চয়ই শুধু দিল্লী সুলতানদের

অন্যদিকে, দুন উপত্যকায় ছিল "বসতি গ্রাম ও 'মহাল'" এবং কিছু কৃষক।[৫১]

দোআব এবং হরিয়ানা এই দুই ভূখণ্ডেই খালসেচের ভূমিকা গত শতকের শেষের দশকগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৯০৯-১০এ উচ্চ দোআবে এইভাবে সেচ-করা এলাকা ছিল নীট ফসলী এলাকার প্রায় একের-পাঁচ ভাগ, আর হরিয়ানায় প্রায় একের-দশ ভাগ। কিন্তু চাষ-বাড়ানোর চেয়ে খরা থেকে বাঁচা ও ভালো জাতের ফসল তৈরিতেই খালব্যবস্থা বেশি কাজ দিয়েছিল।[৫২] এর থেকেই হয়তো বোঝা যায় কেন এই অঞ্চলে আবাদী এলাকা আসলে খুব একটা বাড়েনি। যদিও ভাকরা-নাঙ্গাল প্রকল্প চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট এক ভূখণ্ডের ভবিষ্যৎ পাল্টাচ্ছে, তবে এ কথা সত্য যে হরিয়ানার অনেক এলাকা শুধু জলের অভাবেই অবহেলিত।[৫৩]

আসলে আধুনিক খাল ব্যবস্থা মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে আরও পশ্চিমে, সিন্ধুর সমভূমিতে। সঠিক ভৌগোলিক অর্থে পাঞ্জাবের উত্তর অংশ জুড়ে ছিল মুঘলদের লাহোর প্রদেশ। মূলতান প্রদেশ প্রসারিত ছিল এর দক্ষিণ পর্যন্ত। 'আইন'-এর সময়ে ব-দ্বীপ অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত থাকলেও তারপরে এটি ছিল কেবল সেহ্‌ওয়ানের নীচ অবধি। 'আইন'-এর সময় থেকে আওরঙ্গজেবের আমলের পরিসংখ্যান অবধি (যখন গ্রামগুলির নয়ের-দশ ভাগ জরিপ হয়ে গিয়েছিল) লাহোরের জরিপ-করা এলাকায় কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন হয়নি। মূলতান প্রদেশের মূলতান এবং ভাক্কর 'সরকার'-এ জরিপের কাজ সম্ভবত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমাদের আলোচ্য পর্বের শেষ বছরগুলির মধ্যে দীপালপুর 'সরকার'-এর প্রায় সমস্ত গ্রামই জরিপের আওতায় এসেছিল।[৫৪] লাহোর প্রদেশ এবং দীপালপুর 'সরকার'কে একত্রে নিলে দেখা যায় তাদের অধীনে নথিভুক্ত এলাকা ছিল ১৯০৯-১০এ ঐ সব জেলা এবং রাজ্যগুলির আবাদযোগ্য এলাকার অর্ধেকেরও কম। ১৭ শতকের শেষদিকের জনৈক ঐতিহাসিক একটি কৌতূহলজনক কিংবদন্তী লিখে রেখে গেছেন: বারবার মোঙ্গল আক্রমণে পাঞ্জাব ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও লোকহানি ঘটে, লোদীদের আমলেই অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ, উচ্চবারি দোআবে বন এবং অহল্যাভূমির মধ্যে একটা জায়গা সাফাই করে বতালা শহরের পত্তন করা হয়।[৫৫] মুঘল আমলে এই প্রদেশে

কথাই ছিল। এলিয়টের নিজের মানচিত্রের দিকে একবার তাকালেই বোঝা যায় যে 'আইন' এর সময়ে এই সীমা পেরিয়ে যাওয়া হয়েছিল বেশ ভালোভাবেই। মোরল্যাণ্ড এই বক্তব্যকে মুঘল আমলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুকিছু রদবদলেরও প্রস্তাব দিয়েছিলেন ('জার্নাল...ইউ. পি. হিস্টরিক্যাল সোসাইটি', খণ্ড ২, ১৯১৯, পৃ. ২০)।

৫১. ওয়ারিস, ক: পৃ. ৪৯ ক; খ: পৃ. ১৪২ খ-১৪৩ খ।

৫২. তুলনীয়: রয়্যাল কমিশন অন ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার, 'রিপোর্ট', পৃ. ৩২৫।

৫৩. "দেহ্‌লী" সম্বন্ধে তেভেনো, পৃ. ৬৮, বলেন যে "যেখানে অবহেলা করা হয়নি সেখানে এর চারপাশের জমি চমৎকার, কিন্তু অনেকাংশেই তা অবহেলিত।"

৫৪. আওরঙ্গজেবের পরিসংখ্যানে প্রদেশের যোগফল এবং 'চাহার গুলশন'-এ প্রদেশ ও 'সরকার'-এর অঙ্কগুলির তুলনার ভিত্তিতে বলা হচ্ছে (পৃ. ৪৪ ক-খ, সরকার ১৩০)।

৫৫. সুজান রায়, ৬৬-৭।

অভাবনীয় শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকলেও,[৫৬] নির্জনতার রেশ বোধহয় পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি। এ ছাড়াও অনিয়ন্ত্রিত শতদ্রু ও বিপাশা নদীতে বন্যার ফলে মাঝে-মধ্যেই দীপালপুরের ক্ষয়ক্ষতি হতো। তার ফলেই তৈরি হয়েছিল 'লখী জঙ্গল' নামে এক বিরাট আবাদশূন্য অরণ্য এলাকা।[৫৭] ঐ সময়ের পর থেকে যে পরিবর্তন হয়েছে তার জন্য খালগুলির ভূমিকা কতদূর তা বোঝা যায় নীচের ঘটনা থেকে। মুঘলদের লাহোর ও মূলতান প্রদেশের মধ্যবর্তী বৃটিশ "পাঞ্জাব"-এর জেলা ও রাজ্যগুলিতে সরকারী খালে সেচ-করা জমির অনুপাত ছিল ১৯০৯-১০এর নীট ফসলী এলাকার একের-তিন ভাগেরও বেশি; আর মোট ফসলী জমির অঙ্কে এই অনুপাত আরও বেশি হওয়ারই কথা। অবশ্য এমন ভাবা ঠিক নয় যে নতুন খাল থেকে জলসেচের আগে সেসব জমির এক একরেও কখনও লাঙল পড়েনি। নতুন খাল আসলে জায়গা নিয়েছিল সেইসব বেনো জলের পুরনো খাত ও কাটা খালের, পাড় ভেঙে যেগুলি বুঁজে গিয়েছিল। এই একই উপায়ে কিন্তু লখী জঙ্গল ও ঐ ধরনের অহল্যাভূমি লোপ করা হয়েছে, এবং আধুনিক পদ্ধতির সাহায্যে চাষ-আবাদের যে বিস্তৃতি ঘটেছে তুলনায় তা বিরাট।

আবাদের এই বৃদ্ধি সত্ত্বেও আওরঙ্গজেবের পরিসংখ্যানে লাহোর প্রদেশ এবং মূলতান ও দীপালপুর 'সরকার'-এর ক্ষেত্রে প্রদত্ত গ্রামের সংখ্যা মিলিতভাবে ঐ একই অঞ্চলের ১৮৮১-র আদমশুমারীর অঙ্কের অর্ধেকেরও বেশি।[৫৮]

থাট্টা প্রদেশে একদম জরিপ হয়নি। মুঘল আমল থেকে ঐ প্রদেশ সম্পর্কে শুধু গ্রামের সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় তফাৎ এই যে, ভাক্কর ও সিবিস্তান 'সরকার' সমেত এই প্রদেশে গ্রামের সংখ্যা সিন্ধু প্রদেশের ১৮৮১-র অঙ্কের মাত্র দুএর-তিন ভাগ,[৫৯] যদিও প্রথমটির অন্তর্ভুক্ত এলাকা ছিল আরও বড়। শুধুমাত্র এই তথ্য থেকে এমন বোঝাতে পারে, বা না-ও বোঝাতে পারে যে মুঘল আমলে এই অঞ্চল ছিল বিশেষ করে জনশূন্য। দেখা যাবে, বেনো জলের নালা ও খাল তখনও ছিল; কিন্তু ১৯০৯-১০এ সিন্ধু প্রদেশের নীট বীজ-বোনা এলাকার প্রায় তিনের-চার ভাগ সেচ হয়েছিল আধুনিক সরকারী খাল দিয়ে। এর থেকেই বোধহয় বোঝা যায় অবস্থা কী ছিল।

সিন্ধুর মতো কাশ্মীরেও জরিপ হয়নি। মুঘল পরিসংখ্যানে এখানকার যে গ্রাম-সংখ্যা দেওয়া আছে, ঐ একই অঞ্চলের জেলাগুলির জন্য ১৯০১-এর আদমশুমারীতে দেওয়া সংখ্যাও কার্যত তার সমান। আজমীর প্রদেশ সম্বন্ধেও এখনও খুব কমই বলা

৫৬. পূর্বোক্ত গ্রন্থের পৃ. ৮৮ তে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, কাবুলে মুঘল অধিকারই পাঞ্জাবের সমৃদ্ধির চাবিকাঠি।

৫৭. ঐ, ৬৩; মানুচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৭-৮ এবং পৃ. ৪৫৭-র অনুবাদকের টীকা।

৫৮. 'সরকার'দুটির জন্য 'চাহার গুলশন'-এর অঙ্ক (পৃ. ৪৪ ক-খ; সরকার ১৩০) ব্যবহার করা হয়েছে।

৫৯. খয়েরপুর সমেত। 'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার', "সিন্ধ" এই তথ্যের উৎস।

যায়, কারণ এই প্রদেশের ক্ষেত্রে মুঘলদের এলাকা ও গ্রাম পরিসংখ্যান খুবই অসম্পূর্ণ ;[৬০] আধুনিক কৃষি-পরিসংখ্যানেও মোট এলাকার অংশমাত্র ধরা আছে।

আকবরের উত্তরাধিকারীদের আমলে, জরিপের ভিত্তিতে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের রীতি বদলে, গুজরাটে, অন্তত আংশিকভাবে, অন্য রীতি চালু করা হয়।[৬১] তাই, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে আওরঙ্গজেবের আমলে ১০,৩৭০টি গ্রামের মধ্যে ৬,৪৪৬টি গ্রামেই জরিপ হয়নি, আর নথিভুক্ত এলাকা 'আইন'-এর এলাকার প্রায় অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছিল। এই পরিসংখ্যান ছাড়াও, এই প্রদেশের জরিপ-করা এলাকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায় 'মিরাৎ-এ আহ্‌মদী'তে।[৬২] অনুমান করা হয় এই বিবরণ তৈরি হয়েছিল তোডর মলের সমীক্ষার ভিত্তিতে। কিন্তু এর মোট অঙ্ক আওরঙ্গজেবের পরিসংখ্যান ও 'চাহার গুলশন'-এ দেওয়া অঙ্কের খুব কাছাকাছি। মাত্র একটি বাদে জরিপ না-হওয়া সব 'সরকার'-এর বিবরণই 'চাহার'-এর সঙ্গে এক। তাই সন্দেহ না হয়ে যায় না যে তোডর মলের সমীক্ষার ওপর এটি আরোপ করা নেহাৎই কাল্পনিক, অঙ্কগুলি আসলে নেওয়া হয়েছে আওরঙ্গজেবের আমলের নথিপত্র থেকে। 'মিরাৎ-এ আহ্‌মদী'র সংযোজনীতে আমরা পাই রাজস্ব ও গ্রাম পরিসংখ্যানের বিশদ 'মহাল'-ওয়ারি বিবরণ। তথ্য হিসেবে এটি অমূল্য এবং 'চাহার গুলশন'-এর 'সরকার'-ওয়ারি অঙ্কের সঙ্গেও মোটামুটি মেলে। লক্ষণীয় এই যে 'আইন' অথবা পরের নথিপত্রের এলাকা পরিসংখ্যানে সোরাটকে ধরা হয়নি,[৬৩] আর আওরঙ্গজেবের পরিসংখ্যানে জরিপ-করা গ্রামের সংখ্যা ছিল অবশিষ্ট অঞ্চলের মোট গ্রামসংখ্যার অর্ধেক। যদিও 'আইন'-এ পরের আমলের দুগুণ এলাকা দেখানো আছে, তাহলেও প্রশাসিত ভূখণ্ডের প্রায় সমস্ত গ্রামই জরিপ হয়েছিল—এমন মনে হওয়া খুবই সম্ভব। একই অঞ্চলের আবাদযোগ্য এলাকার আধুনিক বিবরণীর[৬৪] সঙ্গে 'আইন'-এর এলাকার তুলনা করলে দেখা যায় প্রথমটির ভাগে সামান্যই বেশি পড়ে। কিন্তু 'মিরাৎ'-এ দেখা যায়,

৬০. শুধু 'আইন' এবং 'চাহার গুলশন'-ই নয়, একটি বিশদ বিবরণ ('ইয়াদ্‌দাশ্‌ৎ') থেকেও এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায়। সেখানে প্রতি 'মহাল'-এর রাজস্বের অঙ্ক এবং গ্রামের সংখ্যা (বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে) দেওয়া আছে (রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, লণ্ডন: পাণ্ডুলিপি, ফার্সী ১৭৩)।

৬১. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, ২১৭-১৮, ২৬৩।

৬২. ঐ, ১ম খণ্ড, ২৫।

৬৩. পরে এই জায়গাটি ভাগ হয়ে যায় সোরাট এবং ইসলামনগর 'সরকার'-এর মধ্যে।

৬৪. সাধারণত, ১৯২০-২১-এর পরিসংখ্যান থেকে এগুলি নেওয়া হয়েছে। কিন্তু, কাম্বে ও রেওয়া কণ্থার অঙ্কগুলি নেওয়া হয়েছে 'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার', "সোরাট"-এ ১৯০৩-৪-এর বিবরণ থেকে। আগের কোন বিবরণী না থাকায় নতুন সবর কণ্থা জেলার ক্ষেত্রে ১৯৪৯-৫০-এর অঙ্কের সাহায্য নিতে হয়েছে। লক্ষণীয় এই যে রেওয়া কণ্থা জেলার অধিকাংশ 'মহাল'ই 'আইন'-এর তালিকায় নেই এবং 'মিরাৎ'-এ এই 'মহাল'গুলির পরিষ্কার শ্রেণীবিভাগ (যথা, রাজপিপলা, বরিয়া, লুনাবাদা ইত্যাদি) করা হয়েছে প্রশাসনিক নথিপত্রের আওতা-বহির্ভূত করদ অঞ্চল হিসেবে।

জরিপ-করা এলাকার প্রায় একের-তিন ভাগই আসলে ছিল আবাদের অযোগ্য। রাজস্বের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, অত জমি জরিপ করার নিশ্চয়ই দরকার ছিল না।[৬৫] এর একটা ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু 'মিরাৎ'-এর বক্তব্য একেবারেই অগ্রাহ্য করা কঠিন। এ কথা ঠিক যে ১৮৮১-তে গুজরাটের গ্রামের সংখ্যা মুঘল আমলের চেয়ে সামান্যই বেশি ছিল।[৬৬] তবুও ১৬২৯ নাগাদ (অর্থাৎ পরবর্তী দশকের বিরাট দুর্ভিক্ষের আগে) একজন ওলন্দাজ পর্যবেক্ষক বলেছিলেন যে, "জমির একের-দশভাগও আবাদ হয় না", আর তাই যে কেউ যেখানে ইচ্ছা সেখানেই চাষের জমি পেতে পারে।[৬৭] কথাটি স্পষ্টতই অতিরঞ্জিত।[৬৮] কিন্তু এর মধ্যে যদি কণামাত্রও সত্য থাকে তবে এমন একটা অবস্থার কথা ধরে নিতে হয় যা আজকের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। এখন প্রায় সমস্ত জমিই অধিকৃত হয়ে গেছে। বিদেশী পর্যটকরা যে-প্রদেশের সবচেয়ে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন তা হলো গুজরাট। কিন্তু তাঁদের বিবরণ থেকে এ কথার পক্ষে বা

৬৫. আগের একটি টীকায় যেমন আভাস দেওয়া হয়েছে, চারণভূমিও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে পারে।

৬৬. আওরঙ্গজেবের আমলের পরিসংখ্যান এবং 'চাহার গুলশন'-এ মোট গ্রামের সংখ্যা দেওয়া আছে ১০,৩৭০। 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, ২৫-এ এর মোট সংখ্যা হলো ১০,৪৬৫½। এর 'মহাল' শীর্ষকের তলায় দেওয়া অঙ্কগুলি (পরিশিষ্ট, পৃ. ১৮৮ ইত্যাদি) যোগ দিলে হয় ১১,৫৬৩। কিন্তু এমন বহুসংখ্যক গ্রাম এর মধ্যে ধরা আছে যেগুলিকে স্পষ্টভাবেই বিধ্বস্ত বলা হয়েছে। ১৮৮১-র আদমশুমারী অনুযায়ী কচ্ছ, রেওয়া কন্থা এবং সুরাট রাজ্য বাদে গুজরাট এবং কাথিয়াবাড়ে গ্রামের সংখ্যা ছিল ১২,৫৪৫। এও উল্লেখযোগ্য যে, এখানে যেসব অঞ্চল বাদ দেওয়া হলো সেগুলি ছাড়াও কাথিয়াবাড়ের কয়েকটি 'মহাল' এবং পত্তন 'সরকার'-এর ক্ষেত্রে 'মিরাৎ'-এ কোন গ্রামবিবরণী দেওয়া নেই। কমিসারিয়ট, 'মান্দেল্‌স্‌লো', পৃ. ২৮-এ বলা হয়েছে, আহ্‌মেদাবাদ 'সুবা'-র "আওতায় ছিল ২৫টি বড় শহর এবং ৩,০০০ গ্রাম।" কিন্তু এখানে 'সুবা'র সঙ্গে 'সরকার'কে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। এর প্রায় এক দশক আগে (১৬২৯) গেলেইনসেন লিখেছিলেন যে, আহ্‌মেদাবাদের অধীনে ছিল "২৫টি বড় মুখ্য-গ্রাম বা ছোট শহর ও তার নীচে ২,৮৯৮টি পল্লীগ্রাম ইত্যাদি" (*JIH*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৮-৯)। এই অঙ্কগুলির সঙ্গে একই 'সরকার'-এর ক্ষেত্রে 'মিরাৎ'-এ দেওয়া অঙ্কগুলির তুলনা করা যায়: মোট ৩,৪৯৭টি গ্রাম নিয়ে ২৫টি পরগনা, যার মধ্যে ৪০৪টি হয় প্রশাসনের আওতায় নেই, নয়তো ধ্বংস হয়ে গেছে। 'চাহার গুলশন'-এ (Bodl. পৃ. ৬৪ ক) এই 'সরকার'-এর জন্য মোট ২,৮৮০টি গ্রাম নিয়ে ২৮টি 'মহাল' বরাদ্দ করা হয়েছে। এই সমস্ত তথ্যসূত্রের মধ্যে এত মিল থাকা খুবই আশ্চর্যজনক। একইভাবে গেলেইনসেন বলেন (ঐ, পৃ. ৭৫), বরোদার "অধীনে" ছিল-২১০টি গ্রাম। 'মিরাৎ'-এ পরগনার অধীনে আছে ২২৬টি গ্রাম এবং 'সরকার'-এর অধীনে ৩৪৮টি ('চাহার গুলশন', পূর্বোক্ত সংস্করণে, ৩৩৫টি)।

৬৭. গেলেইনসেন, মোরল্যাণ্ড-কৃত অনুবাদ, *JIH*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৯।

৬৮. মোরল্যাণ্ড, 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', পৃ. ১২৯ টীকা।

বিপক্ষে কিছু খোঁজার চেষ্টা বৃথা।[৬৯] আমাদের কাছে যে তথ্য আছে তার অনেকটাই অমীমাংসিত, এমন কি পরস্পরবিরোধী ; যদিও মোটের ওপর এর থেকেই বোঝা যায়, সে সময়ে চাষ-আবাদ হতো এখনকার চেয়ে কম এলাকা জুড়ে। কিন্তু 'মিরাৎ-এ আহ্‌মদী'তে যেমন বলা হয়েছে, তেমনি ঠিক একের-তিন ভাগই কম ছিল কিনা—সে প্রশ্ন থেকেই যায়। এর সঙ্গে এই সম্ভাবনাও যোগ করা যায় যে মুঘল আমলের পর থেকে গুজরাটের কোন কোন অংশে কিছু কিছু জমি পুনরুদ্ধারের কাজ হয়েছে, মুঘল পরিসংখ্যানে যা ধরা হয়নি। যেমন, রাজপিপলার চারধারের অঞ্চল। আমাদের আলোচ্য পর্বে এখানে বুনো হাতি ঘুরে বেড়াত।[৭০]

মালব থেকে নর্মদার দক্ষিণের বিরাট ভূখণ্ড নিয়ে শাহ্‌জাহান তাকে খান্দেশের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। তাহলেও, আওরঙ্গজেবের পরিসংখ্যানে মালবের জরিপ-করা এলাকা 'আইন'-এ নথিবদ্ধ এলাকার দুগুণেরও বেশি। তবুও মাত্র একের-তিন ভাগ গ্রাম জরিপের আওতায় আনা হয়েছিল। খণ্ডিত মালব প্রদেশের (যে কয়েকটি গৌণ 'রাজ্যে'র কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না সেগুলি বাদ দিয়ে) এই অঞ্চলটির আধুনিক বিবরণ (১৯২০-২১) থেকে দেখা যায়, এর আবাদযোগ্য এলাকা আওরঙ্গজেবের অধীনস্থ এলাকার প্রায় তিনগুণ। কিন্তু ১৯২০-২১এর বিবরণে গ্রামগুলির মাত্র একের-তিন ভাগ এলাকা হিসেবে ধরা হয়েছে। এছাড়াও আধুনিক অঙ্কটির দুএর-পাঁচ ভাগই 'আবাদযোগ্য অহল্যাভূমি'। মুঘল নথিপত্র এ বিষয়ে অতটা সম্পূর্ণ না হওয়াই স্বাভাবিক। ১৮৯১ ও ১৯০১-এর আদমশুমারী অনুযায়ী এই প্রদেশের গ্রাম-সংখ্যা মুঘল যুগে নথিভুক্ত সংখ্যার চেয়ে স্পষ্টতই বেশি, কিন্তু খুব একটা বেশি নয়।[৭১] এইসব লক্ষণ থেকে মনে হতে পারে, এ অঞ্চলে চাষ-আবাদের ব্যাপক প্রসারের কথা মানা যাবে না। উর্বরতা আর নিশ্চিতভাবে প্রচুর ফলনের জন্য মুঘল আমলেই মালবের বেশ পাকাপোক্ত সুনাম ছিল।[৭২]

৬৯. মাণ্ডি, ২৬৪, অবশ্য বলেছেন যে "খোদ আগ্রা থেকে…মাহমুদাবাদ (আহ্‌মেদাবাদ)-এর দ্বার পর্যন্ত এক জনবসতিহীন, ঊষর ও তস্কর-অধ্যুষিত স্থান।" কিন্তু শব্দগুলির আক্ষরিক অর্থ বোধহয় উদ্দিষ্ট নয়। মাণ্ডি ইতিমধ্যেই মেহ্‌সানার আগে, বনের সঙ্গে মিশে থাকা 'চমৎকার' জায়গাও দেখেছিলেন, কিন্তু সেই জায়গা ও আগ্রার মধ্যে জনহীন অবস্থার কোন উল্লেখ করেননি।

৭০. লাহোরী, ১ম খণ্ড, ৩৩১ ; 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, ১৪।

৭১. আওরঙ্গজেবের পরিসংখ্যানে এই প্রদেশের ক্ষেত্রে গ্রামের সংখ্যা দেওয়া আছে ১৮,৬৭৮। কিন্তু এর থেকে গড় 'সরকার'-এর অধীনস্থ ৭৫৯টি গ্রাম বাদ দিতে হবে (তুলনীয় 'চাহার গুলশন', পৃ. ৬৭ খ-৬৮ ক ; সরকার, ১৪২), কারণ এর সঠিক সীমা বের করা যায়নি। অবশিষ্ট অঞ্চলে ১৮৯১-এর আদমশুমারী (বৃটিশ জেলাগুলির জন্য) এবং ১৯০১-এর আদমশুমারী ('করদ রাজ্য'গুলির জন্য)-তে ১৯,৫০০ গ্রামের কথা আছে। এই সব গ্রামই পুরোপুরি মুঘল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, আর ৪,০৯২টি গ্রাম ছিল সেইসব অঞ্চলে যা শুধু আংশিকভাবে মুঘল প্রদেশের আওতায় পড়ত।

৭২. 'আইন', ১ম খণ্ড, ৪৫৫ ; মাণ্ডি, ৫৪-৫৭, বিশেষ করে ৫৭ ; তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, ৪৭। উত্তর

খান্দেশের ক্ষেত্রেও সম্ভবত একই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব। 'আইন'-এ এই প্রদেশ ও অন্যান্য দখিন প্রদেশের জরিপ-এলাকার কোন অঙ্ক দেওয়া নেই। কিন্তু আওরঙ্গজেবের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মোট ৬,৩৩৯টি গ্রামের মধ্যে ২,৮৩২টি গ্রাম তখন জরিপের আওতায় এসেছিল। ১৮৯১ ও ১৯০১-এর আদমশুমারী দিয়ে বিচার করলে গ্রামের সংখ্যা প্রায় একই আছে। তবে ১৯২০-২১এর বিবরণে আবাদযোগ্য এলাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল আওরঙ্গজেবের আমলের জরিপ হওয়া এলাকার (মোট গ্রামের অর্ধেকেরও কম) প্রায় ২.৫ গুণ। সুতরাং মনে হতে পারে যে চাষবাস খুব একটা বাড়েনি। অন্যান্য তথ্যসূত্রের সঙ্গেও এই ধারণা মেলে। সেখানে বলা হয়েছে, এই প্রদেশে ভালোই চাষবাস হতো আর প্রায় সব জমিই অধিকৃত হয়েছিল।[৭৩]

আওরঙ্গজেবের আমলে বেরারের প্রায় সব গ্রামকেই জরিপের আওতায় আনা হয়েছিল। ১৮৯১-এর আদমশুমারী অনুযায়ী গ্রামের সংখ্যা বিশেষ পাল্টায়নি। কিন্তু ১৯২০-২১ সালে আবাদযোগ্য এলাকার পরিমাণ মুঘল পরিসংখ্যানে জরিপ-এলাকার দুএর-তিন ভাগেরও বেশি বেড়ে গিয়েছিল, যদি-না তার সমান বেড়ে থাকে। সুতরাং এখানে চাষ-আবাদ বিস্তৃত হয়েছিল যথেষ্ট পরিমাণে ; আর আমরা ধরে নিতে পারি এই বিস্তার ঘটেছিল অনেকটাই বিরাট মধ্য ভারতীয় বনভূমি হাসিল করে। এই নিবিড় বনভূমি তখন ছিল বেরার প্রদেশের পূর্ব অংশে।[৭৪]

মুঘল নথিপত্রে আওরঙ্গাবাদ প্রদেশের মোট গ্রামের সংখ্যা ১৮৯১-এর সংখ্যার প্রায় সমান।[৭৫] জরিপ-করা গ্রামের সংখ্যা ছিল মোট গ্রামসংখ্যার নয়ের-দশ ভাগেরও বেশি, কিন্তু জরিপ-করা এলাকার পরিমাণ ১৯২০-২১-এর বিবরণে আবাদযোগ্য এলাকার মাত্র দুএর-তিন ভাগের মতো। পাশের প্রদেশ বিদর ছিল আয়তনে খুবই

ভারতের চাষীদের কল্পনায় কিছুদিন আগে পর্যন্ত মালবের এই সুনাম অক্ষুণ্ণ ছিল (ক্রুক, 'দা নর্থ-ওয়েস্টার্ন প্রভিন্সেস অফ ইণ্ডিয়া', লণ্ডন, ১৮৯৭, পৃ. ১৭১ ; এলিয়ট, 'মেমোয়ার্স' ইত্যাদি, ২য় ভাগ, পৃ. ৩১৫ দ্রষ্টব্য)।

৭৩. "খুব অল্পই অনাবাদী পড়ে আছে এবং এর অধিকাংশ গ্রামই শহরের মতো দেখায়" ('আইন', ১ম খণ্ড, ৪৭৪)। আরও দ্রষ্টব্য ফিচ, রাইলি সম্পাদিত, পৃ. ৯৫ এবং 'আর্লি ট্রাভেলস্', ১৬ ; তেভেনো ১০১-২ ; তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, ৪২ ; মানুচি, ২য় খণ্ড, ৪২৯ ; 'দিলকুশা', পৃ. ৭ ক। বেস্রো কথা বলেছেন একমাত্র রো, ৬৮। তাঁর মতে সুরাট থেকে বুরহানপুর পর্যন্ত গোটা গ্রামাঞ্চলই ছিল "হতদরিদ্র ও উষর"। আবুল ফজল বলেছেন, পুরনো দিনে অধিকাংশ এলাকাই ছিল জনহীন ; ব্যাপক পুনর্বাসন শুরু হয় ১৪ শতকের শেষের দিকে স্থানীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মালিক রাজী-র উৎসাহে ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৫)।

৭৪. তুলনীয় 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৭-৮।

৭৫. গ্রামের সংখ্যার জন্য আওরঙ্গজেবের পরিসংখ্যানে দেওয়া অঙ্কটি, অর্থাৎ ৮,২৬৩, মেনে নেওয়া হয়েছে। 'চাহার গুলশন'-এ (পৃ. ৭৪ খ, সরকার, ১৫১) মাত্র ৫,৯৫০টি গ্রামের কথা আছে। যদুনাথ সরকার (পৃ. ১৫২) আলাদা আলাদা 'সরকার'-এর অঙ্কের যে যোগফল দিয়েছেন সেটি ভুল। মূলত, পুরেন্দার অধীনস্থ গ্রামের সংখ্যা ৫৯৯-এর জায়গায় ৫,৫৯৯ পড়ার জন্যই এমন ঘটেছে।

ছোট। এর সীমানা নির্দিষ্টভাবে স্থির না-হওয়া পর্যন্ত এই প্রদেশ সংক্রান্ত অঙ্ক নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে বেশ বড় মাপের ভুল হতে পারে।

বিজাপুর এবং হায়দরাবাদ প্রদেশদুটির ক্ষেত্রে মুঘল পরিসংখ্যানে এলাকার বিবরণও পাওয়া যায় না, গ্রামের সংখ্যাও নথিভুক্ত নেই।

এত বিশদভাবে মুঘল পরিসংখ্যান অনুধাবন করাটা বিরক্তিকর ঠেকে থাকতে পারে। কিন্তু এই আলোচনা থেকে অন্তত একটি ব্যাপার বেরিয়ে আসে : কয়েকটি ছোটখাট সমস্যা বাদ দিলে, এই সব পরিসংখ্যানের ধাঁচ খুবই সুসম্বদ্ধ, আর এর সমর্থনে যে তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় তার পরিমাণও তুচ্ছ নয়। আধুনিক পরিসংখ্যানের সঙ্গে তুলনা করে যে সাধারণ ফলাফলগুলি পাওয়া গেল, তার ওপর অন্তত কিছুটা আস্থা রাখার অধিকার এর থেকে পাওয়া যেতে পারে। তাই এ কথা নিশ্চিত বলেই মনে হয় যে মুঘল আমলের পর থেকে চাষ-আবাদ বেড়েছে সর্বত্রই, যদিও মাত্রার হেরফের আছে। তিনটি অঞ্চলে এই বৃদ্ধি হয়েছে সবচেয়ে বেশি : প্রায় শতকরা একশ ভাগ। প্রথম অঞ্চলের মধ্যে পড়ে এলাহাবাদ, অযোধ্যা এবং বিহার আর সম্ভবত বাংলার কিছু অংশ। অবশ্যই এখানে এই বৃদ্ধি ঘটেছিল প্রধানত বিরাট পাহাড়তলীর জঙ্গল, তরাই পুনরুদ্ধার করে। দ্বিতীয় অঞ্চল হলো বেরার। এখানে চাষ-আবাদ ছড়িয়েছে মধ্য ভারতীয় জঙ্গল সাফ করে। আর, অবশেষে, সিন্ধু উপত্যকা। এখানে কৃষির প্রসার ঘটেছে প্রায় পুরোপুরিই আধুনিক খাল ব্যবস্থার ফলে। মনে হয়, এই সমস্ত অঞ্চল বাদে, অন্যত্র চাষ-আবাদ বৃদ্ধির হেরফের হয়েছে একের-দুই থেকে একের-তিন ভাগ, বা মাত্র একের-চার ভাগ। এই বৃদ্ধিতে জঙ্গলসাফাই-এর প্রায় কোন ভূমিকাই নেই। প্রধানত নীচু মানের জমি আর চারণভূমিতে লাঙল চালিয়েই এমন করা সম্ভব হয়েছে। এ ধরনের কাজ এখনও চলছে।

আগেকার দিনে জমির গড়পড়তা উৎপাদন বেশি ছিল কিনা এ নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। এ কথা মেনে নেওয়া হয়েছে যে—সার দেওয়ার প্রচলিত রীতিতে বা, বলা যায়, সার না-দেওয়ায়—গড় উৎপাদন কমে যাওয়ার দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, নীচু মানের জমিতে চাষের বিস্তার, যেসব জমিতে বীজ বোনাটা আগে খরচায় পোষাত না। দ্বিতীয়ত, সাফ-করা জঙ্গলের ক্রমাগত ব্যবহার। কিছুদিন প্রচুর উর্বরা থাকার পর জমির ক্ষমতা এখানে শেষ হয়ে যায় আর সাধারণ জমির পর্যায়ে নেমে আসে।[১৬] আমাদের পরিসংখ্যানগত তুলনার যদি কিছুমাত্র যাথার্থ্য থাকে, তবে, আমরা দেখেছি, প্রথম কারণটি প্রায় সর্বত্রই কাজ করেছিল। আর মুঘল আমলের পর যেসব নীচুমানের জমিকে লাঙলের বশে আনা হয়েছিল, তার পরিমাণ দাঁড়ায় আগের আবাদী এলাকার তুলনায় সাধারণত একের-তিন ভাগ, এমনকি কোথাও কোথাও অর্ধেক। আমরা এও দেখেছি যে কোন কোন প্রদেশে বনভূমি ছিল এখনকার চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত। বিহারের তথ্য থেকে দেখা যায়, পুরনো সাফাই-করা জায়গার জমি ফুরিয়ে গেলে লোকে সে জায়গা ছেড়ে চলে যেত ; আবার অন্যত্র নতুন করে জঙ্গল সাফ করা হতো। গত শতকের গোড়ার দিকে গোরখপুরে তো বটেই,[১৭] সম্ভবত গোটা তরাই জুড়ে এই

১৬. রয়্যাল কমিশন অন ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার, 'রিপোর্ট', পৃ. ৭৫।

১৭. পুরনো সীমানার গোরখপুর 'চাক্লা' (অর্থাৎ গোরখপুর প্রদেশ ছাড়াও বস্তী এবং গোণ্ডা-র বিরাট অংশ তার মধ্যে ধরে) সম্পর্কে মুফ্‌তী গুলাম হজরৎ বলেছেন, "প্রচুর বনভূমি থাকায়

ছিল অবস্থা। জঙ্গল সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পদ্ধতিও লুপ্ত হয়ে গেছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, এইসব এলাকায় প্রকৃত আবাদী জমির গড় উর্বরতা অন্য এলাকার চেয়ে নিশ্চয়ই আরও কমে গিয়েছিল।[৭৮] আবুল ফজল চম্পারণ 'সরকার' (বিহার)-এর জমির উর্বরতার কথা বলেছেন। চম্পারণকেই আমরা উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি। এখানে মাষ-কলাই ('উরদ')-এর জন্য চাষ করার বা কোন যত্ন নেওয়ার দরকার হতো না।[৭৯] শুধুমাত্র সিন্ধু প্রদেশের সমভূমিতে এবং কিছু পরিমাণে দোআবে অবস্থাটা আলাদা। সেখানে খাল থাকার ফলে উঁচু মানের জমি চাষ ও আরও ভালোভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু হিসেবে যদি মুঘল সাম্রাজ্যের পুরো এলাকা নেওয়া হয় আর চাষবাসের রীতি পাল্টায়নি বলে ধরা হয়, তবে বীজ-বোনা জমির প্রতি একরে এখনকার গড় উৎপাদন মুঘল আমলের সমান হতে পারে না।

এই অংশে প্রায়ই আলোচ্য পর্বের গ্রাম-পরিসংখ্যানগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। আধুনিক বিবরণীর সঙ্গে তুলনা করলে একটি বিচিত্র তথ্য নজরে পড়ে। তা হলো: এলাহাবাদ এবং অযোধ্যা থেকে লাহোর এবং মুলতান পর্যন্ত উত্তর ভারতের এই প্রদেশ-সন্নিবেশে গ্রামের সংখ্যা ছিল সাধারণভাবে গত শতকের শেষ দশকগুলির চেয়ে আধগুণ বেশি। অন্যদিকে, বাংলা, বিহার এবং উত্তর-সমভূমির দক্ষিণে, অর্থাৎ গুজরাট, মালব এবং দখিন প্রদেশগুলির ক্ষেত্রে, আধুনিক আদমশুমারীগুলিতে নথিভুক্ত সংখ্যার তুলনায় মুঘল বিবরণীর সংখ্যা হয় সামান্য কম, নয়তো খুবই কাছাকাছি। উত্তর ভারতীয় প্রদেশগুলিতে গ্রামের সংখ্যার এই আপেক্ষিক বৃদ্ধির কারণ খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। ১৮ শতকে সর্বমোট সংখ্যার দিক দিয়ে গ্রাম কমে গিয়েছিল। বহু গ্রাম জনহীন হয়ে যায়, আরও সুনিরাপত্তার জন্য ছোট গাঁ ছেড়ে লোকে চলে গিয়েছিল বড় গ্রামে।[৮০] অথবা, পরে যখন দুটি গ্রামের সীমানাসূচক সব অহল্যাভূমি আর চারণভূমি চষে ফেলা

এখনকার চলতি রীতি হলো তিন বছর অবধি 'বঞ্জর' (আগে বীজ-না-বোনা) জমিতে বীজ বোনা। এই জমি খুব উর্বর, অল্প চাষ দিলেই চলে। তিন বছরের পর জমিটি পূর্ণ উৎপাদন-মাত্রায় পৌছয় এবং ক্ষমতা কমতে শুরু করে। তখন লোকে সে-জমি ছেড়ে তার বদলে কোন নতুন 'বঞ্জর' জমি চাষ করে। গোরখপুর 'চাক্‌লা'র জমি আজমগড় 'চাক্‌লা'র মতো অত তাড়াতাড়ি শক্তি ফিরে পায় না, এর উৎপাদন কমতে শুরু করে (চাষ হওয়ার) তিন-চার বছরের মধ্যে" (I.O. 4540, পৃ. ১০ ক)।

৭৮. তুলনীয় মোরল্যাণ্ড, 'ইণ্ডিয়া…অফ আকবর', পৃ. ১১৭। গড় উৎপাদনের ওপর বন অপসারণের প্রভাব সম্বন্ধে এখানে যা বলা হয়েছে, মোরল্যাণ্ড-এর ব্যাখ্যা তার থেকে একেবারেই আলাদা।

৭৯. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৭। আবুল ফজল আরও বলেছেন যে অন্য জায়গায় সবচেয়ে ভালো জাতের জমি ('পোলাজ')-এর চেয়ে নিম্ন পার্বত্য ভূখণ্ডে 'বঞ্জর' জমি অনেক বেশি উর্বর; রাজস্ব কর্মচারীরা দুটিকেই সমমানের জমি বলে ধরতেন (পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ২৯৭)।

৮০. ক্রুক, 'দ্য নর্থ-ওয়েস্টার্ন প্রভিন্সেস্ অফ ইণ্ডিয়া', পৃ. ৪০, ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, প্রদেশের পশ্চিম অংশের গ্রামগুলি দেখলে "ছোটখাট দুর্গ" বলে মনে হয়। "শিখ ও মারাঠারা যখন এদেশ লুঠতরাজ করত" এসব গ্রাম "তখনকার আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ঐতিহ্যের ভগ্নাবশেষ"।

হলো, তখন নিজস্ব পরিচয় হারিয়ে অন্য গ্রামের সঙ্গে মিশে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়ে থাকতে পারে। এ হয়তো নিছকই অনুমান। তাহলেও আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক তথ্য এই যে, মুঘল আমলে চাষের বিস্তার শুধু যে এখনকার চেয়ে অনেক কম ছিল তা-ই নয়, আরও অনেক বেশি গ্রামও তার আওতায় ছিল। সুতরাং, গড় হিসেবে, এসব গ্রাম নিশ্চয়ই ছিল আজকের তুলনায় যথেষ্ট ছোট।

২. আবাদ ও সেচের উপকরণ

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কৃষির বিরাট কৃতিত্বের পাশে রাখলে, ভারতীয় কৃষকদের স্থূল উপকরণগুলির চেয়ে আরও আদিম কোন জিনিসের কথা কল্পনা করাই কঠিন মনে হতে পারে। কিন্তু তিনশ বছর আগের পৃথিবীতে এ নিয়ে কোন কথা উঠত না। ভারতীয় লাঙল ইউরোপীয়দের চোখে অচেনা ঠেকেনি যদিও এখানে তার সঙ্গে জোতা হতো ঘোড়া নয়, বলদ। টেরি একে ইংলণ্ডে প্রচলিত "পা-লাঙল" বলে বর্ণনা করেছেন।[১] ফ্রায়ার শুধু ভারতের উপকূলবর্তী এলাকাই দেখেছিলেন। তাঁর বর্ণনায় "কোম্বীরা ('কুম্বী') ......[যেভাবে] জমি চাষ করে আর ফসল ফলায়, অন্যান্য জাতির সঙ্গে তার কোন লক্ষণীয় পার্থক্য নেই।" এই লাঙলে তিনি একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যই দেখতে পেয়েছিলেন : "অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লাঙলের ফালে লোহা থাকে না, কারণ লোহা দুর্লভ ; কিন্তু সেখানে শক্ত কাঠ লাগানো থাকে, (যা দিয়ে) তাদের নরম মাটি চষা যায়।"[২] শুধু উপকূল অঞ্চলের ক্ষেত্রেই এ কথা সত্য হতে পারে। দেশের ভিতরে শুকনো আর শক্ত মাটির জন্য লোহার দাঁতাল ফাল ছিল অপরিহার্য। প্রাচীন কাল থেকেই এর ব্যবহার চালু ছিল।[৩] এ কথা ঠিক যে আলোচ্য পর্বে লোহা ছিল "দুর্লভ", কিন্তু ভারতে এর খনন ও উৎপাদন হতো ব্যাপকভাবে। আর গমের অঙ্কে লোহার দর ১৯১৪-র দরের তিনগুণের বেশি ছিল না।[৪] ভারতীয় লাঙলের

১. টেরি, 'আর্লি ট্রাভেলস্', ২৯৮। 'অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিক্শনারী' (৪র্থ খণ্ড : 'এফ', পৃ. ৪০৩ গ, ৪০৪ খ)-র সংজ্ঞা অনুযায়ী এর কোন চাকা ছিল না। মোরল্যাণ্ড ('ইণ্ডিয়া···অফ আকবর', পৃ. ১৬০ টীকা) বলেছেন যে, মাটি সরানোর জন্য বাঁকা অংশটুকুও ছিল না। এ কথা মনে রাখতে হবে যে মাটি উল্টোনোর বা গভীর করে খোঁড়ার লাঙল ভারতীয় জমিতে ঠিক খাপ খায় না (তুলনীয় : রয়্যাল কমিশন অন ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার, 'রিপোর্ট', পৃ. ১১০-১১২)।

২. ফ্রায়ার, ২য় খণ্ড, ১০৮।

৩. তাই 'মনুস্মৃতি', ১০ : ৮৪-তে কৃষিবৃত্তির নিন্দা করা হয়েছে, কারণ "অয়োমুখ কাষ্ঠ" (লোহার ফালওয়ালা কাঠের যন্ত্র) ভূমি ও ভূমিশয়দের (ভূমির প্রাণী) আহত করে ('দি ইনষ্টিটিউটস অফ মনু', বুহ্লার অনূদিত, পৃ. ৪২০-২১)।

৪. এই বক্তব্যের ভিত্তি মোরল্যাণ্ড, 'ইণ্ডিয়া···অফ আকবর', যেখানে তিনি শিল্পের অবস্থা (পৃ. ১৪৭-৯) ও লোহার দাম (পৃ. ১৫০-৫১) নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'আইন'-এ লোহার খুঁটির যে দাম দেওয়া আছে, তিনি তার উল্লেখ করেছেন : সের প্রতি তিন 'দাম' ('আইন',

ফালে ব্যবহারের জন্য অতি সামান্যই লোহা লাগত। তার পক্ষে এই দাম এমন কিছু চড়া হতো না।[৫]

তাছাড়া এও দেখানো হয়েছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতীয় কৃষি পদ্ধতি, সে সময়ের মাপকাঠিতে, আদৌ আদিম স্তরের ছিল না।[৬] বীজ বুয়ে চাষ ও খুরপি-চাষ ভারতের পুরনো আর পরিচিত রীতি।[৭] উর্বরতা বাড়ানোর জন্য সাধারণভাবে হাড় ব্যবহার করা হতো না। তবে সার হিসেবে মাছের বিশেষ উপযোগিতার কথা বোধহয় জানা ছিল। বলা হয়েছে, গুজরাটে আখের চাষ করতে সার হিসেবে মাছ ব্যবহার করা হতো।[৮]

ভারতীয় কৃষির যে অসাধারণ দিকটি সমসাময়িক পর্যবেক্ষকদের মনে ছাপ ফেলেছিল, তা হলো বছরে দুবার—এবং কোন কোন এলাকায় তিনবার—ফসল তোলা।[৯] সুতরাং পর্যায়ক্রমিক শস্য উৎপাদন কার্যত ছিল প্রকৃতিরই দান; আর কোন্ বিশেষ ধরনের মাটিতে কোন্ বিন্যাস সবচেয়ে উপযোগী হবে—সে তো অভিজ্ঞতার ব্যাপার।[১০] এই রীতি সম্বন্ধে সে আমল থেকে সুস্পষ্ট কোন কথা পাওয়া যায়নি, কারণ একে বোধহয় জীবনের অতি সহজ ও সাধারণ ব্যাপার বলেই মনে করা হতো,

১ম খণ্ড, ১৪৩)। ১৬১৩-য় সুরাটে বিলিতি লোহার দাম ছিল আরও কম, স্থানীয় মণপ্রতি ৩½ থেকে ৪ 'মাহ্মুদী' অথবা 'সের-এ আকবরী'-প্রতি ২$\frac{১}{৩}$ বা ২$\frac{২}{৩}$ 'দাম' ('লেটার্স রিসিভ্ড্', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৫, ২৩৮, ২৯৯)।

৫. বিভিন্ন অঞ্চলের লাঙলে কত রকমের লোহার দাঁত-লাগানো ফাল ব্যবহার করা হয়, তার বর্ণনা পাওয়া যাবে এন. জি. মুখার্জী, 'হ্যাণ্ডবুক অফ ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার', কলকাতা, ১৯১৫, পৃ. ৯২-৩ এ।

৬. এলিয়ট, 'মেমোয়ার্স' ইত্যাদি, ২য় ভাগ, পৃ. ৩৪১-২।

৭. তুলনীয়: এলিয়ট, পূর্বোক্ত সূত্র। ভোয়েলকর, 'রিপোর্ট', ২২৩-এ লক্ষ্য করেছিলেন যে, বীজ পোঁতার দেশীয় উপকরণ "চমৎকার কাজ করে, এর কাছ থেকে আর বিশেষ কিছু চাওয়ার নেই।" ১৭ শতকের গোড়ার দিকে, সম্ভবত আমানুল্লাহ্ হুসৈনীর লেখা কৃষি-বিষয়ক একটি রচনায়, তুলো চাষের ক্ষেত্রে খুরপির ব্যবহার লক্ষ্য করা হয়েছে: "কোন কোন জায়গায় তারা মাটিতে ছুঁচলো খুঁটি ('মেক') পুঁতে দেয়, বীজ রাখে গর্তের মধ্যে, তারপর মাটি চাপা দিয়ে দেয়—এইভাবে ফলন আরও ভালো হয়" (I.O. 4702, পৃ. ৩০ খ)।

৮. তেভেনো, ৩৬-৭।

৯. 'আইন', ২য় খণ্ড, পৃ. ৫ ও ৬ (হিন্দুস্তান প্রসঙ্গে), ১ম খণ্ড, ৩৮৯ (বাংলা), ৫১৩ (দিল্লী প্রদেশ); জে. জেভিয়ার, হস্টেন অনু. *JASB*, N. S., খণ্ড ২৩, ১২১ (আগ্রা অঞ্চল); পেলসার্ট, ৪৮ (আগ্রা অঞ্চল); বাউরি, ১২১ (ওড়িশা উপকূল); সুজান রায়, ১১ (হিন্দুস্তান)।

১০. পর্যায়ক্রমিক শস্য উৎপাদন বিষয়ে ভারতীয় কৃষকের জ্ঞান সম্পর্কে প্রশংসা আছে ভোয়েলকর, 'রিপোর্ট', ১১, ২৩৩-৬, এলিয়ট, 'মেমোয়ার্স' ইত্যাদি, ২য় ভাগ, ৩৪২-এ।

যার কোন ব্যাখ্যানের দরকার পড়ে না। কোন কোন বিশেষ জাতের শস্য যে জমির উর্বরতা বা মান বাড়াতে সাহায্য করে তারও স্পষ্ট উল্লেখ আছে।[১১]

ক্ষেত সম্বন্ধে বলা যায় যে সাধারণভাবে সেগুলি দেখতে ছিল আজকের মতোই। জমিতে কোন বেড়া দেওয়া হতো না। কোন ইউরোপীয় পর্যটকের মনে পড়ত না তাঁর মহাদেশের ক্রমবর্ধমান "বেষ্টন"-রীতির কথা।[১২] শুধু গুজরাটে জমি বাঁচানোর জন্য সাধারণত কাঁটাঝোপের বেড়া দেওয়া হতো। আমাদের তথ্যসূত্রগুলিতে একে স্থানীয় বিশেষত্ব হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে।[১৩]

ভারতীয় কৃষির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো মৌসুমী বৃষ্টির স্বাভাবিক দানকে কৃত্রিম সেচব্যবস্থা দিয়ে পরিপূরণ করা। এই উদ্দেশ্যে প্রধান ব্যবস্থা নেওয়া হতো কুয়ো, পুকুর ও খাল কেটে।

উচ্চ-গাঙ্গেয় সমভূমি ও দখিনের কিছু কিছু অংশে নিশ্চয় কুয়োই ছিল সেচের প্রধান উৎস। কুয়ো থেকে জল তোলার যত রকমের পদ্ধতি এখন চালু আছে, তার প্রায় সবই—অবশ্যই নলকূপ বাদে—আমাদের তথ্যসূত্রগুলিতে বর্ণনা করা আছে। ঝিলমের পূর্বদিকে, লাহোর, দীপালপুর এবং সিরহিন্দ্ প্রদেশে ছিল একাধিক 'অরহট' বা 'রহট'। ইংরেজরা একে বলত "পারসী চাকা"। বাবুরের কাছেও এটি অভিনব বলে মনে হয়েছিল।[১৪] আগ্রার চারধারে এবং আরও পূর্বদিকে, জোতা বলদ দিয়ে 'চরস' বা চামড়ার থলি করে জল টেনে তোলার চল ছিল।[১৫] ফ্রায়ার-এর ভারত-বিবরণে 'লিভার'-রীতিতে গড়া 'ঢেঙ্কলী'র বর্ণনা আছে। সাধারণত জলের তল পাড়ের কাছাকাছি থাকলে এটি ব্যবহার করা হয়।[১৬] অন্তত কোথাও কোথাও কিছু

১১. আমানুল্লাহ্ হুসৈনী তাই মনে করতেন, 'বাকিলা' বিন ('ফাবা সাতিভা') ও মিশরীয় বিন ('বাকিলা-এ মিশরী' বা 'তারমাস')-এর উর্বরতাবৃদ্ধির ক্ষমতা আছে (I. O. 4702, পৃ. ২ ক-খ, ৩০ ক), আর মঞ্জিষ্ঠা ('রুনাস') ক্ষার মাটির মান বাড়ায় (পৃ. ৩১ ক)।

১২. "তাদের জমিতে বেড়া দেওয়া হয় না, যদি-না তা শহর ও গ্রামের কাছাকাছি হয়" (টেরি, 'আর্লি ট্রাভেলস্', পৃ. ২৯৮)।

১৩. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৫ ; 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', পৃ. ২০৫ ; ফ্রায়ার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৮ ; 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪।

১৪. 'বাবুর-নামা', এস. এ. বেভারিজ, অনু. ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৮ ; ২য় খণ্ড, ৪৮৬। পরবর্তী অংশে তিনি "এবং সিরহিন্দ্" শব্দদুটি তাঁর অনুবাদ থেকে বাদ দিয়েছেন, যদিও তাঁরই সম্পাদিত তুর্কী 'হায়দরাবাদ পাণ্ডুলিপি', পৃ. ২৭৩ খ ও আব্দুর রহিম খান খানান-এর ফার্সী অনুবাদ, Or. 3714, পৃ. ৩৭৬ খ-য় শব্দদুটি আছে। 'রহট'-এর বিষয়ে বাবুর যে ভৌগোলিক সীমার কথা বলেছিলেন তা এখনকার সীমানার খুব কাছাকাছি (তুলনীয় এলিয়ট, 'মেমোয়ার্স…', ২য় ভাগ, পৃ. ২২০)। সুজান রায়, ৭৯-তে পাঞ্জাবের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হিসাবে 'রহট'-এর বর্ণনা পাওয়া যায়।

১৫. 'বাবুর-নামা', বেভারিজ, অনু. ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৭ : "শ্রমসাধ্য ও কদর্য উপায়", বলেছেন রোজনামচাকার বাদশাহ্।

১৬. ফ্রায়ার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪।

পেশাদার যাযাবর কুয়ো-খুঁড়িয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৭] বিশেষত থর মরুভূমির মতো জায়গায় বেলেমাটি গভীর করে খোঁড়া খুবই খাটুনির কাজ ছিল বলা হয়েছে।[১৮]

'আইন'-এ আবুল ফজল বিভিন্ন প্রদেশের যে বিবরণ দিয়েছেন সেটি পড়ে পরিষ্কার বোঝা যায়, ফসল প্রধানত বৃষ্টি আর অংশতমাত্র কুয়োর জলের উপর নির্ভর করত।[১৯] তাই এখানে সেচের ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু বলা তাঁর বিবেচনায় অবান্তর মনে হয়েছিল। অঞ্চলবিশেষে এই ধরনের সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর নীরবতায় তাই আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।[২০] বরঞ্চ তাঁর এই কথাই কৌতূহলজনক যে লাহোর প্রদেশের "বেশির ভাগ" অঞ্চলে "চাষবাস হতো কুয়ো-সেচের সাহায্যে"।[২১] পরবর্তীকালে একজন ঐতিহাসিক (তিনি ছিলেন এই প্রদেশেরই লোক) একই কথার পুনরুল্লেখ করেছেন।[২২] তাহলে বুঝতে হবে, উচ্চ পাঞ্জাবের উত্তরাংশে কুয়ো ছিল এখনকার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি। সুতরাং, এও সম্ভব যে বহু ভূখণ্ডে, বিশেষত মধ্য গঙ্গা-যমুনা দোআবে প্রাকৃতিক নিকাশী ব্যবস্থার মধ্যে খালের অনুপ্রবেশ ঘটায় কুয়োর সংখ্যা খুব কমে গেছে।[২৩]

১৭. আগ্রা 'সরকার'-এর অন্তর্ভুক্ত বসাওয়ার-এর কাছে একটি ঘটনার বিবরণ প্রসঙ্গে বদাউনী যা লিখেছেন (২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৩) তার থেকে এ-ই মনে হয়।

১৮. তুলনীয় ফৈজী সিরহিন্দী, পৃ. ৫৮ খ-৫৯ খ।

১৯. সুজান রায়, পৃ. ১১, 'হিন্দুস্তান' সম্পর্কে যেমন বলেছেন, "যদিও এর কোন কোন অংশে চাষবাস নির্ভর করে কুয়োর জলের ওপর, আর কতক জায়গায় জমি সেচ হয় বন্যার জলে, তবুও অধিকাংশ জমিই 'ললমী', যা 'বারানী'রই (অর্থাৎ বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভরশীল) সমার্থক।" (সম্পাদক 'ললমী'র জায়গায় ভুল করে 'ইলাহী' পড়েছেন, কিন্তু পুঁথি ক: ১১ খ-১২ ক এবং খ: ১১ ক-খ দ্রষ্টব্য)। তুলনীয় 'বাবুরনামা', বেভারিজ, অনু. ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৮। কুয়ো-সেচ ব্যাপারটিকে আবুল ফজল কতটা অগ্রাহ্য করেছেন তার উদাহরণ হলো দিল্লী প্রদেশ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য। তিনি শুধু বলেছেন, "অনেকটা জমিই সেচ হয় বন্যার জলে ('সেলাবী')" ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১১)। অন্যদিকে, একই প্রদেশ সম্বন্ধে সুজান রায়, ৩৯, বলেছেন, সেখানে চাষ "নির্ভর করে বৃষ্টি ও বন্যার ওপর এবং কোন কোন জায়গায় কুয়োর ওপর।"

২০. অযোধ্যার ('ঔধ') বিষয়ে মন্তব্যের জন্য তুলনীয় মোরল্যাণ্ড, 'ইণ্ডিয়া...অফ আকবর', পৃ. ১২১।

২১. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৮।

২২. সুজান রায়, ৭৯ (আরও দ্রষ্টব্য: পাণ্ডুলিপি. খ: পৃ. ৭২ ক, গ: ৪৪ ক)। তিনি আরও বলেছেন যে, খারিফ শস্য (লিথোগ্রাফ সংস্করণে আছে "খারিফ এবং রবি", কিন্তু কোন পাণ্ডুলিপির পাঠে এর সমর্থন নেই) নির্ভর করে মূলত বৃষ্টির ওপর। আরও তুলনীয়: মানুচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৬। তিনি লাহোরের চারদিকে "কুয়োর ছড়াছড়ি" লক্ষ্য করেছিলেন।

২৩. কুয়োর ওপর খালের প্রভাব পড়েছিল দুভাবে। প্রথমত, বহু ভূখণ্ডে অন্তর্ভূমির জল খালের দখলেই চলে যেত বা জল সরবরাহে ছেদ পড়ত। ফলে ভূগর্ভস্থ জল-তল যেত নেমে। এই জাতীয় বেশ কয়েকটি ঘটনার কথা মোরল্যাণ্ড লক্ষ্য করেছেন ('এগ্রিকালচারাল কনডিশনস্

মধ্যভারত ও দাখিনের পুরাতাত্ত্বিক অবশেষগুলি প্রমাণ করে সেচের পুকুরগুলি ছিল খুবই প্রাচীন।[২৪] তাভার্নিয়ে গোলকুণ্ডাকে পুকুরে "ভর্তি" বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, সেগুলি তৈরি হতো "কখনও কখনও আধ 'লীগ' অবধি লম্বা" বাঁধ দিয়ে। আর এইভাবে প্রাকৃতিক নিম্নভূমিতে জল ধরে রেখে বর্ষার পরে ক্ষেতের কাজে লাগানো যেত।[২৫] বিদর প্রদেশে ছিল কামথানা নামে এক বিরাট পুকুর। উত্তরদিকে বাঁধ দিয়ে তৈরি এই পুকুরটি ছিল "যথার্থই" এক "টাইগ্রিস"। চারপাশের এলাকার চাষীরা এর ফলে বৃষ্টির ওপর সবরকমের নির্ভরতা থেকে মুক্তি পেয়েছিল।[২৬] শাহ্‌জাহানের রাজত্বের শেষদিকে দেখা যায়, মুঘল প্রশাসন, বাঁধ তৈরির জন্য, বেরারের খান্দেশ ও পাইনঘাট এলাকার চাষীদের 40 থেকে 50,000 টাকা আগাম দেওয়ার প্রস্তাব দিচ্ছে।[২৭] উত্তর ভারতে মেবারে উদয়সাগরের ১৬ 'কুরোহ্' পরিধির বিখ্যাত জলাধারটি আমাদের আলোচ্য পর্বেই হয়েছিল। এটি আশেপাশের এলাকায় গম চাষে সাহায্য করত বলা হয়েছে।[২৮]

যেসব জায়গায় নদী বেড়ে উঠে প্রতি বছর মরসুমের সময় জমি ভাসিয়ে দেয়, সেখানে সেচ আর সার (যদি এক পরত অন্তর্ভূমি পড়ে থাকে) দুই-ই হয় পুরোপুরি

অফ দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস অ্যাণ্ড ডিস্‌ট্রিক্টস্‌': আলীগড়ের বিষয়ে টীকা (পৃ. ২), মথুরা (পৃ. ২), আগ্রা (পৃ. ১) এবং মৈনপুরী (পৃ. ২)। দ্বিতীয়ত, বহু ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বেলে জমিতে, খালের দরুন অন্তর্ভূমি সিক্ত থাকায় "কুয়োর পাড় ধসে যেত, ঠেকা না দিয়ে কোন জায়গা গভীরভাবে খোঁড়া সম্ভব হতো না" ('মৈনপুরী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার', এলাহাবাদ, ১৯১০, পৃ. ৫৩। তুলনীয় ভোয়েলকর, 'রিপোর্ট', ৬৯)।

ধরে নেওয়া যায় যে, আজকের মতো, মুঘল আমলেও এই অঞ্চলের বেশির ভাগ কৃষকের সাধ্যে শুধু 'কাঁচা' (অর্থাৎ ইঁটের ব্যবহার ছাড়া) কুয়োই কুলোত। তাই পেলসার্ট, ৪৮, আগ্রার চারপাশে ফি-বছর রবি-মরসুমে কুয়ো খোঁড়ার কথা বলেছেন, কেননা কাঁচা কুয়ো বর্ষা পেরিয়ে বড় একটা টিঁকত না।

২৪. ইতিহাসের দিক থেকে সবচেয়ে আকর্ষণীয় দুটি দৃষ্টান্ত হলো সুদর্শন হ্রদ (গির্নার, কাথিয়াবাড়) আর ১১ শতকে ভোজপুরে (মালব) রাজা ভোজের তৈরি বিরাট জলাধার। প্রথমটি কাটিয়েছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য; অশোকের আমলে 'সেচের আরও সুব্যবস্থার জন্য' এর সঙ্গে জল-নিকাশী নালা যোগ করা হয় (এন. শাস্ত্রী, সম্পা. 'কম্প্রিহেনসিভ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', ২য় খণ্ড, ২৮১-২ এবং কোসম্বী, 'ইন্ট্রোডাকশন টু দা স্টাডি অফ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি', ২৮০-২৮১)।

২৫. তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২১-২।

২৬. 'মআসির-এ আলমগীরী', পৃ. ৩০৮-৯।

২৭. 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ৫৩ ক; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', পৃ. ১৩৪।

২৮. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৯। ১৬ 'কুরোহ্' প্রায় ৪০ মাইল হবে। তুলনীয় টড, 'অ্যানালস্‌ অ্যাণ্ড অ্যান্টিকুইটিস অফ রাজস্থান', লণ্ডন, ১৯১৪, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১৯। তিনি বলেছেন বাঁধটির "আয়তন ও ক্ষমতা" ছিল "বিশাল", "বারো মাইল পরিধি-প্রমাণ জল আটকে রাখার পক্ষে যেমন হওয়া প্রয়োজন।"

প্রাকৃতিক। কিন্তু এও হতে পারে যে খাল বা রেলপথের প্রয়োজনে, অথবা বন্যা আটকানোর জন্য নদীদের 'বশে' আনতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে উর্বর-হওয়া জমির পরিমাণ তাই আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। অযোধ্যায় সরু (সরযূ) এবং ঘাগরা নদীর জলে এই উপায়ে সেচ-হওয়া জমি[২৯] এবং সম্ভল 'সরকার'-এর (উচ্চ রোহিলখণ্ড) বন্যাধীন জমির[৩০] কথাও আবুল ফজল বিশেষ করে লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু এখনকার চেয়ে একেবারে বিপরীত অবস্থা দেখা যায় সিন্ধু ও তার শাখানদীদের প্লাবিত এলাকায়। শুকনো, তৃষ্ণার্ত সমভূমি দিয়ে বয়ে যাওয়া এই নদীগুলির মরসুমী প্লাবন নিয়ন্ত্রণ করার কোন ব্যবস্থা ছিল না বললেই হয়। আলোচ্য পর্ব জুড়ে নদীগুলির গতিপথ বারেবারেই দর্শনীয়ভাবে পাল্টেছিল। এর থেকে তাদের পরিসর যতটা স্পষ্ট করে বোঝা যায়, আর কোনভাবে ততটা বোঝা যায় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'আইন'-এর সময় বিপাশা ও শতদ্রু নদী তাদের বর্তমান সঙ্গমে, বা তারই কাছে, মিলিত হয়ে ফিরোজপুরের নীচে দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। উপরের খাতটিকে 'বিপাশা'ই বলা হতো; আর 'শতদ্রু' বলে তলার খাতটি ছিল কার্যত এখনকার শতদ্রু নদীরই খাত। নিজেদের মধ্যে তিরিশ মাইলের মতো দূরত্ব রেখে প্রায় দুশ মাইল বয়ে যাওয়ার পর, এই দুটি ধারা সম্ভবত মিলিত হয়েছিল চন্দ্রভাগা ও শতদ্রুর বর্তমান সঙ্গমে।[৩১] আওরঙ্গজেবের আমলে

২৯. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৩; আরও দ্রষ্টব্য পৃ. ৩০৩। এও উল্লেখ করা যায় যে, 'আইন'-এর সময়ে সরযূ নদী বাহ্‌রাইচ পার হয়ে অযোধ্যা শহর থেকে মাত্র এক 'কুরোহ্‌' ওপরে ঘাগরার সঙ্গে গিয়ে মিশত (পূর্বোক্ত সূত্র, ৪৩৩, ৪৩৫)। এখন খেরি জেলার দক্ষিণপূর্ব কোণে দুটি নদীর মিলন হয়। এখনকার তুলনায় সমভূমিতে সরযূ নদীর গতিপথ ছিল আরও অনেকটা দূর অবধি। পুরনো নদীখাতটি এখনও মানচিত্রে দেখানো থাকে। জ্যারেট-এর অনুবাদ (২য় খণ্ড, সম্পা. যদুনাথ সরকার, পৃ. ১৮২) খুবই বিপথে নিয়ে যায়, কারণ সাই-কে তিনি সরু বা সরযুর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন।

৩০. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৩। সাধারণভাবে দিল্লীপ্রদেশের জন্য দ্রষ্টব্য, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১৩।

৩১. 'আইন', ১ম খণ্ড, ৫৪৯। এই নদীবিভাগ ও দুটি শাখার গতিপথ প্রমাণিত হয় 'আইন' থেকে। সেখানে দীপালপুর, পকপত্তন, কহ্‌রোর, দুনিয়াপুর এইসব শহরকে দেখানো হয়েছে বেথ-জলন্ধর দোআবে (মুলতান প্রদেশ)। (তুলনীয় আই. আর. খান, 'মুস্লিম ইউনিভার্সিটি জার্নাল', ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৩৪-৩৬)। জরিপের মানচিত্রে দেখা যায় বিপাশার দুটি পুরনো খাত (মানচিত্রেও তাই বলা হয়েছে) পরস্পরের খুব কাছাকাছি। মুনীস রাজার সঙ্গে একযোগে আমি মুলতান প্রদেশের বেথ-জলন্ধর দোআবের অধীনে তালিকাভুক্ত পরগনাগুলি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছিলাম। তাতে দেখা গেল, 'আইন'-এর সময়ে বোধ হয় বিপাশা বইত উত্তরের গতিধারায়। আবুল ফজল দুটি ধারার মধ্যবর্তী এলাকার জন্য 'বেথ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ধারাদুটি যে বিপাশা ও শতদ্রু নামে পরিচিত ছিল তা এর থেকেই আন্দাজ করা যায়। শুধু তাই নয়, ব্যাপারটি প্রতিষ্ঠিত হয় সফ্‌শিকন খানের বর্ণনা থেকে। মুলতানের কাছে দারা শুকো-কে তাড়া করার সময় কুচকাওয়াজ করে তিনি প্রথমে পেরোলেন 'বিপাশা', তারপর দু-দফা থেমে শতদ্রু ('আলমগীরনামা', ২১১-২)।

কোন এক সময় বিপাশা তার পুরনো খাত ছেড়ে যায়। দুভাগে ভাগ হয়ে এরা আজও বয়ে চলেছে। কিন্তু এই ভাগ হয়েছে আগের জায়গার অনেক নীচে। আর শাখাদুটি খুব অল্প পথই ভিন্ন ধারায় বইত।[৩২] এই খাত বদলের ফলে বিপাশার জলে সেচ-হওয়া আগের বিরাট এলাকাটি নিশ্চয়ই বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। একইভাবে চেনাব এবং ঝিলমের সঙ্গমস্থল ১৭ শতকের মধ্যেই ২৫ মাইলের বেশি ওপরে উঠে গেছে।[৩৩] পঞ্চনদ ছিলই না, আর চন্দ্রভাগা ও বিপাশা-শতদ্রু পৃথকভাবে উছ-এর কাছে এসে আলাদা আলাদাভাবে সিন্ধুনদের সঙ্গে মিশেছিল।[৩৪] সিন্ধুর গতিপথ ক্রমাগতই পাল্টাত। তাই এর তীরবর্তী গ্রামের কুঁড়েঘর তৈরি হতো কাঠ আর খড় দিয়ে।[৩৫]

৩২. আগের টীকায় 'আলমগীরনামা'র উল্লিখিত অংশ থেকে যেমন দেখা যায়, ১৬৫৯-এও বিপাশার পুরনো খাত পরিত্যক্ত হয়নি। কিন্তু ১৬৯৫-এ লিখতে বসে সুজান রায় নদীবিভাগের স্থান-নির্দেশ করেছেন দীপালপুরের অনেক নীচে। তিনি বলেছেন, বিপাশা নামে পরিচিত উত্তরের ধারাটি শতদ্রুর সঙ্গে মিলেছে "মাত্র কয়েক 'করসখ' (কুরোহ্) বয়ে যাওয়ার পর"। (সুজান রায়, ৭৬; 'মুস্লিম ইউনিভার্সিটি জার্নাল', ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৩৮, ৪০)।

'চাহার গুলশন'-এ (Bodl. পৃ. ১০৮ ক) মুলতান-ভাক্কর ভ্রমণপথের বর্ণনায় দেখা যায়, পথটি গিয়েছিল বিপাশা ও তারই একটি শাখানদী পেরিয়ে। এই শাখাটি উত্তর তীরে শুজাতপুর থেকে শতদ্রুর বর্তমান খাতে বইত বলে মনে হয়। অবশ্য এর থেকে এমন বোঝায় না যে, ১৮ শতকের মাঝামাঝি আবার 'আইন'-এর সময়কার অবস্থাই ফিরে এসেছিল। বরং এমন হতে পারে: 'চাহার গুলশন'-এ ১৭ শতকে তৈরি কোন ভ্রমণপথ নকল করা হয়েছে।

সম্ভবত, বন্যার মরসুমে বিপাশার পরিত্যক্ত খাতগুলি সক্রিয় হয়ে উঠত। এর থেকে মনে হয়, সুজান রায় (পৃ. ৬৩) ঠিকই বলেছিলেন যে, বর্ষায় নদীটি কয়েক 'করসখ' চওড়া হয়ে যেত এবং দীপালপুর 'সরকার'-এ বিরাট লখী জঙ্গল এর থেকেই তৈরি হয়েছিল। বিপাশা-শতদ্রু নদী থেকে বেরোনো অসংখ্য নালার জন্য দ্রষ্টব্য ফ্র্যাঙ্কলিন-এর 'হিস্ট্রি অফ দা রেন অফ শাহ্-আলম', লণ্ডন, ১৭৯৮-এর নামপত্র-সংলগ্ন পৃষ্ঠায় মুদ্রিত রেনেল-এর মানচিত্র।

৩৩. 'আইন'-এর সময়ে সঙ্গমস্থল ছিল শোরকোটের নীচে। শোরকোট তখন ছিল চনহট দোআবে ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৭, ৫৪৯)। সুজান রায়, ৭৮, অবশ্য এটিকে বসিয়েছেন ঝঙ্গ-এ সিয়ালনে, অর্থাৎ এর বর্তমান অবস্থানে বা তারই কাছাকাছি।

৩৪. 'আইন', ১ম খণ্ড, ৫৪৯ থেকে তা-ই মনে হয়। সুজান রায়, ৭৬, এবং রেনেলের মানচিত্র, পূর্বোক্ত সূত্র। পঞ্চনদ এখন সিন্ধুতে মেশে মিঠানকোটের কাছে।

৩৫. 'আইন', ১ম খণ্ড, ৫৫৮। ল্যামব্রিক, "আর্লি ক্যানাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন সিন্ধ", 'জার্নাল অফ সিন্ধ হিস্টরিক্যাল সোসাইটি', ৩য় খণ্ড (১৯৩৭), ১ম ভাগ, পৃ. ১৫ ও ১৬, প্রবন্ধে জোর দিয়ে বলেছেন যে "নদী বাঁচানোর জন্য প্রায় টানা একসারি বাঁধ দেওয়ার পর থেকে প্রতি বছর বন্যায় ভেসে যাওয়া জমির এলাকা অনেকখানি কমে গেছে।" তাঁর মতে, "প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ১৮ শতক অবধি সিন্ধুপ্রদেশে চাষ--আবাদের বেশির ভাগটাই ছিল 'বোসি', অর্থাৎ সিন্ধুর মরসুমী বৃদ্ধির ফলে স্বাভাবিকভাবে ভেসে যাওয়া জমির জল নেমে গেলে যে রবিশস্য হতো।"

নরম পলি-পড়া মাটিতে নদীর গতিপথের এই অস্থিরতার ফলে গোটা সমভূমি জুড়ে ছড়িয়ে ছিল অসংখ্য পরিত্যক্ত খাত। বন্যার সময়ে উৎস-নদী থেকে জল এসে ঢুকলে এদের অনেকগুলিই সক্রিয় হয়ে ওঠে। আধুনিক বাঁধ এসে অনেক পুরনো খাতের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু এখনও যেসব খাতের দাগ রয়েছে, তার থেকে এই ধারণাই প্রমাণ হয় যে মুঘল যুগে এই ধরনের প্রাকৃতিক খালের সংখ্যা ছিল প্রচুর।[৩৬] সাধারণত একেবারেই কৃত্রিম খাল থেকে এগুলির তফাৎ করা যায় এদের আঁকাবাঁকা খাত দিয়ে। কিন্তু লোকে এতবার এসব খাত আরও গভীর করে কাটার বা জমে-যাওয়া পলি পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছে যে অন্তত কোন কোন ক্ষেত্রে এদের আলাদা করা শক্ত হবে।[৩৭] এরপর, আমাদের আলোচ্য পর্বে যেসব খাল সক্রিয় ছিল বা নতুন করে কাটা হয়েছিল—এই দু ধরনের সম্পর্কেই তথ্য পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

জল ধরে রাখার মতো, নদী ও জলস্রোত থেকে খাল কাটার রীতিও দখিনে অনেকদিন ধরেই চালু ছিল। যেমন, বলা হয়েছে যে, বগলানায় "চাষের সুবিধার জন্য প্রতিটি শহর ও গ্রামে নদী থেকে হাজার হাজার খাল কাটা হয়েছিল।"[৩৮] সম্ভবত, এগুলির দেখাশুনা করা হতো 'ফদ' নামে সমবায় পদ্ধতিতে। ঐ এলাকায় এখনও এটি চালু আছে।[৩৯]

যথার্থই বড় খাল কাটা হয়েছিল উত্তর ভারতে। কিংবদন্তী অনুযায়ী পূর্ব যমুনা খালের পুরনো খাতটি শাহ্‌জাহানের আমলে কাটা হয়েছিল। কিন্তু আসলে এটি ১৮ শতকের গোড়ার দিকের বলেই মনে হয়।[৪০] যমুনার অন্য পারে ছিল ফিরুজ শাহের বিখ্যাত খাল।[৪১] আকবরের আমলে এটির সংস্কার করা হয়েছিল।

৩৬. তুলনীয় ল্যামব্রিক, পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ১৬।

৩৭. পশ্চিম যমুনা খালকে হাঁসি ও হিসার অবধি টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফিরুজ শাহ্‌ পুরনো নদীখাতগুলিই ব্যবহার করেছিলেন—এই ঘটনাই তার একটি দৃষ্টান্ত। (নীচে দ্রষ্টব্য)

৩৮. সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ৬০ খ-৬১ ক ; Or. 1671, পৃ. ৩৪ ক।

৩৯. রয়্যাল কমিশন অন ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার, 'রিপোর্ট', পৃ. ৩২৫।

৪০. তুলনীয় 'সাহারানপুর ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার', ১৯০৯, পৃ. ৫৮-৬০। এর লেখক মনে করেন যে, খাল-কাটার কাজ সম্ভবত মুহম্মদ শাহের আমলেই হয়ে গিয়েছিল। নির্দ্বিধায় বলা যায় শাহ্‌জাহানের আমলের কোন ইতিহাসে এর কোন উল্লেখ নেই। এমনও কিংবদন্তী আছে যে আলী মর্দান খান নাকি এই খাল কাটিয়েছিলেন। ঐ অভিজাত ব্যক্তিটিই 'নহর-এ বিহিশ্‌ৎ' কাটিয়েছিলেন, এমন ধারণার মতো এটিও ভিত্তিহীন।

৪১. মনে হয় ফিরুজ শাহের খাল যমুনা থেকে বেরিয়েছিল আম্বালা জেলার তাজেওয়ালার কাছে, আর ইন্দ্রি অবধি বয়ে গিয়েছিল যমুনার এক পুরনো বাহির খাত ধরে ('কর্নাল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার', ১৯১৮, 'এ' খণ্ড, পৃ. ৩ ও ৪)। সফেদন ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে এটি ধরেছিল চুতাং নদীর একটি পুরনো নালা, যেটি একে বয়ে নিয়ে যেত হাঁসি হিসার ছাড়িয়ে আরও দূরে (*JASB*, ১৮৯২, পৃ. ৪২০ দ্রষ্টব্য ; 'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার', ১৯০৮, ১০ম খণ্ড, ১৮৬)। নালাটি ফিরুজ শাহ্‌-ই প্রথম কাটাননি, যদিও কখনও কখনও এমন মনে করা হয়। এর মধ্য দিয়েই চুতাং নদী হাঁসি ছাড়িয়ে বয়ে চলেছিল কয়েক শতক আগে থেকে। ১৩ শতকে 'চাচনামা'র একটি ফার্সী বয়ানে (বইটি আদতে ৮ম শতকে লেখা) "হাসি (হাঁসি) নদী"র সুনির্দিষ্ট উল্লেখ আছে ('চাচনামা', অধ্যাপক দাউদপোতা সম্পাদিত, পৃ. ৫১)।

প্রথমে করেছিলেন শিহাবউদ্দীন খান, পরে নুরুদ্দীন মুহম্মদ তরখান।[৪২] মনে হয়, 'আইন'-এর সময়ে এই খালের জল হাঁসি পেরিয়ে শেষ হতো একেবারে ভদ্রায়।[৪৩] এটি আবার বুজে গেলে শাহ্‌জাহান সিদ্ধান্ত নেন যে এর উৎসমুখ খিজরাবাদ (পাহাড়ের প্রায় গায়ে) থেকে সফেদনের ঢাল পর্যন্ত আবার নতুন করে খোলা হবে; আর দিল্লীর নতুন শহর শাহ্‌জাহানাবাদের প্রয়োজন মেটাতে এর থেকে প্রায় তিরিশ 'কুরোহ্‌' (অর্থাৎ ৭৮ মাইলের কাছাকাছি) লম্বা একটি নতুন নালা কাটা হবে।[৪৪] এই ছিল সেই বিখ্যাত 'নহর-এ বিহিস্ত' বা 'নহর-এ ফৈজ'।[৪৫] একে ঐ সময়ের বড় কৃতিত্ব বলে মানতেই হয়। এর আধুনিক উত্তরাধিকারী, পশ্চিম যমুনা খালের সঙ্গে যদিও কোন তুলনাই চলে না, তবু অনেকখানি এলাকাই নিশ্চয় এর জলে সেচ হতো।[৪৬]

৪২. ওয়ারিস, ক: পৃ. ৪০১ ক; খ: পৃ. ১৬ খ (সালিহ্‌, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯) বলেছেন যে, আকবরের আমল নাগাদ খালটি পলি পড়ে বুঁজে গিয়েছিল; শিহাবউদ্দীন খান যখন দিল্লীর শাসনকর্তা (অর্থাৎ আকবরের আমলের প্রথম দিকে) তখন তাঁর জাগীরে "চাষ বাড়ানোর জন্য" তিনি খালটির সংস্কার করিয়েছিলেন এবং নতুন নাম দিয়েছিলেন 'শিহাব নহর'। সম্ভবত নুরুদ্দীন মুহম্মদ তরখান এই খালটির শুধু সংস্কারই করিয়েছিলেন বা আবার নতুন করে খাত কাটিয়েছিলেন। তার কারণ, বদাউনী-র মতে (৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯৮), শাহ্‌জাদা সেলিমের নামাঙ্কিত খালটি কাটা হয়েছিল যমুনা থেকে কর্নালের দিকে এবং তা পেরিয়ে (সম্ভবত, তিনি নিজেই যেখানকার জাগীরের অধিকারী ছিলেন সেই সফেদন-ও ছাড়িয়ে) ৫০ 'কুরোহ্‌' অবধি। খাল কাটার যে কালনির্দেশ করা আছে, মনে হয় সেটি ভুল—কেননা তার থেকে ৯৭৬ সংখ্যাটি পাওয়া যায়, অথচ সেলিমের জন্ম ৯৭৭ হিজরীতে (১৫৬৯ খৃস্টাব্দে)।

৪৩. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১৪-১৫।

৪৪. ওয়ারিস, ক: পৃ. ৪০১ ক-৪০২ ক, ৪১১ক; খ: পৃ. ১৬ খ-১৮ ক, ৩০ খ; সালিহ্‌, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯; সুজান রায় ২৯-৩০, ৩৬-৩৭। খালের কাজ শুরু হয়েছিল শাহ্‌জাহানের রাজত্বের ১২তম বছরে, শেষ হয়েছিল ২১তম বছরে। খালটির দৈর্ঘ্য যে 'কুরোহ্‌' এককে দেওয়া আছে তাকে বলা হয়েছে 'কুরোহ্‌-এ শাহী'। এর জন্য পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য। এই খালটির সঙ্গে আলী মর্দান খানের কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর নাম এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরবর্তী কিংবদন্তীতে, যথা 'চাহার গুলশন', সরকার অনু. পৃ. ১২৪ এবং ফ্র্যাঙ্কলিন, 'দা হিস্ট্রি অফ দা রেন অফ শাহ্‌-আলম', পৃ. ২০৮; আরও দ্রষ্টব্য মোরল্যাণ্ডের 'আকবর টু আওরঙ্গজেব', পৃ. ১৯৬।

৪৫. শুধু 'শাহ্‌-নহর' বা শাহী খালও বলা হতো।

৪৬. অবশ্য সুজান রায়, ৩৬-৩৭, জানিয়েছেন যে, খালটি যমুনার অর্ধেকই বয়ে নিয়ে যেত বলা যায়; "বহু পরগনায় এটি চাষবাসে সাহায্য করেছিল আর জল দিয়েছিল রাজধানীর কাছাকাছি বাগানগুলিতে।" ১৭৯৩-৪-এ লেখা দিল্লীর এক বর্ণনায় ফ্র্যাঙ্কলিন, (পূর্বোক্ত গ্রন্থ) এর সম্বন্ধে বলেছেন, "খালটি এর গতিপথে নব্বই মাইলেরও বেশি লম্বা ভূখণ্ড উর্বর করে।"

যমুনা ও শতদ্রুর মধ্যে বিস্তৃত হরিয়ানা ভূখণ্ডের বিশাল এলাকায় কোন চিরতোয়া নদী ছিল না। যেসব মরসুমী জলধারা শিবালিক পর্বত বা তার একটু নীচ থেকে ওঠে, সেগুলি হয় সমভূমিতে নেমে হারিয়ে যায়, নয়তো মরুভূমির শুখা নদী ঘগগর বা হকরা র দিকে বয়ে-যাওয়া কোন নালার সঙ্গে গিয়ে মেশে। এই অঞ্চলের চলতি রীতিই ছিল এইসব জলধারার গতিপথে বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম প্লাবন সৃষ্টি করা, বা অন্তত কিছুটা জলের জোগাড় করা।[৪৭] এসব নদীর তলার বাঁকের অবস্থা স্বভাবতই সঙ্কটজনক হয়ে উঠেছিল। চুতাং বা চিতরং নদীর বিষয়ে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় এক আধা-সরকারী দলিলে। তার থেকেও এই ধারণার সমর্থন মেলে। শাহ্-জাহানের আমলের এই দীর্ঘ স্মারকলিপিতে চুতাং নদীর খাত সংস্কার ও গভীর করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। তার ফলে হিসার পর্যন্ত জল পৌঁছবে। অনেকদিন ধরে জল যাচ্ছিল না বলে হিসার ও তার আশেপাশের এলাকায় খুব দুরবস্থা চলছিল।[৪৮] অবশ্য এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কিনা তার কোন প্রমাণ নেই।[৪৯] পরের কোন বিবরণেও ঐ ধরনের কাজের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

তিনি আরও বলেছেন যে, "প্রায় তিন মাইল লম্বা খালটি যখন মুঘল পারা-র শহরতলীগুলির ভেতর দিয়ে যায় তখন এটি ২৫ ফুট গভীর, প্রায় ততটাই চওড়া [ও] নিরেট পাথর কুঁদে তৈরি…।"

৪৭. যথা: 'কর্নাল ঝোরা'য় আসালত খানের তৈরি 'বন্দ', শাহ্জাহান তাঁর রাজত্বের ১১তম বছরে যেটি দেখতে গিয়েছিলেন (লাহোরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১২)। সিরহিন্দ-এর চারদিকের সমভূমিতে যেসব বাগান ও কুঞ্জ ছিল, মনসেরাৎ (পৃ. ১০২) তার প্রশংসা করেছেন। এগুলি জল পেত "একটি গভীর, কৃত্রিম হ্রদ" থেকে। হ্রদটি ভরা হতো "বর্ষার সময়ে সেচের নালাগুলির (সম্ভবত 'মরসুমী ঝোরা' পড়া উচিত) সাহায্যে।"

৪৮. স্মারকলিপিতে কিছুটা অতিশয়োক্তি করে বলা হয়েছে যে, "একশ বছর" হলো চুতাং নদী আর হিসারে পৌঁছয় না। কিন্তু 'আইন'-এর নজির এবং শিহাব-নহর সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, তার থেকে মনে হয়, হিসারের নালাটি শুকিয়ে গিয়েছিল কেবলমাত্র শিহাব-নহরে পলি পড়ার পর। শাহ্জাহানের খাল চুতাং নদীকে একেবারে বর্জন করে যমুনার পুরো প্রবাহকেই ঘুরিয়ে দেয় দিল্লীর দিকে। স্মারকলিপিতে কিন্তু যমুনার সঙ্গে এই সংযোগের (যাকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা প্রায় অসম্ভব ছিল) কোন উল্লেখই নেই, দৃষ্টি শুধু চুতাং নদীর দিকে। নদীর উৎসটি খুঁজে বের করা হয়েছে সধৌরার কাছে এবং বলা হয়েছে মরসুমী নদী হলেও, নদীখাতটির উন্নতি করা হলে এটি হিসার পর্যন্ত যেতে পারে। স্মারকলিপিতে আরও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যে সিরহিন্দ 'চাক্‌লা'য় নদীটির ওপর দু-তিন জায়গায় 'বন্দ' দেওয়া যেতে পারে। বালকৃষণ ব্রাহ্মণের সংগৃহীত কাগজপত্রের (Add. 16,859, পৃ. ১০৭ ক-১০৯ খ) মধ্যে এই নথিটি পাওয়া যায়। কাগজপত্রগুলি শাহ্জাহানের আমলের শেষ দিক ও আওরঙ্গজেবের আমলের গোড়ার দিকের। কিন্তু স্মারকলিপিতে "আল হজরৎ"-এর উল্লেখ আছে—শাহ্জাহানকে সাধারণত এই নামেই সম্বোধন করা হতো।

৪৯. বলা হয়েছে যে, জল তাদের কাছাকাছি আনা হলেই হিসার 'চাক্‌লা'র জমিনদার ও চাষীরা তাদের জমি ও বসতির ভেতর দিয়ে খাল কাটতে রাজি ছিল। স্মারকলিপি থেকে অবশ্য

খোদ পাঞ্জাবের উচ্চ-বারি দোআবে একটি ছোট খাল-ব্যবস্থার পত্তন করা হয়েছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিচিত শাহ্নহর খালটিও শাহ্জাহানের আমলেই কাটা। এটি বেরিয়েছিল পাহাড়ের গায়ে রাজপুর (বা শাহ্পুর)-এর ইরাবতী থেকে, আর গিয়েছি প্রায় ৩৭ 'কুরোহ্' বা ৮৪ মাইল দূরে লাহোর অবধি।[৫০] একই জায়গা থেকে শুরু হয়ে আরও একটি খাল গিয়েছিল পাঠানকোটে, একটি বতালায় আর একটি পট্টি-হইবৎপুরে। ১৭ শতকের শেষ দিকে একজন স্থানীয় ঐতিহাসিক লিখেছিলেন, "এইসব খাল থেকে চাষের প্রচুর উপকার হয়।"[৫১]

পাঞ্জাবের বাকি অংশ সম্পর্কে আমাদের তথ্যসূত্রগুলি খুব একটা আলোকপাত করে না। সিধনাই-এর দুই বাঁকের মধ্যবর্তী অংশকে আর কিছুতেই খাল বলা যেত না, কারণ এর মধ্যে দিয়ে বইছিল ইরাবতীর মূল স্রোত।[৫২] অবশ্য আমরা জানি, উচ্চ রেচনা দোআবে, ওয়াজিরাবাদের কাছে সোধরায় আলি মর্দান খানের বাগানে জল দেওয়ার জন্য তবী থেকে একটি ছোট খাল কাটা হয়েছিল।[৫৩] মুলতান 'সরকার'-এ যে খাল ছিল, তা বোঝা যায় ঐ অঞ্চলে একজন 'মীর-এ আব' (খাল-অধ্যক্ষ) নিয়োগের খসড়া

স্পষ্ট বোঝা যায়, সিরহিন্দ 'চাক্লা'র, অর্থাৎ বাঁকের মধ্যবর্তী অঞ্চলের ওপর দিকের এলাকার কর্তাব্যক্তিরা এই প্রকল্প সম্পর্কে খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না।

৫০. লাহোরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৮-৯, ২৩৩-৪, ৩১১, ৩১৫, সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ৯২ ক, ১০২ ক-খ, Or. 1671, পৃ. ৫০ খ, ৫৬ ক; 'মআশিরুল উমারা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০৬-৭; সুজান রায়, ৭৭। লাহোরী বলেছেন, আলী মর্দান খানের অনুগৃহীত এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে প্রথম যে চেষ্টা হয়েছিল সেটি ব্যর্থ হয়, যদিও ৪৮½ 'কুরোহ্-এ জরিবী' লম্বা একটি নালার পুরোটাই কাটা হয়ে যায়। মনে হয়, নালাটিকে খুব চওড়া করে পাক খাওয়ানোর ফলে লাহোর অবধি যথেষ্ট পরিমাণে জল পৌঁছত না। এটিকে আরও গভীর করার দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। শেষে ৫ 'কুরোহ্' বাদে পুরনো নালার পুরোটাই পরিত্যক্ত হয় ও নতুন একটি নালা খোঁড়া হয়। এটি ছিল আগের চেয়ে ১১½ 'কুরোহ্' ছোট। এর কাজ শেষ হয় ষোড়শ বছরে। দূরত্বের পরিমাণ বোধহয় দেওয়া হয়েছে আগেকার (এবং আরও ছোট) সরকারী 'কুরোহ্'র মাপে (দ্র. পরিশিষ্ট 'ক')।

৫১. সুজান রায়, ৭৭। এও সম্ভব যে বতালা অবধি বয়ে-যাওয়া খালটিই শাহ্-নহর-এর জন্য খোঁড়া প্রথম খাতটি দখল করেছিল।

৫২. 'আইন'-এ মুলতান এবং তুলম্বা-কে বসানো হয়েছে বারি দোআবে। এর থেকে মনে হয়, মুলতানের পূর্ব দিক পেরিয়ে তার যে পুরনো খাত, সেটি ছেড়ে ইরাবতী তখন বইছিল সিধনাই-এর খাত ধরে। (আরও দ্রষ্টব্য সুজান রায়, ৭৭)। কিংবদন্তী অনুসারে মনে করা হয় যে দুটি বাঁকের মধ্যবর্তী এই অংশটি আসলে মানুষের কাটা খাল। এর আশ্চর্য সরল গতিপথ দিয়ে এই ধারণাই সমর্থিত হয়। (তুলনীয় 'মুলতান গেজেটিয়ার', ১৮৮৩-৪, পৃ. ২; *JASB*, ১৮৯২, পৃ. ৩৭০, টীকা নং ৩৬৫; জি. আর. এল্‌সমী, 'থার্টি-ফাইভ ইয়ারস্ ইন দা পাঞ্জাব, ১৮৫৮-৯৩', পৃ. ৩৫৪)।

৫৩. সুজান রায়, ৭৪। যদি ধরে নিই তবী তখন চন্দ্রভাগার সঙ্গে মিশত এখনকার সঙ্গম-স্থলেই বা তারই কাছাকাছি—তাহলে খালটি নিশ্চয়ই ৩০ মাইলেরও বেশি লম্বা ছিল।

আদেশ থেকে। প্রশাসনিক নথিপত্রের একটি সংগ্রহে এটি রয়ে গেছে। আদেশে বলা হয়েছে : নিযুক্ত ব্যক্তি "নতুন নালা কাটবেন, পুরনো নালার সংস্কার করবেন, বন্যাস্রোতের জায়গায় বাঁধ দেবেন ('বন্দ্-এ সইল')" আর চাষীদের মধ্যে খালের জল ন্যায্য বণ্টনের তদারক করবেন।[৫৪] 'বালুচ দেশ'-এর অন্তর্গত বর্তমান সিন্দসাগর দোআবের সবচেয়ে দক্ষিণের অংশ উর্বরতার জন্য বিখ্যাত ছিল।[৫৫] আওরঙ্গজেব বলেছেন, বন্যা আর কুয়ো-সেচই তার কারণ।[৫৬] এলাকাটি সত্যিই পরিত্যক্ত নদীখাতে ভরা।[৫৭] কিন্তু কিংবদন্তী এও বলে যে মিঠানকোটের ওপরে সিন্ধুর বর্তমান বাঁকের মধ্যবর্তী জায়গা আসলে ছিল কৃত্রিম খাল। ১৯ শতকের গোড়ায় সিন্ধুনদ একে আরও চওড়া করে নিজের খাত বানিয়ে নিয়েছে।[৫৮]

সিন্ধুপ্রদেশে সিন্ধুনদের বাহু ও প্লাবনের নালা বিস্তারের প্রবণতা আরও বেশি। এগুলি ছড়িয়ে আছে পূর্ব দিকে, পূর্ব-নারা পর্যন্ত। এছাড়াও ছিল বড় বড় কৃত্রিম খাল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো উচ্চ সিন্ধুর 'বেগারী ওয়াহ্'। নাম থেকেই বোঝা যায়, খালটি কাটানো হয়েছিল বেগার শ্রমিক দিয়ে। আর ছিল নৌশহ্‌রো বিভাগের নৌলখি খাল। মনে করা হয়, ১৮ শতকের গোড়ায় এটি কাটা হয়েছিল।[৫৯] ব-দ্বীপ অঞ্চলে দরিয়া খান বলে 'জাম'দের এক মন্ত্রী ১৬ শতকের গোড়ায় 'খান-ওয়াহ্' খাল কাটিয়েছিলেন।[৬০] ক্রমাগত পলি পড়ে পড়ে সিন্ধুনদের খাত তার চারধারের সমভূমির চেয়ে অনেকটা ওপরে উঠে যায়। সেচের জন্য তাই এর মূল স্রোত আর প্লাবনের নালা—দুএরই জল সহজে ব্যবহার করা যায়। বার্নিয়েও বলেছেন,[৬১] স্থানীয় রীতি

৫৪. 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী'তে একটি 'পরওয়ানা', পৃ. ১৯৮ খ-১৯৯ ক ; Bodl. পৃ. ১৫৭ ক-খ, Ed. ১৫১-২।

৫৫. সুজান রায়, ৬৩ ও ৬৪।

৫৬. 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ১৩ খ-১৪ ক ; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', পৃ. ২৯।

৫৭. *JASB*, ১৮৯২, পৃ. ২৯৯।

৫৮. ঐ, পৃ. ৩০৩, টীকা নং ৩০১ ; 'মুস্লিম ইউনিভার্সিটি জার্নাল', ১ম ভাগ, পৃ. ৫৬৯।

৫৯. ল্যামব্রিক, 'জার্নাল অফ সিন্ধ হিস্টরিক্যাল সোসাইটি', ৩য় খণ্ড, ১৯৩৭, ১ম ভাগ, পৃ. ১৭।

৬০. 'তারিখ-এ তাহিরী', Or. 1685, পৃ. ২৬ ক। জরিপের মানচিত্রে খালটি এখনও দেখানো হয়। এটি বেরিয়েছিল থাট্টার কাছে সিন্ধুনদের প্রধান খাত থেকে এবং বয়ে গিয়েছিল পশ্চিম দিকে। 'তারিখ-এ তাহিরী' অনুযায়ী এটি খোঁড়ার উদ্দেশ্য ছিল "সন্‌কোরা পরগনা [এখন মীরপুর সকরো] ও পাহাড়ের পাদদেশে অন্ত অঞ্চল [অর্থাৎ ঘারো খাঁড়ির উত্তরের ছোট ছোট পাহাড়] এবং [থাট্টা] শহরের চারপাশের এলাকায় জনবসতি গড়ে তোলা (আরও তুলনীয় হেগ, 'ইন্ডাস্ ডেল্টা কান্ট্রি', পৃ. ৮৬ টীকা)।

৬১. বার্নিয়ে, ৪৫৪। তিনি বলেছেন 'কালিস'। এর অর্থ হতে পারে 'কারীজ' অর্থাৎ নদী থেকে কাটা নালা, অথবা 'খাল' (বা 'খালা') অর্থাৎ কৃত্রিম নালা, যেমন ব্যবহার হতো পাঞ্জাবে। দ্র. প্রিন্সেপ, 'হিস্ট্রি অফ দা পাঞ্জাব', লণ্ডন, ১৮৪৬, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩ ও ১৫৪। শব্দ দুটির বানান সেখানে যথাক্রমে "খুরাজ" এবং "খুল" ; আরও দ্রষ্টব্য এলিয়ট, 'মেমোয়ার্স…', ২য় ভাগ, ২২৫।

ছিল হয় নদী বা খাল থেকে 'কারীজ' বা "কৃত্রিম নালা" কাটা, নয়তো জল তোলার জন্য 'পারসী চাকা' বসানো। সমসাময়িক লেখাপত্রেও এর উল্লেখ আছে।[৬২]

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে খাল-সেচ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের হাতে পুরো তথ্য নেই। অবশ্য এও স্পষ্ট যে, আমাদের আলোচ্য পর্বে স্বাভাবিক প্লাবনের নালাগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হলেও বেশ কিছু খাল কাটা হয়েছিল, যার কয়েকটি সত্যিই বেশ বড় মাপের কাজ।[৬৩] সমসাময়িক তথ্যসূত্রে প্রায়ই পাঞ্জাব এবং সিন্ধু প্রদেশের উঁচু মানের ফসলের কথা শোনা যায়।[৬৪] এর অনেকটাই হয়তো দেখা যেত এইভাবে সেচ-করা ভূখণ্ডে। তবে পরিষ্কার বোঝা যায়, সেচের কাজে স্বাভাবিক নালাগুলি সর্বদাই খুব একটা উপযোগী হতো না, কারণ সেচের জন্য উৎসের জল-তল সাধারণত ক্ষেতের চেয়ে অনেকটা উঁচুতে থাকা দরকার। জলধারণের ক্ষমতা বা বিন্যাসের সুষ্ঠুতা—কোন দিক দিয়েই আলোচ্য পর্বে মানুষের কাটা খালের সঙ্গে আধুনিক কারিগরীবিদ্যার ভিত্তিতে তৈরি খালের তুলনা চলে না। সুতরাং, সিন্ধু উপত্যকা ও উচ্চ-গাঙ্গেয় সমভূমিতে বিশাল আধুনিক খাল ব্যবস্থা যে মধ্যযুগীয় খাল ব্যবস্থার সেরা অবস্থার চেয়েও অনেক দূর এগিয়ে আছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।

৩. শস্য ও অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্য

খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যাপারে মুঘল ভারতে, আজকের মতোই, ধান এবং গম-ও-জোয়ার—মোটামুটি এই দুটি বিভাগ ছিল। বাৎসরিক ৪০ বা ৫০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতের সমবর্ষণরেখা ছিল দুই এলাকার সীমানা। আসাম উপত্যকা,[১] বাংলা[২] ও ওড়িশা,[৩] পূর্ব উপকূল,[৪] তামিল দেশ,[৫] পশ্চিম উপকূলের একফালি সংকীর্ণ জায়গা[৬] আর কাশ্মীরে[৭] ধান চাষ হতো, গম আর জোয়ারের চাষ ছিল না বললেই হয়।

৬২. 'ফ্যাক্টরিস্ ১৬৪৬-৫০', পৃ. ১১৯, নীল চাষীদের সম্পর্কে। এই দুটি রীতির বিষয়েই দ্রষ্টব্য ন্যামত্রিক, পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ১৫।

৬৩. বিপরীত মতের জন্য দ্রষ্টব্য মোরল্যাণ্ড, 'ইণ্ডিয়া…অফ আকবর', ১০৭-৮। মোরল্যাণ্ড বিষয়টি খুব খুঁটিয়ে বিবেচনা করেননি।

৬৪. দ্রষ্টব্য 'আইন', ১ম খণ্ড, ৫৩৮; দে ভেনো, ৮৫, ও সুজান রায়, ৭৯—পাঞ্জাবের জন্য; এবং 'আইন', ১ম খণ্ড, ৫৫৬ ও মানরিক, ২য় খণ্ড, ২৩৮—সিন্ধুর জন্য।

১. 'ফথিয়া-এ ইব্রিয়া', পৃ. ৩২ খ।

২. 'আইন', ১ম খণ্ড, ৩৮৯।

৩. ঐ, ৩৯১।

৪. 'রিলেশনস্ অফ গোলকুণ্ডা', ৭-৮; ফ্রায়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯।

৫. 'দিলকুশা', পৃ. ১১২ খ-১১৩ ক।

৬. ফ্রায়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৭, ১৩৯; লিনস্কোটেন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৫-৬; 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৬৫-৬৭', পৃ. ৪৫।

৭. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬৩; 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ৩০০-৩০১। কিশ্‌ৎবাড়ের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি হয়েছিল উল্টো (ঐ, পৃ. ২৯৬)।

বিহার,[৮] এলাহাবাদ,[৯] অযোধ্যা[১০] এবং খান্দেশের[১১] কিছু কিছু এলাকায় ধান হতো। গুজরাটে, বিশেষত দক্ষিণ উপকূলবর্তী অঞ্চলে,[১২] ধান ফলানো হতো। ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময়ের এক লেখক দাবি করেছেন যে এই প্রদেশের ধানের মান "পুরনো দিনের" চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে।[১৩] উত্তর-পশ্চিমের শুখা এলাকায় জলবায়ুর বাধা পেরিয়ে ধান চাষ হতো প্রায় আজকের মতো একই উপায়ে : সিন্ধুনদ ও শাখানদীগুলির সেচের ফলে ধানই ব দ্বীপের প্রধান শস্য হয়ে উঠেছিল।[১৪] লাহোরেও উঁচু জাতের ধান বোনা হয়েছিল।[১৫]

একইভাবে গম চাষ হতো তার স্বাভাবিক এলাকা জুড়ে। মজার ব্যাপার এই যে বাংলাতেও গম ঢুকে পড়েছিল। যদিও এখানকার গমের মান নীচু বলে ধরা হতো, তবু এর চাষের পরিমাণ ছিল সম্ভবত এখনকার চেয়ে অনেক বেশি।[১৬] গমের মতোই সবচেয়ে বেশি বার্লি জন্মাত মধ্য-সমভূমি[১৭] আর গুজরাটে।[১৮] কিন্তু বাংলায় এর চাষ ভালো হতো না।[১৯] কন্নড়,[২০] তামিলনাড[২১] বা কাশ্মীরে[২২] একেবারেই বার্লির চাষ ছিল না।

৮. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৬।

৯. ঐ, পৃ. ৪২৩ ; মাণ্ডি, ৯১-২, ৯৮।

১০. 'আইন', ১ম খণ্ড, ৪৩৩।

১১. ঐ, ৪৭৩ ; তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭১, ১১৬ ; তেভেনো, ১০২।

১২. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৩ ; কমিসারিয়ট. 'মান্দেসস্‌লো', পৃ. ১৫ ; তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪ ; তেভেনো, ৩৭।

১৩. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪।

১৪. 'আইন', ১ম খণ্ড, ৫৫৬, মান্‌রিক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৮।

১৫. সুজান রায়, ৭৯। আরও তুলনীয় মান্‌রিক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১ ; তেভেনো, ৮২।

১৬. বার্নিয়ে, ৪৩৮ ; মাস্টার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮১-৮২ (হুগলীর চারধারের অঞ্চল প্রসঙ্গে)। ১৬১৬-য় সুরাটের কুঠিয়ালরা অস্বীকার করেননি যে "বাংলা থেকেই ভারতে গম আসে।" ('লেটার্স রিসিভ্‌ড্‌', ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৭)। সম্ভবত যোগানের উৎস হিসেবে বন্দর ও তার পশ্চাদ্‌ভূমির মধ্যে বিভ্রান্তিই এই মন্তব্যের জন্য দায়ী (তুলনীয় মোরল্যাণ্ড, 'ইণ্ডিয়া…অফ আকবর', পৃ. ১২০)।

১৭. মালব ছাড়া প্রায় সমস্ত 'জব্‌তী' প্রদেশ (অর্থাৎ এলাহাবাদ, অযোধ্যা, আগ্রা, আজমীর, দিল্লী, লাহোর এবং মুলতান)-এর 'দস্তুর'-এই বার্লির নাম পাওয়া যায়। মালবে এর কথা আছে শুধু রাইসেনের 'দস্তুর'-এ।

১৮. ফ্রায়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৭। ওড়িশায়ও তাই লক্ষ্য করা গেছে (বাউরি, ১২১)।

১৯. 'আইন', ১ম খণ্ড, ৩৮৯। আসামেও নয় (ফথিয়া-এ ইব্রিয়া', পৃ. ৩২ খ)।

২০. লিনস্কোটেন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৬।

২১. তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৬।

২২. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৯। সমসাময়িক লেখাপত্রে বার্লির উল্লেখ প্রায়ই প্রচ্ছন্ন থাকে 'জিন্‌স্‌-এ গল্লা' বা (ইউরোপীয় সূত্রে) শস্য, খাদ্যশস্য ইত্যাদি শব্দের মধ্যে।

জোয়ার-জাতীয় দানাশস্য চাষের এলাকা[২৩] অনেকটাই গমের সঙ্গে মেলে, তবে এটি আরও শুখা অঞ্চল-ঘেঁষা। তাই এলাহাবাদ প্রদেশে[২৪] জোয়ার ও বাজরার চাষ হতো না। পশ্চিমে, দীপালপুর অঞ্চলে জোয়ার ছিল প্রধান খারিফ (শরৎ) শস্য, রবি (বসন্ত) শস্যর সময়ে বোনা হতো গম।[২৫] আজমীর,[২৬] গুজরাট[২৭] এবং খান্দেশে[২৮] ধান-গমের চেয়ে জোয়ার-বাজরার চাষই ছিল বেশি; অবশ্য মালব[২৯] এবং সোরাষ্ট্রে[৩০] সম্পর্কে এ কথা খাটে না। ডালের ক্ষেত্রে মুঘল আমলের পর কোন বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে কিনা—তা বের করা কঠিন। 'আইন' থেকে বিভিন্ন শস্য সম্বন্ধে যা জানা যায় তাতে মনে হয় সাধারণভাবে উৎপাদনের ধরন যদি একেবারে এক না-ও হয়, তাহলেও মিল ছিল খুবই।[৩১]

২৩. 'আইন'-এ (১ম খণ্ড, পৃ ২৯৩-৩০০) জোয়ার-বাজরা জাতীয় শস্য এই: 'জুবার', 'লহ্‌দ্রা', (অর্থাৎ বাজরা), 'সানবান' (ফার্সীতে 'শামাখ') (আধুনিক 'সবান'), 'চীনা' (ফার্সীতে 'অর্‌জন'), 'মন্দবা' (আধুনিক 'মরুয়া' বা "রাগি"), 'কোদ্রোন' বা 'কোদ্রাম' (আধুনিক 'কোদোন'), 'কংগুনী' (ফার্সী 'গাল') (আধুনিক 'ককুন'), 'কোদিরী' বা 'কোরী', এবং 'বর্‌টী'। শেষদুটিকে সনাক্ত করা যাচ্ছে না। 'কোদিরী'কে স্পষ্টই নীচু মানের শস্য বলা হয়েছে, আর 'দস্তুর'-এ 'বর্‌টী'র নাম নেই। 'কোদিরী' 'গোঁদলী'রই রকমফের ('পানিকুম মিলিআরে')। মোরল্যাণ্ড ('ইণ্ডিয়া…অফ আকবর', পৃ. ৩০৩) প্রস্তাব করেছেন 'মেনঝ্‌রী' বা 'কুত্‌কী' ('পানিকুম পিলোসোদিউম') 'কোদিরী' বা 'বর্‌টী'র সঙ্গে অভিন্ন।

২৪. 'আইন', ১ম খণ্ড, ৪২৩। তাহলেও এই প্রদেশের 'দস্তুর'গুলিতে জোয়ারের নাম আছে। কিন্তু আরও তিন-চারটি ঐ জাতীয় শস্যের মতো 'লহ্‌দ্রা' (অর্থাৎ বাজরা)-র উল্লেখ নেই।

২৫. সুজান রায়, ৬৩।

২৬. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৫।

২৭. ঐ, ৪৮৬; 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ২০৭; 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪।

২৮. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৩; 'দিলকুশা', পৃ. ৭ ক।

২৯. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৫।

৩০. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৮, যদিও 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯০-এ বলা হয়েছে, সোরাটে বছরে তিনবার জোয়ার হতো।

৩১. 'আইন'-এ (১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৮-৩০০) ডালের তালিকা দেওয়া আছে: দু-ধরনের 'নখুদ' (চানা): 'কাবুলী' এবং 'হিন্দী' বা সাধারণ; মসুর (ফার্সী 'অদস'); মটর (ফার্সী 'মশঙ্গ', কড়াইশুঁটি); মুঙ্গ (ফার্সী 'মাষ'); উরদ ('মাষ-এ সিয়াহ্‌,' কিন্তু 'দস্তুর'গুলিতে শুধু মাষ-ই দেওয়া আছে; মুঙ্গ এসেছে তার স্থানীয় নামে); 'লোবিয়া' এবং 'কুল্‌থ' (আধুনিক 'কুল্‌থী')। এই তালিকায় অড়হর ডালের নাম নেই, কিন্তু 'উনিশ বছরের দর' এবং 'দস্তুর'-গুলিতে এর নাম পাওয়া যায়। এও কৌতূহলজনক যে, কোন অবোধ্যার কয়েকটি 'দস্তুর' ছাড়া, 'দস্তুর'গুলিতে এর জন্য রাখা সব ঘরই ফাঁকা পড়ে আছে। 'উনিশ বছরের দর'-এর ক্ষেত্রেও ফসলটির দর ধার্য করা হয়েছে শুধুমাত্র এলাহাবাদ, অযোধ্যা ও মুলতান প্রদেশের ক্ষেত্রে, তাও শুধু ২০তম বছর থেকে, সমহারে বিঘাপিছু ২০ 'দাম' হিসেবে। তাই মনে হয়,

সুতরাং, প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যের ভৌগোলিক বিভাগে আজকের পরিস্থিতির তুলনায় অল্পই তফাৎ দেখা যায়। 'আইন'-এ অযোধ্যা, আগ্রা ও দিল্লী প্রদেশের বিভিন্ন শস্যের যে দাম ও রাজস্ব-নির্ধারণের হার দেওয়া আছে, সেগুলি পরীক্ষা করে মোরল্যাণ্ড সিদ্ধান্ত করেছিলেন : এক শস্যের অঙ্কে আরেক শস্যের দাম ও একরপ্রতি উৎপন্নের মূল্য সেই আমলের পর থেকে অল্পই পাল্টেছে। খাদ্যশস্যের মধ্যে শুধু গোঁদুলার একরপ্রতি উৎপাদন গমের সঙ্গে বিনিময়-অঙ্কে এখনকার চেয়ে বেশি ছিল বলে মনে হয়। বাজরার দাম আজকের তুলনায় অনেক কম ছিল।[৩২] গোঁদুলার দাম কেন পড়ে গেল তা ঠিক করা সহজ নয়। কিন্তু, আরও শুখা জমিতে জোয়ারের বদলে ভুট্টা চাষের সঙ্গে হয়তো এই ঘটনার যোগাযোগ থাকতে পারে। জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে এই প্রয়োজনীয় শস্যটির (ভুট্টা) চাষের বিস্তার ঘটে মূলত ১৯ শতকে।[৩৩] ভারতে ১৭ শতকে ভুট্টার কথা জানা ছিল না।[৩৪]

মুঘল নথিপত্রে যাকে 'জিন্‌স্‌-এ কামিল' বা 'জিন্‌স্‌-এ আলা'[৩৫]—অর্থাৎ মূলত

অড়হরকে এতই নীচু মানের শস্য বলে ধরা হতো যে বেশির ভাগ জায়গায় তার দর দেওয়া হয়নি। এখন যে ডালটিকে 'খেসারী' বলা হয়, সেটিকে তার আসল জায়গা বিহারে দেখা যায় 'কিসারী' নামে। বলা হয়েছে, এটি ছিল গরীবদের খাদ্য ও রোগের কারণ ('আইন', ১ম খণ্ড, ৪১৬)। 'মাষ', অর্থাৎ 'উরদ' সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, চম্পারণের জমিতে এটি লাঙল না চালিয়েই বোনা যেত (ঐ, ৪১৭)। এলাহাবাদ প্রদেশে 'মোঠ' প্রায় হতোই না (ঐ, ৪২৩)।

৩২. *JRAS*, ১৯১৭, পৃ. ৮২০ ; ঐ, ১৯১৮, পৃ. ৩৭৭-৮ ; 'ইণ্ডিয়া…অফ আকবর', পৃ. ১০৩ এবং টীকা। ['সংযোজন ও সংশোধন' অংশ দ্রষ্টব্য]

৩৩. তুলনীয় ওয়াট, 'ডিকশনারি অফ ইকনমিক প্রোডাক্টস অফ ইণ্ডিয়া', ৬ষ্ঠ খণ্ড—ভাগ ৪, পৃ. ৩৩৪-৫।

৩৪. বিজয়নগর রাজ্যে "ভারতীয় ভুট্টা"র চাষ হতো—মোরল্যাণ্ড, 'ইণ্ডিয়া…অফ আকবর', পৃ. ৩০৫-৬-য় এ ধারণা খণ্ডন করেছেন। ওয়াট (ঐ, পৃ. ৩৩৪) স্বীকার করেছেন যে 'আইন'-এ দামসহ শস্যের তালিকায় ভুট্টা নেই কিন্তু ব্লখমান-এর অনুবাদ (১ম খণ্ড, পৃ. ৮৩) থেকে প্রসঙ্গক্রমে ভুট্টার উল্লেখ উদ্ধৃত করেছেন। মূল লেখাটি (১ম খণ্ড, পৃ. ৯৭) ভুল তর্জমার ফলেই (সেখানে আছে 'জুওয়ারী') এমন ঘটেছে। সেই আমলের অন্য কোন লেখায় এখনও পর্যন্ত ভুট্টার সংশয়াতীত উল্লেখ পাওয়া যায়নি। এর চলতি ভারতীয় নাম হলো 'মকা' বা 'মক্কা', এবং 'ভুট্টা'। আরও বিশেষভাবে শব্দটি দিয়ে বোঝায় ঐ শস্যের শিষ।

৩৫. 'আইন' ও তার পরের আমলের রাজস্ব সংক্রান্ত লেখাপত্রে প্রায়ই শব্দদুটি পাওয়া যায়। কিন্তু, মনে হয়, সব জায়গাতেই ধরে নেওয়া হয়েছে এর অর্থ স্বতঃস্পষ্ট। খাফী খান শস্যের দুরকমের শ্রেণীবিভাগ করেছেন : 'জিন্‌স্‌-এ গল্লা' (খাদ্যশস্য) এবং 'জিন্‌স্‌-এ আলা', যেমন "আখ ইত্যাদি" (১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬, ৭৩৫ টীকা)। ১৮ শতকের শেষ দিকের একটি রাজস্ব-সংক্রান্ত পরিভাষাকোষে (Add. 6603, পৃ. ৫৭ ক) বলা হয়েছে, 'জিন্‌স্‌-এ কামিল'-এর মধ্যে পড়ে আখ, পান, তুলো ইত্যাদি। 'জিন্‌স্‌-এ অদনা', অর্থাৎ সংজ্ঞানুযায়ী যে শস্য বেচে কম

বিক্রির জন্য উৎপন্ন 'উঁচু জাতের ফসল'—বলা হয়েছে, আধুনিক শ্রেণীবিভাগের 'অর্থকরী ফসল' কার্যত তা-ই। এই ধরনের দুটি প্রধান শস্য ছিল তুলো আর আখ। দেখা যায়, তুলোর চাষ যথারীতি হতো এখন যাকে বলে 'বোম্বাই তুলো এলাকা'য়, কিন্তু বিশেষ করে খান্দেশে।[৩৬] অবশ্য তুলোর চাষ চলত গোটা উত্তর ভারত জুড়েই।[৩৭] আরও উল্লেখযোগ্য এই যে তুলো ছিল বাংলার এক প্রধান ফসল,[৩৮] যেখানে তার চাষ এখন আর নেই বললেই হয়।[৩৯]

দাম পাওয়া যায়—যেমন নানান জাতের জোয়ার-বাজরা জাতীয় দানাশস্য—তার থেকে এটি আলাদা।

৩৬. খান্দেশের জন্য দ্রষ্টব্য 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৩; সলব্যাঙ্ক, 'পুর্চাস', ৩য় খণ্ড, ৮২-৩; পেলসার্ট ৯; তেভেনো ১০১; এবং তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২-৩। বেরারের জন্য তেভেনো, ১০১; আওরঙ্গাবাদ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের জন্য তেভেনো, ১০২; 'ফ্যাক্টরিস্ ১৬১৫ ৬০', পৃ. ২৪১; ১৬৬৮-৯, পৃ. ২৭০; ফ্রায়ার. ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩১, ৩৪৪। গোলকুণ্ডায় তুলোর চাষ ছড়িয়ে পড়েছিল ('রিলেশনস্', ৬১)। দেখা গিয়েছিল, এখানকার তুলো গুজরাটের তুলোর চেয়ে ভালো ও শস্তা ('লেটার্স রিসিভড্', ২য় খণ্ড, পৃ. ১০২)। গুজরাটের জন্য আরও দ্রষ্টব্য গোডিনহো, *JASB*, লেটার্স, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৩৮, পৃ. ৫৪৯-৫০, 'ফ্যাক্টরিস ১৬৩৪-৬', পৃ. ৬৪; কমিসারিয়ট, 'মান্দেলস্লো', পৃ. ১৫, ফ্রায়ার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৮-৯; এবং কচ্ছের জন্য 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৩৬-৮', পৃ. ১৩০ দ্রষ্টব্য।

৩৭. মানরিক (২য় খণ্ড, পৃ. ২২১) লাহোর এবং মুলতানের মধ্যে তুলোর ক্ষেত দেখতে পেয়েছেন। তেভেনো, ৭৭, দেখেছিলেন, মুলতান প্রদেশে "প্রচুর তুলো" উৎপন্ন হয়; "প্রচুর পরিমাণ" তুলো "সংগৃহীত" হতো থাট্টা অঞ্চলে (মানরিক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৮-৯)। বায়ানা-মেরটার পথে (রাজস্থান) গ্রামগুলিতে সলব্যাঙ্ক ('পুর্চাস', ৩য় খণ্ড, ৮৪) "পেঁজা তুলোর গুদোম" দেখেছিলেন। টোডার কাছে আজমীর থেকে মাণ্ডুর রাস্তায় রো (পৃ. ৩২২) দেখেছিলেন তুলো চাষের জমি। মাণ্ডি দেখেছিলেন মালবে (পৃ. ৫৬-৫৭)। আগ্রা অঞ্চলে তুলো ছিল একটি প্রধান শস্য ('ফ্যাক্টরিস, ১৬৫৫-৬০', পৃ. ১১৮); দিল্লী প্রদেশের সিরসা ভূখণ্ডে তুলো চাষের উল্লেখ আছে (বালকৃষণ, পৃ. ৬৩ ক)। আজমীর, এলাহাবাদ এবং অযোধ্যায় প্রায় সব মণ্ডলের 'দস্তুর'-এই তুলোর নাম পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যায় যে, এই সব প্রদেশেও তুলোর চাষ হতো। 'ফ্যাক্টরিস, ১৬১৮-২১', পৃ. ১৯২-৩ এবং মাণ্ডি, ১৩৪ থেকে আমরা জানি যে এর চাষ ছড়িয়েছিল পাটনা অবধি। ওড়িশাতেও তুলো চাষের উল্লেখ পাওয়া যায় (ফিচ্: রাইলি, ১১৪, 'আর্লি ট্রাভেলস্', ২৬; 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯১)।

৩৮. লিনস্কোটেন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫; ফিচ্: রাইলি, ২৫, ২৮; 'আর্লি ট্রাভেলস্', ১১২, ১১৮; বার্নিয়ে, পৃ. ৪০২, ৪৩৯; মাস্টার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮১-২; বাউরি, ১৩২-৪।

৩৯. ওয়াট (ঐ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৪)-এর উদ্ধৃত ১৮৮৬-৮৭-র একটি সরকারী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে: "আগে ঢাকা এবং মৈমনসিংহ জেলায় ব্যাপক তুলো হতো এক বিরাট ভূখণ্ডে…ঐ শস্য চাষের পক্ষে [যেটি] খুবই উপযোগী। এখানকার তুলো…পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো জাতের এবং এর থেকেই সেই উপাদান পাওয়া যায়…যা দিয়ে ঢাকাই মসলিন তৈরি হয়। বিখ্যাত ঐ বস্ত্রশিল্পের অবনতির পর থেকে এই ভূখণ্ডে তুলোর চাষও প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।"

ভূগোলের পরিভাষায় যাকে 'তুলো উৎপাদন এলাকা' বলে, গত শতকে খুব সম্ভবত তা ভীষণ কমে গিয়েছিল। সামুদ্রিক বাণিজ্যের উন্নতি এবং পরে রেলপথ তৈরির ফলে কয়েকটি অঞ্চলে তুলোর চাষ খুবই কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এমনও হতে পারে যে, এখন যেসব জমিতে তুলোর চাষ হয়, একরপ্রতি গড় উৎপাদনের দিক দিয়ে সেগুলি মুঘল আমলের তুলনায় তুলো চাষের পক্ষে আরও উপযুক্ত। কৃষকদের তখন যে পরিমাণ কাপড় জুটত বলে জানা যায়, তার থেকেও আমরা ধরে নিতে পারি যে তুলোর মোট উৎপাদন এবং সম্ভবত তুলোর চাষে নিযুক্ত মোট জমির পরিমাণও সে আমলের চেয়ে যথেষ্ট বেড়েছে।[৪০] 'আইন'-এ যে অন্যান্য শস্যের চেয়ে একরপ্রতি উৎপন্ন তুলোর মূল্য অনেক বেশি ধরা আছে—আলোচ্য পর্বে তুলোর দুষ্প্রাপ্যতা দিয়েই তার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।[৪১] কিন্তু এও লক্ষণীয় যে আখের তুলনামূলক দামে সেরকম কোন পরিবর্তন হয়নি।[৪২] মুঘল আমলে নিশ্চয়ই খুব ব্যাপকভাবে আখের চাষ হতো—বোধহয় তুলোর চেয়ে অনেক বেশি।[৪৩] উৎপাদনের পরিমাণ ও মান—দু দিক দিয়েই তখন বাংলার চিনি ছিল সবার সেরা।[৪৪] তবে

৪০. একই সিদ্ধান্তের জন্য আরও দ্রষ্টব্য মোরল্যাণ্ড, 'ইণ্ডিয়া…অফ আকবর', পৃ. ১০৫।

৪১. পূর্বোক্ত সূত্র, ১০৫ এবং *JRAS*, ১৯১৮, পৃ. ৩৮১-তে এটি দেখানো হয়েছে।

৪২. 'ইণ্ডিয়া…অফ আকবর', পৃ. ১০৩।

৪৩. বিহারের জন্য 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৬; মাণ্ডি, ১৩৪। 'আইন'-এ কার্যত সমস্ত 'জব্‌তী' প্রদেশের 'দস্তুর'-এই এর নাম আছে (দু জাতে ভাগ করা: সাধারণ এবং মোটা ('পৌড়া')। বায়ানা এবং কলপী (আগ্রা প্রদেশে) এবং মহমে (দিল্লী প্রদেশের হিসার-ফিরুজা 'সরকার'-এ) উৎপন্ন চিনির কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪২, ৫২৭)। স্টিল ও ক্রোথার ('পুর্চাস', ৪র্থ খণ্ড, ২৬৮) "আগ্রা ও লাহোরের মাঝখানের গোটা গ্রাম অঞ্চল" সম্বন্ধে বলেছেন যে "এখানে মিহি চিনির উৎপাদন হয় প্রচুর…।" আরও দ্রষ্টব্য 'ফ্যাক্টরিস্‌, ১৬৪৬-৫০', পৃ. ২৫৫, ১৬৫৫-৬০, পৃ. ১১৮, আগ্রার বিষয়ে; বার্নিয়ে, ২৮৩, তেভেনো ৬৮, দিল্লীর প্রসঙ্গে; 'বাবুরনামা', বিভারিজ অনু. ১ম খণ্ড, ৩৮৮, 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৩৭-৪১', পৃ. ১৩৪-৫, তেভেনো ৮৫ এবং সুজান রায়, ৭৯, লাহোর প্রদেশের প্রসঙ্গে; পেলসার্ট ৩১, তেভেনো ৭৭, মুলতান বিষয়ে; এবং মালবের জন্য 'আইন', ১ম খণ্ড, ৪৫৫। সিন্ধুর জন্য দ্রষ্টব্য লিনস্কোটেন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬। গুজরাটের জন্য, লিনস্কোটেন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০; তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪, তেভেনো ৩৬ এবং ফ্রায়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৬। অবশ্য রপ্তানি করার মতো উদ্বৃত্ত হতো না ('লেটার্স রিসিভ্‌ড্‌', ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১৫, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮০)। খান্দেশের জন্য মাণ্ডি, ৪৮। বগলানার জন্য সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ৬০ খ-৬১ ক; Or. 1671, পৃ. ৩৪ ক। মানুচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৯, বেরারের জন্য। আওরঙ্গাবাদ প্রদেশের জন্য, তেভেনো, ১০২। কোঙ্কণের জন্য, কারেরি, পৃ. ১৬৮-৯, ১৭৯।

৪৪. লিনস্কোটেন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৭; 'হক্‌ৎ ইক্‌লিম', ৯৪, ৯৭; 'ফ্যাক্টরিস্‌ ১৬৩০-৩৩', পৃ. ৩২৩, ১৬৪৬-৫০, পৃ. ২৫৫; বার্নিয়ে, ৪৩৭, ৪৪২। আসামে হতো সাদা, লাল ও কালো চিনি, মিষ্টি কিন্তু কড়া ('ফথিয়া-এ ইব্রিয়া', পৃ. ৩২ খ)। দখিন এবং লাহোরের চিনিও তার মানের জন্য বিখ্যাত ছিল (সুজান রায়, ৭৯; তেভেনো, ৮৫)।

আখের চাষও বাংলায় সে আমলের তুলনায় অনেক কমে গেছে, যদিও এটি এখনও এই প্রদেশের অন্যতম প্রধান ফসল।

নানা ধরনের তৈলবীজ সম্বন্ধে যে সামান্য তথ্য আমরা পাই, তাতে মনে হয় না শস্যটির ভৌগোলিক বিভাগে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। বাংলায় এগুলি ছিল খুবই পরিচিত।[৪৫] কয়েকটি গৌণ ব্যতিক্রম বাদে, এলাহাবাদ থেকে মুলতান অবধি সব প্রদেশের 'দস্তুর' বা রাজস্ব-হারেই নানা তৈলবীজের নাম পাওয়া যায়।[৪৬] গুজরাটেও রেপসীড এবং সম্ভবত রেড়ী গাছ দেখা যেত।[৪৭] মসিনার চাষ হতো প্রধানত তিসি অর্থাৎ তার তেলের জন্য, যদিও এর থেকে যে সুতো তৈরি হয় সে কথাও জানা ছিল।[৪৮] অবশ্য এও স্বীকার করা হতো যে ইউরোপে এবং অটোমান সাম্রাজ্যে তিসির ফলন আরও ভালো এবং পরিমাণে বেশি।[৪৮ক] কাঁচামাল হিসেবে এবং ঘি-এর বিকল্প বা বিকল্পের উপাদান হিসেবে তৈলবীজ, বিশেষত তিসি এখন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে আমলে খাদ্যশস্যের তুলনায় তৈলবীজের ওজন-দর ও একরপ্রতি মূল্য ছিল অনেক কম।[৪৯] লোকের মাথাপিছু তৈলবীজ উৎপাদন যদি মুঘল আমলের চেয়ে যথেষ্ট বেড়ে গিয়ে না থাকে, তাহলে আশ্চর্য হতে হবে। তন্তু-উৎপাদক ফসল হিসেবে, আমাদের আলোচ্য পর্বে, পাটের চেয়ে বোধহয় শণের চাষই হতো বেশি। 'আইন'-এর 'দস্তুর'গুলিতে ধরাই হয়েছে যে 'জব্‌তী' [অধিকৃত, শাসিত] প্রদেশগুলির প্রায় সব অংশেই এর চাষ হয়। বাংলায় অবশ্য পাটের চাষ হতো শুধু স্থানীয় বাজারের জন্য, কারণ 'আইন'-এ পাটকে শস্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে শুধুমাত্র ঘোড়াঘাট 'সরকার'-এর ক্ষেত্রে;[৫০] পরে

৪৫. বার্নিয়ে, ৪৪২, বলেছেন, এই প্রদেশে "তেলের জন্য তিসি"র চাষ হতো। বাংলার এরণ্ড রেশম [এণ্ডি] নির্ভর করত রেড়ি গাছের ওপর। আরও দ্রষ্টব্য, মাস্টার, ২য় খণ্ড পৃ. ৮১-২; বাউরি, ১৩২-৩৩।

৪৬. 'আইন'-এর তালিকায় আছে পাঁচ রকমের তৈলবীজ: কুসুমফুল, তিসি, সর্ষে, তিল অথবা রেপসীড এবং তোরিয়া। এর মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থটি, মনে হয়, সর্বত্রই চাষ হতো। আগ্রা প্রদেশের 'দস্তুর'গুলি থেকে দ্বিতীয়টি বাদ পড়েছে, শেষেরটি দেওয়া আছে শুধু অযোধ্যা, আগ্রা, লাহোর এবং আজমীরের (কেবলমাত্র মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে) 'দস্তুর'-এ। মনসেরাৎ, ২১৪, বলেছেন, শণ চাষ হতো "সিন্ধুর আশেপাশে" কিন্তু তেভেনো, ৫১, সে কথা স্বীকার করেননি। ভারতে শণের সুতো ব্যবহার হতো না—সম্ভবত তার জন্যই এই ভুলটি হয়েছে।

৪৭. ফ্রায়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৭।

৪৮. "'কত্তন' (শণ): এটির চাষ হতো খারিফ মরসুমে, হয় তেলের জন্য নয়তো দড়ি বা লিনেনের জন্য"। (কৃষি-বিষয়ক রচনা, I.O. 4702, পৃ. ৩০ খ)। মুঘল ভারতে অবশ্য তেমন বেশি কিছু লিনেন হতো না।

৪৮ ক. "রুম এবং ফরঙ্গ দেশে" (ঐ)।

৪৯. মোরল্যাণ্ড, 'ইণ্ডিয়া…অফ আকবর', পৃ. ১০৩-৪, *JRAS*, ১৯১৮, পৃ. ৩৭৮-৯।

৫০. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯০: 'পার্চা-এ টাট-বন্দ', টাট বা পাটের বোনা কাপড়।

একবারমাত্র কথাপ্রসঙ্গে এর উল্লেখ আছে।[৫১] চাল এবং চিনির জায়গায় পাট চাষের যে ব্যাপক প্রসার—তার অনেকটাই ঘটেছিল গত শতকে। ঐ প্রদেশটিতে এখন যে স্থায়ী খাদ্যসঙ্কট দেখা যায় এই ঘটনার সঙ্গে বোধহয় তার গূঢ় যোগাযোগ আছে।[৫২]

রঞ্জক-উৎপাদক ফসলকে এখন আর কোন গুরুত্বই দেওয়া হয় না। কিন্তু ১৭ শতকে নিশ্চয়ই অবস্থা এমন ছিল না; তখনকার বাণিজ্য বিষয়ক লেখাপত্রে বিশেষ করে নীলের কথা বারবার এসেছে। সবচেয়ে ভালো জাতের নীল জন্মাত আগ্রার বায়ানা ভূখণ্ডে,[৫৩] আর একটু নীচু মানের নীল চাষ হতো দোআবে, এবং খুরজা ও কোইল (আলীগড়)-এর আশেপাশে।[৫৪] সাধারণত দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হতো আহ্‌মেদাবাদের কাছে সরখেজ-এ উৎপন্ন নীলকে।[৫৫] কিন্তু সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্গত সেহ্‌ওয়ানের নীলকে নানা দিক দিয়ে এর চেয়েও ভালো বলে ধরা হতো।[৫৬] বাংলা থেকে খান্দেশ—এর প্রায় সর্বত্র ছিল নীচু জাতের নীলের চাষ। এই দুএর মাঝামাঝি জায়গায় ছিল দখিন-এর তেলিঙ্গানা অঞ্চলের নীল।[৫৭] বায়ানা এবং সরখেজ ভূখণ্ডে নীলের

৫১. মাস্টার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮১-২। এখানে হুগলীর আশপাশের অঞ্চলে উৎপন্ন দ্রব্যের তালিকায় আছে "মোটা শণ, চট এবং অন্য অনেক পণ্যদ্রব্য।"

৫২. আলোচ্য পর্বে সুতো-উৎপাদনকারী আরেক ধরনের শস্য চীনা-ঘাসের চাষ হতো বাংলায় (লিনস্কোটেন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫-৬) এবং ওড়িশায় (ফিচ্: রাইলি, ১১৪; 'আর্লি ট্রাভেলস', ২৬)।

৫৩. 'আইন', ১ম খণ্ড, ৪৪২; ফিঞ্চ, 'আর্লি ট্রাভেলস', ১৫১-২; পেলসার্ট, ১৩-১৪; মাণ্ডি, ২২২, ২৩৪; তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭২; 'ফ্যাক্টরিস', বহু উল্লিখিত।

৫৪. পেলসার্ট, ১৫, মাণ্ডি, ৯৬, 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৩০-৩৩', পৃ. ৩২৫।

৫৫. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৬; ফিঞ্চ, 'আর্লি ট্রাভেলস', ১৭৪; জুর্দাঁ, ১৭১-৩; ব্রোএক, মোরল্যাণ্ড অনু. *JIH*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৪৬, 'ফ্যাক্টরিস', বহু উল্লিখিত।

৫৬. 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৩৭-৪১', পৃ. ২৭৪; ১৬৪৬-৫০, পৃ. ২৯। আরও তুলনীয় উইদিংটন, 'আর্লি ট্রাভেলস', ২১৮; রো, ৭৬; 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৩৪-৩৬', পৃ. ১২৯, ১৬৩৭-৪১, পৃ. ১৩৬-৭, ১৬৪২-৪৫, পৃ. ২০৩, ১৬৪৬-৫০, পৃ. ১২-১৩, ৩৩, ১১৯।

৫৭. তেলিঙ্গানার নীলের জন্য দ্রষ্টব্য 'লেটার্স রিসিভ্‌ড্', ২য় খণ্ড, পৃ. ১০২; ফস্টার, 'সাপ্লিমেণ্টারি ক্যালেণ্ডার', ৯৩; 'রিলেশনস্', ৩৫-৩৬, ৬১, 'ফ্যাক্টরিস ১৬৬৫-৭', পৃ. ১৬৪।

নীল চাষ হতো বাংলায় (তাভার্নিয়ে, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮) আর বিহারে (মাণ্ডি, ১৫১, ১৫৩)। 'আইন'-এ সমস্ত 'জব্‌তী' প্রদেশের 'দস্তুর'-এই এর নাম আছে। গোয়ালিয়র ('ফ্যাক্টরিস, ১৬৪৬-৫০', পৃ. ১২২), মেওয়াট (পেলসার্ট, ১৫) এবং দিল্লীর কাছে (তেভেনো, ৬৮)। মাণ্ডি, ২৩৫, ২৪০, দেখেছিলেন, 'বাজে নীল' চাষ হয় আজমীর প্রদেশে সম্ভর-এর কাছে ও লালসোট-এ। সলব্যাঙ্ক ('পুর্চাস', ৩য় খণ্ড, ৮৪, ৮৮) বায়ানা ও মেরটার মধ্যে রাস্তার ধারের কিছু কিছু গ্রামে 'মোটা জাতের নীলের গুদোম' দেখেছিলেন। সরখেজ বাদে গুজরাটের অন্যান্য অংশে, যেমন, খামবায়েৎ, বরোদা এবং ভরোচ-এর আশেপাশের

চাষে এতই লাভ হতো যে দু বছরে তিনবার কাটার জন্য শীষগুলো ক্ষেতেই রাখা থাকত। সমসাময়িক তথ্যসূত্রগুলিতে প্রায়ই এর বর্ণনা পাওয়া যায়,[৫৮] যদিও পরে এই রীতি আর বিশেষ চালু ছিল না।[৫৯] নীলই সম্ভবত একমাত্র ফসল যার ফলন সম্পর্কে সমসাময়িক কালের আনুমানিক হিসেব পাওয়া যায়, যদিও স্বাভাবিক কারণেই ঋতুর অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা অনুযায়ী বছর-বছর সে হিসেবের হেরফের হতো। আমাদের তথ্যসূত্রগুলির বিভিন্ন আনুমানিক হিসেব থেকে মনে হবে যে, মুঘল সাম্রাজ্যের তিনটি প্রধান নীল-উৎপাদক ভূখণ্ডে—বায়ানা-দোআব-মেওয়াট, সরখেজ এবং সেহ্‌ওয়ান—এই রঞ্জক দ্রব্যটির বার্ষিক উৎপাদন অনুকূল বছরে ১৮ লক্ষ পাউণ্ড পর্যন্ত হতো।[৬০]

এলাকাতেও নীল হতো (জুর্দাঁ, ১৭৩-৪; কমিসারিয়ট, 'মান্দেস্‌লো', ১৫; তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪)। খান্দেশের নীলের জন্য তেভেনো, ১০১ এবং তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ১, ৪২ দ্রষ্টব্য। দক্ষিণ করমণ্ডলেও নীল ছিল একটি প্রধান ফসল (তুলনীয়: রায়চৌধুরী, 'দা ডাচ্‌ ইন্‌ করমণ্ডল', থিসিস-এর টাইপ-করা কপি, পৃ. ২৯১)।

৫৮. ফিঞ্চ, 'আর্লি ট্রাভেলস্‌', ১৫২-৩; 'লেটার্স রিসিভ্‌ড্‌', ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪০-৪১; পেলসার্ট, ১০-১৩; মাণ্ডি, ২২১-৩। এই সমস্ত বর্ণনাই কেবলমাত্র বায়ানা ভূখণ্ডের সম্পর্কেই প্রযোজ্য। কিন্তু 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৫৫-৬০', পৃ. ১৬-এর মতো লেখা থেকে মনে হয় সরখেজের চারপাশের গ্রামাঞ্চলেও এই রীতি অনুসরণ করা হতো। তাভার্নিয়ে, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮-৯, একেই ভারতের সর্বত্র প্রচলিত রীতি ধরে নিয়ে সম্ভবত ভুলই করেছেন। ঠিক এই ভুলই তিনি করেছেন "এটি কাটা হয় বছরে তিনবার" এ কথা বলে। পূর্বোক্ত কৃষি-বিষয়ক রচনায় পরিষ্কার বলা হয়েছে যে নীল চাষের সাধারণ পদ্ধতি তুলোর সঙ্গে মেলে, শুধু এটি কাটা হয় আরও আগে (I.O. 4702, পৃ. ৩১ ক)। গুজরাটে চাষের পদ্ধতি বিষয়ে লিনস্কোটেন-এর বর্ণনাতেও তা-ই বলা হয়েছে। কোনটিতেই একই ডগা থেকে একবারের বেশি কাটার কথা নেই।

৫৯. অবশ্য পুরোপুরি নয়। দুবার কাটার রীতি বহাল ছিল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে (ওয়াট, ঐ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০৭)। খান্দেশে "দু বছরের বা কখনও কখনও তিন বছরের ফসল" চাষ হতো "খুব অল্প মাত্রায়" (ঐ, পৃ. ৪১২)। মনে হয়, এই পরিবর্তনের আসল কারণ এই যে, পুরনো নীলের ভূখণ্ডে দ্বিতীয়বার ফসল কাটায় যে বাড়তি আয় হতো (প্রথমবারের চেয়ে আরও অনেক ভালো), জমিটি শুধু নীল চাষের জন্য দু-বছর ফেলে রাখার পক্ষে তা যথেষ্ট হতো না। এই পদ্ধতির জন্য কিন্তু তারই দরকার পড়ত। তাছাড়া বায়ানা নীলের চাষ হতো কুয়োর জলে। লোকে ভাবত, জলের গুণ থেকেই নীলের ঐ বিশেষ গুণ আসে (পেলসার্ট, ১৩-১৪)। খাল-সেচের ফলে সেই গুণ খুবই কমে যায় (তুলনীয়: ওয়াট, ঐ, পৃ. ৪০৬)।

৬০. সমসাময়িক কালের আনুমানিক হিসেবগুলি দেওয়া আছে গাঁটরি বা বস্তায়, নয়তো মণ দরে। দুটি এককই অঞ্চলবিশেষে আলাদা আলাদা হতো এবং মণের হিসেবেও সময়ে সময়ে পাল্টাত। এই টীকায় মূল সংখ্যাগুলিকে আভোয়া-দুপোয়াজ পাউণ্ডে পরিণত করে নেওয়া হয়েছে, পরিশিষ্ট 'খ'-তে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে।

পেলসার্ট, ১৩-১৫, বলেছেন যে, বায়ানা ভূখণ্ডে অনুকূল সময়ে নীল-উৎপাদন হতো

গুজরাটের কিছু কিছু অংশ (সরখেজ বাদে), খান্দেশ, বিহার ইত্যাদি যেসব অঞ্চলের আনুমানিক হিসেবের কোন নথিপত্র নেই—এর মধ্যে তাদের ধরা হয়নি। কিন্তু, এদের ধরলেও, ১৮৮০-র দশকে, বিদেশে নীলের চাহিদা যখন তুঙ্গে,[৬১] তখনকার উৎপাদনের তুলনায় মুঘল সাম্রাজ্যের মোট নীল উৎপাদন কখনই তার একের-তিন, এমনকি একের-চার ভাগের বেশি হতে পারত না। অবশ্য, আরও দু-এক দশক পরের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা চলবে না, কারণ ইউরোপে নীলের কৃত্রিম বিকল্প তৈরি হওয়ায় এর চাষ দ্রুত কমতে-কমতে একেবারে বন্ধ হওয়ার দাখিল হয়েছিল। লক্ষণীয় এই যে, নীল চাষ উঠে যাওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল অন্যান্য শস্যও, বিশেষ করে গম ও

৮৮৪,৮০০ পাউণ্ড, প্রতিকূল বছরে তার অর্ধেক। এ ছাড়াও. তাঁর মতে দোআব এবং মেওয়াট ভূ-জায়গা থেকেই প্রতি বছর প্রায় ২২১,২০০ পাউণ্ড পাওয়া যেত। ১৬৩৩-এ "গোটা হিন্দুস্তান" অর্থাৎ, সম্ভবত সাম্রাজ্যের মধ্য অঞ্চলে নীল উৎপাদন হয়েছিল প্রায় ৮৩০,০০০ পাউণ্ড। বায়ানা ভূখণ্ডই তার একের-তিন ভাগ দিয়েছিল বলে ধরা হয় ('ফ্যাক্টরিস, ১৬৩০-৩৩', পৃ. ৩২৫)।

সরখেজের উৎপাদনের পরিমাণ, মনে হয়, ১৬১৫-র মতো ভালো বছরে ৩৩২,০০০ পাউণ্ডে পৌঁছত বা ছাড়িয়ে যেত। আর দুর্ভিক্ষের সময় ছাড়া. ১৬৪৪-এর মতো প্রতিকূল বছরে এই পরিমাণ নেমে দাঁড়াত ২২১,৪০০ পাউণ্ড। ('লেটার্স রিসিভড্', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫১, 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬২৪-২৯', পৃ. ২৩২; ১৬৩০-৩৩, পৃ. ১২৫, ১৭৮; ১৬৩৪-৩৬, পৃ. ৭৩, ২৯২; ১৬৪২-৪৫, পৃ. ১৬৩-৪)।

সেহ্‌ওয়ান ভূখণ্ডের উৎপাদন, মনে হয়, ক্রমেই কমে গিয়েছিল। এই অবনতির প্রমাণ শুধু যে 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৩২-৫', পৃ. ১৩৬-এই স্পষ্ট করে দেওয়া আছে, তা নয়, উৎপাদনের আনুমানিক হিসেবেও তার ছাপ পড়েছে: ১৬৩৫-এ ১৩২,৬০০ পাউণ্ড, ১৬৩৯ এ ৭৩,৭৬০ পাউণ্ড, এবং ১৬৪৪-এ মাত্র ২৯,৪৮০ পাউণ্ড ('ফ্যাক্টরিস, ১৬৩৪-৩৬', পৃ. ১২৯; ১৬৩৭-৪১, পৃ. ১৩৬-৭; ১৬৪২-৪৫, পৃ. ২০৩)।

উপরে ১৮ লক্ষ পাউণ্ডের যে আনুমানিক হিসেব দেওয়া হয়েছে, তার ভিত্তি হলো বায়ানা, দোআব ও মেওয়াট-এর ক্ষেত্রে পেলসার্টের আনুমানিক হিসেব, এবং ১৬১৫ ও ১৬৩৫-এ যথাক্রমে সরখেজ ও সেহ্‌ওয়ানের আনুমানিক হিসেব। অনুকূল বছর অবশ্য সর্বত্রই একই ভাবে অনুকূল হতো না, বেশির ভাগ বছরেই মোট ফলন সম্ভবত আরও কম হতো। সুরাট থেকে 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৩৭-৪১', পৃ. ৯২-এর বক্তব্য থেকে জানা যায়: "সবাই বলছে" ১৬৩৮-এ মুঘল সাম্রাজ্যে "ইজারার উৎপন্ন" নীল ৪০,০০০ "মণ" হওয়ার কথা। যদি গুজরাটের মণ হয়, তবে এই পরিমাণ ১,৪৭৬,০০০ পাউণ্ডের মতো হবে।

৬১. এ কথা বলা হচ্ছে এই ধারণার ভিত্তিতে যে মুঘল সাম্রাজ্যের আওতাভুক্ত এলাকায় ১৮৮০-র দশকে নীলের মোট উৎপাদন ছিল প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ আভোয়াদুপোয়াজ পাউণ্ড। বাংলা, বোম্বাই এবং সিন্ধুর বন্দর থেকে ১ কোটি ৮০ হাজার পাউণ্ড নীল রপ্তানি হয়েছিল এবং দেশের মধ্যে ব্যবহারের জন্য সারা ভারতে লাগত ২০ লক্ষ পাউণ্ড (ওয়াট, ঐ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪২১-২)—এর থেকে আগের অঙ্কটি বের করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য। তার কারণ এই যে, নীলের উর্বরতাশক্তি প্রচুর, আর নীলের চাষ হলে রবিশস্য করা যাবে না—এমন কোন কথা নেই।[৬২] নীলের ভাগ্যে যা ঘটল তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল 'আল' ('মোরিণ্ডা সিট্রিফোলিয়া')-র দশা থেকে। 'আইন'-এর সময়ে নিম্ন-দোআব ও বুন্দেলখণ্ডে এই লাল রঞ্জকটির চাষ হতো।[৬৩] কৃত্রিম রঞ্জক তৈরি হওয়ার পর এর চাষও একেবারেই উঠে গেল।[৬৪]

সরকারী কড়াকড়ির দরুন মুঘল আমলের পর আফিম (পোস্ত) এবং গাঁজার চাষ অনেক কমে গেছে। আফিমের চাষ হতো প্রায় সর্বত্রই, কিন্তু বিশেষ করে মালব আর বিহারে।[৬৫] সিদ্ধি বা ভাঙের চাষও হতো বেশ ব্যাপকভাবে,[৬৬] যদিও আওরঙ্গজেব এটি পুরোপুরি উচ্ছেদ করার আদেশ জারি করেছিলেন।[৬৭] সিদ্ধির চাষ এখন বে-আইনী।

৬২. নীল চাষ লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় গমের ওপর যে প্রতিকূল ফলাফল দেখা দিয়েছিল, তার জন্য তুলনীয় মোরল্যাণ্ড, 'এগ্রিকালচারাল কন্‌ডিশনস্ অফ দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস্ অ্যাণ্ড ডিস্ট্রিক্টস্', বুলন্দশহর সম্পর্কে টীকা, পৃ. ৫-৬। গমের সহায়ক শস্য হিসেবে এর মূল্যের জন্য দ্রষ্টব্য ভোয়েলকর, 'রিপোর্ট', ৩৬১। নীলের পরিত্যক্ত অংশ বা 'সীট' সার হিসেবে খুব ভালো জিনিস (ঐ, ১০৬)। আরও তুলনীয়, ওয়াট, পূর্বোক্ত সূত্র, ৪০৭।

৬৩. আগ্রা প্রদেশের কাল্‌পী, কপুন্দ ও ইরজ এবং এলাহাবাদের কুটিয়া এবং কালিঞ্জর—এই 'দস্তুর'মণ্ডলগুলি ছাড়া আর কোথাও-ই এই শস্যটির দর দেওয়া নেই। শেষোক্ত ক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপিগুলি ব্লখমান-এর সঙ্গে মেলে না। ব্লখমান-এ দর দেওয়া আছে কোররা এবং জাজমউ-এর ক্ষেত্রে।

৬৪. মোরল্যাণ্ড, 'ইণ্ডিয়া…অফ আকবর', পৃ. ১০২-৩।

৬৫. মালবের জন্য দ্রষ্টব্য 'আইন', ১ম খণ্ড, ৪৫৫ ; ফিঞ্চ, 'আর্লি ট্রাভেলস্', ১৪২ ; জুর্দাঁ, ১৪৯ ; 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ১৭৯। তুলনীয় 'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার', ৯ম খণ্ড, ১৯০৮, পৃ ৩৬। বিহারের জন্য, ফিচ্ : রাইলি, ১১০ ; 'আর্লি ট্রাভেলস্', ২৪ ; মার্শাল, ৪১৪। বাংলাতেও আফিম চাষের উল্লেখ আছে (বার্নিয়ে, ৪৪০, মাস্টার, ২য় খণ্ড, ৮১-২) ; 'আইন'-এ 'জব্‌তী' প্রদেশগুলির প্রায় সব 'দস্তুর'-এই এর কথা আছে। মুলতানের জন্য দ্রষ্টব্য পেলসার্ট, ৩১ ; তেভেনো, ৭৭। সেহ্‌ওয়ানের জন্য 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৩৪-৩৬', পৃ. ১২৯। মারোয়াড়ের জন্য, মাণ্ডি, ২৪৭। মেবারের জন্য, মানুচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩২। গুজরাটের জন্য, লিনস্কোটেন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০ ; গোডিন্‌হো, *JASB*, লেটার্স, ৪র্থ খণ্ড (১৯৩৮), পৃ. ৫৪৯-৫০। বেরার-এর জন্য মানুচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৯।

৬৬. মনসেরাৎ, ২১৪ ; লিনস্কোটেন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০ (শুধুমাত্র গুজরাট প্রসঙ্গে)।

৬৭. মে, ১৬৫৯-এ, সিদ্ধির চাষ নিষিদ্ধ করে, গুজরাটের দেওয়ানের কাছে আওরঙ্গজেবের আদেশনামা রক্ষিত আছে 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৭-এ। তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে কুচবিহারের ফৌজদারও এই চাষ বন্ধ করার জন্য একই ধরনের একটি আদেশ পাওয়ার কথা স্বীকার করছেন দেখা যায় ('মাতিমুল ইন্‌শা', পৃ. ১২ ক-খ)। আরও তুলনীয় : Fraser 86, পৃ. ৯২ খ।

১৭ শতক থেকে শস্যের ধরন-ধারনে যেসব উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে, তামাক চাষের সূচনা ও দ্রুত প্রসার তার অন্যতম। 'আইন'-এ কোথাও তামাকের উল্লেখ নেই। কিন্তু বইটি সংকলিত হওয়ার এক দশকের মধ্যেই মক্কাফেরৎ পুণ্যাত্মা তীর্থযাত্রীরা দরবারে এই অভিনব বস্তুটির সংবাদ নিয়ে আসেন। বিজাপুর ফিরতি বাদশাহের জনৈক দূতও আকবরকে একটি চমৎকার, সুগঠিত হুঁকো ('ছিলিম') উপহার দিতে পেরেছিলেন।[৬৮] তামাকের নেশা ছড়িয়ে পড়ল খুব দ্রুত। 'বোধহয় এ ব্যাপারে জাহাঙ্গীরের নিষেধাজ্ঞা ছিল নেহাৎই পোশাকী, আখেরে কোন ফল হয়নি।[৬৯] শাহ্‌জাহানের আমলেই খানদানী লোকজনের বাড়িতে সুগন্ধী জিনিসের মধ্যে তামাকও ঢুকে পড়েছিল।[৭০] তার পরের আমল সম্পর্কে একজন বলেছেন যে. "মুসলমানরা এ বস্তুটি প্রচুর পরিমাণে" ব্যবহার করে।[৭১] আরেকজন লেখক আবার আক্ষেপ করেছেন, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলের গায়েই এই ছোঁয়াচ লেগেছে।[৭২] তিনি আরও অভিযোগ করেছেন যে গোড়ায় ফরঙ্গ (ইউরোপ) থেকে তামাক আসত খুব অল্প, তাই খুব একটা চল ছিল না। কিন্তু চাষীরা শেষ অবধি এত উৎসাহ নিয়ে এর চাষ শুরু করল যে তামাক আর সব ফসলকে টেক্কা দিতে লাগল। তাঁর মতে এই পরিবর্তন দেখা দেয় জাহাঙ্গীরের আমলে।[৭৩] এ কথা যে অনেকটাই সত্য তা এই ঘটনা থেকেই দেখা যায়: ১৬১৩ সালের মধ্যে সুরাটের আশপাশের গ্রামগুলিতে তামাক চাষ হতো "প্রচুর পরিমাণে",[৭৪] আর টেরিও বলেছেন, তাঁর সময়ে "পর্যাপ্ত" তামাক বোনা হতো।[৭৫] অল্প দিনের মধ্যেই এর চাষ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ১৭ শতকের মধ্যভাগের দুটি রাজস্ব বিষয়ক পুস্তিকায় সম্ভল এবং বিহারের মতো দূর এলাকাতেও তামাক চাষের কথা আছে।[৭৬]

৬৮. আসাদ বেগ তাঁর স্মৃতিকথায় এই ঘটনার বেশ বিস্তারিত একটি বিবরণ রেখে গেছেন (Or. 1996, পৃ. ২১ ক-খ)।

৬৯. 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ১৮৩। সুজান রায়, ৪৫৫-৫৬, বলেছেন যে, লাহোরে এই আদেশ অমান্য করার জন্য কয়েকজন তামাকপ্রেমীর ঠোঁট কেটে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি এ কথা লিখেছেন ঘটনার প্রায় আশি বছর পরে। তাঁর বক্তব্যের প্রামাণিকতা স্পষ্ট নয়।

৭০. 'বয়াজ-এ খুশবুই', I.O. 828, পৃ. ১১ খ।

৭১. মানুচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৫।

৭২. সুজান রায়, ৪৫৪।

৭৩. ঐ।

৭৪. 'লেটার্স রিসিভ্‌ড্‌', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৯-৩০০। ঐ একই এলাকায় তামাক চাষের জন্য ফ্রায়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৬ তুলনীয়। গোলকুণ্ডাতেও তামাক চাষ ছড়িয়ে পড়ে মেথোল্ড-এর সময়ের (১৬১৮-২২) "কয়েক বছর" আগে ('রিলেশনস্‌', ৩৫-৩৬)।

৭৫. 'আর্লি ট্রাভেলস্‌', ২৯৯। তিনি বলেছেন ('লেটার্স রিসিভ্‌ড্‌', থেকে যা মনে হয়) চাষীরা তখনও "তামাক গাছের রোগ সারাতে পারত না, আর ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ)-এর মতো তামাক কড়া করতে জানত না।" তুলনীয়: মেথোল্ড, 'রিলেশনস্‌', ৩৫-৬।

৭৬. 'দস্তুর-আল-আমল-এ নভিসিন্দী', পৃ. ১৮২ ক-খ; 'দস্তুর-আল-আমল-এ আলমগীরী', পৃ. ৩৬ খ।

অভিজাত এবং শিষ্ট সমাজে পানীয় হিসেবে কফিও বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছিল।[৭৭] এর আমদানি হতো আরব উপদ্বীপ ও আবিসিনিয়া থেকে মোচা-র ভেতর দিয়ে। ভারতের জলহাওয়ায় তখনও এটি অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি।[৭৮] তবুও দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে এক জাতের কফি চাষ হচ্ছিল, যদিও লোকে তা খেয়ে খুশি হতে পারেনি বলেই মনে হয়।[৭৯] তখনও লোকে চা-এর কথা জানত না, কোথাও চাষও হতো না,[৮০] এমনকি আসামেও নয়।[৮১] তবে বিনা আবাদেও নিশ্চয়ই সেখানে চা জন্মাত।

ভারতে যত জিনিস উৎপন্ন হতো, মশলার মধ্যে মরিচ ছিল ব্যবসায়িক দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পিপুল হতো প্রধানত বাংলায়, তবে সবচেয়ে ভালো জাতের গোল বা কালো মরিচ পাওয়া যেত মুঘল সাম্রাজ্যের সীমার বাইরে, পশ্চিমঘাট পর্বতমালায়।[৮২] আজকাল খুব ব্যাপকভাবে বড় লংকা বা লাল লংকার চাষ হয়। যে-কোন ভারতীয় খাবারে এটি থাকবেই। মুঘল ভারতে কিন্তু এর কথা জানা ছিল

৭৭. ওভিংটন, ১৮০। কফি বা 'কহ্ওয়' আবিষ্কারের কথা আছে 'হফ্ৎ ইকলিম', ১৪-ব। কিন্তু 'আইন'-এ বা শাহ্জাহানের আমলের 'বয়াজ-এ খুশবুই'-তে পানীয়টির উল্লেখ নেই। সুতরাং কফি সম্ভবত জনপ্রিয় হয়েছিল ১৭ শতকের শেষের দিকে। মনে হয়, আওরঙ্গজেবের আমলের শেষ দিকে একে দরবারে পেশ করার যোগ্য উপহার হিসেবে গণ্য করা হতো ('অখবারাৎ' ৪৪/২৬৯ ও ৪৯/২৫)। মধ্য-১৮ শতকের বই, 'মিরাৎ-আল ইস্তিলাহ্', পৃ. ২১৮ ক-তে কফির বীজ এবং পানীয়টির সযত্ন বিবরণ আছে।

৭৮. তাভার্নিয়ে, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০; ওভিংটন, ১৮০; 'মিরাৎ-আল ইস্তিলাহ্', পৃ. ২১৮ ক।

৭৯. 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৫৫-৬০', পৃ. ২৪১। মামুরি, পৃ. ২০২ ক (খাফী খান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০১)-য় ১৭০২ সালে আওরঙ্গজেব-অধিকৃত খেলনা দুর্গের চারপাশের গাছপালার মধ্যে কফি গাছেরও উল্লেখ আছে।

৮০. 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬৫৫-৬০', পৃ. ২৭৬, ওভিংটন, ১৮১।

৮১. 'ফথিয়া-এ ইব্রিয়া'-য় এই রাজ্যটির বিশদ বিবরণ আছে; কিন্তু সেখানে চা-জাতীয় কিছুর উল্লেখ নেই।

৮২. পিপুল হতো বাংলায়, দ্রষ্টব্য 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯০; 'হফ্ৎ ইক্লিম', ৯৪, ৯৭; ফিচ্: রাইলি, ১৮৯, 'আর্লি ট্রাভেলস্', ৪৬, বার্নিয়ে, ৪৪০; বাউরি, ১৩৪। কুচ (কুচবিহার)-এ ('হফ্ৎ ইকলিম', ১০০) এবং চম্পারণ (বিহার)-এর জঙ্গলেও এটি পাওয়া যেত ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৭)। একমাত্র তাভার্নিয়ে, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২, বলেছেন যে, "মহান্ মুঘলদের এলাকার বাইরে না গিয়েও এটি (পিপুল) যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় গুজরাট রাজ্যে।" কিন্তু গুজরাটের উৎপাদনের চেয়ে পুনঃরপ্তানির কথাই বোধহয় তাঁর মাথায় ছিল। বিজাপুর, কানাড়া ও কেরলে উৎপন্ন গোলমরিচের জন্য লিনস্কোটেন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬, ৬৭, ৭১-৭৪; ফিচ্: রাইলি, ১৮৬, ১৮৮, 'আর্লি ট্রাভেলস্', ৪৫, ৪৬; 'ফ্যাক্টরিস ১৬২২-২৩', পৃ. ৫১; ১৬২৪-২৯, পৃ. ২-৩; ১৬৩৪-৩৬, পৃ. ২১২; ১৬৩৭-৪১, পৃ. ৯৩; ১৬৬৮-৬৯, পৃ. ১১২, ২২৪-৫; তাভার্নিয়ে, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১; ক্রায়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৯, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২; মামুরি, পৃ. ২০২ক।

না। এটিকে আমাদের দেশের জলহাওয়ায় অভ্যস্ত করানো হয়েছে ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময়ে।[৮৩]

পানচাষের ক্ষেত্রে আজকের তুলনায় খুব সামান্য তফাৎ নজরে পড়ে। তখনও প্রায় সারা ভারতে জুড়েই পানের চাষ হতো।[৮৪] হয়তো উন্নত যানবাহন ব্যবস্থা এই চাষ বাড়াতে অনেক সাহায্য করেছে। কিন্তু আমাদের কাছে তার কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই।

শুধু বিক্রির জন্যই জাফরান ফলানো হতো। এখানকার মতো, তখনও কিন্তু এর চাষ হতো শুধু কাশ্মীরেই।[৮৫]

মুঘল ভারতে সব্জীর চাষ হতো বেশ ব্যাপকভাবে। শহরের চাহিদা মেটানোর জন্য তারই কাছাকাছি ছোট ছোট জমিতে সব্জী চাষ করার বাড়তি উৎসাহ পাওয়া যেত। আর ভারতীয় সামাজিক কাঠামোর যা বৈশিষ্ট্য : 'মালী' নামের এক বিশেষ জাতের লোক শুধু এই কাজেই হাত পাকিয়েছিল।[৮৬] সব্জীর মধ্যে রাঙা-আলু ও

৮৩. সবচেয়ে সাধারণ দুটি প্রজাতি 'কাপসিকুম ফ্রুতেসেন্স' এবং 'কাপসিকুম আন্নুম' আদতে দক্ষিণ আমেরিকার জিনিস (ওয়াট, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪-৫, ১৩৭-৮ ইত্যাদি)। ১৭৬২-৬৩ তে লিখতে বসে আজাদ বিলগ্রামী লঙ্কা বা 'মিরচ-এ সুর্খ' চালু হওয়ার একটি কৌতূহলজনক বিবরণ দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন হিন্দুস্তান (অর্থাৎ উত্তর-ভারত)-এ দশ-বিশ বছর আগেও এর কথা কেউ জানত না। মারাঠারা ছিল ভীষণ লঙ্কার ভক্ত। তারাই এটি হিন্দুস্তানে নিয়ে আসে। তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, "হিন্দুস্তানের কিছু লোক" এখন তাদের খাবারে লঙ্কা ব্যবহার করতে শিখেছে। ('খিজানা-এ আমীরা', নবল কিশোর, কানপুর, ১৮৭১, পৃ ৪৮)।

৮৪. পান চাষের জন্য 'আইন', পৃ. ৮০-৮২ এবং কৃষিবিষয়ক রচনা, I.O. 4702, পৃ. ২৭ ক-খ দ্রষ্টব্য। নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলির পান 'আইন'-এ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা বা প্রশংসা করা হয়েছে : বাংলা (যেখান থেকে 'বাংলা' পাতা আসত) (১ম খণ্ড, ৮০), ওড়িশা (১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯১), বিহার (মঘী) (১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৬), বেনারস (কপুরকান্ত) (১ম খণ্ড, পৃ. ৮০), আগ্রা প্রদেশ (১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪১), বিশেষত অল্রি (গোয়ালিয়র-এর কাছে) (১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৯), মালব (১ম খণ্ড, পৃ ৪৫৫), বিশেষ করে সরঙ্গপুর 'সরকার'-এ বাজলপুর (১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬২) এবং খান্দেশ (১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৩)। অন্যান্য লেখাপত্রেও এর অনেক উল্লেখ ছড়িয়ে আছে।

৮৫. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৪৮; 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৮, ৫৬৫, ৫৭০; 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', পৃ. ৪৫, ২৯৬, ৩১৫; পেলসার্ট, ৩৫, ৩৬।

৮৬. 'ওয়াকাই-এ আজমীর', ২৩৫-এর একটি বিবরণ দ্রষ্টব্য : "মালী (অর্থাৎ যে সমস্ত বাগান-কর্মচারীরা টবের গাছ আর আনাজ-পাতি চাষ করে) জাতের বাজা নামে একজন লোক বেগুন ক্ষেত চৌকি দেওয়ার জন্য রাতে (আজমীর) শহরের বাইরে ছিল, চোরেরা তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়, ইত্যাদি।" হাসানপুর (রোহিলখণ্ড) শহরের আশেপাশে বেগুন ক্ষেতের জন্য আনন্দ রাম মুখলিস-এর 'সফরনামা-এ মুখলিস', পৃ. ৩৭ দ্রষ্টব্য। মালী জাতের জন্য দ্রষ্টব্য 'তসরীহ্-আল আকওয়াম', পৃ. ২৩১ খ-২৩৩ ক।

সাধারণ আলুর প্রচলনই বোধ হয় মুঘল আমলের পর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন।[৮৭] বিভিন্ন ধরনের খাম-আলুর কথা অবশ্য জানা ছিল।[৮৮] দখিন-এর কতক অংশে এবং সম্ভবত উত্তর ভারতেও এটি ছিল লোকের প্রিয় খাদ্য।[৮৯] টমাটো নিশ্চয়ই নতুন এসেছে। কিন্তু এই ক-টি বাদে তখন যেসব সব্জীর চাষ হতো, এখনও কার্যত তা-ই হয়।[৯০] এদের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য কোন-কোন ইউরোপীয় পর্যটকের মনে দাগ কেটেছিল।[৯১]

৮৭. আলুর উৎপত্তি ও ভারতে তার প্রচলনের সমস্যা নিয়ে সবচেয়ে ভালো আলোচনা আছে ওয়াট, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৫-১২২-এ।

৮৮. 'আইন'-এ ফলের মধ্যে দু ধরনের খাম-আলুর উল্লেখ আছে : 'তর্‌রী' ও 'পিণ্ডাল্' (১ম খণ্ড, পৃ. ৭৯-৮০)। দামের তালিকায় প্রথমটি আছে প্রকৃত ফলের মধ্যে; পরেরটিকে দেখা যায় আরেকটি খাম-আলু কাচালু-র সঙ্গে, 'রান্না করে যেসব ফল খাওয়া হয়' তার তালিকায় (১ম খণ্ড, পৃ. ৭০, ৭২)। লিনস্কোটেন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২., বলেছেন : "ভারতে প্রচুর 'ইনিআমো' এবং 'বাতাতা' জন্মায়" ; একই ধরনের মন্তব্য করেছেন কারেরি, ২০৬। ওয়াট, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, দেখিয়েছেন যে লিনস্কোটেন-এর 'ইনিআমো' ও 'বাতাতা' আসলে বিভিন্ন জাতের খাম-আলু এবং তাঁর 'বাতাতা' মানে রাঙা আলু নয়। সেই সময়ের ইংরেজি রচনায় 'পটাটো' মানে ছিল রাঙা আলু বা সাধারণ আলু ('অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিক্‌শনারি', ৭ম খণ্ড, 'পি', পৃ. ১১৮৪-৫)। কিন্তু ইংরেজ পর্যটকরা, মনে হয়, শব্দটি খাম-আলু বোঝাতেও ব্যবহার করেছিলেন, তাই লিনস্কোটেন-এর মতো খাম-আলু আর রাঙা আলু গুলিয়ে ফেলেছিলেন। গোলকুণ্ডায় মেথোল্ড "আলুর স্তূপ" দেখেছিলেন ('রিলেশনস্', ৮) আর টেরি, 'আর্লি ট্রাভেলস্', ২৯৭, ভারতে আবাদী "ভালো কন্দে"র তালিকায় আলুকেও রেখেছেন।

৮৯. ফ্রায়ার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬, দেখেছিলেন, কানাড়ায় "আলু (খাম-আলু ?) সাধারণত তাদের (জনগণের) ভূরিভোজ"। তাঁর বই-এর ১৬৫৫-র সংস্করণে টেরি যোগ করেছেন, ১৬১৭ সালে আসফ খানের একটি ভোজসভায় "চমৎকার করে থালা সাজিয়ে আলু" পরিবেশন করা হয় (লণ্ডন, ১৭৭৭, পৃ. ১৯৭ ; 'আর্লি ট্রাভেলস্', ২৯৭, টীকা)। স্মৃতি বোধহয় তাঁকে ছলনা করেছে, কারণ 'আইন' (১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫-৫৮) বা 'বয়াজ-এ খুশবুই', পৃ. ৯৬ ক-১০৩ খ-তে সুখাদ্যের তালিকায় খাম-আলুর উল্লেখ নেই। অন্যদিকে, এও সম্ভব যে, বাদশাহী খানাপিনায় বা খানদানী বাড়িতে ব্যবহারের পক্ষে খাম-আলুকে বড়ই স্থূল জিনিস মনে করা হতো, কারণ সাধারণত এটি ছিল গরীবদের খাদ্য।

৯০. তখন বাজারে যেসব সব্জী পাওয়া যেত তার সবচেয়ে বিশদ তালিকা পাওয়া যাবে 'আইন'-এ (১ম খণ্ড, ৬৩-৪ ও ৭২-৩); সেখানে প্রকৃত সব্জী এবং 'রান্না করে খাওয়া হয় এমন ফল' এই দুটি ভাগ করা আছে।

৯১. টেরি, 'আর্লি ট্রাভেলস্', পৃ. ২৯৭ ; পেলসার্ট, ৪৮ ; মাণ্ডি, ৩১০ ; মানুচি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬ ; ফ্রায়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৭-৮ ; কারেরি, ২০৬।

৯২. দোহাদ হয়ে গুজরাট যেতে পথে পড়ত আম, খীরনী আর তেঁতুলের জঙ্গল ('তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ২০৫); আর সিরোহীর দিক থেকে ঐ প্রদেশে ঢুকতে গেলে পড়ত "খীরনী, পীলু

স্বাভাবিকভাবেই সবচেয়ে বেশি রকমফের দেখা যায় ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে। জঙ্গলে অনেক বুনো ফল হতো, শুধু গরীবরাই পেটের দায়ে সেসব কুড়ত।[৯২] কৃষকরা ঋতুবিশেষে আরও কিছু কিছু ফলের (বিশেষ করে খরমুজের) চাষ করতেন।[৯৩] আরও ভালো জাতের ফল (যেমন, বাছাই-করা আম) ধরে এমন সব গাছ সাধারণত সযত্নে সারি করে বাগানে লাগানো হতো।[৯৪] চাষীদেরও হয়তো বাগান ছিল,[৯৫] তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বোধহয় বাগানের মালিক হতো আরও ধনী লোক। এখনও যেমন হয়, মরসুমের সময় চাষী কিংবা পেশাদার ফলওয়ালাদের তারা বাগান ভাড়া দিত।[৯৬] খানদানী লোক এবং রাজকর্মচারীদেরও ফলের বাগান ছিল। তারা নিজেরাই শুধু এর ফল খেত না, মুনাফা করার জন্য বিক্রিও করত।[৯৭] মুসলমান হলে এদের অনেকেই নিজেদের কবর তৈরি করত ফলবাগানের মধ্যে। বাগানের আয় থেকেই তাদের বংশধরদের বা কবরের পাহারাদারদের ভরণপোষণ চলে যেত।[৯৮]

ইত্যাদির" এবং আমের "সুন্দর বন" (মান্তি, ২৬০-৬২, ২৬৫)। "বুনো খেজুর গাছ" গজাত ভরোচ ও সুরাটের মধ্যে (ফিঞ্চ, 'আর্লি ট্রাভেলস্', ১৭৫)।

৯৩. 'আইন'-এর 'দস্তুর'-এ বিলায়তী (মধ্য এশীয়) এবং ভারতীয়—দু জাতের তরমুজই আছে, কিন্তু নিঃসন্দেহে পরেরটি অনেক বেশি চাষ হতো। দখিনে "অসহায় ও নিঃস্ব লোকেরা ফুটি ('খরবুজা-এ গরমা') চাষ করত নদীতীরের বালিতে।" (মামুরি, পৃ. ১৮৪ খ; খাফী খান. ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫)।

৯৪. কৃষি-বিষয়ক রচনায় (I.O. 4702, পৃ. ২৮ খ) সুপারিশ করা হয়েছে যে আমগাছ পুঁততে হবে ফলের বাগানে ('বুস্তান') পরস্পরের সঙ্গে ২৩ গজ দূরত্ব রেখে। আরও দ্রষ্টব্য: মান্তি, ৯৭: "কেরা (এলাহাবাদ প্রদেশের কারা)-র চারপাশে···আমরা দেখেছি ও পার হয়েছি বহু আমবাগান। গাছগুলি মাপ করে সার বেঁধে বসানো।"

৯৫. 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ২৫১-২ থেকে এরকমই মনে হয়। সেখানে বলা হয়েছে, চাষের জমিকে যে ফলের বাগানে পরিণত করবে, তার সব রাজস্ব মকুব করা হবে। Allahabad, 1198 (হিজরী, ১০৮৫)-তে এক গ্রামের দুজন 'মুকদ্দম' (মোড়ল)-এর করা ফলের বাগানের উল্লেখ আছে।

৯৬. এই রকমই ঘটেছিল গোয়ায়। সেখানে পর্তুগীজরা তাদের নারকেল গাছ "ভাড়া দিয়েছিল কানারিনদের"। কোন কোন ভাড়াটিয়ার ভাগে "৩০০, ৪০০ বা তারও বেশি" পড়েছিল (লিনস্কোটেন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭)। মুঘল সাম্রাজ্যেও এমনকি সিরহিন্দ-এর বিরাট বাদশাহী বাগানও ফি-বছর "পঞ্চাশ হাজার টাকায়" ভাড়া দেওয়া হতো (ফিঞ্চ, 'আর্লি ট্রাভেলস্', ১৫৮)।

৯৭. আওরঙ্গজেবের রাজত্বের অষ্টম বছরে একটি বাদশাহী ফরমানে বলা হয়েছে: "১৫. উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং সরকারী চাকুরেরা তাদের নিজেদের বাগানে ও বাদশাহী বাগানে ('সরকার-এ ওয়ালা') সবরকমের সব্জী আর ফল চাষ করে আর দ্বিগুণ দামে সব্জীওয়ালাদের বেচে জোর করে তার দাম আদায় করে" ('মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬১)।

৯৮. পেলসার্ট, ৫; 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, ২৬৩-৪; 'নিগারনামা-এ মুন্সী', পৃ. ২০০ ক, Bodl. পৃ. ১৫৮ ক-খ, Ed. 152 এবং 'দুর্-আল-উলূম', পৃ. ৫৫ খ-৫৬ ক।

ফলের বিষয়ে, বিশেষ করে স্বাদের ব্যাপারে আমাদের তথ্যসূত্রের লেখকরা অনেক কথা লিখে গেছেন। কোথায় সবচেয়ে ভালো জাতের আম ফলে,[৯৯] নারকেল কত কাজে লাগে[১০০] ইত্যাদি বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য কিন্তু এখনও সমান সত্য। আমাদের আলোচ্য পর্বে ও তার পরে বাগান করার রীতিনীতি ও ফলনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তনও হয়েছে। সেদিকে নজর দেওয়াই সবচেয়ে ভালো। আমেরিকা থেকে পর্তুগীজদের মারফৎ যেসব নতুন ধরনের ফল-গাছ এসেছিল—তার থেকেই এই পরিবর্তনের সূচনা। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল আনারস ('আনানস সাতিভা')। অতি দ্রুত এটি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। গোড়ায় এর ফলন হতো শুধু পর্তুগীজ-অধিকৃত পশ্চিম-উপকূলে,[১০১] কিন্তু ১৬ শতকের শেষ দিকে বাংলা,[১০২] গুজরাট এবং বগলানাতেও[১০৩] এর চাষ এতই চালু হয়ে যায় যে, আনারস এসব অঞ্চলের প্রধান উৎপাদনের মধ্যে গণ্য হতে থাকে। আবুল ফজলের বর্ণনায়[১০৪] ভারতীয় ফলের মধ্যে এটি অন্যতম; জাহাঙ্গীরের আমলে আগ্রার রাজ-বাগানে প্রতি বছর হাজার হাজার আনারস সংগ্রহ করা হতো।[১০৫] পেঁপে এবং কাজুবাদামও আমদানি হয়েছিল একই জায়গা থেকে, কিন্তু ছড়াতে সময় লেগেছিল আরও বেশি।[১০৬] পেয়ারা চালু হয় সম্ভবত আলোচ্য পর্বের পরে।[১০৭]

৯৯. 'আইন'-এ নির্দিষ্ট করে বলা আছে (১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫-৭৬): বাংলা, গুজরাট, মালব, খান্দেশ ও দখিন।

১০০. "সারা দুনিয়ায় এই গাছটির চেয়ে লাভজনক এমন আর কোন গাছ নেই" (সিজার ফ্রেডরিক, 'পুর্চাস', ১০ম, পৃ. ৯১)। তুলনীয় 'আইন', ১ম খণ্ড. পৃ. ৭৯, মানুচি, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৫-৬ ইত্যাদি।

১০১. লিনস্কোটেন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯, 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', পৃ. ১৭৩; পি. দেল্লা ভাল্লে, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪-৫। লক্ষণীয় এই যে, ফার্সীতে ও স্থানীয় উপভাষাগুলিতে ফলটির ব্রাজিলীয় নাম 'আনানস' গৃহীত হয়েছে।

১০২. 'হফ্‌ৎ ইকলিম', ৯৪। আরও তুলনীয় 'আলমগীরনামা', পৃ. ৬৯১-২, বার্নিয়ে, ৪৩৮, মানুচি, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৩। ১৭ শতকের ষাটের দশকে খুব ভালো জাতের আনারস ফলতে দেখা যেত আসামে ('ফথিয়া-এ ইব্রিয়া', পৃ. ৩২ খ)।

১০৩. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৮, ৪৯২।

১০৪. ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯, ৭৬।

১০৫. 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', পৃ. ১৭৩।

১০৬. পি. দে. ভাল্লে (১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪-৫) এ দুটি ফলের স্বাদ নিয়েছিলেন দমনে, ১৬২৩ সালে। তিনি অবশ্য একটু বেশি এগিয়ে আম এবং 'জিআম্বো' (হয় 'ইউজেনিয়া জাম্বোলানা' নয় 'ইউজেনিয়া জাম্বোস') দু-এরই মার্কিন উৎপত্তির কথা বলেছেন। লিনস্কোটেন, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭, ইতিমধ্যেই পর্তুগীজ-অধিকৃত এলাকায় কাজু-বাদাম জন্মাতে দেখেছিলেন এবং লক্ষ্য করেছিলেন এটি ব্রাজিল থেকে এনে পোঁতা। তেভেনো, পৃ. ১০২, সুরাট থেকে আওরঙ্গাবাদের পথে কাজু গাছ হতে দেখেছিলেন।

১০৭. এ কথা উল্লেখ করা যায় যে সমসাময়িক লেখাপত্রে, যেমন, 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩ বা পূর্বোল্লিখিত কৃষি-বিষয়ক রচনায় (I.O. 4702, পৃ. ১৬ খ-১৭ ক) 'আমরূদ' মানে নাসপাতি, পেয়ারা নয়। পেয়ারাকেও আমরূদ বলা শুরু হয় অনেক পরে।

দ্বিতীয়ত, দরবারের লোকজন ও খানদানী লোকেরা তাদের বাগানে প্রায় সব জাতেরই ফল ফলানোর জন্য প্রচুর চেষ্টা করত।[১০৮] মধ্য এশিয়ার ফল ভারতে ফলানোর চেষ্টা শুরু হয় বাবুরের সময়ে :[১০৯] তাঁর নাতির আমলে দাবি করা হয় যে আগ্রার চারপাশের জমিতে তুরাণ ও ইরাণের মতোই ভালো তরমুজ ও আঙুর ফলছে।[১১০] কিন্তু এই সাফল্য আটকে ছিল শুধু রাজ-বাগান আর অভিজাতদের বাগানেই। অনেক সময়েই এসব বাগান দেখাশোনা করতেন মধ্য-এশিয়ার মালীরা[১১১] আর ক্রমাগত বীজ আমদানি হতো বিদেশ থেকে।[১১২] এছাড়া সেচের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা তো ছিলই।[১১৩] তাহলেও এই বাগান করার প্রতিযোগিতা থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ রীতিও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আকবরের আমলের আগে কাশ্মীরে চেরীর ফলন হতো না। কিন্তু তাঁর সময়ে মহম্মদ কুলী আফসার কাবুল থেকে এই গাছটি কলম করে নিয়ে আসেন। এই পদ্ধতিতে প্রচুর খোবানি হতে শুরু করে। আগে এর খুব অল্প গাছই ছিল।[১১৪] সম্ভবত মর্যাদার খাতিরেই কলম করার রীতি রাজ-বাগানের বাইরে যেতে পারেনি। কিন্তু, "সাধারণ ও অসাধারণ" সব রকম লোকের ক্ষেত্রেই, কলম করার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন শাহ্‌জাহান। ব্যাপক প্রয়োগে এর থেকে ভালো ফল পাওয়া গিয়েছিল। কোলা এবং নারঙ্গী জাতের কমলালেবুর মানও তাই খুব উন্নত হয়েছিল।[১১৫] আমের ক্ষেত্রেও এই রীতি প্রয়োগ করা হয়।[১১৬] কলম করার এই কায়দা সত্যই কতটা নতুন আর কতটা পুরনো নীতি

১০৮. কিরানায় (দিল্লী ও সিরহিন্দ-এর মধ্যে) মুকর্‌রব খানের বাগানের আমের প্রশংসা করে মুতামদ খান বলেছেন যে, মুকর্‌রব খান "আমের বীজ আনিয়েছিলেন দখিন, গুজরাট ও আরও দূর দূর এলাকা থেকে। যেখানকার আম সম্বন্ধেই তিনি কোন প্রশংসা শুনেছেন, সেখান থেকেই আঁটি আনিয়ে তিনি এখানে পুঁতেছিলেন।" মুতামদ খান আরও বলেছেন যে, ১৪০ বিঘা বা ৮৪ একর জুড়ে এই বাগানে ছিল "বহুসংখ্যক গাছ যাদের জন্ম গরম এবং ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়" ('ইক্‌বালনামা-এ জাহাঙ্গীরী' নবল কিশোর সম্পা., ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৭)।

১০৯. 'বাবুরনামা', অনু. বেভারিজ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৮৬।

১১০. 'আইন', ১ম খণ্ড, ৪৪১, ২য় খণ্ড, ৬। আরও তুলনীয়. 'মআশির-এ রহিমী', বিবিলিও-থেকা ইণ্ডিকা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০৪।

১১১. 'বাবুরনামা' থেকে তাই মনে হয় (পূর্বোক্ত সূত্র), 'আইন', ২য় খণ্ড, পৃ. ৬, এবং সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ১০২ ক ; Or. 1671, পৃ. ৫৬ ক।

১১২. পেলসার্ট ৪৮ ; বার্নিয়ে, পৃ. ২৪৯-৫০।

১১৩. মুঘল বাগানে জলের ব্যবস্থা স্বাভাবতই বিখ্যাত। এমনকি রো-ও স্বীকার করেছেন, "যত চমৎকার ও কৃত্রিম উপায়ে জলের ব্যবস্থা কাম্য, রাজা ও অভিজাতবর্গের নিজেদেরই তা আছে।" ('লেটার্স রিসিভড্‌', খণ্ড ৬, পৃ. ২৬)। আরও দ্রষ্টব্য সি. এম ভিলিয়র্স স্টুয়ার্ট, 'গার্ডেনস অফ দা গ্রেট মুঘল্‌স্‌', লণ্ডন, ১৯১৩, পৃ. ১৪-১৫ ও অন্যত্র।

১১৪. 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ২৯৯।

১১৫. সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ১০২ ক ; Or. 1671, পৃ. ৫৬ ক।

১১৬. I.O. 4702, পৃ. ২৮ ক-খ।

অনুসরণ করে নতুন পরীক্ষা—তা বলা শক্ত।[১১৭] বার্নিয়ের মন্তব্য থেকে মনে হয়, কাশ্মীরে ১৭শ শতকের ষাটের দশকে হয় এই পদ্ধতি আদৌ কাজে লাগানো হতো না, বা হলেও হতো খুবই অযত্নে। প্রথম এটি পরখ করা হয়েছিল কাশ্মীরেই।[১১৮]

সবাই জানেন, গত একশ বছরে রেশমগুটির চাষ ভারতে খুবই কমে গেছে। মুঘল সাম্রাজ্যে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি রেশম উৎপন্ন হতো বাংলায়।[১১৯] আসাম,[১২০] কাশ্মীর[১২১] এবং পশ্চিম উপকূলেও[১২২] রেশমগুটি চাষের চল ছিল। উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে একমাত্র তাভার্নিয়ের লেখা থেকে একটা আনুমানিক হিসেব পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, বাংলার কাশিমবাজার একাই ২২,000 গাঁট যোগান দিতে পারে। তাঁর হিসেবে এক গাঁট মানে ১00 'লিভ্র্'। কিন্তু এই সমীকরণটি ঠিক কিনা সন্দেহ। ২২,000 গাঁট মানে তাহলে ৩·১ বা ২·৪ মিলিয়ন—এর যে কোন একটা হতে পারে।[১২৩] ১৯১৭ সালের আনুমানিক হিসেবে ভারতে মোট রেশম উৎপাদন হতো ৩ মিলিয়ন পাউণ্ড। এর সঙ্গে তাভার্নিয়ের হিসেবের তুলনা করা

১১৭. এই রীতি অবশ্য চালু ছিল পারস্য এবং মধ্য এশিয়ায়। সদ্য-উল্লিখিত কৃষি-বিষয়ক রচনায় এই পদ্ধতি বিশদভাবে আলোচনা করা আছে; তুঁত গাছের ওপর ডুমুর গাছ, নাসপাতির ওপর আপেল, কুলের ওপর পীচ, বাদামের ওপর খোবানি ও আপেলের ওপর আঙুরলতা কলম করার ব্যাপারেও পরামর্শ দেওয়া আছে। এই সমস্তই অবশ্য নেওয়া হয়েছে একটি বহু পুরনো বই 'রিসালা-এ ফলাহৎ' (Add. 1771, পৃ. ১৫৭-২৬৯ ইত্যাদি) থেকে। বইটি লেখা হয়েছিল পারস্যে।

১১৮. বার্নিয়ে, ৩৯৭।

১১৯. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯০ ; 'হফ্‌ৎ ইকলিম', ৯৪, ৯৭ , বার্নিয়ে ২০২, ৪৩৯, ৪৪১ ; মাস্টার ২য় খণ্ড, ৮১-২ ; বাউরি, ১৩৩। বাংলার রেশম পারস্য বা সিরিয়ার রেশমের মতো অত ভালো জাতের না হলেও দাম ছিল অনেক শস্তা। মনে করা হতো, "ভালো বাছাই ও যত্ন করে তৈরি করা হলে" এর মানও উন্নত হতে পারে (বার্নিয়ে, ৪৩৯-৪০)। খসখসে ধরনের রেশম, তসর এবং এরিণ্ডি বা 'এরি'ও বাংলায় চাষ করা হতো। শেষেরটি হতো প্রধানত ঘোড়াঘাটে (মাস্টার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮১ ২, ২০২)। ওড়িশাতেও ছিল "প্রচুর পরিমাণে" এরি রেশম। সেখানে এর চাষ হতো না, কিন্তু বলা হয়েছে এটি "জন্মাত বনের মধ্যে, মানুষের কোন শ্রম ছাড়াই" (সিজার ফ্রেডরিক, 'পুর্চাস', ১০ম খণ্ড, পৃ. ১১৩)।

১২০. তাভার্নিয়ে, ২য় খণ্ড, ২২০। তিনি সম্ভবত তসরের কথা বলেছেন। 'কুচ' বা কুচবিহারেও রেশম হতো ('হফ্‌ৎ ইক্‌লিম', ১০০)।

১২১. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬২-৩ ; 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ৩০০।

১২২. 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬৬৮-৯', পৃ. ৯১।

১২৩. তাভার্নিয়ে, ২য় খণ্ড, পৃ. ২। ওলন্দাজদের নথিপত্র অনুসারে বাংলার রেশমের এক গাঁটের ওজন ছিল ১৪৩ পাউণ্ড। সে আমলের ১০০ ফরাসি 'লিভ্র্' ১০৯ আভোয়ারডুপোয়াজ পাউণ্ডের চেয়ে কম হতো। পরিশিষ্ট 'খ' দ্রষ্টব্য।

যায়।[১২৪] সম্ভবত বাংলার প্রধান বাজারে যা যোগান আসত তিনি শুধু তার কথাই ধরেছেন, সেখানকার রেশম উৎপন্নের পুরো হিসেব ধরেননি।[১২৫] উৎপন্ন রেশমের পরিমাণ তাহলে আমাদের আলোচ্য পর্বের তুলনায় চূড়ান্তভাবেই কমে গেছে বলে মনে হয়, মাথাপিছু আপেক্ষিক উৎপাদন তো কমেইছে।

লাক্ষা শিল্পও ছিল মুঘল যুগের লক্ষণীয় পেশা, কিন্তু এখনকার চেয়ে অবস্থার বিশেষ কিছু তফাৎ ছিল—এমন কোন নজির নেই।[১২৬]

গবাদি পশু ও অন্যান্য ভারবাহী প্রাণীর ক্ষেত্রে, ১৭ শতকের কৃষকের অবস্থা তাঁর এখনকার বংশধরদের তুলনায় অনেক ভালো ছিল। সে সময়ে আবাদের প্রসার সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানি তার থেকেই বোঝা যায় যে, পশুচারণের জঙ্গল এবং অহল্যাভূমি—দুই-ই ছিল এখনকার চেয়ে অনেক বিস্তৃত।[১২৭] এমনকি বাংলার মতো ঘন-আবাদী প্রদেশেও জনৈক পর্যটক 'বিরাট পশুপাল' ও তাদের 'চারণভূমি' দেখতে পেয়েছিলেন।[১২৮] গ্রামের দিকে এ দৃশ্য চোখে পড়তই। সমসাময়িক ইউরোপীয়

১২৪. ম্যাক্সওয়েল-লেফ্রয়, 'জার্নাল, রয়্যাল সোসাইটি অফ আর্টস', ১৯১৭, পৃ. ২৯০ ইত্যাদি; মোরল্যাণ্ড, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৭৪, ১৯৫-এ উদ্ধৃত।

১২৫. আশ্চর্যের কথা, তাভার্নিয়ে স্পষ্ট করে এ কথা বলা সত্ত্বেও মোরল্যাণ্ড ('ইণ্ডিয়া…অফ আকবর', পৃ. ১৭৩-৪) তার উল্টো ধারণাই করলেন।

১২৬. বাংলার লাক্ষা ছিল সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে শস্তা এবং হতোও প্রচুর ('ফ্যাক্টরিস, ১৬৩০-৩৩', পৃ. ৩২৩, '১৬৩৪-৬', পৃ. ১৪৬, তাভার্নিয়ে, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮; বার্নিয়ে ৪৪০, বাউরি ১৩২)। তাভার্নিয়ে বলেছেন, আসামেও প্রচুর লাক্ষা হতো (২য় খণ্ড, পৃ. ২২১)। ওড়িশা (বাউরি, ১২১-২) এবং বিহারেও এর চাষ হতো, কিন্তু বিহার অঞ্চলের লাক্ষা না ছিল খুব ভালো, না খুব শস্তা (মাণ্ডি, ১৫১, ১৫৩)। গুজরাটে ('লেটার্স রিসিভ্ড্', ১ম খণ্ড, ৩০: কমিসারিয়েট, 'মান্দেলস্লো', ১৬), বিজাপুর ও মালাবারেও (লিনস্কোটেন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯০, 'ফ্যাক্টরিস, ১৬২৪-২৯', পৃ. ২৫৮) লাক্ষা সংগ্রহ করা হতো। এই ভৌগোলিক বিস্তার আজকের অবস্থার সঙ্গে অনেকটাই মেলে। তফাৎ শুধু এই যে, আলোচ্য পর্বের কোন তথ্যসূত্রে বৃটিশ 'মধ্য প্রদেশ' অঞ্চলে লাক্ষা চাষের কোন উল্লেখ নেই। এই অঞ্চলে এখন লাক্ষা হয় "প্রচুর" (তুলনীয় ওয়াট, ঐ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৭০)। লাক্ষা থেকে এক ধরনের লাল রঞ্জক পাওয়া যেত এবং খাম-আটকানো গালা ও বার্নিশ-এর কাজে লাগত ('লেটার্স রিসিভ্ড্', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০; কমিসারিয়েট, 'মান্দেলস্লো', পৃ. ১৬-১৭; তাভার্নিয়ে, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮, ২২১)। রাসায়নিক রঞ্জনদ্রব্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পড়ে রঞ্জক হিসেবে এর আর কোন মূল্যই নেই।

১২৭. তুলনীয় মোরল্যাণ্ড, 'ইণ্ডিয়া…অফ আকবর', পৃ. ১০৬-৭ এবং রয়্যাল কমিশন অন ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার, 'রিপোর্ট', পৃ. ২০১-২। এও লক্ষণীয় যে, এই অঞ্চলে পেশাদার পশুপালকদের যে চমৎকার চারণভূমি ছিল তরাই জঙ্গলে চাষ-আবাদের প্রসারের ফলে তার পরিমাণ অনেক কমে গেছে (মোরল্যাণ্ড, 'এগ্রিকালচারাল কনডিশনস্ অফ দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস অ্যাণ্ড ডিস্ট্রিক্টস্', পৃ. ২৮-৩১)।

১২৮. মানরিক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৩।

পর্যবেক্ষকরা ভারতের নানান জায়গায় বিরাটসংখ্যক গবাদি পশুর কথা বলেছেন।[১২৯] তবে তার ওপর খুব একটা গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই, কারণ শীতকালে গবাদি পশুদের খাওয়ানো ও বাঁচিয়ে রাখার কোন পদ্ধতি তখনও আবিষ্কার হয়নি, তাই ইউরোপের বেশির ভাগ জায়গাতেই গবাদি পশু ছিল দুর্লভ। কিন্তু আবুল ফজল যখন বলেন যে, লাঙলপিছু চারটে বলদ, দুটো গরু আর একটা মোষের জন্য কোন কর লাগত না,[১৩০] তখন এই ধারণাই হয় যে আজকের তুলনায় তখন সাধারণ চাষীর কাজের জন্য অনেক বেশি গরু-মোষ থাকত।[১৩১] ঘি-এর পর্যাপ্ত পরিমাণ থেকে বোধহয় আরও প্রমাণ হয় যে লোকের মাথাপিছু কর্মরত গবাদি পশুর সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। বলা হয়েছে আগ্রা অঞ্চলে "সাধারণ লোকের খাবার" ছিল ভাতের সঙ্গে মাখন আর আগ্রায় সকলেই তা-ই খেত।[১৩২] একইভাবে, বাংলায় মাখন এত প্রচুর হতো যে তা শুধু [সেখানকার] লোকেই খেত না, রপ্তানিও হতো।[১৩৩] গম এবং জোয়ার-বাজরার অঙ্কে মাখন আজকের তুলনায় অনেক শস্তা ছিল। 'আইন'-এ অবশ্য এর দর গমের চেয়ে ৮·৭৫ গুণ বেশি বলা হয়েছে,[১৩৪] ১৬৬৯-এ আগ্রা থেকে সরকারী সূত্রেও দরের ঐ একই অনুপাত পাওয়া যায়।[১৩৫] মোরল্যাণ্ড-এর হিসেব অনুযায়ী, ১৯১০-১২ সালে

১২৯. লিনস্কোটেন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০-৩০১; 'রিলেশনস্', পৃ. ৬৩, ৮৬; রো, ৬৭; টেরি, 'আর্লি ট্রাভেলস্', পৃ. ২৯৬; পেলসার্ট ৪৯; মানরিক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৩, ৩২৯।

১৩০. 'আইন', ১ম খণ্ড, ২৮৭। যুক্ত প্রদেশে ১৯২৪-৫ সালে জোয়াল পিছু গবাদি পশুর সংখ্যা ছিল ২টি বলদ, ১·১টি গরু এবং একটি মোষ; পাঞ্জাবে ২টি বলদ, ১·৩টি গরু ও ১·৪টি মোষ (এই সংখ্যাগুলি বের করা হয়েছে রয়্যাল এগ্রিকালচারাল কমিশন-এর রিপোর্ট-এ পৃ. ১৮১-১৮২ তে প্রদত্ত সারণিগুলি থেকে)। যুক্তপ্রদেশের জন্য আরও দ্রষ্টব্য, মোরল্যাণ্ড, 'এগ্রিকাল-চারাল কনডিশনস্' ইত্যাদি, পৃ. ২৬-২৭।

১৩১. আওরঙ্গজেব যখন দখিন-এর সুবাদার, আওরঙ্গাবাদ প্রদেশের (যেটির জাগীর তাঁকে দেওয়া হয়েছিল) কয়েকটি পরগনায় কয়েক ঘর নতুন চাষী তাঁদের বলদ নিয়ে বসত করেছিল। এ সম্পর্কে একটি কৌতূহলজনক স্মারকলিপি আছে ('সিলেক্টেড ডকুমেণ্টস অফ শাহ্জাহানস্ রেন', পৃ. ২৪৫)। স্মারকলিপির শীর্ষে বলদের যে মোট সংখ্যা দেওয়া আছে, সম্পাদক সম্ভবত তা পড়তে ভুল করেছেন, কারণ তার তলায় দেওয়া সংখ্যাগুলির সঙ্গে সেটি মেলে না। পরগনাগুলির চাষী ও বলদের মোট সংখ্যা (যেখানে দুটিই পড়া যায়) যথাক্রমে ১৫৮ ও ২৯০। হিসেব করা হয়েছিল যে সিন্ধুপ্রদেশ সমেত বোম্বাইতে ১৯২৪-২৫ সালে ৮·১ জন চাষী (পুরুষ-কর্মী) পিছু ১০টির বেশি বলদ ছিল না (রয়্যাল কমিশন, রিপোর্ট, পৃ. ১৮২)। বিষয়টি আরও লক্ষণীয় এই কারণে যে, ভ্রাম্যমাণ চাষীরাই সাধারণত সবচেয়ে গরীব স্তরে থাকবে—এমনই আশা করা যায়।

১৩২. জে. জেভিয়ার, অনু. হস্টেন, *JASB*, N. S., খণ্ড ২৩, ১৯২৭, পৃ. ১২১।

১৩৩. বার্নিয়ে, পৃ. ৪৩৮, ৪৪০।

১৩৪. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০-৬৫।

১৩৫. 'ম'আশির-এ আলমগীরী', ছাপা বই-এ আছে 'রউগন', তার জায়গায় Add. 19,495, পৃ. ৪৪ খ-তে আছে 'রউগন-এ জর্দ', ঘি-এর এটি আরও যথাযথ প্রতিশব্দ। ১৬৭৮-এর

আগ্রা, দিল্লী এবং লাহোরে ঘি-এর গড় দাম ছিল গমের ১৩·৯ গুণ,[১৩৬] এবং তারপর থেকে দাম প্রায় একই আছে।[১৩৭] অবশ্য ঘি-এর আপেক্ষিক দাম দখিন-এ ততটা বাড়েনি বলেই মনে হয়। গমের দামের সঙ্গে এই অনুপাত বেড়ে সম্ভবত ৭ : ১ থেকে ৯ : ১ হয়েছে।[১৩৮]

এমন মনে হতে পারে যে, প্রচুর ঘাস এবং জাব পাওয়া যেত বলে গবাদি পশুর গড়-পড়তা মানও আরও ভালো হওয়া উচিত। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় গবাদি পশু মেরে ফেলার বিষয়ে চিরাচরিত অনীহা ছিল,[১৩৯] তাই ভালো জাতের পশু প্রজনন সম্ভব হতো বলে মনে হয় না।[১৪০] বাদশাহ্‌দের গোয়ালে যত দুধ হতে

৫ আগষ্ট আজমীর থেকে পাঠানো এক প্রতিবেদনে, ঘি-এর দাম খুবই কম দেখানো হয়েছে—গমের ৫·৫ গুণ। কিন্তু তার কারণ বোধহয় এই যে সেই বছর বৃষ্টি না হওয়ায় গমের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়েছিল ('ওয়াকাই-এ আজমীর', পৃ. ১৪)।

১৩৬. *JRAS*, ১৯১৮, পৃ. ৮২০।

১৩৭. লুধিয়ানার অমৃতসর বাজারে ১৯৩৯-এ ঘি-এর দাম ছিল গমের প্রায় ১৪ গুণ এবং ১৯৫২-য় প্রায় ১৬ গুণ। দোআবের ক্ষেত্রে শুধু নিকৃষ্ট 'দেশী' মোষের ঘি-এর দর পাওয়া যায়। ১৯৫২-য় এমনকি এর (চন্দাউসী) দামও ছিল গম (হাপুর)-এর ১২ গুণ। 'এগ্রিকালচারাল প্রাইসেস্ ইন্ ইণ্ডিয়া, ১৯৫১ ও ১৯৫২', পৃ. ১৩২, ২০০ দ্রষ্টব্য।

১৩৮. আওরঙ্গাবাদ থেকে ২০ মে, ১৬৬১ তারিখের একটি সরকারী প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে, ঘি-এর দাম গমের প্রায় ৭·৫ গুণ ('ওয়াকাই-এ দখিন', ৩৭, ৪৩-৪৪)। ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৬৬২ তারিখের আরেকটি 'নির্খনামা'য় এর দাম গমের ৬·৫ গুণ (ঐ, ৭৫-৭৬; 'দফ্‌তর-এ দিওয়ানী ও মাল ও মুল্‌কী' ইত্যাদি, পৃ. ৭৩, ৭৫)। বর্তমানের অনুপাতটি বের করা হয়েছে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২-তে হায়দ্রাবাদের বাজারে ঘি-এর দামের সঙ্গে গোটা রাজ্যে এবং বিদর জেলায় ফসল তোলার সময়ে গমের দামের তুলনা করে। প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া গেছে 'এগ্রিকালচারাল প্রাইসেস্ ইন ইণ্ডিয়া, ১৯৫১ ও ১৯৫২' এবং এর পরিপূরক 'ফার্ম (হার্ভেস্ট) প্রাইসেস্ অফ প্রিন্সিপ্যাল ক্রপ স্, ১৯৪৭-৪৮ টু ১৯৫১-৫২'য়।

১৩৯. এই সংস্কার সবচেয়ে প্রবল ছিল বাংলা (ফিচ্: রাইলি ১১৯, 'আর্লি ট্রাভেলস্', ২৮), গুজরাট (রো, ৬৭) এবং দখিন ('রিলেশনস্' ১৭; 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৫৫-৬০', পৃ. ২৬১; তাভার্নিয়ে, ২য় খণ্ড, ১৬৯)-এর মতো অঞ্চলে, অবশ্যই বিশেষ করে গো-হত্যার ক্ষেত্রে। আকবর ও জাহাঙ্গীর সরকারীভাবেই গোহত্যায় বাধা দিতেন। উত্তর ভারতে তারও কিছুটা প্রভাব পড়েছিল মনে হয় (পেলসার্ট, ৪৯)। অবশ্য এসব জায়গায় মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক থাকায় মাংসের একটা বড় বাজারও তৈরি হয়েছিল (তুলনীয় তাভার্নিয়ে, ১ম ভাগ, ৩৮)। সিন্ধুপ্রদেশ থেকে চামড়া রপ্তানিও হতো (লিনস্কোটেন, ১ম ভাগ, ৫৬; মানুচি, ২য় খণ্ড, ৪২৭)।

১৪০. অবশ্য এ কথা ঠিকই বলা হয়েছে যে, একটি বিশেষ জাতের পেশাদার পশুপালকদের চেষ্টার ফলেই সবচেয়ে ভালো জাতের গবাদি পশু হতো। এই পশুপালকরা ছিল যাযাবর, এরা গরু চরাতে নিয়ে যেত অনেক দূর-দূরে। চাষ-আবাদের প্রসারের দরুন তাদের পেশা খুবই

পারত[১৪১] তার সর্বোচ্চ সীমাও আজকের ভালো জাতের গরু-মোষের দুধের চেয়ে বেশি ছিল না। একজন ওলন্দাজ পর্যবেক্ষক লক্ষ্য করেছিলেন যে, এখানকার গবাদি পশু তাঁর নিজের দেশের (যেখানে প্রতি শীতের আগে পাইকারী হারে জবাই-এর জন্য তাঁরা নির্মমভাবে কিছু পশু বেছে নিতে বাধ্য হতেন) মতো "অত বেশি দুধ দেয় না"।[১৪২]

ভারতীয় ভেড়ার পশমের মানও ইউরোপীয় পর্যবেক্ষকদের মনে দাগ কাটার উপযোগী ছিল না। এখানকার পশম ছিল মোটা এবং শুধুমাত্র কম্বল বানানোর উপযুক্ত বলেই ধরা হতো।[১৪৩] কাশ্মীরের বিখ্যাত শাল বোনা হতো ছাগলের লোম দিয়ে। লোম আসত লাদাখ ও তিব্বত থেকে।[১৪৪]

আগেই আভাস দেওয়া হয়েছে, মাথাপিছু গবাদি পশুর সংখ্যা যদি আজকের তুলনায় সত্যই বেশি হয়ে থাকে, তবে আশা করা যায় আলোচ্য পর্বে কৃষকরা প্রচুর পরিমাণে গোবর সার পেতেন। তার উপর জঙ্গল ও অহল্যাভূমি আরও বিস্তৃত থাকার দরুন জ্বালানি কাঠ পাওয়া যেত সহজেই। গোবর দিয়ে তাই জ্বালানির কাজ চালাতে হতো না, সার হিসেবে তার আসল কাজেই লাগত।[১৪৫] তবু আগ্রা প্রদেশের মতো ঘন-আবাদী জায়গায় গরীবেরা সাধারণত ঘরের কাজে ঘুঁটেই পোড়াতেন, কারণ এখানে জ্বালানি কাঠ ছিল দুষ্প্রাপ্য।[১৪৬]

মুঘল আমলের পর থেকে যেসব পরিবর্তন হয়েছে তার আলোচনা আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য পর্বের কৃষিজ উৎপাদনের

খর্ব হয়ে গেছে বা পুরোপুরিই লুপ্ত হয়েছে (রয়্যাল এগ্রিকালচারাল কমিশন, 'রিপোর্ট', পৃ. ১৯৮-৯)। ভালো জাতের গবাদি পশুর জন্মস্থান ছিল হিসার। গবাদি পশু চালানদার হিসেবে এই 'চাক্‌লা'-র একটা পুরনো ইতিহাস আছে (দ্র. বালকৃষণ ব্রাহ্মণ, পৃ. ৫৯ খ-৬০ ক। হিসার 'চাক্‌লা' থেকে এক অনামা শাসকের কাছে ৩৪৯ এবং ৬৫২টি 'গাও' (গরু, ষাঁড় এবং / অথবা বলদ)-এর দুটি পাল পাঠানো হয়েছিল। দাম পড়েছিল মাথাপিছু প্রায় ৭½ টাকা)।

১৪১. "গরু প্রতিদিন ১ সের থেকে ১৫ সের (১.৪ থেকে ২০.৭ আভ. পাউণ্ড) দুধ দেয় আর মোষ দেয় ২ থেকে ৩০ সের (২.৮ থেকে ৪১.৫ আভ. পাউণ্ড)"—'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫১। মহুর (বেরার)-এর মোষ দুধ দিত ১ মণ (৫৫.৩২ পাউণ্ড) বা তারও বেশি (প্রতিদিন) (ঐ, পৃ. ৪৭৭)।

১৪২. 'রিলেশনস্', পৃ. ৮৬। এই বক্তব্য শুধুমাত্র গোলকুণ্ডা সম্পর্কে।

১৪৩. টেরি, 'আর্লি ট্রাভেলস্', পৃ. ২৯৭; 'লেটার্স রিসিভড্', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০০।

১৪৪. 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ৩০১। তুলনীয় মহিব্বুল হাসান, 'কাশ্মীর আন্ডার দা সুলতানস্', কলকাতা, ১৯৫৯, পৃ. ২৪৫-৬।

১৪৫. কিন্তু, তুলনীয় মোরল্যাণ্ড, 'ইণ্ডিয়া…অফ আকবর', পৃ. ১০৭। তাঁর মতে, চারণভূমিতে গবাদি পশুর বর্জ্য পদার্থ হয়তো একেবারেই কুড়োনো হতো না, আর অহল্যাভূমি বহু বিস্তৃত হওয়ার দরুন অনেক সারই নষ্ট হতো।

১৪৬. পেলসার্ট, ৪৮; ওভিংটন, ১৮৩।

বিশেষ কয়েকটি দিককে চিহ্নিত করতে সেগুলি সাহায্য করতে পারে। তাই যেসব জায়গায় পরিবর্তন খুবই প্রকট, হয়তো সেগুলি মনে করলে কাজে আসবে। খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে যোগ হয়েছিল কেবল ভুট্টা ও আলু ; নীচুমানের জোয়ারের গুরুত্ব কমে গেছে। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন অবশ্য হয়েছে : খাদ্যশস্যের জায়গায় অর্থকরী ফসলের উৎপাদনে নিযুক্ত জমির এলাকা অনুপাতে বেড়ে গেছে। এই এলাকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কতক ভূখণ্ডে বিশেষ ধরনের শস্য চাষের ব্যাপারটিও ভৌগোলিকভাবে যথেষ্ট কেন্দ্রীভূত হয়েছে। ১৯ শতকে দেখা দিল এক দ্বৈত প্রক্রিয়া : সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় হস্ত-শিল্প, বিশেষ করে তাঁত ধ্বংস হয়ে গেল ; আমাদের কৃষি-অর্থনীতিও পরিণত হলো 'বিশ্বের কারখানা'র কাঁচামাল যোগানের উৎসে।[১৪৭] ঐ একই তাড়নায় নীল ও রেশমগুটির চাষও অবশেষে নষ্ট হয়ে গেল।[১৪৮] তবে মোটের উপর বলা যায়, অঞ্চল ভাগ করে শস্য উৎপাদনের নতুন ব্যবস্থার ফলেই, যার পক্ষে যেটি উপযুক্ত সেই রকম জমিতে চাষবাস্ করা সম্ভব হয়েছে। উল্টোদিকে, মুঘল আমলের প্রবণতা ছিল প্রধান প্রধান শস্যের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দিকে, আর প্রায় সব অঞ্চলেই এই নীতি মানতে হতো। এ ছাড়াও তখন মূলত জোর দেওয়া হতো খাদ্যশস্য উৎপাদনে। অনুকূল বছরগুলিতে, তার ফলে, নিশ্চয়ই অপ্রয়োজনীয় উদ্বৃত্তও পাওয়া যেত। প্রথম অংশের শেষে আমরা সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে, অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে, আবাদী এলাকার একরপিছু গড় উর্বরতা মুঘল আমলের পর থেকে কমে যাওয়ার কথা। এমন যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে, অঞ্চল ভাগ করে চাষ আবাদ করায় উর্বরতা হ্রাসের কুফল অনেকটাই কমে গেছে। অন্যদিকে, এক মুমূর্ষু অর্থনীতির পরিবেশে হঠকারিতা করে চারণভূমি ও বনভূমি দখল করার ফলে পশুপালনের ক্ষেত্রে এক ভয়ংকর সংকট দেখা দিয়েছে। যে-দেশে লাঙল টানা ও জল তোলার জন্য পশুশক্তির ব্যবহার হয়, সেখানে পশুপালনকে অবশ্যই কৃষির অন্যতম প্রধান অবলম্বন হিসেবে গণ্য করা উচিত।

৪. কৃষি সংক্রান্ত হস্তশিল্প

আমাদের আলোচ্য পর্বে কৃষকজীবনের একটি লক্ষণীয় দিক ছিল বিশুদ্ধ কৃষি-কর্মের সঙ্গে কারিগরী কার্যধারার মিলন। গ্রামীণ 'কুটির শিল্পে'র বিনাশ ভারতে বৃটিশ শাসনের অর্থনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম হিংস্র অধ্যায়।[১] গত শতকের

১৪৭. তুলনীয় কার্ল মার্কস, 'ক্যাপিটাল', ১ম খণ্ড; ইং অনু : সম্পা. ডোনা টর, পৃ. ৪৫৩-৪।

১৪৮. মুঘল আমল থেকে যে সব পরিবর্তন হয়েছে তার মধ্যে তামাক এবং আনারস চালু হওয়ার বিষয়টি এখানে ধরা হয়নি, কারণ এগুলির প্রচলন হয়েছিল আসলে ১৭ শতকের গোড়ায়। তারপর থেকে এগুলির মাথাপিছু উৎপাদন কতটা বেড়েছে সে কথা পরিষ্কার নয়। আজকের চা এবং কফি বাগানগুলি বেশির ভাগই পড়ে মুঘল সাম্রাজ্যের সীমানার বাইরে। অন্যদিকে, আফিং এবং সিদ্ধির চাষ প্রায় উঠে যাওয়ার মুখে।

১. রমেশচন্দ্র দত্ত, 'দি ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া আণ্ডার আর্লি ব্রিটিশ রুল', লণ্ডন, ৬ষ্ঠ সং, পৃ. ২৫৬ ইত্যাদি এবং 'দি ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া ইন্ দা ভিক্টোরিয়ান এজ', লণ্ডন,

তথ্যাদি থেকে (যখন পুরনো পদ্ধতির কিছু উপাদান টিঁকে ছিল বা তার কথা মনে ছিল) মুঘল আমলে ঐ সব শিল্পের মোটামুটি একটা ছবি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু নীচের রেখাচিত্রটি মূলত সমসাময়িক তথ্যের ভিত্তিতেই খাড়া করা হয়েছে।

ধরে নিতে হবে যে খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে, উৎপাদনের কাজে চাষীদের ভূমিকা শস্য ঝাড়াই-এর সঙ্গেই শেষ হয়ে যেত।[২] আটা পেষা (হাত দিয়ে) এবং ধান কোটার কাজ সাধারণত বাড়িতেই হতো ; চাষীদের ঘরে শুধুমাত্র নিজের পরিবারের প্রয়োজনটুকু মিটলেই কাজ চুকে যেত।[৩] তথাকথিত 'অর্থকরী ফসলে'র ক্ষেত্রে, চাষীদের হাত থেকে সেগুলো বেরিয়ে, বা অন্তত পক্ষে গ্রামের চৌহদ্দী ছাড়িয়ে, যাওয়ার আগে কিছুটা কারিগরি করতেই হতো—শুধু তৎকালীন কলাকৌশলের জন্যে নয়, পরিবহণের কারণেও তার দরকার পড়ত। চাষীরাই তুলো তুলে তার বীজ ছাড়াত। তারপর সেই তুলো সাফ করত বা ধুনত 'ধুনিয়া' বলে এক বিশেষ শ্রেণীর যাযাবর শ্রমিক।[৪] এর পরে,

১৯৫০, পৃ. ৯৯-১২৩ দ্রষ্টব্য ; আরও দ্রষ্টব্য ডি. আর. গাডগিল, 'দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এভল্যুশন অফ ইণ্ডিয়া', ১৯৪৪, পৃ. ৩৩-৪৭।

২. ঝাড়াই হতো কার্যত এখনকার পদ্ধতিতেই। এর বর্ণনা আছে ফ্রায়ার, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৮-এ। তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন যে, "খোলা মাঠে" জোয়ালে-জোতা বলদ দিয়ে ঝাড়াই হতো। কেন যে তিনি এই রীতিকে "মুর-মেন" অর্থাৎ মুসলমানদের আর "লাঠি" দিয়ে ঝাড়াইকে "জেণ্টু" অর্থাৎ হিন্দুদের রীতি বলেছেন—তা বোঝা যায় না। শস্যবিশেষে এবং অঞ্চলবিশেষে অবশ্যই রীতির হেরফের হয়, কিন্তু কৃষকের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

৩. "ভারতীয় স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের খাবার সাজিয়ে দেয়, জল নিয়ে আসে আর হস্তচালিত কলে শস্য মাড়াই করে। সেই সময়ে তারা গান গায়, গল্প-গুজব করে আর আমোদে থাকে" (ফ্রায়ার, ২য় খণ্ড, ১১৮। আরও তুলনীয় লিনস্কোটেন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৬, ২৬১)। শক্তি-চালিত কল চালু হওয়ায় ভারতীয় মহিলাদের দৈনন্দিন গৃহকর্মের এই সার্বজনীন চিত্রটি এখনই কিছুটা পাল্টেছে। তাও এই পরিবর্তন হয়েছে শুধুমাত্র শহরগুলিতে। 'দস্তুর-আল-আমল-এ আলমগীরী', পৃ. ৫৭ ক-খ-তে ৪ মণ ৪ সের গম পেষার বিবরণ আছে। আটা পাওয়া যেত প্রায় ৪ মণ, আর পেষকের মজুরি ছিল মণপ্রতি ৩ আনা। ঐ একই পুস্তিকায় গমের যে দাম দেওয়া আছে, সে অনুযায়ী মজুরি হয় ৩½ সের গম। সাধারণ গমের আটার ('খুশ্‌কা') দাম ছিল 'আইন'-এর (১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩) গমের সিকিভাগ বেশি। আরও দ্রষ্টব্য 'ওয়াকাই দখিন', ৩৭, ৪২-৪৩, ৭৫, ৭৭-এ দেওয়া দামের তালিকা। ১৬৩০-এ দেখা যায় ইংরেজরা ৭০০০ মণ ধান কেনার প্রস্তাব দিচ্ছে "(ঝাড়াই করলে যা দাঁড়াবে কিঞ্চিদধিক ৪৫০০ মণ চাল)"। ('ফ্যাক্টরিস, ১৬৩০-৩৩', পৃ. ৬২)।

৪. এটি হলো হিন্দী নাম, পদ্ধতিটি পরিচিত ছিল 'ধুন্না' বলে। ধুনুরীর ফার্সী প্রতিশব্দ 'নদ্দাফ'। তেভেনো, ১০, 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬০ এবং 'জাওয়াবিৎ-এ আলমগীরী', Ethe 415, পৃ. ১৮১ খ ; Or. 1641, পৃ. ১৩৬ ক ; Add. 6598, পৃ. ১৮৯ ক থেকে মনে হয় ধুনুরীরা ছিল যাযাবর, সপরিবারে "গ্রাম-গ্রামান্তর" ঘুরে বেড়াত। এই জাতটির বর্ণনা আছে

চাষীদের বাড়িতেই সুতো বোনা হতো।[৫] এইভাবে বিক্রির জন্য তৈরি হয়ে সুতো চলে যেত তাঁতীর কাছে। এখন তার বদলে শেষ গন্তব্যস্থান হয়েছে সুতোর কারখানা। সেইসঙ্গে তাই বীজ ছাড়ানো, তুলো পরিষ্কার ও সুতো বোনার কাজও গ্রাম থেকে অনেকাংশেই বিদায় নিয়েছে। সাধারণত, গাছ থেকে তোলার পর তুলো এখন সরাসরি বীজ ছাড়ানোর কারখানায় চলে যায়। আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রামীণ শিল্প ছিল চিনি ও গুড় তৈরি।[৬] বিদ্যুৎচালিত শোধনাগারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এটিও এখন পুরোদমে পিছু হঠেছে। তৈলবীজ থেকে তেল বের করার কাজও গ্রামের মধ্যেই হতো ; 'তেলী' নামে এক আধা-যাযাবর জাতের লোক সেই আদ্যি কালের বলদ-টানা ঘানিতে এই কাজ করত।[৭] আগ্রা অঞ্চলে, আর কিছু না হোক, নীল থেকে রঙ তৈরি

একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক রচনায়, জেমস স্কিনারের 'তশরীহ্-আল আকওয়াম', পৃ. ৩০২ খ-৩০৩ ক, ১৮২৫-এ লেখা। যেসব ক্ষেত্রে বাজারে তুলো পাঠানো হতো, সুতো নয়, তখন সে তুলো আর ধোনা হতো না, কারণ তুলো তাহলে ফেঁপে উঠবে ও পরিবহণের পক্ষে খুব ভারী হয়ে যাবে ('ফ্যাক্টরিস, ১৬৬৫-৬৭', পৃ. ১৭৪। আরও তুলনীয় ঐ, ১৬৩০-৩৩, পৃ. ১৯-২০)।

৫. "সুতো তৈরি করে বা বোনে গ্রামের বাইরে সবচেয়ে গরীব লোকেরা ; সেখান থেকে এর ব্যবসায়ীরা এসে সুতো নিয়ে যায়।" (ঐ, ১৬৬১-৬৫, পৃ. ১১২)।

৬. সুরাট থেকে আহ্‌মেদাবাদ যাওয়ার প্রসঙ্গে তেভেনো, পৃ. ১০২, বলেছেন, "বহু যায়গায় আখ আছে, আর আছে আখ মাড়াই-এর কল ও চিনি ফোটানোর চুল্লী"। কারেরি, পৃ. ১৬৯, বর্ণনা করেছেন, "আখ মাড়াই হয় দুটি বিরাট কাঠের বেলনার মাঝে। সেগুলি বলদ দিয়ে ঘোরানো হয় আর ভালোভাবে পেষার পর রস বেরিয়ে আসে।" কাঠের বেলনার জায়গায় লোহার বেলনা এসেছে মাত্র গত শতকে (তুলনীয় ক্রুক, 'নর্থ-ওয়েস্টার্ন প্রভিন্সেস অফ ইণ্ডিয়া', পৃ. ৩৩২)। লোহার কড়াই-এ ফুটিয়ে চিনি পরিশোধন পদ্ধতির উল্লেখ আছে তেভেনো, ঐ, ছাড়াও কারেরি, ১৬৯, 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৭ এবং 'দুর-আল উলূম', পৃ. ৬১ খ। সব রকমের চিনির মধ্যে 'গুড়' (ফার্সী 'কন্দ-এ সিয়াহ্') নিশ্চয়ই ছিল সবচেয়ে চালু। আবুল ফজল এর উল্লেখ করেছেন ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৭), কিন্তু দাম বলেননি। আওরঙ্গাবাদ এবং রামগির থেকে যথাক্রমে ১৬৬১ ও ১৬৬২-র বিবরণীতে দেখা যায় গুড়ের দাম ছিল গমের দ্বিগুণ ('ওয়াকাই দখিন', ৩৭, ৪৩, ৭৫, ৭৬ ; 'দফতর-এ দিওয়ানী ও মাল ও মুলকী', পৃ. ১৭৩)। এর থেকেই বোঝা যায়, আজকের তুলনায় এর দাম আরও বেশি ছিল। এখন গুড়ের দাম প্রায় কখনই গমের সোয়া-এক ভাগের বেশি হয় না। কারেরি, ১৬৯, দেখেছিলেন, গ্রামে সাদা চিনি তৈরি হয়, আর আবুল ফজলের তালিকায় গুড় ছাড়াও আরও চার ধরনের চিনির নাম আছে : লাল ও সাদা (গুঁড়ো) চিনি, সাদা মিছরি (বা দানাদার) এবং সবচেয়ে পরিশ্রুত 'নবাৎ' ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫, ৭৭)। মোরল্যাণ্ড দেখেছেন, 'আইন'-এ এগুলির যে-দাম দেওয়া আছে, গমের অঙ্কে তা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি (*JRAS*, ১৯১৮, পৃ. ৩৭৯ ; 'ইণ্ডিয়া…অফ আকবর', পৃ. ১৫৭-৮)।

৭. 'তেলী'র ফার্সী নাম হলো 'রওগনগর'। 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬০-এ রক্ষিত আওরঙ্গজেবের একটি ফরমান থেকে মনে হয়, পেশায় এরাও ছিল তুলো-ধুনরীদের মতো যাযাবর। 'ধুনিয়া,

হতো গ্রামের মধ্যেই। এই কাজ করতে চাষীদের মধ্যে বোধহয় এক ধরনের যৌথ প্রচেষ্টার দরকার হতো। সমসাময়িক লেখকরা প্রায়ই এই পদ্ধতির বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন।[৮] নীল চাষের শেষ দিন অবধি এটি মূলত একই থেকে গিয়েছিল।[৯] অবশ্য, গুজরাটের চাষীরা, মনে হয়, প্রায়ই এক শ্রেণীর ফড়িয়াদের কাছে পাতা বিক্রি করে দিত। তারা ঐ পাতা থেকে রঙ বের করে বাজারে ছাড়ত।[১০]

ওপরে যেসব তথ্য দেওয়া হলো, তার মধ্যেই সব দিক ধরা পড়েছে—এমন দাবি একেবারেই করা হচ্ছে না। তাহলেও, শিল্প থেকে কৃষির সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ গ্রামে মরসুমী বেকারত্বের সমস্যাকে কতখানি তীব্র করে তুলেছিল (যদি-না ঐ বিচ্ছেদের ফলেই এর সৃষ্টি হয়ে থাকে)—এসব তথ্য আমাদের তা বুঝতে সাহায্য করে। আরও খুঁটিয়ে দেখলে লক্ষ্য করা যাবে, যেসব শিল্পজাত দ্রব্যের কথা আমরা উল্লেখ করেছি সেগুলি চাষী পরিবারের কয়েকটি খুব জরুরি প্রয়োজন মেটাত। একটা গ্রাম—বা কয়েকটা গ্রাম মিলে—যখন নিজেদের সুতো বুনে নেয়, চিনি ও তেল নিজেরাই জোগাড় করে,[১১] কৃষকের গৃহস্থালীর জন্য যা দরকার—কাপড়, লাঙল, সামান্য ক-টি চাষের

এবং 'তেলী'দের একই রকম অবস্থার ফলেই সম্ভবত এই কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়েছে যে প্রথম জাতটি এসেছে পরের জাতটি থেকে ('তশরীহ্-আল-আকওয়াম', ঐ, 'তেলী'র ছবি ও বর্ণনা আছে পৃ. ২৯৯ খ-৩০১ ক-এ)।

৮. ফিঞ্চ, 'আর্লি ট্রাভেলস্', ১৫৩-৪, 'লেটার্স রিসিভ্ড্', ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪১; পেলসার্ট ১০-১১, ১৫; মাণ্ডি, ২২১-৭; তাভার্নিয়ে, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮-৯। প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে ছিল এই রকম: প্রথমে বোঁটাগুলো একটা বড় পাত্রে রেখে তার ওপর জল ছেড়ে দেওয়া হতো। রঙ টেনে নেওয়ার পর সেই জল আরেকটি পাত্রে রাখা হতো। প্রথমে একটানা নেড়ে নেড়ে পুরো রঙ গুলে ফেলা হতো, তারপর সেই রঙ তলায় থিতোতে দেওয়া হতো, শেষে রঙ জড়ো করে শুকোবার জন্য ছড়িয়ে দেওয়া হতো কাপড়ের ওপর।

৯. ইঙ্গ-ভারতীয় নীলকরদের রীতির (উদাহরণস্বরূপ, এন. জি. মুখার্জীর 'হ্যাণ্ডবুক অফ ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার', ৩০১) সঙ্গে ১৭ শতকের চাষীদের অনুসৃত রীতির কোন মৌলিক পার্থক্য চোখে পড়ে না। ভোয়েলকর-এর 'রিপোর্ট', ২৬১-৫-তে এইসব নীলকরদের নীল তৈরির পদ্ধতির বিস্তারিত সমালোচনা আছে। ভারতের ইতিহাসে নীলকরদের স্থান তাদের উদ্ভাবনী প্রতিভার ওপর দাঁড়িয়ে নেই: বরং তা দাঁড়িয়ে আছে লুঠ, অত্যাচার ও খুনের কীর্তিকলাপের ওপর—মার্কস যাকে বলেছেন 'প্রাথমিক সঞ্চয়' তারই চমৎকার সব পদ্ধতি। (তুলনীয় এল. নটরাজন, 'পেজেন্টস্ আপরাইজিংস্ ইন ইণ্ডিয়া (১৮৫০-১৯০০)', বোম্বাই, ১৯৫৩, পৃ. ৩৩-৪৭)।

১০. 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬৩৪-৩৬', পৃ. ২৯২। আহ্মেদাবাদে ইংরেজরা চেষ্টা করেছিল নিজেরাই পাতা কিনে ভাড়াটে মজুর দিয়ে রঙ তৈরি করতে। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেল তাতে খরচ বেশি পড়ে (ঐ, ১৬৪৬-৫০, পৃ. ৭৭-৭৮, ১৮৯, ২০২-৩)।

১১. মনে রাখা ভালো যে, তুলো ও আখের চাষ ভৌগোলিক অর্থে এখনকার চেয়ে অনেক বিস্তৃত ছিল।

যন্ত্রপাতি ও মাটির পাত্র[১২]—তার প্রায় সবকিছুর জন্যই যখন গ্রামের তাঁতী, ছুতোর, কামার আর কুমোরই যথেষ্ট, গ্রামের বাইরে থেকে তখন খুব অল্প জিনিসই আনার দরকার পড়ত।

১২. "প্রত্যেক "অলদেয়া"য় (গ্রামে) সমস্ত পেশার লোক আছে, আর আছে তাদের কাপড়-কাচা, জঙ্গল সাফ করার জন্য চাকর-বাকর, একজন কামার ইত্যাদি।" (মনসেরাৎ, 'ইনফরমেশন', অনু. হস্টেন, *JASB*, N.S., খণ্ড ১৮, পৃ. ৩৫২)। ১৫৭৯-তে লেখা এই রচনাটিতে সলসেট দ্বীপ এবং কোঙ্কণের কথাই বলা হয়েছে। মুঘল ভারতের চাষীদের সামান্য ক-টি পার্থিব সম্পত্তির জন্য আরও দ্রষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম অংশ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কৃষিপণ্যের বাণিজ্য

১. দূর পাল্লার বাণিজ্য

কৃষি অর্থনীতির যে কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় কৃষিপণ্যের বাজার, তার বিস্তার ও কাঠামোর বিচার যে অপরিহার্য—এ কথা বোধহয় স্বতঃসিদ্ধ। এই সময়কার ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত যে সব তথ্য আমাদের হাতে এসেছে সেগুলি নেহাৎ তুচ্ছ নয়। এইসব তথ্যে উচ্চমূল্যের পণ্যের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে, আমাদের বর্তমান আলোচনার সঙ্গে তার সরাসরি কোন যোগ নেই। তাছাড়া, আমরা এখনও সেদিনের অপেক্ষায় আছি যখন পুরো বিষয়টির বিশদ ও পর্যাপ্ত বিচার বিশ্লেষণ হবে।[১] এ মুহূর্তে এই বিষয়ের খুঁটিনাটির ভেতর না যাওয়াই ভালো। কারণ, আমরা তাহলে বর্তমান আলোচ্য ক্ষেত্র থেকে অনেকখানি সরে যাব। তার চেয়ে কৃষিপণ্যের ব্যবসার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ও ধরন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

আজকের এই ঠাস-বুনট জাতীয় বাজার তৈরি হয়েছে স্পষ্টতই রেলপথের দৌলতে। কিন্তু আলোচ্য পর্বে দূর পাল্লার বাণিজ্যের সব চাইতে বড়ো বাধা ছিল যানবাহন। স্থলপথে মাল যেত গরুর গাড়িতে কিংবা উট বা বলদের পিঠে। রাস্তাগুলো পায়ে-চলা পথের চেয়ে বেশি চওড়া ছিল না। অবশ্য বড় বড় রাজপথের কথা আলাদা। ঐসব পথের ধারে ধারে রাত কাটানোর জন্য সরাই বা পাঁচিল ঘেরা আস্তানা এবং গুদামের ব্যবস্থা ছিল।[২] সাধারণ 'কাফিলা'য় সওদাগরেরা দামী জিনিসই শুধু নিয়ে যেতে পারত।

১. মোরল্যাণ্ড তাঁর 'ইণ্ডিয়া…অফ আকবর' ও 'আকবর টু আওরঙ্গজেব' গ্রন্থে যা আলোচনা করেছেন, তার ওপর কোন কটাক্ষ করার জন্য এ কথা বলা হচ্ছে না। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে আলোচনা করা। বিশেষ করে পরের দিকের গবেষণায় তাঁর ঝোঁক বেশি পড়েছে বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর।

২. শের শাহ্-ই যাতায়াতের পথে সুসংবদ্ধভাবে সরাই তৈরি করেছিলেন বলে ধরা হয় (আব্বাস খান, পৃ. ১০৮ খ-১০৯ ক, 'তবাকৎ-এ আকবরী', ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৬; বদাউনী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৩, ৩৮৪; আহ্মদ ইয়াদগার, ২২৭-৮)। ইউরোপীয় পর্যটকেরা প্রায়ই সরাইখানার উল্লেখ করেছেন (স্টিল ও ক্রোথার, 'পুর্চাস্', ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৮; মানরিক, ২য় খণ্ড, ৯৯-১০১; বার্নিয়ে, ২৩৩; তাভার্নিয়ে ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫; বাউরি, ১১৭; মানুচি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮, ৬৯, ১১৬)। একা বার্নিয়েই নাক সিঁটকেছেন। সরাই-এ থাকার ভাড়া সম্পর্কে সমসাময়িক কোন অভিযোগ নেই এবং মার্শালের কথা, ১১৭-৮, থেকে মনে হয় যে ভাড়া ছিল খুব অল্প। কোন কোন রাস্তায় গাছের সারি ও সামান্য দূরে দূরে কুয়ো দেখা যেত এবং এক-এক কুরোহ্ অন্তর আজানের মিনার তৈরি করা হয়েছিল (আগের ফারসী সূত্রগুলি ছাড়াও দ্রষ্টব্য 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১১; ফিঞ্চ, 'আর্লি ট্রাভেলস্', ১৬০, ১৮৫-৬; স্টিল

আর যেসব পণ্য স্থলপথে নিয়ে যাওয়া হতো প্রচুর পরিমাণে—যেমন খাদ্যশস্য, চিনি, মাখন, নুন প্রভৃতি—তার বেলায় অদ্ভুত কায়দায় পরিবহণের ব্যবস্থা করত বিখ্যাত 'বন্‌জারা' জাতের লোকেরা। এ ব্যবসায়ে তারা ছিল কার্যত একচেটিয়া।[৩] ভারবাহী বিরাট বিরাট বলদের পাল নিয়ে এরা পথ চলত, বলদের খাবার যোগাড় হতো পথের ধারের জমি থেকে।[৪] 'বন্‌জারা'রা ছিল যাযাবর। পুরো পরিবার নিয়ে বাস করত 'টাণ্ডা' বা তাঁবুতে। এক একটি বড় 'টাণ্ডা'য় ৬০০ থেকে ৭০০ লোক ও ১২,০০০ থেকে ১৫,০০০ এমনকি ২০,০০০ পর্যন্ত বলদ থাকতে পারত।[৫] এই সব বলদ ১,৬০০ থেকে

ও ক্রোথার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ; কোরইয়াট, 'আর্লি ট্রাভেলস্' ২৪৪; 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ২৭৭; রো, ৪৯৩; মাণ্ডি, ৮২-৮৪, ৮৬, ৯২; বার্নিয়ে, ২৮৪, তেভেনো, ৫৭, ৮৫; তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, ৭৮)।

পথে গাড়িঘোড়া চলার অসুবিধা হলে স্থানীয় রাজকর্মচারীদের নালা ও খালের ওপর সাঁকো তৈরি করতে বলা হতো ('নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ১২৮ ক, Bodl. ৯৮ খ-৯৯ ক; Ed. ৯৮-৯৯)। এমন নজির আছে যে, বিখ্যাত বাদশাহী সড়কটি সমতল দিয়ে গিয়ে দেঘ্, কার্ণাল উপনদী, সেন্‌গর্, রিন্দ্, গোমতী এবং কুত্রা নদীর ওপর পাথর বা ইঁটের সেতু পার হয়ে চলে গিয়েছিল (মনসেরাৎ ৯৮; মাণ্ডি ৮৯, ৯১, তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৮; সুজান রায় ৭৩)। একইভাবে আগ্রা থেকে দখিনে যাওয়ার পথটি উটানগন ও কুয়ারী (মাণ্ডি ৬৪-৫; তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩) এবং পরে সিন্ধু নদীর (মানুচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২২) ওপর এ ধরনের সেতু পার হয়ে যেত। কিন্তু আরও বড় নদীগুলির প্রায় কোনটিতেই সেতু ছিল না (বার্নিয়ে ৩৮০)—এক নৌকোর সাঁকো ছাড়া, যেমন কয়েকটি সাঁকো ছিল আগ্রা ও দিল্লীর মধ্যে, যমুনার ওপর ('আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫১; বার্নিয়ে, ২৪১)। বেশির ভাগ ছোট নদী ও উপনদীই সম্ভবত পায়ে হেঁটে পার হওয়া যেত। ফলে, বর্ষার সময়ে কয়েকটি রাস্তা, যেমন আগ্রা-পাটনার পথ, চাকাওয়ালা গাড়ির পক্ষে অসুবিধাজনক বা অনুপযোগী হয়ে পড়ত ('ফ্যাক্টরিস্, ১৬১৮-২১', পৃ. ২৫৮, ২৮৩; মাণ্ডি, ১৪৩-৪)। আগ্রা-বুরহানপুরের পথটি বন্যাপ্লাবিত নদীর দরুন পুরো মরসুম জুড়েই বন্ধ থাকত (তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১)।

৩. তুলনীয় 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ৩৪৫; 'ফ্যাক্টরিস ১৬২৪-২৯', পৃ. ২৭০; মাণ্ডি, ৫৫, ৯৫; তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, ৩৩-৩৪। তাভার্নিয়ে যেভাবে 'বন্‌জারা'দের চারটি নির্দিষ্টভাগে ভাগ করেছেন—এক-একটি জাত শুধু শস্য, চাল, ডাল আর নুন বয়ে নিয়ে যায়—তা একেবারেই কাল্পনিক। যে-অঞ্চলে যে-জিনিসের দরকার তারা তা-ই নিয়ে যেত আর সেখানে যা উদ্বৃত্ত তা-ই নিয়ে ফিরে আসত (মাণ্ডি, ৯৬, ৯৮-৯; আরও তুলনীয় 'আহ্‌কাম্-এ আলমগীরী', পৃ. ৮৩ ক)। তারা প্রধানত নিজেদের মতো করেই ব্যবসা করত, কিন্তু কখনও কখনও অন্যের মাল বয়ে দিতেও তৈরি থাকত (মাণ্ডি, ৯৫-৬)।

৪. মাণ্ডি, ৯৬। যে সব জবরদস্তি আদায় আওরঙ্গজেব বেআইনী বলে ঘোষণা করেছিলেন, তার মধ্যে পশুচারণের জন্য 'বন্‌জারা'দের ওপর চাপানো মাশুলও ছিল ('মিরাৎ', ১ম খণ্ড, ২৮৭; Fraser 86, পৃ. ৯৩ ক; খাফী খান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭ ক)।

৫. রো ৬৭, মাণ্ডি ৯৫-৬; তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২-৩।

২,৭০০ টনের মতো মাল বয়ে নিয়ে যেত।[৬] সময়ে সময়ে, যেমন একটা বড় সৈন্য-বাহিনীর রসদ যোগান দিতে হলে, 'বন্‌জারা'রা প্রয়োজন অনুযায়ী লাখখানেক বা তারও বেশি বলদ যোগাড় করে ফেলতে পারত।[৭] মোটের ওপর, বছরে তারা যা মাল বইত তার পরিমাণ নিশ্চয়ই ছিল খুব বেশি, এতই বেশি যে, তা কয়েকশ হাজার টনের অঙ্কেও বলা যায়। স্থলপথে এই ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থায় অন্যান্য উপায়ের চেয়ে খরচ পড়ত অনেক কম।[৮] তবে, এরা শ্লথগতি তো ছিলই,[৯] তাছাড়া পথের ধারে ধারে পশুগুলোর জন্য চারণভূমির দরকার হতো বলে গ্রীষ্মকালে ও শুকনো এলাকায় 'বন্‌জারা'দের কাজকর্মের পরিমাণ অবশ্যই সীমিত হয়ে পড়ত।

অবশ্য এটা ধরেই নেওয়া যেতে পারে নদীপথে পরিবহণ ব্যবস্থাই ছিল সবচেয়ে শস্তার।[১০] বাংলা,[১১] সিন্ধু,[১২] ও কাশ্মীরে[১৩] বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নৌকায় মাল

৬. একটি বলদ সাধারণত ৪½ 'মণ-এ শাহ্‌জাহানী' বা ৩১০ আভ. পাউণ্ডের মতো ওজন বইতে পারত ('ফ্যাক্টরিস্, ১৬৫৫-৬০', পৃ. ৬৩)। মাণ্ডি-র, ৯৫, হিসেবে, ভার হতো মাত্র ৪ 'মণ-এ জাহাঙ্গীরী' বা ২৬৫.৫ পাউণ্ড এবং মার্শালের, ৪২৫, মতে, ৪ 'মণ-এ শাহ্‌জাহানী' (বা ২৯৫ পাউণ্ড)। অন্যদিকে, তাভার্নিয়ে-র মনে হয়েছিল যে এটি ৩০০ বা ৩৫০ লিভ্‌র্‌ অর্থাৎ ৩২৭ থেকে ৩৯০.৫ পাউণ্ডের মতো বেশি হবে (১ম খণ্ড, ৩২)।

৭. 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ৩৪৫ ; 'আহ্‌কম-এ আলমগীরী', পৃ. ৮৩ ক।

৮. উদাহরণত, 'ফ্যাক্টরিস ১৬১৮-২১', পৃ. ১০২ এবং '১৬৫৫-৬০', পৃ. ৬৩ থেকে এমন সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। বলদ ব্যবহার করার জন্যই মুখ্যত খরচ কম পড়ত, তা নয়। সাধারণ-ভাবে, টানা গাড়ির চেয়ে ভারবাহী বলদের ভাড়া ওজনের অঙ্কে অনেক বেশি পড়ত (মার্শাল, ১১৭-১১৮)। আবার মালটানা-গাড়ির খরচ ছিল উটের ভাড়ার চেয়ে অনেকটাই বেশি। ('লেটার্স রিসিভ্‌ড্‌', ৪র্থ খণ্ড, ২৩৭-৮)। 'বন্‌জারা'দের একটি পরিবারই তাদের 'টাণ্ডা'য় পঞ্চাশ থেকে একশটি বলদের দেখাশুনা করতে পারত ; আর চলার পথে তারা পশুদের চরে খাওয়ার সময় দিত বলে জাবের জন্য সাধারণত কোন খরচ হতো না। তারা আসলে পয়সা বাঁচাত এইভাবে।

৯. "খুব বেশি হলে দিনে ৬ বা ৭ মাইলের ওপর নয়" (মাণ্ডি, ৯৬)। না হলে ভারবাহী বলদের সাহায্যেই সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যাওয়া যেত (তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩)। এও অনুধাবনযোগ্য যে, শুকনো মরসুমে আগ্রা থেকে পাটনা পৌঁছতে একটি মাল-বোঝাই গাড়ির সাধারণত ৩৫ দিন লাগত ('ফ্যাক্টরিস, ১৬১৮-২১', পৃ. ১৯১, ১৯৯) আর আগ্রা থেকে সুরাটের পথে গাড়ি এবং উট দুইই'সময় নিত ৫০ দিন ('লেটার্স রিসিভ্‌ড্‌', ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৭-৮)।

১০. ১৬৩৯এ যে-পরিবহণ ব্যয় দেওয়া হয়েছে, উদাহরণ হিসেবে সেটিকেই দেওয়া যেতে পারে : আগ্রা থেকে মুলতানে যেতে "মালের ভাড়া বা মালবোঝাই গাড়িভাড়া" ছিল মণপিছু ২½ টাকা ; কিন্তু তার থেকে একটু বেশি দূরত্বে, মুলতান থেকে থাট্টা যেতে নৌকার ভাড়া পড়ত মণপিছু মাত্র ⅞ টাকা ('ফ্যাক্টরিস্, ১৬৩৭-৪১', ১৩৫-৬)।

১১. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৯।

১২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৫৫৫। বলা হয় যে, থাট্টা 'সরকারে' বা ভাকায়ের তলায় সিন্ধুনদে চলাচল করত প্রায় ৪০,০০০ "ছোট-বড়" নৌকা। আরও দ্রষ্টব্য 'তারিখ্‌-এ তহিরি', Or. 1685, পৃ. ৫৮ ক-খ।

১৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৫৬৩ ; 'তুজুক্‌-এ জাহাঙ্গীরী', ২৯৮। আবুল ফজল বলেন যে, কাশ্মীরে ৩০,০০০

আনা-নেওয়া চলত। ৩০০ থেকে ৫০০ টন ওজনের বড় বড় বজরা যমুনা এবং গঙ্গা ধরে আগ্রা থেকে পাটনা ও বাংলা পর্যন্ত আসত। বর্ষার সময় এগুলি নেমে আসত নীচের দিকে, আর বছরের বাকি সময়টায় তারা আবার ফিরে যেত ওপরে।[১৪] নদী-বন্দর হলেও লাহোর এবং মুলতান থেকে ছোট নৌকা থাট্টা অবধি যেত।[১৫] প্রতি বছর আগ্রা থেকে বাংলার জলপথে শুধু নুনই যেত দশ হাজার টন।[১৬] এ তথ্য বিচার করলে বোঝা যায় যে, বাণিজ্য-পণ্যের বেশ বড় একটা অংশ নদীগুলোই বহন করত। সেই সময়কার পরিস্থিতি বিবেচনা করলে, উপকূলগামী নৌকাগুলির ক্ষমতাও আমাদের মনে ছাপ ফেলে।[১৭] খাদ্যশস্য সহ বিভিন্ন পণ্যের প্রচুর পরিমাণ পরিবহণের জন্য এগুলির ব্যাপক ব্যবহার ছিল।[১৮] কিন্তু যেসব ইওরোপীয় জাহাজ তখন ভারত সাগরগুলিতে আধিপত্য চালাত, তাদের জলদস্যুসুলভ আক্রমণ, জবরদস্তি ও অবরোধের শিকার হতো এইসব নৌকা।[১৯]

নৌকা ছিল ('আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, ৫৫০); "শহর (পরে শ্রীনগর) এবং পরগনাগুলির" ক্ষেত্রে জাহাঙ্গীর (ঐ) সংখ্যা দিয়েছেন ৫,৭০০

১৪. জুর্দ্যাঁ, ১৬২, মাণ্ডি, ৮৭-৮৮। মোরল্যাণ্ড এ সময়ের ইংরেজ তথ্যসূত্রের 'টন'কে আধুনিক জাহাজের 'নীট' রেজিস্টার্ড টনের $\frac{৪}{১০}$ থেকে $\frac{৬}{১০}$ বলে ধরেছেন ('ইণ্ডিয়া...অফ আকবর', পৃ. ৩১০-১২)। বাউরি, ২২৫, বলেছেন, পাটনা এবং হুগলীর মধ্যে "পাটেলা নামে...প্রচণ্ড শক্তিশালী চেপ্টা তলার বিরাট নৌকা" চলাচল করত। এদের প্রত্যেকটি ৪,০০০ থেকে ৬,০০০ 'বাংলা মণ' বা প্রায় ১৩০ থেকে ২০০ টন ওজনের কাছাকাছি মাল নিয়ে আসত।

১৫. স্টিল ও ক্রোথার, 'পুর্চাস' ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৮; 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৩৪-৩৬', পৃ. ২৪৪; '১৬৩৭-৪১', পৃ. ১৩৫-৭। নৌকাগুলির ওজন নানারকমভাবে দেওয়া হয়েছে: ৪০ থেকে ৫০ 'টন', '১০০ টন ও তার ওপর' এবং ৫০০ থেকে ২০০০ 'মণ' (অর্থাৎ ৬৫ টন পর্যন্ত ওজন)। (সলব্যাঙ্ক, 'পুর্চাস', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৫: 'ফ্যাক্টরিস্', ঐ)।

১৬. জুর্দ্যাঁ, ১৬২।

১৭. উদাহরণস্বরূপ, ১৬৪৮-এ সুরাটের ইংরেজ কুঠিয়ালরা বলেছিল, "এই দেশীয় বণিকরা বিরাট সংখ্যক জাহাজের অধিকারী।" "ফলে" তাঁদের ভয় হচ্ছিল যে কম্পানির জাহাজগুলি বিক্রি করতে চাইলে "কার্যোপযোগী ও ভালো জাহাজ হওয়া সত্ত্বেও সেগুলির দাম কত কম হবে।" ('ফ্যাক্টরিস্, ১৬৪৬-৫০', পৃ. ১৯০)। আরও তুলনীয় মোরল্যাণ্ড, 'ইণ্ডিয়া...অফ আকবর', পৃ. ২২৭ ইত্যাদি এবং 'আকবর টু আওরঙ্গজেব', পৃ. ৮১ ইত্যাদি।

১৮. অক্টোবর ১৭০৫-এ গুজরাটের দেওয়ান পশ্চিম উপকূলে কার্যরত আওরঙ্গজেবের সৈন্যবাহিনীর জন্য সমুদ্রপথে ২০০,০০০ মণ খাদ্যশস্য পাঠানোর আদেশ পেয়েছিলেন ('অখবারাৎ' ক ১৮২)। 'মণ-এ শাহজাহানী'তে ধরলে এর পরিমাণ ৬,৬০০ টনের মতো দাঁড়াবে, কিন্তু গুজরাটের 'মণ' হলে ৩,৩০০ টন। এর দু-এক বছর আগে সমুদ্রপথে ১০০,০০০ মণ (খাদ্যশস্য) পাঠানোর অনুরূপ একটি আদেশ দেওয়া হয়েছিল ('মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৪)।

১৯. পর্তুগীজ এবং পরে ওলন্দাজ ও ইংরেজ-প্রবর্তিত 'লাইসেন্স' ব্যবস্থা ভারতীয় নৌবহরের ওপর শুধু যে বড় অর্থনৈতিক বোঝা চাপিয়েছিল তা-ই নয়, উপরন্তু কয়েকটি বাণিজ্যের ভারতীয় জাহাজ ঢুকতে বাধা দেওয়ার জন্যও এটি ব্যবহার করা হয়েছিল। এইভাবে

সেই সময়কার পরিবহণ ব্যবস্থার প্রভাব ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর যে বিশেষভাবে পড়ত, তা তখনকার মূল্যস্তরের প্রসঙ্গে পরিবহণ-ব্যয়ের আলোচনা থেকেই পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে। উদাহরণস্বরূপ, ১৭ শতকের গোড়ার দিকে আগ্রা থেকে সুরাট পর্যন্ত এক মণ ওজনের মাল উটের পিঠে চাপিয়ে আনতে যে খরচ পড়ত,[২০] 'আইন'-এ নির্দিষ্ট দাম অনুযায়ী তা ঐ ওজনের গমের দামের প্রায় চারগুণ, কিন্তু সাদা চিনির দামের মাত্র অর্ধেক।[২১] দুর্ভাগ্যবশত, 'বন্‌জারা'দের কত খরচ পড়ত সে বিষয়ে কোথাও কিছু বলা হয়নি,[২২] তবে আমরা নদী পরিবহণের খরচ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করে নিতে পারি। ১৬৩৯ খৃস্টাব্দে নৌকা করে মুলতান থেকে থাট্টায় মাল নিয়ে যেতে 'আইন'-এ নির্দিষ্ট দাম অনুযায়ী খরচ পড়ত গমের দামের দুগুণ, কিন্তু সাদা চিনির প্রায় একের-ছয় ভাগ।[২৩] এইসব উদাহরণ এই মতটিকেই জোরদার করে যে কেবলমাত্র পরিবহণের প্রচলিত উপায়গুলির কথা বিবেচনা করলে, খাদ্যশস্য বা ঐ ধরনের পর্যাপ্ত পরিমাণ জিনিসের চলাচলের আগে দূরদূরান্তের বাজারের মধ্যে দামের আনুপাতিক তারতম্য ছিল খুব বেশি। দামী জিনিসের বেলায় এই তারতম্যের প্রয়োজনীয় মাত্রা ছিল আরও কম। উপরন্তু স্থলপথের চেয়ে নদীপথে দামের পার্থক্য নিশ্চয়ই আরও অনেক কম হতো।

কিন্তু যানবাহন ছাড়া অন্যান্য বিষয়েরও বিরাট প্রভাব ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য চালানোর ওপর। এগুলির মধ্যে আবার মাল চলাচলের ওপর কর চাপানোর বিষয়ে

ওলন্দাজরা ভারতীয় জাহাজকে মালাবারে তুলো বা আফিম নিয়ে যেতে ও সেখান থেকে মরিচ নিয়ে আসতে জোর করে বাধা দিত (নীচে দ্রষ্টব্য)। ১৬৭৭-এ গিন্‌গেলী বা কলিঙ্গ উপকূল থেকে সমুদ্রপথে চাল রপ্তানি তারা পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছিল (তপন রায়চৌধুরী, 'দা ডাচ্ ইন্ করমণ্ডল')।

২০. পর পর তিন বছরে 'মণ-এ জাহাঙ্গারী'র হিসেবে দাম পড়েছিল : ১৬১৭-য় ১$\frac{১}{২}$ টাকা (১·৩ টাকা 'জাহাঙ্গীরী'), ১৬১৮-য় ১$\frac{৩}{৪}$ টাকা এবং ১৬১৯-এ ১$\frac{২}{৫}$ টাকা ও ১$\frac{৩}{৫}$ টাকা। ('লেটার্স রিসিভ্‌ড্', খণ্ড ৬, পৃ. ২৩৮ ; 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬১৮-২১', পৃ. ৪৭, ৫১, ৭৩-৪)।

২১. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০, ৬৫।

২২. একথা আগেই বলা হয়েছে যে, স্থলপথে 'বন্‌জারা'দের সংগঠিত পরিবহণই ছিল নিঃসন্দেহে সবচেয়ে শস্তা। তাহলেও, এই ব্যবস্থাকে বেশি বড় করে দেখা ঠিক হবে না। ১৬৫৬-য় 'বন্‌জারা'দের দিয়ে আগ্রা থেকে সুরাটে সোরা পাঠানো হয়েছিল। এর ফলে যে খরচ বেঁচেছিল, তার ওপর বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে। দাম দেওয়া হয়েছিল 'মণ-এ শাহ্‌জাহানী' পিছু ২·৭ টাকা। এর মধ্যে চালানের জন্য দেয়-ও ধরা আছে, ফলে যথাযথ তুলনা সম্ভব নয়। কিন্তু নিশ্চয়ই এতে খুব শস্তা পড়ত না ('ফ্যাক্টরিস, ১৬৫৫-৬০', পৃ. ৬৩)।

২৩. 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৩৭-৪১', পৃ. ১৩৫, ১৩৬। ঐ একই দলিলে উল্লেখ আছে যে, চালানোর খরচ ছিল লাহোর এবং মুলতানে সাদা চিনির চলতি দামের যথাক্রমে $\frac{১}{৯}$ ও $\frac{১}{১৩}$ ভাগ। গমের চলতি দাম দেওয়া নেই, কিন্তু এই শতকের শেষে লাহোরের যে দাম দেওয়া আছে তার প্রায় $\frac{২}{৩}$ ভাগ দাঁড়াত। ('খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৯০ খ ; Or. 2026, পৃ. ৫৭ ক)।

প্রধান গুরুত্ব আরোপ করা চলে। আকবর ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা কতকগুলি বাদশাহী আদেশের বলে 'বাজ', 'তম্‌গা' অথবা 'জাকাৎ' নামে পরিচিত এই ধরনের শুল্ক একেবারে পুরোপুরি নয়তো আংশিক ছাড় দিয়েছিলেন।[২৪] সম্ভবত এর ফলে অনেক ক-টি তোলা ও কর রদ হয়ে যায়, যার বেশির ভাগই বোধহয় অধিকারভুক্ত রাজ্যগুলি থেকে ওয়ারিশ সূত্রে এসেছিল।[২৫] ফরমানগুলির বয়ান বেশ আটঘাট বেঁধে তৈরি হলেও, মনে হয় এগুলি মাত্র আংশিক ফল দিতে পেরেছিল। কারণ, সব রকমের শুল্কই আদায় করা চলছিল—হয় বেআইনীভাবে জাগীরদার বা অন্যান্য রাজকর্মচারীদের

২৪. আকবর তাঁর আমলের শুরুতেই এ বাবদে একটি ফরমান জারি করেছিলেন (আরিফ কান্দাহারী, ৩০-৩২)। তাঁর রাজত্বের ৩৭তম বছরে জারি-করা ফরমানটির মূল পাঠটি 'ইন্‌শা-এ আবুল ফজল', ৬৭-৮ এবং 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭১-৩এ রক্ষিত আছে। (আরও দ্রষ্টব্য 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৫-৬; 'তবাকৎ-এ আকবরী', ৩য় খণ্ড, ৩৪৭; 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৪)। 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ৪এ জাহাঙ্গীর তাঁর তখ্‌তে বসার সময়কার ফরমানের উল্লেখ করেছেন (তুলনীয় আসাদ বেগ, পৃ. ৩০ ক)। সালিহ্‌ কম্বু-র 'বাহার-এ সুখন', Add. 5557, পৃ. ২৩ খ-২৪ ক, Or. 178, পৃ. ৫১ ক-৫৩ ক-য় শাহ্‌জাহানের ফরমান দেওয়া আছে (আরও তুলনীয় 'চার চমন-এ বরহমন', ক: পৃ. ২৫ ক; খ: পৃ. ১৬ ক-খ)। তখ্‌তে বসার বছরে জারি-করা আওরঙ্গজেবের ফরমান, 'দুর্‌-আল-উলুম', পৃ. ৩৭ খ-৩৮ খ-য় উদ্ধৃত এবং 'মিরাৎ-আল আলম্‌', আলীগড় পাণ্ডুলিপি, পৃ. ১৩৮ খ-১৩৯ ক-য় বর্ণিত; 'আলমগীরনামা', ৪৩৫-৯; 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৯, ২৫১-২; 'ম'আশির-এ আলমগীরী', ৫৩০-৩১; খাফী খান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৭-৯০। নিষিদ্ধ আদায়গুলির তালিকা দেওয়া আছে এমন অন্য একটি ফরমানের জন্য দ্রষ্টব্য 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৬-৭।

২৫. এই সব আদেশ বলবৎ করায় কয়েকটি সাফল্যের জন্য মনসেরাৎ, ৭৯-৮০ এবং 'জাহাঙ্গীর অ্যাণ্ড দা জেস্যুইটস', পৃ. ৩৬ দ্রষ্টব্য। এও সম্ভব যে, এ বিষয়ে প্রাদেশিক রাজ্যগুলির অধীনে যে অবস্থা ছিল, মুঘল সাম্রাজ্য এদিক দিয়ে তার বিরাট উন্নতি করেছিল। সরাসরি না বললেও তেভেনো, ১৩১, দেখিয়েছেন যে, গোলকুণ্ডার তুলনায় মুঘল মাশুল ব্যবস্থা অনুকূলই ছিল। যখন করদ রাজ্যের সর্দারদের জবরদস্তি আদায়ের সঙ্গে বাদশাহী শাসনের অধীন অঞ্চলগুলির আমদানি শুল্ক ব্যবস্থার তুলনা করা যায়, তখন এটি পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে আসে। ১৬২১-এ আগ্রা থেকে পাটনায় চালানের দেয় ছিল গাড়ি পিছু ১৪ টাকা, খুব বেশি হলে ২০ টাকা ('ফ্যাক্টরিস, ১৬১৮-২১', পৃ. ২৬৯-৭০)। বারো বছর পরে আগ্রা-আহ্‌মেদাবাদের পথে, যার দূরত্ব এর চেয়ে বেশি ছিল না, শুল্ক বেড়ে গাড়ি পিছু ৪৫ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছিল (মাণ্ডি, ২৭৮)। এই পথটি গিয়েছিল রাজপুত সর্দারদের অধিকৃত অঞ্চলের ভেতর দিয়ে। অন্যত্র, ১৬১৬-তে ইংরেজদের একটি দলিলে এই পথের "শুল্ক ও জবরদস্তি আদায়"কে "অসহনীয়" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রায় পুরোপুরি বাদশাহী এলাকার ভেতর দিয়ে সুরাট থেকে বুরহানপুর ঘুরে আগ্রা যাওয়ার যে-বিকল্প পথটি ছিল, তা 'আরও নিরাপদ, দ্রুত এবং শস্তা' বলেই পছন্দ করা হয়েছে (ফস্টার, 'সাপ্লিমেণ্টারী', ৮৯)। সর্দারদের এলাকায় শুল্ক সংগ্রহ সম্পর্কে আরও অভিযোগের জন্য দ্রষ্টব্য তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১; 'ফ্যাক্টরিস্‌, ১৬৪৬-৫০'; পৃ. ১৯২-৩ এবং 'ওয়াকাই-এ আজমীর', ১২-১৩, ১৯৬ ইত্যাদি।

সুবিধার জন্য, নয় একদিকে যা রদ হয়েছে, অন্যদিকে তাই অনুমোদন করা হতো।[২৬] এই দু ধরনের করকে আপাতদৃষ্টিতে আলাদা করে দেখা উচিত। বড় বড় বাজার, সীমান্ত শহর ও বন্দরগুলিতে যে সব মাল সরবরাহ হতো, তা পৌঁছেই থাক কিংবা যাওয়ার পথে পড়ুক, তার জন্যে শুল্ক দিতে হতো মোট মূল্যের ২½ শতাংশ,[২৭] যদিও ঐ শুল্কের হার ছিল কোথাও বা এর চেয়ে বেশি, কোথাও কম।[২৮] আওরঙ্গজেব হিন্দুদের জন্য এটি বাড়িয়ে করেছিলেন ৫ শতাংশ, কিন্তু মুসলমানদের জন্য পুরনো হারই বহাল ছিল। তবে এর মধ্যে পনের বছর অবশ্য সমস্ত শুল্কেরই ছাড় দেওয়া

২৬. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, ৬৭০ অনুসারে, ৪০তম বছরে খবর পাওয়া গিয়েছিল যে, 'তমগা' উঠিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও বাণিজ্যপথে তার নাম করে পয়সা আদায় করা হচ্ছিল। এটি দমনের জন্য রাজকর্মচারী নিয়োগ করতে হয়। তারা খুব বেশি সফল হতে পারেনি; কেননা তখ্‌তে বসার পর জাহাঙ্গীর লক্ষ্য করেন যে, "প্রত্যেক প্রদেশ ও 'সরকার'-এই এ ধরনের পাওনা আদায় করা হচ্ছিল" ('তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ৪)। জাহাঙ্গীরের হুকুম, তাঁর বাবার চেয়ে আরও ঢালাও হলেও, শুধুই কথার ফুল্‌কি ছিটিয়েছিল। কারণ, আমরা দেখি, আগ্রার ঠিক উল্টো দিকে নূরজাহানের দালালবা চালানের দেয় আদায় করছে (পেলসার্ট, ৪)। কেন আওরঙ্গজেবের আদেশ সত্ত্বেও এ সব শুল্ক আদায় বন্ধ হয়নি—এই প্রসঙ্গে খাফী খানের মন্তব্য তাঁর পূর্বসূরীদের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য বলে মনে হয়। খাফী খান বলেন যে, প্রথমত, বেআইনী উপশুল্ক আদায়ের দায়ে দোষী ব্যক্তির কখনও গুরুতর শাস্তি হতো না; এবং দ্বিতীয়ত প্রায়ঃ বরাদ্দ জাগীরের 'জমা'য় এই বাতিল মাশুলগুলি ধরা হতো, সুতরাং এগুলি আদায় করা ছাড়া জাগীরদারদেরও কোন উপায় ছিল না (খাফী খান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৮-৯)।

২৭. 'আইন', ১ম খণ্ড, ২০৪ পৃষ্ঠায় বন্দরগুলির জন্য এই হার দেওয়া আছে। শাহজাহানের আমলে কান্দাহার বা থাট্টায় মাল পাঠানোর জন্য মুলতানে এই একই হারে শুল্ক আদায় হতো ('ফ্যাক্টরিস্, ১৬৩৭-৪১', পৃ. ৮১); সিন্ধুর উপর-অঞ্চলেও কেনা জিনিসপত্রের ক্ষেত্রে এটি চাপানো হতো (পূর্বোক্ত সূত্র, '১৬৫৫-৬০', পৃ. ৮১)। আওরঙ্গজেব তাঁর ফরমানে চালানের দেয় তুলে দেন। "সীমান্তে এবং বিশেষ বিশেষ শহরে প্রতিষ্ঠিত 'জাকৎ' ছিল বাদশাহী আদেশ অনুসারে নির্দিষ্ট ও স্থাপিত" ('দুর্‌ আল-উলূম', পৃ. ৩৭খ-৩৮খ)। এই ফরমানের শর্তগুলি থেকে সেই 'জাকাৎ' বিশেষ করে বাদ দেওয়া হয়। স্থানীয় বাজারে যে-খুচরো দাম চালু থাকত, তার সরকারী বিবরণের ভিত্তিতে জিনিসপত্রের মূল্যের ওপর শুল্ক দিতে হতো (পেলসার্ট, ৪৩; 'ফ্যাক্টরিস ১৬৩৭ ৪১', পৃ. ১৩৬: 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৮-১৯, ৩৩৯-৪০; 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৯০ ক-৯২ খ; Or, 2026, পৃ. ৫৭ ক-৫৯ ক)।

২৮. সুরাটের "ভেতরে ও বাইরে" শতকরা ৩½ এবং ভরোচে শতকরা ১¾ বা ১½ (ফস্টার, 'সাপ্লিমেন্টারী ক্যালেণ্ডার', ৪৭, ৮৬; পেলসার্ট, ৪২, ৪৩; কমিসারিয়ট, 'মান্দেলস্লো', পৃ. ৯)। থাট্টায় ঘাট থেকে মাল খালাসের জন্য শুধুমাত্র শতকরা ¼ দিতে হতো। বোধহয় ধরে নেওয়া হতো যে সমুদ্রকূল থেকে দূরবর্তী অঞ্চলের জিনিসপত্রের জন্য মুলতানেই আসল শুল্ক দেওয়া হয়েছে ('ফ্যাক্টরিস্, ১৬৩৭-৪১', পৃ. ১৩৬)।

হয়।[২৯] অন্যান্য পণ্যের মতোই, খাদ্যশস্যও এই শুল্কের আওতায় পড়ত[৩০]—যদিও অভাবের সময় শুল্ক একেবারেই তুলে দেওয়া হতো।[৩১] ১৭ শতকে সাধারণত যাকে বলা হতো 'রাহ্‌দারী'—সেইসব শুল্ক বা তোলা ছিল সম্ভবত আরও দুর্বহ। নানা ধরনের কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ করত যাতায়াতের পথঘাট, তারাই জোর করে এসব আদায় করত। আপাতদৃষ্টিতে এসব শুল্ক মালের দামের সমানুপাতিক বলেই মনে হয়,[৩২] যদিও নদী-নালা পারাপারের বেলায় আদায় করা হতো একই হারে।[৩৩] বাদশাহী ফরমানগুলিতে খাদ্যশস্য ও সাধারণ মানুষের ভোগ্য সামগ্রীর ওপর থেকে শুল্ক রেহাই দেওয়ার কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে।[৩৪] স্বাভাবিক অবস্থায় এইসব জিনিসের ওপর এই বোঝা বোধহয় খুব বেশি ভার হয়ে উঠত না। কিন্তু, আপাতবিরোধী মনে হলেও, দুর্ভিক্ষ বা অনটনের পরিস্থিতিতে এটি হয়ে উঠত খুবই নিদারুণ। এসব ক্ষেত্রে, শুধু যে মাশুলের পরিমাণই আনুপাতিক হারে বাড়ত তা-ই নয়, বরং এও সম্ভব যে, বেশি দামে বিক্রিবাট্টার দরুন ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশিত মুনাফার একটা ভাগ না পাওয়া পর্যন্ত রাজকর্মচারীরা কর আদায়ের অছিলায় ব্যবসা-বাণিজ্য দিত আটকে।[৩৫] উপরন্তু, এও প্রায় নিশ্চিত যে, আমাদের আলোচ্য সময়ের শেষের দিকে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব আলগা

২৯. দ্রষ্টব্য 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮-৯, ২৬৫, ২৯৮-৯, 'ফ্যাক্টরিস্‌, ১৬৬৫-৬৭', পৃ. ২৬৬; 'দর্‌-আল উলূম', পৃ. ৫৯ খ-৬০ ক।

৩০. তুলনীয় 'খুলাসতুস সিয়াক', ঐ; Fraser 86, পৃ. ৭৪ ক-খ।

৩১. খাফী খান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৮, Or. 6574, পৃ. ৩৩ খ; 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৯, ৩১৫।

৩২. ১৬১৬-তে সুরাটের কুঠিয়ালরা বুরহানপুরে তাঁদের সহকর্মীদের জানিয়েছিলেন, "পথে গাড়ির ওপর আমদানি-রপ্তানি শুল্ক ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের মনে হয় যে, বিভিন্ন পণ্যের জন্য আলাদা আলাদা শুল্ক দিতে হয়" (ফস্টার, 'সাপ্লিমেণ্টারী ক্যালেণ্ডার', ৬৬)।

৩৩. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৪; তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৬।

৩৪. আকবর, শাহ্‌জাহান এবং আওরঙ্গজেবের ফরমানগুলির বয়ান দ্রষ্টব্য।

৩৫. ১৬৬১-তে ঢাকায় দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী করা হয় এই কারণগুলিকে: "অত্যন্ত বেশি পরিমাণে 'জাকাৎ'-এর বোঝা, 'রাহ্‌দার'দের (রাস্তার তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী) অত্যাচার, 'চৌকীদার'দের ('চৌকী' অর্থাৎ পথশুল্ক ও পাহারার ফাঁড়িতে নিযুক্ত লোকজন) জবরদস্তি আদায়" এবং এরই ফলস্বরূপ ব্যবসায়ীরা শহরে খাদ্যশস্য আনতে পারেনি। অবশেষে, বাংলার অস্থায়ী প্রদেশকর্তা দাউদ খান নিজ দায়িত্বে খাদ্যশস্যের ওপর এ ধরনের সব শুল্ক ছাড় দিতে বাধ্য হন। তাঁর এই কাজ পরে দরবারের সমর্থন পেয়েছিল। ('ফথিয়া-এ ইব্রিয়া', পৃ. ৭৯ খ-৮০ ক, ১১০ খ-১১১ ক)। যদিও আওরঙ্গজেবের সাধারণ ফরমান-এর বয়ানে ('দুর্‌-আল উলূম'-এ যেমন দেওয়া আছে) এ বিষয়ে কোন কথা নেই, তবু এর ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে সব ঐতিহাসিকই একমত যে, সাম্রাজ্যের বিরাট অংশ জুড়ে অনটনের দরুন খানিক রেহাই দেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। উল্লেখযোগ্য এই যে, স্বাভাবিক সময়ে সিন্ধুর পথে পাওনা আদায়ের নামে যানবাহন আটকানো হতো, কিন্তু আসল লক্ষ্য ছিল ঘুষ ('ফ্যাক্টরিস ১৬৩৭-৪১', পৃ. ১৩৭, '১৬৫৫-৬০', পৃ. ৮১)। অনুমান করা যেতে পারে যে, এ ধরনের লাভজনক ব্যবস্থা শুধুমাত্র সিন্ধুপ্রদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আওরঙ্গজেবের শাসনের শেষদিকে দখিনে তাঁর শিবিরে জিনিসপত্রের দাম

হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ ধরনের তোলা আদায়ের ঘটনা অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল।[৩৬]

আইন-শৃঙ্খলার যে সাধারণ অবস্থায় বাণিজ্য চলত তাতে প্রথম লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, 'বন্‌জারা'রা সব সময় সশস্ত্র থাকত। তাদের 'কাফিলা', সরাই, 'টাণ্ডা'[৩৭] এবং সম্ভবত নদীগুলোতে ছোট ছোট জাহাজের বহর[৩৮] এমনভাবে সুসংগঠিত হয়ে থাকত যাতে তারা সবক্ষেত্রেই রাহাজানির মোকাবিলা করতে পারে।[৩৯] রাস্তাঘাটের নিরাপত্তা ছিল প্রশাসনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব এবং মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত আইন ছিল এই যে, যদি কোন পদস্থ রাজকর্মচারীর এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় কোন চুরি বা ডাকাতি ঘটে, তবে হয় তিনি ঐ চোরাই মাল উদ্ধার করবেন নয়তো নিজে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।[৪০] আইনের এই বাধ্যবাধকতার ফলে রাজকর্মচারীরা

খুব চড়েছিল। তখন সুরাটের 'মুৎসদ্দী'[illegible]র তার দালাল 'বন্‌জারা'দের কাছ থেকে জোর করে বলদপিছু যথাক্রমে দু টাকা ও এক টাকা আদায় করত। তবে তারা বাদশাহী ফৌজের কাছে খাদ্যশস্য নিয়ে যেতে পারত ('আহ্‌কম-এ আলমগীরী', পৃ. ১৪৮ খ)।

৩৬. পরবর্তীকালের লেখক হলেও খাফী খান, ২য় খণ্ড, ৮৭ ৯০, এই পরিস্থিতির একটি বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, আওরঙ্গজেবের রাজত্বে শুল্ক-উপশুল্কের আদায় অতীতের পরিমাণ ছাড়িয়ে গিয়েছিল, আর 'জমিনদার'-এরাও সব জায়গায় অকুতোভয়ে পথশুল্ক আদায় করত! বন্দর থেকে কোন পণ্য দেশের ভেতরে আনলে হয়তো-বা কেনা দামের সমান শুল্ক দিতে হতো। সেওনির (খান্দেশ) আমিন ও ফৌজদার-এর জবরদস্তি আদায়ের প্রসঙ্গে আওরঙ্গজেব নিজেই লিখেছেন, "এ 'রাহ্‌দারী' নয়, 'রাহ্‌জানী' (বড়রাস্তায় ডাকাতি)।" ('রুকাৎ'-এ আলমগীর', কানপুর, পৃ. ১৪)। আরও তুলনীয় মাসুচি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬।

৩৭. মাণ্ডি ২৬২। 'বন্‌জারা'দের লড়তে তৈরি থাকার প্রসঙ্গে তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩ দ্রষ্টব্য।

৩৮. মোরল্যাণ্ড, 'ইণ্ডিয়া...অফ আকবর', পৃ. ১৬৭-৮।

৩৯. এর জন্যই বোধ হয় ১৮ শতকের শেষে এবং ১৯ শতকের গোড়ায় (পরিবহণের পুরনো ব্যবস্থা যখন ভীষণ এলোমেলো হয়ে যায়) বাণিজ্য এবং যাতায়াতের পথে ঠগীরা অমন বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আলোচ্য পর্বের ইউরোপীয় পর্যটকদের মধ্যে শুধুমাত্র তেভেনো, ৫৮ এবং ফ্রায়ার, ১ম খণ্ড, ২৪৪-৫, এই অপরাধের উল্লেখ করেছেন। "বড় রাস্তার যে-ডাকাতদের হিন্দীতে 'ঠগ' বলা হয়", রাজপুতানায় তার উল্লেখ সম্পর্কে 'ওয়াকাই-এ আজমীর', ৪০৫ দ্রষ্টব্য।

৪০. "এই মহান্ সরকারের ন্যায়বিচার ও সুব্যবস্থার দরুন পথে এবং বিশ্রামের জায়গায় এমনই শান্তি বজায় রাখা হয়, যাতে ব্যবসায়ী ও যাত্রীরা (দূর ?) অঞ্চলে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে ও আনন্দে যাতায়াত করেন। কোথাও কোন কিছু হারালে ঐ এলাকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা ('আমল দারান', পাণ্ডুলিপির পাঠভেদে ('উম্‌মাল', রাজস্ব-কর্মচারীরা) তার খেসারত ও কাজে গাফিলতির জন্য জরিমানা দিতে বাধ্য থাকেন" ('চার চমন-এ বরহ্‌মন', ক: পৃ ২৫ ক-খ; খ: ১৬ খ)। 'আইন', ১ম খণ্ড, ২৮৪-তে 'কোতোয়াল'-এর (শহরের পুলিশ কর্মচারী) ওপর এই ধরনের বাধ্যবাধকতা চাপানো আছে; কিন্তু আলাদা করে কোন 'কোতোয়াল'

এক ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ গ্রহণের নীতি অনুসরণ করে সন্দেহজনক গ্রামগুলিতে লুটপাট চালাত—এতে তাদের লাভ বই ক্ষতি হতো না।[৪১] অবশ্য যে সব সমভূমি ও অঞ্চল বাদশাহী সরকারের কড়া নিয়ন্ত্রণে ছিল, একমাত্র সেখানেই এ কথা খাটত। পাহাড়ে বা পাহাড়ের কাছাকাছি, গিরিসঙ্কট ও জনবসতিহীন জায়গায় এ ধরনের নীতি কার্যকর করা যেত না। ডাকাত ও বিদ্রোহীরা প্রায়ই এখানে লুকিয়ে থাকত। যে সব ব্যবসায়ী এদের এলাকার মধ্যে দিয়ে যেত, তাদের কাছ থেকে এরা যা আদায় করত তাকে খেসারত বা উপঢৌকন—এর যে কোন একটা বলা যেতে পারে।[৪২] যাই হোক, বিশেষত ভারতে ইউরোপীয় বাণিজ্যের অভিজ্ঞতা থেকে সাধারণভাবে এ ধারণা পাওয়া যায় যে, কোন নিঃসঙ্গ পথিকের যা-ই বিপদ হোক না কেন, মুঘল সাম্রাজ্যের বৃহত্তর অংশে 'কাফিলা' বাণিজ্য ছিল স্বাভাবিক অবস্থায় বেশ নিরাপদ।[৪৩]

সবশেষে এও লক্ষণীয় যে, আলোচ্য পর্বে দূর পাল্লার বাণিজ্যের সহায় ছিল এক অসাধারণ সুগঠিত অর্থ ও ঋণদান ব্যবস্থা।[৪৪] হুণ্ডি কিংবা ব্যাঙ্কারের ড্রাফ্‌ট্‌ ও বিনিময় বিলের ব্যবহার ছিল ব্যাপক এবং ঐ সময়ের বিচারে তাদের বাট্টা এবং সুদের

নিয়োগ না করলে, সেখানকার রাজস্ব-আদায়কারীই ('আমালগুজার') যেহেতু 'কোতোয়াল'-এর কাজ করবে বলে ধরা হতো, সে ক্ষেত্রে তার ওপরেও নিশ্চয়ই ঐ নিয়ম খাটত (ঐ, ২৮৮)। মানুচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২১, বলেন যে, পথে "দিনে-দুপুরে কোন ব্যবসায়ী বা যাত্রীর ওপর ডাকাতি হলে", 'ফৌজদার' (অঞ্চল-অধিপতি) "খেসারত দিতে বাধ্য"। আরও দ্রষ্টব্য 'অখবারাৎ'-ক, ১৯৩। জাগীরদারদের ওপরও একই ধরনের দায়িত্ব পড়েছিল বলে মনে হয় ('ফ্যাক্টরিস, ১৬৪৬-১৬৫০', পৃ. ৩০০-৩০২ দ্রষ্টব্য)। আরও তুলনীয় 'দুর্-আল উলূম', পৃ. ৬৪ খ-৬৫ ক।

৪১. এই সব পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার প্রসঙ্গে নবম অধ্যায়, দ্বিতীয় অংশ দ্রষ্টব্য।

৪২. "তাঁকে (জাহাঙ্গীর) শুধু সমতল ও খোলা সড়কের রাজা বলেই গণ্য করা যায়। কারণ, বহু জায়গা আছে যেখানে যেতে হলে হয় ভারী দল থাকা চাই, নয় বিদ্রোহীদের বিস্তর মাশুল দিতে হবে" (পেলসার্ট, ৫৮-৫৯)। যাতায়াতের পথে সর্বদা ভয়ের কারণ ছিল: আগ্রা এবং দিল্লির মধ্যে মেও এবং জাঠ, বাঘেলখণ্ডে রাজপুত আর গুজরাটে কোলি। শেষ দুই-এর সঙ্গে সংঘর্ষের বিশদ বিবরণের জন্য মাণ্ডি, ১১০-১১, ১১৭-২০, ২৫৯, ২৬৩-৪, ২৬৯-৭০ দ্রষ্টব্য। এছাড়া গুজরাটের জন্য দ্রষ্টব্য গেলেইনসেন, *JIH*, ৪র্থ খণ্ড, ৭৩, ৭৪, ৭৯, ৮১।

৪৩. বিভিন্ন পর্যটকদের ধারণায় হেরফের দেখা যায়। ফিঞ্চ-এর প্রতিকূল বিবরণের বিরুদ্ধে মানরিক ও তাভার্নিয়ের মতো পর্যটকদের অভিজ্ঞতা উপস্থিত করা সম্ভব। উপরন্তু, কয়েকটি পথ হয়তো অন্যগুলির চেয়ে আরও নিরাপদ ছিল। যেমন, আগ্রা-পাটনার পথে "ডাকাতের বিপদ খুব বেশি ছিল না" ('ফ্যাক্টরিস, ১৬১৮-২১', পৃ. ২৬৯) এবং জৌনপুর হয়ে গেলে মাণ্ডিকেও ডাকাতের হাতে পড়তে হতো না (মাণ্ডি, পৃ. ১১০)। মুঘল আমলে আইন-শৃঙ্খলার বিষয়ে অনুকূল মতের জন্য পি. শরণ, 'প্রভিন্‌শিয়াল গভর্নমেণ্ট অফ দা মুঘলস্‌', পৃ. ৩৯৯-৪০৩ দ্রষ্টব্য।

৪৪. সুজান রায়, ২৫, উৎসাহের সঙ্গে এটিকে ভারতের অন্যতম আশ্চর্য বলে বর্ণনা করেছেন।

হার ছিল বেশ পরিমিত।[৪৫] এ ছাড়া ছিল এক সংগঠিত বীমা ব্যবস্থা। এটি পথের ক্ষয়-ক্ষতি ছাড়া[৪৬] অতিরিক্ত কর চাপানোর ঝুঁকি বহন করত।[৪৭]

বাণিজ্যের ওপর উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়ের প্রভাব যথাযথ বিচার করা সহজ নয়। যদিও মনে হতে পারে যে, এর কোনটিই যানবাহনের দ্বারা নির্ধারিত বাণিজ্যের আপেক্ষিক সম্ভাবনাগুলিকে খুব বেশি রদবদল করতে পারেনি, তবুও পুনরুক্তি করেই বলা যায়, এইসব প্রভাবের সুবিধা পেত বেশি ওজনের মালের চেয়ে বেশি দামী মাল এবং স্থলপথের তুলনায় নদীপথ বাণিজ্য ছিল বেশি সুবিধাজনক। সম্ভবত প্রশাসনের তরফ থেকে খাদ্যশস্যের পরিবহণকে কখনও কখনও উৎসাহ দেওয়া হতো; অবশ্য আবার এও দেখা গেছে যে প্রায়ই তা বাধা পেয়েছে। স্থলপথে পরিবহণ তো বেশি ব্যয়বহুল ছিলই, তার ওপর ভয়ের কারণ ছিল সর্দার ও বিদ্রোহীদের জবরদস্তি

৪৫. 'সরাফ' বা ব্যাঙ্কাররা তাদের কাছে গচ্ছিত টাকার বিনিময়ে প্রায়ই অন্যান্য জায়গায় তাদের দালাল বা প্রতিনিধিদের নামে হুণ্ডি কাটত। এসব ক্ষেত্রে হুণ্ডি ছিল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় টাকা পাঠানোর উপায়মাত্র ('আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৬২; সুজান রায়, ২৫; 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১১)। আবার ধারের দরকার পড়লে ব্যবসায়ীরাও এটি ব্যবহার করতে পারত। সেক্ষেত্রে, এটি আধুনিক 'অ্যাকোমোডেশন বিল'-এর সঙ্গে অভিন্ন (তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০, আরও তুলনীয় ফস্টার, 'সাপ্লিমেণ্টারী ক্যালেণ্ডার', ১১২ ইত্যাদি)। 'বিনিময়'-হারের ক্ষেত্রে এও লক্ষণীয় যে, 'চালানী' (চলতি) ও 'সিক্কা' (নতুন মুদ্রা) টাকার মূল্যের ফারাক ধরে হুণ্ডির তামাম শোধ করা হতো (পরিশিষ্ট 'গ' দ্রষ্টব্য; আরও দ্রষ্টব্য ফস্টার, 'সাপ্লিমেণ্টারী ক্যালেণ্ডার', ৬৪, ৮০)। ইংরেজরা সাধারণভাবে হুণ্ডি মারফৎ টাকা পাঠানোর হার ন্যায্য বলেই মনে করত (উদাহরণস্বরূপ, 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬১৮-২১', পৃ. ১৫৫, সুরাট থেকে আগ্রার ক্ষেত্রে)। আগ্রা থেকে দিল্লীর মধ্যে দর ছিল শতকরা এক (পূর্বোক্ত সূত্র, '১৬৫৫-৬০', পৃ. ১৮-১৯)। তাভার্নিয়ে যে হার দিয়েছেন, সেটি অ্যাকোমোডেশন বিলের বাট্টার হার (১ম খণ্ড, পৃ. ৩০-৩১)। তিনি বলেন: এ হার ছিল বেশ চড়া, কিন্তু তার কারণ বিল-এর অধিকারী পথে মাল হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকির ভাগ নিতেন। উপরন্তু, দূরত্ব ছাড়াও, হুণ্ডিদাতার সুনাম অনুযায়ী ছাড়ের হেরফের হতো ('ফ্যাক্টরিস্, ১৬৫৫-৬০', পৃ. ১৮-১৯)।

ব্যবসায়ে যে ব্যাপকভাবেই হুণ্ডির চল ছিল, ইংরেজদের নথিপত্র থেকে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। প্রচুর পরিমাণ টাকা পাঠানোর সময়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকেও এটি ব্যবহার করা হতো। ('আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৬২; 'ওয়াকাই দখিন', ১৭; 'নিগর-নামা-এ মুন্শী', পৃ. ৫০ ক; 'আহ্কম-এ আলমগীরী', পৃ. ১০৯ ক; 'অখবারাৎ', ৪০/৩১)। হুণ্ডির বাজার এতই প্রসারিত ছিল যে প্রকৃত লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রায়শই খুব অল্প নগদ টাকা কাজে লাগানো হতো ('মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১১)।

৪৬. সুজান রায়, ২৫, বলেছেন যে এটি 'বীমা' নামে পরিচিত ছিল।

৪৭. তুলনীয় মাণ্ডি, ২৭৮, ২৯১: যারা বিশেষ করে এ-নিয়েই কারবার করত, তারা 'আদাবিয়া' বলে পরিচিত ছিল।

আদায়। বিশেষভাবে তা ঘটত রাজপুতানার পথে।[৪৮] স্বাভাবিক ধাঁচটি বোঝবার জন্য এই তথ্যগুলি মনে রাখা উচিত। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে, বেশি গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে এই ধরনের বিশেষ দিকগুলি দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এর থেকে শুধু দূর পাল্লার বাজারের প্রভাবাধীন শস্যই নয়, এখানি যে অনুমানগুলির রূপরেখা দেওয়া হলো, তা প্রয়োগ করলে বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত আপেক্ষিক মূল্যান্তর বোঝা যাবে।

শুরুতেই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আমাদের আলোচ্য পর্বে জিনিসপত্রের কম দামের জন্য বাংলার সুনাম ছিল[৪৯] এবং রপ্তানির জন্য খাদ্যসামগ্রীর একটা বড় উদ্বৃত্ত এখানে পাওয়া যেত। করমণ্ডলে[৫০] এবং কন্যাকুমারিকা হয়ে কেরল[৫১] পর্যন্ত চাল, চিনি ও মাখন নিয়ে নিয়মিত উপকূল-বাণিজ্য চলত। জাহাজে করে চিনি যেত গুজরাটে[৫২] এমনকি পারস্যে[৫৩] পর্যন্তও, আর আফিম রপ্তানি হতো মূলত কেরলে।[৫৪] কখনও কখনও এখানকার বন্দর থেকে গম পাঠানো হতো দক্ষিণ ভারতে[৫৫] এবং পর্তুগীজ-অধিকৃত অঞ্চলে।[৫৬] ওড়িশা থেকে সমুদ্রপথে করমণ্ডলের বন্দরে রপ্তানি

৪৮. এই অংশের ২৫ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৪৯. লিনস্কোটেন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৪-৫ ; 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৯ ; বাউরি ১৯৩-৪ ; 'কলিমাৎ-এ তইয়বাৎ', পৃ. ৫০ ক। ১৬৫০-এ একজন ইংরেজ কুঠিয়াল বলেছেন, "মোম, গোলমরিচ, গন্ধক, চাল, মাখন, তেল এবং গম পাওয়া যেত হুগলীতে অন্যান্য জায়গার থেকে প্রায় অর্ধেক দামে" ('ফ্যাক্টরিস্ ১৬৪৬-৫০', পৃ. ৩৩৮)।

৫০. 'রিলেশনস্', ৪০, ৬০ ; 'ফ্যাক্টরিস্ ১৬৩৪-৩৬', পৃ. ৪১ ; বার্নিয়ে ৪৩৭। অন্যান্য রপ্তানির মধ্যে ছিল জিনজিলি-র (মিষ্টি তেল), বীজ, পিপুল, গালা, মোম, রেশম ইত্যাদি (আরও তুলনীয় সিজার ফ্রেডরিক, 'পুর্চাস্', ১০ম খণ্ড, পৃ. ১১৪)। প্রচুর ধান উৎপন্নের এলাকা করমণ্ডলে ধান রপ্তানিও উল্লেখযোগ্য। মেথওল্ড ('রিলেশনস্' ৪০) মন্তব্য করেছেন, মনে হতো এ যেন "তেলা মাথায় তেল দেওয়া। অথচ এখানেও তারা ভালো লাভেই বিক্রি করে।"

৫১. ফিচ্, রাইলি, ১৮৫, 'আর্লি ট্রাভেলস', ৪৪ ; 'রিলেশনস্', ৬০। পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজ-অধিকৃত এলাকার জন্য দ্রষ্টব্য ফিচ্, রাইলি, ১১০, 'আর্লি ট্রাভেলস্', ২৪, ২৮ এবং 'লেটার্স রিসিভড্', ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৭। (মনে হয় সম্পাদক এখানে 'ইণ্ডিয়া' (Indya) অর্থে হিন্দুস্তান ধরে ভুল করেছেন ; সে সময়কার ইংরেজদের কাছে সাধারণত এই শব্দটি বোঝাত পর্তুগীজ ভারত)।

৫২. পেলসার্ট, ১৯ ; 'ফ্যাক্টরিস্, নিউ সিরিজ', ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৬।

৫৩. বার্নিয়ে ৪৩৭, 'ফ্যাক্টরিস্ ১৬৬৮-৯', পৃ. ১৭৯ ; তপন রায়চৌধুরী, 'দা ডাচ্ ইন করমণ্ডল', পৃ. ২৪০ ; 'বেঙ্গল পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট', খণ্ড ৭৬, ১ম ভাগ, পৃ. ৩৭।

৫৪. 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬৬১-৬৪', পৃ. ৩৫৫। ওলন্দাজরা এ-ব্যবসায় জোর করে একচেটিয়া কারবার কায়েম করেছিল।

৫৫. কর্ণাটকে নিযুক্ত মুঘল সৈন্য গম পেত বাংলা থেকে ('দিলকুশা', পৃ. ১১৩ খ-১১৪ ক)।

৫৬. 'লেটার্স রিসিভড্', ৪র্থ খণ্ড, ৩২৭।

হতো মাখন ও লাক্ষা। এর সঙ্গেই যেত ৪০,০০০ টনেরও বেশি চাল।[৫৭] পূর্ব উপকূল থেকে বাংলায় আমদানি হতো তুলোর সুতো আর তামাক।[৫৮]

১৭ শতকে ওলন্দাজেরা বাংলার রেশমের এক গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্য গড়ে তোলে। তারা রেশম রপ্তানি করত জাপান ও হল্যাণ্ডে। শোনা যায়, কাশিমবাজারের বাজার থেকে ২২,০০০ গাঁট রেশমের মধ্যে প্রতি বছর ৬ বা ৭,০০০ গাঁট তারাই নিত ; মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ ও মধ্য এশিয়ার ব্যবসায়ীরা রেয়াত করলে আরও বেশি তারাই সংগ্রহ করতে পারত।[৫৯] এই শতকের শেষের দিকে, ইউরোপে তুলোর সুতো ও চিনি রপ্তানি শুরু হয়।[৬০]

গঙ্গার জলপথে বাংলা থেকে চাল এবং রেশম রপ্তানি হতো পাটনায়,[৬১] বদলে আসত গম, চিনি আর আফিম।[৬২]

গঙ্গা ও যমুনা ধরে আগ্রা পর্যন্ত চলত এক রমরমা ব্যবসা। বাংলা এবং পাটনা থেকে আগ্রা শুধু কাঁচা রেশম ও চিনিই আমদানি করত না, পূর্বাঞ্চল থেকে খাদ্যসামগ্রীও নিত : যেমন, চাল, গম ও মাখন। বলা হয় যে, আমদানি না করলে আগ্রার নিজের খাবার জুটত না।[৬৩] তার বদলে বাংলায় যেত তুলো, আফিম আর নুন। বাংলায় নুন ছিল দুষ্প্রাপ্য।[৬৪]

আগ্রা থেকে আবার চিনি, গম আর বাংলার রেশম নিয়ে যাওয়া হতো গুজরাটে,[৬৫] যদিও, বাজার হিসাবে, আগ্রা ছিল নীলের ব্যবসার জন্যই বিখ্যাত। পৃথিবীর সেরা নীল জন্মাত এরই কাছাকাছি অঞ্চলে। আর শুধু ভারতবর্ষের সর্বত্রই নয়, এই নীলের আন্তর্জাতিক বাজারও ছিল। মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রির জন্য[৬৬] আগে তা

৫৭. বাউরি, ১২১-২ ; আরও তুলনীয় সিজার ফ্রেডরিক, 'পুর্চাস', খণ্ড ১০, পৃ. ১১২-১৩', 'রিলেশনস' ৫৪।

৫৮. 'রিলেশনস' ৬০।

৫৯. তাভার্নিয়ে, ২য় খণ্ড, পৃ. ২। তিনি বলেন যে, তাঁদের শরিকরা ওলন্দাজদের সমানই নিত, বাকিটুকু পড়ে থাকত বাংলার লোকের ব্যবহারের জন্য।

৬০. 'ফ্যাক্টরিস ১৬৫৫-৬০', পৃ. ১৭৯, ২৯৭, 'ফ্যাক্টরিস, নিউ সিরিজ', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩১ ; হেজেস্, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫।

৬১. 'ফ্যাক্টরিস ১৬১৮-২১', পৃ. ১৯৩-৪ ; মাণ্ডি ১৫৩ ; বার্নিয়ে ৪৩৭। মনে হয়, আগ্রার দিক থেকে সুবিধাজনক অবস্থানের দরুন বাংলার রেশমের এক গুরুত্বপূর্ণ বাজার হতে পেরেছিল পাটনা (তুলনীয় পেলসার্ট, ৭)।

৬২. ফিচ্, রাইলি, ১১০, 'আর্লি ট্রাভেলস্', ২৪ ; বাউরি ২২৫।

৬৩. পেলসার্ট, ৪-৫, ৯ ; মাণ্ডি ৯৫-৬, ৯৮-৯। বাদশাহী দরবারে 'সুখদাস' চাল যেত বাহ্‌রাইচ থেকে ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩)।

৬৪. জুর্দা ১৬২ ; পেলসার্ট ৯। বাংলায় নুনের চড়া দামের জন্য 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯০ দ্রষ্টব্য। নুন আরও দুর্লভ ছিল আসামে ('ফথিয়া-এ ইব্রিয়া', পৃ. ৩২ খ)।

৬৫. 'ফ্যাক্টরিস ১৬১৮-২১', পৃ. ১০২, '১৬২৪-২৯', পৃ. ২৩৫-৬ ; পেলসার্ট ১৯ ; তাভার্নিয়ে, ২য় খণ্ড, পৃ. ২। পেলসার্ট ও তাভার্নিয়ে থেকে আমরা জানতে পারি যে, আহ্‌মেদাবাদের বিরাট রেশম বয়ন শিল্প পুরোপুরিই বাংলার রেশমের উপর নির্ভর করত।

৬৬. পেলসার্ট ৩০। এই কারণেই, ইউরোপে বায়ানা নীল লাহোরের নামে পরিচিত ছিল।

নিয়ে যাওয়া হতো লাহোরে, কিন্তু ইউরোপের সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথ খুলে যাওয়ায়, একমাত্র না হলেও আগ্রাই হয়ে দাঁড়ায় প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।[৬৭] ১৭ শতকের গোড়ার দিকে ইউরোপীয় বাণিজ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, অবশ্য কিছুকালের মধ্যেই এর দ্রুত অবনতি ঘটে।[৬৮]

সুদূর মোরাদাবাদ থেকে গম এবং সিরহিন্দ থেকে ভালো জাতের চাল আসত লাহোরের বাজারে।[৬৯] লাহোর এবং মুলতান থেকে চিনি ও আদা নৌকা করে পাঠানো হতো থাট্টায়। নৌকাগুলি ফিরে আসত মরিচ আর খেজুর বোঝাই হয়ে।[৭০] ভাক্কার থেকে থাট্টায় রপ্তানির জন্য মাখন আসত নদীপথে।[৭১] মাঝে মাঝে সেহ্‌ওয়ান থেকে এই একই পথ ধরে সুরাট হয়ে ইউরোপে[৭২] যাওয়ার জন্য নীল আসত বসরায়।[৭৩] যাই হোক, কোন কারণে বসরার বাণিজ্য নষ্ট হয়ে যায়[৭৪]; ইংরেজরা সেই স্থান পূরণ করতে পারেনি।[৭৫]

কাশ্মীর থেকে আগ্রা[৭৬] ও ভারতের অন্যান্য জায়গায় রপ্তানি হতো জাফরান, তার

৬৭. উৎকৃষ্ট জাতের বায়ানা নীল বেশির ভাগই কিনত ওলন্দাজ ও ইংরেজরা এবং কিনত আর্মেনিয়ান, মুগল' ও পার্সী ব্যবসায়ীরা। দোআবের খুরজা এবং কোয়েলে যে নীল জন্মাত তাও এরা প্রচুর পরিমাণে নিয়ে যেত। মেওয়াটে উৎপন্ন নীল বিশেষ করে স্থানীয় ব্যবহার ও ভারতের বাজারের জন্য চাষ করা হতো (পেলসার্ট ১৫, ১৮; 'ফ্যাক্টরিস ১৬৪২-৫', পৃ. ১৩৬)।

৬৮. আগ্রা-নীলের দাম বেড়ে যাওয়া ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ক্রীতদাস দিয়ে চাষ চালু হওয়ায় তার সঙ্গে প্রতিযোগিতাই ছিল অনেকাংশে এর জন্য দায়ী ('ফ্যাক্টরিস ১৬৪৬-৫০', পৃ. ৩২, ৭৬-৭, '১৬৫৫-৬০', পৃ. ৩২২, ৩৩৬; 'ফ্যাক্টরিস, নিউ সিরিজ', ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৫। আরও তুলনীয় মোরল্যাণ্ড, 'আকবর টু আওরঙ্গজেব', পৃ. ১১২-১১৩)। পরে এ ব্যবসায় কিছুটা উন্নতি দেখা গিয়েছিল, কারণ ১৬৮৪-৫তে ইংরেজ কম্পানি আগ্রায় ৫০০ গাঁট (নীলের) অর্ডার দিয়েছিল, যদিও যোগাড় হয়েছিল মাত্র ২১২ গাঁট ('ফ্যাক্টরিস, নিউ সিরিজ', ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৫)।

৬৯. শাহ্দারা-লাহোরের দেয় আদায়ের বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য 'খুলসতুস সিয়াক', পৃ. ৯০ ক-৯২ খ, Or. 2026, পৃ. ৫৭ ক-৫৯ ক।

৭০. পেলসার্ট, ৩১-২, 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৩৭-৪১', পৃ. ১৩৬।

৭১. 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৩৭-৪১', পৃ. ১৩৬। লিনস্কোটেন ও আবুল ফজল সিন্ধুপ্রদেশে উৎপন্ন মাখনের তারিফ করেছেন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬ এবং 'আইন' ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৬। মানুচি বলেছেন যে মাস্কাটেও মাখন রপ্তানি হতো, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৭।

৭২. পর্তুগীজদের জন্য দ্রষ্টব্য রো, ৭৫; ইংরেজদের জন্য 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৩৭-৪১', পৃ. ২৭৪; ঐ, ১৬৪২-৪৫, পৃ. ২০৩ ইত্যাদি।

৭৩. 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৩৭-৪১', পৃ. ১৩৬-৭।

৭৪. ঐ, ১৬৪২-৫, পৃ. ১৩৬।

৭৫. ঐ, ২০৩; ঐ, ১৬৪৬-৫০, পৃ. ১২-১৩, ২৯, ৩৩।

৭৬. পেলসার্ট ৩৫।

প্রতিযোগিতা চলত পাটনার বাজারে নেপাল[৭৭] থেকে আনা জাফরানের সঙ্গে। এর বদলে কাশ্মীর আমদানি করত নুন, মরিচ, আফিম, তুলো, সুতো ইত্যাদি।[৭৮]

পশ্চিম ভারতের বাণিজ্যে খাদ্যসামগ্রী আমদানির বিরাট কারবারী হিসেবে গুজরাটের অবস্থান ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মালব এবং আজমীর থেকে গুজরাট আমদানি করত গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্য এবং দখিন থেকে চাল।[৭৯] গণ্ডোয়ানার[৮০] মতো সুদূর এলাকায় উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারও এখানে ছিল, আর মালাবার[৮১] থেকেও সমুদ্রপথে আসত চাল। অন্যদিকে, প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল অর্থকরী ফসল। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তুলো। সুরাট থেকে বুরহানপুর (খান্দেশ)-এর মধ্যে তুলোর চাষ "আগ্রার বিশাল বাণিজ্যকে বাঁচিয়ে রাখত।"[৮২] সমুদ্রপথে তুলো এবং তুলোর সুতো যেত পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের বন্দরে[৮৩] এবং ঐ একই উপকূলের কেরলে।[৮৪] সময় বিশেষে, ইউরোপেও এর রপ্তানি হতো।[৮৫] গুজরাটে উৎপন্ন নীল, বিশেষত সরখেজ জাতের নীল রপ্তানি হতো ইউরোপে ও মধ্যপ্রাচ্যে।[৮৬] জাহাজে করে প্রচুর আফিম পাঠানো হতো কেরলে;[৮৭]

৭৭. মার্শাল ৪১৩। ভুটানে উৎপন্ন "পারস্যের জাফরানের মতো জাফরান" প্রসঙ্গে ফিচ্, রাইলি ১১৬, 'আর্লি ট্রাভেলস্' ২৭।

৭৮. 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী' ৩০০, ৩১৫ ; পেলসার্ট, ৩৬।

৭৯. 'আইন', ১ম খণ্ড, ৪৮৫। আমরা যেমন দেখেছি, আগ্রা থেকেও গুজরাট চাল পেত।

৮০. গড (যা আগে মালব প্রদেশের অন্তর্গত ছিল) প্রসঙ্গে আবুল ফজল বলেছেন, "এখানকার চাষ দিয়ে দখিন ও গুজরাটে ত্রাণের ব্যবস্থা হয়।" ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৬)।

৮১. ট্যুইস্ট, অনু. মোরল্যাণ্ড, *JIH*. খণ্ড ১৬ (১৯৩৭), পৃ. ৭৬। কেরলে বেশি চাল হতো না বলেই মনে হয়। তা সত্ত্বেও এই রপ্তানি চলত (তুলনীয় ফিচ্, রাইলি ১৮৫, 'আর্লি ট্রাভেলস' ৪৪)। কেরল থেকে গোলমরিচ ছাড়া আমদানির অন্যান্য জিনিস ছিল নারকেল, ছোবড়া, তাল-চিনি, সুপারি ইত্যাদি। (পেলসার্ট, ১৯, ট্যুইস্ট, ঐ ; ফ্রায়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৬)।

৮২. পেলসার্ট ৯।

৮৩. ফ্রায়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮২।

৮৪. ট্যুইস্ট, ঐ ; 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৬৫-৬৭', পৃ. ১০১।

৮৫. তুলনীয়, সুতো রপ্তানি বিষয়ে 'আকবর টু আওরঙ্গজেব', পৃ. ১৩৭-৮। পাজা তুলোর জন্য, 'ফ্যাক্টরিস ১৬২৪-২৯', পৃ. ২১২ ; '১৬৬৫-৬৭', পৃ. ১৭৭। এখানে আমরা অবশ্য বয়নশিল্পের কথা বলছি না, যা ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্যের একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল।

৮৬. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৬; 'ফ্যাক্টরিস ১৬৩০-৩৩', পৃ. ১৯-২০ ; ফ্রায়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮২। সরখেজ নীলের বেশির ভাগটাই রপ্তানি হতো। যখন অল্প উৎপাদন হতো (হিসেবমতো মাত্র ৬,০০০ (গুজরাট) মণ), স্থানীয় প্রয়োজন এর ⅙ ভাগের বেশি ছিল না ('ফ্যাক্টরিস, ১৬৪২-৪৫', পৃ. ১৬৩-৪)।

৮৭. লিনস্কোটেন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৩ ; ট্যুইস্ট, পূর্বোক্ত গ্রন্থ ; 'ফ্যাক্টরিস ১৬৬১-৬৪', পৃ. ৩৫৫ ; '১৬৬৫-৬৭', পৃ. ৯৯-১০১। গুজরাট যে আফিম রপ্তানি করত সম্ভবত তার বেশির ভাগটাই

থাট্টা,[৮৮] পারস্য[৮৯] এবং লোহিত সাগরের[৯০] বন্দরে যেত তামাক। পুনঃরপ্তানির মধ্যে ইউরোপে প্রায়ই চালান যেত চিনি,[৯১] মধ্যপ্রাচ্যে রেশম[৯২] আর মালাবারে জাফরান।[৯৩]

পশ্চিম উপকূল জুড়ে মরিচ ছিল সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়িক পণ্য। মহারাষ্ট্র এবং উত্তর কন্নড়-এর কয়েকটি এলাকার সঙ্গে স্থলপথে আগ্রার বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল খুব ঘনিষ্ঠ।[৯৪] কিন্তু মালাবারের চিরাচরিত বাণিজ্য ছিল গুজরাটের সঙ্গে—আফিম ও তুলোর বদলে সমুদ্রপথে যেত মরিচ। ১৭ শতকের ষাটের দশকে ওলন্দাজদের হাতে এ বাণিজ্য পুরোপুরি তছনছ হয়ে যায়; তারা তিনটি পণ্যেরই একচেটিয়া বাণিজ্য আয়ত্ত করে এবং মালাবারে আফিম ও সুরাটে মরিচের দাম অস্বাভাবিক চড়িয়ে দেয়।[৯৫]

আগের সমীক্ষায় এটা লক্ষ্য করবার যে, পণ্য চলাচলের সঠিক পরিমাণ ধরে আমাদের পক্ষে কিছু বলা প্রায় কখনই সম্ভব হয়নি। তাসত্ত্বেও এ কথা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়, দূর পাল্লার বাজারের জন্য উৎপাদন ছিল এই পর্বে ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। বিশাল এলাকা জুড়ে খাদ্যশস্যের উৎপাদনকে দূর পাল্লার বাণিজ্যের চাহিদা অনেকটাই প্রভাবিত করত। বাংলা থেকে রপ্তানি ও গুজরাটে আমদানি থেকে এর পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যায়। অর্থকরী ফসলের ক্ষেত্রে এই প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই আরও বেশি ছিল। যেসব অঞ্চলে বিশেষ ধরনের উঁচু মানের পণ্যের চাষ হতো (যেমন, বায়ানা এবং সরখেজে নীল, কাশ্মীরে জাফরান) সেখানে বাণিজ্যের ওপরই সাধারণ চাষীর নির্ভরতা ছিল নিঃসন্দেহে অনেক বেশি।

আসত মালব থেকে। গোল-মরিচের ব্যবসা চালানোর জন্য ওলন্দাজরা আফিম কিনত বুরহানপুর থেকে (তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯)।

৮৮. 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৪৬-৫০', পৃ. ৬০।

৮৯. ঐ, ১৬৩৭-৪১, পৃ. ১২৬।

৯০. ঐ, ১৬১৮-২১, পৃ. ৬৩।

৯১. যদিও গুজরাটে চিনি উৎপন্ন হতো তবু, রপ্তানি তো দূরস্থান, স্থানীয় ব্যবহারের জন্যও তা যথেষ্ট ছিল না। ইংরেজরা প্রায়ই চিনির যোগানের জন্য আগ্রা থেকে 'বনজারা'দের সঙ্গে চুক্তি করত ('লেটার্স রিসিভড্', ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১৫; ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮০; 'ফ্যাক্টরিস ১৬১৮-২১', পৃ. ১০২; '১৬২৪-২৯', পৃ. ২৩৫-৬, ২৭০। আরও তুলনীয় 'আকবর টু আওরঙ্গজেব', পৃ. ১৩৮-৯)।

৯২. ফ্রায়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮২।

৯৩. টুইস্ট, পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৯৪. 'ফ্যাক্টরিস ১৬৪৬-৫০', পৃ. ২৫৫; '১৬৬১-৬৪', পৃ. ৩৪৪।

৯৫. ঐ, পৃ. ২৬১; '১৬৬৫-৬৭', পৃ. ৯৯-১০১, ১৫১, ১৭৪।

২. আঞ্চলিক বাণিজ্য ; চাষী ও বাজার

স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় পরিবাহিত কৃষিজ উৎপন্নের মোট পরিমাণ সর্বসাকুল্যে অবশ্যই ছিল প্রচুর, কিন্তু ঐ সময়ের পরিবহণ ব্যবস্থার বিচারে তা কখনই মোট উৎপাদনের অতি সামান্য অংশের বেশি হতে পারত না। কৃষকসাধারণের কাছে আঞ্চলিক বাজারের গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। তার সঙ্গে আর কিছুর তুলনাই চলে না। আর, আঞ্চলিক বাণিজ্য বলতে সাধারণভাবে গ্রাম-শহরের বাণিজ্যই বোঝাত।

ঐ সময়ের উৎস-তথ্যাদি পড়লে এক বিরাট সংখ্যক শহরবাসীর অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা না হয়ে পারে না। বিদেশী পর্যবেক্ষকরা প্রায়ই শহরের বহুসংখ্যক কারিগর, পিয়ন ও চাকর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন।[১] বলা হয় যে আকবরের সাম্রাজ্যে ১২০টি বড় শহর ও ৩,২০০টি ছোট শহর ('কসবা') ছিল। এদের প্রত্যেকটির অধীনে থাকত একশ থেকে এক হাজার পর্যন্ত গ্রাম।[২] ১৭ শতকের সবচেয়ে বড় শহর ছিল আগ্রা। তার আনুমানিক লোকসংখ্যা ছিল ৫00,000, আর যখন সেখানে দরবার বসত সেই দিনগুলোয় ৬৬0,000।[৩] পরবর্তীকালে দরবার দিল্লীতে উঠে যাওয়ার সময়েও আগ্রা ছিল দিল্লীর চেয়ে বড়,[৪] যদিও আমাদের আলোচ্য পর্বে দিল্লী ইউরোপের তৎকালীন বৃহত্তম শহর প্যারী-র মতোই জনবহুল ছিল।[৫] তার গৌরবের দিনগুলিতে লাহোরকে "এশিয়া বা ইউরোপের সবার সেরা" (শহর) বলে বর্ণনা করা

১. "হিন্দুস্তানে আরেকটি ভালো জিনিস এই যে, সেখানে প্রতিটি বিষয়েই অসংখ্য ও অনন্ত কাজের লোক আছে" ('বাবুরনামা', অনু. এস. বেভারিজ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২০)। প্রামাণ্য ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে, উদাহরণত, পি. ভাল্লে, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২ এবং পেলসার্ট ৬১।

২. 'তবাকৎ-এ আকবরী', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৫-৬।

৩. আগ্রা থেকে ১৬০৯-এ জে. জ্যাভিয়ের-এর একটি চিঠিতে (হস্টেন : অনু. *JASB*, N.S., খণ্ড ২৩. ১৯২৭, পৃ. ১২১) আগের হিসেবটি দেওয়া আছে, পরেরটি মানরিক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫২-য়। মানরিক বলেছেন যে, এ হিসেব বিদেশীদের বাদ দিয়ে। ১৫৮৩-৬-তে আগ্রা এবং ফতেপুর সিক্রি দুটি শহরকেই লণ্ডনের চেয়ে বড় বলে ধরা হতো (ফিচ, রাইলি ৯৭-৮ ; 'আর্লি ট্রাভেলস্', ১৭-১৮ ; আরও তুলনীয় সলব্যাঙ্ক, 'পুর্চাস্', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৪, ফতেপুর সিক্রির বিষয়ে)। এ হলো লাহোরের গৌরব শেষ পর্যন্ত আগ্রা দখল করার আগের কথা। আওরঙ্গজেবের গোড়ার বছরগুলোয় যখন দরাবর বসত দিল্লীতে, তখন তেভেনো, ৪৯, জনশ্রুতির ভিত্তিতে স্থির করেছিলেন যে, "বড় শহর" হলেও আগ্রা এত বড় নয় "যে যুদ্ধক্ষেত্রে দু লক্ষ লোক পাঠাতে পারে"। কিন্তু জনসংখ্যা সম্পর্কে এর থেকে খুব একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

৪. বার্নিয়ে, ২৮৪ ; তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৬।

৫. বার্নিয়ে, ২৮১-২।

হয়েছে।[৬] পাটনার আনুমানিক লোকসংখ্যা ছিল ২00,000 ;[৭] এবং ১৭ শতকের গোড়ার দিকে আহ্‌মেদাবাদকে শহরতলীসহ লণ্ডনের মতোই বড় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৮] অন্যান্য বড় শহর, যেমন ঢাকা, রাজমহল, মূলতান এবং বুরহানপুর সম্বন্ধে এ ধরনের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।[৯] কিন্তু যে সামান্য তথ্য পাওয়া গেছে, তার থেকে দেখা যায় যে, দেশের শহরবাসী ও মোট জনসংখ্যার মধ্যেকার অনুপাত ছিল অনেক বেশি। আর ১৯ শতকের শহরগুলির বিরাট জনসংখ্যা হ্রাসের যে কথা আমরা জানি, তার থেকে মনে হয়, একেবারে ইদানীংকালে ছাড়া এই অনুপাত ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না।[১০]

শহরের জন্য শুধুমাত্র খাদ্য-ই নয়, হস্তশিল্পের কাঁচামালও যোগাতে হতো গ্রামাঞ্চলকেই। লক্ষণীয় এই যে, শহরের শিল্পের ওপর গ্রামগুলির নির্ভরতার সপক্ষে কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। তাই, শহরে-আনা কাঁচা মাল সম্ভবত বিলাসদ্রব্যের ব্যবসা বা শেষ পর্যন্ত শহরের মানুষের ভোগ-ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ থাকত। এ সত্ত্বেও, এত বিরাট

৬. এ কথা বলেন মনসেরাৎ, ১৫৯-৬০, যিনি ১৫৮১-তে লাহোর গিয়েছিলেন। ১৬১৫-তে কোরিআট ('আর্লি ট্রাভেলস', পৃ. ২৪৩) জানান যে লাহোর ছিল "সারা পৃথিবীর বৃহত্তম শহরগুলির একটি" এবং "বিরাটত্বে কনস্টান্টিনোপলকেও" (যা তিনি দেখেছিলেন) "ছাড়িয়ে যায়"। তিনি আরও বলেন যে, তখন লাহোর ছিল আগ্রার চেয়ে বড়। আরও দ্রষ্টব্য 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৮। পরে এর অবস্থা খারাপ হয়ে যায় (পেলসার্ট ৩০ ; তাভার্নিয়ে ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪, ৭৭)।

৭. মানরিক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪০। ১৬৭১-র পাটনার দুর্ভিক্ষে সুবাদারের খরচে যতজন মুসলমানকে কবর দেওয়া হয়, সে বিষয়ে কোতোয়াল-এর এক বিশদ বিবরণের ভিত্তিতে মার্শাল হিসেব করেছেন যে, মোট ৯০,৭২০ জন শহরবাসী এই দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারিয়েছিল। আরও আগে, কোতোয়াল-এর 'চবুতরা' থেকে বিবরণে (কিন্তু এগুলি ততটা নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় না) মৃতের সংখ্যা দেওয়া আছে প্রথমে ১৩৫,৪০০ ও পরে ১০৩,০০০ (মার্শাল, পৃ. ১৫২, ১৫৩)। এই সংখ্যা মানরিক-এর হিসেবের সঙ্গে মেলে।

৮. 'লেটার্স রিসিভড', ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮ ; উইদিংটন, 'আর্লি ট্রাভেলস', পৃ. ২০৬।

৯. আমাদের আলোচনার ভৌগোলিক সীমার বাইরে মসুলিপত্তমে ২০০,০০০ লোক বাস করত বলা হয় (ফ্রায়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯০)।

১০. বৃটিশ শাসনের প্রথম শতকে ভারতীয় শহরগুলির ভয়াবহ ধ্বংসের ফলে যে দুর্দশা দেখা দিয়েছিল "বাণিজ্যের ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার" (বেণ্টিঙ্ক)— এই বহু পরিচিত কাহিনীর বিশদ বিবরণ বোধহয় এখনও পর্যন্ত জড়ো করা যায়নি (তুলনীয় আর. পি. দত্ত, 'ইণ্ডিয়া টুডে', লণ্ডন, ১৯৪০, পৃ. ১২৪ ইত্যাদি)। মানরিক-এর হিসেব মতো আগ্রার যে জনসংখ্যা ছিল, কেবলমাত্র ১৮৯১-এ এসে বৃটিশ ভারতের সবচেয়ে বড় শহর কলকাতা তাকে ছাড়াতে পেরেছিল। কিন্তু এই মধ্যবর্তী সময়ে ভারতের জনসংখ্যা বিরাটভাবে বেড়ে যায় ; তাই তুলনামূলকভাবে বললে, কলকাতা তখনও মুঘল রাজধানী থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল। বর্তমান শতক পর্যন্ত ছোট শহরগুলির অবস্থা খারাপ হতে থাকে। ১৯০১ থেকে ১৯৩১-এর মধ্যে সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নেহাৎই তুচ্ছ।

সংখ্যক লোকের খাদ্যসহ ভোগবিলাসের যোগান নিশ্চয়ই মোট কৃষি-উৎপাদনের একটা বড় জায়গা দখল করে ছিল। আর খুব অল্প গ্রামই শহরের বাজারের টান এড়াতে পারত।

আবার এও ঠিক যে, যাকে বলা যায় বিশুদ্ধ গ্রামীণ ব্যবসা, তাও কিছু পরিমাণে ছিল। প্রধানত অর্থকরী ফসলই উৎপাদন করে এমন গ্রাম ও ছিটমহলগুলিতেও নিশ্চয়ই খাদ্যশস্যের দরকার পড়ত; এবং নুন, গুড়, তেল ও এমনকি মাখনের মতো জিনিসের ব্যবসার প্রয়োজনও অবশ্যই দেখা দিত। সব গ্রামের পক্ষে এই সব জিনিসে স্বয়ংনির্ভর হওয়া সম্ভব ছিল না। চিরাচরিতভাবে এই ধরনের বাণিজ্য চালাত কিছুটা নীচু জাতের যাযাবর ব্যবসায়ীরা। এরা সাধারণত পরিচিত ছিল 'বেদেহক' নামে, তবে এদের আরও অন্য নামও ছিল।[১১]

কৃষকের উৎপাদনের একটা বড় অংশই বাজারে পৌঁছত। তাই বাজারের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্বভাবতই অনুসন্ধানের যোগ্য। কখনও কখনও চাষী ভূমিরাজস্বের বদলে তার উৎপন্নের একটা অংশ দিয়ে দিত এবং এইসব ক্ষেত্রে জাগীরদার বা তার গোমস্তাদের মতো ক্ষমতাশালী লোকেরা তা বিক্রির ব্যবস্থা করত। তবে প্রায় সব প্রদেশেই কৃষক নগদ টাকায় রাজস্ব দিতে বাধ্য থাকত[১২] এবং তাকে নিজেকেই তার উৎপন্ন শস্য বিক্রি করতে হতো। এই ধরনের বিক্রি-বাট্টা সে প্রায়ই করত স্থানীয় বাজারে বা শহরে গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়িতে করে মাল পাঠিয়ে।[১৩] তবে নীলের মতো দামী জাতের শস্যের ক্ষেত্রে উৎসাহী ব্যবসায়ীরাই তার গ্রামে আসত।[১৪] তবে এও সম্ভব যে, বেশির

১১. 'তশরিহ্-আল আকোয়াম', পৃ. ১৬৬ খ-১৬৮ ক দ্রষ্টব্য। এই বই-এ "সার্থ-বাহক" এবং "বনজীওয়ালা"—এ দুটি নাম দেওয়া আছে। হিমুর প্রসঙ্গে আবুল ফজল অবজ্ঞাভরে মন্তব্য করেছেন যে, "সে (হিমু) ছিল মেওয়াটের এক ছোট শহর রেওয়ারী-র শস্য-ব্যবসায়ীদের নীচু জাতভুক্ত। তার জন্ম 'ধূসর' জাতে, যারা হিন্দুস্থানের শস্য-ব্যবসায়ীদের মধ্যে সবচেয়ে নীচে। পরে সে বিস্তর চালাকি ('বে-নমকি') করে রাস্তার বাজে নুন ('নমক-এ শোর') বেচত" ('আকবরনামা', ২য় খণ্ড, পৃ ৩৩৭)। বাণীর মধ্যে ফার্সী শব্দগুলিতে শ্লেষ আছে। গ্রামীণ বাণিজ্যে নুন ছিল এক প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এটি আনা হতো পাঞ্জাবের লবণ অঞ্চল ও সম্বর থেকে ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৯; মাণ্ডি. ২৪১; সুজান রায়, ৫৫, ৭৫)। আবার "লুনিয়া" নামে এক বিশেষ জাতের লোক ক্ষারমাটি থেকে ব্যাপকভাবে নুন বের করত ('তশরিহ্ আল আকোয়াম', পৃ. ৩৫৪ খ-৩৫৬ ক)।

১২ ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চম অংশ দ্রষ্টব্য।

১৩. "গাড়িবোঝাই খাদ্যশস্য বেচতে পটলাদ পরগনা ইত্যাদি অঞ্চলের চাষীরা আহ্মেদাবাদে আসে।" ('অখবারাত', A 77)। ১৬৩০-এ দেখি, সুরাটে ১০০০ (গুজরাট) মণ বিক্রির জন্যে একজন মোড়ল ('পাটেল') ইংরেজদের সঙ্গে দর-কষাকষি করছে। এর অর্ধেক ছিল তার নিজের ও বাকিটা এসেছিল ভরোচ-এর কাছে কোন গ্রাম (বা তার নিজের গ্রাম?) থেকে; মাল সরবরাহের প্রস্তাবিত জায়গার উল্লেখ নেই। ('ফ্যাক্টরিস ১৬৩০-৩৩', পৃ. ৯১)।

১৪. 'লেটার্স রিসিভড্', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২০, ২৩৪-৫, ২৪৮-৯; পেলসার্ট ১৫-১৬। এসবই বায়ানা ভূখণ্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে।

ভাগ চাষী খোলা বাজার অবধি পৌঁছতেই পারত না, কারণ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তারা দাদনদারদের কাছে মাল বেচতে বাধ্য হতো। দাদনদার ব্যবসায়ী বা গ্রামের মহাজন যাই হোক না কেন, চাষীরা সর্বদাই কম দাম পেত।[১৫] মনে হতে পারে যেসব চাষী এ ধরনের চুক্তিতে বাঁধা ছিল না, হয়তো তারা পেত ন্যায্য মূল্যের কাছাকাছি। খাজনার জন্য নগদ টাকা ও বেঁচে থাকার জরুরি তাগিদে তারা ফসল ওঠামাত্র বিক্রি করতে বাধ্য হতো। অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা সাধারণত অপেক্ষা করতে পারত।[১৬] আবার, বাজারে যাওয়ার পথে কিংবা বাজারে পৌঁছে চাষীদের হয়তো মেটাতে হতো নানা ধরনের পাওনা ও দস্তুরি।[১৭] হয়তো বিক্রির সময়েও তাদের

১৫. ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৬; পেলসার্ট ১৬। ১৬২৮-এ ইংরেজরা বায়ানার কাছে গ্রামগুলি থেকে "আগাম টাকা দিয়ে" নীল পেতে পারত মণ প্রতি ২৪½ টাকা দরে, যখন বাজারে চালু দর ছিল ৩৬½ টাকা। এমনকি দেশীয় নীল যদি 'কাঁচা'ও হয়—অর্থাৎ স্থানীয় ব্যবসায়ীরা যে নীল যোগাত তার চেয়ে এ নীল আরও ভেজা, শুকিয়ে গেলে ওজন কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে—তাহলেও দামের ফারাক যথেষ্ট। ('ফ্যাক্টরিস, ১৬২৫-৯', পৃ. ২০৮)। সুরাটের কাছে তুলো-উৎপাদক গ্রামগুলিতে ব্যবসায়ীরা ইংরেজদের দালালদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে "কয়েকটি কাছাকাছি গ্রামে পোকায় খাওয়া ও নষ্ট হয়ে যাওয়া শস্য পাঠাত; এগুলি তারা জালে ভরে নেয় ও তাড়া করে [সুরাটে] নিয়ে আসে" (পূর্বোক্ত সূত্র, ১৬৬১-৬৫, পৃ ১১২)।

১৬. চাষীদের নীল কেনার ব্যাপারে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা যে ইংরেজদের তুলনায় বেশি সুবিধা ভোগ করত, তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রো এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন ('লেটার্স রিসিভড্', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২০)।

১৭. উদাহরণস্বরূপ, 'অখবারাত', A 77 (ইতিপূর্বেই উল্লিখিত)-এ অভিযোগ করা হয়েছে যে, পটলাদ থেকে শস্য আনার সময়ে চাষীরা 'নাকাদার' ও 'চৌকীদার'দের গাড়ি পিছু ২ টাকা করে 'রাহ্‌দারী' দিতে বাধ্য হতো। আহ্‌মেদাবাদের শহরতলীর ('গির্দ') ফৌজদারেরা এদের বসিয়ে রাখত। 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬০-৬৪-তে আওরঙ্গজেবের রাজত্বের অষ্টম বছরের এক ফরমান দেওয়া আছে। গুজরাট থেকে সেখানে কয়েকটি জবরদস্তি আদায়ের খবর পাওয়া যায়। যথারীতি এগুলি নিষিদ্ধ হয়েছিল। যেমন, যে-বলদগুলি বাইরে থেকে শহরে মাল আনত (গাড়ি-টানা বা মাল-বওয়া যে জন্যই হোক), তাদের খাবারের জন্য এক টঙ্কা করে ফী দিতে হতো; যে গাড়িগুলি ঘাস ও খড় আনত, তার উপর একটা করে তামার পয়সা; যে গাড়িতে জ্বালানি কাঠ আসত, তার গাড়িপিছু পাঁচ সের করে কাঠ; আর শহরে আসার পথে অনেক জায়গাতেই বলদ বোঝাই বাদাম এলে বলদ পিছু চারটে করে বাদাম আদায় করা হতো। আবার "গরীব লোক ও চাষীরা শহরে ও শহরতলী অঞ্চলে বিক্রির জন্য সব রকমের গবাদি পশু নিতে আসত; তাদের কাছে জবরদস্তি আদায় হতো দু ভাবে: প্রথমে 'প্রবেশ'-এর নামে ও পরে বিক্রির সময়ে। যদি বিক্রি না হয় ও তারা এগুলি (গবাদি পশু) ফেরত নিয়ে যেতে চায়, তাহলে 'প্রস্থান'-এর খাতে কিছু দিতে হতো"। পত্তনে কলা ও আখের গাড়িপিছু ৪ কিংবা ৫ টাকা আদায় করা হতো, ইত্যাদি।

ওজনে[১৮] আর দামেও ঠকানো হতো।[১৯]

সবশেষে ছিল একচেটিয়া কারবার ও পাইকারী ব্যবসা ('ইহ্‌তিকার')-এর দৌরাত্ম্য। নীতিবাগীশরা এর নিন্দা তো করেছেনই,[২০] উপরন্তু সরকারীভাবেও এগুলি নিষিদ্ধ ছিল।[২১] যখন সামান্য কয়েকজন লোক মজুত মাল দখল করে ফেলত, তখন ভুগত শহরের লোক, চাষীরা নয়।[২২] কিন্তু একচেটিয়া কারবার কায়েম করার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ চাষীকে প্রায়ই তার উৎপন্ন একজন বা একদল ক্রেতা ছাড়া অন্য কারও কাছে বিক্রি করতে দিত না, ফলে মারা পড়ত চাষীও। মনে হয়, এই ধরনের স্থানীয় একচেটিয়া কারবার ছিল খুবই সাধারণ ঘটনা, যদিও এও সম্ভব যে, দরবারের অনুমোদন না থাকায় এটি সাধারণত কিছুটা নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যেতে পারত

১৮. পেলসার্ট, ১৬-১৭, আরও বর্ণনা করেছেন, নীলের ব্যবসায় ঐ কায়দায় চাষীদের কীভাবে ৪০ সেরের বদলে ৪৭ সের বা তারও বেশি দিতে হতো। তিনি বলেন, তাহলেও তাদের উৎপন্নের চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাষীরা এ ধরনের অন্যায় ব্যবহারের বিরুদ্ধে সতর্ক হয়ে উঠেছিল। ভারতের বাজারে বিক্রির জন্য মাল ওজনের সময়ে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতির প্রথা আছে। এই ওজনদার 'বয়া' বা 'কয়াল' নামে পরিচিত (তুলনীয় এলিয়ট, 'মেমোয়ার্স…', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৬)। লোকটি দু পক্ষ থেকেই দস্তুরি পেত। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার গাঁটছড়া বাঁধা থাকত ব্যবসায়ীর সঙ্গে, সে ক্রেতা বা বিক্রেতা যাই হোক (তুলনীয়, রয়্যাল এগ্রিকালচারাল কমিশন, 'রিপোর্ট', ৩৮৮-৯)। ১৬৪৬-এ এক পরোয়ানার বিষয়বস্তু থেকে তার পদের গুরুত্ব বোঝা যায়। গোকুলে 'মাণ্ডবী' বা শস্যের বাজারের 'বরাঈ' তখনও গোঁসাই বিঠলদাসের দালালদের হাতে ছিল। কোন একজন নাথ কর্তৃপক্ষকে বাৎসরিক ১৭৫ টাকা অবধি দিতে রাজি ছিল যদি এই কাজ তার হাতে দেওয়া হয়। এই সুযোগে সেই নাথ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের হঠিয়ে বাজারে একচেটিয়া দখল কায়েম করতে চাইছে—এই আর্জি পেশ করার ফলে তার প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায়। (জাভেরী, 'ডকুমেণ্টস', ৯)। আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০১-এ নিষিদ্ধ উপশুল্কগুলির মধ্যে 'কয়ালী'-র নামও দেখা যায়। সম্ভবত, এই সুযোগে ব্যবহারের জন্য যে-টাকাটা সে কর্তৃপক্ষকে দিতে বাধ্য থাকত--সেটিকেই বোঝানো হয়েছে, ওজনদারের দস্তুরি নয়।

১৯. তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪-২৫।

২০. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯১-য় বলা হয়েছে, সব পেশার মধ্যে এটি সবচেয়ে নীচ।

২১. 'ইন্‌শা-এ আবুল ফজল', পৃ. ৬৫ ('মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৯-৭০); 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৪।

২২. অনটনের সময়ে এ ধরনের বেসরকারী বা বিশুদ্ধ বাণিজ্যিক একচেটিয়া কারবার আরও তাড়াতাড়ি কায়েম হতে পারত। তাই ১৬৫৭-য় আগ্রায় যখন অপ্রত্যাশিতভাবে প্রচুর পরিমাণে ফসল হয়, তখন বলা হয়েছিল: "আগের বছরগুলির মুনাফার মধুতে প্রলুব্ধ হয়ে যে সব 'শেরফ' ও অন্যান্যরা প্রচুর পরিমাণে চিনি, শস্য আর তুলো মজুত করেছে, তারা তাদের লগ্নী টাকার একের-তিনভাগও চোখে দেখবে না।" [মূলে আছে "…are like to bee scarce one third part of the money they disbarced…"। ইরফান হবিব 'bee'-র জায়গায় 'see' পড়ার পক্ষপাতী।] ('ফ্যাক্টরিস ১৬৫৫-৬০', পৃ. ১১৮)।

না।[২৩] ১৬৩৩ সালে বাদশাহী মদত ও মঞ্জুরী পেয়ে সারা সাম্রাজ্য জুড়ে একচেটিয়া নীল ব্যবসার পত্তন হয়। তিন বছর অবধি এটি চালু থাকার কথা ছিল। কিন্তু দুবছরের মধ্যেই তা পরিত্যক্ত হয়, বোধহয় এই কারণে যে "অনেক চাষী (যারা সাধারণভাবে অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও দুর্দান্ত লোক)" প্রতিবাদস্বরূপ তাদের "চারাগাছ উপড়ে ফেলেছিল।"[২৪]

২৩. আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের অষ্টম বছরে গুজরাটের দেওয়ানের উদ্দেশে জারি-করা এক ফরমানে নিষিদ্ধ কাজকর্মের তালিকায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেওয়া হয়েছে: "১৩. ঐ প্রদেশের বেশির ভাগ পরগনার কর্মচারী ও শেঠ (ব্যবসায়ী) এবং দেসাই (মোড়লরা) অন্য কোন লোককে নতুন তোলা ফসল কিনতে দেয় না। তারাই প্রথমে এগুলো কিনবে, তারপর জোর করে ব্যাপারীকে পচা বা নোংরা যা কিছু গছিয়ে দেবে; এবং (ভালো) শস্যের হারেই দাম দিতে বাধ্য করবে।... ২৩. আহ্‌মেদাবাদ ও তার শহরতলীগুলি এবং ঐ প্রদেশের পরগনাগুলিতে কিছু লোক চাল কেনা-বেচার কারবার একচেটিয়া করে ফেলেছে। তাদের অনুমতি ছাড়া কেউ কেনা-বেচা করতে পারে না। এর জন্যেই গুজরাটে চালের দাম বেশি।" ('মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬০-২৬২)। ১৬৪৭-তে আমরা দেখি যে, আহ্‌মেদাবাদে ইংরেজ কুঠিয়ালরা সুবেদার শায়েস্তা খানের "এ জায়গার একমাত্র বণিক" হওয়ার উচ্চাশা লক্ষ্য করে খুবই সন্ত্রস্ত। তাঁরা বলেছিলেন যে, যদি তিনি (শায়েস্তা খান) নীলের কারবার কব্জা করতে পারেন, তাহলে "আমরা আশা করতে পারি কিছুদিনের মধ্যে তাঁর কাছেই আমাদের মাখন ও চাল নিতে হবে।" ('ফ্যাক্টরিস ১৬৪৬-৫০', পৃ. ১৩০)। এর থেকে দেখা যায় যে, তখনও পর্যন্ত এসব পণ্যের ওপর একচেটিয়া দখল কায়েম হয়নি। এও সম্ভব যে, আওরঙ্গজেবের গোড়ার বছরগুলিতে অনটনের সময় এই (একচেটিয়ার) ঝোঁক আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। শায়েস্তা খানের বাণিজ্যিক উচ্চাশা পরবর্তী সময়ে বাংলা পর্যন্ত ছড়িয়েছিল। তাঁর এক ভাট বলেন যে শায়েস্তা খান আসার আগে পর্যন্ত সেখানে (বাংলায়) "এ প্রদেশের রাজকর্মচারীরা খাবার জিনিস ও জামাকাপড় এবং পণ্যদ্রব্য ও মালের (ব্যবসা) একচেটিয়া করে ফেলেছিল। এগুলি তারা নিজেদের ইচ্ছামতো দামে বিক্রি করত...। এই মহান সেনাধ্যক্ষ, ন্যায় ও ঔদার্যের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠাতা এ ধরনের হীন প্রথা অনুসরণ করেননি; তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে কেউ ইচ্ছামতো কেনা-বেচা করতে পারে।" ('ফথিয়া-এ ইব্রিয়া', পৃ. ১২৭ খ)। এ নির্দেশ বাস্তবিক কতদূর বলবৎ হয়েছিল তা সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে বিচার করা যেতে পারে। "নবাবের (শায়েস্তা খানের) পদস্থ কর্মচারীরা জনসাধারণকে শোষণ করত, অধিকাংশ জিনিসের, এমনকি পশু (খাদ্যের) ঘাসের মতো কমদামী জিনিস, বেত, জ্বালানি কাঠ, চাল ছাইবার খড় ইত্যাদিরও একচেটিয়া কারবার করত। দেশী হোক, বিদেশী হোক, যে কোন ধরনের ব্যবসায়ীর ওপরে অত্যাচার চালাতে তাদের উপায়ের অভাব হয়নি...।" (মাস্টার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০)।

২৪. 'ফ্যাক্টরিস্ ১৬৩০-৩৩', পৃ. ৩২৪-৫। এখানে আগ্রা প্রদেশের চাষীদের কথাই বলা হয়েছে। ওলন্দাজ ও ইংরেজরা জোট বেঁধে একচেটিয়া কারবারের বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু তা বেশিদিন টেঁকেনি (ঐ, ১৬৩০-৩৩, পৃ. ৩২৭-৮; ১৬৩৪-৩৬, পৃ. ১, ১২)। একচেটিয়া

চাষীর ঋণগ্রস্ততা, নানা ধরনের তোলা, বাজারের অনাচার, এবং (তার ওপর) একচেটিয়া কারবার চাপানো—এ সবই নিশ্চিতভাবে বাজার দাম ও চাষীর প্রাপ্যের মধ্যে ফারাক বাড়াতে সাহায্য করে। এসব সত্ত্বেও সাধারণভাবে এই দুই দামের মধ্যে একটা অনুপাত বজায় থাকত। পার্থক্যের মাত্রা খুব বেশি হলে, ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা সরাসরি চাষীদের থেকে কেনার চেষ্টা করত[২৫] এবং দেখা গেছে যে, এসব ক্ষেত্রে চাষীরা সঙ্গে সঙ্গে দাম বাড়িয়ে দেওয়ার মতো বিচক্ষণতার পরিচয় দিত।[২৬] বাস্তবিক-পক্ষে আমরা দেখি, চাষবাসের কাজ বাজারের চাহিদার ওপর ঘনিষ্ঠভাবে, এমনকি নিরুপায় হয়ে নির্ভর করত। উদাহরণস্বরূপ, ১৬৩০-৩২এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পরে গুজরাটের চাষীরা চড়া দামের প্রত্যাশায় তুলোর বদলে খাদ্যশস্যের চাষ করেছিল।[২৭] একইভাবে, চল্লিশের দশকে সিন্ধু প্রদেশে নীল ব্যবসায় টান পড়ায় নীল চাষের কাজও কমে গিয়েছিল।[২৮] সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হবে—এমন যে কোন চাষের কাজে চাষীদের তৈরি থাকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো তামাক চাষের দ্রুত প্রসার। এ বিষয়ে সমসাময়িক একজনের মনে হয়েছিল : চাষীরা সত্যিই বাজারের ভবিষ্যৎ আঁচ করতে পারছে।[২৯]

কারবার বিস্তৃত ছিল গুজরাট পর্যন্ত; সেখানে আবার "অবাধ বাণিজ্য" চালু হওয়ার কথা পাওয়া যায় 'ফ্যাক্টরিস্ ১৬৩৪-৩৬', পৃ. ৭০, ১৪২-এ।

২৫. আগ্রায় নীল ব্যবসার তথ্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, বিদেশী ব্যবসায়ীরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী হয় স্থানীয় ব্যবসায়ী নয় চাষীদের থেকে নীল কিনতে পারত। পেলসার্ট, পৃ. ১৫-১৬ বিশেষ-ভাবে দ্রষ্টব্য। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম দিকে দিল্লীতে যখন খাদ্যশস্য পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন "শহরের লোক দলে দলে চলে গিয়েছিল গ্রামে যেখানে শস্য বিক্রি হতো।" ('আলমগীরনামা', পৃ. ৬১১)।

২৬. যেমন আগ্রার কাছে নীলের জমি। তুলনীয় 'লেটার্স রিসিভড্', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৩৫, ২৪৯; পেলসার্ট, ১৬।

২৭. "['শস্যের চড়া দাম'] গ্রামের লোকেদের নিঃসন্দেহেই সেই পথে নিয়ে যায়, যা তাদের পক্ষে সবচেয়ে লাভজনক হয়েছে। তাই তারা তুলোর চাষ বন্ধ করে দিয়েছিল; আগের দিনের অনুপাতে আর তা করা যাচ্ছিল না, কারণ সব ধরনের শিল্পী ও কারিগর খুবই দুর্দশায় পড়ে মারা গিয়েছিল বা পালিয়ে গিয়েছিল…।" ('ফ্যাক্টরিস, ১৬৩৪-৩৬', পৃ. ৬৪)।

২৮. মধ্যপ্রাচ্যে সেহ্ওয়ান নীলের চাহিদা পড়ে গিয়েছিল। "এর মূল্য এতই দারুণভাবে কমে গেছে যে, যেখানে ঐ নীলের চাষ হয় সেখানকার চাষীরা প্রায় ভিখিরি হয়ে গেছে এবং এর ফলে তারা বছরে যে পরিমাণ নীলচাষ করতে অভ্যস্ত তাও কমবেশি মাত্রায় কমিয়ে ফেলেছে।" ('ফ্যাক্টরিস্, ১৬৪২-৪৫', পৃ. ১৩৬)।

২৯. সুজান রায়, ৪৫৪। 'বাজারের সঙ্গে তাল রাখা'র ব্যাপারে চাষীদের সাধারণ প্রবণতার বিষয়ে মোরল্যাণ্ড, 'আকবর টু আওরঙ্গজেব', পৃ. ১৯০-৯২ দ্রষ্টব্য।

৩. কৃষিপণ্যের দামের ওঠা-নামা

চাষীর কাছে বাজার-দামের ওঠা-নামার গুরুত্ব কতখানি তা বিশেষ করে বলার দরকার পড়ে না। প্রাসঙ্গিক তথ্য নিয়ে আলোচনার আগে, কয়েকটি বিষয়ে বোধহয় সাবধান হওয়া প্রয়োজন। ঋতুভেদ এবং ফসলের গুণাগুণ অনুযায়ী কৃষিপণ্যের দামের প্রচণ্ড হেরফের হতো। উপরন্তু, বিভিন্ন অঞ্চলে দামের পার্থক্যও ছিল বিরাট। এ ঘটনাগুলি, আমাদের হাতে যেটুকু সামান্য তথ্য আছে তার অধিকাংশেরই মূল্য যথেষ্ট কমিয়ে দেয়। স্বাভাবিক ফসলের বছরগুলির দামের উল্লেখ যেখানে পাওয়া গেছে সেসব অঞ্চলের তুলনামূলক আলোচনা অনুচিত হবে না। যেমন, দূর পাল্লার বাণিজ্যের ধরন সম্পর্কে আলোচনা থেকে আমরা কয়েকটি প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পণ্যের আপেক্ষিক মূল্যস্তরের সামান্য পরিচয় পেয়েছি। এই ধারণা থেকে মোটা দাগের কিছু নির্দেশ করার জন্যে আন্তরাঞ্চলিক তুলনার মূল্য থাকতে পারে।

আলোচ্য পর্বের দাম সম্পর্কে বিস্তারিত তালিকা পাওয়া যায় 'আইন'-এ। আবুল ফজলের কথা থেকে স্পষ্ট মনে হয় যে বাদশাহী দরবারে এইসব দাম স্বাভাবিক বলেই গণ্য হতো।[১] 'আইন' লেখার সময় কয়েক বছরের জন্যে দরবার বসত লাহোরে। কিন্তু এইসব দামকে ঐ শহরে সাধারণভাবে চালু দাম মনে করলে ভুল হতে পারে, কারণ অন্যত্র এ কথা নির্দিষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে লাহোরে দরবার আসার ফলে পাঞ্জাবের কৃষিজ উৎপাদনের দাম খুবই বেড়ে গিয়েছিল।[২] তাই, 'আইন'-এ বর্ণিত দাম সাধারণভাবে লাহোরে প্রচলিত দামের তুলনায় বেশি হওয়াই সম্ভব। এগুলি কতখানি অন্য রাজধানী আগ্রার মূল্যসূচক, তা বলা শক্ত, কেননা এই দুটি শহরের আপেক্ষিক মূল্যস্তরের কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই। এই দুই শহরের মধ্যে শস্যের কোন বাণিজ্য চালু ছিল বলে মনে হয় না, তবে সম্ভবত পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলি থেকে আগ্রায় শস্তার খাদ্যসামগ্রী আসত নদীপথে এবং সাধারণত লাহোরের চেয়ে সেখানে দাম কমই ছিল। আলোচ্য পর্বের শেষের বছরগুলিতে আগ্রা ও লাহোর, এই দুজায়গারই খাদ্যশস্যের দামের কিছু তথ্য পাওয়া গেছে; 'আইন'-এ উল্লিখিত দামের সঙ্গে

১. দামের তালিকার ভূমিকায় আবুল ফজল নীচের ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন: "খাদ্যসামগ্রীর দামের 'আইন': যদিও কুচকাওয়াজ ও বর্ষা ইত্যাদির সময়ে দামের প্রচণ্ড তারতম্য ঘটে, তথাপি গড় দামগুলির সারণি নীচে দেওয়া হলো, যাতে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসুরা জ্ঞানলাভের উপায় পেতে পারেন।" ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০)। মোরল্যাণ্ড (*JRAS*, ১৯১৭, পৃ. ৮১৫ ইত্যাদি) মনে করেন যে-দামগুলি দেওয়া আছে তা মীর বকাওয়াল (বাদশাহী রসুইখানার তত্ত্বাবধায়ক) সঙ্গত বলে মনে করেছিলেন এবং খাদ্যসামগ্রী কেনার ব্যাপারে এটিই অনুসরণ করা হতো। তা সম্ভব নয়, কেননা মীর বকাওয়াল মনে হয় দূর দূর অঞ্চল থেকে সওদা করতেন, স্পষ্টতই যেখানেই সেরা জিনিস পাওয়া যেত ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩)। এ ধরনের কেনাকাটার সময় তিনি যে-দাম দিতেন, দরবারের দৈনিক মুদ্রা তৈরির পরিমাণ দিয়ে তা প্রভাবিত হতো না, কিন্তু সৈন্যশিবিরের বাজারে ঠিক সেই ঘটনাই ঘটত, যেখান থেকে কেনাকাটা করত সৈন্য ও দরবারের অন্যান্য সহযাত্রীরা।

২. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৪৭।

এগুলির একটি তাৎপর্যপূর্ণ তুলনা করা যেতে পারে। ১৬৭০-এ রবিশস্যের খুব ভালো ফলন হয়েছিল। ১৬৭০-এর মার্চ বা ঐ সময় নাগাদ আগ্রা থেকে পাওয়া দাম দরবারে বিশেষভাবে জানানো হয় এবং একজন ঘটনাপঞ্জি-লেখক পরম সন্তোষের ভঙ্গিতে তা নথিবদ্ধ করেন।[৩] লাহোর সংক্রান্ত তথ্য অবশ্য ততটা সন্তোষজনক নয়। ১৭০২ সালের জানুয়ারি মাসের তারিখ-দেওয়া একটি দলিলে দামগুলো দেওয়া আছে। বলা হয়েছে যে, এগুলি শাহ্দারা-লাহোরের বাজার-পাওনার হিসাব খাতা থেকে নেওয়া।[৪] তিনটি সূত্র থেকে পাওয়া তুলনামূলক দামগুলি পাশাপাশি নীচের সারণিতে দেওয়া হলো। যেহেতু দামগুলি 'মণ-এ শাহ্জাহানী'র টাকার ভিত্তিতে লেখা তাই দামের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়েছে।[৫]

	'আইন'	১৬৭০ : আগ্রা	১৭০২ : লাহোর
গম	০.৪০	১.১৪	১.১৪
সুখদাস চাল	৩.৩৩	২.৮৬	২.০০
ছোলা	০.২৭	০.৯৫	...
ঘি	৩.৫০	১০.০০	...
মুগ	০.৬০	...	১.০০
মোঠ (একজাতের ডাল)	০.৪০	...	১.০০

১৬৭০-এ ভালো ফসল হওয়া সত্ত্বেও আগ্রাতে জিনিসপত্রের দাম আকবরের আমলের চেয়ে সাধারণভাবে তিনগুণ বেশি ছিল এবং ১৭০২ সালে লাহোরের দাম সম্পর্কেও কার্যত একই কথা সত্য। তবে সুখদাস জাতের চালের ক্ষেত্রেই একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায়। একে এই উঁচু মানের চালের বাজার ছিল সীমাবদ্ধ, তার ওপর আবার এও সম্ভব যে 'আইন'-এ যাকে 'সুখদাস' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, পরবর্তীকালে অন্যান্য নীচু মানের চালের ক্ষেত্রেও ঐ নামটিই ব্যবহার করা হতো।[৬]

এছাড়া আরও কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা ওপরের সারণির অন্তত দুটি দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে। আমরা জানি যে, গুজরাটে গমের ঘাটতি ছিল এবং আগ্রা থেকে এনে সেই ঘাটতি পূরণ করা হতো; ফলে আগ্রার তুলনায় গুজরাটে নিঃসন্দেহে গমের দাম ছিল চড়া। আরও জানা যায়, ১৬৩০-

৩. 'ম'আসির এ আলমগীরী', পৃ. ৯৮ (Add. 19,495, পৃ. ৫৪ খ)। এর কথা থেকে বোঝা যায়, যে-দাম বলা হয়েছে তা অস্বাভাবিক শস্তা বলে ধরা হতো। "গৃহস্থালীর কর্মচারীরা ('বায়ুতাত') রাজধানী আকবরাবাদ (আগ্রা)-র শস্যের দাম জানাল বাদশাহ্কে, যাঁর দর্শনে দেহ ও চিত্ত উৎফুল্ল হয়, ধর্ম ও জগৎ সুখী হয়!···(দামগুলি উদ্ধৃত হয়েছে)। লোকে তাদের প্রার্থনার বীণায় ধন্যবাদের গীত গায়···"।

৪. 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৯০ ক-খ; Or. 2026, পৃ. ৫৭ ক-৫৯ ক।

৫. পরিশিষ্ট 'খ' ও 'গ'-তে উপনীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এগুলি ধরা হয়েছে।

৬. সুখদাস জাতের চাল এখন আর চেনার উপায় নেই; মনে হয়, এর বদলে অন্য কোন নাম চালু হয়ে গেছে। সুখদাসের প্রশংসার জন্য সুজান রায়, ১১ দ্রষ্টব্য।

৩২-এর দুর্ভিক্ষের আগে গুজরাটে গম বিক্রি হতো সাধারণত 'মণ-এ শাহ্‌জাহানী' পিছু ০.৭৯ টাকা দরে।[৭] এই দাম 'আইন'-এ দেওয়া দামের প্রায় দুগুণ। কিন্তু এর চেয়েও বেশি উল্লেখযোগ্য যে, ১৬৭০-এ আগ্রায় যে-দামে গম পাওয়া যেত, তার থেকে এটি একের-তিন ভাগ কম। অন্যদিকে, যে-বিহারে খাবার-দাবার শস্তা বলে সুখ্যাতি ছিল,[৮] এবং যেখান থেকে খাবার পাঠানো হতো আগ্রায়, সেই বিহারে ১৬৫৯-এ গমের দাম ছিল ০.৫০ টাকা,[৯] 'আইন'-এ দেওয়া দামের তুলনায় একের-চার ভাগ বেশি। এই তুলনাগুলি ব্যাখ্যা করা তবেই সম্ভব যদি আমরা মেনে নিই যে, আকবর ও আওরঙ্গজেবের আমলের মধ্যে গমের দাম অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সাধারণভাবে, ঘি-র দাম বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমরা অনুরূপ প্রমাণ দিতে পারি। গাওয়া ও ভঁয়সা জাতীয় দ্রব্যের জন্য ভাক্করের সুনাম ছিল এবং এখান থেকে অন্যান্য অঞ্চলে ঘি রপ্তানি হতো ; সুতরাং অন্য জায়গার চেয়ে ঘি-র দাম এখানে শস্তা হওয়ার কথা। ১৬৩৯-এ এই দাম ছিল ৫'৩৩ টাকা।[১০] বিহার বাদে[১১] অন্যান্য অঞ্চলের ক্ষেত্রে পরে যে-দামের উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে এই দাম সবচেয়ে কম হলেও, 'আইন'-এর দর ৩'৫০ টাকা ও ১৬১১-তে সুরাটের ৫ ৮৩ টাকা দামের সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে।[১২]

৭. ট্যুইস্ট, মোরল্যাণ্ড অনু. *JIH*, খণ্ড ১৬, পৃ. ৬৮। অক্টোবর ১৬১১-য় ইংরেজরা সুরাটে 'মণ-এ শাহ্‌জাহানী' পিছু ১'৩৬ টাকার সমান দরে গম কিনেছিল ('লেটার্স রিসিভড্', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪১)। মোরল্যাণ্ড যেমন দেখিয়েছেন, দর-কষাকষির অসুবিধার সময় একটি জাহাজের জন্য এই গম কেনা হয়েছিল। বছরের সেই সময় গমের দাম নিশ্চয়ই ছিল সবচেয়ে চড়া। ('আকবর টু আওরঙ্গজেব', পৃ. ১৭১)। ১৬১৯-এর ফেব্রুয়ারিতে একটি ব্যান্টমগামী জাহাজে 'শস্যে'র চালান হয়েছিল ০.৯১ টাকার মতো দরে ('ফ্যাক্টরিস্ ১৬১৮-২১', পৃ. ৬৩)।

৮. তুলনীয় 'কলিমৎ-এ তৈয়্যাবৎ', পৃ. ৫০ ক। বাংলার সঙ্গে একযোগে এটি দেওয়া আছে।

৯. 'দস্তুর-আল আমল-এ আলমগীরী', পৃ ৫৭ ক-খ, ৫৯ খ।

১০. 'ফ্যাক্টরিস্ ১৬৩৭-৪১', পৃ. ১৩৬।

১১. 'দস্তুর…আলমগীরী', পৃ. ৫৯ খ। শস্তায় ভালো দুধের জন্য 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৬-য় বিহারের প্রশংসা করা হয়েছে।

১২. 'লেটার্স রিসিভড্', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪১। বৃদ্ধ বয়সে ভীমসেন স্মরণ করেছেন যে ১৬৫৮-য়— তাঁর স্মৃতিকথা লেখার প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে—"খাদ্যশস্য, যেমন গম ও ছোলা মণপিছু ২½ টাকা দরে বিক্রি হতো এবং 'জুওয়ার' ও 'বাজরী' ছিল মণপ্রতি ৩½ টাকা।" তিনি আরও বলেছেন যে, আওরঙ্গজেবের রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে (১৬৫৯-৬০) দখিনে গম ও ছোলা সাধারণত টাকায় ২ মণ দরে বিক্রি হতো ('দিলকুশা', পৃ. ১৫ খ, ২০ খ)। হয় তাঁর স্মৃতি তাঁকে ছলনা করেছে, নয় এই কম দাম বেশিদিন চালু থাকে নি। আমাদের সৌভাগ্য যে, যে ১৬৬১-তে আওরঙ্গাবাদ বাজারে চালু দামের এক সরকারী বিবরণ পাওয়া গেছে। এতে দেখা যায়, তখন গম বিক্রি হতো টাকায় ¾ মণ আর ছোলা টাকায় এক মণের একটু কম। 'জুওয়ার'-এর দর ছিল টাকায় এক মণের সামান্য বেশি এবং 'বাজরী' এক মণের সামান্য কম।

এই পর্বে ইংরেজদের বাণিজ্য-বিষয়ক নথিপত্রে প্রায়ই চিনির দাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিছুটা বিশদভাবে এর গতিপ্রকৃতি অনুসন্ধান করা যেতে পারে। 'নবাৎ' বলে বেশ উঁচু জাতের মিহি চিনি এবং লাল চিনি বাদে, 'আইন'-এ সাদা মিছরি ('কন্দ্-এ সফেদ') ও সাদা (গুঁড়ো) চিনি ('শক্কর-এ সফেদ') এই আরও দুটি অন্য জাতের চিনির দাম দেওয়া আছে; 'মণ-এ শাহ্জাহানী'র হিসাবে এদুটির দাম ছিল যথাক্রমে ৭.৩৩ টাকা ও ৪.২৭ টাকা।[১৩] মনে হয় ১৬১৫ সালে "আগ্রা ও লাহোরের মধ্যে" সাদা (গুঁড়ো) চিনির দর ছিল ২·৭৫ টাকা থেকে ৩·০০ টাকার মধ্যে।[১৪] তবুও ১৬৩৯-এ লাহোরে 'সাদা মিছরি'র দাম ১১·০০ টাকার কম ছিল না এবং বলা হয়েছে সবচেয়ে ভালো (গুঁড়ো) চিনির দাম ছিল ৭·০০ টাকা। খারাপ জাতের চিনি পাওয়া যেত ৫·৭৫ টাকা থেকে ৬·০০ টাকার মধ্যে।[১৫] ১৬৪৬-এ আগ্রায় 'খুব মিহি' জাতের চিনি বিক্রি হতো ৬·০০ টাকায়[১৬] এবং বলা হয়েছে ১৬৫১-য় এর দাম ৬·০০ টাকার[১৭] 'ওপরে যায়নি'। এভাবে, ১৭ শতকের প্রথম ভাগেই সাম্রাজ্যের মধ্যাঞ্চলে চিনির দাম ৪০ শতাংশ বা তারও বেশি বেড়ে গিয়েছিল। গুজরাটের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চলে আগ্রা থেকে প্রচুর পরিমাণে চিনি আনা হতো, ফলে এখানে দাম কিছুটা চড়া হওয়ার কথা। তবুও ১৬১৩-য় আহ্মেদাবাদে 'গুঁড়ো চিনি' ৪·৪৪ টাকা দরে বিক্রি হতো[১৮]। টেরি হিসেব করেছেন এর দাম ছিল সাধারণত ৪·৯৩ টাকা[১৯] (অবশ্য টেরির অভিজ্ঞতা

টাকায় ২০ সের গুড় ও ৪ সের ঘি—ভীমসেন এই যে দর দিয়েছিলেন, বিবরণটি তার সঙ্গে মেলে, যদিও এতে নীচু মানের জিনিসেরই দাম দেওয়া হয়েছে। ('ওয়াকাই দখিন', ৩৭-৪৪)। আরও তুলনীয় রামগীর 'সরকার'-এর ১৬৬২-র দামের বিবরণ, 'দফ্তর-এ দিওয়ানী' ইত্যাদি, ১৭১-৫; 'ওয়াকাই দখিন', ৭৫-৭৭।

শস্যের দামের উল্লেখ আছে, 'ওয়াকাই-এ আজমীর', পৃ. ১৪, ১৪৮, ৩৪৩, ৫৯৯, ৭০৩ (আওরঙ্গজেবের ২১-২৪তম শাসন-বর্ষের)। কিন্তু এ অঞ্চলের জন্য আগের কোন তথ্য না থাকায় আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যে এটি বিশেষ কাজে লাগবে না।

১৩. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫।

১৪. স্টিল ও ক্রোথার, 'পুর্চাস্', ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৮। "চল্লিশ সেরের বড় মণ" হিসেবে যে দাম দেওয়া হতো, আমি তাকে 'মণ-এ জাহাঙ্গীরী' হিসেবে ধরেছি, 'মণ-এ আকবরী' নয়। চিনির ব্যবসায় যদি তখনও 'মণ-এ আকবরী' চালু থাকে, তাহলে 'মণ-এ শাহ্জাহানী'র অঙ্কে মণ পিছু ৩·৩৩ টাকা থেকে ৩·৬৬ টাকা দাঁড়াবে।

১৫. 'ফ্যাক্টরিস্ ১৬৩৭-৪১', পৃ. ১৩৫।

১৬. ঐ, ১৬৪৬-৫০, পৃ. ৬২।

১৭. ঐ, ১৬৫১-৫৪, পৃ. ৫২।

১৮. 'লেটার্স রিসিভড্', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৫-৬।

১৯. টেরি, 'আর্লি ট্রাভেলস্', পৃ ২৯৬-৯৭: (চিনি) "শোধিত হওয়ার পর দুই পেন্সে এক পাউণ্ড বা তারও কমে আনা যেত।" তিনি সাধারণত ১ টাকা সমান ২ শিলিং ৬ পেন্স ধরে হিসেব করেছেন (ঐ, ২৮৪, ৩০২)।

সীমাবদ্ধ ছিল শুধুমাত্র গুজরাট এবং মালবেই, ১৬১৬-১৬১৯-এর মধ্যে)। এসব সত্ত্বেও, ১৬২২-এ আহ্‌মেদাবাদে চিনিকে 'খুবই আক্রা' বলা হয়েছে ; তার দাম ছিল প্রায় ৯'১১ টাকার সমান।[২০] পরে, ১৬২৮ থেকে ১৬৩০-এ এই দাম ওঠানামা করত ৮ টাকা থেকে ৯ টাকার মধ্যে।[২১] ১৬১৯-এ সুরাটে দাম ছিল ৭'১১ টাকা বা ৮'০০ টাকা,[২২] কিন্তু ১৬৩৫-এর দুর্ভিক্ষের পরে দাম গিয়ে দাঁড়ায় ১১'৭৭ টাকায়।[২৩] মনে হয়, এর ফলে ইংরেজরা সরাসরি আগ্রা থেকেই তাদের সওদার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত বাংলা থেকে চিনি কেনাই তারা সঠিক উপায় বলে মনে করেছিল।[২৪] বাংলায় এটি ছিল সবচেয়ে শস্তা এবং পাওয়াও যেত প্রচুর : আগ্রাও এখান থেকেই চিনি আমদানি করত। বাংলা থেকে ১৬৫০, ১৬৫৯ এবং ১৬৮৩-তে চিনির যে-দর পাওয়া গেছে তার হার ৪ টাকা থেকে ৫ টাকার মধ্যে।[২৫] বাংলার চিনির দামও এই সময় বেড়ে গিয়ে এই শতকের গোড়ায় মধ্যাঞ্চল ও গুজরাটের দামের প্রায় সমান হয়ে দাঁড়ায়।

সবশেষে, নীলের দাম নিয়ে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। এ ব্যাপারে আমাদের তথ্য সবচেয়ে বেশি। মোরল্যাণ্ড সরখেজ নীলের দাম বিষয়ক তথ্যাদির বিশদ পরীক্ষা করেছেন, এবং তাঁর মতে, এর মূল্যবৃদ্ধির কোন নির্দিষ্ট ইঙ্গিত নেই।[২৬] সরখেজ নীলের উৎপাদন ইউরোপীয় বাণিজ্যের ওপর অত্যন্ত বেশি পরিমাণে নির্ভরশীল ছিল। তবে সম্ভবত এটির চাহিদা খুবই কমে যাওয়ায় দাম বাড়ার ঝোঁকও কমে যায়। কারণ পশ্চিম ভারতের চাষ থেকেই এর চাহিদা ক্রমেই মিটে যাচ্ছিল। বায়ানা নীলের ক্ষেত্রে কিন্তু এর ভূমিকা তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। আশ্চর্য এই যে, মোরল্যাণ্ড বায়ানা নীলের

২০. 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬২২-২৩', পৃ. ১০৯।

২১. ঐ, ১৬২৪-২৯, পৃ. ২২১ ; ১৬৩০-৩৩, পৃ. ৬১।

২২. 'ফ্যাক্টরিস্ ১৬১৮-২১', পৃ. ১০২। এটি যদি মিছরির চিনি না হয়, তাহলে সুরাটের ক্ষেত্রে যে দাম 'লেটার্স রিসিভ্‌ড্', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮০-তে দেওয়া আছে তা অসম্ভব। ১৬১৭-র আগে কিছু সময় ধরে চিনির দাম ১৪ থেকে ১৫ টাকার মধ্যে ছিল। ১৬১৬-তে সুরাটে চিনির মিছরি ১২.৪৪ টাকা দরে বিক্রি হতো। (ঐ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯৯)।

২৩. 'ফ্যাক্টরিস্ ১৬৩৪-৩৬', পৃ. ১৭৭।

২৪. মোরল্যাণ্ড, 'আকবর টু আওরঙ্গজেব', পৃ. ১৩৯ তুলনীয়।

২৫. 'ফ্যাক্টরিস্ ১৬৪৬-৫০', পৃ. ১৩৭-৮ ; '১৬৫৫-৬০', পৃ. ২৯৭ ; হেজেস্, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫। ১৬৫০-এ জানানো নিম্নতম দাম ৩৭৫ টাকা হতে পারে, যদি গাঁটের ওজন ২ 'মণ-এ জাহাঙ্গীরী' না হয়ে, ২ 'মণ-এ শাহ্‌জাহানী' হয় (পরিশিষ্ট 'খ' দ্রষ্টব্য)। এও বলা হয়েছে যে বর্ষার সময়ে দাম একলাফে গাঁটপিছু ১১ বা ১২ টাকা হয়ে যেত। ১৬৫৮-য় মাদ্রাজে পাঠানো লণ্ডন কমিটির সরকারী কাগজপত্রে উল্লেখ আছে যে হুগলীতে চিনির গাঁটপিছু ১১ শিলিং-এ চালান তৈরি হয়েছে, যেখানে মাদ্রাজে লাগে ২৮ শিলিং। সন্দেহ হয় যে, মাদ্রাজের কুঠিয়ালরা কম্পানিকে প্রচণ্ডভাবে ঠকিয়েছিল'। ('ফ্যাক্টরিস, ১৬৫৫-৬০', পৃ. ১৭৯)। কিন্তু আগের অঙ্কটিতেও নিশ্চয়ই কিছু ভুল আছে এবং সঠিক তথ্যের চেয়ে সন্দেহই বড় হয়ে উঠেছে।

২৬. 'আকবর টু আওরঙ্গজেব', পৃ. ১৬০-৬৪।

দামের ইতিহাস অনুসন্ধান করেননি। প্রধানত ইংরেজদের ব্যবসায়িক নথিপত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যগুলি পাদটীকায় রাখা যেতে পারে[২৭] এবং এই সাক্ষ্য এতই স্পষ্ট যে

২৭. সারণি আকারে তথ্য পেশ করার আগে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আলোচ্য পর্ব জুড়ে আগ্রাতে নীলের ক্ষেত্রে 'মণ-এ আকবরী'ই চালু ছিল ও দাম বলা হতো এর দরেই। যেখানে অন্য কোন একক ব্যবহার করা হয়েছে, তুলনার সুবিধার জন্য সেগুলিকেও 'মণ-এ আকবরী' পিছু টাকায় বদলে নেওয়া হয়েছে। বায়ানা ভূখণ্ড ছাড়া অন্য কোন জায়গার উৎপন্ন নীল হলে বা সুরাট বা সোয়ালিতে সরবরাহের সময়কার দাম দেওয়া থাকলে, তাও নির্দেশ করা করা হয়েছে।

বছর	মণপিছু টাকা	বিবরণ	উৎস
১৫৯৫-৯৬	১০ থেকে ১৬	সচরাচর	'আইন', পাণ্ডুলিপি (Add. 7652, 6552, 5645 ইত্যাদি) ব্লখম্যান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪২-এ বলা হয়েছে: মণ প্রতি ১০ থেকে ১২ টাকা।
১৬০৯	১৬ থেকে ২৪	সচরাচর	'লেটার্স রিসিভড্', ১ম খণ্ড, ২৮
১৬০৯	২৫	কেনা দাম	ঐ
১৬১৪	৩১	কেনা দাম, সুরাট (?)	ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৪
১৬১৪-১৫	৩৪ এবং ৩৬	ধার্য দাম	ঐ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৯-৭০
১৬১৫	২৭ এবং ২৮	"	ঐ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৭
১৬১৬	৩৫	"	ঐ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৯, ৩২৭
১৬১৬	২৯ থেকে ৩৩	"	ঐ, ৪র্থ, খণ্ড, পৃ. ২৩৯
১৬১৬	৩৬ এবং ৩৮	আগ্রাতে সবসময়কার দাম	ঐ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৯
১৬১৬	৩৬ এবং ৩৭	কেনা দাম, সুরাট	ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১০
১৬১৭	২৮ থেকে ৩৬; গড়ে ৩৩¼	কেনা দাম	ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৩৪-৫, ২৪৫, ২৪৯
১৬১৮	৩৫	আনুমানিক	'ফ্যাক্টরিস্, ১৬৬২-৫', পৃ. ২৮৪-৫
১৬২৪-৫	২৮ থেকে ৩২	ধার্য দাম	'ফ্যাক্টরিস্ ১৬২৪-২৯', পৃ. ৬৩
১৬২৬	৩০	সচরাচর	পেলসার্ট, ১৫
১৬২৭	৩৩¾ থেকে ৩৫	কেনা দাম	'ফ্যাক্টরিস্ ১৬২৪-২৯', পৃ. ১৮৯
১৬২৭	৩৫ থেকে ৩৬½ এবং ৩০	কেনা দাম	" পৃ. ২০৮
১৬২৭-২৮	৩২½ থেকে ৩৫	কেনা দাম	" পৃ. ২২৮
১৬২৮-২৯	৩৬ এবং ৩৭	কেনা দাম	" পৃ. ৩৩৫
১৬৩০	৩৮	কেনা দাম	'ফ্যাক্টরিস্ ১৬৩০-৩৩', পৃ. ১৩১
১৬৩৩	৬১	কেনা দাম। একচেটিয়া কারবারীর দাম।	'ফ্যাক্টরিস্ ১৬৩৪-৩৬', পৃ. ১, ২
১৬৩৩-৩৪	৬২+২	"	'ফ্যাক্টরিস্ ১৬৩৪-৩৬', পৃ. ১২

এ বিষয়ে সামান্য কয়েকটি মন্তব্যই যথেষ্ট হবে। এ কথা ঠিকই যে, মূল্যরেখাটি

বছর	মণপিছু টাকা	বিবরণ	উৎস
১৬৩৫-৩৬	৪৫ থেকে ৫৬	কেনা দাম	'ফ্যাক্টরিস্ ১৬৩৪-৩৬', পৃ. ২০৬
১৬৩৯	৪৫	আনুমানিক। সোয়ালী	,, ১৬৩৭-৪১, পৃ. ১৯২
১৬৪০	৪০ এবং উর্ধ্বে	কেনা দাম	,, পৃ. ২৭৮
১৬৪৩	৩৩ এবং নীচে	,,	'ফ্যাক্টরিস্ ১৬৪২-৫', পৃ. ১৩৬
১৬৪৩-৪৪	২৬ থেকে ৩১$\frac{১}{২}$	,,	,, পৃ. ২০২
১৬৪৪-৪৫	৩৭ থেকে ৪০		,, পৃ. ২৫৪
১৬৪৫	৩৩	করিয়া। ধার্য দাম	,, পৃ. ৩০৪
১৬৪৫-৪৬	৪০	কেনা দাম	'ফ্যাক্টরিস্ ১৬৪৬-৫০', পৃ. ৩৩
১৬৪৬	৪২	প্রত্যাশিত	,, পৃ. ৬২
১৬৪৬-৪৭	৪৩ এবং তদূর্ধ্ব	ধার্য দাম	,, পৃ. ১১৪
১৬৪৭-৪৮	৪০$\frac{৩}{৪}$ থেকে ৪৩$\frac{৩}{৪}$	কেনা দাম	,, পৃ. ২০২
১৬৪৮	৪২	আধা শুকনো। ধার্য দাম	,, পৃ. ২১৯
১৬৪৮	৪৩$\frac{৫}{৮}$	হিন্দায়ুন। ধার্য দাম	,, পৃ. ২১৯
১৬৪৮	৩৬ এবং ৩৭	দোআব। কেনা দাম	,, পৃ. ২১৯
১৬৪৮-৪৯	৪০ থেকে ৪৬	ধার্য দাম	,, পৃ. ২৭৬
১৬৪৯	৩৫ এবং ৩৬	ধার্য দাম	,, পৃ. ১৭৬
১৬৫০	৪৭ এবং তদূর্ধ্ব	হিন্দায়ুন। ধার্য দাম	'ফ্যাক্টরিস্ ১৬৫১-৫৪', পৃ. ৯
১৬৫০	৪৬	,, ,,	,, পৃ. ৫১
১৬৫১	৪৫$\frac{৩}{৪}$	খুরজা। ধার্য দাম	,, পৃ ৩০২
১৬৫৫	৩৩ এবং ৩৮	খুরজা। কেনা দাম	'ফ্যাক্টরিস্ ১৬৫৫-৬০', পৃ. ১৮
১৬৫৫-৫৬	৩৩	হিন্দায়ুন। ধার্য দাম	,, পৃ. ৬৩
১৬৫৮	৩৮	কেনা দাম.	,, পৃ. ১৫৩
১৬৬৩-৬৪	১০০$\frac{১}{২}$	ধার্য দাম। সুরাট	'ফ্যাক্টরিস্ ১৬৬১-৬৪', পৃ. ৩২০
১৬৬৫	৯৭$\frac{৪}{৫}$	কেনা দাম। সুরাট	'ফ্যাক্টরিস্ ১৬৬৫-৬৭', পৃ. ৫
১৬৬৭	৫২	ধার্য দাম। সুরাট	'ফ্যাক্টরিস্ ১৬৬৮-৬৯', পৃ. ৩
১৬৬৮	৫১	কেনা দাম	'ফ্যাক্টরিস্ ১৬৬৮-৬৯', পৃ. ৬-৭
১৬৬৯-৭০	৫৫	প্রত্যাশিত সুরাট (সম্ভাবা)।	'ফ্যাক্টরিস্ ১৬৬৮-৬৯', পৃ. ১৯৪

১৬৬৯-৭০-এর দাম যদি সুরাটে মাল সরবরাহের সময়কার দাম হয়, তাহলে আগ্রার দাম মণপিছু ৪৭ টাকার কম হতে পারে না। ১৬৫১-য় আগ্রা থেকে আহ্মেদাবাদের পথে এক উটবোঝাই মালের পরিবহণ খরচ পড়ত ১৫ টাকা ৩ আনা বা প্রতি 'মণ-এ আকবরী'-তে

চড়াই-উতরাই-এ ভরা। কিন্তু যে শস্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়[২৮] এবং প্রধানত দূরের বাজারের জন্যই যার চাষ, তার ক্ষেত্রে এই ওঠা-নামায় আশ্চর্যের কিছুই নেই। কিন্তু সন্দেহ নেই যে, এসব উত্থানপতনের ভেতর দিয়েও দাম নিয়মিত এবং মাঝে মাঝে খুবই দ্রুত বেড়েছে। এও লক্ষণীয় যে, ঐ শতকের ষাটের দশকে ইউরোপীয় চাহিদার পড়তির মুখেও এই গতি অব্যাহত ছিল। আবার এও দেখা গেছে যে, ১৬৬৯-৭০এর বছরে ফলন হয়েছিল প্রচুর এবং বায়ানা নীল 'খুবই শস্তা' হয়ে যায়, কিন্তু প্রত্যাশিত দাম ছিল আবুল ফজলের ধারণায় যা সর্বোচ্চ দাম তার তিনগুণ আর ১৬০৯ সালের স্বাভাবিক সর্বোচ্চ সীমার নির্ধারিত দামের দুগুণ।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে, আলোচ্য পর্বে কৃষিজ পণ্যের দাম বেশ ভালোই বেড়েছিল। এই পর্বের মূল্যবান ধাতুগুলির আপেক্ষিক মূল্য থেকে এই মূল্যবৃদ্ধির বিচার করা যায় কিনা সে প্রশ্ন ঠিক আমাদের অনুসন্ধানের আওতায় পড়ে না। কিন্তু বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ আর এই নিয়ে আলোচনা এত কম হয়েছে[২৯] যে, এই বিষয়ে পরিশিষ্ট 'গ'-তে রূপোর টাকার (এটি ছিল মুঘল মুদ্রাব্যবস্থার মানস্বরূপ) অঙ্কে সোনা এবং তামার দামের বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে। এ দুটি ধাতুর তুলনায় টাকার দাম যে সাধারণভাবে পড়ে গিয়েছিল এ রকম তথ্য প্রচুর এবং দাম কমে যাওয়ার ঘটনাটি বিশদভাবে দেখানো সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, আমরা দেখতে পাই যে, যদি মূল্যস্তর 'আইন'-এর সময়ে রূপোর টাকায় ১০০ ধরা হয়, তাহলে এই শতকের কুড়ির দশকে তা ১৫০-এরও বেশি হওয়া উচিত; পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে এটি আবার বেড়ে ১৭৮ থেকে ২৭৬-এর মধ্যে যায়। এরপর থেকে মূল্যস্তর সামান্য কমে এবং এই

প্রায় ১·৭ টাকা। ('ফ্যাক্টরিস্ ১৬৫১-৫৪', পৃ ৫২)। এর থেকে ধরা যেতে পারে যে, আগ্রা থেকে পরিবহণ খরচ মণপিছু ২·৫ টাকার বেশি পড়ত না। উপরন্তু, ইংরেজরা যে মাল নিয়ে যেত তা পথে সবরকমের দেয় থেকে ছাড় পেত (ঐ, ১৬৬৫-৬৭, পৃ. ২৬৬)। কিন্তু দালালি বাবদ নিজেদের দালালদের শতকরা দশভাগ দিতে হতো (ঐ, ১৬৬৮-৯, পৃ. ৭)।

তাভার্নিয়ে, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮, বলেন যে, প্রতি মণ বায়ানা নীলের জন্য "সাধারণত" ৩৬ থেকে ৪০ টাকা দিতে হয়। ভারত বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ১৬৪০ থেকে ১৬৬৭ পর্যন্ত; মাত্র দুবার তিনি আগ্রায় এসেছিলেন, ১৬৪০-৪৩এ ও ১৬৬৫-৬৭তে। দেখাই যাচ্ছে, পরবর্তী বছরগুলির ক্ষেত্রে তাঁর কথা প্রযোজ্য হতে পারে না। সম্ভবত তিনি তাঁর আগের ভ্রমণের সময়কার দামগুলোর স্মরণ করেছেন।

দুর্ভাগ্যবশত, প্রকাশিত ইংরেজ নথিপত্র থেকে ১৬৬৯-৭০এর পরবর্তী সময়ের দাম উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

২৮. তুলনীয় পেলসার্ট, ১৩।

২৯. মোরল্যাণ্ড, 'আকবর টু আওরঙ্গজেব', পৃ. ১৮৩-১৮৫, রূপো ও তামার মূল্যবৃদ্ধি লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু সোনার ক্ষেত্রে তিনি অনিশ্চিত (পৃ. ১৮২-৩)। হোদিবালা ('মুঘল ন্যুমিস্মেটিক্স', পৃ. ২৪৫-৫২) কিছু তথ্যপ্রমাণ জড়ো করেছেন যার থেকে দেখা যায় যে, সোনার দামও বেশ বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের আলোচনার পক্ষে দুটি গবেষণার কোনটিই যথেষ্ট পুঙ্খানুপুঙ্খ নয়।

শতকের শেষে ১৪৫ থেকে ২০০-র মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়। এও লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, পরবর্তীকালে রূপোর দাম বেড়ে যাওয়ার ঘটনাটি প্রমাণ করার মতো কৃষি-পণ্যের দাম বিষয়ক যথেষ্ট তথ্য আমাদের নেই, তবুও প্রথম দিকের কৃষিজ মূল্য ও রূপোর টাকার ক্ষেত্রে একইভাবে কমা-বাড়ার ঝোঁকটি উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, কুড়ির দশকে চিনির দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টাকার দাম কমাটাও নজরে পড়ার মতো। তেমনি, ১৬৬৯-৭০ সালে খাদ্যশস্য ও নীলের দামের উল্লেখ থেকে দ্বিতীয়বার টাকার দাম খুবই কমে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কৃষিজ পণ্যের বাণিজ্যের আলোচনায় আমরা এই ঘটনার ওপর জোর দিয়েছি যে, যদিও গ্রামগুলি শহরের উৎপন্নের ওপর নির্ভর করত না, শহরগুলি কিন্তু গ্রামের উৎপন্নের একটা বিরাট অংশ গ্রহণ করত। অত্যন্ত চড়া ভূমিরাজস্ব দাবি করা হতো বলেই এমন সম্ভব হয়েছিল। খাদ্য ও কাঁচামাল কেনার জন্য যে টাকা গ্রামাঞ্চলে থেকে যেত, ভূমিরাজস্ব তা আবার ফিরিয়ে আনত শহরে। অথবা যখন রাজস্ব আদায় হতো উৎপন্ন দ্রব্যে (টাকায় নয়), তখন শহরের প্রয়োজনীয় যোগানই গাড়িবোঝাই হয়ে চলে আসত। শহরের তৈরি জিনিসের কোন বাজার গ্রামে ছিল না। তাই, যখন কৃষিমূল্য বাড়তির দিকে যেত, তখন শহরের উৎপন্ন জিনিসের দাম বাড়িয়ে ফের ভারসাম্য বজায় রাখা যেত না। শুধুমাত্র ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েই ভারসাম্য আনা যেত। ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম অংশ এবং নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে আমরা দেখব, কেমন করে ভূমি রাজস্বের বাস্তব বৃদ্ধি ঘটত। কৃষকের উদ্‌বৃত্ত উৎপন্নের বৃহত্তর অংশই চলে যেত ভূমিরাজস্বে। সুতরাং দাম বাড়ায় চাষী যে সম্ভাব্য সুবিধাগুলি পেতে পারত, বাড়তি ভূমিরাজস্ব তা নির্মূল করে দিত।

তৃতীয় অধ্যায়

কৃষকদের জীবনের বাস্তব অবস্থা

১. সাধারণ বর্ণনা

জাহাঙ্গীরের আমলে একজন ওলন্দাজ পর্যবেক্ষক মন্তব্য করেছিলেন, "সাধারণ মানুষ এমনই প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে যে তাদের জীবনের ছবি বা নিখুঁত বিবরণ দিলে বলতে হয় এই জীবন শুধু এক তীব্র অভাব ও নিদারুণ দুঃখের বাসভূমি।"[১] আলোচ্য পর্বে চাষীদের সাধারণ ভোগ্য ও ব্যবহৃত জিনিসপত্রের বিবরণ দিতে গেলে সেটি আসলে কোনমতে টি'কে থাকার জন্য সম্ভাব্য সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় স্তরের রূপরেখা হয়ে দাঁড়াবে। মনে হয়, সমসাময়িক লোকেও সঙ্গে সঙ্গে এ কথায় সায় দিতেন।[২]

দুঃখের বিষয়, চাষীদের খাওয়া-দাওয়ার পরিমাণ কী ছিল—এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের প্রমাণসূত্র খুব একটা সাহায্য করে না। বরং, সাধারণ খাদ্যতালিকায় কী কী ধরনের খাদ্য ছিল তার থেকেই এ ব্যাপারে আমরা কিছু বেশি তথ্য পাই। বাংলা, ওড়িশা, সিন্ধু ও কাশ্মীরের প্রধান শস্য ছিল চাল। তাই, স্বভাবতই আশা করা যায় এইসব অঞ্চলে চালই হবে সাধারণ মানুষের প্রধান খাদ্য,[৩] গুজরাটের বেলায় যেমন জোয়ার ও বাজরা।[৪] কিন্তু সাধারণত চাষীরা তাদের উৎপন্ন ফসলের মধ্যে সবচেয়ে

১. পেলসার্ট, ৬০।

২. ভীমসেন প্রশ্ন তুলেছেন, দক্ষিণ ভারতে কী কারণে অত অসংখ্য মন্দির ছিল পৃথিবীতে যাদের কয়েকটির কোনো তুলনা মেলে না? এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, এখানকার জমি অত্যন্ত উর্বর আর অধিবাসীদের জীবনধারণের জন্য খুব অল্প জিনিসই দরকার পড়ে। ফলে, যে বিরাট উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হতো, রাজারা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় ঝোঁক অনুযায়ী তা মন্দির তৈরির কাজে লাগাতেন। এছাড়াও, তাঁদের এর চেয়ে ভালো কিছু করার ছিল না ('দিলকুশা', পৃ. ১১২ খ-১১৩ খ)। সুতরাং তিনি নির্দ্বিধায় ধরে নিয়েছেন যে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবকিছুরই অধিকারস্বত্ব ছিল শাসকদের হাতে। "সাধারণ মানুষ" সম্বন্ধে শিবাজী নাকি বলেছিলেন, "টাকা-পয়সা ওদের কাছে ঝামেলা। ওদের খাবারদাবার আর পেছন-ঢাকার একটা কাপড় দাও, তাই যথেষ্ট" (ফ্রায়ার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩)।

৩. বাংলার জন্য: 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৯, ফিচ্, রাইলি ১১৯, 'আর্লি ট্রাভেলস্', ২৮, বার্নিয়ে ৪৩৮। ওড়িশার জন্য: 'আইন', ১ম খণ্ড, ৩৯১, সিন্ধুর জন্য: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৫৫৩; এবং কাশ্মীরের জন্য: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৫৬৪।

৪. 'আইন', ১ম খণ্ড, ৪৮৫। ফ্রায়ার, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৯, সাধারণভাবে ভারত সম্বন্ধে (কিন্তু সম্ভবত এই দিয়ে শুধু গুজরাট ও পশ্চিম উপকূল বোঝাতে চেয়েছেন) বলেছেন, "সিদ্ধ চাল, নিচানি (রাগি), জওয়ার এবং (প্রচণ্ড অনটনের সময়) ঘাসের গোড়া হচ্ছে সাধারণ মানুষের খাদ্য।"

নীচু মানের ফসলই নিজেদের পরিবারের জন্য রাখতে পারত। আমরা জানি যে, কাশ্মীরে সাধারণ মানুষের খাদ্য ছিল খুব মোটা চালের ভাত[৫] এবং বিহারে 'হা-ভাতে' মানুষ বাধ্য হতো 'মটরশুঁটির দানার মতো' খেসারী খেতে, যার ফলে তাদের প্রায়ই অসুখবিসুখ হতো।[৬] সবচেয়ে ভালো গম উৎপন্ন হতো আগ্রা-দিল্লী অঞ্চলে। তাহলেও এই গম "সাধারণ মানুষের খাদ্যে"র মধ্যে ছিল না : তারা খেত চাল, জনার ও ডাল।[৭] তেমনি, আমরা দেখেছি, মালবে রপ্তানি করার মতো যথেষ্ট গম ছিল। তবুও টেরি (যাঁর অভিজ্ঞতা মূলত এই অঞ্চল থেকেই) বলেন, "সাধারণ মানুষ" গম খেত না, তারা ব্যবহার করত "আরও মোটা দানা" (সম্ভবত জোয়ার)[৮] থেকে তৈরি আটা।

খাদ্যশস্যের সঙ্গে লোকে খেত সাধারণত অল্পকিছু সব্জী বা আনাজ।[৯] বাংলা, ওড়িশা, সিন্ধু বা কাশ্মীরের বেশির ভাগ লোক (তার সঙ্গে) মাছ খেত।[১০] ধর্মীয় বাধানিষেধ (গো-হত্যা ও শুয়োর পালনের বিরুদ্ধে) ও দারিদ্র্যের দরুন চাষীরা মাংস খেত না বললেই হয়।[১১]

৫. 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ৩০০।

৬. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৬।

৭. জে. জেভিয়ার, অনু হোস্টেন, *JASB*, N. S., খণ্ড ২৩ ১৯২৭, পৃ. ১২১ : বার্নিয়ে ২৮৩। পেলসার্ট, ৬০ ৬১, বিশেষ করে আগ্রার শ্রমিকদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "তাদের একঘেয়ে দৈনিক খাদ্য অল্প একটু খিচুড়ি (মূলে আছে 'kitchery') ছাড়া আর কিছু নয়। এটি তৈরি হয় কাঁচা ডালের ('মোঠ') সঙ্গে চাল মিশিয়ে…সন্ধ্যায় মাখন দিয়ে খাওয়া হয়। দিনের বেলা তারা অল্প শুকনো ডাল বা অন্য শস্য চিবোয় যা, তারা বলে, তাদের রোগা পেটের পক্ষে যথেষ্ট।" খুব সম্ভব চাষীদের খাবারও ছিল একই ধরনের। আশ্চর্যের কথা এই যে আমাদের তথ্যসূত্রগুলিতে কোথাও বার্লির উল্লেখ নেই, যা নিশ্চয়ই লোকে খেত। 'আইন' ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০-এ এর দাম ও সাধারণ ছোলার দাম একই।

৮. "সুস্বাদু, স্বাস্থ্যকর এবং পুষ্টিকর দুইই" (মূলে তাই আছে!) এবং "গোল রুটি ও মোটা কেকের [চাপাটি] মতো করে তৈরি।" (টেরি, 'ভয়েজ টু ইস্ট ইণ্ডিয়া', পুনর্মুদ্রণ, লণ্ডন, ১৭৭৭, পৃ. ৮৭, ১৯৯; 'আর্লি ট্রাভেলস'-এ টেরি-র রোজনামচার প্রথম পাঠের যে পুনর্মুদ্রণ হয়েছিল তার মধ্যে এই মন্তব্যটি নেই)।

৯. তাভার্নিয়ে, পৃ. ৩৮, ২৩৮ অনুযায়ী বীন ও অন্যান্য আনাজ সাধারণত সবচেয়ে ছোট গ্রামগুলিতে বিক্রি হতো। বাংলায় "সাধারণ লোকের খাবারের প্রধান (জিনিসগুলির)" মধ্যে ছিল "তিন-চার রকমের আনাজ" (বার্নিয়ে, ৪৩৮)। ওড়িশায় সাধারণত বেগুন খাওয়া হতো ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯১)। কাশ্মীরে খেত "নানারকম আনাজ" (ঐ, ৫৬৪; 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', পৃ. ৩০০)।

১০. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৯, ৩৯১, ৫৫৬, ৫৬৪।

১১. "বড় বড় গ্রামে সাধারণত একজন করে মুসলমান কর্তা থাকে, সেখানে বিক্রির জন্য ভেড়া, মুরগী ও পায়রা দেখতে পাবে", কিন্তু "যেখানে শুধু বেনিয়ানরা (হিন্দু) আছে সেখানে পাবে

আগেই বলা হয়েছে, মুঘল আমলে মাথাপিছু ঘি উৎপাদন এখনকার চেয়ে বেশি ছিল। আগ্রা অঞ্চল,[১২] বাংলা[১৩] ও পশ্চিম ভারতে[১৪] প্রধান খাদ্যের সঙ্গে সবসময় ঘি থাকত—অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে এই তথ্য দিয়েও আমরা এটি দেখাতে পারি। আসামের লোকের সঙ্গে আবার ঘি-এর একেবারেই কোন সম্পর্ক ছিল না। এ বস্তুটিকে তারা দেখত প্রচণ্ড ঘৃণার চোখে।[১৫] কাশ্মীরেও সাধারণ মানুষ জল দিয়েই রান্না করত : আখরোট-তেল ও ঘি ছিল তাদের কাছে বড়লোকী ব্যাপার।[১৬]

তাভার্নিয়ে বলেছেন, "এমনকি সবচেয়ে ছোট গ্রামেও চিনি এবং অন্যান্য শুকনো বা তরল মিষ্টিজাতীয় জিনিস পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।"[১৭] এর থেকে মনে হতে পারে, আর যাই হোক, অন্তত গ্রামগুলিতে সাধারণভাবে গুড় খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। নুন ব্যবহারের ক্ষেত্রে মোরল্যাণ্ড দেখিয়েছেন যে, 'আইন'-এর আমলে গমের অঙ্কে নুনের দাম ছিল এখনকার দ্বিগুণ।[১৮] অতএব, বোঝা যায়, মাথাপিছু নুনের

না" (তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮)। সুরাট থেকে বুরহানপুর যাওয়ার সময় রো অভিযোগ করেছেন, দেশে যদিও "প্রাচুর্য আছে, বিশেষ করে গবাদি পশুর", তবুও বেনিয়ানরা "চারধারের কিছুই মারবে না ও ঐ একই যুক্তিতে আমাদের একটি (পশুও) বিক্রি করবে না" (রো, ৬৭)। আগ্রায় শ্রমিকেরা "মাংসের স্বাদ জানে না বললেই হয়" (পেলসার্ট, ৬০)। বাংলায় "তারা মাংস খাবে না বা কোন পশুও মারবে না" (ফিচ, রাইলি, ১১৯, 'আর্লি ট্রাভেলস', ২৮)। মানরিক-কে ওড়িশার গ্রামবাসীরা কাছে ঘেঁষতে দেয়নি কারণ তিনি ছিলেন "যারা মুরগী, গরু ও শুয়োরের মাংস খায়" তাদের একজন। তাঁর দলের লোকদের ময়ূর মারা নিয়ে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল (মানরিক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৫-১১৩)। আসামের লোকদের আবার এই ধরনের কোন সংস্কার ছিল না, তারা প্রায় সবকিছুই খেত ('আলমগীরনামা', পৃ. ৭২৬, 'ফথিয়া ইব্রিয়া', পৃ. ৩৬ ক)।

১২. জেভিগার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পেলসার্ট, ৬১।

১৩. বার্নিয়ে ৪৩৮। তু. ফিচ, রাইলি ১১৯, 'আর্লি ট্রাভেলস্' ২৮ : তিনি দুধের কথা বলেছেন, মাখন নয়।

১৪. টেরি, 'আর্লি ট্রাভেলস্', পৃ. ২৯৬, ১৭৭৭ পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ১৯৮-৯।

১৫. 'আলমগীরনামা', পৃ. ৭২৬, 'ফথিয়া ইব্রিয়া', পৃ. ৩৬ ক।

১৬. 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ৩০০-৩০১।

১৭. তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮। তু. টেরি-র 'আর্লি ট্রাভেলস্', পৃ. ৩২৫, যেখানে তিনি বলেছেন নিরামিষাশী অখৃস্টানরা বেঁচে থাকে "শাকপাতা, দুধ, মাখন, চিজ এবং মিঠাই-এর ওপর, যা তারা নানা ধরনের তৈরি করে।" এই বিবরণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা ভাবতে অবাক লাগে, যে মোরল্যাণ্ড বিশ্বাস করতেন "প্রচুর পরিমাণে মিঠাই ভারতীয় জীবনের তুলনামূলকভাবে আধুনিক লক্ষণ" ('ইণ্ডিয়া…অফ আকবর', পৃ. ২৭২)।

১৮. *JRAS*, ১৯১৮, পৃ. ৩৭৯। আধুনিক দামের জন্য তিনি লখনউ বাজারে চালু দামটি ধরেছেন। এও অদ্ভুত যে ১৮৯০-এর দশকে কানপুরে নুনের বাজার-চালু দাম ছিল (দ্র. ক্রুক,

ব্যবহার এখনকার চেয়ে অনেক কম হতো। বাংলায় নুন ছিল খুবই দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্যও।[১৯] বাংলার কোন কোন অংশে এবং আসামে মানুষ বাধ্য হয়ে ব্যবহার করত কলাগাছের গোড়া পুড়িয়ে এক ধরনের উৎকট বস্তু; এর মধ্যে অবশ্য কিছু পরিমাণে নুন আছে।[২০] গোলমরিচ কিংবা কাঁচালঙ্কা এখন যে-কোন পরিবারেরই রান্নার একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদান। কিন্তু এর ব্যবহারও তখন জানা ছিল না।[২১] অবশ্য জিরে, ধনে, আদা ইত্যাদি মশলা সম্ভবত চাষীদের নাগালের মধ্যে ছিল।[২২] কিন্তু লবঙ্গ, এলাচ ও মরিচের দাম অন্তত দেশের মধ্য-অঞ্চলে ছিল খুব বেশি।[২৩] পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে সমুদ্রপথে ওলন্দাজরা একচেটিয়া ব্যবসা কায়েম করার আগে লবঙ্গের দাম ছিল সবচেয়ে শস্তা। তখনও গ্রামের লোকেরা লবঙ্গকে খাবার জিনিস না ভেবে তাদের বৌ-বাচ্চাদের গলায় পরার গয়না বলেই মনে করত।[২৪]

কোন কোন ঋতুতে চাষীরা সম্ভবত প্রচলিত ফল ছাড়াও কিছু বুনো ফলও খেতে ভালবাসত।[২৫] গ্রামের দিকে পান খাওয়ার রেওয়াজ ছিল এমন কোন তথ্য আমরা

'নর্থ-ওয়েস্টার্ন প্রভিন্সেস', পৃ. ২৭২) কার্যত মোরল্যাণ্ড যে দাম বলেছেন তার দ্বিগুণ, সুতরাং আপেক্ষিক বিচারে এই দাম 'আইন'-এ প্রদত্ত দামের সমান। স্পষ্টতই, উৎপাদন পদ্ধতির কোন পরিবর্তনের জন্য নয়, পরিবহণের খরচ কমার ফলেই নুনের দাম পড়ে গিয়েছিল। সম্ভর হ্রদ ও লবণ রেঞ্জে যে পদ্ধতি কাজে লাগানো হতো, সুজান রায়-এর পৃ. ৫৫, ৭৫-এ তার সবচেয়ে ভালো সমসাময়িক বর্ণনা পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহে নুনের দাম পড়ে যাওয়াই হলো ক্ষার মাটি থেকে যারা নুন জোগাড় করত সেই নুনিয়া জাত ও তাদের শিল্পের বর্তমান অবলুপ্তির কারণ।

১৯. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯।

২০. 'হফ্‌ৎ ইক্‌লিম', ৯৫, 'ফথিয়া ইব্রিয়া', পৃ ৩২ খ।

২১. প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য।

২২. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫-৬৬-তে যে-দাম দেওয়া আছে তার থেকে যা বোঝা যায়। 'দস্তুর'-গুলিতেও জিরে, 'সিয়াধান' বা 'কালাউঞ্জি' এবং 'আযোয়ানে'র কথা পাওয়া যায়। আদার জন্য টেরি, 'আর্লি ট্রাভেলস', পৃ. ৩২৪ এবং ১৭৭৭-এর পুনর্মুদ্রণের পৃ. ১৯৮ দ্রষ্টব্য।

২৩. 'আইন'-এ যে-দাম দেওয়া আছে। টেরি কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় সংস্করণে (১৭৭৭ পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ১৯৮) বলেছেন, "সেখানে গরীব লোকেরা কাঁচা আদা ও অল্প মরিচ দিয়ে ভাত খায়।"

২৪. পেলসার্ট, ২৪-২৫। তিনি ১৭ শতকের প্রথম দিকের কথা বলেছেন যখন তাঁর মতে আগ্রায় ৬০ থেকে ৮০ টাকায় এক 'মণ' লবঙ্গ পাওয়া যেত। আকবরী ও জাহাঙ্গিরী ওজনের তফাৎ ধরে নিয়েও এই দাম 'আইন'-এ দেওয়া দামের সঙ্গে মেলে, অর্থাৎ 'মণ-এ আকবরী' পিছু ৬০ টাকা। মোরল্যাণ্ড যেমন দেখিয়েছেন, 'আইন'-এ লবঙ্গের দাম গমের অঙ্কে আধুনিক দামের চেয়ে প্রায় ১৫ গুণ বেশি (*JRAS*, ১৯১৮, পৃ. ৩৭৯)।

২৫. এইভাবে মেওয়ারের পাহাড়গুলিতে চাষবাস প্রায় হতোই না, কিন্তু আম হতো প্রচুর। অন্যান্য জায়গার মতো অত মিষ্টি বা সুস্বাদু না হলেও আমই 'সাধারণ লোকের প্রধান খাদ্য

পাই না; তাই, বেশির ভাগ লোকের এই অভ্যাস ছিল কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাড়ি বা 'টোডি' নামক মাদকটি প্রায়ই ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের চোখে পড়েছে, তাঁরা খেয়েওছেন। কিন্তু নিঃসন্দেহে দেশের অভ্যন্তরের তুলনায় গুজরাটের উপকূলবর্তী অঞ্চলেই এটির চলন ছিল বেশি।[২৬] আফিমের ব্যবহার কতটা ছিল তা হিসেব করা সম্ভব নয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের "বেশি বা কম" মাত্রায় আফিম খাওয়ানোর কথা আবুল ফজল এমনভাবে উল্লেখ করেছেন যেন এই অদ্ভুত প্রথা শুধুমাত্র মালবেই সীমাবদ্ধ ছিল।[২৭] কিন্তু (পরবর্তী) কালে এই প্রথা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। আলোচ্য পর্বের শেষদিকে তামাকের নেশা পুরোপুরি সর্বজনীন অভ্যাসে পরিণত হয়। সাধারণভাবে ভারতের কথা বললেও, ফ্রায়ার মূলত গুজরাট ও পশ্চিম উপকূলের "সাধারণ মানুষের" "পাইপে তামাক"[২৮] খাওয়ার কথাই বলেছেন। এও জানা যায় যে, এই সময়ে করমণ্ডলে "গরীব গোছের" লোকেরা চুরুটের নেশা শুরু করেছিল।[২৯] সুজান রাই-এর আলঙ্কারিক বর্ণনা থেকেও মনে হতে পারে, উত্তর ভারতের লোকও ধূমপানে খুব দ্রুত অভ্যস্ত হচ্ছিল।[৩০]

পরিণত হয়েছিল (অবশ্য মরসুমের সময়)। এর ফলে তারা অসুখে পড়ত (বাদাউনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪-৫)। বাংলায় ফল খাওয়ার চলন ছিল বেশি (ফিচ, রাইলি, ১১৯, 'আর্লি ট্রাভেলস্', ২৮), আসামে এত কমলালেবু পাওয়া যেত যে তা বিক্রি হতো একটি তামার পয়সা পিছু দশটি দরে ('ফথিয়া ইব্রিয়া', পৃ. ২৬ ক-খ)। নারকেলের কথা অবশ্যই আলাদা। কিন্তু, যেসব অঞ্চল (উদাহরণত, মালাবার—তুলনীয় ডাভার্নিযে, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৭) এটি ছিল প্রধান খাদ্যের অংশ তার বেশির ভাগই ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের সীমানার বাইরে। একজন আধুনিক লেখক উত্তরপ্রদেশের গ্রামগুলির অতি দরিদ্র স্তরের মানুষদের সম্বন্ধে বলেছেন যে ফসল কাটার আগে সঙ্কটপর্বে "গ্রামের আম, ...তা সে যত অপুষ্টিকরই হোক না কেন ও তার সঙ্গে নানারকমের বুনো ফলমূল" তাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করে (ক্রুক, 'নর্থ ওয়েস্টার্ন প্রভিন্সেস', পৃ. ২৭৪)।

২৬. গুজরাটের জন্য ফিঞ্চ, 'আর্লি ট্রাভেলস', ১৭৫, মাণ্ডি, ৩২-৩৩, ওভিংটন, ১৪২-৩ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

বাবুর লক্ষ্য করেছিলেন বায়ানা ও ঢোলপুরের অন্তর্বর্তী চম্বল উপত্যকা থেকে গ্রামবাসীরা খেজুর-মদ যোগাড় করছে। এই মদ ও 'তাড়ি' বলতে ঠিক যা বোঝায় তা বের করার পদ্ধতিরও তিনি বর্ণনা দিয়েছেন ('বাবুর-নামা' অনু. বেভারিজ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০৮-৯)। বেনারসের কাছ দিয়ে, কিন্তু গঙ্গার দক্ষিণ দিকে যাওয়ার সময় মাণ্ডি "প্রচুর তাড়ি গাছ" দেখতে পেয়েছিলেন, যা তিনি আগ্রা থেকে যাওয়ার সময় তার আগের কুড়ি দিনে দেখতে পাননি। তাঁকে অবশ্য বলা হয়েছিল, এই গাছগুলি লাগানো হয় তাদের পাতা থেকে মাদুর তৈরির জন্য, মদের জন্য নয় (মাণ্ডি, ১২৪-৫)।

২৭. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৫।

২৮. ফ্রায়ার, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৯।

২৯. বাউরি, ৯৭।

৩০. সুজান রায়, ৪৫৪।

এ পর্যন্ত যেসব তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে আধুনিক যুগের সঙ্গে তার সঠিক তুলনা করা খুব সহজ নয়। কিন্তু, সাধারণভাবে বলতে গেলে, আমরা যদি আধুনিক যুগের মধ্য ও দরিদ্র স্তরের চাষীদের কথা ভাবি, তাহলে খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হবে না। মুঘল যুগের চাষীরা ভাগ্যবান ছিল, কারণ তারা ঘি খেতে পেত অথচ তাদের আধুনিক বংশধরদের জুটেছে সামান্য বেশি নুন ও একেবারেই নতুন তিনটি খাদ্যবস্তু—ভুট্টা, আলু আর লঙ্কা। কিন্তু আর কিছুই বোধহয় জোটে না।

পোশাকের ব্যাপারে আমাদের তথ্যসূত্রের বিবরণ সাধারণত সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ। হিন্দুস্তান অর্থাৎ 'বেরা থেকে বিহার' পর্যন্ত এলাকা সম্পর্কে বাবুর মন্তব্য করেছেন, "চাষী ও গরীব লোকেরা সম্পূর্ণ খালি পায়ে থাকে আর লঙ্গুটা দিয়ে লজ্জা নিবারণ করে। লঙ্গুটা নাভির নীচে বাঁধা দু-বিঘৎ পরিমাণ ঝোলা কাপড়। এই ঝোলা কাপড়ের গ্রন্থির নীচ থেকে আর এক টুকরো কাপড় দুই উরুর মাঝখান দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়। মেয়েরাও লুঙ্গ নামে এক ধরনের কাপড় পরে, যার অর্ধেক কোমরে জড়ানো থাকে ও বাকিটা মাথার উপর তুলে দেওয়া হয়।"[৩১] অন্যভাবে বলা যায়, পুরুষদের সবচেয়ে ছোট ধুতি ও মেয়েদের একটি শাড়িই ছিল যথেষ্ট এবং তারা আর কিছুই পরত না। একইভাবে পরবর্তী শতকে আগ্রার এক ইংরেজ কুঠিয়াল মন্তব্য করেছেন, "সাধারণ লোক এত গরীব যে তাদের বেশির ভাগই লিনেন (মূলে তাই আছে! সুতির কাপড়) দিয়ে শরীরের গোপন অঙ্গ ঢাকা ছাড়া প্রায় নগ্ন হয়েই থাকে।"[৩২] বেনারস সম্বন্ধে একই কথা বলতে গিয়ে ফিণ্ড যোগ করেছেন, শীতকালে পশমের বদলে "মানুষের পরিচ্ছদ ছিল আমাদের তোষক ও তুলো-ভরা টুপির মতো এক ধরনের সুতি-কাঁথার ঢোলা পোশাক।"[৩৩]

৩১. 'বাবুরনামা', অনু এস বেভারিজ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১৯। দু একটি ব্যাপারে শ্রীমতী বেভারিজের অনুবাদ আমার সঙ্গত মনে হয়নি। প্রথম বাক্যটির শব্দবিন্যাস আমি পাল্টে দিয়েছি ও তার পরে একটি বাক্যাংশ যোগ করেছি। আব্দুর রহিম খান-এ খানান-এর প্রামাণিক ফার্সী তর্জমা (Or. 3714, পৃ ৪১১ খ-৪১২ ক) অনুসরণ করে এই পরিবর্তন করা হয়েছে।

৩২. 'লেটার্স রিসিভড্', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৮৭।

৩৩. রাইলি, ১০৭, 'আর্লি ট্রাভেলস', ২২। আগ্রা থেকে সলব্যাঙ্ক বলেছিলেন, "...পশমী পোশাকের চড়া দাম ও তাদের নিজেদের সুতি কাপড় শস্তা হওয়ার দরুন এই দেশের লোকের গায়ে পশমের পোশাক চোখে পড়া একটি বিরল ঘটনা।" ('লেটার্স রিসিভড্', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০০)। আজকের দিনেও এ কথা অনেকটাই সত্য, আর 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ১১১ তে পশমী কম্বলের যে-দাম দেওয়া আছে, গমের অঙ্কে তা এই শতকের গোড়ায় যে-দামে পাওয়া যেত তার থেকে সামান্য একটু বেশি। (*JRAS*, ১৯১৮, পৃ. ৩৮১, ক্রুক, পৃ. ২৭৩)।

পেলসার্ট, ৬১, আগ্রার শ্রমিকদের গৃহস্থালীর জিনিসপত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "তাদের বিছানার চাদর থাকে খুব কম, হয়তো একটা মাত্র বা দুটো, যা বিছানা ঢাকা ও

ব্যাংলায় সাধারণ মানুষ এর চাইতেও কম কাপড় পরত। আবুল ফজল বলেছেন, "ব্যাপক সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা উলঙ্গ হয়েই থাকে এবং কপানি (লুঙ্গ) ছাড়া কিছুই পরে না।"[৩৪] আবার ওড়িশায় "মেয়েরা তাদের গোপন স্থান ছাড়া আর কিছুই ঢাকে না ও অনেকে গাছের পাতা দিয়ে এই আবরণ তৈরি করে।"[৩৫] অপরদিকে সিন্ধুপ্রদেশে "গ্রামের (অর্থাৎ যারা শহরের বাইরে বাস করে) বেশির ভাগ লোকই খুব অসভ্য এবং কোমরের উপরের অংশ নগ্ন রাখে, তাদের মাথায় থাকে পাগড়ী… ।"[৩৬] কাশ্মীরে সুতোর কাপড় একেবারেই পরা হতো না ; পুরুষ ও মহিলা উভয়েই 'পাত্তু' নামে গোড়ালি পর্যন্ত নেমে আসা একটি পশমের পোশাকই না ধুয়ে তিন-চার বছর পরত। পুরোপুরি ছিঁড়ে না যাওয়া পর্যন্ত এটি গায়েই থাকত।[৩৭]

গুজরাটের মেয়েদের জামাকাপড় ছিল "কাঁধের ওপর বেল্টের মতো ঢিলে করে বাঁধা ও ছোট ব্রীচেসের ধরনে পায়ের মাঝে জড়ান একটি লুঙ্গি" আর একটি ছোট কাঁচুলি। তাদের "জামাকাপড় বলতে এই দুটোই ও সবসময় তারা জুতোমোজা ছাড়াই চলে।"[৩৮] তুলো-উৎপাদনকারী বিশাল মুঘল দখিন অঞ্চল সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট তথ্য না থাকলেও অবস্থা সম্ভবত সেখানেও ছিল একই। আবার দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ গোলকুণ্ডা ও দক্ষিণ ভারতের কাছাকাছি জামাকাপড়ের স্বল্পতা খুব বেশি করে চোখে পড়ত।[৩৯]

গা ঢাকা দু-এর কাজই করে। গরমকালের পক্ষে এটা যথেষ্ট, কিন্তু প্রচণ্ড শীতের রাতে অবস্থা হয় সত্যিই শোচনীয় এবং দরজার বাইরে ঘুঁটের অল্প আঁচের আগুন জ্বালিয়ে তারা গরম থাকার চেষ্টা করে।" আজও ভারতের গ্রামে ও শহরে লক্ষ লক্ষ লোকের এই একই অবস্থা।

৩৪. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৯। তুলনীয় ফিচ, রাইলি, ১১৮-৯, 'আর্লি ট্রাভেলস', ২৮।

৩৫. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯১। তুলনীয় বাউরি ২০৮. "ওড়িয়ারা…খুব গরীব, লুঙ্গির চেয়ে ভালো কিছু পরে না, বা একটা সাদা কাপড় কোমরের কাছে শক্ত করে বেঁধে রাখে।"

আসামের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, "পাগড়ি, গাউন, ড্রয়ার বা জুতো পরা, বা বিছানায় শোওয়ার চলন নেই, তারা মাথায় একটুকরো 'ক্ষিরপাসী' (ক্যালিকো ?) বেঁধে রাখে, কোমরে থাকে লুঙ্গি আর কাঁধে জড়ানো থাকে এক টুকরো কাপড়। শীতকালে কিছু বড়-লোক 'ইয়াকুব-খানী' কেতার 'নিম-জামা' (ওয়েস্ট-কোট) পরে" ('ফথিয়া ইব্রিয়া', পৃ ৩৭-ক। তুলনীয় 'আলমগীরনামা', পৃ. ৭২৭, তাভার্নিয়ে, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৩)।

৩৬. উইদিংটন, 'আর্লি ট্রাভেলস', ২১৮।

৩৭. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬৪ ; 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী' ৩০১, পেলসার্ট ৩৫।

৩৮. ফ্রায়ার, ২য় খণ্ড, ১১৬-১১৭। যদিও এখানে "পূর্ব-ভারতের" বর্ণনা দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু স্পষ্টতই তাঁর জ্ঞান গুজরাট ও পশ্চিম উপকূলেই সীমাবদ্ধ।

৩৯. ভীমসেন ছিলেন বুরহানপুরের লোক, জীবনের একটা বড় অংশ কাটিয়েছিলেন আওরঙ্গাবাদে। যে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তিনি দক্ষিণ ভারতের সাধারণ জামাকাপড়ের বর্ণনা

অবস্থা যদিও এখনও করুণ তবে নিঃসন্দেহে পোশাকের ক্ষেত্রে (বর্তমানে), যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। যেমন, বাবুরের বর্ণনা উত্তরপ্রদেশের কোন কোন অংশে সত্যি হলেও দোআব বা পাঞ্জাবের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। একইভাবে বাংলার গ্রামগুলিতে চরম দারিদ্র্য সত্ত্বেও মেয়েদের পরা শাড়ির দৈর্ঘ্য যথেষ্ট বেড়েছে। আর, অন্তত আজকের দিনে, আবুল ফজলের ঢঙের বর্ণনা টেঁকে না।

কৃষকদের বাসস্থান সম্পর্কে পাওয়া তথ্যগুলির ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেওয়া যায়। "ভারতের বেশির ভাগ অঞ্চলের" মতো বাংলার সাধারণ কুঁড়েঘরকে বলা হয়েছে "খুবই ছোট ও খড় দিয়ে ছাওয়া।"[৪০] "দেওয়ালের", বা ঠিক মতো বলতে গেলে মাটি খুঁড়ে কাদার ভিতের[৪১] ওপর দড়ি দিয়ে একসঙ্গে বাঁশ বেঁধে[৪২] এগুলি তৈরি হতো। ওড়িশায় দেওয়াল তৈরি হতো নলখাগড়া দিয়ে।[৪৩] বিহারে 'বেশির ভাগ বাড়িরই' চাল ছিল টালির।[৪৪] দোআবে চাষীদের কুঁড়েগুলি "কোন রকমে খড়ে-ছাওয়া ও

করেছেন তার থেকে ঐ অঞ্চলের সঙ্গে এ ব্যাপারে মুঘল দখিনের তফাৎ বোঝা যায়। 'বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার কর্ণাটকী' (অর্থাৎ যথার্থ কনড় ও তামিলনাড়ু)-দের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : "পুরুষেরা মাথায় একটা নোংরা চাদর বাঁধে, একটি ছোট কাপড়ের টুকরো দিয়ে (গুহ্যস্থান) ঢেকে রাখে ও একটা ক্যালিকো ('কিরপাস') চাদর (কাঁধের উপর ফেলে রাখে) যা দিয়ে বছরের পর বছর কাজ চলে যায়......মেয়েরা 'লুঙ্গ'-এর মতো তিন-চার হাত লম্বা একটা কাপড় কোমরে জড়িয়ে রাখে, তাদের মাথা ও বুকে কোন আবরণ থাকে না..." ('দিলকুশা', পৃ. ১১৩ ক)। অন্যান্য সমসাময়িক প্রমাণসূত্র থেকে ভীমসেনের এই বর্ণনার সমর্থন মেলে, যেমন, গোলকুণ্ডা ও করমণ্ডলের জন্য ফিচ্, রাইলি ৯৪, 'আর্লি ট্রাভেলস্', ১৬ ; 'রিলেশনস্', ৭৬-৭৭ ; বাউরি ৯৭ ; কানাড়ার জন্য লিনস্কোটেন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬০-৬১ ; কেরলের জন্য ফিচ্, রাইলি ১৮৬, 'আর্লি ট্রাভেলস', ৪৭ ; তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৭ ও ক্রায়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৭-৮ ; এবং সাধারণভাবে দক্ষিণ ভারতের জন্য মানুচি, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯-৪১ দ্র.। সালসেট দ্বীপে "লোকে উলঙ্গ হয়ে থাকে, পুরুষ ও মহিলা উভয়েই এক টুকরো কাপড় দিয়ে তাদের গুহ্যস্থান ও আর এক টুকরো কাপড় দিয়ে বুক ঢেকে রাখে......হাত, উরু ও পা খালিই থাকে" (কারেরি, ১৭৯)। আমরা ধরে নিতে পারি যে কোঙ্কণের সাধারণ অবস্থা এইরকমই ছিল।

৪০. 'ফিচ্, রাইলি, ১১৯, 'আর্লি ট্রাভেলস', ২৮।

৪১. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৯।

৪২. মাস্টার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯২-৯৩। তুলনীয় 'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার', ৭ম খণ্ড, ১৯০৮, পৃ. ২৪১। বাড়ি তৈরি করার পদ্ধতি আজও ঠিক একই রকমের। আসামে "গরীব ও বড়লোকেরা তাদের বাড়ি ও আস্তানা তৈরি করে কাঠ, বাঁশ ও খড় দিয়ে।" ('আলমগীরনামা', পৃ. ৭২১)।

৪৩. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯১।

৪৪. ঐ, ৪১৬।

বাজে মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা"[৪৫] বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সিন্ধু নদীর তীবে গ্রামগুলিতে ছিল "কাঠ ও খড়ের বাড়ি"। এগুলি সহজেই সরিয়ে ফেলা যেত।[৪৬] আজমীর প্রদেশে "সাধারণ লোক তাঁবুর ধাঁচে তৈরি বাঁশের কুঁড়েতে বাস করত।"[৪৭] সিরোঞ্জ (মালব)-এব কাছাকাছি কৃষকরা বাস করত "ছোট গোল কুঁড়ে" ও "শোচনীয় ঝুপড়িতে"।[৪৮] গুজরাটের বাড়িগুলিতে ছিল টালির (খাপরাইল) চাল ও প্রায়ই সেগুলি ইঁট ও চুণ দিয়ে তৈরি হতো।[৪৯] আবাব, খান্দেশ ও বিহারে কুঁড়েগুলির দেওয়াল ছিল মাটিব ও খড়ে-ছাওয়া।[৫০] এ সবকিছুই আমাদের চেনা ঠেকে এবং নিঃসন্দেহে গত তিনশ বছবে চাষীদেব বাড়িঘরের অবস্থা আরও ভালো বা খারাপ কোনটাই হয়নি। তখনকার মতো এখনও কুঁড়েগুলি কোনরকম স্থাপত্য-কৌশল ছাড়াই সবচেয়ে সহজলভ্য জিনিস দিয়েই তৈরি হয। এব থেকে বলা যায়, ব্যবহৃত উপাদান, জলবায়ু ও মাটিই এখনকার সবরকমের আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের জন্য দায়ী।

সমসাময়িক পর্যবেক্ষকদের নজরে পড়তে পাবে সেরকম কিছুই চাষীদের এই ঝুপড়িতে ছিল না। আগ্রার শ্রমিকদের সম্বন্ধে এই মন্তব্য করা হয়েছে: "জল রাখা ও রান্না করাব জন্য মাটির পাত্র এবং স্বামী-স্ত্রীর জন্য দুটো বিছানা (অর্থাৎ খাটিয়া) ছাড়া কোন আসবাবপত্র নেই...।"[৫১] চাষীদের যে এর চেয়ে বেশি ভালো কিছু ছিল তা আশা কবার কোন কারণ নেই। টেরির তথ্য থেকে আমরা গৃহস্থালীর জিনিসপত্রের এই সংক্ষিপ্ত তালিকার সঙ্গে "সাধারণ লোকে"র রুটি সেঁকার জন্য "একটি ছোট লোহার চুল্লী" যোগ করতে পারি।[৫২] এও বলা হয়েছে যে, দক্ষিণ ভাবতে "সাধারণ লোকের

৪৫. মাণ্ডি, ৭৩। তিনি বিশেষ কবে কোইলের আশপাশের জায়গা সম্বন্ধে বলেছেন। চাষীদের তিনি বলেছেন 'গাউয়াবে' ('গাঁওয়ার') ও 'শ্রমিক' (তাঁর এই পরবর্তী শব্দটি ব্যবহারের বিষয়ে ঐ বই-এর পৃ. ৯০ দ্র.)। আগ্রাব মজুররাও "কাদার তৈরি খড়ে ছাওয়া" বাড়িতে থাকত। (পেলসার্ট, ৬১)

৪৬. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫০, সুজান রায়, ৬৪।

৪৭. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৫। মাণ্ডি লক্ষ্য কবেছেন যে মাড়োয়ারেব 'টাউনে' অর্থাৎ গ্রামে "আমাদের মাঠে যেবকম গোল করে শস্য গাদা করা থাকে সেরকম প্রত্যেক বাড়ি আলাদা আলাদা খাড়া হয়ে আ'ছ, যদিও সেগুলি অত বড় বা অত উঁচু নয়" (পৃ ২৪৯)।

৪৮. মন্‌সেরাৎ, ২১।

৪৯. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮০। আবু পাহাড়কে পিছনে ফেলে মাণ্ডি যখন আহ্‌মেদাবাদেব দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, 'টালির চাল দেওযা বাড়ি শুরু হয়েছে" (পৃ. ২৫৮)।

৫০. ফিচ্, রাইলি ৯৪-৫ 'আর্লি ট্রাভেলস্', ১৬, রো ৬৮।

৫১. পেলসার্ট ৬১।

৫২. 'আর্লি ট্রাভেলস্' ২৯৬। তিনি লোহার গোল চাটু অর্থাৎ তাওয়ার কথা বলতে চেয়েছেন, যার ওপর চাপাটি সেঁকা হয়।

থালা ছিল একটা পাতা ··· বা একটা ছোট তামার থালা। এতে গোটা পরিবারই খেত।"[৫৩] লিনস্কোটেন বলেছেন, কানাড়ার চাষীরা "সাধারণত জল খায় নল-লাগানো একটি তামার পাত্র থেকে ··· তাদের ঘরে ধাতুর জিনিস বলতে শুধু এইটেই আছে।"[৫৪] উত্তর ভারতে বড় বড় সব তামার খনি থাকায় সাম্রাজ্যের অধীনস্থ কৃষকরা সম্ভবত এই ধাতুটি কিছু বেশি ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু 'আইন' থেকে হিসেব করে দেখা গেছে তামার দাম ছিল গমের বিনিময়ের অঙ্কে ১৯১৪-র চেয়ে পাঁচগুণ বেশি।[৫৫] এর থেকেই বোঝা যায় কেন পেলসার্ট রান্না করার ব্যাপারেও শুধুমাত্র মাটির হাঁড়ির কথা বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে গত শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত মধ্যভারতের চাষীদের ক্ষেত্রে মাটির হাঁড়ির ব্যবহার ছিল "প্রায় সর্বজনীন"। এর বদলে "পেতল বা অন্য কোন ধাতুর তৈরি বাসনপত্রের পুরোদস্তুর ব্যবহার শুরু হয়েছে তার পরে।"[৫৬] চিরাচরিত গ্রামীণ সহবতের অঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত নীচু টুল বা চৌকি বাদ দিলে সম্ভবত কাঠের আসবাবপত্র বলতে খাটিয়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না।[৫৭] আজকে, চাষীদের গৃহসামগ্রীর ছবিটি সম্পূর্ণ করতে গেলে[৫৮] (এর সঙ্গে) যোগ করা দরকার শুধুমাত্র টিনের বাক্স ও সামান্য কয়েকটি গয়না।[৫৯]

গয়নাপত্র, অর্থাৎ সঞ্চয়কে মেয়েদের গয়নায় পরিণত করার রীতি, মনে হয় সর্বত্র চালু ছিল। বিদেশী পর্যটকরা প্রায় সব জায়গায় অত্যধিক পরিমাণে গয়না লক্ষ্য করেছেন, যা হয়তো মেয়েরা পরত।[৬০] সাধারণত এ বিষয়ে তাঁদের বর্ণনা খুব

৫৩. মানুচি, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩।

৫৪. লিনস্কোটেন, ১ম খণ্ড, পৃ ২৬১-২, এবং ২২৬।

৫৫. লখনউ-এর বাজারে। *JRAS*, ১৯১৮, পৃ. ৩৮১-২। এখানে এ-ও যোগ করা যেতে পারে যে ১৭ শতক চলাকালীন সময়ে ভারতে তামার উৎপাদন সম্ভবত কমে যায়।

৫৬. মোয়েন্‌স্‌, 'সেটল্‌মেন্ট রিপোর্ট ফর দা বেরিলী ডিস্ট্রিক্ট' পৃ. ৫৫, ক্রুক কর্তৃক উদ্ধৃত, 'নর্থ-ওয়েস্টার্ন প্রভিন্সেস', পৃ. ২৭৬। তুলনীয় মোরল্যাণ্ড, 'ইণ্ডিয়া······অফ আকবর', পৃ. ২৭৩-৭৪।

৫৭. ভাণ্ডের (আগ্রা প্রদেশের ইরাজ্‌ 'সরকার'-এ)-এর এক মালীর গল্প বলতে গিয়ে মুশ্‌তাকী (পৃ. ২১ ক) বলেছেন: "একশ্রেণীর গ্রামবাসীদের ('দিহ্‌কান') প্রথা হলো যে যখন কোন অতিথি তাদের বাড়িতে আসে তখন গৃহকর্তার স্ত্রী হাত-পা ধোওয়ার জল দেয় ও তার সামনে চৌকি পেতে দেয়।"

৫৮. তুলনীয় ক্রুক, ঐ, পৃ. ২৬৮. "ছোট চাষীদের আসবাবপত্র বলতে বোঝায় কয়েকটি বাজে নড়বড়ে খাটিয়া, রান্নার জন্য কিছু পেতলের বাসনপত্র, কিছু লাল মাটির পাত্র, বাচ্চাদের জন্য একটা বা দুটো চৌকি, কাপড় বা অন্যান্য অল্পদামী জিনিস রাখার বাক্স এবং একটা মাটির গোলা যেখানে পরিবারের ফসল মজুত রাখা হয়।"

৫৯. তুলনীয় মোরল্যাণ্ড, 'ইণ্ডিয়া······অফ আকবর', ২৭৭-৮।

৬০. তুলনীয় ফিচ, রাইলি ১০৭, ১০৯, ১১৮-৯, 'আর্লি ট্রাভেলস্‌', ২২-৩, ২৮; ফ্রায়ার, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৭; ওভিংটন, ১৮৮-৯ ইত্যাদি।

বিশদ নয়। কিন্তু ঐ সব বর্ণনা ও ফ্রায়ার-এর একটি সুনির্দিষ্ট বিবৃতি[৬১] থেকে মনে হয় গরীব লোকদের গয়না ছিল তামা, কাচ বা শাঁখের[৬২] অথবা, আগে আমরা যেমন দেখেছি, এমনকি এক সময়ে লবঙ্গের গয়নাও ছিল।

সমসাময়িক বিবরণে প্রায়ই আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব ও তীর্থযাত্রার যে বিবরণ আমাদের জন্যে রাখা আছে, সেগুলি বিচার করলে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় এখনকার মতো তখনও কৃষকদের জীবনে এগুলির ভূমিকা ছিল লক্ষণীয়। এই ধরনের অনুষ্ঠান, ছেলেমেয়ের বিয়ে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং নদীর ধারে উৎসব—এগুলিতে নিশ্চয়ই চাষীর সামান্য পুঁজির একটা অংশ খরচ হয়ে যেত বা তার ঋণের বোঝা বাড়ত।[৬৩] এমনকি ভালো ফসলের বছরগুলোয় গুজরাটের চাষীরা "নারকীয় উৎসবগুলিতে" তাদের উদ্‌বৃত্ত "খরচ করে ও উড়িয়ে দেয়"—এই বলে একজন সমসাময়িক ওলন্দাজ পর্যবেক্ষক তাদের তিরস্কার করেছেন—আর এই কারণে ঈশ্বর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রীতি অনুযায়ী ১৬৩০-৩২ সালের বিরাট দুর্ভিক্ষ মারফৎ তাদের শাস্তি দিয়েছেন।[৬৪]

২. দুর্ভিক্ষ

এ পর্যন্ত আমরা মুঘল যুগের চাষীদের দারিদ্র্য ও দুর্দশা, অর্থাৎ স্বাভাবিক বছরগুলোয় তাদের যা দশা হতো তা দেখেছি। কিন্তু যে বর্ষাকালের ওপর তাদের ফসল

৬১. "বড়লোক (মেয়েদের) হাতে পায়ে সোনারূপোর শিকলি থাকে. গরীবদের নাকে, কানে ও হাতে পায়ের আঙুলে আংটি ছাড়াও পেতল, কাঁচ ও দস্তার শিকলি আছে" (ফ্রায়ার, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৭)।

৬২. যেমনটি ওড়িশায় দেখা যায় (বাউরি, ২০৮-৯)। এখানে পুরুষরা মেয়েদের মতোই গয়না পরে ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯১)।

৬৩. এই সমস্ত তীর্থযাত্রা থেকে কর্তৃপক্ষ আরেকটি আদায়ের উপায় দেখতে পেয়েছিল। 'কর' নামে তীর্থশুল্কটি আকবর উঠিয়ে দিয়েছিলেন ('আকবরনামা' ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯০; 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০১), কিন্তু এটি আবার নিঃশব্দে চাপানো হয়। 'নিগারনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ৯৭ ক-খ, Bodl. পৃ ৭৩ ক, Ed. 76 (ত্রুটিপূর্ণ) বইতে মুহম্মদ মোমিন, আমিন-কে জারি করা একটি পরওয়ানায় মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে "গঙ্গ নদী, হিন্দবী ভাষায় যাকে গঙ্গা বলে. তার তীরে দলে দলে হিন্দুর সমবেত হওয়ার" আসন্ন সময়ের কথা। "এটি তারা কয়েক বছর অন্তর পার হয়" এবং "এই সময় 'সাই-র' (ভূমি-রাজস্ব ছাড়া অন্য কর)-এর 'মহল' থেকে যথেষ্ট রাজস্ব পাওয়া যায়।" ঐ পরওয়ানায় তাকে তাই যাত্রাপথ ও দেবস্থানগুলি সম্বন্ধে সঠিক খবর রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করে দেওয়া হয়েছে, যাতে কেউ কর ফাঁকি দিতে না পারে। এসত্ত্বেও আওরঙ্গজেবের আমলে "গঙ্গাস্নান থেকে রাজস্ব" নিষিদ্ধ শুল্ক-তালিকার অন্তর্গত ছিল। ('জাওয়াবিৎ-এ আলমগীরী', Ethe 415, পৃ. ১৮১ খ, Or. 1641, পৃ. ১৩৬ খ, Add. 6598, পৃ. ১৮৯ খ)।

৬৪. ট্রাইস্ট, অনু. মোরল্যাণ্ড, *JIH*, খণ্ড ১৩, পৃ. ৬৬।

নির্ভর করত, তার আশীর্বাদ বরাবর একই রকম থাকত না। ঠিক সময়ে বৃষ্টি না হলে বা অতিবৃষ্টির ফলে ফসল ডুবে গেলে, সব বরবাদ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আজকে বিশাল রেল ব্যবস্থার ফলে 'উদ্‌বৃত্ত' অঞ্চল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় দ্রুত খাদ্যশস্য পাঠানো যায়। কালক্রমে রেলপথের এই সুবিধা বৃটিশ শাসনব্যবস্থার বহুল-প্রচারিত সাফল্যের তালিকায় আরেকটি মাত্রা যোগ করেছে : সেটি হলো 'খাদ্যের দুর্ভিক্ষ'কে 'কাজের দুর্ভিক্ষে' পরিণত করা। অবশ্য এই দাবি নিয়ে আমাদের মাথা-ব্যথার কোন কারণ নেই। তবে মুঘল যুগের দুর্ভিক্ষজনিত ভয়াবহ পরিস্থিতির সঙ্গে বৃটিশ রাজত্বের সময়ে সন্তুষ্টি ও প্রাচুর্যের প্রশংসা করে, দু-এর মধ্যে তুলনা করার যে প্রচেষ্টা হয়েছে তা কতখানি সঙ্গত তার ওপর আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে পাদটীকায় কতক তথ্য দেওয়া হলো।[১]

সমসাময়িক সূত্র থেকে সংগ্রহ করে নীচে যে দুর্ভিক্ষ ও অনটনের বর্ণনা দেওয়া

১. "মুঘল আমলের শাসন যখন তার গৌরবের চূড়ায়, তখনকার জীবনধারনের অবস্থার সঙ্গে আধুনিক বৃটিশ রাজত্বের অবস্থার যে প্রচণ্ড পার্থক্য"—ভিনসেণ্ট স্মিথকে (যিনি ছিলেন এক-কালে ইঙ্গ-ভারতীয় ঐতিহাসিকদের অগ্রগণ্য) তা ভালো করে দেখিয়ে দেওয়ার সুযোগ দিয়েছিল ১৬৩০-৩২ সালের গুজরাট দুর্ভিক্ষের "ভয়াবহ চিত্র" ('অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', অক্সফোর্ড, ১৯২৩, পৃ. ৩৯৪)। এই 'আধুনিক' সরকার ভারতে তার রাজত্ব শুরু করেছিল এক দুর্ভিক্ষ দিয়ে যা বাংলার জনসংখ্যার একের-তিন অংশকে পরপারে ঠেলে দিয়েছিল। মূল তথ্যসূত্রগুলি ভুল পড়ার দরুন স্মিথ প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এই বলে যে ১৬৩০-৩২ সালে শাহ্‌জাহান "ধার্য ভূমি-রাজস্বের মাত্র একের-এগার অংশ" ছাড় দিয়েছিলেন। এই (কাল্পনিক) হৃদয়হীন ব্যবস্থার বিপরীতে ১৭৬৯-৭০ সালে ইংরেজ যে-মহানুভবতা দেখিয়েছিল তা তুলনা করে দেখুন : "যে-বছরে শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ চাষী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তখন পাঁচ শতাংশ ভূমি-করও ছাড় দেওয়া হয়নি। এবং এর পরের বছরের (১৭৭০-৭১) জন্য তার সঙ্গে যোগ করা হয়েছিল আরও শতকরা দশ ভাগ।" (হাণ্টার, 'দি অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল', লণ্ডন, ১৮৯৭, পৃ. ৩৯)। মোরল্যাণ্ড, যিনি সাধারণত এই ধরনের মন্তব্য করার বিষয়ে খুব সাবধান, তিনিও এই গর্ব করার লোভ সামলাতে পারেননি যে বৃটিশ শাসনের অধীনে "এখনও অগম্য কিছু ভূখণ্ড ছাড়া খাদ্য-দুর্ভিক্ষের ধারণাটিই দূর হয়ে গেছে" ('আকবর টু আওরঙ্গজেব', পৃ. ২১০)। এই লেখার কুড়ি বছর পরে, ১৯৪৩-৪৪ সালে বাংলাদেশের প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যায় এবং সমস্ত মধ্যযুগীয় বীভৎসতা আবার এমনভাবে দেখা দেয় যা সত্যই 'আধুনিক'কালের উপযুক্ত।

কিন্তু এইসব কথা যেন আমাদের মুঘল ভারতের দুর্ভিক্ষগুলির ভয়াবহ ফলাফলকে ছোট করে দেখার দিকে নিয়ে না যায়। ডঃ শরণ যখন একটিমাত্র অনুচ্ছেদের কয়েকটি আলঙ্কারিক অংশ তুলে নিয়ে এই বিপর্যয়গুলির বর্ণনাকে অতিরঞ্জিত ও শুধুমাত্র সাহিত্যিক প্রয়াস বলে ধিক্কার দেন, সেটিও খুব বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না ('প্রভিন্‌সিয়াল গভর্নমেন্ট অফ দ মুঘলস্', পৃ. ৪২৭ ইত্যাদি)।

হয়েছে, তার থেকে আমাদের আলোচ্য পর্বে এই বিপর্যয়গুলির পুনরাবৃত্তি ও ভয়াবহতা সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারে। অবশ্য মনে রাখতে হবে এই বিবরণ কখনই সম্পূর্ণতার দাবি করে না এবং তথ্যের পরিমাণ যত বাড়বে ততই এই তালিকাও বোধহয় বাড়বে।[২]

আমাদের আলোচ্য পর্বের শুরু এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সর্বশেষ পর্যায়ে, যে দুর্ভিক্ষ পরপর দু-বছর অর্থাৎ ১৫৫৪-৫৫ ও ১৫৫৫-৫৬ সালে "হিন্দের সমস্ত পূর্ব অংশ" বা হিন্দুস্তান (অর্থাৎ বাংলা ও সম্ভবত বিহার বাদ দিয়ে) বিশেষ করে আগ্রা, বায়ানা ও দিল্লীর কাছাকাছি অঞ্চল ধ্বংস করেছিল। মানুষ মরেছে দলে দলে—দশ, কুড়ি বা আরও বেশি সংখ্যায় এবং মৃতদের "কবর বা কফিন" কিছুই জোটেনি। "মিশরীয় কাঁটার বীজ, বুনো শুকনো ঘাস ও গরুর চামড়া খেয়ে" সাধারণ মানুষ বেঁচে ছিল। বদাউনী নিজের চোখে মানুষকে নরমাংস খেতে দেখেছিলেন। "দেশের ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের বেশির ভাগই জনশূন্য, চাষী ও কৃষিজীবীরা উদ্বাস্তু আর বিদ্রোহীরা মুসলমানদের শহরগুলি লুট করেছিল।"[৩] আবুল ফজল দাবি করেছিলেন যে আকবরের ক্ষমতায় আসার সময় এই অনটন মিটে গিয়েছিল।[৪] সম্ভবত ভালো রবিশস্য ফলনই এর কারণ।

মনে হয়, ষাটের দশকের মাঝামাঝি নাগাদ গুজরাট এক ভয়াবহ অনটনে আক্রান্ত হয়েছিল। সামান্য খাদ্যের বিনিময়ে বাপমায়েরা ছেলেমেয়েদের বিক্রি করেছেন—এই সময়ে এটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্বাভাবিক ঘটনা।[৫] পরবর্তী দশকে অর্থাৎ ১৫৭২-৭৩ অথবা তার কাছাকাছি সময়ে সিরহিন্দ অঞ্চলে এক তীব্র দুর্ভিক্ষের আভাস পাওয়া যায়।[৬] ১৫৭৪-৭৫ সালে আবার গুজরাটে নেমে এসেছিল এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। আর এবার তার সঙ্গে ছিল মড়ক; বিশাল সংখ্যায় 'ধনী-নির্ধন' নির্বিশেষে মানুষ ঐ প্রদেশ ত্যাগ করেছিলেন।[৭] ঐ বছরেই সমস্ত উত্তর ভারতে খরার আতঙ্ক

২. উল্লেখ করা যেতে পারে যে করমণ্ডল, যেখা'ন বিশেষ করে দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকত, তা আমাদের আলোচনার সীমার বাইরে বলে এই সমীক্ষার ভেতর আনা হয়নি।

৩. বাদাউনী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৮-৯ ; 'আকবরনামা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫। পরবর্তী সূত্রটিতেও নরমাংস খাওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। দুর্ভিক্ষের জন্য 'আইন', ২য় খণ্ডে আবুল ফজলের আত্মজীবনী দ্রষ্টব্য ('ইন্‌শা-এ আবুল ফজল', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৬-২৭এ পুনর্মুদ্রিত)।

৪. 'আকবরনামা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫।

৫. সিজার ফ্রেডরিক, 'পুর্চাস', ১০ম খণ্ড, পৃ. ৯০। এই ইতালীয় পর্যটক খামবায়াত (কাম্বে)-এ গিয়েছিলেন এবং ১৫৬৩ ও ১৫৬৭-র মধ্যেকার এই অনটন চোখে দেখেছিলেন।

৬. এই অঞ্চলের একটি পরিবার নরমাংস খাওয়া ধরেছিল। শেষ পর্যন্ত যখন তাদের গ্রেপ্তার করা হয় তখন তারা বলে যে দুর্ভিক্ষের সময় তাদের এই অভ্যাস রপ্ত হয়েছিল। (ফৈজী সিরহিন্দী, পৃ. ১২১ ক১-২২ক)।

৭. আরিফ কান্দাহারী, ১৭৭-৭৯ ; 'তবাকৎ-এ আকবরী', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০১ ; বাদাউনী, ২য় খণ্ড, ১৮৬ ; ফৈজী সিরহিন্দী, পৃ. ১২২ ক-খ। শেষের দুজন নিঃসন্দেহে তাঁদের তথ্য

দেখা দিয়েছিল, কিন্তু ঠিক সময়ে বৃষ্টি হওয়ার ফলে সেই বিপদ কেটে যায়।[৮] মনে হয়, ১৫৭৮-১৫৭৯ সালে হিন্দুস্তানের কিছু অংশে অনটন দেখা দেয়।[৯] ১৫৮৭ ও ১৫৮৮ সালে ভাক্কার অঞ্চলে পঙ্গপাল শস্য ধ্বংস করেছিল। ফলে "বেশির ভাগ লোক ঐ অঞ্চল ছেড়ে চলে যায় এবং সমিজা ও বালুচে নদীর দুধারেই লুটপাট চালায়। একটি বসতিও তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি।"[১০] ১৫৮৯-৯০ সালের খরাতে আবার ঐ জায়গায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।[১১]

১৫৯৬ সালে সাধারণভাবেই কম বৃষ্টি হয়েছিল : "চড়া দাম লোককে দুঃখমগ্ন করল"। আকবর প্রত্যেক শহরে লঙ্গরখানা খোলার আদেশ দিলেন।[১২] পরের বছরে খরার ফলে কাশ্মীরে এক তীব্র অনটন দেখা দেয় ; "বাচ্চাদের খাওয়ানোর কোন উপায় না থাকায় সেখানকার নিঃস্ব মানুষ শহরের প্রকাশ্য জায়গায় শিশুদের বিক্রির জন্য হাজির করে।"[১৩]

১৬১৫-১৬ সালে লিখতে বসে জাহাঙ্গীর সেই বছর ও তার আগের বছরে পাঞ্জাব থেকে সিরহিন্দ, দোআব ও দিল্লীতে ব্যুবোনিক প্লেগ ছড়িয়ে পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর রচনায় উদ্ধৃত এক সুচিন্তিত মন্তব্যে বলা হয়েছে, দুবছরের

নিয়েছিলেন 'তবাকৎ-এ আকবরী' থেকে। কিন্তু সেখানে মৃত্যুহারের কোন উল্লেখ না থাকলেও বাদাউনী যোগ করেছেন যে অসংখ্য লোক মারা গিয়েছিল। কিন্তু সম্ভবত এটি নিছক অনুমান।

৮. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৬-৭।

৯. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৪।

১০. মাসুম, 'তারিখ-এ সিন্দ', সম্পা. দাউদপোতা, পৃ. ২৪৯।

১১. ঐ, পৃ. ২৫০।

১২. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭১৪। নুরুল হক্ দিহ্লবীর 'জুদবতুৎ তওয়ারিখ'-এ এই দুর্ভিক্ষকে অত্যন্ত তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী বলে দেখানো হয়েছে। বলা হয়েছে যে খরা হয়েছিল ১৫৯৫-৯৬ সালে এবং হিন্দুস্তানে 'টানা তিন-চার বছর ধরে' চলেছিল এক 'ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ'। 'মানুষ নিজ জাতির মাংস খেয়েছিল। মৃতদেহ জমে গিয়ে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল' (এলিয়ট ও ডউসন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯৩)। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ দিকে এই বইটি লেখা হয় এবং এও সম্ভব যে এর বিবরণ খুবই অতিরঞ্জিত (তুলনীয় শরণ, পৃ. ৪২৪ টীকা)। ১৬০১-এর আগের ঘটনাগুলির জন্য নুরুল হক্ সাধারণত ফৈজী সিরহিন্দীকে অনুসরণ করেছেন, আর ফৈজী এ ধরনের কোন কথা বলেননি। জেসুইট প্রচারকরা ১৫৯৫ সালের মে মাসে লাহোরে পৌঁছান। তারপর থেকে তাঁরা দরবারেই ছিলেন। তাঁরা শুধু ১৫৯৭ সালে কাশ্মীরের দুর্ভিক্ষই দেখেছিলেন ; আর দ্যু জারিক (অনু. পেন, 'আকবর অ্যাণ্ড দ্য জেসুইটস') যদি তাদের বক্তব্য সঠিকভাবে উপস্থিত করে থাকেন, তাহলে তাঁরা সমভূমিতে অনটনের সামান্যতম উল্লেখও করেননি। নুরুল হক্ এই দুর্ভিক্ষকে যতটা গুরুতর বলে দেখিয়েছেন, ঘটনা যদি তা-ই হয়ে থাকত, তাহলে সেটি উল্লেখ না করার কোন কারণ থাকতে পারে না।

১৩. 'আকবর অ্যাণ্ড দ্য জেসুইটস্', পৃ. ৭৭-৮। তুলনীয় 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭২৭।

(১৬১৩-১৪ ও ১৬১৪-১৫) প্রচণ্ড খরাই এই অবস্থার জন্য দায়ী ; কিন্তু এর কোন বিশদ তথ্য দেওয়া হয়নি।[১৪] আমাদের আলোচ্য পর্বে নথিবদ্ধ বিপর্যয়গুলির মধ্যে সম্ভবত ১৬৩০-৩২ সালের বিরাট দুর্ভিক্ষই ছিল সবচেয়ে বিধ্বংসী। সমসাময়িক ভাবনার উপর এটি গভীরতম ছাপ ফেলেছিল। গুজরাট ও দখিনের বেশির ভাগ অংশই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[১৫] ১৬৩০ সালের প্রথমে এইসব অঞ্চলে বৃষ্টি একেবারেই হয়নি। পরের বছর, শস্য উৎপাদন উৎসাহজনক হলেও প্রথমে ইঁদুর ও পঙ্গপালের অত্যাচারে, পরে অতিবৃষ্টির ফলে তা ধ্বংস হয়ে যায়।[১৬] তখন মনে হয় দখিনে চলছিল খরার প্রকোপ।[১৭] যাঁরা অনাহারের হাত থেকে বেঁচেছিলেন

১৪. 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ১৬১-২।

১৫. কজবীনী (Add. 20,734, পৃ. ৪৪২-৪৪৪ ; Or. 173, পৃ. ২২০ খ-২২১ ক) এবং সাদিক খান (Or. 174, পৃ. ২৯ ক-৩২ ক ; Or. 1671, পৃ. ১৭ ক-১৮ খ) এই দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিয়েছেন। দুজনেই নিজেদের প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবি করেছেন। বুরহানপুরে যে-দরবার বসেছিল সেখানে নাকি তাঁরা হাজির ছিলেন। লাহোরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬২-৩, শুধুমাত্র কজবীনীর লেখাকে সংক্ষিপ্ত আকারে হাজির করেছেন। ফলে তাঁর বিবরণকে ফার্সী ভাষায় একমাত্র সমসাময়িক বর্ণনা বলে মেনে নেওয়া এবং তারপরে তাঁর লেখাকে বিশুদ্ধ আলঙ্কারিক রচনা বলে সমালোচনা করা—দু-এর কোনটাই তাঁর প্রাপ্য নয় (শরণ, পৃ. ৪২৭ ইত্যাদি)। সাদিক খানের ব্যক্তিগত উল্লেখগুলি অদলবদল করা বা বাদ দেওয়া ছাড়া খাফী খান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৪-৯-এ তাঁর হুবহু নকল করেছেন। দুর্ভিক্ষের জন্য প্রধান ইউরোপীয় সূত্র হলো মাণ্ডি, 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৩০-৩৩' এবং ট্রাইস্ট (*JIH*, খণ্ড ১৬, পৃ. ৬৫-৬৯)। তাঁদের বিবরণগুলির বেশির ভাগই গুজরাট সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

১৬. এখানে ইউরোপীয় তথ্যসূত্রগুলিকে অনুসরণ করা হয়েছে: 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬৩০-৩৩', পৃ. ১৩৪-৫, ১৫৮, ১৬৫, ১৮১, ১৯৩ ; মাণ্ডি, ৩৮ ; ট্রাইস্ট, *JIH*, খণ্ড ১৬, পৃ. ৬৬, ৬৮। বিবরণগুলির মধ্যে খুবই মিল আছে।

১৭. কজবীনী বলেন যে যদিও "বালাঘাটের বেশির ভাগ 'মহালে', বিশেষ করে দৌলতাবাদের আশপাশের অঞ্চলে", ১৬৩০ সালে কম বৃষ্টি হয়েছিল, তবু খরা আরও অনেক ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে ১৬৩১ সালে। অন্যদিকে সম্ভবত যথার্থ ঘটনাপরম্পরাটি উল্টে দিয়ে সাদিক খান বলেন যে ১৬৩০ সালে অতিবৃষ্টির ফলে শস্য নষ্ট হয়ে যায় আর তারপরেই ১৬৩১ সাল ছিল পুরোপুরি খরার বছর। তিনি যোগ করেছেন, তৃতীয় বছরে ইঁদুর ও পঙ্গপাল শস্যের বিরাট ক্ষতি করে। আগেই বলা হয়েছে যে এই দুজন লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল শুধুমাত্র দখিন সম্বন্ধেই এবং এও সম্ভব যে গুজরাটের কারণের ঠিক উল্টো কারণে সেখানে দুর্ভিক্ষ চলছিল। করমণ্ডলে আবার প্রকৃতির আচরণ ছিল আলাদা। অন্যান্য জায়গার মতো এখানে ১৬৩০ সালে শুরু হয়েছিল দুর্ভিক্ষ ('ফ্যাক্টরিস, ১৬৩০-৩৩', পৃ. ৭৩, ২৬৮)। ১৬৩১ সালেও খরা চলছিল, কিন্তু অবশেষে ১৬৩২-র আগস্ট মাসে "প্রচুর বৃষ্টি হয়" (ঐ, পৃ. ২০৩-৪, ২২৮)। কিন্তু ১৬৩৩ সালে "এত বেশি বৃষ্টি হয় যে মাঠের শস্য আধপাকা হওয়ার আগেই তার এক বিরাট অংশ পচে গিয়েছিল" ('ফ্যাক্টরিস, ১৬৩৪-৩৬', পৃ. ৪০)।

তাঁদের শেষ করার জন্যে দুর্ভিক্ষের পিছু নিয়ে হাজির হলো মড়ক। এই সময় বীভৎসতম সব দৃশ্য দেখা দেয়। বাপমায়েরা নিজে বাঁচার জন্যে বাচ্চাদের বিক্রি করেছিলেন। কম ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের দিকে পাইকারিভাবে পালানোর চেষ্টা হয়, কিন্তু খুব বেশি লোক মৃত্যুর হাত এড়িয়ে যাত্রার প্রাথমিক পর্যায়ও শেষ করতে পারেননি। জমে-ওঠা মৃতদেহে পথ আটকে গিয়েছিল। প্রথম বছর মরেছিলেন বেশির ভাগই গরীব মানুষ, কিন্তু পরের বছর এল বড়লোকের পালা।[১৮] গবাদি পশুর চামড়া ও কুকুরের মাংস খাওয়া চলছিল। মৃতদের হাড় গুঁড়ো করে ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে বিক্রি করা হতো ও শেষ পর্যন্ত নরমাংস খাওয়া চালু হয়েছিল।[১৯] ১৬৩০ সালে শাহ্জাহানের সেনাবাহিনী বুরহানপুরে ছাউনি গাড়ে। তাদের খাওয়ানোর দায়িত্ব থাকায় মালব থেকে 'বন্জারা' মারফৎ গুজরাটে ও তারও পারে খাদ্যশস্য ঠিকমতো পাঠানো যায়নি।[২০] যদিও পরের বছর ছাউনি উঠে গিয়েছিল ও বিপুল পরিমাণে মালপত্র নিয়ে 'বন্জারা'রা সুরাট অবধি পৌঁছেছিল,[২১] তবুও তখন খাবারের দাম ছিল প্রায় নাগালের বাইরে।[২২] প্রশাসনের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বড় বড় শহরে খোলা হতো লঙ্গরখানা[২৩]—ত্রাণব্যবস্থার চেয়ে এর আসল উদ্দেশ্য ছিল দয়া দেখানো। আর বাধ্য হয়েই জমির রাজস্ব অনেকটাই মকুব করা হতো।[২৩ক]

১৮. এও বিচিত্র যে সাদিক খান ও ট্যুইস্ট দুজনেই এই বিষয়টির ওপর জোর দিয়েছেন।

১৯. মনে হয় ডঃ শরণ বলতে চান যে লাহোরী ও ট্যুইস্ট যে নরমাংস খাওয়ার উল্লেখ করেছেন তা হলো সাহিত্যিক উচ্ছ্বাস ও শোনা কথার ফল (শরণ, পৃ. ৪২৯-৩১)। বাবা-মা-এর নিজেদের সন্তানদের খাওয়ার কথা দুজনেই বলেছেন। মাণ্ডি (পৃ. ২৭৬) দুর্ভিক্ষের ঠিক পরেই গুজরাটে ফিরে এসে একই বিবৃতি দিয়েছেন। সাদিক খান দরবারে পাঠানো একটি সত্য বিবরণের কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে একজন মহিলা আহ্মেদাবাদের কাজীর কাছে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল যে ঐ প্রতিবেশী, মহিলাটির সম্মতি নিয়ে তার ছেলেকে মারার পর মাংসের ভাগ দেয়নি। এই ধরনের ঘটনা ও তার সঙ্গে নরমাংস খাওয়ার উদ্দেশ্যে যে-সব হত্যা হয়েছিল বলে সন্দেহ করা হয়েছে তাব থেকে দেখা যায় যে মৃতদেহ খাওয়া কত সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল ; আর এই সর্বসম্মত সাক্ষ্য এতই জোরালো যে উপেক্ষা করা যায় না।

২০. মাণ্ডি, ৫৬ ; 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৩০-৩৩', পৃ. ১৬৫।

২১. 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৩০-৩৩', পৃ. ১৯৬ ; '১৬৩৪-৬', পৃ. ২২৪-২৫।

২২. জানুয়ারি, ১৬৩২-এ সুরাটে মণপিছু ৬½ ও ৬¾ মাহ্মুদী দরে "শস্য" বিক্রি হচ্ছিল। বলা হয়েছে এই দাম আগের চাইতে কম, কারণ 'বন্জারা' মারফৎ ও তার সঙ্গে সমুদ্রপথে যোগান এসেছিল ('ফ্যাক্টরিস ১৬৩০-৩৩', পৃ. ১৯৬)। সেপ্টেম্বর, ১৬৩১-এ দর মণপিছু ১৬ মাহ্মুদীর কম ছিল না (ঐ, ১৬৫)। দুর্ভিক্ষের আগে গমের স্বাভাবিক দাম ছিল ১½ মণপিছু ১ মাহ্মুদী (ট্যুইস্ট, *JIH*, খণ্ড ১৬, পৃ. ৬৮)।

২৩. কজবীনী, Add. 20, 734, পৃ. ৪৪৪, Or. 173, পৃ. ২২১ ক ; লাহোরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৩, সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ৩১ খ, Or. 1671, পৃ. ১৮ খ ; খাফী খান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৮-৯।

২৩ ক. ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৮ম অংশ দ্রষ্টব্য।

ক্ষতিগ্রস্ত প্রদেশগুলির মধ্যে গুজরাটের দুর্দশাই ছিল সবচেয়ে বেশি।[২৪] বলা হয়েছে, ১৬৩১-এর অক্টোবরের আগের দশ মাসে এখানকার তিরিশ লক্ষ অধিবাসী মারা যায়; আর আহ্মেদনগর রাজ্যে মৃতদের সংখ্যা অনুমান করা হয় দশ লক্ষ।[২৫] মৃত্যু অথবা পালানোর দরুন গুজরাটের শহরগুলির লোকসংখ্যা একের দশ ভাগে নেমে এসেছিল।[২৬] গ্রামের অবস্থা নিশ্চয়ই এর চেয়ে ভালো ছিল না। সাদিক খান বলেছেন, "সুলতানপুর, বিদর, মাণ্ডু, আহ্মেদাবাদের পরগনাগুলি এবং খান্দেশ প্রদেশ ও বালাঘাটের কিছু পরগনা একেবারেই জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল", সেখানে বসবাসের জন্য অন্যান্য জায়গা থেকে চাষীদের আনাতে হয়। ১৬৩৪-এর শেষদিকে তিনবার ভালো ফসল হওয়ার পর গুজরাট থেকে খবর পাঠানো হয় যে, যদিও শহরগুলিতে লোকসংখ্যা বাড়ছে "কিন্তু গ্রামগুলি ভরে উঠেছে খুবই ধীরে ধীরে।"[২৭] ১৬৩৮-৩৯ সালেও "সর্বত্রই"[২৮] দুর্ভিক্ষের "চিহ্ন" দেখা দেয় এবং স্পষ্টতই শাহ্জাহানের রাজত্বের দ্বিতীয় দশকের শেষদিকেও চাষবাস সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়নি।[২৯]

১৬৩৬-৩৭ সালে পাঞ্জাব দুর্ভিক্ষ ও অঘটনের কবলে পড়েছিল বলে জানা যায়।[৩০] ১৬40 সালে অতিবৃষ্টি ও তার ফলে বন্যায় কাশ্মীরের খারিফ শস্য ধ্বংস হয়।[৩১] ১৬৪২ সালে আবার একই কারণে সেখানে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তিরিশ হাজার লোক দুর্দশার দরুন লাহোরের দিকে পালাতে বাধ্য হয়েছিল।[৩২] পরের বছর ওড়িশায় দেখা দেয় এক দীর্ঘস্থায়ী খরা; ফলে সেখান থেকে করমণ্ডলে নিয়মিত খাদ্যশস্য রপ্তানি বিপর্যস্ত হয়।[৩৩]

২৪. লাহোরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৩।

২৫. পর্তুগীজ রাজপ্রতিনিধি তাঁর রাজাকে যেরকম জানিয়েছিলেন ('ফ্যাক্টরিস ১৬৩০-৩৩', পৃ. একুশ)।

২৬. তুলনীয় মাণ্ডি, ২৭৬, উদাহরণ হিসেবে তাঁতীদের কথা বলা হয়েছে। আরও দ্র. 'ফ্যাক্টরিস', ১৬৩০-৩৩', পৃ. ১৮০; আগে "সোয়ালি" শহরে যে ২৬০টি পরিবার বাস করত ডিসেম্বর ১৬৩১-এ তার মাত্র "১০টি বা ১১টি" পড়ে আছে।

২৭. 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৩৪-৩৬', পৃ. ৬৫।

২৮. কমিসারিয়ট, 'মানদেল্‌স্‌লো', পৃ. ৭।

২৯. লাহোরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১১-১২, শাহ্জাহানের রাজত্বের ২০তম বছরে (১৬৪৬-৪৭) লিখতে বসে জানিয়েছেন যে গুজরাট ও দখিনের প্রদেশগুলি দুর্ভিক্ষের ফলে এতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে তাদের 'জমা' (বা ধার্য রাজস্ব) বাড়তে দেখা যায়নি এবং কার্যত আগের চেয়ে কমের দিকেই গেছে।

৩০. লাহোরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯।

৩১. ঐ, ২০৪-৫; সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ৯৬ ক, Or. 1671. পৃ. ৫২ খ।

৩২. লাহোরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮২-৩; সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ৯৯ খ, Or. 1671, পৃ. ৫৪ ক-খ; খাফী খান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮৭।

৩৩. মোরল্যাণ্ড, আকবর টু আওরঙ্গজেব', পৃ. ২০৮; রায়চৌধুরী, 'ডাচ্ ইন করমণ্ডল', পৃ. ১৪২।

চল্লিশের দশকে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বারবারই অনাবৃষ্টি ঘটে। এইভাবে ১৬৪৪ সালে আগ্রা প্রদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যদিও দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির কথা আমাদের জানা নেই।[৩৪] ১৬৪৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে দরবারে জানানো হয় যে খাদ্যশস্যের বেশি দামের ফলে 'নিঃস্ব'রা বাচ্চাদের বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু মনে হয় এই দুর্দশা সীমা ছাড়িয়ে যায়নি।[৩৫] ১৬৪৬ সালে আগ্রা ও আহ্‌মেদাবাদ এই দুজায়গাতেই খরা দেখা দেয়।[৩৬] ১৬৪৭ সালে মাড়োয়ারে একেবারেই বৃষ্টি হয়নি। ফলে "এমনই দুর্ভিক্ষ হয় যে মৃত্যু ও লোক পালানোর দরুন ঐসব অঞ্চল জনশূন্য ও অগম্য হয়ে পড়ে।"[৩৭] ১৬৪৮ সালে আবার আগ্রা অঞ্চলে 'আংশিক অনাবৃষ্টি' দেখা দেয়।[৩৮] অন্যদিকে, ১৬৪৪-৪৫ ও ১৬৪৮ সালে অতিবৃষ্টির ফলে বাংলায় আখের চাষ নষ্ট হয়ে যায়।[৩৯]

১৬৫০-এ "ভারতের সব অঞ্চলেই"[৪০] অনাবৃষ্টি হয়েছিল। অযোধ্যা থেকে "শস্যের অভাবে"র খবর জানা যায়।[৪১] আগ্রা ও আহ্‌মেদাবাদের মধ্যবর্তী এলাকা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৪১] পাঞ্জাবে প্রথমে খরা ও পরে অতিবৃষ্টি ফসলের ক্ষতি করে, আর খাদ্যশস্যের দাম এত চড়ে যায় যে পুরো রাজস্ব দেওয়ার ক্ষমতা চাষীদের ছিল

৩৪. 'ফ্যাক্টরিস ১৬৪২-৪৫', পৃ. ২০২। প্রথম জুমাদা মাসে দরবারে পাঠানো খান্‌জাহান বার্‌হা-র (Add. 16,859, পৃ. ১ খ-২ খ) 'আর্জদাশ্‌ৎ'-এ গোয়ালিয়রে তার জাগীরে রবিশস্যের ফলন থেকে রাজস্ব সংগ্রহের উল্লেখ আছে এবং তার সঙ্গে যোগ করা হয়েছে যে ঐ বছরে "খরাজনিত বিপর্যয় এত বেশি যে উৎপাদন ('হাসিল') আগের বছরগুলির চেয়ে অনেক কম।" যদিও এই "আর্জি" কোন্ বছরে লেখা হয়েছে তা দেওয়া নেই, তবুও বিষয়বস্তু থেকে এটিকে শাহ্‌জাহানের রাজত্বের ১৮তম বছর, এবং মাস যখন দেওয়া আছে সেই হিসেবে জুন-জুলাই ১৬৪৫ সাল বলে নির্দেশ করা যায়। সুতরাং খরার ফলে যে শস্যের ক্ষতি হয় তা হবে ১৬৪৪-এর খারিফ ও ১৬৪৫-এর রবিশস্য।

৩৫. লাহোরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৯। শাহ্‌জাহান হুকুম দিয়েছিলেন যে বাপ মা-রা যত বাচ্চা বিক্রি করে দিয়েছে, তাদের সবাইকে কোষাগারের খরচায় আগের দামে আবার কিনে নিয়ে তাদের পরিবারে ফেরৎ দেওয়া হবে। অনটন যে সীমিতভাবে ছড়িয়েছিল তা এই ঘটনা থেকে দেখা যায়, কারণ, বিশাল সংখ্যায় এইরকম হয়ে থাকলে এই ব্যবস্থার কথা সম্ভবত ভাবাই হতো না। সম্ভবত দাম বেড়ে গিয়েছিল সাময়িকভাবে, রবিশস্য ওঠার আগে পর্যন্ত।

৩৬. 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৪৬-৫০', পৃ. ৬২, ৯৯।

৩৭. ঐ, পৃ. ১৯২-৩।

৩৮. ঐ, পৃ. ২১৯।

৩৯. রায়চৌধুরী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৪০।

৪০. 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৪৬-৫০', পৃ. ৩২২ ; '১৬৫১ ৫৪', পৃ. ২৯।

৪১. ঐ, ১৬৫১-৫৪, পৃ. ৯-১০।

৪২. ঐ, পৃ. ২৬।

না।[৪৩] ১৬৫০ সালে মুলতান প্রদেশে পঙ্গপাল রবিশস্য ধ্বংস করে আর অন্যান্য জায়গার মতো খারিফ শস্য নষ্ট হয় খরাব প্রকোপে। আবার বন্যার ফলে ১৬৫১ সালে রবিশস্যেরও ক্ষতি হয়।[৪৪]

মুঘল দখিনের বালাঘাট প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১৬৫৫ সালে বৃষ্টি নামে দেরিতে এবং প্রচণ্ড পরিমাণে। ফলে ক্ষতি হয় খারিফ শস্যের।[৪৫]

১৬৫৮ থেকে উত্তর ভারতে এক দীর্ঘ অনটনের পর্ব শুরু হয়েছিল। এর প্রথম কারণ 'উত্তরাধিকারের লড়াই'-এর লুটপাট, তারপর আওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম চার অথবা পাঁচ বছরে বর্ষণের অভাবে এই অবস্থাই চলতে থাকে। এই অনটন বিশেষভাবে বোঝা যায় আগ্রা, দিল্লী ও লাহোরের কাছাকাছি অঞ্চলে। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের চতুর্থ বছরে বা তার আগেই প্রশাসনকে এই সব শহরে বড় বড় লঙ্গরখানা খুলতে হয়।[৪৬] কিন্তু ১৬৫৯-৬০এ দুর্ভিক্ষ ও মড়কের কবলে পড়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সিন্ধুদেশ। ফলে এখানে "বেশির ভাগ লোকই মারা গিয়েছিল।"[৪৭] ১৬৫৯, ১৬৬০ ও ১৬৬৩ সালে গুজরাটে ফের খরাব প্রকোপ দেখা দেয়।[৪৮] খরার দরুন শস্যের দাম এত চড়ে যায় যে ১৬৬৪ সালে আশঙ্কা হয়: আর একবার বৃষ্টি না না হলে "এইসব অঞ্চল জনশূন্য হয়ে যাবে।"[৪৯] তবে সুখের বিষয় এই আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হয়নি।[৫০] এমন কি চিরপ্রাচুর্যের দেশ মালবও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তার কারণ যুদ্ধের ফলে ১৬৫৮ সালের খারিফ শস্যের বেশির ভাগই নষ্ট হয়ে যায়।[৫১]

৪৩. ওযাবিস ক: পৃ. ৪৪৫ ক, খ: পৃ. ১৬ ক-খ, সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ১৬৮ ক-১৬৯ ক, Or. 1671, পৃ ৮৪ খ, সালিহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৫। বালকৃষণ ব্রাহ্মণ-এর সংগ্রহে (পৃ ৩৯ ক-খ, ৩৭ ক—পাতা উল্টোপাল্টা হয়ে আছে) হিসার-এ খরা সংক্রান্ত চিঠিটিকে সম্ভবত এই বছরে ফেলা যায়।

৪৪. 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ২০২ ক-খ; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', সম্পা. নাদভী, পৃ. ২২৭-২৮। চিঠিটি জাহানারাকে লেখা এবং শুধুমাত্র অনুমানের ওপর নির্ভর করে তারিখ ঠিক করা যায়।

৪৫. 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ৫৪ খ, ৫৫ খ, 'রুকাৎ-এ আলমগীর', সম্পা. নাদভী, পৃ. ১৪০-৪১, ১৬৬-৭।

৪৬. 'আলমগীরনামা', ৬০৯-১১, খাফী খান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৭, ১২৪ (তুলনীয় Add. 6574, পৃ. ৩৩ক), বার্নিয়ে ৪৩৩।

৪৭. 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৫৫-৬০' পৃ. ২১০ এবং পৃ. ৩০৭-এর টীকা।

৪৮. ঐ, পৃ. ৩০৬-৭, ৩২০, '১৬৬১-৬৪', পৃ. ২৫, ২০০, ২৫৭, ৩২৯, তুলনীয় 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, ২৫১।

৪৯. 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৬১-৬৪', পৃ. ৩২০-২১।

৫০. ঐ, পৃ. ৩২৩।

৫১. 'জামি-আল ইন্শা'-র জফর খানের 'আর্জদাশ্‌ৎ', পৃ. ১০ খ, 'ফৈয়াজ-আল কওয়ানীন', Or. 9617, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩০ খ।

পূর্বদিকে, বাংলা প্রদেশের ঢাকায় ১৬২২-২৩ সালে এক আঞ্চলিক দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে শুরু করে। খাদ্যশস্য রপ্তানির ওপর জোর করে সরকারী কর আদায় ও পথে নানারকম বাধার ফলে এই দুর্দশা আরও বেড়ে যায়।[৫২] কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের লক্ষণ হিসেবে গণমৃত্যু বা সচরাচর বীভৎসতার দৃশ্য এক সিন্ধুপ্রদেশ ছাড়া আর কোথাও দেখা গেছে বলে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

১৬৭০ সালে বৃষ্টির অভাবে বিহারে খারিফ শস্য একেবারেই হয়নি। এর পরের বছর এক তীব্র দুর্ভিক্ষে বেনারসের পশ্চিম থেকে রাজমহল পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল ধ্বংস হয়ে যায়। এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি কীভাবে পথে ও পাটনা শহরে হাজার হাজার মানুষ মারা যায় ও বাপ মা-রা কীভাবে বাচ্চাদের বিক্রি করে দিয়েছিল। সাধারণ হিসেবে শুধু পাটনাতেই নব্বই হাজার লোক মারা পড়ে এবং "একটি লোকও না থাকায় পাটনার কাছাকাছি কয়েকটি শহর জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল।"[৫৩]

১৬৭৮-এর শেষদিকে লাহোরে শস্যের দাম খুব চড়ে গিয়েছিল বলে জানা যায়,[৫৪] কিন্তু দুর্দশার কোন বিবরণ পাওয়া যায়নি। ১৬৮২-তে গুজরাট প্রদেশ "দুর্ভিক্ষ ও অনটনে"র প্রকোপে পড়ে, আর আহ্‌মেদাবাদে প্রদেশকর্তার বিরুদ্ধে 'রুটির জন্য দাঙ্গা' হয়েছিল।[৫৫] দখিনও খরার কবলে পড়ে; এ অঞ্চলের শহরগুলিতে এই বছর থেকেই মড়ক শুরু হয়।[৫৬] ১৬৮৪ সালে আবার (দখিন) উপদ্বীপে শস্যহানি ঘটে। জিনিসপত্রের দামও ভীষণ বেড়ে গিয়েছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫৭]

গুজরাটেও অনটনের পরিস্থিতি চলতেই থাকে। ১৬৮৫ সালে খাদ্যশস্যের দাম এত বাড়ল যে তাদের ওপর সব কর মকুব করতে হয়। আহ্‌মেদাবাদে কাজীর বিরুদ্ধে দাঙ্গা হয়েছিল। কারণ মনে করা হয়েছিল তিনি একচেটিয়া কারবারীদের সঙ্গে একজোটে আছেন।[৫৮] পরের বছরও খরার দরুন চড়া দামই বজায় থাকে।[৫৯] ১৬৯১-তে এই প্রদেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী একইসঙ্গে নেমে আসে।[৬০] ১৬৯৪-৯৫ সালে আবার অনটন দেখা দেয়।[৬১] দিল্লীর কাছাকাছি অঞ্চলেও ১৬৯৪-৯৫-এর এই অনটন বোঝা গিয়েছিল, কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল থর মরুভূমির উত্তর-

৫২. 'ফথিয়া ইব্রিয়া', পৃ. ৭৯ খ-৮০ ক, ১১০ খ-১১১ ক।

৫৩. মার্শাল, পৃ. ১২৫-২৭, ১৩৮, ১৪৯-৫৩। তুলনীয় বাউরি, ২২৬-২২৭।

৫৪. 'মআসির-এ আলমগীরী', পৃ. ১৬৯।

৫৫. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০-৩০১; 'ফ্যাক্টরিস', নতুন সিরিজ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৭।

৫৬. মামুরী, পৃ. ১৫৫ খ-১৫৬ ক; খাফী খান, Add. 6574, পৃ. ১০৫ ক-খ।

৫৭. খাফী খান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৭।

৫৮. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৯।

৫৯. ঐ, ৩১৫।

৬০. ঐ, ৩২৫।

৬১. ঐ, ৩২৯-৩০।

পূর্ব প্রান্তের বাগার ভূখণ্ড। এখানকার বাসিন্দারা অন্যত্র চলে যায়, বাধ্য হয়ে পচা মাংস খায়, বাচ্চাদের বিক্রি করে এবং অবশেষে মারা যায় হাজারে হাজারে।[৬২] ১৬৯৬-৯৭ সালে গুজরাট ও মাড়োয়ারের বিভিন্ন অংশ খরার কবলে পড়ে এবং পত্তন ও যোধপুরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এক টুকরো ঘাস বা এক ফোঁটা জলের চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায়নি।[৬৩]

দখিনে ১৭০২ সালে এক বিরাট দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। ফেব্রুয়ারি মাসে সঙ্গমনের (আওরঙ্গাবাদ প্রদেশ) থেকে দরবারে জানানো হয় যে খরার ফলে "বেশির ভাগ গ্রামই" জনশূন্য হয়ে গেছে।[৬৪] ঐ বছরে "চাষের কাজ চলতে পারে এমন বৃষ্টি সারা দখিনে হয়নি।"[৬৫] আসলে বৃষ্টি এত প্রচণ্ড হলো যে খারিফ শস্য ধ্বংস হয়ে গেল।[৬৬] নর্মদার দক্ষিণে সব জায়গাতেই ভয়ঙ্কর অনটন চলে; লোকে ভিটেমাটি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়।[৬৭] পরের বছরও (১৭০৩) অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি, কারণ রবিশস্যের ক্ষতি হয় শীতকালীন অতিবৃষ্টির ফলে, বিশেষ করে রোগের দরুন গমের ক্ষতি হয়।[৬৮] তারপরে এল খরা। "খরার ফলে দুর্ভিক্ষ ও অনটন, গরীবের মৃত্যু আর দুর্বলের আর্তনাদ"[৬৯]—মহারাষ্ট্রের এই বছরটি একজন ঐতিহাসিক এই বলে বর্ণনা করেছেন। খরা ও তার দোসর প্লেগ ১৭০৪ সালেও ধ্বংসলীলা চালিয়ে যায়।[৭০] "এই দু বছরে"—১৭০২-৩ ও ১৭০৩-০৪ সালে—দখিনে "বিশ লাখের বেশি লোক মারা যায়; খিদের জ্বালায় বাবারা সিকি থেকে আধ টাকায় বাচ্চাদের বিক্রি করতে চেয়েও খদ্দের পায়নি, অগত্যা তাদের অনাহারে দিন কাটাতে হয়।"[৭১]

যেসব সাক্ষ্যপ্রমাণ আমাদের হাতে আছে তার থেকে বোঝা যায়, বিভিন্ন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তির ব্যাপারে যথেষ্ট তারতম্য ছিল। অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে কয়েকটি প্রদেশ সম্পর্কে আমাদের বেশি তথ্য জানা আছে—অংশত এটিও তার কারণ হতে

৬২. ইয়াহিয়া খান, 'তাজকিরাৎ-আল মুলুক', Ethe 409, পৃ. ১০৮ ক-খ। তিনি বলেন যে তাঁরা প্রথমে দিল্লীতে এসেছিলেন ও তার পরে গিয়েছিলেন উজ্জয়িনীর দিকে। পূর্ব মালবে বাগারীদের বর্তমান বসবাস কি এই দেশান্তরী হওয়ার ফল? দ্রষ্টব্য এলিয়ট, 'মেমোয়ার্স', ১ম ভাগ, পৃ. ৯, ১০।

৬৩. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, ৩৩৫-৬।

৬৪. 'অখবারাৎ' ৪৬/১২।

৬৫. 'দিলকুশা', পৃ. ১৪৬ ক।

৬৬. মামুচি, ৩য় খণ্ড, ৪২৩; মামুরী, পৃ. ২০২ খ; খাফী খান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১০।

৬৭. 'দিলকুশা', পৃ. ১৪৬ ক।

৬৮. মামুরী, পৃ. ২০২ খ; খাফী খান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১০-১১।

৬৯. 'মআসির-এ আলমগীরী', ৪৭৭।

৭০. গোটা দখিন জুড়ে "শস্যের অনটন ও অনাবৃষ্টি"র জন্য 'অখবারাৎ'-ক ২৪৫ (জুলাই ২২, ১৭০৪) দ্রষ্টব্য।

৭১. মামুচি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৭।

পারে। যেমন, সমগ্র ১৭ শতক জুড়ে বাংলা প্রদেশ সম্বন্ধে আমাদের হাতে যথেষ্ট তথ্য থাকলেও কেন সেখানকার কোন গুরুতর দুর্ভিক্ষের বিবরণ নথিভুক্ত নেই—তার কারণ এ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। ব্যাপারটি এমনই যে, ১৬৬২-৬৩ সালের ঢাকার অনটনকে সেই প্রদেশের এক অভূতপূর্ব ঘটনা বলে বর্ণনা করা হয়েছিল।[৭২] মনে হয়, একইভাবে বরাবর অনটনমুক্ত থাকার সুনাম বজায় রাখতে পেরেছিল মালব।[৭৩] উচ্চগাঙ্গেয় অঞ্চলের এতখানি সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু এই অঞ্চলের যে-বিরাট দুর্ভিক্ষের ফলে বিশাল সংখ্যায় মানুষ মারা যায়, তা ঘটেছিল আমাদের আলোচ্য পর্বের ঠিক আগে। বিহারের ক্ষেত্রে এই মাপের একটিমাত্র দুর্ভিক্ষ নথিভুক্ত আছে। অন্যদিকে, সিন্ধু উপত্যকা, গুজরাট ও মুঘল দখিনের প্রদেশগুলি খুব সহজেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হতো এবং বারবারই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে হয়।

দুর্ভিক্ষ যে জনগণকে কী পরিমাণে দুর্দশাগ্রস্ত করে তুলত সে বিষয়ে সম্ভবত খুব বেশি বলার প্রয়োজন নেই। বিপুল সংখ্যক মানুষ মারা গেছে এরকম বছর কম হতে পারে, কিন্তু যখন সেই মৃত্যু আসত তখন জনশূন্যতার পরিমাণ হতে পারত ভয়াবহ। মানুষ শুধু অনাহারেই মরত না, তারা সবরকম মহামারীরই শিকার হতো—এমনকি সামান্য অনটনের পরেও বিশেষ করে যে ভয়ঙ্কর মড়ক নামত, তারও।[৭৪] এইসব বিপর্যয় জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি কতটা ঠেকাতে পেরেছে তা হিসেব করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে সেগুলির ফলাফলের অতিরঞ্জন ঘটাও সম্ভব। ১৬৩০-৩২ সালের দুর্ভিক্ষ হয়তো গুজরাটের এক বিরাট অঞ্চল থেকে প্রাণের অস্তিত্ব মুছে দিয়েছিল, কিন্তু পরের তিন পুরুষে অন্তত আর এই ধরনের কিছু ঘটেনি। একইভাবে, আমাদের আলোচ্য পর্বে, ১৫৫৪-৫৬-র দুর্ভিক্ষজনিত জনশূন্যতার ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য হিন্দুস্থান পুরো দেড়শ বছর সময় পেয়েছিল। কিন্তু মৃত্যু ছাড়াও দুর্ভিক্ষ গরীবদের ওপর আরও দুর্দশা চাপাত। তাদের খাদ্যের পরিমাণ বিপজ্জনকভাবে নেমে আসত বেঁচে থাকার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্তরের নীচে এবং অভাবের সময় তারা কী খেতে বাধ্য হতো তার ছবি আমরা মাঝে মাঝে দেখেছি। "(খুব বেশি অনটনের সময়) ঘাসের গোড়া" "সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন খাদ্যে"[৭৫] পরিণত হয়—ফ্রায়ার একে একটি স্বীকৃত তথ্য বলেই ধরে নিয়েছিলেন। আবাদ-বন্ধ-হওয়া জমি চাষীদের বাধ্য

৭২. 'ফথিয়া ইব্রিয়া', পৃ. ৮০ ক।

৭৩. মাশুি ৫৭।

৭৪. খরার সঙ্গে প্লেগের যোগাযোগ বিষয়ে জাহাঙ্গীরের উল্লেখের কথা আগেই বলা হয়েছে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই বিশ্বাস সাধারণভাবে চালু ছিল। ১৬৬৪ সালে সুরাটের ইংরেজ কুঠিয়ালরা যেমন লিখেছিল: "এই লোকেরা নিশ্চিতভাবে বলে যে আবহাওয়া খারাপ হওয়ার দরুন সবসময় বৃষ্টির ও শস্যের অভাব দেখা দেয় আর সেই কারণে গত বছর অনটন হয়েছিল। এখানকার সব গ্রাম ও শহরে রোগ ভর্তি, প্রায় কোন বাড়িই পার পায়নি" ('ফ্যাক্টরিস, ১৬৬১-৬৪', পৃ. ৩২৯)।

৭৫. ফ্রায়ার, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৯।

করত বাড়িঘর ছেড়ে খাবারের খোঁজে দূর-দূর অঞ্চলে যেতে, আর প্রতিটি অনটনের সময় ক্রীতদাসদের বাজার খুব তেজী হয়ে উঠতে দেখা যেত।[৭৬] এইভাবে মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষ এসে কৃষি-উৎপাদনের নিরুত্তাপ বিচ্ছিন্নতার মধ্যে এনে দিত এক তীব্র চলনশীলতা ও বিভ্রান্তি। আর কোন কারণ না থাকলেও শুধু এই ব্যাপারটিই মধ্যযুগীয় কৃষকদের ভিটে-ছাড়া বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করার পক্ষে যথেষ্ট। এ নিয়ে পরে আরও বিশদ আলোচনা করতে হবে।

৭৬. ওপরে যত ঘটনার কথা বলা হলো সেগুলি ছাড়াও বাদাউনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯১-তে আকবরের যেসব আদেশ উদ্ধৃত আছে সেখানেও বাপ মা-এর সন্তানবিক্রিকে দুর্ভিক্ষ ও দুর্দশার স্বাভাবিক পরিণতি বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে তুলনীয় ফিচ্, রাইলি, ৫৭, 'আর্লি ট্রাভেলস' ১২, মান্নুচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫১; রায়চৌধুরী, 'ডাচ্ ইন করমণ্ডল' পৃ. ২৮৮, ৩২২।

চতুর্থ অধ্যায়

কৃষক ও জমি ; গ্রাম-সমাজ

১. কৃষক ও জমি

বৃটিশ শাসন শুরু হওয়ার আগে ভারতে "জমির মালিক" কে ছিল, তার খোঁজে মাথা ঘামিয়েছেন অনেক আধুনিক লেখক। এই বিতর্কে আলোচ্য পর্বের ইউরোপীয় পর্যটকদের সাক্ষ্য কম প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁরা একবাক্যে ঘোষণা করেছেন, জমির মালিকানা শুধু রাজার হাতেই ন্যস্ত ছিল।[১] এই ধারণাকেই কৃষি-ইতিহাসের প্রামাণ্য ব্যাখ্যাকাররা প্রায় সকলেই সমর্থন করে গেছেন।[২] কিন্তু এই ধারণাটি এখন আর আগের মতো স্বীকৃত মতবাদের অংশ বলে মনে হয় না।[৩] বরং বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা হচ্ছে যে হিন্দু বা মুসলিম—প্রচলিত কোন বিধানেই ঐ রকম কোন নীতির স্বীকৃতি নেই। মধ্যযুগের ভারতীয় গ্রন্থাকারদের বিবরণে অথবা এখনও যেসব প্রশাসনিক বা ব্যক্তিগত দলিল-দস্তাবেজ বর্তমান, তার মধ্যেও এর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। "চাষী ও ব্যবসায়ীদের" উপর কর বসানোর উদ্দেশ্য সমর্থন করতে গিয়ে আবুল ফজল একটিই যুক্তি দেখান যে, প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের জন্য ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে বাদশাহ্‌কে যে ব্যবস্থা করতে হয়, তারই বিনিময়ে এই করকে "বাদশাহীর পারিশ্রমিক" হিসেবে গণ্য করতে হবে। করের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কারণ বাদশাহ্‌কে প্রশাসনিক কাজে যারা সাহায্য করে (অর্থাৎ যোদ্ধাদের) ভরণপোষণের জন্য বাদশাহ্‌র অবশ্যই সঙ্গতি থাকা দরকার। তাই বলে বাদশাহী ভূসম্পত্তি ব্যবহারের জন্য চাষীকে খাজনা দিতে হবে—ভূমিরাজস্বের ধরন সম্পর্কে এরকম কোন আভাস কোথাও পাওয়া যায় না।[৪]

এছাড়াও মনে হয়, জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিষয়ে শহরাঞ্চলে একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল। স্বত্বের অধিকারী ('মালিক') হিসেবে প্রজাদের কেউ কেউ বাদশাহ্‌কে জমির অংশ বিক্রি করছে, এমনকি কোন কোন জমির মালিকানা নিয়ে বাদশাহ্‌র সঙ্গে বিবাদ

১. জে. জেভিয়ার, অনু. হস্টেন, *JASB*, N. S., খণ্ড ২৩, ১৯২৭, পৃ. ১২১-২ ; রো, ১০৫ ; 'রিলেশনস্', ১০-১১ ; বার্নিয়ে, ৫, ২০৪, ২২৬, ২৩২, ২৩৮ ; 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬৬৮-৬৯', পৃ. ১৮৪ ; ক্রায়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৭ ; মানুচি, ২য় খণ্ড, ৪৬।

২. উদাহরণস্বরূপ, গ্রান্ট, "অ্যানালিসিস অফ দ্য ফিনান্সেস অফ বেঙ্গল", 'ফিফ্‌থ্‌ রিপোর্ট', মাদ্রাজ, ১৮৮৩, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩২ ; ব্যাডেন-পাওয়েল, 'দি ইণ্ডিয়ান ভিলেজ কম্যুনিটি', লণ্ডন, ১৮৯৬, পৃ. ২২৩।

৩. বিশেষভাবে 'ইউ. পি. জমিন্দারী অ্যাবলিশন কমিটি, রিপোর্ট', এলাহাবাদ, ১৯৪৮, পৃ. ৬৩-৬৫, ৭৩ দ্রষ্টব্য।

৪. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯০-৯১।

চলছে—তেমন ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫] শুধু তাই নয়, অসংখ্য দলিলপত্রে এমনও দেখা যায়, শহরের বাইরেও এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা মালিক, যাঁদের হাতে 'মিলকিয়াৎ' অর্থাৎ একাধিক গ্রামের জমি বা তার অংশবিশেষের মালিকানা ছিল।[৬] এই সমস্ত শব্দে আসলে ঠিক কী বোঝায় আমরা তার যতরকম ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি না কেন, এ ধরনের বিবরণ থেকে এটি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, বাদশাহ্ ছাড়া অন্য লোকও জমির উপর নামত মালিকানার স্বত্ব দাবি করতে পারত।

কিন্তু এই প্রশ্ন খুবই সঙ্গত যে, রাজা নিজে যে অধিকার দাবি করেননি, ইউরোপীয় পর্যটকেরা কেন একবাক্যে তাঁর ওপর সেটা দিয়ে গেছেন? এ কথা ঠিক যে অনেক পর্যটকেরই ভারত সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল ভাসাভাসা। লোকচলতি কথার ভিত্তিতে বা অন্যদের লেখা নকল করে তাঁরা অনেক ভুল ধারণা চালু রেখে গেছেন। কিন্তু এই বিশেষ মন্তব্য যাঁরা করেছেন, তাঁদের কেউ কেউ, যেমন মানুচি, ভারতে অনেক বছর কাটিয়েছেন এবং সেই সময়ের যে-কোন ওয়াকিবহাল ভারতীয়ের মতোই প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত ছিলেন। সম্ভবত এই বিষয়ের একটি ব্যাখ্যায় যথেষ্ট সত্যতা আছে। মুঘল জাগীরদারেরা ইউরোপের জমিদার অভিজাতন্ত্রের স্বাভাবিক প্রতিকল্প—ইউরোপীয়দের চোখে নিশ্চয়ই এমন মনে হয়েছে। মুঘল বাদশাহ্‌রা মর্জিমাফিক এই সব কর্তাদের জাগীর বা আঞ্চলিক রাজস্ব আদায়ের কাজ একজনের বদলে অন্যকে দিতে পারতেন। তার ফলে পর্যটকদের মনে হয়েছিল তিনি অভিজাতদের স্বাভাবিক মালিকানা স্বত্ব থেকে বঞ্চিত করে নিজেই তা দখল করেছেন।[৭] বোধহয় এই ধরনের ভুল করা খুবই স্বাভাবিক, কারণ দেশের এক বিরাট

৫. 'ওয়াকাই-এ দখিন', ৫০-৫১, 'ওয়াকাই-এ আজমীর', ৪৩০-৩২। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ধরনের লেনদেন, যার পুরোটা ইউরোপীয় পর্যটকদের অজানা থাকার কথা নয়, সেগুলি দিয়ে তাঁদের কেউই জমির ওপর বাদশাহের একচ্ছত্র মালিকানা সম্পর্কে তাঁদের বাঁধাগতের ঘোষণাটি শুধরে নেননি। একমাত্র বার্নিয়ে, ২০৪, একবার তাঁর সাধারণ বিবৃতিটি এই বলে সীমাবদ্ধ করে নিয়েছেন যে, "কিছু কিছু বাড়ি ও বাগান ছিল যেগুলি নিজেদের মধ্যে বেচা-কেনা বা অন্য কোনরকম হস্তান্তর করার জন্য তিনি ('মহান্ মোগল') মাঝে মাঝে তাঁর প্রজাদের অনুমতি দিতেন।" রো, ১০৫, এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে বাদশাহ্ বাদে "কোন লোকেরই এক চিলতে জমিও ছিল না।"

জমিতে স্বত্বাধিকার সংক্রান্ত ধারণাটি শহরে কতখানি পাকা হয়ে উঠেছিল, 'ওয়াকাই-এ আজমীর', ৩৮৬-৭-র এক বিবরণী থেকে তা দেখা যায়। সেখানে ধরেই নেওয়া হয়েছে যে বসবাসকারীকে উচ্ছেদ করার অধিকার স্বত্বাধিকারীর আছে।

৬. কয়েকটি নথিপত্রে যেসব লোককে 'মালিক' বলা হয়েছে, তারা হচ্ছে চাষী; কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই তারা হতো 'জমিনদার'। এই অংশের পরের দিক এবং ৫ম অধ্যায়ের ১ম অংশ দ্রষ্টব্য।

৭. শরণ, 'প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট...', ৩৩০-৩১, ৩৩৩ দ্রষ্টব্য।

অংশ জুড়ে যে তথাকথিত 'রাইয়তী' বা 'চাষীদের দখলে থাকা' গ্রামগুলি ছিল,[৮] ইউরোপীয় পর্যটকরা সেখানে দুটিমাত্র শ্রেণীকে খুঁজে পেয়েছেন যাদের মধ্যে জমির উৎপন্ন ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় : একটি শ্রেণী চাষী ও অপরটি বাদশাহ্ ও তাব জাগীরদার বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা। আপাতদৃষ্টিতে তাঁরা কখনওই চাষীদের মালিক বলে ভাবতে পারেননি। তাই শুধু বাদশাহ্ই তাঁদের কাছে এই মর্যাদার অধিকারী বলে মনে হয়েছিল।[৯]

কিন্তু চাষীরা যে জমির মালিক হতে পারে না এই বিষয়ে ইউরোপীয় পর্যটকদের অনুমান কি ঠিক ছিল? জমির আসল মালিক ছিল চাষীরাই—এই মতের ওপরে আধুনিক কালের কয়েকজন লেখক খুব জোর দিলেও ঐ সময়কার যথেষ্ট সাক্ষ্য তাঁরা হাজির করেননি।[১০] প্রমাণের এই ঘাটতি এখন খানিকটা পূরণ করা যেতে পারে। মুহম্মদ হাসিমকে দেওয়া আওরঙ্গজেবের ফরমানটিতে মালিক ও 'আরবাব-এ জমিন' (জমির মালিক) এই শব্দ দুটি খুব পরিষ্কারভাবে সাধারণ চাষী বা কৃষকদের বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ফরমানের তথ্য সন্দেহজনক, কারণ, এটি পুরোপুরি শরীয়তের বিধান বোঝানোর উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছিল এবং ভারতের কৃষি-পরিস্থিতির

৮. 'রাইয়তী ও জমিনদারী' গ্রামের বিভাগের জন্য ৫ম অধ্যায়, ১ম অংশ দ্রষ্টব্য। ভুল বোঝাবুঝি এড়ানোর জন্য খেয়াল রাখা উচিত যে বৃটিশ আমলে 'রাইযতওয়ারী' নামে এক বিশেষ ভূমি রাজস্বের বন্দোবস্ত করা হযেছিল, তার সঙ্গে 'রাইযতী' শব্দটি যেন গুলিয়ে না যায়।

৯. জমির ওপর বিভিন্ন ধরনের অধিকার বিষযে 'দেশীয়' সরকারী অভিমত জানার জন্য বাংলা দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগের বছরে ইংরেজরা কযেকটি প্রশ্নমালা প্রচার করেছিল। যে প্রশ্নটি প্রায়ই করা হতো তা এই: "জমির মালিক কে—'হাকিম' (শাসক) না 'জমিনদার'?" লক্ষণীয় এই যে প্রশ্নট যেভাবে সাজানো হয়েছে তাতে চাষীরা আদৌ বিবেচনায় আসে না। এর একটি উত্তর ছিল: প্রাচীনকালে 'রাজা' বা 'জমিনদার'রাই ছিলেন জমির মালিক, কিন্তু যেহেতু মুঘল বাদশাহ্রা যখন ইচ্ছা হলেই তাদের হাত থেকে এসব কেড়ে নিতেন, তখন নিশ্চয়ই ধরে নেওয়া যায় যে মালিকানা স্বত্ব শাসকের হাতেই এসে পড়েছিল (Add. 19,504, পৃ. ১০০ ক ইত্যাদি)। সম্ভবত ইউরোপীয় পর্যটকেরা যে-যুক্তি অনুসরণ করেছিলেন, এখানে আবার সেই একই পথ ধরা হয়েছে: শুধুমাত্র 'জাগীরদার'-এর বদলে এসেছে 'জমিনদার'।

১০. উদাহরণস্বরূপ, স্মরণ, 'প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট...', ৩২৮-৩৫।

১১. তুলনীয় 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', ১৩৩, ১৩৯-৪০। 'ফতোয়া-এ আলমগীরী' নামে পরিচিত সমস্ত মুসলিম বিচারবিধি সঙ্কলন তৈরির সঙ্গে এই ফরমানটি জড়িত ছিল মোরল্যাণ্ডের মতো এ কথা মনে করার কোন প্রয়োজন নেই। আওরঙ্গজেবের ফরমানে জারি করা নিয়মগুলি শরীয়তের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিদের ইতিমধ্যেই ভালোভাবে জানা ছিল। উদাহরণত, ১৩৫৯ সালে লেখা এক প্রশাসন সংক্রান্ত পুস্তিকা, 'দস্তুর-আল অলবাব কী ইলম্-ইল হিসাব' ('মেডিয়েভাল ইণ্ডিয়া কোয়ার্টার্লি', ১ম খণ্ড, সংখ্যা ৩-৪, পৃ. ৬৬ ইত্যাদি অধ্যাপক এস্. এ.

সঙ্গে এটির প্রায় কোন সম্পর্ক নেই।[১১] কিন্তু এও সম্ভব যে, কৃষকদের বেলায় 'মালিক' শব্দটি ব্যবহার করে ফরমানটি প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে যায়নি তাঁর সময়কার রাজস্ব-কর্মচারীরা "চাষীদের মালিকানাধীন ('মিল্কী') ও উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া জমি" বিক্রি করে দিচ্ছিল, এর বিরুদ্ধে খাফী খান প্রতিবাদ করেছেন।[১২] এই সম্পর্কে কিছু কিছু সরকারী দলিলপত্রেও যে-প্রসঙ্গে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার থেকে মনে হয় চাষী-মালিকদের কথাই উল্লেখ করা হচ্ছে।[১৩]

প্রকৃত সমস্যাটি হলো. শুধুমাত্র নামে নয়, কার্যক্ষেত্রেও চাষীদের কি সেই অধিকার ছিল যা আইনের সঠিক পরিভাষায় 'মালিকানাধীন' বলে গণ্য হতে পারে? এই ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তের আগে আমাদের তথ্যসূত্রগুলি থেকে চাষীদের প্রকৃত অধিকার ও দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে সব তথ্য জড়ো করা দরকার।

ইতিবাচকভাবে দেখলে, চাষী যে-জমি চাষ করে সেই জমির ওপর তার স্থায়ী ও বংশগত দখলস্বত্বের ব্যাপারে একটা সাধারণ স্বীকৃতি ছিল। মুহম্মদ হাসিমের উদ্দেশে লেখা ফরমানে বলা হয়েছে যে 'মালিক' (আর 'মালিক' অর্থে এখানে চাষী) যদি জমি চাষ করতে না পারে বা পুরোপুরি ফেলে রাখে তাহলে চাষ করতে রাজি আছে এরকম কোন লোককে সেই জমি দিয়ে দেওয়া হবে যাতে ভূমিরাজস্বে ঘাটতি না পড়ে। কিন্তু কোন সময় মালিক যদি সেই জমি চাষ করার সামর্থ্য ফিরে পায় বা সেখানেই ফিরে আসে তাহলে জমি তাকে ফেরৎ দিতে হবে।[১৪] এটি যে শুধুমাত্র বিমূর্ত তত্ত্বের কোন নীতি নয়, তা একটি ঘটনার উল্লেখে বোঝা যায়। চাষবাস পরিত্যক্ত হয়েছিল এমন এক গ্রামের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে এক বাদশাহী সনদে এই নীতিটি গ্রহণ করা হয়। যেমন, একটি লোক নাকি ঐ গ্রামের কুয়ো মেরামত ও জমি চাষ করতে রাজি ছিল। সনদটিতে বলা হয়েছে, যে-যে জায়গার মালিক উপস্থিত ও

রশিদ-এর অনুবাদ) দ্রষ্টব্য। ফরমান যে শরীয়ৎ থেকে ধার করবে এটা কোন ব্যাপার নয়, বরং আসল আগ্রহের ব্যাপার এই যে 'ফতোয়া-এ আলমগীরী'র সঙ্গে এটির তুলনা করলে দেখা যায় কয়েকটি মাত্র নীতিকে আবার ঘোষণা করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, যে-বিষয়গুলি তখন ভারতের বিশেষ কৃষি-সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক, শুধুমাত্র সেই সংক্রান্ত নীতিগুলি হাজির করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

১২. খাফী খান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৭-৮, Add. 6573, পৃ ৬৯ খ-৭০ ক।

১৩. উদাহরণস্বরূপ 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ১৮৭ ক-১৮৮ ক, Bodl পৃ ১৪৮ খ-১৪৯ ক, Ed. 143-4, 'দুর-অাল উলুম', পৃ ৪৬ খ ৪৭ ক।

১৪. অনুচ্ছেদ ৩-এর এই হলো মূল কথা। এটির বিষয়. যে-জমি 'খরাজ-এ মুওয়াজ্জফ' বা নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব দেয়। কিন্তু অনুচ্ছেদ ১৭-য় বলা আছে, যদি 'খরাজ-এ মুকাসিমা' (উৎপন্নের হেরফের অনুযায়ী রাজস্ব)-প্রদায়ী জমির মালিক আর চাষ করতে না পারে ('মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ ২৭২), অথবা পাঠান্তরে ('দুর-আল উলুম', পৃ ১৪২ টীকা, *JASB*, N. S. ২য় খণ্ড, ১৯০৬, পৃ. ২৪৩) সে ওয়ারিশ ছাড়াই মারা যায়, তাহলে 'খরাজ-এ মুওয়াজ্জফ'-প্রদায়ী জমির মতো একইভাবে ঐ জমির ব্যবস্থা করা হবে।

নিজেই চাষ করতে পারে সেখানে অপর কোন ব্যক্তিকে ঐ অধিকার দেওয়া হবে না। আবেদনকারীর অনুরোধ তবেই গ্রাহ্য করা হবে যদি 'মালিক' ঐ কাজ নিজে না পারে এবং সে ক্ষেত্রেও দেখা হবে মালিকের অনুমতি আগে নেওয়া হয়েছে কিনা।[১৫] চাষীদের দখলী স্বত্ব যে অস্বীকার করা যায় না তার স্বীকৃতি রয়েছে আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলের দুটি বিধানে। প্রথমটি পাওয়া যায় 'আইন'-এ। এখানে রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের এই বলে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে তারা যেন 'চাষীদের মালিকানা' ('রাইয়ত-কাস্তা')-কে 'মদদ-এ মআশ'-এর অধিকারীদের 'নিজ-চাষের জমি' ('খুদ-কাস্তা') হিসেবে নথিভুক্ত না করে।[১৬] অন্যটি হলো জাহাঙ্গীরের তখ্‌তে বসার পর ঘোষিত বারোটি আদেশনামার একটি। এতে রাজস্ব-কর্মচারীদেরই নিষেধ করা হয়েছে তারা যেন চাষীদের জমি ('জমিন-এ রি-আয়া')-কে জোর করে নিজেদের জোতে ('খুদ-কাস্তা') পরিণত না করে।[১৭]

"যারা পুরুষানুক্রমিকভাবে চষা জমির মালিক", বাদশাহ্ সেই চাষীদের রক্ষণ করেন—'আইন'-এর এই উল্লেখ থেকে চাষীদের অধিকার যে মৌরুসী (বংশগত) ছিল তা বোঝা যায়।[১৮] আমরা আগেও যেমন লক্ষ্য করেছি, খাফী খানও চাষীদের "মৌরুসী" জমির কথা বলে গেছেন। মুহম্মদ হাসিম-কে দেওয়া ফরমানটিতে আলোচনা করা হয়েছে : মালিক মারা গেলে কীভাবে তার উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করা হবে।[১৯] বিষয়টি বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক নয়। এছাড়াও, ঐ ফরমান থেকে দেখা যায় যে চাষীর জমি বিক্রির অধিকার ছিল, অবশ্য বেচবার অবস্থা দেখা দিলেও কেউই হয়তো তা কেনার যোগ্য বলে মনে করত না।[২০]

কিন্তু আধুনিক মালিকানাস্বত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো মালিকের ইচ্ছামতো জমি ছেড়ে চলে যাওয়া বা বিক্রি করা। কিন্তু সত্যিকারের এইরকম স্বাধীনভাবে

১৫. 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ১৮৭ ক-১৮৮ ক, Bodl. পৃ. ১৪৮ খ-১৪৯ ক, Ed. ১৪৩-৪।

১৬. 'আইন' ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৭।

১৭. 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ৪।

১৮. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯০।

১৯. অনুচ্ছেদ, ১১।

২০. অনুচ্ছেদ ১৩ দ্রষ্টব্য, যেখানে বছরের কোন সময়ে জমি বিক্রি হলে খরিদ্দারের কাছ থেকে ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। এই ফরমানের যে ব্যাখ্যাকর্তাকে যদুনাথ সরকার আমাদের কাছে হাজির করেন, তিনি ফরমানটির পরিভাষা ও ব্যবস্থাগুলিতে ব্যক্ত কৃষক-স্বত্বাধিকারের গোটা ধারণাটিকেই সন্দেহ করেন। তাঁর যুক্তি এই যে, ঘটনা যদি তা-ই হয়ে থাকে তবে কোন চাষী আগে জমি বিক্রি না করে পালাত না, আর তাহলে চাষীর ছেড়ে যাওয়া জমির (অনুচ্ছেদ ৩ তুলনীয়) সমস্যাই উঠত না (*JASB*, N. S. ১৯০৬, পৃ. ২৪৪)। এর বিরুদ্ধে বলা যায়, তত্ত্বত যদিও জমি বিক্রি করা যেত, কিন্তু যেহেতু জমির অভাব ছিল না ও রাজস্বের চাপ ছিল খুব বেশি তাই বেশির ভাগ সময়েই চাষীর হয়তো খরিদ্দার জুটত না।

হাতবদল করার প্রশ্নই তখন উঠত না। যদি এক অর্থে জমি ছিল চাষীর অধীন, তাহলেও অন্য অর্থে আবার চাষী ছিল জমির অধীন। উত্তরাধিকারী না থাকলে চাষীর পক্ষে জমি ছেড়ে যাওয়া বা চাষ করতে নারাজ হওয়া—এর কোনটাই সম্ভব হতো না। এক ইউরোপীয় পর্যবেক্ষক বলেছেন, "পোল্যাণ্ডে যেরকম ভূমিদাস দেখা যায় তাদের সঙ্গে এদের [ভারতের চাষীদের] কোন তফাৎ ছিল না। কারণ এখানে[ও] চাষীরা বীজ বুনতে বাধ্য···।"[২১] মুহম্মদ হাসিমকে দেওয়া ফরমানটিতে (অনু. ২) স্পষ্টই বলা আছে, "তদন্তের পরে যদি দেখা যায় যে চাষ করার ক্ষমতা ও সেচ (বা সেচের ব্যবস্থা) থাকা সত্ত্বেও তারা (চাষীরা) চাষবাস থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে" তাহলে রাজস্ব-কর্মচারীদের উচিত "তাদের ওপর জুলুম করা ও ভয় দেখানো এবং কয়েদ ও দৈহিক শাস্তির ব্যবস্থা করা।" এসব জবরদস্তি সত্ত্বেও যদি দেখা যায় কোন চাষী চাষ করতে অক্ষম তাহলে অন্তত সাময়িকভাবে সে জমির ওপর তার অধিকার হারাবে এবং তা হাতবদল করা যেতে পারে। রাজস্ব প্রশাসনের এক পুস্তিকা (১৭৩১-৩২) থেকে গ্রামের সরকারী কর্মচারীদের তৈরি একটি খৎ-এর খসড়া পাওয়া যায়। আওরঙ্গজেবের ফরমানে নির্দিষ্ট নীতিগুলি এখানে সঠিকভাবে মানা হয়েছে। গ্রামের (ভারপ্রাপ্ত) সরকারী আমলাদের কথা দিতে হতো যে "তারা কোন চাষীকে জমি ছেড়ে যেতে দেবে না।" আর কিছু চাষী ফেরার হলে তাদের জমি অন্যান্য বসবাসকারীদের মধ্যে বিলি করার দায়িত্বও এই আমলাদের নিতে হতো।[২২]

এই দৃষ্টিভঙ্গির একটা স্বাভাবিক পরিণাম এই যে ফেরারী চাষীদের (বিশেষ করে যারা কোন সর্দার বা জমিনদার-এর এলাকায় পালিয়েছে) জোর করে ফিরিয়ে আনার অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে—এটা ধরেই নেওয়া হতো। এইভাবে, ১৬৪১ সালে নবনগরের জাম তাঁর বিরুদ্ধে এক সফল আক্রমণের পর "আহমেদাবাদের কাছাকাছি অঞ্চলের যেসব চাষীরা তাঁর এলাকায় পালিয়ে এসেছিল, তাদের তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, যাতে তারা বাড়ি ও নিজেদের জায়গায় ফিরে যায়।"[২৩] আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দিকে দেখা যায় পর্তুগীজদের অধিকারভুক্ত এলাকায় এই যুক্তিতেই কল্যাণের থানাদার এক সামরিক অভিযান চালিয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল এই যে, যেসব চাষীদের তিনি জমিনদারদের এলাকা থেকে তাদের নিজেদের ভিটেমাটিতে ফিরিয়ে এনেছিলেন, "ফিরিঙ্গীরা" আবার সেইসব লোকেদেরই নতুন করে পর্তুগীজ-শাসিত এলাকায় বসতি করার জন্য নানাভাবে প্রলুব্ধ করছে।[২৪]

২১. গেলেইনসেন, *JIH*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৭৮।

২২. বেকাস, পৃ. ৬৭ খ। এই দলিলটি হলো 'জমিনদার', 'মুকদ্দম' (গ্রামের মোড়ল) ও 'পাটওয়ারী'দের (গ্রামের হিসাবরক্ষক) দেওয়া একটি মুচলেকার মতন, যেখানে তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্বীকার করছে। বেকাস-এ যে-দলিলগুলি পাওয়া গেছে তার সবই সম্ভল 'সরকার'-এর (দিল্লীপ্রদেশ) রাজস্ব বিষয়ক নথিপত্র থেকে নেওয়া।

২৩. লাহোরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩২, 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৪।

২৪. 'কারনামা', পৃ. ২৩৮ ক-২৩৯ ক, ২৪৩ খ-২৪৪ খ। পর্তুগীজরা আরও এক ধাপ এগিয়ে তাদের নিজেদের অধিকারভুক্ত এলাকায় পুরোপুরি ভূমিদাসপ্রথা চালু করেছিল। সালসেট

প্রশাসন যে তৎপরতার সঙ্গে চাষীর দখলীস্বত্ব মেনে নেওয়ার আগ্রহ এবং চাষী যাতে নির্দিষ্ট জমি ছেড়ে অন্যত্র চলে না যায় তার জন্য উদ্বেগ দেখিয়েছিল, সেই যুগের পক্ষে তা ছিল খুবই স্বাভাবিক। কারণ তখন জমি ছিল প্রচুর অথচ চাষীর সংখ্যা কম। প্রথম অধ্যায়েই দেখা গেছে, মুঘল যুগের অনেক অঞ্চলেই মোট জমির অর্ধেকের বেশি চাষ হতো না। অথচ পঞ্চাশ বছর আগেও ঐসব অঞ্চলেই মোট জমির দুএর-তিন থেকে তিনের-চার অংশ পর্যন্ত চাষবাসের জন্য নির্দিষ্ট ছিল; অতএব, এই যুগের বিস্তৃত অনাবাদী জমি হাতছানি দিয়ে চাষীকে ডাকত সবসময়েই। কিন্তু নীচু মানের জীবনযাত্রা আর আদ্যিকালের কুঁড়েঘর ছাড়া এমন কোন স্থাবর সম্পত্তি চাষীর ছিল না যা তাকে পুরোনো ভিটেয় আটকে রাখতে পারে। বাবুর মন্তব্য করেছেন, "হিন্দুস্তানে পাড়াগাঁ, গ্রাম—এমনকি শহরগুলোও মুহূর্তের মধ্যে যেমন জনশূন্য হয়ে যায়, তেমনিই আবার গড়ে ওঠে মুহূর্তের মধ্যেই। বছরের পর বছর ধরে বেশ বড় শহরেই বাস করেছে এমন সব লোকও যদি পালায় তারা এমনভাবে পালায় যে এক-দেড়দিন বাদে তাদের বসবাসের কোন চিহ্ন বা প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে যে-জায়গায় বসবাস করবে ঠিক করে সেখানে তারা না কাটে খাল, না দেয় নদীতে বাঁধ; কারণ, সব শস্যই তো হবে বৃষ্টির জলে। ভারতের জনসংখ্যা বিপুল। একসঙ্গে কিছু লোক জড়ো হয়ে একটা দল তৈরি হলেই তারা পুকুর কাটে কিংবা কুয়ো খোঁড়ে; আর বাড়ি তৈরি বা দেওয়াল তোলার হাঙ্গামা নেই। চারদিকে তো অজস্র খস্ ঘাস আর অসংখ্য গাছ-গাছালি। [এইসব দিয়েই] সটান গড়ে ওঠে কোন গ্রাম বা শহর।"[২৫] এই সাধারণ বিবৃতির পাশে ঐ সময়েরই অন্য সূত্র থেকে প্রসঙ্গত দেওয়া একটি উদাহরণের উল্লেখ করা যায়: মাড়োয়ারের এক রাঠোর চাষী তার ভিটেমাটি ছেড়ে সুদূর বিহারে গিয়ে বসতি গেড়েছিল।[২৬] চাষীদের ক্রমাগত বসবাস পরিবর্তনের এই ক্ষমতাকে সেই সময়ের সমাজ ও অর্থনীতির অন্যতম সর্বাধিক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরা যেতে পারে। দুর্ভিক্ষ বা মানুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই ছিল চাষীর প্রথম জবাব। এর থেকেই বোঝা যায় জমি থেকে পালানো বুঝতে পীড়নকারী কেন প্রকৃত বাহুবলের অধিকারী হতে চাইত।

দ্বীপের বর্ণনা দিতে গিয়ে কারেরি (১৬৯৫ খৃস্টাব্দ) বলেছেন: "গ্রামে প্রভুদের যে ভূমিদাস আছে, কৃষকদের অবস্থা তাদের চেয়েও খারাপ, ভূস্বামীকে যতটা দেওয়ার শর্ত আছে ততটা আবাদ করতে বা চাষ করতে তারা বাধ্য; সুতরাং তারা যদি দাসদের মতো এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে পালায় তবে ভূস্বামীরা জোর করে তাদের ফিরিয়ে আনে" (কারেরি, ১৭৯: সম্পাদক তাঁর টীকায় যে সংশোধনের কথা বলেছেন সেই অনুযায়ী মূল ইংরেজি অনুবাদে রদবদল করে নেওয়া হয়েছে)।

২৫. 'বাবুরনামা', অনু. বেভারিজ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৭-৮৮। আব্দুর রহিম-এর ফার্সী তর্জমার (Or. 3714, পৃ. ৩৭৭খ) সঙ্গে তুলনা করে এই অনুবাদ বেশ খানিকটা শুধরে নিয়েছি।

২৬. হাসান আলি খাণ, 'তারিখ-এ দৌলত-এ শের শাহী', 'মেডিয়েভাল ইণ্ডিয়া কোয়ার্টার্লি', ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা (জুলাই ১৯৫০), ফার্সী মূলপাঠ, পৃ. ৩।

জমির সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে মুঘল ভারতের চাষীর অবস্থা আর আধুনিক জমিদারতন্ত্রের অধীনে তার বংশধরদের অবস্থা—এ দু-এর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ দেখা যায়। ইচ্ছামতো বলপ্রয়োগ ছাড়া আধুনিক জমিদারের প্রধান অস্ত্র হলো প্রজাকে জমি থেকে উচ্ছেদের ভয় দেখানো। কোন প্রজা তার জমি ছেড়ে চলে যাবে এটা আর জমিদারের কাছে কোন আতঙ্কের ব্যাপার নয়। প্রজাকে আটকানোর কোন ক্ষমতা তার যেমন নেই, তেমনি এখন আর সে ক্ষমতার দরকারও নেই। বৃটিশ আমলের চিরস্থায়ী ও অন্যান্য বন্দোবস্তের ফলে জমিদার তার আইনগত অধিকারগুলি পেয়েছিল বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুশ বছরের অর্থনৈতিক অচলাবস্থাই চাষীদের চেয়ে জমিদারকে এক সুবিধাজনক অবস্থায় এনেছে। (শিল্পের প্রসার না ঘটায়) একদিকে জমির ওপর জনসংখ্যাবৃদ্ধির চাপ এবং অন্যদিকে চাষবাসের পদ্ধতিতে বা সমাজ-সংগঠনে কোন পরিবর্তনের অভাবে শেষ অবধি জমি বিরল আর মানুষ অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়াল।

মুঘল আমলে চাষীরা যে অধিকার ভোগ করত, বৃটিশ ভারতে শুধু কয়েকটি প্রদেশে বিশেষ প্রজাস্বত্ব আইনের দরুন চাষীদের কিছু অংশ সেই অধিকার পেয়েছিল—যেমন চিরস্থায়ী ও বংশানুক্রমিক দখলীস্বত্ব। কোন কোন ক্ষেত্রে এই অধিকারকে এক ধরনের মালিকানাস্বত্ব বলে ধরা যায় বটে, তবে মালিক হবে স্বাধীন ও তারই থাকবে ইচ্ছামতো জমি হাতবদলের অধিকার। আর চাষী যেহেতু আইনগতভাবে কোন জমিই কোন কারণে ছেড়ে দিতে পারত না, তাই আসলে সে ছিল ভূমিদাসের সামিল। সুতরাং জমির প্রকৃত মালিকানা না ছিল রাজার, না ছিল চাষীর। অর্থাৎ, 'রাইয়তী' এলাকায় অন্তত জমির কোন মালিকই খুঁজে পাওয়া যাবে না। জমি ও ফসলের ওপর বিভিন্ন ধরনের অধিকার ছিল বটে, কিন্তু সম্পত্তির নিরঙ্কুশ অধিকার বলতে কিছু ছিল না।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শুধু 'রাইয়তী' এলাকার অবস্থা নিয়েই আলোচনা করেছি। পরের অধ্যায়ে আমরা দেখব যে 'জমিনদারী' এলাকায় সময় সময় জমিনদারের দখলে যে অধিকারগুলি থাকত সেগুলিকে কার্যত মালিকানার অধিকার বলা যায়। জমিনদারদের যে 'মালিক' বলা হতো সেটাই চূড়ান্ত কথা নয়, কারণ তাদের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঐ 'মালিক' শব্দটি দিয়ে তাদের পদাধিকার সঠিকভাবে বোঝানো যায় না। এই ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য একটিমাত্র প্রামাণ্য দলিল আছে। সেখানে দেখা যায়, অযোধ্যার দুটি গ্রামের চাষীরা জমিনদারের অনুমতি পাওয়ার পর তবে জমি চাষ করতে রাজি হয়েছিল। এই দলিলের বিশদ ব্যাখ্যা পরের অধ্যায়ের জন্য মুলতুবি রেখে একটা ব্যাপার এখানে লক্ষ্য করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। তা হলো এই যে, শুধুমাত্র ঐ দুটিমাত্র গ্রামের এই অবস্থা থেকে, এমনকি শুধু জমিনদারী এলাকার সব জায়গাতেও যে এইরকম ব্যবস্থা চালু ছিল তা বলা যায় না। আবার এও সম্ভব যে, কিছু কিছু টুকরো জমি ছিল অসাধারণ উর্বর কিংবা সুবিধাজনক অবস্থানে ; এই জমি আবাদ করতে ইচ্ছুক চাষীরও অভাব হতো না। এই ধরনের অঞ্চল হতো সেইসব জায়গায় যেখানে জমির উর্বরতা তো ছিলই, তার ওপর সেচের সুবিধাও ছিল বেশি, অথবা শহরের আশেপাশে কিছু কিছু জমি ছিল, যেখান থেকে

শহরের বাজারে ফসল নিয়ে যাওয়া যেমন সহজ তেমনই চড়া দাম পাওয়ার প্রত্যাশাও করা যেত। এইরকম জায়গায় চাষীরা সবসময়ই প্রভুদের চাপানো যে কোন শর্ত মেনে নিতে রাজি হতো। কর্তা ও জমিনদারদেরও এই ভয় ছিল না যে কোন চাষীকে উচ্ছেদ করলে আর কাউকে পাওয়া যাবে না।

২. গ্রাম-সমাজ

মুঘল ভারতের গ্রামের অর্থনৈতিক পরিবেশ আলোচনা করতে গিয়ে[১] আমরা ঐ সময়ের গ্রামীণ অর্থনীতির একটি বিশেষ তাৎপর্যের দিক লক্ষ্য করেছি : গ্রামের উৎপন্ন জিনিসের একটা বড় অংশ শহরের বাজারে নিয়ে যাওয়া হতো কিন্তু গ্রামগুলি তার বিনিময়ে শহর থেকে প্রায় কিছুই পেত না। কাজেই পণ্য-উৎপাদন (অর্থাৎ বাজারের জন্য উৎপাদন)-এর জন্য যা যা দরকার তার জন্য গ্রামের ওপর বেশ ভালো রকম চাপ পড়ত, তবুও গ্রামের নিজস্ব চাহিদা মেটাতে হতো নিজের ভেতর থেকেই। অতএব সেখানে পাশাপাশি বিরাজ করত মুদ্রা-অর্থনীতি ও স্বয়ম্ভরতা। পরস্পরবিরোধী এই দুটি অর্থনৈতিক উপাদানের অস্তিত্বের দরুনই বোধহয় এই সামাজিক দ্বন্দ্ব, যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল একদিকে কৃষিতে ব্যক্তিগত উৎপাদন রীতির অস্তিত্বে, অন্যদিকে গ্রাম-সমাজের গঠনে।

প্রামাণ্য নথিগুলিতে চাষীকে সবসময়েই সপরিবারে একক উৎপাদনকারীরূপে দেখানো হয়েছে। সরকারী দলিলপত্রে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য চাষীদের প্রত্যেকের ওপর আলাদা আলাদা করে রাজস্ব নির্ধারণের বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে।[২] এটি যদি শুধু কাগজ কলমেই মানা হয়ে থাকে তবুও ব্যক্তিগত কৃষি-ব্যবস্থার ধারণাটি যে অন্তর্নিহিত আছে তা বুঝতে ভুল হয় না। গুজরাটের ক্ষেত্রে পরিষ্কার করেই উল্লেখ করা হয়েছে যে চাষীরা যে-যার জমিতে কাঁটাঝোপের বেড়া দিয়ে "নিজেদের জমির ভাগ আলাদা করে নিয়েছে।"[৩] জমিতে চাষীর অধিকার কী ধরনের ছিল আগের অংশে আমরা কিছুটা বিশদভাবে তা নিয়ে আলোচনা করেছি। তবে এই অধিকার যে কখনও সমবেতভাবে তাদের হাতে ছিল তার বিন্দুমাত্র আভাসও আমাদের তথ্যসূত্রে নেই।

পণ্য উৎপাদন ও তার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই জড়িত ব্যক্তিগত জোতের দরুন অনিবার্যভাবেই গ্রামগুলিতে কোনরকম সমতা সৃষ্টি হতে পারেনি।[৪] এ বিষয়ে এক

১. ১ম অধ্যায়, ৪র্থ অংশ ও ২য় অধ্যায়, ২য় অংশ।

২. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫-৬, ২৮৮; রসিকদাসের কাছে আওরঙ্গজেবের ফরমান, অনুচ্ছেদ ৩ ইত্যাদি। এছাড়া ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৪ অংশ দ্রষ্টব্য।

৩. 'তুযুক-এ জাহাঙ্গীরী', ২০৫।

৪. তর্ক উঠতে পারে, জমির যেহেতু অভাব ছিল না তাই জমিতে প্রত্যেকেরই সমান সুযোগ থাকার কথা, আর তাহলে চাষীদের জোতগুলির মধ্যে আকারে কোন তফাৎ হওয়া উচিত নয়।

কৌতূহলজনক সাক্ষ্য হলো পাঞ্জাবের একটি গ্রামে (১৬৯৭-৯৮ খৃস্টাব্দে) 'জিজিয়া' (অ-মুসলমানদের উপর মাথা পিছু চাপানো কর) ধার্য করার একটি নমুনা-বিবরণ। হিসাব-সংক্রান্ত দুটি পুস্তিকায় এটি রক্ষিত আছে। এর থেকে গ্রামবাসীদের ব্যক্তিগত সম্পদের ফারাকের একটা মূল্যায়ন করা যায়। এখানে মোট ২৮০ জন পুরুষের মধ্যে ৭৩ জনকে শিশু, প্রতিবন্ধী ও গরহাজির ইত্যাদি বলে ছাড় দেওয়া হয়েছে, এছাড়াও ২২ জনকে বলা হয়েছে "একেবারেই নিঃস্ব"। বাকি ১৮৫ জনের মধ্যে ১৩৭ জনকে ফেলা হয়েছে তৃতীয় শ্রেণীতে, অর্থাৎ এদের মাথাপিছু সম্পদের মূল্য ৫২ টাকারও কম ; ৩৫ জন আছে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাদের প্রত্যেকের সম্পদের মূল্য ৫২ টাকার ওপর ; এবং ১৩ জন পড়েছে প্রথম শ্রেণীতে যাদের সম্পদ ২৫০০ টাকারও বেশি।[৫]

গ্রামীণ জনসংখ্যা যে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, সম্পদের মূল্য অনুযায়ী এই শ্রেণীবিভাগকে তার এক নমুনা হিসেবে ধরা যেতে পারে। আমরা ধরে নিতে পারি জমিনদার, মহাজন ও শস্য-ব্যবসায়ীদের এক ছোট গোষ্ঠী নিয়ে গড়ে উঠেছিল প্রথম শ্রেণী। সম্ভবত, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল ধনী চাষীরা, আর বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ চাষীদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল তৃতীয় শ্রেণী। একটি সাধারণ বাদশাহী আদেশনামার বিধানে বলা হয়েছে "ছোট চাষীরা ('রেজা রিআয়া') যারা চাষবাসে নিযুক্ত আছে কিন্তু (চাষ করার) ক্ষমতা এবং বীজ ও গবাদি পশুর জন্য" পুরোপুরি ঋণের ওপর নির্ভরশীল তাদের 'নিঃস্ব' শ্রেণীর মধ্যে ফেলা হবে।[৬] যতদূর মনে হয় শেষের এই শ্রেণীটির মধ্যে আরও গরীব চাষীরাও ছিল। ১৮ শতকের মাঝামাঝি

কিন্তু আসলে একজন লোক যতটা জমি চাষ করতে পারে, ততটাই নিতে পারত, আর বীজ, গবাদি পশু, কুয়ো খোঁড়ার টাকা ইত্যাদির সংস্থান যার বেশি, সে তার নিঃসম্বল প্রতিবেশীর চেয়ে অনেক বড় এলাকা চাষ করতে পারত।

৫. 'খুলাসতুস সিয়াক', আলীগড় পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৪১ ক-খ, Or. 2026, পৃ. ৫৬ ক-খ। 'খুলাসতুস সিয়াক' পাণ্ডুলিপিতে যে-যোগফলগুলি দেওয়া আছে, তা বিভিন্ন পর্যায়ের বিস্তারিত অঙ্কগুলির সঙ্গে মেলে না ; কিন্তু Or. 2026-এ এগুলি সঠিকভাবে দেওয়া আছে।

'জিজিয়া' চাপানোর কথা ঘোষণা করে আওরঙ্গজেবের যে ফরমান, সেখানে তিন শ্রেণীর করদাতাদের সম্পত্তির মূল্য 'দিরহাম'-এ দেওয়া আছে : ১ম শ্রেণী ১০,০০০-এর উপরে, ২য় শ্রেণী ২০০-র উপরে এবং ২০০-র কম হলে ৩য় শ্রেণী ('মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৬)। ৩য় শ্রেণীর জন্য যে-হার বরাদ্দ করা হয়েছিল, অর্থাৎ ১২ 'দিরহাম' সমান ৩ টাকা ২ আনা, তার ভিত্তিতে আমি 'দিরহাম'-এ দেওয়া সংখ্যাগুলিকে টাকায় বদলে নিয়েছি। ঈশরদাস, পৃ. ৭৪ ক-খ, টাকার অঙ্কেই স্তরভেদটি দিয়েছেন, কিন্তু ২য় ও ৩য় শ্রেণীর মূল্যমানের বেলায় ভুল করেছেন মনে হয়। ১ম শ্রেণী, তাঁর হিসেবে, ২৫০০ টাকার উপরে, ২য় শ্রেণী ২৫০-এর উপরে আর ৩য় শ্রেণীর মাত্র ৫২ টাকা।

৬. 'নিগরনামা-এ মুন্শী', পৃ. ১৮০ ক-খ, Bodl. পাণ্ডুলিপি, পৃ. ১৪৩ খ-১৪৪ ক, Ed. 139। 'মআরিফ', ৪০ (১৯৩৭), নং ৪, পৃ. ২৯৫ দ্রষ্টব্য (ত্রুটিপূর্ণ পাঠ, 'জিম্মী-এ নাদার'কে 'জমিনদার' ও 'কর্জ'কে 'কর্জ' লেখা আছে)।

বাংলায় 'কালজানা' নামে এক ধরনের চাষী ছিল—এরা অন্য চাষীদের জমিতে চাষ করত।[৭] আর সর্বশেষ পর্যায়ে ছিল "একেবারেই নিঃস্ব" বলতে যাদের বোঝায়, অর্থাৎ ভূমিহীন মজুর। উঁচু জাতের চাষীদের যেসব কাজ করতে ঘৃণা হতো—চামড়ার কাজ, ময়লা পরিষ্কার ইত্যাদি—নীচু জাতের লোকেরা সেসব কাজ তো করতই, তাছাড়া তাদের এক ব্যাপক অংশ ক্ষেতমজুরিও খাটত। তাই চামাররা "মজুরির জন্য কৃষক বা জমিনদারদের জমিতে খাটত।"[৮] ধানুকরা ছিল আরও নীচু জাতের। "চাষীদের ফসল কাটা ও শস্য বইবার" সঙ্গে ধানও ভানত বলে তাদের এই নাম হয়েছিল।[৯] এরা আজমীর প্রদেশে পরিচিত ছিল 'থোরী' আর অন্যান্য জায়গায় 'বলাহর' নামে। এদের প্রথাগত কাজ ছিল রাস্তা দেখানো ও মোট বওয়া।[১০] 'বলাহর' নামটি তাৎপর্যপূর্ণ। এ নামটি আমাদের ১৪ শতকের কথা মনে করিয়ে দেয়। সে সময় সবচেয়ে নীচু জাতের চাষীদের সম্পর্কে জিয়াউদ্দীন বারানী এই নামটি ব্যবহার করেছিলেন।[১১]

এইসব কিন্তু এমন ইঙ্গিত বহন করে না যে আজকের এই বিশাল গ্রামীণ সর্বহারা পুরোপুরি মুঘল আমলের উত্তরাধিকার। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীর অতিদ্রুত বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে মাত্র দেড়শ বছর আগে।[১২] যতদিন আবাদযোগ্য জমি পাওয়া যাচ্ছিল, ততদিন ভূমিহীন চাষীর আপেক্ষিক সংখ্যা কখনোই বেশি হতে পারেনি। কেননা, কোন চাষী কোন কারণে ভূমিহীন হলে সে সর্বদাই দূরে চলে গিয়ে কোন অহল্যা জমিতে ভিটে গড়তে পারত।[১৩] তা সত্ত্বেও যদি মুঘল আমলে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর শ্রেণীর সন্ধান পাওয়া যায়, তাহলে দুটি কারণ দিয়ে তার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রথমত, আমরা যদি ধরেই নিই যে তখন জমির অভাব ছিল না

৭. 'রিসালা-এ জিরাৎ', Edinburgh 144, পৃ. ৮ ক।

৮. 'তসরিহ্-আল আকওয়াম', হন্সী, ১৮২৫, পৃ. ১৮২ ক।

৯. 'তসরিহ্-আল আকওয়াম', পৃ. ১০১ খ-১০২ ক। উইলসন এই জাতের নামটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করেছেন সংস্কৃত শব্দ 'ধনুষ্ক', তিরন্দাজ থেকে (ইবেটসন, 'পাঞ্জাব কাস্টস্', পৃ. ২৯৫)।

১০. 'তসরিহ্-আল আকওয়াম', পৃ. ১৮৮ ক-তে ধানুক ও থোরীদের এক করে দেখা হয়েছে; 'ওয়াকাই-এ আজমীর', ১৩১-এ ১৬৭৯ সালের এক সংবাদ-প্রতিবেদনে থোরীদের এক করা হয়েছে বলাহরদের সঙ্গে। তাদের প্রথাগত পেশার জন্য ঐ একই প্রামাণ্য সূত্রগুলি দ্রষ্টব্য; আরও দ্রষ্টব্য Add. 6603, পৃ. ৫১ খ-৫২ ক এবং এলিয়ট, 'মেমোয়ার্স...,' ২য় ভাগ, পৃ. ২৪৯।

১১. 'খূৎস্'-এর বিপরীতে: 'তারিখ-এ ফিরুজ-শাহী', সৈয়দ আহ্মদ খান, বিবলিও. ইণ্ডি. সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮৬২, পৃ. ২৮৭।

১২. এস. জে. প্যাটেল, 'এগ্রিকালচারাল লেবারার্স ইন ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড পাকিস্তান', বোম্বাই, ১৯৫২ দ্রষ্টব্য, বিশেষ করে পৃ. ৯-২০।

১৩. নতুন জমিতে বসতকারী চাষীরা 'গৈর-জম'ঈ' (যাদের উপর অন্ত কোথাও কোন রাজস্ব দাবি চাপানো হয়নি) হবে—এই সরকারী শর্ত থেকে দেখা যায়, রাজস্ব-প্রদায়ী চাষীরা

তাহলে চাষীর জমির পরিমাণ আজকের চেয়ে গড়ে অনেক বেশি ছিল। বেশি জমিজায়গা থাকলে তখন কৃষক-পরিবারকে ফসল কাটার মতো জরুরি সময়ে নিজেদের লোকবলের ঘাটতি পূরণ করতে বেশি ঠিকে শ্রমিক লাগাতে হতো। এই ঠিকে লোক পাওয়া যেত শুধুমাত্র গ্রামের অকৃষক শ্রেণী থেকে, অর্থাৎ এই গ্রামবাসীরা চাষবাস ছাড়াও অন্য পেশায় যুক্ত থাকত। এইভাবে, যাদের নিজস্ব নির্দিষ্ট পেশা ছিল, যেমন ধানুকরা ক্ষেতমজুর হিসেবে কাজ করত। এই উদাহরণ দুটি আমাদের ভূমিহীন ক্ষেতমজুর শ্রেণী সম্পর্কে দ্বিতীয় উৎসের সন্ধান দেয়। সাধারণত এরা ছিল নীচু জাতের এবং আজও এদের ভূমিহীন শ্রেণীর সেরা নমুনা বলে ধরা হয়।[১৪] মনে হয়, কৃষি-উৎপাদনের জন্য এক নির্দিষ্ট সংরক্ষিত শ্রমবাহিনী তৈরি করতেই জাতিভেদপ্রথা কাজ করে গেছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। সবচেয়ে ঘৃণ্য ও লজ্জাজনক কাজ বরাদ্দ ছিল নীচু জাতের লোকদের জন্য, নিজেদের হাতে জমি পেয়ে বা চাষ করে তারা কখনই চাষী হওয়ার আশা করত না। এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই, কারণ এদের অনেকেরই প্রকৃত অবস্থা ছিল আধা দাসের মতো—অর্থাৎ এরা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের বর্ণ-কৃষক বা জমিনদারের কাছে এক ধরনের মুচলেকা-বন্দী হয়ে ছিল।[১৫]

জাতিভেদ প্রথা চাষী ও ক্ষেতমজুরের মধ্যে যে বংশানুক্রমিক পার্থক্য তৈরি করেছিল তা থেকে গ্রামীণ সমাজে শ্রেণীগত প্রভেদের পরিমাণ কিছুটা বোঝা যায়। "অপরিবর্তনীয় শ্রমবিভাগে"র এক উদাহরণ হিসেবে এই পার্থক্যকেই মার্কস ভারতীয় গ্রাম-সমাজ

পুরানো জমি ছেড়ে নতুন জমিতে চলে যেতে পারে এই ভয় ছিল। এর থেকে আরও বোঝা যায় যে কিছু পরিমাণে ভূমিহীন চাষী থেকে যেত যারা তখনও কোন রাজস্ব দিত না। নতুন বসতির দিকে তারা আকৃষ্ট হতে পারত ('নিগারনামা-এ মুন্শী', পৃ. ১০৩ খ-১০৪ ক ; ১৮৭ ক-১৮৮ ক ; Bodl. পৃ. ৭৯ ক-খ, ১৪৮ গ-১৪৯ ক ; Ed. 81,144)।

১৪. তুলনীয় : এস. জে. প্যাটেল, 'এগ্রিকালচারাল লেবারার্স…', ৬৩-৬৫, যেখানে বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে এই বিশ্বাসের প্রকৃত ভিত্তি নিয়েই প্রশ্ন তোলা হয়েছে ও দেখানো হয়েছে যে বিভিন্ন প্রদেশের মোট জনসংখ্যার সঙ্গে নিপীড়িত জাত ও ক্ষেতমজুরদের অনুপাতের মধ্যে কোন পারস্পরিক সম্পর্ক নেই বললেই হয়।

১৫. তুলনীয় : ক্রুক, 'নর্থ-ওয়েস্টার্ন প্রভিন্সেস', ২০৮ ; মোরল্যাণ্ড, 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', ১৬০। মার্কস যখন ভারতীয় গ্রাম-সমাজগুলিকে, অন্যান্য ব্যাপারের মধ্যে, "দাসত্ব" দ্বারা "কলুষিত" বলে বর্ণনা করেন, তখন সম্ভবত এই ধরনের গোলামির কথা তাঁর মনে ছিল ('নিউ ইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউন', জুন ২৫, ১৮৫৩ ; কার্ল মার্কস, আর্টিকল্স্ অন ইণ্ডিয়া', বোম্বাই ১৯৫১, পৃ. ২৮-২৯-এ পুনর্মুদ্রিত)। সমসাময়িক লেখাপত্রগুলিতে নিপীড়িত জাতগুলির [সামাজিক] অবস্থান সম্বন্ধে সরাসরি কোন সাক্ষ্য নেই। কিন্তু এও লক্ষণীয় যে এই জাতগুলির অনেক বিভাগে উঁচু জাতের (বা গোষ্ঠীর বা উপজাতির) নাম পাওয়া যায়। এই তথ্য থেকে আভাস মেলে যে ঐ ধরনের নামধারী নীচু জাতের লোকে একসময় সেই নামধারী উঁচু জাতের গোলাম ছিল।

গঠনের জন্য অপরিহার্য বলে মনে করেছিলেন। গ্রামের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটি হাতের কাজই, যেমন ছুতোরের কাজ, কুমোরের কাজ ইত্যাদি, এক একটি আলাদা-আলাদা জাতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল এবং সম্ভবত এক-একটি গ্রামে তাদের একটির বেশি পরিবার থাকত না। অর্থনৈতিক কারণে গ্রামে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রয়োজন ছিল; ফলে প্রতিটি গ্রামে কয়েকটি প্রাথমিক ধরনের হাতের কাজের উপস্থিতি ছিল একান্ত জরুরি। কিন্তু "বৃত্তির পার্থক্য" যদি আদতে "স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠে থাকে" তবে জাতিভেদ প্রথার বিধানের ফলে তা "সংহত রূপ পেয়েছিল ও শেষ পর্যন্ত আইনত স্থায়ী ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল।" একবার এই ব্যবস্থা পাকা হয়ে যাওয়ার পর প্রতিটি গ্রাম অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে স্বতন্ত্র এককে পরিণত হলো, ফলে প্রতিটি গ্রাম হয়ে উঠল এমন এক-একটি সমাজ যেখানে লোকসংখ্যা বাড়লে একই ধরনের আরেকটি সমাজের জন্ম দিতে পারত।[১৬]

স্বাভাবিকভাবেই এইসব এককগুলিতে জনসংখ্যার সবচেয়ে বড় অংশ ছিল চাষীরাই। যদিও সাধারণভাবে চাষীদের মধ্যে একাধিক জাত ছিল, তবে সম্ভবত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোন একটি গ্রামের চাষীরা একই জাতের লোক হতো। আজকের অনেক গ্রাম সম্পর্কেও এ কথা সত্য। যেমন, মধ্য দোআবের গ্রামগুলিকে চিহ্নিত করা হয় ঠাকুর, জাট, আহীর, গুজর বা অন্যান্য জাতের চাষীর গ্রাম হিসেবে। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, জাতপাতের বাঁধন যখন আরও কড়া ছিল তখন এই ব্যাপার আরও বেশি ঘটত। ১৬৭৯ সালে আজমীরের এক সংবাদদাতার প্রতিবেদনে জাতিভেদ প্রথার এই দিকটি জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়। "একটি গ্রামের অধিবাসীরা জাট-সম্প্রদায়ের।" তারা এই কর্মচারীটির কাছে কয়েকজন রাজপুতের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ এনেছিল। এই রাজপুতরা এক রাত্রে জাটদের গ্রাম ঘিরে ফেলে এবং ঐ গ্রামে কোন রাজপুত আছে কিনা জানতে চায়। গ্রামের মধ্যে ছিল একজন মাত্র "নিঃস্ব" রাজপুত, সে তার "শোচনীয় অবস্থার জন্য ঐ গ্রামে বসবাস করত।" দুজন সরকারী বার্তাবাহকের হত্যাকারী হিসেবে ঐ রাজপুতকে দায়ী করবে এই মতলবে আক্রমণকারীরা তাকে ধরে খুন করে।[১৭] এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে একই গ্রামে রাজপুত ও জাটদের একত্রে বাস করার প্রথা ছিল না এবং ব্যাপারটি এমনই যে একজন রাজপুত অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে জাটদের গ্রামে বাস করলে সে তার সজাতির সমস্ত সহানুভূতি বা বিবেচনা থেকে বঞ্চিত হতো।

অনেক সময়ই কোন গ্রামের চাষীরা শুধুমাত্র যে একই জাতের হতো তা নয়, ঐ জাতের একই বিভাগ বা উপবিভাগ নিয়েও এক-একটি গ্রাম গড়ে উঠত। তারা দাবি করত যে তাদের পূর্বপুরুষ একই ও তারা একই 'ভাইয়াচারা' বা ভ্রাতৃত্বের অন্তর্গত।[১৮]

১৬. ভারতীয় গ্রাম-সমাজের অর্থনীতির উপর মার্কস-এর বিখ্যাত রচনার অংশটি দ্রষ্টব্য। 'ক্যাপিটাল', ১ম খণ্ড, সম্পা. ডোনা টর, পৃ. ৩৫০-৫২।

১৭. 'ওয়াকাই-এ আজমীর', ১৩২। এই প্রতিবেদনে ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৬৭৯ পর্বের বিবরণ দেওয়া আছে। গ্রামটি ছিল মিরতা অঞ্চলে।

১৮. মোরল্যাণ্ডের 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', পৃ. ১৬০-৬৮-তে ১৮-১৯ শতকের ভাইয়াচারির বিবরি-

প্রতিবেশীদের মধ্যে যে একতা আশা করা যায় তার চেয়ে রক্তের সম্পর্কে গড়ে ওঠা এই 'ভাইয়াচারা' চাষীদের অনেক দৃঢ় বন্ধনে বেঁধে রাখত। যারা ঐ 'ভাইয়াচারা'র অন্তর্গত নয় বা গ্রামে বাস করে না, কিন্তু গ্রামের জমি চাষ করে, তাদের 'পাইকাশ্ৎ' নামে অন্য একটি শ্রেণীভুক্ত করা হতো।[১৯]

অতএব, চাষীদের পুরুষানুক্রমিক শ্রমবিভাগ ও জাতের সংহতি গ্রামের পক্ষে প্রয়োজনীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে বাস্তব রূপ দিয়েছিল। এরই ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল গ্রাম-সমাজ। আমরা যখন 'গ্রাম-সমাজ' শব্দটি ব্যবহার করি তখন তার মানে এই দাঁড়ায় না যে তার সদস্যদের প্রতিভূ হিসেবে গ্রাম কমিউন গ্রামের সব জমির অধিকারী ছিল। জমিতে যে যৌথ মালিকানা ছিল বা চাষীদের মধ্যে মাঝে মাঝে জমির বণ্টন বা পুনর্বণ্টন করা হতো—তেমন কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি জমিতে চাষীর অধিকার বরাবরই ছিল ব্যক্তিগত। এখানে আমাদের বক্তব্য হলো: উৎপাদনের বাইরে এমন কয়েকটি ক্ষেত্র ছিল, যেখানে গ্রামের চাষীরা প্রায়ই যৌথভাবে কাজ করত। এরা ছিল সাধারণত একই 'ভাইয়াচারা'র লোক। আর এই যৌথভাবে কাজ করার জন্য তারা যে মিলিত সংস্থা গড়ে তুলেছিল আমরা তারই নাম দিয়েছি 'গ্রাম-সমাজ'।

তখনকার দিনে অবস্থা যা ছিল তাতে কয়েকটি ক্ষেত্রে যৌথভাবে কাজ না করে উপায় ছিল না। বসতি পাল্‌টানোটা ছিল চাষীদের জীবনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। একা একা দূরে কোথাও গিয়ে লোক জঙ্গল হাসিল করছে—এ তো আমাদের পক্ষে কল্পনা করাই অসম্ভব। এ-ঘটনা সম্ভব, একমাত্র যখন, বাবুরের ভাষায় বলতে গেলে, লোকে কাজ করত "একটা দল" বেঁধে। দ্বিতীয় এবং বোধহয় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, রাষ্ট্রশক্তির মোকাবিলা করতে চাষীদের জোট বাঁধতেই হতো।

১৬ শতকে কোঙ্কণের গ্রাম-সমাজগুলির এক বিবরণ থেকে এই দ্বিতীয় বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। বিশেষভাবে সালসেট দ্বীপ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মনসেরাৎ বলেছেন:

"এখানে ছেষট্টিটি 'অল্‌দিয়া' (গ্রাম) আছে। এগুলিকে কমিয়ে আনা হয়েছিল বারোটি কেন্দ্রে। এগুলিকে বলা হয় সাধারণ সভা (জেনেরাল চেম্বার)। এই নামকরণের কারণ: এরাই শুধু সমগ্র দ্বীপ ও সমগ্র কোঙ্কণে নিম্নলিখিত উপায়ে শাসন করে: বারোটি 'অল্‌দিয়া'র প্রত্যেকটি থেকে দুজন করে প্রতিনিধি তাদের একজন মুন্‌শী সমেত একটি নির্দিষ্ট জায়গায় মিলিত হয়। সেখানে তারা সভা করে সাধারণ

বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য। আরও তুলনীয়: ব্যাডেন-পাওয়েল, 'ভিলেজ কম্যুনিটি', পৃ. ২৭৪ ইঃ। 'ভাইয়াচারা' শব্দটি 'ভাই' এবং 'আচার', প্রথা—এই দু-এর সমাস। (এলিয়ট, 'মেমোয়ার্স…', ২য় ভাগ, পৃ. ২৩)।

১৯. 'রিসলা-এ জিরাৎ', Edinburgh 144, পৃ. ৭ খ-৮ ক; 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', ১৬১ ও টীকা; ইউ. পি. জমিনদারী অ্যাবোলিশন কমিটি, 'রিপোর্ট', ১ম খণ্ড, পৃ. ৮২, ১৮১৮-র 'হল্ট ম্যাকেঞ্জি মিনিট' উদ্ধৃত।

লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান, এবং রাজাধিরাজের (পর্তুগালের রাজা) সেবা বাবদ খাজনা ও রাজস্ব আদায়ের জন্য কী করতে হবে তা স্থির করে। এগুলি স্থির হওয়ার পর পর মুনশী নিলামদারের মতো তা ঘোষণা করে (একে বলা হতো 'নেমো')। সেই ঘোষণাটিই ছিল তাদের সাধারণ সিদ্ধান্ত। যদি শুধুমাত্র একজন আপত্তি করে এবং ঐ সিদ্ধান্তে মত না দেয়, তাহলে সিদ্ধান্তের কোন রদ-বদলই ঘটে না। যা ঠিক করা হলো তার একমাত্র সাক্ষী থাকে মুনশী এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও এরা কেউই দস্তখত করে না। রাজাধিরাজের রাজস্ব এমনভাবে নির্ধারিত হয় যে জমিতে বেশি বা কম যা-ই উৎপন্ন হোক না কেন, ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণের রাজস্ব সবসময় তাঁকে দিতে হবে। যদি কোন 'অলদিয়া' বিনষ্ট হয় বা সেখানে ফসল না হয় তবে তার রাজস্ব দেয় অন্যান্য গ্রাম। আর, কিছু বাড়তি হলে তা অন্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। এই দ্বীপের প্রভুত্ব ও প্রশাসন 'গনুচারেস' নামে এক শ্রেণীর লোকেদের হাতে থাকে।"[২০]

অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এই অনুচ্ছেদ থেকে জানা যায় যে কোঙ্কণ সমাজের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য ছিল একটি যৌথ তহবিল। এখানে প্রত্যেকে তার দেয় টাকা জমা দিত এবং তার থেকেই গ্রামের প্রতিনিধিরা রাজস্বের দাবি মেটাত; বাড়তি অংশ ভাগ করে ফেরত দেওয়া হতো এবং সম্ভবত কিছু অংশ "সাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে"র জন্য খরচ করা হতো।

উত্তর ভারতের গ্রাম-সমাজের এই ধরনের কোন সমসাময়িক বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু সরকারী দলিলপত্রের বিভিন্ন অংশে এ সম্পর্কে কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। এদের অস্তিত্ব অনুমান করা যায় যখন আমরা জানতে পারি "গ্রামগুলিতে চাষীরা" সকলেই বিশ্বস্ত ও যৌথভাবে রাজস্ব জমা দেয় অথবা কর্তৃপক্ষের বিরোধিতার জন্য সবাই মিলে জোট বাঁধে (আকবরের রাজত্বের ২৭তম বছরে তোডর মল-এর সুপারিশ)।[২১] অথবা 'আইন'-এ দেখা যায় 'পাটওয়ারী' ছিল "চাষীদের প্রতিভূ এমন একরকমের হিসাবরক্ষক।[২২] তারা আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখে। তাদের বাদ দিয়ে

২০. মনসেরাৎ, 'ইনফরমেশন', অনু. হস্টেন, *JASB*, N. S., খণ্ড ১৮, ১৯২২, পৃ. ৩৫১-২। তিনি আরও বলেন যে, গোয়ার কাছে চোডার ও দিভার দ্বীপের গ্রামগুলি একই প্রথায় শাসিত হতো (ঐ, ৩৬৫)। তিনি লিখেছিলেন ১৫৭৯-তে।

২১. সুপারিশগুলির অনুচ্ছেদ ৮। Add. 27,247, পৃ. ৩৩২ ক-তে বিষয়টি যেভাবে দেওয়া আছে তাতেই সম্ভবত সুপারিশগুলির মূল খসড়াটি ঠিকঠাক হাজির করা হয়েছে। 'আকবরনামা', বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮২-তে দেওয়া রূপের চেয়ে এটি আরও বিশদ। শেষের সূত্রটিতে 'রিআয়া-এ ইল'-এর ("গ্রামগুলির চাষীদের") কথা আছে যাদের সঙ্গে রাজস্ব-কর্মচারীরা এমন আচরণ করবে যাতে তারা ঠিক সময়ে রাজস্ব দাখিল করতে উৎসাহ পায়। কিন্তু Add. 27,247 এই বিষয়ে 'রিআয়া-এ মওয়াজী-এ ইতিমাদী' অর্থাৎ বিশ্বস্ত গ্রামগুলির চাষীদের কথা উল্লেখ করে এবং প্রত্যেক পরগনায় বিশ্বস্ত ('রাইয়ত-এ খাস') ও বিদ্রোহী ('মুতামরিদ') চাষীদের গ্রামের একটি তালিকা তৈরির কথা বলে।

২২. 'আজ তরফ-এ বরজগরান', এর অর্থ দাঁড়ায় 'চাষীদের তরফে' (বা 'নিযুক্ত')।

কোন গ্রামের চলে না।"[২৩] এ প্রসঙ্গে আমরা মনসেরাৎ-এর বিবরণে গ্রাম-সমাজের মুন্শীর কথা মনে করতে পারি। এক্ষেত্রে আবার দেখা যায় গ্রামবাসীরা যৌথভাবে একজনকে নিয়োগ করেছেন। নিঃসন্দেহে তাঁর উত্তরাধিকারী হচ্ছেন আজকের সরকারী কর্মচারী। 'পাটওয়ারী' কিসের হিসেব লিখে রাখে তার বর্ণনাও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এর থেকে বোঝা যায় যে প্রত্যেক গ্রামেরই নিজস্ব 'আয় ও ব্যয়'-এর হিসেব অর্থাৎ সাধারণ অর্থসংস্থান ছিল। কোঙ্কণ সমাজগুলির মতো একধরনের সাধারণ তহবিল যে উত্তর ভারতের গ্রামগুলিতেও ছিল, এ বিষয়ে নির্দিষ্ট প্রমাণও পাওয়া যায়। 'পাটওয়ারী'র কাগজপত্র মুঘল সরকারের প্রশাসনিক নথিপত্রের অংশ বলে ধরা না হলেও রাজস্ব কর্মচারীদের হিসেব-পরীক্ষা ('বরামদ') করার সময় সেগুলির সাহায্য নেওয়া হতো।[২৪] হিসেব-পরীক্ষকরা 'পাটওয়ারী'র কাগজপত্র থেকে গ্রামের আয়-ব্যয়ের যে নমুনা-সংক্ষিপ্তসার খাড়া করেছিল, আওরঙ্গজেবের আমলের তিনটি হিসাবপত্রের পুস্তিকায় তা উদ্ধৃত হয়েছে। গ্রামের আর্থিক অবস্থা বোঝবার পক্ষে এগুলি খুব মূল্যবান।[২৫]

এখানে সব প্রথম দেখানো হয়েছে প্রত্যেক চাষীর থেকে আদায়-করা টাকায় গ্রামের মোট আয়ের হিসেব।[২৬] রসিকদাসের কাছে আওরঙ্গজেবের ফরমানটিতে বোধহয় এই ধরনের আদায়ের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। এর ৮নং অনুচ্ছেদে "ফার্সী ভাষায় 'হিন্দবী' হিসেব পরীক্ষা করার জন্য" রাজস্ব কর্মচারীদের 'বাছ' ও 'বেহ্‌রীমাল'-এর আসল পরিমাণ ও প্রত্যেকের কাছ থেকে আদায় করা দর্শনী ও দস্তুরি (অর্থাৎ চাষীদের ঘর থেকে যে কোন খাতে নেওয়া সব কিছুই) খুঁজে বের করতে" বলা হয়েছে। 'বাছ' শব্দটি 'ভাইয়াচারা' সংগঠনের সঙ্গেই বিশেষভাবে সম্পর্কিত। 'ভাইয়াচারা'র প্রত্যেক সদস্য সাধারণ তহবিলে যে হারে টাকা জমা দিত, সাম্প্রতিক কালেও 'বাছ' শব্দটি দিয়ে তা-ই বোঝানো হয়। চাঁদা বা খাজনার কিস্তি বোঝাতে সাধারণত 'বেহ্‌রী' শব্দটি ব্যবহার হয়। কিন্তু 'ভাইয়াচারা'র গ্রামগুলিতে এই শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ হচ্ছে : গ্রামের আওতায় থাকা মোট জমির উপবিভাগ বা ভগ্নাংশ। অতএব, 'বেহ্‌রীমাল' বলতে বোঝাবে 'ভাইয়াচারা'র সদস্যরা তাদের জমির ভাগ অনুযায়ী যে পরিমাণ রাজস্ব ('মাল') দেয়।[২৭] এইভাবে গ্রামের যে আয় পাওয়া যেত, বিভিন্ন

২৩. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০।

২৪. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৭ ; 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৮-৯ ; রসিকদাসকে দেওয়া ফরমান, অনুচ্ছেদ ১১ ; 'সিয়াকনামা', ৭৫-৭৬ ; 'খুলাসতুস্ সিয়াক', পৃ. ৯১ খ, Or. 2026, পৃ. ৫৯ ক।

২৫. 'দস্তুর-আল আমল-এ আলমগীরী', পৃ. ৪১ খ-৪২ খ ; 'সিয়াকনামা', ৭৭-৭৯ এবং 'খুলাসতুস্ সিয়াক', পৃ. ৯২ ক-৯৪ ক (Or. 2026, পৃ. ৫৯ খ-৬৪ ক)। প্রথম পুস্তিকাটি লেখা হয়েছিল বিহারে, দ্বিতীয়টি এলাহাবাদ প্রদেশে আর তৃতীয়টি পাঞ্জাবে।

২৬. 'খুলাসতুস্ সিয়াক'-এ স্পষ্টই উল্লেখ করা আছে। আরও তুলনীয় 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৭।

২৭. 'বাছ' ও 'বেহ্‌রী'র তাৎপর্যের জন্য এলিয়ট, 'মেমোয়ার্স', ২য় ভাগ, পৃ. ২৩, ৩৮ ও উইলসন-

খাতের খরচের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখা হতো। রাজস্বের দাবি মেটানোর জন্য রাজকোষে যে-টাকা জমা পড়ত তাই ছিল প্রথম ও সবচেয়ে বড় অঙ্কের খরচ।[২৮] এর পরেই থাকত বিভিন্ন শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী ও তাদের প্রতিনিধিদের দর্শনী ও দস্তুরি। এর সঙ্গে যুক্ত হতো কর্তাব্যক্তিদের কিছু বিশেষ চাহিদা মেটানোর খরচ। খরচের শেষ দফাটি বোধ হয় সবচেয়ে মজার জিনিস। তা হলো 'খরজ্-এ দেহ্' বা গ্রামের খরচ।[২৯] এর মধ্যে আছে মোড়ল ও 'পাটওয়ারী'র ভাতা, কানুনগো ও আমিন-এর দস্তুরি,[৩০] চৌধুরীকে খাতির যত্ন করার খরচ ইত্যাদি। একটি পুস্তিকায়

এর 'গ্লসারি', পৃ. ৪২, ৭০-৭১ দ্রষ্টব্য। Add. 6603, পৃ. ৫০ ক "প্রত্যেক চাষীর থেকে পাওনা রাজস্ব ও শুল্ক ছাড়াও একটি পরিমাণ" বলে 'বেহরী'-র সংজ্ঞা দেয়। এই সূত্রে আরও বলা হয়েছে যে দিল্লীতে এটি ছিল 'বাছ' নামে পরিচিত। মুঘল নথিপত্রে মাঝে মধ্যে এই শব্দটি যে-ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে 'বাছ'-এর এই সংজ্ঞার সঙ্গে তা মেলে। যেমন, 'নিগারনামা-এ মুন্শী', পৃ. ১১৭ ক, Bodl. পৃ. ৯১ ক Ed. 91—যেখানে 'কানুনগো'কে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সে যেন কখনও "অত্যাচার, বলপ্রয়োগ এবং (জোর করে) 'বাছ' (আদায়ের) দিকে না যায়।" কিন্তু ওপরে উদ্ধৃত রসিকদাস-এর প্রতি ফরমানটির ভাষা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে 'বাছ' ও 'বেহ্‌রী-মাল' এবং তার সঙ্গে 'দর্শনী ও দস্তুরি' বলতে চাষীর দেয় সবকিছুই ধরা হতো। ওপরের চারটি খাতে মোট যে-আদায়, তার থেকে রাজকোষে ('ওয়াসিলৎ-এ ফোতাখানা') দাখিল-করা টাকা বাদ দিতে হবে—ফরমানটির ঐ একই অনুচ্ছেদে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব, 'বাছ' ও 'বেহ্‌রী মাল' মিলে নিশ্চয়ই রাজস্ব-দাবির পুরো পরিমাণ মেটাত।

২৮. 'দস্তুর-আল আমল-এ আলমগীরী'-তে মোট ৪,৬৫৫ টাকা গ্রামের খরচের মধ্যে রাজকোষে দাখিল করা টাকার পরিমাণ ৪,৪২৭; 'সিয়াকনামা'-য় এই পরিমাণ ২১৮ টাকার মধ্যে ১০৯ টাকা আর 'খুলাসতুস্ সিয়াক'-এ ১,২৮২ টাকার মধ্যে ১,০১১ টাকা।

২৯. ভূমি-রাজস্ব আর বিভিন্ন কর্মচারীদের দস্তুরি সহ সেই সংক্রান্ত বিবিধ খরচ এবং 'গ্রামের খরচ' বাদ দিয়ে গ্রামের তহবিল থেকে আর সবরকম খাতে যে-টাকা দেওয়া হয় হিন্দীতে তাকে বলে 'মলবা' (উইলসন, 'গ্লসারি', ৩২৪ এবং 'মীরাট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার', ১৯২২, পৃ. ১০৮)। মুঘল নথিপত্রে এই শব্দটি প্রায়ই দেখা যায়। উদাহরণত, 'আকবরনামা'-তে তোডর মলের সুপারিশ, Add. 27,247, পৃ. ৩৩১ খ, ৩৩২ খ; ফথুল্লাহ্ শিরাজীর স্মারকপত্র, 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৮ (Add. 26,207, পৃ. ১৯৪ খ-১৯৫ ক), রসিকদাসকে দেওয়া ফরমান, অনুচ্ছেদ ১০; 'নিগারনামা-এ মুন্শী', পৃ. ১৭৫ খ, ১৮৯ ক, Bodl. পৃ. ১৪০ খ, ১৫০ ক, Ed., ১৩৬, ১৪৫. গ্রামগুলি থেকে পদস্থ কর্মচারীদের জবরদস্তি আদায়ের ব্যাপারে সাধারণভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৭ম অংশ দ্রষ্টব্য।

৩০. 'মীর দেহ্', আক্ষরিক অর্থে গ্রামের প্রধান। ম্যালকম, 'মেমোয়ার অব সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া', ২য় খণ্ড, ১৩-১৪য় এই কর্মচারীটির অবস্থান ও কার্যাবলী বর্ণনা করা আছে। উত্তরপ্রদেশে সে ছিল 'কানুনগো'র অধস্তন, 'কানুনগো'র নির্দেশ অনুযায়ী জমি জরিপ করা ছিল তার কাজ

মহাজনদের ধার মেটানোর জন্য এই খাতে একটা বড় অঙ্কের খরচ দেখানো হয়েছে।[৩১] সম্ভবত গ্রামের সাধারণ তহবিল বন্ধকী রেখে পুরো গ্রাম-সমাজই ধার নিতে পারত। এই বিশেষ নজিরটিতে যে-পরিমাণ টাকা দেখানো হয়েছে তা সেই বছরে দাখিল করা রাজস্বের তিনের-চার ভাগ। আমরা ধরে নিতে পারি যে রাজস্ব-দাবির কিছু অংশ মেটানোর জন্য বা 'প্রাকৃতিক বিপর্যয়' কাটিয়ে উঠতে ঐ টাকা আগের কোন-এক বছরে ধার করা হয়েছিল। 'গ্রামের খরচে'র মধ্যে নালার পাড় উঁচু করা, তরমুজের বীজ কেনার খরচের মতো কিছু উৎপাদনমুখী কাজকর্মের খরচও দেখানো হয়েছে।[৩২] আবার সাধারণ আমোদপ্রমোদ খাতে বা গ্রামের 'নৈতিক' দায়িত্ব পালনের জন্যও খরচ করা হয়েছিল। তাই দেখা যায় বাজিকর ও গাইয়েদের টাকা দেওয়া হয়েছে এবং বহিরাগতদের আতিথ্য ও ভিখিরিদের দাতব্য বাবদও কিছু খরচ হয়েছে।[৩৩]

গ্রামের এই হিসেবগুলিতে তাই দেখা যায় প্রত্যেক চাষী গ্রামের সাধারণ তহবিলে তার দেয় অংশ জমা দিয়েছে আর সেখান থেকেই ভূমি-রাজস্ব, সরকারী কর্মচারীদের চাহিদাপূরণ, ঋণ শোধ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক এমনকি আত্মিক উপকারের খরচও মেটানো হতো। কিন্তু মনুসেরাৎ-বর্ণিত 'সাধারণ সভা'র মতো কোন সভা যে উত্তর ভারতের গ্রামগুলিতে এই ধরনের লেনদেন চালাত তার উল্লেখ আমাদের নথিপত্রে পাওয়া যায় না। জোর কিংবদন্তী এই যে গ্রাম-পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু ছিল। আক্ষরিক-ভাবে 'পঞ্চায়েত' অর্থে 'পাঁচজনের সমিতি', কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল 'বাড়ির কর্তাদের সমিতি' এবং এর ওপরই 'ভাইয়াচারা' সমাজের পরিচালনার দায়িত্ব ছিল। এখনও পর্যন্ত, বা বলতে গেলে সাম্প্রতিককাল অবধি "পঞ্চায়েত যে কাজের মাধ্যমে এতকাল টিঁকে রয়েছে" তা হলো প্রত্যেক জোতের ওপর দেয় রাজস্বের অনুপাত স্থির করা ও গ্রামের "সাধারণ খরচে"র টাকা বরাদ্দ করা।[৩৪] হিসেবনিকেশের এই কাজ কোন কোন গ্রামে বছরে একবার আর কোথাও বা প্রতিবার ফসল কাটার পর করা হতো। এই ধরনের গ্রামে মোড়ল ছিল শুধুমাত্র গ্রাম-সমাজের মুখপাত্র, সব সময়ই সে চলত গ্রাম-সমাজের ইচ্ছা অনুযায়ী।[৩৫] মনে হয় কোন কোন ক্ষেত্রে

(এই তথ্যের জন্য আমি ডঃ আতহার আলীর কাছে ঋণী)। 'দস্তুর-আল আমল-এ আলমগীরী'তে গ্রামের নমুনা-হিসেবপত্রে 'মীর-দেহ'-র দস্তুরিকে 'খরজ-এ দেহ্'-র মধ্যে ফেলা হয়নি, রাজস্ব কর্মচারী ও তাদের প্রতিনিধিদের আদায়ের অধীনে ধরা হয়েছে।

৩১. 'সিয়াকনামা', ৭৯ দ্রষ্টব্য। গ্রামের মোট আয় ২১৮ টাকা, ধার শোধের পরিমাণ ৮০ টাকা বলা হয়েছে।

৩২. 'দস্তুর-আল আমল-এ আলমগীরী'-তে এই সব দফা দেওয়া আছে।

৩৩ 'খুলাসতুস সিয়াক' দ্রষ্টব্য। তুলনীয়, 'মীরাট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার', পৃ. ১০৮ ও ব্যাডেন-পাওয়েল, 'ইণ্ডিয়ান ভিলেজ কম্যুনিটি', ২৫।

৩৪. ব্যাডেন-পাওয়েল, 'ইণ্ডিয়ান ভিলেজ কম্যুনিটি', ২৪-২৫ দ্রষ্টব্য। আমাদের তথ্যসূত্রে 'পঞ্চায়েত'-এর অনুল্লেখ আশ্চর্যজনক।

৩৫. 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', ১৩৩-৩৪ ; ব্যাডেন-পাওয়েল, 'ইণ্ডিয়ান ভিলেজ কম্যুনিটি', ২৪।

মোড়লও থাকত না ; কর্তৃপক্ষের কাছে এমন লোকও গ্রামের প্রতিনিধিত্ব করত যাদের কোন পদই ছিল না এবং এই বিশেষ কাজের জন্যই গ্রাম-সমাজ তাকে নিয়োগ করত।[৩৬]

এ পর্যন্ত গ্রাম-সমাজের কাজকর্মের যে ধাঁচ হাজির করা হলো, সব গ্রাম-সমাজই যে কঠোরভাবে সেই অনুযায়ী চলত এমন মনে করলে ভুল করা হবে। প্রত্যেক গ্রামের চাষীরাই যে একটি গ্রাম-সমাজে সংগঠিত ছিল, এমন ধরে নেওয়াও উচিত নয়। চাষীদের এই ধরনের গ্রাম-সমাজ গড়ে ওঠার পেছনে নির্দিষ্ট কতকগুলি অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ ছিল। কিন্তু এ ছাড়াও এমন একাধিক দিক ছিল যা হয় গ্রাম-সমাজগুলিতে ভাঙন ধরিয়েছে নয় তো 'সমাজহীন' গ্রাম গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। পণ্য-উৎপাদন বা বাজারের জন্য উৎপাদন কৃষকদের মধ্যে অর্থনৈতিক স্তরভেদের সৃষ্টি করেছিল। চাষীদের ধনী অংশ ও বাদবাকিদের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাত বা 'ভাইয়াচারা'র বাঁধন আলগা হতে বাধ্য। কোন এক সময়ে গ্রাম-সমাজের বড়লোক চাষীরা অন্যদের উপর আধিপত্য করতে শুরু করবে—এমনও প্রত্যাশা করা যেত। মোড়ল ('মুকদ্দম'), বড়মানুষ ('কলান্তরান') বা প্রতাপশালী লোকেদের ('মুতাগল্লিবান') সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রামের টাকা নিয়ে নয়ছয় করা, বিশেষ করে 'রেজা রিআয়া' বা ছোট চাষীদের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে এমনভাবে রাজস্ব দাবি বণ্টন করার জন্য আমাদের তথ্যসূত্রগুলিতে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।[৩৭] কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রামের বিত্তবান সদস্যদের হাতে সব ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে গ্রাম-সমাজ হয়তো কিছুদিন বাদে সম্পূর্ণভাবেই হারিয়ে যেত : এবং এই বিত্তবান লোকেরাই সাধারণত দেখা দিত মোড়ল হিসেবে।

৩৬. উদাহরণত 'দুর-আল উলুম', পৃ. ৬৫ ক-খ-তে একটি 'হসবুল হুকুম্' আমাদের সামনে এমন একটি গ্রাম হাজির করে, যেখানে আপাতদৃষ্টিতে কোন মোড়ল নেই। একটি গ্রামের চাষীদের আর্জিকে এখানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এতে তিনজন আবেদনকারীর নাম আছে, কিন্তু গ্রামে যে তাদের কোন পদ ছিল, এরকম কোন আভাসই নেই। ঐ গ্রামটি যে-'চৌধুরী' ইজারা নিয়েছিল, সে জোর করে অতিরিক্ত আদায় করে—আর্জিতে অভিযোগ ছিল এই। গ্রামবাসীর তহবিল ('ফোতা') থেকে এই 'চৌধুরী' একটা বড়ো অঙ্কের টাকা নিয়েছিল আর অতিরিক্ত আদায় গোপন রাখার জন্য গ্রামের হিসাবপত্র ('কাগজ-এ খাম') কেড়ে নিয়েছিল। গ্রামের তহবিলের অস্তিত্ব থেকে গ্রাম-সমাজের অস্তিত্ব অনুমান করা যেতে পারে।

৩৭. রসিকদাসের কাছে আওরঙ্গজেবের ফরমানের অনুচ্ছেদ ৬ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। তোডর মল-এর সুপারিশগুলির মূল পাঠে ('আকবরনামা', Add. 27,247, পৃ. ৩৩২ খ) খানিকটা অসংযত ভাষায় বলা আছে যে "গ্রামের বজ্জাত ও গোঁয়ার লোকেরা (তাদের কাছে পাওনা রাজস্ব দাবি-কে) 'রেজা-রিআয়া'-য় পাঠিয়ে দিয়ে সেই ভাগ নিজেদের কাছে রেখে দেয়।" 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৬-তে রাজস্ব-সংগ্রাহককে "গ্রামের কলান্তরান'-এর সঙ্গে 'নসক' (গ্রামের ওপর এক ধরনের ধার্য)-এর ব্যবস্থা" করার ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে, কারণ "এর ফলে অত্যাচারপ্রবণ প্রতাপশালী লোকেরাই শক্তিমান হয়।"

৩. গ্রাম-কর্মচারী

আমাদের নথিপত্রে 'পাটওয়ারী' বা হিসাবরক্ষক ছাড়া একমাত্র যে-গ্রামকর্মচারীর উল্লেখ পাই সে হলো গ্রামের মোড়ল—এরা উত্তর ভারতে 'মুকদ্দম' ও দক্ষিণে 'পাটীল' নামে পরিচিত ছিল।[১] কিন্তু কোন কোন গ্রামে একজনের বেশি মোড়ল ছিল এবং বাস্তবিক আমরা দেখি একটি গ্রামে সাতজন মোড়ল আছে বলে বড়াই করেছে।[২] আগের অংশের শেষ ভাগে মোড়লের পদ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হওয়ার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেই অনুযায়ী অনুমান করা যেতে পারে যে একবার এই দপ্তর বিত্তবান-কৃষকদের অধিকারে আসার পর তা অবশিষ্ট চাষীভাইদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। স্বাভাবিকভাবেই বিত্তশালী কৃষকরা তাদের এই অধিকারকে স্থায়ী এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করার চেষ্টা করত। তাই এটি শুধুমাত্র বংশানুক্রমিকই হয়ে ওঠেনি,[৩] এর কেনাবেচাও চলত—মুদ্রা-অর্থনীতির আয়তন বৃদ্ধির

১. 'মুকদ্দম' একটি আরবী শব্দ। এর মানে হলো: যাকে প্রথমে বসানো হয়। মধ্যযুগের ভারতের গোড়ার দিকেই শব্দটি 'গ্রামের মোড়ল' এই বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হতো (বারানী, 'তারিখ-এ ফিরুজশাহী', বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা, ২৮৮, ২৯১, ৪৩০। তুলনীয় 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', ১৯ ও টীকা)। দখিনে 'মুকদ্দম'-এর সঙ্গে 'পাটীল'কে এক করে দেখার ব্যাপারে 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৬ দ্রষ্টব্য। এও আশ্চর্য যে শুধু এই শব্দদুটিই সরকারী স্বীকৃতি পেয়েছিল, কারণ মোড়ল বোঝাতে বিভিন্ন অঞ্চলে আরও বেশ কিছু নাম ছিল বলে মনে হয়। Add. 6603-র লেখক (দিল্লী ও বাংলার নামগুলি সম্বন্ধে যাঁর জ্ঞান ছিল) 'মুকদ্দম' ছাড়াও 'মণ্ডল', 'জেঠ-এ রাইয়ত' ও 'মহ্‌তাউন'-এর উল্লেখ করেছেন (পৃ. ৮১ ক-খ)। ১৬ শতকে ওড়িশায় মোড়লকে বলা হতো 'পধান' (*JASB*, N. S., খণ্ড ১২, ১৯১৬, পৃ. ৩০)। ঐ একই পদাধিকারীর জন্য আবুল ফজলও এক জায়গায় 'রঈস-এ দেহ্‌' শব্দটি ব্যবহার করেছেন ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫)। ১৮ শতকের শেষদিকের একটি বই 'দস্তুর-আল আমল-এ খালিসা শরিফা', Edinburgh 230, পৃ. ৬৩ ক, এ বিষয়ে তাঁকেই অনুসরণ করেছে। সেখানে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে 'মণ্ডল'-এর তাৎপর্য বোঝাতে।

২. ১৬৫৩ খৃস্টাব্দে অযোধ্যার একটি গ্রামের 'মুকদ্দমী' বিক্রির কোবালা দ্রষ্টব্য (Allahabad 1183)। 'দুর-আল-উলুম', পৃ. ৫৫ খ-তে দেখা যায়, তিনজন প্রার্থী মিলে অযোধ্যার একটি গ্রামের 'মুকদ্দমী'র পদ দাবি করেছে। একই গ্রামে দুজন 'মুকদ্দম'-এর জন্য Allahabad 329 এবং *1198*; 'সিয়াকনামা', ২৯ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

৩. উপরে উল্লিখিত একটি গ্রামের সাতজন 'মুকদ্দম' দাবি করে যে তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে তারা ঐ পদ পেয়েছিল (Allahabad 1183)। একজন আবেদনকারী কোন এক দখলদারের কাছ থেকে তার পদ ফিরে চাওয়ার আর্জিতে বলে: "তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে ঐ গ্রামের 'মুকদ্দমী' তারই উপর বর্তায়" ('নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ১২৭ খ, Ed. 98)। ১৫৬৬ সালের একটি আদিলশাহী আদেশনামায় (*IHRC*, খণ্ড ২২, ১৯৪৫, পৃ. ১১) স্বীকার করা হয়েছে যে 'পাটীল'-এর পদটি বংশানুক্রমিক। খাফী খান, ১ম খণ্ড, ৭৩৩ টীকা, Add.

এটি একটি প্রমাণ।[৪] সাধারণত, মোড়ল নিজেই ছিল চাষী। কিন্তু এই পদ বেচা-কেনা হওয়ার ফলে কখনও কখনও গ্রামের বাইরের লোক, এমন কি শহরের লোকও মোড়ল হতে পারত।[৫] সঠিকভাবে বলতে গেলে মোড়ল কখনোই সরকারী কর্মচারী ছিল না। তবে কোন মোড়ল তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে তাকে খারিজ করার ক্ষমতা রাজস্ব কর্তৃপক্ষের ছিল।[৬] নতুন পত্তন হয়েছে কিংবা পত্তন হবে এরকম গ্রামগুলিতে বা পুরনো গ্রামে যেখানে স্বাভাবিক উত্তরাধিকারীর অভাবে

6573, পৃ. ২৬১-৬৫ এই নীতিই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। সেখানে আভাস মেলে যে উত্তরাধিকারীর অভাবে কোন গ্রাম 'মুকদ্দম' ছাড়াই পড়ে থাকতে পারত।

৪. Allahabad 1183 হলো ১৬৫৩ সালে অযোধ্যার একটি গ্রামের "মুকদ্দমীর আর্থিক লাভ" বিক্রির কোবালা। আরও দ্রষ্টব্য 'দুর-আল উলুম', পৃ. ৫৫ ক-খ। আগের পদাধিকারীরা স্বেচ্ছায় পদ হস্তান্তর করছে বলা হলেও এটি বোধহয় বেচে দেওয়া হয়েছিল।

৫. Allahabad 329 (১৬৭৭ খৃস্টাব্দ)-এ দুজন 'মুকদ্দম' পরিষ্কারভাবে নিজেদের 'কৃষক' (মুজারিআন') বলেছে। পালাম-এর 'মুকদ্দম'-এর উল্লেখ এবং আকবরের আদেশে তার জমির 'মদদ-এ মআশ' (রাজস্ব-অনুদান)-এ পরিবর্তন—এর থেকে অনুমান করা যায় যে এমনিতে সে ছিল একজন সাধারণ রাজস্বদাতা ('তবাকৎ-এ আকবরী', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৬)। 'দস্তুর-আল আমল এ নবীসিন্দগী', পৃ. ১৮২ ক-১৮৫ ক-তে দেখা যায় অন্যান্য চাষীদের ('অসামী') সঙ্গে 'মুকদ্দম'-এর জমির ভূমি-রাজস্বও নির্ধারণ করা হচ্ছে। 'প্রধান কৃষক' বলতে মানুচি স্পষ্টতই মোড়লদের বুঝিয়েছেন (২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫০)।

অন্যদিকে, 'দুর-আল উলুম', পৃ. ৫৫ ক-খ-তে একটি আর্জির ওপর এক আদেশ থেকে বোঝা যায়, 'কসবা' বা শহরাঞ্চলে বসবাসকারী একদল লোক ঐ একই 'কসবা'র অন্য তিনজন লোককে একটি গ্রামের 'মুকদ্দমী' বেচে দিয়েছিল। তেমনি যখন দেখা যায় অ-মুসলমান নামধারী সাতজন 'মুকদ্দম' ২৩০ টাকার বিনিময়ে একজন মুসলমানকে তাদের 'মুকদ্দমী' বেচে দিচ্ছে (Allahabad 1183) তখন নিশ্চয়ই ধরে নেওয়া যায় যে ক্রেতাটি বাইরের লোক, আর বোধহয় পাকা ফাটকাবাজ।

৬. বংশানুক্রমিক অধিকারের ভিত্তিতে কোন গ্রামের 'মুকদ্দমী' দাবি করে একজন আবেদনকারী যে আর্জি করেছিল তার উপর জারি-করা পরওয়ানাতে তাকে ঐ 'মুকদ্দমী' পাইয়ে দেবার হুকুম দেওয়া হয় যদি-না "অভিযোগকারীর গোঁয়ার্তুমি বা অক্ষমতার দরুন পূর্ববর্তী কর্মচারীরা ('হুক্কাম') অন্য কাউকে ঐ 'মুকদ্দমী' দিয়ে থাকে" ('নিগরনামা-এ মুন্সী', পৃ. ১২৭ খ, Bodl. পৃ. ৯৮ খ, EJ. 98) কিন্তু জাগীরদাররা খুশিমতো 'মুকদ্দম'দের সরাতে পারত বলে মনে হয় না। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে আলহানপুরের 'মুকদ্দম'-এর সঙ্গে সেখানকার জাগীরদারের ছেলের বিবাদের বয়ান দ্রষ্টব্য। এক্ষেত্রে 'মুকদ্দম' তার সপক্ষে বাদশাহী পরিপোষণ পেয়েছিল ('ওয়াকাই-এ আজমীর', ৬৪-৬৫)। সম্ভবত মোড়লদের সরানো বা বসানোর অধিকার ছিল একমাত্র বাদশাহী প্রশাসনের হাতে।

মোড়লের পদ খালি হয়েছে, সেই রকম অবস্থায় মোড়ল মনোনয়নে তারা ক্ষমতা প্রয়োগ করত।[৭]

গ্রাম-সমাজ যেখানে দুর্বল হয়ে পড়েছে বা একেবারেই নেই, সেই সব রাইয়তী গ্রামে 'মুকদ্দম'-এর পদ ছিল সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামের ওপর ধার্য রাজস্ব দাখিল করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কাছে সে-ই প্রথম দায়ী থাকত।[৮] তাই প্রত্যেক চাষীর কাছ থেকে তার দেয় রাজস্ব আদায় করা ছিল তার কাজ।[৯] এই কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে সে হয় গ্রামের রাজস্ব-নির্ধারিত জমির ২½ শতাংশ পেত, এবং তার জন্য তাকে রাজস্ব দিতে হতো না ; অথবা তার আদায়ীকৃত মোট রাজস্বের ২½ শতাংশ সে নিজের জন্য রাখতে পারত।[১০] কিন্তু এ সন্দেহ সব সময়ই করা হতো যে 'মুকদ্দম'দের উপর যদি নজর রাখা না হয় তবে তারা রাজস্ব-দাবি মেটানোর অজুহাতে অথবা রাজস্ব কর্মচারীদের দস্তুরি দেওয়ার নামে গরীব চাষীদের কাছ থেকে প্রচুর বেআইনী টাকা-

৭. শাহ্জাহানের রাজত্বের শেষ দিকে দখিনের দেওয়ান মুর্শিদ কুলী খান "যেসব লোকের বসত গাড়ার ও চাষীদের দেখাশোনা করার ক্ষমতা আছে তাদের জন্য লাঙ্গল পড়েনি এমন জমি বরাদ্দ করেছিলেন ; ইজ্জতদার পোশাক ও 'মুকদ্দম' উপাধি দিয়ে তিনি তাদের চাষবাসের (কাজকর্ম) দেখাশোনা করার কাজে লাগিয়েছিলেন" (সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ১৮৭ খ, Or. 1671, পৃ. ৯১ ক)। খাফী খান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩৩ টীকা, যিনি এই অংশটির অন্যান্য জায়গায় সাদিক খানকে অনুসরণ করেছেন, এখানে অন্যরকম লিখেছেন। তিনি বলেন : মুর্শিদ কুলী খান নতুন 'মুকদ্দম'দের নিয়োগ করেছিলেন "সেইসব গ্রামে যেখানে দুর্ভাগ্যবশত আগের 'মুকদ্দম'দের ওয়ারিশ না থাকায় গ্রামগুলিতে কোন 'মুকদ্দম'ই ছিল না।"

৮. তুলনীয় 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫, যেখানে তাকে 'রঈস্-এ দেহ্' বলা হয়েছে। 'কবুলিয়ৎ' বা রাজস্ব-দাবি মেনে নিয়ে ও সেই পরিমাণ রাজস্ব দেওয়ার কর্তব্য অঙ্গীকার করে 'মুকদ্দম'দের সই-করা কাগজপত্র 'ফরহান্-এ কারদানী', পৃ. ৩৪ ক-খ ; 'সিয়াকনামা' ২৯ এবং 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৪ ক-৭৫ ক ; Or. 2026, পৃ. ২৩ ক-২৪ খ-তে উদ্ধৃত আছে। আরও তুলনীয় 'ফ্যাক্টরিস, ১৬২২-২৩', পৃ. ২৫৩-৪।

৯. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৮ ('আইন'-এ 'বিতিক্চি' শীর্ষকে)। তুলনীয় মামুচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫। তিনি বলেন, রাজস্ব আদায়ের জন্য "প্রধান কৃষকদের বেঁধে ফেলা দরকার", যারা "চাষীদের কাছ থেকে একই রকম কঠোর ব্যবস্থা মারফৎ [রাজস্ব] আদায় করে থাকে।"

১০. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫ ; 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, ১৭৩। 'আইন'-এর কথা থেকে মনে হয় যে প্রথম ধরনের ইনামই বেশি চালু ছিল। বেরার-এর পাপাল পরগনার নথিপত্রে দেখানো হয়েছে যে অন্যান্য কর্মচারীদের মতো 'মুকদ্দম'দের দখলে কিছু জমি ছিল, যার জন্য তাদের রাজস্ব দিতে হতো না (*IHRC*, ১৯২৯, পৃ. ৮৫-৮৬)। 'মিরাৎ' থেকে দেখা যায়, রাজস্বের ওপর শতকরা পাঁচ ভাগ ধার্য ছিল যা 'মুকদ্দম' ও 'দেসাই' (চৌধুরী)-এর মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হতো ; আর ঠিক একইভাবে 'সদ-দোঈ' বা 'দু শতাংশ' নামে আরেকটি ধার্য ছিল, যা সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হতো 'পাটওয়ারী' ও 'কানুনগো'র মধ্যে ('আইন',

পয়সা আদায় করবে।[১১] চাষবাসে উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রশাসন যখন 'তকাবী' ঋণ দিল তখনও মোড়লদের মাধ্যমেই এই ঋণ চাষীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল এবং নিঃসন্দেহে চাষীদের টাকা দেওয়ার আগে মোড়লরা নিজেদের কমিশন কেটে নিত।[১২] এই সমস্ত কাজকর্মের মাধ্যমে বা এদের থেকে 'মুকদ্দম'-এর বিভিন্ন পাওনার সুযোগ ছাড়াও সে কিছু প্রথাগত দস্তুরি আদায় করত। যেমন, গ্রামের তহবিল থেকে তার খাবারদাবার বা 'খুরাক' এবং প্রত্যেক চাষীর থেকে 'মুকদ্দমী' নামে একটি কর।[১৪]

১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০)। আকবরের আমল থেকে শুরু করে 'মদদ-এ মআশ'-এর দলিলপত্রে প্রাপকদের জন্য ছাড়-দেওয়া শুল্কের তালিকায় প্রায়ই 'সদ-দোই-এ কানুনগোই' ছাড়াও 'দহ্‌নীমী' নামে পরিচিত এক বা একাধিক শুল্ক থাকত। 'দহ্‌-নীমী' মানে দশের অর্ধেক অর্থাৎ পাঁচ শতাংশ (এলাহাবাদ, ২য় খণ্ড, ২৩, ১৫৭৮ সালে আকবরের জারি করা ফরমান। এখানে 'দহ্‌-নীমী' আর 'মুকদ্দমী'কে পরস্পরের থেকে আলাদা করে রাখা আছে। কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমল থেকে দুটিকে সবসময় জোড়ে দেখা যায়)। Add. 6603, পৃ. ৬১ খ-তে 'দহ্‌-নীমী-কে বলা হয়েছে 'মুকদ্দম'-এর ভাগ, যার পরিমাণ ছিল গ্রাম থেকে মোট আদায়ের পাঁচ শতাংশ। 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৪০ খ, ৪৪ ক-তে যে-নমুনা হিসেব দেওয়া আছে সেখানে আদায়ীকৃত রাজস্বের ('হসবুল ওউসুল') প্রতি হাজার টাকা থেকে ১৬ টাকা ১৪ আনা হারে 'মুকদ্দম'দের ইনাম ('ইনাম-এ মুকদ্দমী') কেটে নেওয়ার ('মুজরা') অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মনে হয়, মুকদ্দম' যে পাঁচ শতাংশের অর্ধেক পেত, তা ছিল নেহাৎই নামমাত্র, এবং অঞ্চলভেদে আসল হারের তারতম্য হতো।

১১. আব্বাস খান, পৃ ১১ খ-১২ ক, ১০৬ ক; রসিকদাসকে আওরঙ্গজেবের ফরমান, অনুচ্ছেদ ৬। গ্রামগুলির ওপর বড় অঙ্কের রাজস্ব ছাড় দেওয়ার ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখানো হয়নি ঐ একই কারণে যে মোড়লরা চাষীদের সেই ছাড়ের সুবিধা দেবে না। ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৪র্থ অংশ দ্রষ্টব্য।

১২. ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৮ম অংশ দ্রষ্টব্য।

১৩. আগের অংশে যে তিনটি গ্রামের হিসেব পরীক্ষা করা হয়েছে তার প্রত্যেকটিতেই 'খুরাক-এ মুকদ্দমান'কে 'খরজ-এ দেহ্‌' খাতের একটি খরচ বলে দেখানো আছে। তার দুটি হিসেবে এই খরচ খুব অল্প, দাখিল-করা রাজস্বের একের-তিন শতাংশেরও কম। 'সিয়াকনামা'-তে এটি অবশ্যই তিন শতাংশের বেশি, কিন্তু এর মধ্যে অন্য খরচও থাকতে পারে, যেমন, 'পাটওয়ারী'র ভাতা, যার জন্য হিসেবে কিছু ধরা ছিল না। 'খুরাক' মানে খাবার বা খোরাকি এবং এও সম্ভব যে মোড়ল যখন গ্রামের কাজে গ্রামের বাইরে যেত তখন তার খাওয়াদাওয়া বাবদ যা লাগত, বোধ হয়, এই নামের খরচ থেকে তা মেটানো হতো।

১৪. টীকা ১০-এ যেরকম উল্লেখ করা হয়েছে; ১৭ শতকের ফরমানগুলিতে 'মদদ-এ মআশ'-এর মালিকদের ছাড় দেওয়া শুল্কের তালিকায় 'মুকদ্দমী'কে 'দহ্‌-নীমী'র সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে (যুক্তরূপটি হলো 'দহ্‌-নীমী ও মুকদ্দমী')। 'দহ্‌-নীমী' আসলে শুল্ক নয়, এটি আদায়ীকৃত রাজস্ব থেকে কেটে নেওয়া ('মুজরা') হতো, 'আর 'মুকদ্দমী' যে প্রত্যেক চাষীর উপর চাপানো একটি সত্যিকারের শুল্ক—এই ধারণাটি পুরোপুরি অনুমাননির্ভর।

গ্রামের ওপর 'মুকদ্দম'-এর কেবল আর্থিক এক্তিয়ারই ছিল না। তার গ্রামের মধ্যে অথবা কাছাকাছি অঞ্চলে কোন অপরাধ হলে তাকেই জবাবদিহি করতে হতো। বিশেষ করে ডাকাতি হলে বা পথিক খুন হলে অপরাধীদের হাজির করা ও চুরি-যাওয়া মালপত্র উদ্ধারের দায়িত্বও ছিল তার।[১৫] এই অবস্থায় "কোন গরীবের ওপর [দায়িত্ব] চাপিয়ে যাতে সে (নিজে) ছাড়া পায়"[১৬] এই প্রলোভন নিশ্চয়ই তার কাছে প্রায়ই দুর্নিবার হয়ে উঠত। তার গ্রামের গরীব অংশকে দাবিয়ে রাখতে 'মুকদ্দম'-এর হাতে এটি ছিল আরেকটি অস্ত্র।

শেষত, চাষ করতে রাজি এরকম লোকদের মধ্যে গ্রামের অনাবাদী জমি বিলি করার দায়িত্ব ছিল 'মুকদ্দম'-এর।[১৭] 'মুকদ্দম'দের ওপর নতুন গ্রাম পত্তনের ভার দেওয়ার পর এই অধিকার কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছিল প্রচ্ছন্নভাবে।[১৮] সম্ভবত দখলীকৃত জমির ব্যাপারে মোড়লরা হস্তক্ষেপ করতে পারত না, যদিও একটি ক্ষেত্রে দুজন জমির মালিকের সীমানা সংক্রান্ত বিরোধে আমরা তাকে সালিশী করতে দেখি।[১৯]

১৫. এই উপায়ে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য শের শাহ্ যে সাদাসাপ্টা ব্যবস্থা নিতেন, তা সকলেরই জানা। আব্বাস খান, পৃ. ১১০-১১১ ক-এ এর বিশদ বর্ণনা আছে। মুঘল প্রশাসনও মূলত এই ব্যবস্থাই চালিয়ে গিয়েছিল। উদাহরণত. একটি ইংরেজ জাহাজের ধ্বংসাবশেষ কীভাবে লুঠ করা হয়েছিল 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬২২-২৩', পৃ. ২৫০-৫২, ২৫৩-৫৪-তে তার বিবরণ দ্রষ্টব্য। দোষীদের খুঁজে বের করা ও লুটের মাল উদ্ধারের জন্য সন্দেহভাজন গ্রামের 'মুকদ্দম'কে তৎক্ষণাৎ তলব করা হতো। বালকৃষণ ব্রাহ্মণের সংগ্রহ, পৃ. ৩৩ ক-খ-এর একটি চিঠিতে একজন অজ্ঞাত পদের কর্মচারীকে বলা হয়েছে একটি গ্রামের 'মুকদ্দম'কে শাস্তি দিতে। ঐ গ্রামের কয়েকজন আরেকটি গ্রামে বিনা অনুমতিতে ঢুকে সেখানকার রাজস্ব-রক্ষকদের মারধোর করে। শেষত, 'সিয়াকনামা', ৬৯-এ রাজপথের ('শাহ্‌রাহ্') ধারে অবস্থিত গ্রামগুলির 'মুকদ্দম'দের কাছ থেকে নেওয়া একটি মুচলেকার খসড়া পাওয়া যায়। তারা কথা দেয় যে তাদের এলাকায় কোন চুরি বা ডাকাতি হলে তারাই দোষী সাব্যস্ত হবে। তারা এও অঙ্গীকার করে যে চুরি-যাওয়া মালপত্র হয় উদ্ধার করা হবে নয় ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

১৬. জনৈক 'মুকদ্দম'-এর প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে। একটি ইংরেজ জাহাজ লুটের সঙ্গে তার যোগসাজস আছে বলে সন্দেহ করা হয়েছিল ('ফ্যাক্টরিস, ১৬২২-২৩', পৃ. ২৫৪)।

১৭. "যদি কেউ কোনো জমি চাষ করতে চায়, তাহলে সে গ্রামের মোড়লদের (যাদের 'মুকদ্দম' বলে) কাছে গিয়ে যে-জায়গা তার পছন্দ সেখানে যতটা ইচ্ছা জমি চায়। এই আবেদন কদাচিৎ নামঞ্জুর হয়, বরং সর্বদাই অনুমোদন পায়।" (গেলেইনসেন, *JIH*, খণ্ড ৪, পৃ. ৭৮-৭৯। দ্য লেৎ ৯৫-তে এই অংশের অনেক অর্থবিকৃতি ঘটেছে)। গেলেইনসেনের বক্তব্য নির্দিষ্টভাবে গুজরাট প্রসঙ্গে।

১৮. নতুন গ্রাম পত্তনের জন্য মুর্শিদ কুলী খান যেভাবে 'মুকদ্দম' নিয়োগ করেছিলেন, তার জন্য এই অংশের টীকা ৭ দ্রষ্টব্য।

১৯. Allahabad 1197. পদাধিকার বলে নয়, দুপক্ষ তাকে সালিশ মানার জন্যই 'মুকদ্দম' এই মধ্যস্থতা করেছিল।

ভূমি-রাজস্বের চাপে যে গ্রাম একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়নি, সেখানে 'মুকদ্দম'-এর পদটি ছিল লাভজনক। পয়সাওয়ালা লোকেরা তাদের টাকা খাটানোর ভালো জায়গা হিসেবে এই পদ কিনতে চাইত—এরকম সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে। অযোধ্যার একটি দলিলে দেখা যায়, নিঃসন্দেহে একজন বহিরাগত লোক ২৩০ টাকার (তখনকার দিনের পক্ষে বেশ ভালো অঙ্ক) বিনিময়ে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পুরনো সব 'মুকদ্দম' কিনে নিয়েছে।[২০] অন্য এক জায়গায় দেখা যায়, তিনজন শহরের লোক জানিয়েছে যে একটি সর্বস্বান্ত গ্রামের 'মুকদ্দম'-এর পদটি কেনার পর তারা গ্রামের পুনর্বাসনের জন্য 'প্রচুর টাকা' খরচ করেছে ও নিজেরা চাষীদের ৪০০ টাকা 'তকাবী' ঋণ দিয়েছে।[২১]

মোড়ল ও সাধারণ চাষীদের মধ্যেকার বৈষম্য এবং গ্রামশাসনের যে-পরিমাণ ক্ষমতা তার ছিল, মনে হয় তার বলে সে মাঝে মাঝেই জমিনদারের মতো কিছু অধিকারের দাবি বা দখল করতে চাইত। আওরঙ্গজেবের আমলের দুটি দলিলে আমরা দেখি 'মুকদ্দমী'কে 'সতারাহী' এবং 'বিসবী' বা 'বিস্বহা'-র সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এগুলি ছিল একেবারেই জমিনদারী স্বত্বের চিহ্ন।[২২] সুতরাং এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, ১৮ শতকের একটি কোষগ্রন্থে "একটি গ্রামের মালিক" বলে 'মুকদ্দমী'-র সংজ্ঞা দেওয়া হয়। জমিনদারের সঙ্গে হয়তো তার এইটুকুই তফাৎ ছিল যে জমিনদারের দখলে থাকত একাধিক গ্রাম।[২৩]

কার্যত, 'রাইয়তী' অঞ্চলে 'মুকদ্দম' তাই কালক্রমে জমিনদারের মতোই অধিকার ভোগ করতে পারত। কিন্তু যেসব গ্রামে জমিনদারের একচ্ছত্র অধিকার ছিল, সেখানে 'মুকদ্দম'-এর অবস্থা ছিল একেবারেই আলাদা। ১৬৬২ সালে একটি গ্রামের জমিনদারি সংক্রান্ত বিরোধের এক নথিতে এক পক্ষের অভিযোগ ছিল: অন্য পক্ষ গ্রামের "পুরনো মুকদ্দম"কে তাড়িয়ে দিয়েছে, আর বাদীপক্ষের জবাব হলো: যার সঙ্গে ঐ রকম ব্যবহার করা হয়েছে, সে হচ্ছে তার 'কারিন্দা' (প্রতিনিধি) এবং গ্রামের পুরুষানুক্রমিক জমিনদার হিসেবে লোকটিকে তাড়ানোর পূর্ণ অধিকার তার আছে।[২৪] মামলার শুনানি হওয়ার পর রাজস্ব- ও বিচার-বিভাগীয় কর্মচারীরা বাদীপক্ষের অনুকূলেই রায় দিয়েছিল। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় মোড়লকে জমিনদারের কর্মচারী

২০. Allahabad 1183. এই দলিলের বিষয়বস্তুর ওপর এই অংশের ২৪ টীকায় মন্তব্য করা হয়েছে।

২১. 'দুর-আল উলূম', পৃ. ৫৫ ক-খ।

২২. Allahabad, 295; 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ১২৭ খ, Bodl. পৃ. ৯৮ খ; Ed. 98. (Bodl. পাণ্ডুলিপিতে নথিটির সূত্রপাত "'মুকদ্দমী' এবং 'জমিনদারী' বিষয়ে নালিশ" এই শিরোনামে)।

২৩. Add. 6003, পৃ. ৮১ ক। ঐ একই পৃষ্ঠায় 'মুকদ্দম'-কে বলা হয়েছে "চাষীদের মধ্যে অগ্রগণ্য লোক"।

২৪. Allahabad, 375. গ্রামটি ছিল অযোধ্যার সানডিলা পরগনায়।

হিসাবেই গণ্য করা হতো ও তার চাকরি জমিনদারের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করত। সুতরাং, বৃটিশ আমলে জমিনদারীর বিস্তৃতি মোড়লদের ক্ষমতাকে একেবারেই দাবিয়ে রেখেছিল ও অনেক জায়গায় শুধু নামমাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[২৫]

আগেই কয়েকবার গ্রামের হিসাবরক্ষক বা 'পাটওয়ারী'র কথা বলা হয়েছে।[২৬] তার পদ ছিল বহুদিনের। আলাউদ্দীন খলজীর প্রশাসনিক ব্যবস্থার বর্ণনায় তার নাম পাওয়া যায়।[২৭] আবুল ফজল-এর কথা অনুযায়ী 'পাটওয়ারী'র কাজ ছিল গ্রামের 'আয়ব্যয়ে'র হিসেব রাখা।[২৮] প্রত্যেক চাষীর থেকে ভূমিরাজস্ব আদায় ও কর্তৃপক্ষের কাছে তা দাখিল করার হিসাবপত্র রাখার জন্যই বিশেষভাবে তার প্রয়োজন ছিল।[২৯] গ্রামের বা প্রত্যেক চাষীর উপর ধার্য রাজস্ব পরিমাণের 'পাট্টা' বা দলিলপত্র নিয়ে তার কাজকর্ম বলেই সম্ভবত তার এই নাম হয়েছিল।[৩০] সাধারণত 'পাটওয়ারী' 'হিন্দবী' বা আঞ্চলিক ভাষায় 'বহী' বা 'কাগজ-এ খাম' নামে পরিচিত তার হিসাবপত্র লিখে রাখত।[৩১] 'পাটওয়ারী' যে গ্রামবাসীদের কর্মচারী ছিল, এই মন্তব্যের জন্য আবুল ফজল-ই আবার আমাদের প্রামাণ্য সূত্র।[৩২] আমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারি যে, যেখানেই গ্রাম-সমাজের অস্তিত্ব ছিল সেখানেই সে তার কর্মচারী হিসেবে কাজ করত। গ্রামের হিসেবের যে সব নমুনা-বিবরণ আমাদের কাছে আছে সেখানে তার ভাতাকে গ্রামের তহবিল থেকে "গ্রামের খরচ" খাতে দেখানো হয়েছে।[৩৩]

২৫. তুলনীয় ডব্লু. সি. বেনেট, 'চীফ ক্ল্যান্‌স্ অফ দা রায়বেরিলী ডিস্ট্রিক্ট', লখনউ, ১৮৭০, পৃ. ৬৬-৭।

২৬. উত্তর ভারতে সবসময়ই 'পাটওয়ারী' শব্দটি ব্যবহার করা হতো। এই একই অর্থে দখিনে কুলকর্ণী ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৬) ও ওড়িশায় 'ভোই' (*JASB*, N. S., খণ্ড ১২, ১৯১৬, পৃ. ৩০) শব্দদুটি চালু ছিল।

২৭. বারানী, 'তারিখ্-এ ফিরুজশাহী', বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা, পৃ. ২৮৮-৮৯ ;

২৮. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০।

২৯. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮২-৩ (Add. 27,247, পৃ. ৩৩২ ক-খ) এবং পৃ. ৪৫৭ ; 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৬-৮৮।

৩০. 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৩ খ, ৭৫ ক, Or. 2026, পৃ. ২২ খ-২৩ ক ; 'দুর-আল উলুম' পৃ. ৬২ ক ; 'ফরহাঙ্গ-এ কারদানী', পৃ. ৩৫ ক ; Allahabad 177, 897, 1206। 'পাট্টা' শব্দের সংজ্ঞা বিষয়ে উইলসন-এর 'গ্লসারি অফ জুডিশিয়াল অ্যাণ্ড রেভিনিউ টার্মস্' ইত্যাদি, পৃ. ৪০৮ দ্রষ্টব্য। মরাঠী 'পট' (যার অর্থ রেজিস্টার বা নথিপত্র) থেকে উইলসন (ঐ, পৃ. ৪০৬) 'পাটওয়ারী' শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনিও স্বীকার করেছেন যে এই অর্থে 'পট' শব্দটি হিন্দীতে পাওয়া যায় না এবং 'পাটওয়ারী' শব্দটি মহারাষ্ট্রে চলে না।

৩১. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৭ ; 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৯ ; রসিকদাসকে দেওয়া আওরঙ্গজেবের ফরমান, অনুচ্ছেদ ১১ ; 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৯১ খ, Or. 2026, পৃ. ৫৯ ক-খ ; Add. 6603, পৃ. ৫২ ক-খ

৩২. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০।

৩৩. 'দস্তুর-আল আমল-এ আলমগীরী', পৃ. ৪১ খ-৪২ খ-তে এই ভাতা-র নাম 'কাগজ-এ

কিন্তু তার কাজের জন্য প্রশাসনও তাকে কিছু পারিশ্রমিক দিত। আকবরের আমলে গ্রামের রাজস্বের এক শতাংশ কমিশন তার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল।[৩৪]

যেখানেই গ্রাম-সমাজ দুর্বল হয়ে পড়েছিল ও 'মুকদ্দম'-এর ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল, সেখানে 'পাটওয়ারী' কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো তা বলা শক্ত। তবে, অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে, ছোট চাষীদের উপর অত্যাচার করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা 'পাটওয়ারীর'ও ছিল।[৩৫] সম্ভবত গ্রাম-সমাজ থেকে তার বিচ্ছিন্নতা এবং একই সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার লক্ষণীয় যোগাযোগের ফলে বৃটিশ রাজত্বের সময় সে পুরোপুরি সরকারী কর্মচারীতে পরিণত হতে পেরেছিল।

পাটওয়ারী', যেন এর উদ্দেশ্য ছিল কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় কাগজের খরচ মেটানো। 'খুলাসতুস সিয়াক'-এ 'পাটওয়ারী'র জন্য দুটি আলাদা ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটি হলো 'ফসলানা' ('ফসল' থেকে), আরেকটি 'খুরাক' (আক্ষরিক অর্থে: খাবার)।

৩৪. 'সদ-দোই-এ কানুনগোই' (কানুনগোর শতকরা দু ভাগ কমিশন) নামে এক কমিশনের অর্ধেক তার প্রাপ্য ছিল। ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০)।

৩৫. রসিকদাসকে দেওয়া আওরঙ্গজেবের ফরমানের অনুচ্ছেদ ৬ দ্রষ্টব্য। অনুচ্ছেদ ৯-এ তাকে 'রেজা রাইয়ত' বা ছোটচাষীদের সঙ্গে না রেখে 'চৌধুরী', 'কানুনগো, ও 'মুকদ্দম'-এর সঙ্গে রাখা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

জমিনদার

১. জমিনদারী স্বত্বের স্বরূপ

আধুনিক ভারতীয় প্রয়োগে 'জমিনদার' বলতে বোঝায় জমির মালিক। আধুনিক জমিনদার পুরোপুরি বৃটিশ শাসনের সৃষ্টি কিনা এ প্রশ্ন নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে। এই বিতর্ক (যার সঙ্গে এখানে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই) থেকে আরও প্রশ্ন উঠেছে : মুঘল যুগের লেখাপত্রে ব্যবহৃত 'জমিনদার' কথাটি আজকের অর্থই বোঝাত কিনা। দুর্ভাগ্যবশত, এই শব্দটির অর্থ তখন কী ছিল—সে বিষয়ে কি 'আইন-এ আকবরী', কি আরও সহজলভ্য কোন ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র কোথাওই সরাসরি কোন ব্যাখ্যা দেওয়া নেই। সাম্প্রতিক ব্যাখ্যাগুলি তাই খুবই কম মালমশলা থেকে পাওয়া অনুমানের মতো। মনে হয়, সাধারণভাবে গৃহীত মত এই যে, মুঘল আমলে 'জমিনদার' বলতে আসলে বোঝাত সামন্ত প্রধান, আর সাম্রাজ্যের যে-অংশগুলি প্রত্যক্ষভাবে প্রশাসনের আওতায় ছিল সেখানে তার কোন অস্তিত্বই থাকতে পারে না।[১]

সমসাময়িক তথ্যসূত্রে প্রায়শই 'জমিনদার' কথাটি যে সাধারণভাবে 'প্রধান'দের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।[২] কিন্তু এই ধারণা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে : এটিই তার সামগ্রিক, বা এমনকি প্রকৃত অর্থ কিনা। কিন্তু এও দেখানো

১. আধুনিক লেখকদের মধ্যে সম্ভবত মোরল্যাণ্ডই প্রথম এই মতের প্রবক্তা ('এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', ১২২, ২৭৯)। তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন যে বাংলায় হয়তো 'জমিনদার' শব্দটির আরও ব্যাপক অর্থ ছিল (ঐ, ১৯১-৪)। তিনি এও দেখিয়েছেন যে অযোধ্যার বিভিন্ন অংশের প্রধান, তাদের গোষ্ঠী ও বীরত্বের স্থানীয় কিংবদন্তীর সঙ্গে তিনি যেভাবে 'আইন' পড়েছিলেন তা মেলানো শক্ত (ঐ, ১২৩)। ডঃ শরণের মনে অবশ্য এ জাতীয় কোন সন্দেহ কখনওই জাগেনি। তিনি জমিনদার-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন মোরল্যাণ্ডের ধরনেই ('সামন্ত-প্রধান'); আর সাম্রাজ্যের সব জায়গাতেই যে জমিনদার দেখা যেতে পারত এমন ধারণাকে তিনি "উদ্ভট" বলে উড়িয়ে দিয়েছেন ('প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেণ্ট' ইত্যাদি, ১১১ এবং টীকা)।

এ কথা ঠিক যে, ১৭-১৮ শতকে লেখা দুটি প্রামাণ্য ফার্সী অভিধান 'ফরহঙ্গ-এ রশীদী' (দ্র. 'মর্জবান') এবং 'বাহার-এ আজম' (দ্র. 'জমিনদার')-এ, 'জমিনদার' এবং 'মর্জবান' শব্দদুটি সমার্থক ধরা হয়েছে ; দ্বিতীয়টির অর্থ 'প্রধান'। কিন্তু পারিভাষিক শব্দ এই অভিধান দুটির বিবেচ্য ছিল না। উপরন্তু 'জমিনদার' শব্দের ব্যবহার বোঝানোর জন্য 'বাহার-এ আজম'-এ যেসব কবিতার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে (সবই ভারতীয় কবিদের রচনা থেকে) তার মধ্যে একটি কবিতা আছে, যেখানে ফরহাদ এবং মজনুন সম্পর্কে ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে কারণ, প্রথমজন ছিলেন নেহাৎই খেটে-খাওয়া লোক এবং দ্বিতীয়জন 'জমিনদার'। তাহলে, মহান্ প্রেমিক মজনুন কি 'সামন্ত প্রধান' ছিলেন ?

২. এই অধ্যায়ের ৪র্থ অংশ দ্রষ্টব্য।

যায় যে, নিয়মিত প্রশাসনভুক্ত অঞ্চলেও তথাকথিত 'জমিনদার'দের অস্তিত্ব ছিল, কখনওই শুধু করদ রাজ্যগুলির মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিল না। সামন্ত প্রধান ও জমিনদারের অভেদ-সম্পর্ক খণ্ডন করার এটিই সবচেয়ে সহজ উপায়। শুধু 'আইন-এ আকবরী'-র নজিরই এই তথ্য প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে যথেষ্ট। এতদিন পর্যন্ত ব্যাপারটি স্পষ্ট না হওয়ার কারণ এই যে ব্লখমান-কৃত 'আইন'-এর প্রামাণ্য সংস্করণের একটি ভুল কারও নজরে পড়েনি। এই ভুলের দরুন পরিসংখ্যানগত তথ্যের মারাত্মক ভুল উপস্থাপনা হয়েছে।[৩] সবচেয়ে ভালো পাণ্ডুলিপিগুলিতে "বারোটি প্রদেশের বিবরণ"-এ প্রদত্ত পরিসংখ্যান মূলে সারণির আকারে দেওয়া ছিল। ব্লখমান-এর সংস্করণে, সম্ভবত ছাপার সুবিধার জন্য, সেটি হুবহু সেইভাবে দেওয়া হয়নি। ব্লখমান শুধু মূল সারণির স্তম্ভগুলিকেই বাদ দেননি, বিনা ব্যাখ্যায় স্তম্ভ-শীর্ষকও বাদ দিয়েছেন। তাই তাঁর পাঠকদের জানার কোন উপায়ই নেই যে প্রতি পরগনার পাশে যে সব 'কওম' [গোষ্ঠী, জাত]-এর নাম দেওয়া আছে, সেগুলি আসলে 'জমিনদার' (বা পাণ্ডুলিপিতে কখনও কখনও 'বূমী')-শীর্ষক একটি স্তম্ভের।[৪] কার্যত বাংলা, বিহার, ওড়িশা, বেরার ও খান্দেশ—এই পাঁচটি প্রান্তিক প্রদেশ ছাড়া, সরাসরি প্রশাসনভুক্ত অঞ্চলের প্রত্যেক পরগনা সম্বন্ধেই এই স্তম্ভের নীচে কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। শুধু এই পাঁচটি প্রদেশ এবং অন্যান্য প্রদেশের করদ প্রধান-শাসিত অঞ্চলে 'পরগনা'-র পাশে কিছু লেখা নেই। সাধারণত, গোটা 'সরকার'-এর ক্ষেত্রেই জমিনদারদের বিভিন্ন 'কওম' নির্দিষ্ট করা আছে।[৫]

৩. মনে রাখতে হবে যে ব্লখমানের সংস্করণ, বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা, কলকাতা, ১৮৬৭-৭৭, বেআইনীভাবে ছেপেছিল নবল কিশোর প্রেস এবং ১৮৮২ ও ১৮৯৩-এর সংস্করণদুটি (যেগুলির পাঠকসংখ্যা সম্ভবত আরও বেশি ছিল) ব্লখমানের সংস্করণের হুবহু পুনর্মুদ্রণ। সুতরাং পরিসংখ্যান অংশের ভুলগুলিও বিশ্বস্তভাবে ছাপা হয়েছে। সৈয়দ আহ্‌মদ সম্পাদিত 'আইন'-এর (১৮৫৫) দ্বিতীয় খণ্ডটি আর বেরোয়নি (যেখানে এই পরিসংখ্যান থাকার কথা)।

৪. মূল সারণিগুলিতে আটটি স্তম্ভ আছে, শীর্ষকগুলি এই : 'পরগনাৎ' (পরগনা), 'কিলা' (দুর্গ), 'নক্‌দী' (নগদ টাকায় নির্দিষ্ট রাজস্ব), 'সুয়ূরগাল' (রাজস্ব- ও নগদ-অনুদান), 'জমিনদার' (বা 'বূমী'), 'সওয়ার' (ঘোড়সওয়ার বাহিনী) এবং 'পিয়াদা' (পদাতিক)। ব্লখমানের সংস্করণে 'সুয়ূরগাল', 'সওয়ার' এবং 'পিয়াদা' ছাড়া বাকি সবই বাদ গেছে। সংক্ষেপে এগুলির শুধুমাত্র আদ্যক্ষর এবং প্রতি 'পরগনা'র নামের পাশে সেই পরগনার অঙ্কগুলি দেওয়া আছে।

মূল সারণিগুলির ক্ষেত্রে ব্লখমানের হাতে যে-বিভ্রান্তির সূচনা জ্যারেটের 'আইন'-অনুবাদে তা আরও বেড়েছে (২য় খণ্ড, সম্পা. যদুনাথ সরকার, পৃ. ১২৯ ইঃ)। তিনি আরও খামখেয়ালীভাবে স্তম্ভ ও শীর্ষকগুলির পুনর্বিন্যাস করেছেন। 'জমিনদার' শীর্ষকটির জায়গায় তিনি বসিয়েছেন 'কাস্ট্‌স্‌' (জাত) এবং মূল সারণির স্তম্ভের ষষ্ঠ স্থান থেকে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন একেবারে শেষে; আর ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক স্তম্ভদুটির অঙ্কগুলিকে বসিয়েছেন "রাজস্ব" স্তম্ভের ঠিক পরে।

৫. 'প্রসিডিংস্‌ অফ দি ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস', ২১তম অধিবেশন, ত্রিবান্দ্রম, ১৯৫৮, পৃ. ৩২০–২৩-এ আমার প্রবন্ধ 'জমিনদারস্‌ ইন দি আইন' দ্রষ্টব্য।

১৬ ও ১৭ শতকের প্রচুর দলিল-দস্তাবেজ, যেমন বিক্রয়-কোবালা, সরকারী কাগজ-পত্র ও অন্যান্য নথি ইত্যাদি থেকেও 'আইন'-এর নজিরের সমর্থন পাওয়া যায়। এখানেও দেখি, মুঘল সাম্রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই, আগ্রা, দিল্লী, পাঞ্জাব, আজমীর (বাদশাহী অঞ্চল) এবং বিশেষ করে অযোধ্যায়, জমিনদারী স্বত্ব ছিল; আরও দূরের প্রদেশ, যেমন বাংলা, বিহার এবং গুজরাটের কথা বলাই বাহুল্য।[৬] জোর দিয়েই বলা যায় যে, এখনও যেসব নথিপত্র আছে সেগুলি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলে জমিনদারদের অস্তিত্ব ধরা পড়বেই।

'জমিনদার' শব্দটিকে যদি 'সামন্ত প্রধান' অর্থে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব না হয়, তাহলে নতুন করে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে এই নামধারীদের অবস্থা ও অধিকার, বিশেষ করে সরাসরি বাদশাহী প্রশাসনের এলাকায়, কী ছিল।

আগেই দেখা গেছে, আমাদের ইতিহাসগুলোয় না আছে জমিনদারীর কোন সংজ্ঞা, না এর মূল উপাদানগুলির কোন বিবরণ। আক্ষরিকভাবে, 'জমিনদার' এই ফার্সী যৌগিক শব্দটির অর্থ: 'যার জমি আছে'। শব্দটি ভারতে তৈরি হয়েছিল অনেক আগে, ১৪ শতক নাগাদ;[৭] খোদ পারস্যের রাজস্ব-সংক্রান্ত নথিপত্রে শব্দটি পাওয়া যায় না।[৮] আবুল ফজল প্রায়ই 'বূমী' বলে জমিনদারের সমার্থক আরেকটি ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন। অন্যান্য লেখকরা কদাচিৎ এটি প্রয়োগ করেন। আক্ষরিক দিক থেকে এটি 'জমিনদার'-এর সমার্থক ('বূম': অর্থাৎ জমি)। পারস্যে এই শব্দটিও কোন পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার হতো বলে মনে হয় না।[৯] এই দুটি

৬. এ বিষয়ে এত তথ্যপ্রমাণ আছে যে নির্দিষ্ট কয়েকটির উল্লেখ না করলেও চলে। তার খুব একটা প্রয়োজনও নেই, কারণ উল্লিখিত সমস্ত অঞ্চলের 'জমিনদার'-সংক্রান্ত নথিপত্র থেকে এই অংশের নানান প্রসঙ্গে উদ্ধৃতি দেওয়া হবে। অযোধ্যার আগে 'বিশেষ করে' শব্দটি বসিয়েছি শুধু এই কারণে যে, ঐ অঞ্চল থেকে পাওয়া বহু জমিনদারী নথিপত্র আমি নিজে এলাহাবাদের উত্তরপ্রদেশ নথিপত্র দপ্তরে দেখেছি। তার মানে এই নয় যে অযোধ্যায় জমিনদারের সংখ্যা অন্যান্য জায়গার চেয়ে বেশি ছিল বা ঐ অঞ্চলে জমিনদারী প্রথা আরও ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

৭. ১৪ শতকের সবচেয়ে সুপরিচিত দুজন ঐতিহাসিক, বরানী এবং আফিফ এই শব্দদুটি ব্যবহার করেছেন। মোরল্যাণ্ড, 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', ১৮ এবং টীকা দ্রষ্টব্য।

৮. এ. কে. এস. ল্যামটন-এর 'ল্যাণ্ডলর্ড অ্যাণ্ড পিজান্টস্ ইন্ পার্সিয়া', লণ্ডন, ১৯৫৩-এর শেষে, পৃ. ৪২২ ইত্যাদি, 'ভূমিস্বত্ব এবং রাজস্ব-প্রশাসন' সংক্রান্ত যে-পরিভাষাকোষ আছে, সেখানে 'জমিনদার' শব্দটি নেই। কেবলমাত্র ফার্সী শব্দের প্রামাণ্য অভিধান (১৭ শতক) 'ফরহঙ্গ-এ রশিদী'-তে শব্দটি নিজের জায়গায় নেই, তবে 'মর্জবান' শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এটি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু, যতই হোক, 'ফরহঙ্গ-এ রশিদী' ভারতেই সঙ্কলন করা হয়েছিল। 'বহার-এ আজম'-এ শব্দটি গৃহীত হলেও, এর প্রয়োগ বোঝাতে শুধু ভারতীয় কবিদের রচনাই উদ্ধৃত হয়েছে।

৯. 'বূমী' শব্দটি প্রাচীন ফার্সীতে কখনও ব্যবহার হয়নি বলেই মনে হয়। আবুল ফজল এবং তাঁর সমসাময়িকের মুখে নিঃসন্দেহে এটি ছিল অপ্রচলিত কথার প্রয়োগ। 'ফরহঙ্গ-এ রশিদী' বা 'বহার-এ আজম'-এ এর উল্লেখ নেই, ল্যামটনের পরিভাষাকোষেও পাওয়া যায় না।

ফার্সী শব্দ, বিশেষ করে 'জমিনদার' বেশ চালু হয়ে গেলেও, অনেক স্থানীয় নাম টিঁকে ছিল। ধরা হতো, সেগুলি দিয়ে জমিনদারী স্বত্বই বোঝায়। অযোধ্যায় ছিল 'সতারহী' এবং 'বিশ্বী',[১০] আর বলা হয়েছে রাজস্থানে 'ভূমিয়া'রা ছিল জমিনদারদের যথার্থ প্রতিরূপ।[১১] এই তিনটি শব্দের প্রথমটির আক্ষরিক অর্থ অস্পষ্ট, দ্বিতীয়টি বোঝায় $\frac{১}{২০}$ ভাগ, যা এই মুহূর্তে আমাদের জ্ঞান বিশেষ বাড়ায় না।[১২] ব্যুৎপত্তিগত-ভাবে তৃতীয়টি ফার্সী শব্দ 'বূমী'-র ইন্দো-আর্য মূলের সঙ্গে অভিন্ন এবং একই জিনিস বোঝায়।[১৩] ১৭ শতকের শেষ দিকে, কার্যত সারা দেশ জুড়েই, 'তাল্লুক' এবং 'তাল্লুকদার' বলে এক নতুন শব্দগুচ্ছের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কতক জায়গায় 'জমিনদারী' ও 'জমিনদার'-এর বদলে এই নাম ব্যবহার করা হয়েছে। এদের যথার্থ তাৎপর্য নিয়ে পরে আলোচনা করা হবে (এই অধ্যায়ের তৃতীয় অংশে)। আপাতত, এই বলাই যথেষ্ট যে এদের উৎপত্তি হলো 'তাল্লুক' শব্দ থেকে, যার অর্থ 'সংযোগ'। সুতরাং, এই শব্দ দুটিরও বাইরের রূপ থেকে প্রকৃত অর্থ ধরা পড়ে না।

১০. দুটি শব্দই আকবরের আমলের বিক্রয়-কোবালায় পাওয়া যায় (Allahabad 317, ১৫৮৬ খৃ.)। ১৬৫০ খৃস্টাব্দের একটি নথিতে "'সতারহী' নামে 'বিশ্বী'" এই সূত্রটির প্রয়োগ দেখা যায়। অর্থাৎ দুটি শব্দ দিয়েই একই জিনিস বোঝাত। 'বিশী' বা 'বিশ্বী'-র চেয়ে 'সতারহী' অনেক বেশিবার এসেছে। কিন্তু, একমাত্র লখনউ এর আশপাশের এলাকায়, বিশেষ করে সাণ্ডিলার নথিপত্রে দুটি শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। বাহ্‌রাইচ 'সরকার'-এর নথিপত্রে কথা দুটি পাওয়া যায় না। 'বিশ্বী'-র সঙ্গে জমিনদারী-কে সরাসরি এক করে দেখা হয়েছে এমন কোন নজির নেই। কিন্তু ১৮ শতকের দুটি দলিলে 'সতারহী'কে স্পষ্টতই জমিনদারীর সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে। সেখানে সূত্রটি হলো "'সতারহী' নামে পরিচিত 'মিলকিয়ৎ' ও 'জমিনদারী'" (১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের Allahabad 457; Allahabad 362)। আরও আগের একটি দলিল, ১৬৯৮-এর এক বিক্রয়-কোবালায় আরও ছোট একটি সূত্র "'সতারহী' নামে পরিচিত 'মিলকিয়ৎ'" ব্যবহার করা হয়েছে। এই সূত্রটি ভালোভাবেই খাপ খেয়ে যায়, কারণ এসব নথিপত্রে 'জমিনদারী' ও 'মিলকিয়ৎ' শব্দদুটি প্রায় বিনিময়যোগ্য।

১১. টড, 'অ্যানাল্‌স্‌ অ্যাণ্ড অ্যান্টিকুইটিস অফ রাজস্থান', লণ্ডন, ১৯১৪, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৩, ১৩৬ তুলনীয়।

১২. 'সতারহী' শব্দটি মনে হয় একেবারেই লুপ্ত হয়ে গেছে; এর ব্যুৎপত্তি আমি বের করতে পারিনি। 'বিশী' বা 'বিশ্বী'র (যার মূলে আছে 'বিশ' অর্থাৎ কুড়ি) সঙ্গে সাদৃশ্য অনুযায়ী এর উৎপত্তি 'সতের' (১৭) থেকে ধরে নিয়ে, শব্দটির অর্থ করা যায় $\frac{১}{১৭}$ ভাগ। কিন্তু এ বোধহয় নেহাৎই কষ্টকল্পনা।

১৩. 'ভূমিয়া' শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত 'ভূমি' থেকে। ফার্সী 'বূম'-এর মতো 'ভূমি' শব্দের অর্থ 'মাটি', 'জমি'। দুটি শব্দই খুব নিকট সম্পর্কের, মূলের আদি আর্য শব্দের সামান্য পরিবর্তিত রূপ। 'বূমী' শব্দটি যে স্থানীয় 'ভূমিয়া' শব্দের প্রভাবে ভারতেই তৈরি হয়েছিল এমন হওয়াই সম্ভব। জাহাঙ্গীরের আমলে লেখা সিন্ধুপ্রদেশের একটি ইতিহাস 'তারিখ-এ তাহিরী' (পৃ. ২৫ ক)-য় 'বূমিয়া' বলে একটি মধ্যবর্তী রূপ ব্যবহারও করা হয়েছে।

'জমিনদার'-এর সর্বাধিক ব্যবহৃত সমার্থক শব্দ হলো 'মালিক'। কোন কোন নথিতে 'জমিনদার'-কে সরাসরি 'মালিক' আখ্যা দেওয়া আছে।[১৪] ১৭ শতকের দুটি নথিতে একই স্বত্ব বোঝাতে 'মিলকিয়ৎ' (অর্থাৎ 'মালিক'-এর স্বত্ব) এবং 'জমিনদারী' শব্দ দুটি নির্বিশেষে ব্যবহার করা হয়েছে।[১৫] বহু নথিতেই দেখি একই স্বত্বের নাম হিসেবে একজোড়ে রাখা হয়েছে 'মিলকিয়ৎ ও জমিনদারী'।[১৬] অন্যান্য সমার্থক শব্দগুলির অর্থ অস্পষ্ট হলেও 'মালিক' একটি আরবী শব্দ। মুসলিম আইনে এটির নিজস্ব স্থান ও নির্দিষ্ট অর্থ (স্বত্বাধিকারী) আছে। সুতরাং, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'প্রাইভেট প্রপার্টি' (ব্যক্তিগত সম্পত্তি), 'মিলকিয়ৎ' মানে প্রায় তাই।

অবশ্য 'জমিনদারী' ছিল এক ধরনের 'মিলকিয়ৎ'—এ কথা বলা এক ব্যাপার, আর জমির ওপর 'মিলকিয়ৎ' নামের সমস্ত স্বত্বই ছিল জমিনদারী স্বত্ব—এমন মনে করা আরেক ব্যাপার। মুহম্মদ শাহ্‌র আমলের শেষ দিকে আনন্দ রাম মুখলিস নামে দিল্লী দরবারের জনৈক কর্মচারী 'জমিনদার' শব্দটির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, মনে হয় এটিই তার আসল কথা। "ব্যুৎপত্তিগতভাবে ('দর অসল') 'জমিনদার' বলতে বোঝায় কোন ব্যক্তি যিনি জমির অধিকারী ('সাহিব-এ জমিন'), কিন্তু এখন এর অর্থ দাঁড়িয়েছে : কোন ব্যক্তি যিনি গ্রাম বা শহরের জমির 'মালিক' এবং চাষবাস চালাচ্ছেন।"[১৭] জমির সাধারণ অধিকারী বা দখলিকার, আর কিছু সংখ্যক লোকের (অর্থাৎ, গ্রাম বা শহরের অধিবাসীর) দখলে-থাকা জমির ওপর যার স্বত্ব আছে এমন একজন—এখানে তফাৎ করা হয়েছে এই দুজনের মধ্যে। শুধুমাত্র দ্বিতীয় ধরনের লোকের ক্ষেত্রে 'জমিনদার' শব্দটি প্রযোজ্য। আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে চাষীদেরও সত্যিই কখনও কখনও 'মালিক' বলা হতো, কিন্তু মুখলিসের সংজ্ঞা অনুযায়ী তাদের 'জমিনদার' বলা চলে না। ঐ সময়ের নথিপত্রে জমিনদারী স্বত্বের অধীনস্থ এলাকার আকার যেভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তার থেকে এ-ই বেরিয়ে আসে যে জমিনদারীর সঙ্গে যোগাযোগ গ্রামের, জমির নয়। সর্বদাই বলা হয়েছে, জমিনদারীর আওতায় কোন গ্রাম বা গ্রামের অংশ-বিশেষ আছে, কখনওই এত বিঘা বা এলাকার নির্দিষ্ট একক নয়। জমিনদারী এলাকা বোঝাতে মাঝে মধ্যে 'বিশ্বা' বলে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা আসলে ঐ নামের এলাকার একক, অর্থাৎ এক বিঘার একের-কুড়ি ভাগ, বোঝায় না। এটি গ্রামের একের-কুড়ি ভাগের সূচক।[১৮]

১৪. ১৬৬৯-এর Allahabad 1192-তে "মালিক ও জমিনদার ও চৌধুরী" বলে এক শব্দগুচ্ছ আছে। Add. 6603, পৃ. ৭৯ ক-এ জমিনদারদের 'মালিকিয়ৎ', অর্থাৎ 'মালিক' হিসেবে তাদের অবস্থানের কথা বলা হয়েছে।

১৫. Allahabad 375 (১৬৬২ খৃ.) এবং Allahabad 323 (১৬৭৫ খৃ.)।

১৬. Allahabad 891, 1192, 1196, 1205, 1216, 1219, 1221, 1222, 1224, 1227 ইত্যাদি (সব কটি নথিই ১৭ শতকের)।

১৭. 'মিরাৎ-আল ইস্তিলাহ্', পৃ. ১৫৩ ক।

১৮. উদাহরণস্বরূপ, আকবরের আমলের 'সত্তারহী' এবং 'বিম্বী' স্বত্ব হস্তান্তর সংক্রান্ত একটি বিক্রয়-কোবালায় বলা হয়েছে যে "গোটা গ্রামই" এই দুই স্বত্বের আওতায় পড়ত। কিন্তু

সুতরাং, জমিনদারী ছিল চাষীকে বাদ দিয়ে তার ওপরতলার এক গ্রামীণ শ্রেণীর স্বত্ব। চাষীদের সঙ্গে এই শ্রেণীটির আসল সম্পর্ক কী ছিল সে বিষয়ে খোঁজ করার আগে একটি বিষয় লক্ষণীয় : সারা গ্রামাঞ্চল জুড়ে জমিনদারদের আধিপত্য ছিল না। প্রত্যেক জনপদেই, মনে হয়, এক বিরাট সংখ্যক গ্রামে কোন জমিনদারী স্বত্বই ছিল না। সুতরাং, জমিনদারী গ্রাম থেকে আলাদা করে তাদের বলা হতো 'রাইয়তী' বা 'চাষী-অধিকৃত' গ্রাম।

সাম্রাজ্যের সর্বত্র 'রাইয়তী' আর 'জমিনদারী' গ্রামগুলির মধ্যে এই পার্থক্য সুনির্দিষ্ট না হলেও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। শাহ্জাহানবাদ (দিল্লী) প্রদেশে লেখা একটি প্রশাসন-বিষয়ক পুস্তিকায় গ্রামের জমিকে 'খুদ-কাস্তা-এ জমিনদারান' (আক্ষরিক অর্থে : জমিনদারদের 'নিজে-চষা' জমি) এবং 'রাইয়তী'—এইভাবে ভাগ করা হয়েছে।[১৯] এলাহাবাদ প্রদেশে লেখা আরেকটি পুস্তিকায় পরগনার গ্রামগুলিকে 'তাল্লুক' (অর্থাৎ 'তাল্লুকদার'-এর অধীন) এবং 'রাইয়তী'—এইভাবে ভাগ করা আছে।[২০]

গুজরাটের ক্ষেত্রে এই ভাগাভাগির বিবরণ পাওয়া যায় ১৭৬১ নাগাদ লেখা নামকরা ইতিহাস 'মিরাৎ-এ আহ্‌মদী' থেকে। এই বিবরণে আরও অনেক আকর্ষণীয় বিষয় আছে, তাই এটি দীর্ঘ উদ্ধৃতির যোগ্য :

"খান-এ আজম-এর নবাবীর আমলে (১৫৮৮-৯২ খৃস্টাব্দ, আকবরের আমলে) অধিকাংশ পরগনার 'দেসাই', 'মুকদ্দম' এবং চাষীরা রাজদরবারে অভিযোগ করে যে সুবাদার ও জাগীরদার-এর প্রতিনিধিরা (নানারকম) উপশুল্কের ('আবওয়াব') মাধ্যমে সমস্ত খাজনা (বা উৎপাদন, 'ওয়াসিলাৎ') কেড়ে নিচ্ছে ; তারা এ-সব নিয়ে যাওয়ার পর রাজপুত, কোলি ও মুসলমানরা এসে গোলমাল পাকাচ্ছে, আবেদনকারীদের জমি ও উৎপন্ন দ্রব্য ('ওয়াসিল') তছনছ করে দিচ্ছে। এইভাবেই চাষীদের সর্বনাশ হয়, এবং সরকারী রাজস্ব কমে যাওয়ার কারণও এই। সুতরাং আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে …কোলি এবং অন্যান্যদের জমির একের-চার ভাগ আলাদা করে রাখা হবে, সেখান থেকে কোন খাজনা দাবি করা হবে না এবং তাদের কাছ থেকে সদাচরণের বিশ্বাসযোগ্য জামিন নিয়ে রাখতে হবে। সমস্ত গ্রাম ('দেহাত-এ দর-ও-বস্ত') এবং রাজশাসিত এলাকা ('মকানৎ-এ উমদা')-র জমিনদারদের ঘোড়া দাগিয়ে রাখতে হবে, যাতে প্রদেশকর্তার কাছে হাজির করার পর তারা সরকারের কাজে লাগতে পারে। 'বেচান' বলে যে জমি তারা বিক্রি করতে পারত, তার অর্ধেক রাজস্ব (মহ্‌সূল') তাদের নেওয়া

কয়েক লাইন পরে আবার যখন ঐ দুএর স্বত্বাধীন এলাকার উল্লেখ করা হয়েছে তখন এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, "উক্ত গ্রামের কুড়ি 'বিশ্বা'।" (Allahabad 317, ১৫৮৬ খৃস্টাব্দের)।

এই ধরনের প্রয়োগে, 'বিশ্বা' শব্দটি কখনও কখনও শুধু গ্রামের জমিনদারীর ভাগ বোঝাতেও ব্যবহার করা হয়েছে। তাই Allahabad 1191 (খৃ. ১৬৬৭)-য় "অর্ধেক গ্রামের জমিনদারীর 'বিশ্বা' ('বিশ্ব-হা')" ইত্যাদি পাওয়া যায়। আরও দ্রষ্টব্য 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ১২৭ খ ; Bodl. পৃ. ৯৮ খ ; Ed. ৯৮ ; 'দুর-আল উলুম', পৃ. ৪৮ ক (বাংলা), ৫৩ ক (বিহার) এবং ৬১ খ-৬২ ক।

১৯. 'দস্তুর-আল আমল-এ নভিসিন্দগী', পৃ. ১৮৩ ক।

২০. 'সিয়াকনামা', ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৫৩ ইত্যাদি।

উচিত। এই আদেশ কার্যকর হয়েছিল এবং সেই সময়ে দিনে-দিনে প্রদেশটির উন্নতি হতে থাকে।

গোপন করার কিছু নেই…যে, আগে যেমন বলা হয়েছে, পুরনো দিনে গুজরাট অঞ্চল ছিল রাজপুত ও কোলিদের দখলে।[২১] গুজরাটের সুলতানদের আমলে, মুসলিমদের ক্ষমতা পুরোপুরি স্থাপিত হওয়ার পর, তারা (সুলতানরা) এই সমস্ত লোকদের (রাজপুত ও কোলিদের) বিদ্রোহপ্রবণতার জন্য তাদের শাস্তি দেওয়া আর শায়েস্তা করার কাজেই সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকত। নিরুপায় হয়ে, অধীনতা ও বশ্যতা স্বীকার করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না। (ক্ষমার জন্য) অনুনয়-বিনয় করে তারা বাধ্যতামূলকভাবে যুদ্ধে যাওয়া ও রাজস্ব দেওয়ার (শর্ত) মেনে নিতে রাজি হলো। তাদের জন্মস্থান ও গ্রামের একের-চার ভাগে তাদেরই [খাজনার শর্তে] বসানো হয়েছিল, গুজরাটের আঞ্চলিক ভাষায় যাকে বলে 'বাঁঠ'। আর, (তাদের জমির) বাকি তিন ভাগ, যাকে 'তলপদ' বলে, জুড়ে দেওয়া হয়েছিল সরকারী জমিতে। বড় বড় জমিনদার, যাদের দখলে থাকত অনেক (আক্ষরিক অর্থে, অধিকাংশ) পরগনা, তাদের 'তাল্লুক'-এর ব্যবস্থা হতো এই শর্তে যে [সরকারী] কাজে তাদের যোগ দিতে হবে আর সৈন্য রাখতে হবে। এ হলো 'জাগীর'-এরই মতো, অর্থাৎ প্রত্যেককে তার শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী পদাতিক আর ঘোড়সওয়ার বাহিনী নিয়ে হাজির থাকতে হবে। সেই থেকে অনেকদিন ধরে বিভিন্ন গ্রামের 'বাঁঠ'-এর অধিকারী কোলি আর রাজপুতরা নিজের নিজের জায়গায় চৌকি ও পাহারার কাজ করত আর প্রতি ফসলের কিছুটা জাগীরদারকে দিত 'সালামী' হিসেবে। কালক্রমে কিছু রাজপুত, কোলি ও অন্যান্যরা খানিক শক্তি সঞ্চয় করল এবং কাছের ও দূরের 'রাইয়তী' গ্রামগুলি থেকে গরু-মোষ লুঠ করে, চাষীদের মেরে গোলমাল পাকাতে লাগল। ঐসব এলাকার চাষীরা তাই তাদের খুশি রাখার জন্য কোথাও কোথাও ফি-বছর কিছু বাঁধা টাকা বা দু-একটি আবাদযোগ্য ক্ষেত দিতে বাধ্য হলো। এভাবে জোর করে আদায় করাকে বলে 'গিরাস' ও 'বদল'। এই প্রথা এ দেশে বেশ ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল আর প্রদেশকর্তাদের দুর্বলতার দরুন সর্বব্যাপী (আক্ষরিক অর্থে, নিখুঁত) হয়ে উঠেছিল। পরগনায় এমন জায়গা প্রায় নেই বললেই চলে সেখানে রাজপুত, কোলি এবং মুসলমান গোষ্ঠীর ডেরা বা 'গিরাস' ও 'বদল' নেই।" তারপর বইটি যখন লেখা হয় তখনকার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন "(বাদশাহী) নিয়ন্ত্রণ না থাকায়", এসব লোক "জায়গায় জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। তারা যে শুধু সমস্ত 'তলপদ' বা সরকারের অধীনস্থ এলাকা দখল করেছে তা-ই নয়, তাদের 'গিরাস' (-এর দাবি) মেটাতে অনেক (অন্য) গ্রামও দখল করেছে।"[২২]

এই অংশ থেকে মূলত যা বেরিয়ে আসে তা হলো : গুজরাটে জমি ছিল 'রাইয়তী' গ্রাম এবং জমিনদারদের 'তাল্লুক'—এই দুভাগে বিভক্ত ;[২৩] আর বেশ কিছু গ্রাম যেমন

২১. ছাপা সংস্করণে শব্দগুলি মিশে গেছে।

২২. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৩-৪ ; আরও দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট, ২২৮-২৯।

২৩. 'মিরাৎ, পরিশিষ্ট, ২১৫-১৭ এ এ রকম আরেকটি বিভাগের আভাস পাওয়া যায়। এখানে সোরাট 'সরকার'-এর কয়েকটি 'মহাল'-এর গ্রামকে 'রাইয়তী' বলে লেখা হয়েছে। স্পষ্টতই,

পুরোপুরি জমিনদারদের দখলে ছেড়ে রাখা ছিল, তেমনি বিরাট এলাকার 'জমিনদারী' গ্রামেরও দুটি করে অংশ থাকত। 'বাঁঠ' নামের অংশটির রাজস্ব জমিনদারদের হাতেই থাকত, 'তলপদ' বলে অন্য অংশটির রাজস্ব সংগ্রহ করত বাদশাহী প্রশাসন।[২৪] পরের দিকে জমিনদাররা শুধু 'তলপদ'-ই দখল করেনি, রাইয়তী গ্রাম থেকেও তারা জোর করে 'গিরাস' নামের জবরদস্তি আদায় করত।[২৫] 'রাইয়তী' জমি যে 'তলপদ' থেকে আলাদা ছিল এবং আদতে সেগুলো যে এমনকি কোলি বা অন্যান্যদের দখলেও ছিল না—তার প্রমাণ হিসেবে এই কথাই যথেষ্ট।

কৌতূহলের ব্যাপার এই যে, এমন কি ১৯ শতকের গোড়ার দিকেও, টড মেবারে আলাদা দু ধরনের গ্রাম দেখেছিলেন। 'নিষ্কর স্বত্বাধিকারী' 'ভূমিয়া'দের তিনি অন্য জায়গায় জমিনদারদের সঙ্গে এক করে দেখেছেন। এদের দখলে ছিল দেশের অল্প কিছু সংখ্যক গ্রাম। বাকি গ্রামগুলি ছিল 'পট্টাওয়ৎ'দের অধীনে, টড যাদের 'গিরাসিয়া'ও বলেছেন। ঐ সময়ে 'পট্টাওয়ৎ' আর 'ভূমিয়া'দের মধ্যে আর কোন তফাৎ ছিল না। কিন্তু কিংবদন্তী অনুযায়ী আগে এরা ছিল রাষ্ট্রেরই কর্মচারী। মুঘল সাম্রাজ্যের জাগীর-এর মতো তাদের ওপরেও রাজস্ব বরাত থাকত।[২৬]

সব গ্রামই যদি হয় জমিনদারী নয়তো রাইয়তী হয়ে থাকে, তবে ধরে নেওয়া যায় যে জমিনদার ও চাষীদের 'মিলকিয়ৎ' স্বত্ব ছিল পরস্পর-নিরপেক্ষ। যেখানে একটা থাকত সেখানে আর অন্যটা থাকত না। অযোধ্যার এক কৌতূহলজনক দলিল থেকে মনে হয়, এমন ধারণাও কিছুটা সত্য হতে পারে যে, জমিনদারদের অধীনে গেলে চাষীরা তাদের দখলীস্বত্ব হারাত। এ বাবদে ১৬৭৭-এ এক গ্রামের দুজন 'মুকদ্দম'-এর দেওয়া একটি বিবৃতি পাওয়া যায়। গ্রামের নাম করে তারা বলছে (যার একটি তাদের নিজস্ব) যে গ্রামদুটির 'মিলকিয়ৎ' ছিল জনৈক চৌধুরীর "পৈতৃক জমিনদারীর মধ্যে"। তারা বলে, "আমরা কবুল করছি যে, আমরা তার চাষী ('মুজারিআন') এবং আমরা তার অনুমতি ('রজামন্দী') নিয়ে চাষ করি।"[২৭] তাদের নিয়ে এ কথা কবুল করিয়ে

জমিনদার বা করদ প্রধানদের অধীনস্থ গ্রামগুলির থেকে এদের তফাৎ করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

২৪. নবনগরের প্রধানদের ইতিহাস বর্ণনা করে 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫-তে বলা হয়েছে, গুজরাটের শেষ সুলতান মুজফ্ফর-এর সময়ে "নবনগরের জমিনদার (অর্থাৎ শাসনকর্তা)-র জমিনদারীর মধ্যে ছিল পুরোপুরি ('দর ও বস্ত') ৪০০ গ্রাম এবং ৪০০ গ্রামের একের-চার ভাগ।" এর অর্থ বোধহয় এই যে ৪০০ গ্রামে তিনি শুধু 'বাঁঠ' থেকে রাজস্ব আদায় করতে পারতেন।

২৫. 'গিরাস'-এর তাৎপর্য বিষয়ে এই অংশেই পরে আলোচনা করা হয়েছে।

২৬. টড, 'অ্যানালস্ অ্যাণ্ড অ্যান্টিকুইটিস অফ রাজস্থান', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩২-৩৮। 'পট্টাওয়াৎ'-এর জন্য দ্রষ্টব্য এই অধ্যায়ের ৪র্থ অংশ।

২৭. Allahabad 329। "জমিনদারী" শব্দটি খুব স্পষ্ট নয়। গ্রামগুলির কোন্ 'সরকার' বা পরগনায়—তারও উল্লেখ নেই। কিন্তু এই সংগ্রহে ঐ একই 'চৌধুরী' সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্র থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে জায়গাটি ছিল লখনউ 'সরকার'-এর সাণ্ডিলা পরগনায়।

নিচ্ছে নিশ্চয়ই কোন জমিনদার যে নিজের পছন্দমতো লোককে জমি দেওয়ার অধিকার ঘোষণা ও রক্ষা করতে চায়। আওরঙ্গজেবের আমলের এক সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত একটি চিঠি থেকেও বোঝা যায় যে জমি দেওয়ার অধিকার ন্যস্ত ছিল জমিনদারদের ওপর। ঐ চিঠিতে একই সঙ্গে পত্র-প্রাপকের একটি গ্রামের "জমিনদারী সনদ পাওয়া"র কথা আছে। "যারা রাজস্ব দেয় এবং পরিশ্রমী" এমন চাষীদের মধ্যে ঐ গ্রামের জমি বাঁটোয়ারা করার ('তকসীম') কথাও সেই সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৮]

অবশ্য সব জায়গায় যে চাষীদের জমি দেওয়ার বা ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার জমিনদারেরই ছিল—এই দুটিমাত্র দৃষ্টান্তই তার যথেষ্ট প্রমাণ নয়। আগের অধ্যায়ে আমরা বলার চেষ্টা করেছি যে খুব অল্প এলাকাতেই চাষীদের উচ্ছেদ করার অধিকার দাবি করা বা প্রয়োগ করা যেত। বিরাট অহল্যাভূমি তখনও অনাবাদী থাকার দরুন সাধারণ পরিস্থিতিতে চাষীদের খোয়ানোর চেয়ে রেখে দেওয়াই বরং জমিনদারদের প্রধান লক্ষ্য হওয়ার কথা। আইনত জমিনদাররা চাষীদের জোর করে তাদের জমিতে আটকে রাখতে পারত কিনা তা নিশ্চিত নয়, কিন্তু বাদশাহী কর্তৃপক্ষ (যার মধ্যে জাগীরদার ও তার কর্মচারীরাও পড়ে) এ কাজ করতে পারত। এ বিষয়ে একমাত্র নজির পাওয়া যায় একটি মুচলেকার খসড়ায়। 'মুকদ্দম' আর 'পাটওয়ারী'দের সঙ্গে জমিনদাররাও সেখানে অঙ্গীকার করছে "কোন চাষীকে তার জায়গা ছেড়ে যেতে দেওয়া হবে না।"[২৯] এখানেও একটা প্রশ্ন থেকেই যায়: চাষীদের আটকে রাখার ব্যাপারে তাদের ক্ষমতা কি নিজস্ব অধিকার থেকেই পাওয়া, না প্রশাসনের তরফ থেকেই তাদের এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, কেননা তারা ছাড়াও উল্লিখিত আরও দুজন গ্রাম-কর্মচারী এর সমান ভাগীদার।

স্বাভাবিকভাবেই, জমিনদারী স্বত্বের অধিকারীর একটা আয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়াই ছিল এই স্বত্বের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যেহেতু এটি ছিল মূলত জমি সংক্রান্ত অধিকার, তাই আমরা আশা করতে পারি যে এর অধিকারী জমির উৎপন্নের একটা ভাগ পেত। আমাদের নথিপত্রে এই ভাগের নানারকম নাম আছে; সম্ভবত এলাকা অনুযায়ী এই ভাগের পরিমাণেও যথেষ্ট হেরফের হতো।

অযোধ্যার কিছু দলিল থেকে 'রুসুম-এ জমিনদারী' (জমিনদাররা প্রথাগতভাবে যা জোর করে আদায় করত) এবং 'হুকুক-এ জমিনদারী' (জমিনদারদের আর্থিক অধিকার) —এই দুটি শব্দের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়।[৩০] এক গ্রামের জমিনদারদের পক্ষ থেকে দায়ের-করা অভিযোগ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, জনৈক কাজী (বিচারক) জোর করে গ্রামের 'রুসুম-এ জমিনদারী' কেড়ে নিয়েছে আর সারা বছরের ভূমিরাজস্বও ('মহসুল',

২৮. 'দুর-আল উলুম', পৃ. ৯০ ক। জায়গাটি নির্দিষ্ট করা নেই। যেহেতু 'ছপ্পর-বন্দী' বা কুঁড়েঘর তোলারও উল্লেখ পাওয়া যায়, তাই মনে হয় গ্রামটি ছিল পরিত্যক্ত। সেক্ষেত্রে, গ্রামের জমি-বণ্টন সে-সময়ের কোন স্বত্ব খর্ব করবে না।

২৯. বেকাস, পৃ. ৬৭ খ।

৩০. আগের শব্দটির জন্য Allahabad, 782 (আওরঙ্গজেবের রাজত্বের ১৪তম বছরে) ও 1214 এবং পরেরটির জন্য Allahabad 375 (১৬৬২ খ্রী.)।

'ওয়াসিল') দখল করেছে।[৩১] আরেকটি নথির একটি অংশের সঙ্গে এটি মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। সেখানে বলা হয়েছে, যিনি 'মদদ-এ মআশ' অনুদান পাবেন (যার ফলে প্রাপক সমস্ত ভূমি রাজস্বের অধিকারী হন) তাঁকে ঐ অনুদানের জমির জন্য 'মালিক'দের 'হক্-এ মিলকিয়ৎ' (আক্ষরিক অর্থে, 'মিলকিয়ৎ'-এর ভিত্তিতে যে দাবি) দিতে হবে।[৩২] এই সব দলিল অযোধ্যার একই জায়গা (বাহ্‌রাইচ 'সরকার') থেকে পাওয়া গেছে। এগুলি থেকে দেখা যায় যে, অন্তত ঐ অঞ্চলে, জমিনদাররা অনুমোদিত ভূমিরাজস্ব থেকে আলাদা ও বাড়তি এক ধরনের উপকর বা শুল্ক দাবি করতে পারত। 'সতারহী' (জমিনদারীর স্থানীয় নাম) বলে যে শুল্ক বসানো হতো—লখনউ-এর কাছাকাছি অযোধ্যা প্রদেশেরই একটি জায়গা থেকে আমরা তার নজির পাই। ১৭৪৬-এ এক ধরনের গ্রাম-কর্মচারীদের ('কারিন্দা') কাগজপত্রে 'সতারহী'র সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে: বিঘা পিছু ১০ সের শস্যের শুল্ক। তার সঙ্গে যোগ করা আছে 'দামী' অর্থাৎ বিঘা পিছু একটি করে তামার পয়সার ('ফ্‌লূস') শুল্ক। এই অধিকার যাদের আছে 'কারিন্দা'রা তাদের 'সতারহী' বাবদ কিছু পরিমাণ শস্য এবং 'দামী' বাবদ কিছু নগদ পয়সা দিতে বাধ্য থাকবে, দুই-ই সম্ভবত উল্লিখিত হারের ভিত্তিতে।[৩৩]

কিন্তু প্রত্যেক চাষীর উপর আলাদা করে কর বসিয়ে জমিনদাররা সর্বদা তাদের ভাগ নিত না। কোথাও কোথাও, যেমন বাংলায় (পরে দ্রষ্টব্য), জমিনদার গ্রামের রাজস্ব বাবদ কর্তৃপক্ষকে একটি বাঁধা অঙ্কের টাকা দিত, তারপর প্রথামতো বা নিজের নির্দিষ্ট হারে চাষীদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করত। সেক্ষেত্রে তার আয় দাঁড়াত শুধু এই: যা সে সংগ্রহ করেছে আর তার থেকে কর্তৃপক্ষকে যা দিয়েছে—এর বিয়োগফল। যেসব এলাকায় বাদশাহী প্রশাসন স্বয়ং কৃষকদের রাজস্ব-হার বেঁধে দেওয়ার ব্যাপারে জোর করেত, সেখানে জমিনদারকে নিজের সুবিধার জন্য আলাদা উপকর বসাতে হতো। কিন্তু এ ধরনের এলাকায় প্রশাসনের প্রবণতাই ছিল রাজস্ব দাবি এতই বাড়িয়ে দেওয়া যাতে কৃষককে তার পক্ষে যতটা দেওয়া সম্ভব তার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছতে হয়, অর্থাৎ তার উৎপন্নের যাবতীয় উদ্‌বৃত্তই রাজস্ব দাবির আওতায় পড়ে যায়।[৩৪] এখানে ভূমিরাজস্ব দাবি কৃষকের কাছ থেকে অন্য সব আর্থিক দাবির জায়গা দখল করে নিত। মনে হয়, অন্যান্য দাবিগুলি যেন ভূমিরাজস্ব থেকেই মেটানো হচ্ছে বা তার থেকেই ছাড় দেওয়া হচ্ছে—পরিণামে এই চেহারা নিতে শুরু করে।

৩১. Allahabad 782.

৩২. Allahabad 1203 (আওরঙ্গজেবের রাজত্বের ১৯তম বছরে)।

৩৩. Allahabad 299. স্থির হয়েছিল, বছরে মোট ৫০ মণ শস্য দিতে হবে। খারিফ শস্যের ক্ষেত্রে এটি এসে দাঁড়ায় ২৫ মণে (ধান ১০ মণ; বাজরা ('কুদরুম' ও 'শামাখ'), ১৫; এবং মাষ, ৫)। নথির এক জায়গায় একটি টীকা আছে যার অর্থ পরিষ্কার নয়, কিন্তু মনে হয় এতে আখ ও তুলোর ওপর 'সতারহী'-র ব্যবস্থা করা আছে। রবি শস্য থেকে যে ২৫ মণ দিতে হতো তার মধ্যে গম ছিল ৮ মণ, ছোলা ৮ এবং বার্লি ৯। নগদ হিসেবে বছরে ৭ টাকা দেওয়ার কথা ছিল, প্রতি ফসলের মরসুমে সাড়ে তিন টাকা করে।

৩৪. ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১ম অংশ দ্রষ্টব্য।

জমিনদারদের দাবি যখন এই চেহারা নিত, আর আদায়ীকৃত রাজস্বের ওপর একটি ব্যয়ভার হিসেবে দেখা দিত, তখন তাকে বলা হতো 'মালিকানা'। দিল্লী এবং বাংলার রীতিনীতির সঙ্গে ওয়াকিবহাল জনৈক সরকারী কর্মচারীর সঙ্কলিত ১৮ শতকের একটি রাজস্ব-পরিভাষাকোষে বলা হয়েছে, "'মালিকানা' হলো জমিনদারের একটি অধিকার ('হক')। যখন তারা (কর্তৃপক্ষ) জমিনদারের জমিকে 'সীর'-এ পরিণত করে (অর্থাৎ, এর ওপর সরাসরি রাজস্ব নির্ধারণ করে আর কৃষকদের থেকে খাজনা আদায় করে) তখন তারা তাকে (জমিনদারকে) 'মালিক' হওয়ার দরুন ('মিলকিয়ৎ') প্রতি একশ বিঘা বা প্রতি একশ মণ শস্য পিছু কিছু ধরে দেয়।"[৩৫] অন্যত্র বলা হয়েছে, এই ভাগ দেওয়া হতো শুধু তখনই, যখন জমিনদারের জমি 'সীর' হয়ে আছে বা 'সীর' করে দেওয়া হয়েছে। যখন "সে নিজেই রাজস্ব দেয়, তখন সে 'মালিকানা' পায় না, পায় শুধু 'নানকার' (কাজের জন্য একটা ভাতা)।"[৩৬] সুতরাং 'মালিকানা' দেওয়া হতো শুধু তখনই যখন জমিনদারকে এড়িয়ে গিয়ে রাষ্ট্রই সরাসরি ভূমিরাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহ করত।

ঐ একই পরিভাষাকোষে বলা হয়েছে, 'মালিকানা'র স্বাভাবিক হার হলো কোন অঞ্চলে মোট আদায়ীকৃত রাজস্বের শতকরা দশ ভাগ।[৩৭] যেসব ক্ষেত্রে জমিনদারকে নগদ টাকা দেওয়া হতো সেখানে এটি সত্য। কিন্তু ওপরে উদ্ধৃত সংজ্ঞা থেকে যেমন বোঝা যায়, লাখেরাজ জমি রূপেও 'মালিকানা' দেওয়া যেত। এটি দেওয়া হতো মোট রাজস্বপ্রদায়ী জমির একটা শতকরা হিসেবে ("প্রতি একশ বিঘা থেকে কিছু")। সব প্রথম যেখানে 'মালিকানা'র উল্লেখ পাওয়া যায় সেখানে একে জোত-জমি হিসেবেই দেখানো হয়েছে।[৩৮] পরিভাষাকোষটির আরেক জায়গায় বলা আছে যে

৩৫. Add. 6603, পৃ. ৭৯ ক। বন্ধনীর মধ্যে 'সীর' শব্দটির যে-অর্থ দেওয়া হয়েছে, এখানে সেই অর্থেই সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে (ঐ, পৃ. ৬৬ ক-খ)। এখন শব্দটির অনেক বেশি চালু অর্থ হলো: জমিনদারদের খাস জমি, যা তারা নিজেরাই চাষ করে কিংবা মজুর বা ইচ্ছামতো উচ্ছেদযোগ্য প্রজাদের দিয়ে চাষ করায়। কিন্তু এর সঙ্গে আগের অর্থটিকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। উইলসন, 'গ্লসারি' ইত্যাদি, পৃ. ৮১৮-য় দ্বিতীয় অর্থটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, কিন্তু লক্ষ্য করেছেন যে "কখনও কখনও শব্দটি প্রয়োগ করা হয় রাষ্ট্রীয় খাতে চাষ করা জমির ক্ষেত্রে বা সেই ধরনের জমি বোঝাতে যেখানে চাষীরা মধ্যবর্তী প্রতিনিধি ছাড়াই রাজস্ব দেয়।"

৩৬. Add. 6603, পৃ. ৬১ খ। অন্যত্র, পৃ. ৫৮ খ, 'চৌধুরী'দের প্রসঙ্গে একই কথা বলা হয়েছে। যখন তার জমি 'সীর' করে দেওয়া হয়, সে তখন পায় 'মালিকানা'। "যদি সে নিজেই তার জমির রাজস্ব দেয়, তাহলে 'মালিকানা' পায় না।"

৩৭. Add. 6603, পৃ. ৬১ খ।

৩৮. Allahabad 294 (১৫৯৫ খৃষ্টাব্দ)। এই দলিলটি জারি হয়েছিল একদল লোকের নামে। তারা যথাক্রমে ২০ এবং ৯ বিঘা করে দুটি এলাকা 'মালিকানা' হিসেবে পিচ্ছে। যে সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে, তা হলো: "আমরা 'মালিকানা' দিচ্ছি (গ্রহীতাদের)— বিঘা জমির (রাজস্ব) আমরা মাফ করে দিয়েছি।" কারা যে দাতা—সে কথা স্পষ্ট নয়; সম্ভবত তারা ছিল 'মদদ-এ মআশ'-এর অধিকারী।

'দো-বিশ্বী' বা প্রতি বিঘায় দুই 'বিশ্বা' জমি ছিল জমিনদারদের 'হক'; 'মালিকানা'র সঙ্গে এর কোন তফাৎ নেই।[৩৯] ১৯ শতকের গোড়ার দিকে গোরখপুরের একটি স্মৃতিকথায় 'বির্তিয়া' বলে পরিচিত জমিনদারদের উল্লেখ আছে। চাষীদের ওপর সরাসরি রাজস্ব-নির্ধারণ করা হলে ('হাঙ্গাম-এ খাম') এরা "পেত একের-দশ ভাগ বা 'দো-বিশ্বী'।"[৪০] অযোধ্যায় 'জমিনদারী'র আঞ্চলিক প্রতিশব্দ হিসেবে সংক্ষেপে 'বিশ্বী' শব্দটি ব্যবহারের কারণ হয়তো এই।

মনে হয়, গুজরাটের জমিনদারদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষ মোটামুটি এই রকমই একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। 'মিরাৎ-এ-আহ্‌মদী' থেকে যে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তার মূল কথা এই যে, জমিনদারদের জমি দু ভাগে ভাগ করা হতো। তার তিনের-চার ভাগকে বলা হতো 'তলপদ' আর একের-চার ভাগকে 'বাঁঠ'। প্রথমটি থেকে রাজস্ব নিত কর্তৃপক্ষ আর পরেরটি ছেড়ে দেওয়া ছিল জমিনদারদের ওপর। 'মালিকানা' হতো সাধারণত জমির একের-দশ ভাগ। একের-চার ভাগ হওয়ায় 'বাঁঠ' বলতে জমির আরও বড় অনুপাত বোঝাত। কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে দুই-ই ছিল এক। 'মালিকানা'র মতো 'বাঁঠ'ও তাই নগদ টাকার রূপ নিতে পারত। মুঘল কর্তৃপক্ষ যখন গুজরাটে পোরবন্দরের জমিনদারকে বন্দরটির মোট রাজস্বের একের-চার ভাগ দিয়েছিল, তখন এই ঘটনাই ঘটেছিল।[৪১] মনে হয়, এসব ক্ষেত্রে জমিনদারের সমস্ত জমির রাজস্বই সংগ্রহ করত প্রশাসন, তারপর সংগ্রহের একের-চার ভাগ তাকে দিয়ে দিত।

উল্লেখযোগ্য এই যে, 'মিরাৎ'-এ 'বাঁঠ' আর 'গিরাস'[৪২] (এবং 'বদল')-এর মধ্যে সুস্পষ্ট তফাৎ করা আছে। 'বাঁঠ' ছিল জমিনদারীর অধিকারীর জমিরই একটা অংশ; 'গিরাস' ছিল জবরদস্তি আদায়। জবরদস্তি আদায়কারীর জমিনদারীর বাইরে, 'রাইয়তী' বা চাষী-অধিকৃত গ্রাম থেকে এটি আদায় করা হতো নগদে বা জমি

৩৯. Add. 6603, পৃ. ৬১ খ।

৪০. গুলাম হজরৎ, 'কওয়াইফ-এ জিলা-এ গোরখপুর' (১৮১০), আলীগড় পাণ্ডুলিপি, পৃ. ১৪ ক-খ। 'বির্তিয়া'র সংজ্ঞা দেওয়া যায় এইভাবে: সে একজন জমিনদার, উর্ধ্বতন কোন জমিনদারের যথার্থ বা কাল্পনিক দানসূত্রে সে এই স্বত্ব পেয়েছে, এবং কর্তৃপক্ষের কাছে সে ভূমিরাজস্ব দাখিল করে সাধারণত (কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই নয়) দাতা বা 'তালুকদার' উপাধিধারী তার উত্তরাধিকারীর মাধ্যমে। আরও দ্রষ্টব্য: এলিয়ট 'মেমোয়ার্স' ইত্যাদি, ২য় ভাগ, পৃ ২৫-৬।

১৭ শতকের একটি নথিতে 'বির্ত' শব্দটির ব্যবহার থেকেও বোঝা যায় এটি ছিল নেহাৎই জমিনদারীর স্থানীয় নাম। ১৬৬৯-র একটি হস্তান্তর কোবালার লেখক ঘোষণা করছেন যে. তিনি একটি গ্রামের 'মিলকিয়ৎ', 'জমিনদারী' এবং 'চৌধুরাই' " 'বির্ত'রূপে" দিয়ে দিচ্ছেন। (Allahabad, 1192)।

৪১. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৮। বন্দরটি তখন (১৬৭৭-৮) ছিল 'খালিসা'-য়।

৪২. "গ্রাস, 'আহার্য'; আক্ষরিক ও পরিচিত অর্থে, 'মুখভর্তি'।" (টড, 'অ্যানালস্‌ অ্যাণ্ড অ্যান্টিকুইটিস্‌ অফ রাজস্থান', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৩)।

হিসেবে। 'বাঁঠ' নেওয়া হতো আগেকার একটি আইনসম্মত অধিকারবলে, আর 'গিরাস' আদায় হতো ভয় দেখিয়ে বা জোরজুলুম করে। ১৬৭২ সালে গুজরাট সংক্রান্ত একটি বাদশাহী আদেশে 'গিরাসিয়া' ও জমিনদারদের কথা বলা হয়েছে (তুলনীয়: টড-এর লেখায় মেবারে 'গিরাসিয়া ঠাকুর' ও 'ভূমিয়া')। এ দিয়ে সম্ভবত একটা সাধারণ সাদৃশ্যের কথাই বোঝানো হয়েছে, কিন্তু দুটো আলাদা শব্দ ব্যবহার করে অর্থের একটা সূক্ষ্ম তফাৎও করা আছে।[৪৩]

'বাঁঠ' এবং 'গিরাস' শব্দদুটির প্রকৃত তাৎপর্য যথাযথভাবে বিচার করলে আমরা 'চৌথ' (মারাঠাদের চাপানোর ফলে কুখ্যাত)-এর উৎপত্তি বিষয়ে নতুন জ্ঞানলাভ করতে পারি। কোন কোন ঐতিহাসিক শিবাজীর 'চৌথ'কে তুলনা করেছেন 'করদ রাজ্য' থেকে ওয়েলেসলি-র পোষণমূলক অর্থ দাবির সঙ্গে। আবার কেউ কেউ আরও স্পষ্ট করে একে 'ব্ল্যাকমেল-এর টাকা' বলেছেন।[৪৪] শিবাজী ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছে 'চৌথ' ছিল সত্যিই মারাঠাদের লুঠতরাজের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার দাম হিসেবে জেলার খাজনার একের-চার ভাগের দাবি।[৪৫] পর্তুগীজ নথিপত্র খুঁটিয়ে দেখে সাব্যস্ত করা হয়েছে যে 'চৌথ' ব্যাপারটি শিবাজীর আবিষ্কার নয়, এ নামও তাঁর দেওয়া নয়। ১৬ শতক থেকেই দামন-এর পর্তুগীজরা আশেপাশের ছোটখাট রাজাদের এই নামে 'একের-চার ভাগ' রাজস্ব দিচ্ছিল।[৪৬] মনে হয়, এমন

৪৩. মুঘল আদেশনামার জন্য 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৯ দ্রষ্টব্য। টড-এর 'গ্রাসিয়া ঠাকুর' ও 'ভূমিয়া'র জন্য দ্রষ্টব্য 'অ্যানালস অ্যাণ্ড এ্যান্টিকুইটিস্', পূর্বোক্ত সূত্র।

৪৪. শিবাজীর 'চৌথ'-এর সঙ্গে ওয়েলেসলি-র [মিত্রতামূলক] 'অর্থদান'-এর তুলনা করে রানাডে, মনে হয়, শিবাজীর প্রশংসাই করতে চেয়েছিলেন। 'ধারণা'টির সুখ্যাতি করে তিনি বলেছেন, আদতে শিবাজীর মাথা থেকেই এটি বেরিয়েছিল, পরে ওয়েলেসলির হাতে 'অমন ফল দিয়েছিল' (সুরেন্দ্রনাথ সেন, 'মিলিটারি সিস্টেম অফ দা মারাঠাস্', বোম্বাই, ১৯৫৮, পৃ. ৩৭-৩৮এ উদ্ধৃত)। মারাঠাদের জবরদস্তি 'চৌথ' আদায় প্রসঙ্গে যদুনাথ সরকার অবাধে 'ব্ল্যাকমেল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

৪৫. আক্ষরিক অর্থে 'চৌথ' মানে 'একের-চার ভাগ'। শিবাজীর জবরদস্তি 'চৌথ' আদায়ের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ২৬ নভেম্বর, ১৬৬৪ তারিখে কম্পানির কাছে লেখা সুরাটের ইংরেজ কুঠিয়ালদের এক চিঠিতে। সেখানে বলা হয়েছে, "শিবাজী রোজই ভালোরকম ভয় দেখান যে তিনি এই শহরে আরেকবার আসবেন, যদি-না শহর এবং আশপাশের গ্রাম থেকে রাজা প্রতি বছর যা পান তার একের-চার ভাগ বিনা বিবাদে তাঁকে দেওয়া হয়" ('ফ্যাক্টরিস্, ১৬৬১-৬৪', পৃ. ৩১২)। মারাঠাদের 'চৌথ' দাবির স্বরূপ সম্বন্ধে সবচেয়ে ভালো আলোচনা পাওয়া যাবে সুরেন্দ্রনাথ সেনের 'মিলিটারি সিস্টেম অফ দা মারাঠাস'-এ। সেখানে সঠিকভাবেই জোর দিয়ে বলা হয়েছে (পৃ. ৩৭-৩৯), মারাঠারা তাদের নিজেদের ছাড়া আর কারও হাত থেকে 'চৌথ'দাতাকে বাঁচানোর কথা দিত না। রক্ষক-শক্তি হিসেবে কর্তব্য পালনের কোন ভানই তাদের ছিল না।

৪৬. পর্তুগীজ ভাষা জানি না বলে তথ্যটি আমি নিজে দেখতে পারিনি। আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে মূলত সুরেন্দ্রনাথ সেনের ব্যাখ্যা আর সেই সঙ্গে তাঁর 'মিলিটারি সিস্টেম অফ

ভাবলে ভুল হবে যে 'দামন'-এর এই ব্যবস্থা ছিল শিবাজীর 'চৌথ'-এর এক এবং অদ্বিতীয় 'নমুনা'।[৪৭] আগেই বলা হয়েছে যে মুঘল কর্তৃপক্ষ কাথিয়াবাড় উপকূলে পোরবন্দরের রাজস্বের একের-চার ভাগ সেখানকার জমিনদারকেই দিত। এর থেকেই বোঝা যায় দামন-এর ঘটনা এমন কিছু অনন্য ব্যাপার ছিল না। আমরা আগেই দেখেছি এরও উৎপত্তি হয়েছিল প্রায় নিশ্চিতভাবেই 'জমিনদার'-এর 'বাঁঠ'-এর অধিকার, অর্থাৎ তাঁর জমিনদারীর একের-চার ভাগ জমির অধিকার থেকে। এই সাদৃশ্য থেকে মনে হয় যে দামন-এ দেওয়া 'চৌথ'-এর উৎপত্তি কোঙ্কণ-এর জমিনদারদের ঐ ধরনের অধিকার থেকে। লক্ষণীয় এই যে, দামন-এর 'চৌথ' 'বাঁঠ'-এর মতো হলেও শিবাজীর 'চৌথ' থেকে আলাদা, কেননা এটা ছিল অধস্তন, এমনকি অধীনস্থ শক্তিকে ঊর্ধ্বতন শক্তির দেওয়া মাইনে বা ভাতা।[৪৮] শিবাজীর 'চৌথ'-এর উৎপত্তি জমিনদারদের অধিকার দাবি থেকেই। কিন্তু তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত জমিনদারী অধিকারের ভিত্তিতে আইনসঙ্গত দাবির চেহারা ঘুচে গেল, এটি হয়ে দাঁড়াল জুলুম করে আদায়।

অবশ্য এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে এমনকি দামন-এও চৌথ লুঠতরাজের চেহারা নিতে শুরু করেছিল। ১৬৩৮-এ 'চৌথ'-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল, "এক ধরনের শুল্ক যা পেলে ঐ রাজা (সরসেটের রাজা) তাঁর রাজ্যে ডাকাতদের আশ্রয় দেবেন না আর দামন প্রদেশের চাষীদের গরু-মোষ দখল করা থেকে নিবৃত্ত থাকবেন।"[৪৯] অর্থাৎ 'মিরাৎ-এ আহ্‌মদী'তে যাকে 'গিরাস' বলা হয়েছে, তার মতো এখানেও 'চৌথ'কে জবরদস্তি আদায় বলে ধরা হয়েছে। ১৬১৭-য় দামন এর এক অংশের জন্য দেওয়া 'চৌথ' বোঝাতে এর পর্তুগীজ রূপ 'গ্রাসৃসো' শব্দটি ব্যবহারও করা হয়েছে।[৫০]

তাহলে ব্যাপারটা হলো এই : প্রায় গোটা মুঘল সাম্রাজ্য জুড়ে, তাদের জমিনদারীর অন্তর্ভুক্ত জমির জন্য জমিনদারের একটা আর্থিক দাবি ছিল। সেই দাবি মেটানোর জন্য হয় চাষীদের উপর একটা আলাদা শুল্ক চাপানো হতো, বা জমির একটা অংশ লাখেরাজ হয়ে তাদের হাতেই থাকত, বা কর্তৃপক্ষ নিজেই সমস্ত জমি থেকে রাজস্ব

দা মারাঠাস', ২০-২৯ যে-দীর্ঘ উদ্ধৃতির তর্জমা দেওয়া আছে তার ওপর। মুদ্রিত ইংরেজি নথিপত্রে এই ব্যবস্থার একটি উল্লেখ আছে। ১৬৩৯-এর গোড়ায় দুজন পর্তুগীজ দূত দামন থেকে সুরাটে এসে সেখানকার প্রদেশকর্তাকে তাদের হয়ে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে মধ্যস্থতা করার কথা বলেছিল। আওরঙ্গজেব তখন ছিলেন দখিনের নবাব। তাঁর সৈন্যবাহিনী "দামন-এর চারদিকের সমস্ত গ্রামাঞ্চলে উৎপাত ও ধ্বংস করতে ছাড়ত না।" মুঘল বাহিনী সরিয়ে নেওয়ার মূল্য হিসেবে পর্তুগীজরা "সে দেশের শাসকবংশীয় রাজা রামুগর (রামনগর)-কে বার্ষিক যা দিতে হতো, অর্থাৎ লভ্যাংশের একের-চার ভাগ, স্বেচ্ছায় তা-ই দিতে রাজি হয়েছিল।" (ফস্টার, 'সাপ্লিমেন্টরী ক্যালেণ্ডার', ১৪১)।

৪৭. তুলনীয় সুরেন্দ্রনাথ সেন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২৯, ৩২, ৪৩। তাঁর মত ঠিক এ-ই।

৪৮. তুলনীয় পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২৮-২৯।

৪৯. ঐ, ২৬।

৫০. ঐ, ২৬-২৭।

আদায় করে তার থেকে তাদের একটা নগদ ভাতা দিত। উত্তর ভারত ও বাংলায় এই শেষ দুটি রূপ পরিচিত ছিল 'দো-বিশ্বী' নামে; গুজরাটে এরই নাম ছিল 'বাঁঠ' আর দখিনে 'চৌথ'।

জমিনদাররা, মনে হয়, প্রায়ই তাদের প্রধান আর্থিক দাবি ছাড়াও চাষীদের কাছ থেকে কয়েকটি ছোটখাট উপরিপাওনাও আদায় করত। এক জায়গায় দেখি, তারা 'দস্তার-শুমারী' (পাগড়ি গোনা) নামে মাথা-পিছু এক কর, এবং বিবাহ ও জন্ম বাবদে উপকর আদায় করছে। আবার আরেক জায়গায় বাড়ি-বাবদ কর ('খানা-শুমারী' এবং অন্যান্য উপকর বসানো হয়েছে।[৫১] এ ছাড়াও জমিনদাররা কখনও কখনও কোন শ্রেণীর লোকদের দিয়ে বেগার খাটিয়ে নিত। বলাহার, থোরী, ধানুক এবং চামাররা তাদের জমিনদারের জন্য পথ দেখানোর কাজ ও কুলিগিরি করতে বাধ্য হতো। মনে হয়, 'জমিনদার' 'কওম'-এর যে-কোন লোক তাদের এলাকা দিয়ে গেলেই এই কাজ করতে হতো।[৫২] অবশ্য সমসাময়িক নথিপত্রে এমন কোন নজির নেই যার থেকে মনে হয় জমিনদাররা তাদের ক্ষেতের জন্য বাধ্যতামূলক বেগার খাটাত।

একজন সাধারণ জমিনদার এইসব উপরিপাওনা থেকে কতটা আয় করত আমাদের হাতে যে অল্প তথ্য আছে তার ভিত্তিতে সে-হিসেব করা শক্ত। তার মূল আর্থিক অধিকার থেকে যে-আয় হতো তার সঙ্গে এই উপরিপাওনার লাভ কোন অংশেই তুলনীয় ছিল বলে মনে হয় না। সুতরাং গুজরাট ও দখিনে, 'মালিকানা' এবং অনুরূপ অধিকার সম্পর্কে যা জানা যায় তার থেকে উদ্‌বৃত্ত উৎপন্নের উপর জমিনদারদের ভাগের একটা মোটামুটি হিসেব করা যেতে পারে। সাধারণত 'মালিকানা' হতো ভূমিরাজস্বের একের-দশ ভাগ, আর 'বাঁঠ' ও 'চৌথ' একের-চার ভাগ। জমিনদাররা যখন ভূমিরাজস্ব থেকে না কেটে, চাষীদের ওপর সরাসরি কর বসিয়ে তাদের ভাগ উসুল করত, তখন এই অনুপাত মানা হতো বলে মনে হয় না। জমিনদারদের বসানো হার কত ছিল তার একটিমাত্র উদাহরণ পাওয়া যায়:

৫১. বালকৃষণ ব্রাহ্মণ, পৃ. ৫২ ক-খ; 'দুর-আল উলুম', পৃ. ৫১ ক-খ। দু জায়গাতেই এই উপকরকে বলা হয়েছে 'আবওয়াব-এ মমনুআ' বা দরবার থেকে নিষিদ্ধ আদায়।

৫২. 'ওয়াকাই-এ আজমীর', ১৩১ দ্রষ্টব্য। সেখানে একজন আহত সহযোদ্ধাকে নিয়ে একদল রাজপুতের পালানোর বর্ণনা আছে। প্রত্যেক গ্রামে তারা স্থানীয় জমিনদারদের থোরীদের কাজে লাগিয়েছিল। থোরীরা আহত লোকটির 'চারপাই' (খাটিয়া) বয়ে নিয়ে যেত পরের গ্রামের সীমানা পর্যন্ত, সেখান থেকে ঐ গ্রামের থোরীরা আবার সেটি তুলে নিত। (আরও দ্রষ্টব্য Add. 6603, পৃ. ৫১ খ-৫২ ক এবং 'তসরিহ্-আল আকোয়াম', পৃ. ১৮১ খ-১৮২ ক, ১৮৮ ক। কোন লোক বেগার খাটতে বাধ্য কিনা, মনে হয়, সেটি ঠিক হতো তার জাত দিয়ে। চামাররা 'বেগারী' বলে পরিচিত ছিল, কারণ তাদের বিনা পয়সায় কুলির কাজ করতে হতো ('তসরিহ্-আল আকোয়াম', পৃ. ১৮১ খ-১৮২ ক)। অন্যদিকে, জনৈক গুজরের কথা পাওয়া যায় যে কয়েকজন রাজপুতের হয়ে বেগার খাটতে রাজি হয়নি, কারণ সে বোধহয় ভেবেছিল এ কাজ করতে সে বাধ্য নয়। এই প্রত্যাখ্যানের শাস্তিস্বরূপ তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয় ('ওয়াকাই-এ আজমীর', ১৮৭)।

তার নাম 'সতারহী'।[৫৩] এর থেকে কিন্তু মনে হয়, ভূমিরাজস্বের চলতি হারের তুলনায় এটি ছিল নেহাৎ হালকা। যদি বলা হয়, জমিনদাররা যে সব বিবিধ উপকর বসাত সেগুলোও হিসেবে ধরতে হবে, তবে এ যুক্তিও দেওয়া যায় যে রাষ্ট্রের ভাগের সঙ্গে তুলনা করলে তা-ও সমান-সমান হয়ে যায় (ভূমিরাজস্ব ছাড়াও কর্তৃপক্ষ বসাত 'সাইর' এবং আরও নানান কর)। ১৮ শতকের শেষ দিকে বাংলায় এবং সম্ভবত দিল্লীর আশপাশে প্রায়ই 'সাইর' করগুলির একের-চার ভাগ জুড়ে দেওয়া হতো জমিনদারদের উপরিপাওনার সঙ্গে। তাদের ভাগের নাম ছিল 'সাইর-চৌথ'।[৫৪]

সরাসরি বাদশাহী প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে উদ্‌বৃত্ত উৎপন্নের ওপর জমিনদারদের ভাগ যে ভূমিরাজস্ব থেকে আদায়ের ভাগের চেয়ে অনেক কম ছিল—কিছু গ্রামের জমিনদারীর বিক্রয়মূল্যের সঙ্গে তাদের দেওয়া ভূমিরাজস্ব পাশাপাশি রেখে বিচার করলে এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণ হয়। আধুনিক 'রিয়াল এস্টেট' (ভূ-সম্পত্তি) কেনা-বেচার ব্যাপারে ওয়াকিবহাল যে-কেউ দেখে আশ্চর্য হবেন যে মুঘল আমলে জমিনদারীর দাম এক বছরে প্রদেয় ভূমিরাজস্বের চেয়ে খুব অল্প ক্ষেত্রেই দুগুণের বেশি হতো (মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে তার সামান্য ওপরে), যদিও এর দাম হওয়া উচিত ছিল ক্রীত স্বত্বের অধিকার থেকে প্রত্যাশিত বার্ষিক আয়ের লগ্নী মূল্য।

বাংলায় ১৭০৩ সালে ইংরেজরা কয়েকজন জমিনদারের কাছ থেকে ১৩০০ টাকা দিয়ে 'ডহী কলকাত্তা' ও আরও দুটি গ্রাম কিনেছিল। এই গ্রামগুলির জন্য 'জমা' বা বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১,১৯৪ টাকা ১৪ আনা।[৫৫]

আওরঙ্গজেবের আমলের মাঝের বছরগুলোয় অযোধ্যার একটি পরগনায় পাশাপাশি কয়েকটি গ্রামের 'মিলকিয়ৎ' ও 'জমিনদারী' স্বত্ব বিক্রি হয়েছিল। একগুচ্ছ নথি থেকে তার বিক্রয়মূল্যের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। চার বছরে ঐ গ্রামগুলির ওপর ধার্য বার্ষিক ভূমিরাজস্বের অংক পাওয়া যায় অন্য দুটি নথিতে।

বিশদ বিবরণ নীচের তালিকায় দেওয়া হলো।[৫৬]

৫৩. Allahabad 299 (১৭৪৬ খৃস্টাব্দের) দ্রষ্টব্য। এই দলিল ও তার বিষয়বস্তুর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে 'সতারহী'র হার দেওয়া হয়েছে বিঘাপিছু ১০ সের খাদ্যশস্য।

৫৪. Add. 6603, পৃ. ৬৫ ক-খ। 'সাইর' ও অন্যান্য করের জন্য ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৭ম অংশ দ্রষ্টব্য।

৫৫. Add. 24,039, পৃ. ৩৬ ক-খ, এই বিক্রি অনুমোদন করে দিওয়ান যে পরওয়ানা জারি করেছিলেন তার নকল এতে দেওয়া আছে। উল্টোপিঠে ('জিম্‌ন্') কয়েকটি পৃষ্ঠলেখ সমেত তিনটি অন্য দলিলেরও নকল আছে: বিক্রয়-কোবালা, ইংরেজ কম্পানির নামে একটি 'নিশান' (যাতে আছে কতকগুলি প্রাসঙ্গিক অসুবিধি) আর কম্পানির 'ওয়কীল' (প্রতিনিধি)-র মুচলেকা: বার্ষিক রাজস্ব দাখিল করার ব্যাপারে মক্কেলদের হয়ে সে নিজেই জামিন থাকছে। পৃ. ৩৯ ক-র বিক্রয়-কোবালাটি আলাদাভাবেও দেওয়া আছে।

৫৬. বিক্রি সংক্রান্ত দলিল হলো Allahabad 891, 1195, 1196, 1205, 1215, 1216, 1221, 1222, 1224; এবং রাজস্ব সংক্রান্ত দলিল Allahabad 1206 ও 897. বিক্রয়-কোবালাগুলিতে হিজরী পঞ্জিকা অনুযায়ী তারিখ দেওয়া আছে। রাজস্ব-দাবি ধার্য হতো

গ্রাম	বিক্রির বছর (খৃস্টাব্দ)	মিলকিয়ৎ ও জমিনদারীর বিক্রয়-মূল্য (টাকায়)	ভূমিরাজস্ব	
			বছর (খৃস্টাব্দ)	পরিমাণ (টাকায়)
বৈদৌরা-বৈদৌরী (দুটি গ্রাম)	১৬৭২[৫৭]	৩০১[৫৭]	১৬৭৬-৭	২৩৯
			১৬৭৭-৮	২৩৯
			১৬৮৪-৫	২২৬
			১৬৮৫-৬	১২৬
			গড়	২০৭ টাকা ৮ আনা
পসনাজৎ	১৬৭২ ($\frac{১}{৩}$ ভাগ)	৫৮৯	১৬৭৬-৭	২৭১ টাকা ৮ আনা
(গ্রামের অর্ধেক)[৫৮]	১৬৮৮ ($\frac{১}{৯}$ ভাগ)		১৬৭৭-৮	২২৪ টাকা ৮ আনা
	? ($\frac{১}{১৮}$ ভাগ)		১৬৮৪-৫	১৯৪ টাকা ১১ আনা
			১৬৮৫-৬	২০৯ টাকা (১১) আনা
			গড়	২২৫ টাকা ১$\frac{১}{২}$ আনা
অল্লাপুর	১৬৭৭	১৩৬[৫৯]	১৬৮৪-৫	৪৪ টাকা ৯ আনা
			১৬৮৫-৬	৩৪ টাকা ৯ আনা
			গড়	৩৯ টাকা ৯ আনা
দেবীদাসপুর	১৬৮২	১৭৫	১৬৮৪-৫	৫৪ টাকা ১২ আনা
			১৬৮৫-৬	৫৪ টাকা ১২ আনা
			গড়	৫৪ টাকা ১২ আনা

ক. একুনে গ্রামগুলির বিক্রয়মূল্য ... ১২০১ টাকা

খ. একুনে ভূমিরাজস্বের গড় ... ৫২৬ টাকা ১৪$\frac{১}{২}$ আনা

ক : খ = ১০০ : ৪৪

[৫৭, ৫৮, ৫৯—পরের পাতায় দ্রষ্টব্য]

ফসলী বছরে। Allahabad 897-এ ফসলী বছরটি ঠিকমতো পড়া যায় না, কিন্তু সৌভাগ্যবশত দলিলটিতে হিজরী তারিখও দেওয়া আছে। এই দলিল এবং অন্যান্য রাজস্ব-সংক্রান্ত দলিলে 'অস্‌ল্‌' অভিধায় আগের বছরের রাজস্বের অঙ্কও দেওয়া হয়েছে। তারপর চলতি বছরের অঙ্কটির তুলনায় রাজস্বের যে-কোন পরিবর্তন, হ্রাস বা বৃদ্ধি নির্দেশ করা আছে। এইভাবে প্রতিটি দলিল থেকে দু বছরের রাজস্বের অঙ্ক পাওয়া যায়।

সমস্ত গ্রামই ছিল বহরাইচ্ 'সরকার'-এর হিসামপুর পরগনায় চৌরসী টপ্পায়। সৈয়দ মুহম্মদ আরিফ আস্তে আস্তে এই গ্রামগুলির জমিনদারী কিনে নেন; একটি বাদে বাকি সব ক্ষেত্রে তিনি যে দাম দিয়েছিলেন তাই ছিল বিক্রয়মূল্য। রাজস্ব দলিলগুলিতে এই গ্রামগুলির রাজস্বের জন্য তাঁর ওপরেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা নিশ্চিত জানি যে তিনি পসনাজৎ-এর একের-তিন ভাগ, অল্লাপুরের $\frac{১}{২}$ ভাগ এবং দেবীদাসপুরের পুরোটাই কিনেছিলেন যে-বছরের রাজস্বের অঙ্কগুলি পাওয়া গেছে তার আগের বছরগুলিতে। আর তিনি যে বইদৌরি-র অর্ধেক আর পসনাজৎ-এর $\frac{১}{৯}$ ভাগ কিনেছিলেন, সে-বিষয়টি রাজস্ব নির্ধারণের আওতায় এসেছিল আরও পরে (টীকা ৫৮ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে

সুতরাং, কোন জমি তার জমিনদারীর সীমানার মধ্যে পড়লেই জমিনদাররা চাষীর উদ্‌বৃত্ত উৎপন্নের ওপর যে ভাগ বসাত, তা ঐ একই জমির ওপর কর্তৃপক্ষের আদায়ীকৃত ভূমিরাজস্ব দাবির তুলনায় কমই ছিল। তার ওপর জমিনদারদের ভাগ ইচ্ছামতো বাড়ানো যেত না। একটিমাত্র নথিতে 'সতারহী'র হার দেওয়া আছে। তাতে বলা হয়েছে এটি "পুরনো [হারেই] বসানো হলো", অর্থাৎ প্রথাগত হারই বহাল রইল, সেই বিশেষ বছরে জমিনদারের নিজের বাঁধা হার নয়।[৬০] যেখানে জমিনদার তার ভাগ পেত ভূমিরাজস্ব থেকে দেওয়া ভাতা হিসেবে, সেখানে রাজস্বের সঙ্গে ভাতার সম্পর্ক ছিল বাঁধা বা নির্দিষ্ট, সে শতকরা দশ ভাগই হোক বা একের-চার ভাগই

রাজস্ব-সংক্রান্ত দুটি দলিলে আরিফ-কে বলা হয়েছে 'তালুকদার'। সুতরাং, এই অধ্যায়ের তৃতীয় অংশে শব্দটির যে-অর্থ করা হয়েছে সেইভাবে দেখলে, তিনি যে-জমির রাজস্ব দিচ্ছেন তার সবটাই যে তাঁর নিজের জমিনদারীর মধ্যে পড়ে না—এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

৫৭. দাম এবং বছর প্রকৃত বিক্রির নয়। যে-দাম দেওয়া আছে প্রথমে সেই দামেই বিক্রি হবে ঠিক হয়েছিল, পরে ভাবী ক্রেতার অনুরোধে তা খারিজ হয়ে যায় (Allahabad 1195)। তারপর গ্রামদুটি চলে যায় মুহম্মদ আরিফ-এর হাতে। ১৬৮৬-তে বৈদৌরী গ্রামের অর্ধেক অংশের যে বিক্রয়-কোবালা সম্পাদন করা হয় তা এখনও বর্তমান (Allahabad 1219)।

৫৮. দুটি রাজস্ব নথির প্রথমটিতে (Allahabad, 1206) রাজস্ব ধার্য করা হয়েছে "পসনাজৎ পট্টী"র ওপর, পরেরটিতে (Allahabad, 897) "দুটি পট্টী (অর্থাৎ) পসনাজৎ গ্রামের অর্ধেক"-এর উপর। ১৬৭২-এ সৈয়দ আরিফ-এর বাবা সৈয়দ আহ্‌মদ গ্রামটির একের-তিন ভাগের পুরোটাই কিনে নিয়েছিলেন (Allahabad, 1196)। এর পরের স-তারিখ খরিদটি (গ্রামের একের-নয় ভাগ) করা হয় ১৬৮৮-তে। আরেকটি বিক্রয়-কোবালায় (তারিখ পাওয়া যায়নি) দেখা যায় গ্রামটির দ্বিতীয় 'পট্টী'র একের-আঠারো ভাগ কেনা হয়েছে, যার মধ্যে ঐ একের-নয় ভাগও পড়ে (Allahabad 1221 ও 1222)। এই দুটি খরিদের সীমানা একটি 'কিসমৎ-নামা'য় (Allahabad 1186) নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সারণিতে একুনে যে মূল্য দেওয়া আছে, তা তিনটি অংশের বিক্রয়মূল্য যোগ করে পাওয়া। কিন্তু এও সম্ভব যে, যেহেতু দ্বিতীয় 'পট্টী'টি কেনা হয়েছিল আরও পরে, তাই ১৬৭৬-৭৭ এবং ১৬৭৭-৭৮ সালে যে রাজস্ব দেখানো আছে, আসলে তা ধার্য হয়েছিল একটি পট্টী বা গ্রামের একের-তিন ভাগের ওপর। সেক্ষেত্রে তার অনুপাত ভূমিরাজস্বের আরও অনুকূলে যাবে।

প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, আরিফ ১৬৮৯ সালে ৬১ টাকা দিয়ে গ্রামটির আরও $\frac{1}{১৮}$ ভাগ কিনেছিলেন (Allahabad 1224)।

৫৯. ১৬৭৭-এ সম্পাদিত দুটি বিক্রয়-কোবালা পাওয়া গেছে। একটি $\frac{১}{২}$ ভাগের জন্য (দাম ৭০ টাকা), আরেকটি $\frac{১}{৪}$ ভাগের জন্য (দাম ৩২ টাকা)। (Allahabad 891 ও 1205)। এইভাবে গ্রামটির $\frac{৩}{৪}$ ভাগের জন্য যা দেওয়া হয়েছিল বলে জানা গেছে, তার ভিত্তিতে গোটা গ্রামটির দাম বার করা হয়েছে।

৬০. Allahabad 299.

হোক। সুতরাং জমির উৎপন্নের একটা অংশের ওপর জমিনদারদের অধিকার সীমাবদ্ধ থাকত দুভাবে: প্রথমত, চলতি প্রথা দিয়ে, দ্বিতীয়ত, বাদশাহী বা সরকারী নিয়মকানুন দিয়ে। জমিনদার হয়তো পোশাকীভাবে 'মালিক' বলে পরিচিত ছিল, তার স্বত্বকেও বলা হতো 'মিলকিয়ৎ', কিন্তু ঔপনিবেশিক যুগে যে ভূমিস্বত্বাধিকারী ভূমি-কর দিত আর ইচ্ছামতো উচ্ছেদযোগ্য প্রজাদের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট হারে খাজনা আদায় করত, জমিনদারকে তার সমান কল্পনা করার চেয়ে বড় ভুল আর কিছুই হতে পারে না।

সুতরাং, জমিনদারী বলতে জমির ওপর কোন স্বত্বাধিকার বোঝাত না। জমির উৎপন্নের ওপর অন্যান্য অধিকার ও দাবির সঙ্গে এটিও থাকত। সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষণীয় যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে গণ্য এমন সামগ্রীর যাবতীয় চিহ্ন জমিনদারী ব্যাপারটির (জমিনদারীর আওতায় জমির নয়) গায়ে লেগে ছিল। ওয়ারিশ সূত্রে জমিনদারী পাওয়া যেত এবং ইচ্ছামতো বেচাকেনা চলত।

জমিনদারীতে বংশানুক্রমিক অধিকার ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের সাধারণ নিয়ম। আওরঙ্গজেবের আমলে কোন রাজপুত সিংহাসনের জনৈক দাবিদারের সমর্থকরা এই আইনের আশ্রয় নিয়েছিল বলে দেখা যায়। যোধপুরের কাজীর সামনে তারা বলেছিল, "মারওয়াড় দেশের জমিনদারী রাজা যশবন্ত সিংহের সম্পত্তি ('মিল্‌ক্')। সুতরাং, তাঁর মৃত্যুর পর এটি ওয়ারিশন সূত্র ও অধিকারবলে তাঁর পুত্রদের উপর বর্তাবে।"[৬১] জমি বিক্রি বা বিবাদ সংক্রান্ত সমসাময়িক নথিপত্রে প্রায়ই দেখা যায়, এক বা অন্য দল জমিনদারীর ওপর অধিকার দাবি করছে মৌরুসী সূত্র পাওয়ার ভিত্তিতে, যেন মৌরুসই তাদের প্রাথমিক অধিকার দেয়।[৬২] জমি হস্তান্তরের একটি দলিলে সুনির্দিষ্ট কড়ার

৬১. তারা আরও বলেছে: "তাঁর ছেলেরা থাকতে ইন্দর সিংহ কী করে 'ওয়তন' আর জমিনদারীর মালিক হয়?" যশোবন্ত সিংহ মারা যান ১৬৭৮-এর ডিসেম্বরে। তাঁর মৃত্যুর পরে জাত দুই পুত্রের দাবি আওরঙ্গজেব ইন্দর সিংহের অনুকূলে নাকচ করে দিয়েছিলেন। মৃত রাজার দুজন কর্মচারী বাদশাহের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাজীর কাজে নালিশ জানায়। কাজীর কাছে তারা জানতে চায়: এ বিষয়ে 'শরিয়ৎ'-এর বিধান কী ('ওয়াকাই-এ আজমীর', ২৪৫-৬)। মুঘল সদর-এ আদালত রাজ্য বোঝাতে 'জমিনদারী' শব্দটি ব্যবহার করত। শুধুমাত্র এই কারণে রাজ্যের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সাধারণ জমিনদারীর আইন প্রয়োগ করা যত না সঠিক, তার চেয়ে বেশি কৌশলের লক্ষণ। কিন্তু এর থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়, সাধারণ জমিনদারীর ব্যাপারে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন কী ছিল।

৬২. অযোধ্যার একটি গ্রামের 'সতারহী' বিক্রি প্রসঙ্গে বহুসংখ্যক লোক ঘোষণা করে যে, "পিতা ও পিতৃপুরুষদের থেকে মৌরুসী সূত্রে এটি আমাদের ক্ষমতা ও অধিকারভুক্ত" ছিল (১৬৯৮ খৃস্টাব্দের Allahabad 435)। কয়েকজন আবেদনকারী বিহারে তাদের 'বিশ্বা' 'জমিনদারী'তে কয়েকজন আফগানের জবরদখলের বিরুদ্ধে দরবারে নালিশ জানায়। তাদের দাবি: এই স্বত্ব তাদের অধিকারে ছিল "পিতা ও পিতৃপুরুষ"দের সময় থেকে ('দুর-আল-উলুম', পৃ. ৫২ খ-৫৩ ক)। বিবাদের ক্ষেত্রে ঐ একই ধরনের ঘোষণা করতে দেখা যায় Allahabad 375 এবং 1214-এ। দুটি দলিলই অযোধ্যা থেকে পাওয়া, দুটিই আওরঙ্গজেবের আমলের।

আছে: হস্তান্তরকারীর কোন 'উত্তরাধিকারী' যাতে জমিনদারীতে অধিকার দাবি করতে না পারে।[৬৩] কোন কোন বিক্রয়-কোবালায় বিক্রেতারা চুক্তিবদ্ধ থাকে যে 'উত্তরাধিকারীরা' এসে জমির ওপর তাদের দাবি যদি প্রমাণ করে (মনে হয়, জমিনদারীর ওপর বিক্রেতার চেয়ে তাদের বেশি দাবি ছিল) তবে বিক্রেতারা ক্রেতাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।[৬৪] নথিপত্র থেকে আমরা এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাই যেখানে কোন জমিনদারের ছেলে বা অন্য কোন আত্মীয় জমিনদারী পেয়েছে উত্তরাধিকারসূত্রে। সেগুলি উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, আর অত জায়গাও পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে কৌতূহলের বিষয় এই যে, হিন্দু ও মুসলিম সম্পত্তি উত্তরাধিকার আইন পুরোপুরি প্রয়োগ করা হতো। দুটি আইনেই যেহেতু বাবার সম্পত্তিতে ছেলেদের সমান উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা আছে তাই বিনা ব্যতিক্রমে ছেলেদের মধ্যে জমিনদারী বাঁটোয়ারা হয়ে যেত। পরের অনুচ্ছেদে এর কয়েকটি সুনির্দিষ্ট উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। তার ওপর, হিন্দু ও মুসলিম আইনের বিধানে উত্তরাধিকারিণীদের দাবিও স্বীকৃত ছিল। অযোধ্যায় পাওয়া নথিপত্রে আমরা দেখি, হিন্দু ও মুসলিম স্ত্রীলোকেরা মৌরুসী সূত্রে 'জমিনদারী' বা 'মিলকিয়ৎ' স্বত্ব পাচ্ছে, বিক্রি করছে বা অন্যভাবে হস্তান্তর করছে।[৬৫]

৬৩. Allahabad 1192 (১৬৬৯ খৃ.)।

৬৪. Allahabad 891, 1196, 1205 ইত্যাদি।

৬৫. Allahabad, 1215 (১৬৮১ খৃ.)-এ, মহাসিংহ দেবীদাসপুর গ্রামের যে ⅓ অংশ বিক্রি করেছিলেন, এক 'ওয়কীল' (প্রতিনিধি) মারফৎ "সভানু, মহাসিংহের ভগিনী ও উত্তরাধিকারিণী" তা বহাল করেছেন। ক্রেতাকে তিনি আশ্বস্ত করেছেন এই বলে যে, উক্ত কয়েকজন লোক যদি ঐ গ্রামটির ওপর তাদের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তবে তিনি ক্রেতাকে তাঁর অধিকারভুক্ত অন্য একটি গ্রাম থেকে সমান অংশ দিয়ে দেবেন। ঐ একই বছরের শেষ দিকে ঐ ক্রেতাকে তিনি গ্রামের বাকি অংশ বেচে দেন (Allahabad 1216)। Allahabad 1205-এ মহাসিংহের জাতের যে-উল্লেখ আছে তার থেকে মনে হয় ঐ মহিলা ছিলেন ক্ষত্রী পরিবারভুক্ত। Allahabad 1195 (১৬৭২ খৃষ্টাব্দের) থেকে মনে হয়, দেবীদাসপুরের কাছে অবস্থিত বৈদৌরা ও বৈদৌরী গ্রাম দুটির 'মালিকা' ছিলেন জনৈকা "মুসম্মাৎ (শ্রীমতী) ভীকন"। বৈদৌরীর অর্ধেক ভাগ বেচে দেওয়া হয় ১৬৮৬-তে। বিক্রেতা দুজন (যারা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়েছে) বাবার নামের পর তাদের মা-এর নাম যোগ করেছে। নামটি পরিষ্কার পড়া যায় না, সম্ভবত ভীকন-ই (Allahabad, 1219)। সচরাচর এভাবে মা-এর নাম দেওয়া হতো না। এখানে সেটি দেওয়ার কারণ বোধহয় এই যে, বিক্রেতারা গ্রামের ওপর তাদের স্বত্ব পেয়েছিল বাবার কাছ থেকে নয়, মা-এর কাছ থেকে।

মুসলিম মহিলারা জমিনদারী স্বত্বের অধিকারী—এমন উল্লেখ অসংখ্য। দ্রষ্টব্য Allahabad 359, 810, 1191, 1208 ইত্যাদি (সবকটিই ১৭ শতকের)। কয়েকজন মুসলিম ('শেখ') এবং একজন হিন্দু ছুতোর একটি গ্রামের 'সতারহী' বিক্রি প্রসঙ্গে ঘোষণা করে যে, তারা এ কাজ করছে "নিজেদের হয়ে এবং তাদের মা-বোনদের তরফে।" সুতরাং তাদের মা-বোনেরাও নিশ্চয়ই সহ-স্বত্বাধিকারিণী ছিল (Allahabad 435, ১৬১৮ খৃ.)।

মনে হয় না যে জমিনদারীকে কোন অবিভাজ্য একক ধরা হতো, কেননা, আমরা এইমাত্র যা বললাম, উত্তরাধিকারীদের দাবি মেটাতে জমিনদারী ভাগ করা যেত। একটি ঘটনায় দেখা যায়, সম্ভল অঞ্চলে এক পরগনা নিয়ে একটা বড় জমিনদারী "একই পিতামহ থেকে আগত পৌত্রদের মধ্যে" বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেক উত্তরাধিকারীকে তার ভাগ হিসেবে দেওয়া হয়েছে কয়েকটি করে গ্রাম।[৬৬] বোঝাই যায় যে, ক্রমাগত এইভাবে ভেঙে চলার ফলে এমন একটা অবস্থা আসতই যখন পুরনো জমিনদারীর ভাগে একটার বেশি গ্রাম পড়ত না। প্রথম জমিনদারী প্রতিষ্ঠার সময় তার আওতায় একটিমাত্র গ্রাম থাকতে পারত—সে কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া হলো। কিন্তু দু-এর ক্ষেত্রেই পরবর্তী উত্তরাধিকারের সময় ওয়ারিশদের মধ্যে গ্রামটি ভাগ করে দিতে হতো। তারপর থেকে জমিনদারী-ভাগ গ্রামের একটি বিশেষ ভগ্নাংশ মাত্র হিসেবে দেখা দিত। অযোধ্যা থেকে পাওয়া ১৭ শতকের কয়েকটি নথিতে বাহ্‌রাইচ 'সরকার'-এ পসনাজৎ নামে একটি গ্রামের জমিনদারী নিয়ে এই ধরনের বিভাজন ও উপ-বিভাজনের প্রক্রিয়াটি খুঁটিয়ে দেখতে পারা যায়।[৬৭] মনে হয় গ্রামটি ছিল বড়, আর আদতে এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সম্পত্তি। প্রথমবার এটিকে 'পট্টী' নামে তিনটি প্রায় সমান ভাগে ভাগ করা হয়েছিল, সম্ভবত তিন ভাই-এর মধ্যে। কোন এক সময়ে এই তিন 'পট্টী'র সীমানা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল।[৬৮] যেসব বিক্রয়-কোবালা পাওয়া যায় তার সবই ঐ তিনটির মধ্যে দুটি 'পট্টী' সংক্রান্ত। দেখা যায়, প্রথম বিভাজনের পর অন্তত তিন পুরুষ পেরিয়েছে আর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রতিটি 'পট্টী'র আরও বিভাজন ও উপ-বিভাজন হয়েছে। নীচের তালিকায় বংশপঞ্জি আর উত্তরাধিকারীদের ভাগের পরিমাণ দেওয়া আছে। এর থেকে বোঝা যাবে, ভাইদের মধ্যে সমবিভাগের আইন অনুযায়ী গোটা গ্রামের ঠিক কতটা করে অংশ ওয়ারিশের ভাগে পড়ত।
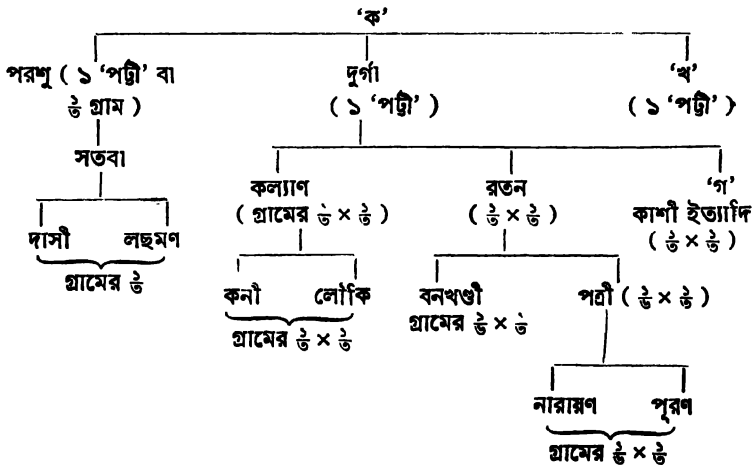
৬৬. 'দুর-আল উলুম', পৃ. ৪৩ ক-৪৪ ক।

৬৭. দলিলগুলি হলো Allahabad 1186, 1196, 1221, 1222 এবং 1224. 1186 বাদে সবগুলিই বিক্রয়-কোবালা। বিক্রয়মূল্য ও বার্ষিক রাজস্বের তুলনামূলক সারণিতে যে পসনাজৎ-এর কথা বলা হয়েছিল, এ সেই পসনাজৎ।

৬৮. সবচেয়ে আগের পসনাজৎ দলিল, Allahabad 1196 থেকে এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায়।

লক্ষণীয় এই যে, যদিও গ্রামটি তিনটে 'পট্টী'তে ভাগ করাই ছিল, প্রতিটি উত্তরাধিকারীর ভাগ কিন্তু গ্রাম ও 'পট্টী' দু-এরই ভগ্নাংশ হিসেবে নির্দিষ্টকরা আছে। নথির ভাষায়, "পসনাজৎ গ্রামের একের-তিন ভাগের (অর্থাৎ, এক 'পট্টী'র) পুরো ছ ভাগ অর্থাৎ, গোটা গ্রামের একের-আঠারো ভাগ।" দু দশকের মধ্যেই এই জমির কিছু কিছু অংশ বেচে দেওয়া হয়। যে-দামে সেগুলি বিক্রি হয়েছিল তাও মোটামুটি-ভাবে তাদের ভগ্নাংশের মূল্যের সঙ্গে মিলে যায়।[৬৯]

জমিনদারী যদিও সর্বদাই ভাগ করা যেত, তবু মূল জমিনদারীর ভগ্নাংশ হিসেবে ওয়ারিশদের স্বত্ব নির্দেশ থেকে মনে হয় তখনও পর্যন্ত জমিনদারীর অখণ্ডতা সম্পর্কে এক ধরনের স্বীকৃতি রয়ে গিয়েছিল। কতকক্ষেত্রে ওয়ারিশদের মধ্যে বাঁটোয়ারা-করা জমিনদারীকে 'মুশ্‌তারিক' অর্থাৎ 'সাধারণভাবে অধিকৃত' বলা হয়েছে।[৭০] এমন নজিরও আছে যেখানে জমিনদারীর ওপর প্রত্যেক ওয়ারিশের ভাগের স্বীকৃতি দেওয়া হলেও জমি আসলে ভাগাভাগি করা হয়নি; অন্তত বেশ কিছুদিন ধরে যৌথ পরিবারের অধিকারভুক্ত বলে ধরা হয়েছে। জমিনদারীর আয় সম্ভবত ওয়ারিশদের ভাগের পরিমাণ অনুযায়ী তাদের মধ্যে বেঁটে দেওয়া হতো। একটি পসনাজৎ নথি থেকে স্বাভাবিকভাবে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয়। সেখানে দেখানো আছে, বহু শরিক থাকা সত্ত্বেও গ্রামের মাঝখানের 'পট্টী'র জমি দুই বা তিন পুরুষ ধরে অবিভক্তই থেকে গিয়েছিল। যখন একজন বাইরের লোক দু ভাগ কিনে নিল (যার পরিমাণ 'পট্টী'র অর্ধেক) কেবল তখনই তাদের ভাগ অনুযায়ী জমির সীমারেখা টেনে দেওয়া হলো।[৭১]

জমিনদারীর নানান দিক সম্বন্ধে এত তথ্য যখন সমসাময়িক বিক্রয়-কোবালা

বিক্রেতারা ঘোষণা করেছে যে গ্রামের একের-তিন ভাগ তাদের দখলে আছে এবং "একের-তিন ভাগ অংশ নিয়ে গঠিত যে 'পট্টী' আমাদের আছে, তা আলাদা করে রাখা হলো ও তার চারদিকে এইভাবে সীমানা দেওয়া হলো" ইত্যাদি। Allahabad 1186-এও দেখা যায়, জমিতে তিনটি পট্টীর সীমানা দাগিয়ে রাখা হয়েছিল।

৬৯. যে ক-টি বিক্রয়-কোবালা রক্ষা পেয়েছে সেগুলিতে পসনাজৎ-এর জমিনদারীর বিভিন্ন ভাগের বিক্রয়-মূল্য নির্দিষ্ট করা আছে। তা এই :

পট্টী ১ (গ্রামের ১/৩ ভাগ) :	৪০৫ টাকা,	১৬৭২ খৃষ্টাব্দ	(Allahabad 1196)
গ্রামের ১/৩ ভাগের ১/৩ ভাগ (পট্টী ২) :	১২৭ টাকা,	১৬৮৮ ,,	(,, 1222)
১/৩ ভাগের ১/৩ ভাগ (পট্টী ২) :	৫৭ টাকা,	—	(,, 1221)
গ্রামের ১/১৮ ভাগ (পট্টী ২-তে) :	৬১ টাকা,	১৬৮৯ ,,	(,, 1224)

৭০. 'দুর-আল উলুম', পৃ. ৪৪ ক; আরও দ্রষ্টব্য পৃ. ৪৭ খ।

৭১. Allahabad 1186 : একটি 'কিসমৎ-নামা'। জমিটি মেপে তুটি টুকরোয় ('তথ্‌তা') ভাগ করা হয়। তারপর এর থেকে ক্রেতাকে ও বাকি অধিকারীদের সমান অংশ বরাদ্দ করা হয়। প্রতিটি ভাগের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সমেত তার সীমানার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। দলিলটির তারিখ খুঁজে পাইনি, কিন্তু সম্ভবত এটি ১৬৮৮ বা ১৬৮৯-এর।

থেকেই পাওয়া যাচ্ছে, তখন জমিনদারী যে সত্যিই বিক্রয়যোগ্য ছিল এ কথা প্রমাণের চেষ্টা করা মানে স্পষ্ট ব্যাপার নিয়ে ধস্তাধস্তি করার ঝুঁকি নেওয়া। কিন্তু বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ ও প্রশ্নাতীত হওয়া একান্তই প্রয়োজন—আর কিছু না হোক, শুধু এর ওপর জোর দেওয়ার জন্যই সে ঝুঁকি নিতে হবে। জমিনদারী যে বিক্রয়যোগ্য—এই নীতি প্রথম সরাসরি ঘোষণা করা হয়েছে কেবলমাত্র ১৮ শতকের রাজস্ব সংক্রান্ত এক পরিভাষাকোষে[৭২]। সত্যিকারের বেচাকেনার নথিবদ্ধ নজির পাওয়া যায় আকবরের আমল থেকে[৭৩], আওরঙ্গজেবের আমলে এ ঘটনা আরও ব্যাপক হয়ে ওঠে। আওরঙ্গজেবের দরবার থেকে জারি-হওয়া আদেশনামা অনুযায়ী, জমিনদারী স্বত্বের ওপর পরস্পরবিরোধী দাবির ফয়সালা করার সময় খেয়াল রাখতে হবে তার দরুন বিক্রিবাটার কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা।[৭৪] আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে ইংরেজদের কাছে কলকাত্তা (পরে কলকাতা) ও আরও কয়েকটি গ্রাম বিক্রি করেছিলেন সেখানকার জমিনদাররা।[৭৫] ঐ একই প্রদেশে (বাংলা) মালদায় ইংরেজরা এক স্থানীয় জমিনদারদের কাছ থেকে জমি কিনেছিল।[৭৬] এলাহাবাদের নথিপত্র থেকে অযোধ্যায় এই ধরনের প্রচুর বেচাকেনার নজির পাওয়া যায়।[৭৭] শাহ্জাহানের একটি ফরমানে মথুরার কাছে একটি জমিনদারী বিক্রির উল্লেখ আছে।[৭৮] গুজরাটেও জমিনদাররা তাদের জমি বেচতে পারত, কারণ বলা হয়েছে যে তাদের বিক্রি-করা জমির নাম ছিল 'বেচান'।[৭৯]

মনে হয়, জমিনদারী স্বত্ব বিক্রির ব্যাপারে সচরাচর কোন সরকারী কড়াকড়ি ছিল না। ইংরেজরা যখন কলকাত্তা ও অন্যান্য গ্রাম কেনে তখন প্রাদেশিক দিওয়ান একটি

৭২. Add. 6603, পৃ. ৬৫ ক।

৭৩. ৩৮-তম ইলাহী বছরে আকবরের জারি-করা একটি ফরমানে উল্লেখ করা হয়েছে যে গোঁসাই বিঠল রায় মথুরার কাছে উক্ত গ্রামের "জমিনদারদের কাছ থেকে জমি কিনেছেন" (জাভেরী, 'ডক্যু'. ৪র্থ খণ্ড)। আরও আগের একটি দলিলে, Allahabad 317 (১৫৮৬ খৃ.), অযোধ্যায় সাণ্ডিলা পরগনার একটি গ্রামের " 'সতারহী' এবং 'বিশী' " বিক্রির কথা নথিভুক্ত আছে।

৭৪. 'দুর-আল উলুম', পৃ. ৪৮ ক, ৬২ ক।

৭৫. Add. 24,039, ৩৬ ক-খ, ৩৯ ক।

৭৬. "মালদা ডায়রি অ্যাণ্ড কনসাল্টেশনস", *JASB*, N. S, খণ্ড ১৪, ১৯১৮, পৃ. ৮১-২, ১২২-৩। জনৈক 'রাজারায়'-এর কাছ থেকে এই জমি কেনা হয়েছিল। এখানে তাকে বলা হয়েছে 'চৌধুরী', কিন্তু পরে 'জিম্মেদার' (পৃ. ১৭৪, ১৮২, ১৯৬, ২০২)। কথাটি অবশ্যই 'জমিনদার' শব্দের বিকৃত রূপ।

৭৭. Allahabad 891, 1180, 1194, 1196, 1205, 1215, 1219, 1221, 1222, 1224, 1227—বাহ্রাইচ 'সরকার'-এর ক্ষেত্রে; লখনউ 'সরকার'-এ 'পরগনা' সাণ্ডিলার জন্য Allahabad 317, 435, 464. এইসব দলিল আওরঙ্গজেবের আমলের বা তার পূর্ববর্তী সময়ের। Allahabad 1192 (১৬৬৯ খৃস্টাব্দের) নেহাৎই এক হস্তান্তর-কোবালা।

৭৮. জাভেরি, 'ডক্যু'. ৬ষ্ঠ খণ্ড।

৭৯. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৩।

পরওয়ানা জারি করে তার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু স্পষ্টতই এটি ছিল এক বিশেষ ঘটনা যার সঙ্গে একটি বিদেশী কম্পানি জড়িত। কিন্তু অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও এমন কোন ইঙ্গিত নেই যে বেচাকেনা কার্যকর হওয়ার আগে কর্তৃপক্ষের আগাম অনুমতি নিতে হতো। প্রচলিত রীতিনীতিও কোন দুস্তর বাধা সৃষ্টি করত বলে মনে হয় না। উত্তরাধিকারের মতো বিক্রির সময়েও জমিনদারী ভাগ করা যেত। অধিকারী জমির এক অংশ রেখে আরেক অংশ বিক্রি করতে পারত।[৮০] পসনাজৎ-এর ঘটনায় আমরা দেখি : গোটা গ্রামের জমিনদারী গোড়ায় যে-পরিবারের অধীনে ছিল, সেই পরিবারের লোকে তাদের অন্যান্য শরিকদের উল্লেখ না করেই যে যার নিজের অংশ বিক্রি করে দিচ্ছে। শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্রে দেখা যায়, এক মুসলিম পরিবারের জমিনদারীতে এক ভাগের অধিকারী অন্য ভাগের ক্ষেত্রে 'হক্‌সফা' (আগে কেনার অধিকার) দাবি করছে।[৮১]

জমিনদারী যদি বিক্রিই করা যেত, তাহলে ইজারাও দেওয়া যেত। ইজারা সংক্রান্ত একটি দলিল আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। তিন বছর ধরে ইজারাদারকে বাৎসরিক দুটি ফসলের জন্য প্রতিবার কত করে দিতে হবে তা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ আছে।[৮২] ইজারা ফিরিয়ে দেওয়ার সময়ে চাষীদের কাছে তার দেওয়া 'তকাবী' ঋণ-শোধ বকেয়া থাকলে কিস্তিতে কিস্তিতে তা আদায় করার অনুমতি দেওয়া আছে আরেকটি দলিলে।[৮৩] দুটি নথিতেই জোর দিয়ে বলা হয়েছে, জমিনদারী ইজারা নিলে ইজারাদারের ওপর কোন 'মিলকিয়ৎ' স্বত্ব বর্তায় না।[৮৪]

২. জমিনদার শ্রেণীর উদ্ভব, গঠন ও শক্তি

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শুধু জমিনদারী স্বত্বের আইনগত বিষয় ও স্বরূপ নিয়েই আলোচনা করেছি। যে ঐতিহাসিক প্রসঙ্গে এই স্বত্বকে দেখতে হবে তা আমরা বাদ দিয়েছিলাম। জমিনদারী স্বত্বের অধিকারীরা সম্পত্তি বলে বিবেচিত কোন বস্তুর মতো ধরা-ছোঁয়ার যোগ্য বস্তুর অধিকারী ছিল না। তাদের ছিল সমাজের উৎপাদনের ওপর একটা বাঁধা ভাগের আইনগত অধিকার। এই অধিকার আকাশ থেকে পড়তে পারে না। সামাজিক শক্তিগুলিই এর জন্ম দিয়েছিল। ১৮ শতকের

৮০. উদাহরণস্বরূপ, মহাসিংহ দেবীদাসপুর গ্রামের [জমিনদারীর] $\frac{১}{৩}$ ভাগ বিক্রি করেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারিণী সভানু বাকি $\frac{১}{৩}$ ভাগ বিক্রি করেন অনেক পরে (Allahabad 1215 ও 1216)।

৮১. Allahabad 1200 (১৬৭৬ খৃস্টাব্দের)।

৮২. Allahabad 1230. গ্রামটির "'মিলকিয়ৎ' ও জমিনদারী"-র অধিকারী 'মদদ-এ মআশ'-ক্রমেও এর অধিকারী ছিলেন। রাজস্ব আদায়ের অধিকারও তাই ইজারার মধ্যেই পড়ত।

৮৩. Allahabad 323.

৮৪. Allahabad 323 ও 421. এই অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত সমস্ত ইজারার দলিলই আওরঙ্গজেবের আমলের।

লেখকরা দেখেছেন, এই স্বত্বের উৎস রয়েছে বহু দূরে, কম করে মুসলিম রাজত্বের গোড়ার দিকে।[১] সুলতানরা কিছু কিছু জমির জমিনদারী স্বীকার করে থাকতে পারেন[২], কখনও কখনও তা হয়তো মঞ্জুরও করেছিলেন, তবুও মনে হয় তাঁদের উদ্যোগের অপেক্ষা না রেখেই এই স্বত্বটির সৃষ্টি হয়েছিল। মধ্যযুগের গোড়ার দিক সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যেভাবে বাড়ছে তাতে একদিন হয়তো যে-প্রক্রিয়ায় এই স্বত্বের বিবর্তন হয়েছিল সে সম্পর্কে আরও নিশ্চিতভাবে বলা যাবে। এখন অবশ্যই স্থানীয় কিংবদন্তীর ওপরেই নির্ভর করতে হবে। ঐতিহাসিক নজির হিসেবে যদিও এককভাবে এগুলি খুবই অসম্পূর্ণ, তবু যেসব বিষয়ে সব নজিরই একমত বা প্রায় একমত, সেখানে তাদের অগ্রাহ্য করা খুব মুস্কিল। সাধারণত, স্থানীয় জমিনদারী স্বত্বের উৎপত্তি বর্ণনা করতে গিয়ে এই কিংবদন্তীগুলিতে ছকে-বাঁধা এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়। প্রথমে কোন জাত বা গোষ্ঠীর লোকে এক জায়গায় গেড়ে বসে। যে-চাষীরা সেখানে আগেই বসত করেছিল তাদের ওপর এরা আধিপত্য বিস্তার করে, কখনও হয়তো এরা নিজেরাই চাষী। তারপর আরেকটি গোষ্ঠী এসে তাদের তাড়িয়ে দেয় বা তাদের ওপর আধিপত্য কায়েম করে : তারপর আসে আরও একটি গোষ্ঠী। একেবারে গোড়া থেকে যদি না-ও হয়, তবু এই প্রক্রিয়ার কোন এক স্তরে বিজয়ী 'ক়ওম'-এর আধিপত্যই জমিনদারী স্বত্ব হিসেবে দানা বাঁধে। সেই 'কওম'-এর প্রথম সারির লোকেদের অধিকারে থাকে বিজিত অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ। মনে হয় এই প্রক্রিয়া চলছিল মুঘল আমল অবধি। কিংবদন্তী ছাড়াও আমাদের হাতে অন্যান্য সূত্র আছে, তার থেকে জানা যায় এই প্রক্রিয়া সেখানেই থামেনি।[৩]

১. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, ১৭৩-৫, থেকে যে-অংশ আগে এই অধ্যায়ে উদ্ধৃত করা হয়েছে তার সুস্পষ্ট তাৎপর্য এই। আরও সরাসরি বক্তব্য পাওয়া যাবে Add. 6603, পৃ. ৬৫ ক-য়।

২. পরের অংশ দ্রষ্টব্য।

৩. ১৯ শতকের গোড়ার দিকে গোরখপুর জেলা নিয়ে ফার্সীতে একটি স্মৃতিচিত্র লেখা হয়েছিল। কিংবদন্তীর সাক্ষ্যের আদর্শ নমুনা হিসেবে তার একটি ছোট অংশ ব্যবহার করা যেতে পারে : "প্রাচীনকালে এই শহরের (গোরখপুরের) আশপাশের ওপর আধিপত্য ('রিয়াসৎ') এবং 'রাজ' ছিল ডোম জাতের ('কওম')। তাই বতিয়ালগড়, রামগড়, ভিন্দিয়াগড়, ডোমনগর ইত্যাদি শহরের লাগোয়া এলাকায় আজও তাদের কেল্লার অবশেষ দেখা যায়। আর গ্রামগুলিতে ছিল থারু, অর্থাৎ পাহাড়ী জাতের ('কওম') বসতি। সেই জাতীয় ('কিস্‌ম্‌') লোকে এখন পাহাড়ের পাদদেশে বাস করছে। পাহাড় থেকে আনা জিনিসপত্র বিক্রির জন্য বটোল-এর বাজার বসত গোরখপুরে। মুসলমানদের শাসন কায়েম হওয়ার পর থেকেই থারুদের বাজার এবং বসতি আস্তে আস্তে উঠে গেল। এখন তা টিঁকে আছে কেবল তরাই-এ। শ্রীনগরের আদি বাসিন্দা কিছু শ্রীনিৎ রাজপুত তাদের পুরোপুরি উচ্ছেদ করে নিজেদের ক্ষমতা কায়েম করছে। এখনও পর্যন্ত তারা 'রাজা গোরখপুরী' নামে পরিচিত। তাই তাদের পরবর্তী বংশধররা সিলহট-এর কিছু গ্রাম ও গোরখপুরের কাছাকাছি পরগনায় 'জমিনদারী'র অধিকারী। বহু 'বির্তিয়া' (জমিনদার) 'রাজা গোরখপুরী'দের সনদ-বলে সিলহট এবং গোরখপুর শহরতলীর পরগনায় (তাদের জমির) অধিকারী হয়েছে। পরে,

জমিনদারী স্বত্ব স্থাপনের প্রচলিত কিংবদন্তীমূলক বিবরণের এই সংক্ষিপ্তসার থেকে একটি কথা স্পষ্ট বোঝা যায়: (যে-কয়েকটি 'কওম' বিভিন্ন এলাকায় জমিনদারী জমি-জোত একচেটিয়াভাবে দখলে রেখেছিল এই বিবরণগুলিতে ধরা হয়েছে জমিনদার শ্রেণী তাদের নিয়ে গঠিত। জমিনদারীর সঙ্গে 'কওম'-এর এই যোগসূত্রটি 'আইন-এ আকবরী'র সাক্ষ্যও পুরোপুরি সমর্থন করে।) 'বারোটি প্রদেশে'র বিশদ আদমশুমারীতে 'জমিনদার' বা 'বূমী'র জন্য একটি স্তম্ভ রাখা আছে। এতে একমাত্র তথ্য দেওয়া আছে জমিনদারের 'কওম' (বহুবচনে 'আকওআম') সম্পর্কে। এই অধ্যায়ের গোড়াতেই বলা হয়েছে যে, হিন্দুস্তান ও গুজরাটের সমস্ত প্রদেশগুলির প্রত্যেক পরগনার জন্য এই স্তম্ভে আলাদা আলাদা উল্লেখ আছে। সাধারণত প্রত্যেক পরগনার পাশে একটিমাত্র 'কওম'-এর নাম দেওয়া থাকে, কখনও কখনও দুটি বা তিনটির। 'নানান কওম' বা শুধু 'নানান' কথাটি খুবই বিরল।[৪] সুতরাং ধরে নিতে হবে যে একই 'কওম'-এর লোকদের জমিনদারীর অধীনে ছিল এক বা একাধিক পরগনা নিয়ে গঠিত সুনির্দিষ্ট অঞ্চলবিভাগ।[৫]

'আইন'-এর প্রামাণ্য সাক্ষ্য যদিও আর কোন সমর্থনের অপেক্ষা রাখে না, তাহলেও কয়েকটি অঞ্চলে জমিনদারী 'কওম'গুলির আলাদা-আলাদা উল্লেখের কথাও এর সঙ্গে যোগ করা যায়। বাবুরের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি যে লবণ রেঞ্জ-এর

আকবরের আমলে কচ্ছোর-এর 'তালুকদার'-এর পূর্বপুরুষরা (যারা আগে তাদের স্বজনদের (আক্ষরিক: ভাইদের) সঙ্গে ভোওয়াপারা পরগনায় বাস করত) গোরখপুর শহরতলী এবং সিলহট-এর জমিনদারী দখল করে নেয়। সেই থেকে আজও এটি তাদের বংশধরদের হাতেই আছে।" (গুলাম হজরৎ, 'কওয়াইফ-এ গোরখপুর' (১৮১০ খৃ.) I. O. 4540, পৃ. ৫ খ-৬ ক, আলীগড় পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৭ ক-খ)।

অযোধ্যায় 'জমিনদারী' বিষয়ে স্থানীয় কিংবদন্তীর দুটি উৎকৃষ্ট সমীক্ষা হলো সি. এ. এলিয়ট-এর 'দা ক্রনিকল্‌স্‌ অফ উনাও', এলাহাবাদ, ১৮৬২ এবং ডব্লু. সি. বেনেট, 'এ রিপোর্ট অন দ্য ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ দা চীফ ক্ল্যান্‌স্‌ অফ রায় বেরিলী ডিস্ট্রিক্ট', লখনউ, ১৮৭০।

৪. মূলে 'আকওয়াম এ মুখ্‌তলিফা' ও 'মুখ্‌তলিফা'। তুলনীয়, এলিয়ট, 'মেমোয়ার্স' ইত্যাদি, ২য় ভাগ, পৃ. ২০৪।

৫. এলিয়টের 'মেমোয়ার্স' ইত্যাদি, ২য় ভাগ, পৃ. ২০২ ও ২০৩-এর মধ্যে খুবই কৌতূহলজনক একসারি মানচিত্র পাওয়া যায়। প্রথমটিতে দেখানো আছে পুরনো উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলির এলাকায় (অযোধ্যা বাদে) "'আইন-এ আকবরী' অনুযায়ী জমিনদারী অধিকারের এলাকা" এবং দ্বিতীয়টিতে, "১৮৪৪ খৃস্টাব্দে জমিনদারী অধিকারের এলাকা"। ছোট স্কেলে আঁকার দরুন মানচিত্রগুলিতে কতক জিনিস বিশদভাবে দেখানো নেই। যেমন, 'আইন'-এ যে বিভিন্ন রাজপুত গোষ্ঠীর নাম আছে তাদের তফাৎ করা হয়নি, আর তাদের সকলের 'অধিকৃত' এলাকাই একই রঙ দিয়ে দেখানো হয়েছে। তাহলেও, মানচিত্রগুলির নিজস্ব মূল্য আছে, কারণ 'আইন'-এর আমল থেকে সিপাহী বিদ্রোহের আগের সময় পর্যন্ত বড় 'কওম'গুলির আওতার জমিনদারী এলাকায় যেসব বড় মাপের পরিবর্তন হয়েছিল এইসব মানচিত্রে তা দেখানো আছে।

এলাকাটি জ্দ, জনজ্হা এবং ঘক্কর—এই তিন উপজাতির অধীনে তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। তারা ঐ এলাকার সমস্ত অধিবাসীর কাছ থেকে প্রতি বলদের লাঙল এবং গৃহস্থালি পিছু কয়েকটি প্রথাগত পাওনা আদায় করত (যেগুলিকে আমরা জমিনদারী উপকর বলে ধরে নিতে পারি)।[৬] একইভাবে আজমীর প্রদেশে রাজপুত গোষ্ঠীদের উল্লেখ পাওয়া যায়, তারা যৌথভাবে কতক এলাকার জমিনদারী অধিকার করেছিল।[৭] অযোধ্যা এবং এলাহাবাদ প্রদেশের সংলগ্ন এলাকায় সরকারীভাবে বাইসওয়ারা নামে একটি জেলা গঠন করা হয়েছিল। বলা হয়েছে, এর মধ্যে ছিল "অনেক কটি 'মহাল' যেগুলি বাইস গোষ্ঠীর ('কওম') রাজদ্রোহী জমিনদারদের আবাস।"[৮]

স্থানীয় ইতিহাসের একজন সেরা ছাত্র চার্লস এলিয়ট, মনে হয়, জমিনদারী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে জমি ভাগাভাগির এই ব্যাপারটিতে খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, "পরগনার সীমানা প্রায় কখনোই তার বাস্তব বা ভৌগোলিক সীমানার সঙ্গে মেলে না; এবং এগুলির অনিয়মিত সীমারেখার আর একটি মাত্র কারণ মনে হয় স্বত্বাধিকার।" তারপর একটি যুক্তিপরম্পরায় (যা এই মুহূর্তে আমাদের বিবেচ্য নয়) তিনি প্রস্তাব করেছেন যে "কোন অবিভক্ত গোষ্ঠীর অধিকৃত ভূখণ্ড"—এইভাবে 'পরগনা'র সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে।[৯]

জমিনদারী স্বত্ব যেভাবে এসেছিল তারই ফলে নানান জাত ও গোষ্ঠীর মধ্যে জমিনদারী অধিকারের আঞ্চলিক বিভাগ দেখা দেয়: এর সৃষ্টি হয়েছিল ঐতিহাসিকভাবে। কোন পদ্ধতি অনুসারে এটি গড়ে উঠেছিল—এমন মনে করলে ভুল হবে। কোন গোষ্ঠী কোন এক অঞ্চল জয় করতে পারত, কিন্তু প্রাক্তন ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সমস্ত লোককে তাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হতো না। শেষোক্ত গোষ্ঠীর কেউ কেউ এ-কোণে ও-কোণে তাদের দখল বজায় রাখতেও পারত।[১০] জমিনদারী অধিকার

৬. 'বাবুরনামা', অনু. এস বেভারিজ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৯-৮০, ৩৮৭। আরও দ্রষ্টব্য 'তবাকৎ-এ আকবরী', ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৯-৬০।

৭. যথা, 'ওয়াকাই-এ আজমীর', পৃ. ৩৬৪-৫তে সইন্ধাল ও দেওয়াল-এর 'কওম' সংক্রান্ত উল্লেখ।

৮. 'ইন্‌শা-এ রোশন কলাম', পৃ. ৬খ-৭ক। বাইসওয়ারার মধ্যে পড়ত লখনউ, অযোধ্যা, মনকপুর এবং কোরা 'সরকার'গুলির খানিক অংশ। এই অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য জমিনদারী গোষ্ঠী হিসেবে বাইস 'কওম' এখনও আছে। 'আইন'-এর 'মহাল' তালিকায় জমিনদার হিসেবে যে সব বাইসের নাম আছে তার সঙ্গে এলিয়টের 'ক্রনিকল্‌স্ অফ উনাও', পৃ. ৬৭-তে বাইসওয়ালার 'মহাল' তালিকার তুলনা বেশ কৌতূহলজনক। অধিকাংশ 'মহাল'-এর নাম দুটি তালিকাতেই আছে, কিন্তু নিশ্চয়ই কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনও হয়েছিল।

৯. 'দা ক্রনিকল্‌স্ অফ উনাও', পৃ. ১৪৯ টীকা।

১০. এই অংশেই আগের একটি পাদটীকায় (৩) গোরখপুর সম্পর্কে গুলাম হজরতের স্মৃতিচিত্রের যে অংশ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তাতে পরিষ্কার দেখা যায় যে, কচ্ছোর-এর তালুকদারের পূর্বপুরুষ এবং তার স্বজনরা যখন সিলহট এবং গোরখপুর শহরতলীর পরগনাগুলির জমিনদারী দখল করে নিল, তখনও শ্রীনিৎ রাজপুতদের পুরনো গোষ্ঠীটি উভয় পরগনারই "কিছু গ্রামে" 'জমিনদারী' ভোগ করত।

যখন পুরোপুরি সম্পত্তির জিনিস হয়ে উঠল, তার বেচাকেনা শুরু হলো (গোটা মুঘল আমল জুড়ে তা-ই হয়েছে), তখনই আরও বেশি অব্যবস্থা দেখা দেয়। তারপর হয়তো টাকা এসে পুরনো 'কওম'-এর বুরুজে ফাটল ধরিয়ে বাইরের লোকের জন্য দরজা খুলে দিল।

জমিনদারী স্বত্ব কীভাবে বিক্রেতার কাছ থেকে অন্য 'কওম'-এর, এমনকি বহু ক্ষেত্রে অন্য ধর্মের লোকের কাছে চলে যেত, এলাহাবাদে রক্ষিত বিক্রয়-কোবালাগুলিতে তার প্রচুর নজির পাওয়া যায়। জমিনদারী স্বত্বের কয়েকটি দিক ব্যাখ্যা করতে হিসামপুরের যে পাঁচটি গ্রামের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, দৃষ্টান্ত হিসেবে সেগুলিই আবার নেওয়া যেতে পারে। এমনকি গোড়াতেও এই পাঁচটি লাগোয়া গ্রাম একই জাতের লোকের হাতে ছিল না : তিনটি ছিল ব্রাহ্মণদের, দুটি ক্ষত্রীদের। কিন্তু কুড়ি বছরের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে দুই সৈয়দ (বাবা ও ছেলে) একের পর এক জমিনদারী কিনতে কিনতে পুরনো জমিনদারদের সবাইকে কিনে ফেলেছিলেন।[১১] অযোধ্যার আরেক অংশে, সাণ্ডিলা পরগনায়, জমিনদার হিসেবে দুই গোষ্ঠী—বাছল এবং গাহ্লোট-এর নাম 'আইন'-এ আছে।[১২] কিন্তু আকবরের আমলের একটি নথিতে দেখা যায়, কয়েকজন ব্রাহ্মণ ও অন্যান্যরা এই পরগনারই একটি গ্রামের 'সতারহী' এবং 'বিসী' বিক্রি করছে জনৈক মুসলমানকে।[১৩] আওরঙ্গজেবের আমলেও দেখি, ঐ একই পরগনার একটি গ্রামের 'মিলকিয়ৎ' অর্থাৎ 'সতারহী' বিক্রি হচ্ছে। ক্রেতা : কালোয়ার (শুঁড়ি) জাতের দু-জন অ-মুসলমান, বিক্রেতা : কয়েকজন মুসলমান ('শেখ') ও একজন অ-মুসলমান ছুতোর (মিলিতভাবে)।[১৪] এসব নথিপত্র থেকে দৃষ্টান্ত আরও বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের বড় কেন্দ্রগুলি থেকে অনেক দূরের এলাকাতেও টাকার খেলা শুরু হয়েছিল, জমিনদারী স্বত্বের উপর 'কওম'-অধিকারের সীমানা ভেঙে দিচ্ছিল—এই ঘটনা দেখাবার জন্য আগে যা বলা হয়েছে তা-ই যথেষ্ট।

জমিনদারী ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত আরেকটি বৈশিষ্ট্যও কিংবদন্তী থেকে বেরিয়ে আসে। এবার সেদিকে ফেরা যাক। এই নজির থেকে আমরা বুঝতে পারি, প্রত্যেক 'কওম'-ই জমিনদারীর ওপর তার অধিকার কায়েম করত একটি মোক্ষম উপায়ে। সেটি হলো তার অধীনস্থ সশস্ত্র বাহিনী। সশস্ত্র বাহিনীই জমিনদারী স্বত্ব প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণের প্রথম ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত হিসেবে দেখা দেয়।

'আইন'-এ বলা হয়েছে, "(সাম্রাজ্যের) জমিনদারদের সৈন্য ছিল চুয়াল্লিশ লক্ষেরও বেশি।[১৫] ঐ একই বাক্যের আরেকটি অংশে বলা হয়েছে যে, এইসব

১১. Allahabad 891, 1196, 1205, 1215, 1216, 1219, 1221, 1222, 1224. লক্ষণীয় এই যে, 'আইন'-এ হিসামপুর পরগনার 'জমিনদার' হিসেবে এই নামগুলি আছে : "রেকওয়ার, জালে এবং কিছু বসীন"। ব্রাহ্মণদের কোন উল্লেখ নেই, সৈয়দদেরও না।

১২. 'আইন', ১ম খণ্ড, ৪৬৯।

১৩. Allahabad 317.

১৪. Allahabad 435.

১৫. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৫। ব্লখমান লক্ষ্য করেছেন যে তাঁর ব্যবহৃত ছুটি পাণ্ডুলিপিতে বাক্যটির গোড়ায় "বাহিনী ও জমিনদাররা"—এই লেখা আছে, 'জমিনদার' শব্দটির আগে

সৈন্যবাহিনীর বিশদ বিবরণ অন্যত্র দেওয়া আছে। "বারোটি প্রদেশ"-এর পরিসংখ্যান সারণিতে "ঘোড়সওয়ার" এবং "পদাতিক" শীর্ষক স্তম্ভগুলির কথাই নিশ্চয় বলা হচ্ছে।[১৬] "জমিনদার" স্তম্ভের ঠিক পাশেই আছে এই স্তম্ভগুলি; যদিও সরাসরি বলা নেই তবু পরিষ্কার বোঝা যায় যে এগুলিতে জমিনদারদের সৈন্যসংখ্যাই দেখানো হয়েছে। যেখানেই প্রতি পরগনায় 'জমিনদার' স্তম্ভটি পূরণ করা আছে, সেখানেই দেওয়া আছে ঘোড়সওয়ার ও পদাতিকের সংখ্যা।[১৭] একইভাবে যেখানে গোটা 'সরকার'-বাবদ জমিনদারদের 'কওম' দেওয়া আছে, সেখানে শুধু 'সরকার' পিছু সৈন্যসংখ্যাই পাওয়া যায়। পরগনার অঙ্কগুলি থেকে আরেকটি জিনিস স্পষ্ট বোঝা যায়: এতে কেবলমাত্র করদ প্রধানদেরই সৈন্য গণনা করা হয়নি, প্রধানত মামুলি জমিনদারদের সৈন্যবাহিনীর হিসেবই দেওয়া হয়েছে। সরাসরি প্রশাসিত অঞ্চলের পরগনাগুলিতে নথিভুক্ত সৈন্যের সংখ্যা করদ প্রধানদের এলাকার সংখ্যার চেয়ে সত্যিই অনেক বেশি। প্রত্যেক প্রদেশের মোট সৈন্যসংখ্যাও দেওয়া আছে। এখানে সাধারণত তার উল্লেখ করা হয়েছে 'বূমী' (জমিনদারের সমার্থক) হিসেবে। গোটা সাম্রাজ্যে সব প্রদেশের সৈন্যসংখ্যার যোগফল ৪৪ লক্ষের সামান্য বেশি। সংখ্যাগুলি আরও কৌতূহলজনক এই কারণে যে গোটা সাম্রাজ্যে জমিনদারদের সৈন্য-বাহিনীর গঠনও এর থেকে বোঝা যায়: ৩,৮৪,৫৫৮ জন ঘোড়সওয়ার, ৪২,৭৭,০৫৭ জন পদাতিক; ১,৮৬৩টা হাতি, ৪,২৬০টা বন্দুক ও ৪,৫০০টা নৌকা ছিল।[১৮]

'ব' ('ও') বসেছে। এর ফলে বাক্যটির কোন অর্থই হয় না। ডঃ শরণ তবু এই পাঠভেদই স্বীকার করে নিয়েছেন, "বিকল্প পাঠের অর্থ যা-ই হোক" ('প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেণ্ট' ইত্যাদি, পৃ. ২৬২)!

১৬. মূল সারণিগুলিতে হাতির জন্য কোন আলাদা স্তম্ভ নেই। খুবই অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে হাতির সংখ্যা দেওয়া আছে. তা-ও "ঘোড়সওয়ার" স্তম্ভে, ঘোড়সওয়ারের সংখ্যার নীচে।

১৭. পরগনার পাশে ঘোড়সওয়ার এবং পদাতিকের সংখ্যা দেওয়া আছে, কিন্তু "জমিনদারে"র ঘর ফাঁকা—এমন ঘটনা বিরল; কিন্তু জমিনদার নির্দিষ্ট করা আছে, অথচ সৈন্যসংখ্যা দেওয়া নেই—এমন ঘটনা আরও বিরল। দ্বিতীয় ধরনের কয়েকটিমাত্র ক্ষেত্রে এই মর্মে একটি বিশেষ টীকা দেওয়া হয়েছে যে, সেই পরগনার সৈন্যসংখ্যা অন্য একটি পরগনার সৈন্যসংখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে দেখানো আছে ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৫, ৪৫৯, ৪৯৪-৫, ৫৪১)। কখনও কখনও টীকাটি (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৪৩৫, ৪৫৯, ৫৪১) দেওয়া হয়েছে জমিনদার 'কওম'-এর ঠিক নীচে—সৈন্যবাহিনী যে আসলে জমিনদারদেরই ছিল তারই আরেকটি ছোট প্রমাণ। ব্লখমান স্তম্ভগুলি একেবারেই বাদ দিয়ে দিয়েছেন, তাই বিষয়টি বুঝতে হলে 'আইন'-এর বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে ঐ স্তম্ভগুলির নীচে কী লেখা আছে তা দেখতে হবে। 'আইন'-এর অনুবাদে জ্যারেট স্তম্ভগুলি ফিরিয়ে এনেছেন, কিন্তু মূল বিন্যাস বজায় রাখেননি। ফলে সেটি ভুল পথে নিয়ে যায়। ঘোড়সওয়ার, পদাতিক এবং হস্তীবাহিনীর স্তম্ভগুলি সেখানে "কওম" স্তম্ভের পরে না গিয়ে আগে গেছে।

১৮. শেষ দুটি সংখ্যার মধ্যে, প্রথমটি বাংলার এবং দ্বিতীয়টিতে বাংলা (৪,৪০০) এবং বিহার (১০০) মিলিয়ে মোট সংখ্যা দেওয়া আছে। বাংলার ক্ষেত্রেই হাতির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (১,১৭০)।

আকবরের প্রশাসন কী করে জমিনদারদের সামরিক শক্তি সম্পর্কে এত খবর যোগাড় করল জানা যায় না। কিন্তু সৈন্যগণনার এই সবিশদ ধরন দেখে শ্রদ্ধা হয়। একদিকে ঐ বিশাল সমষ্টি, অন্যদিকে পরগনা-অনুযায়ী সংখ্যার হিসেব থেকে বোঝা যায়, প্রায় সব প্রভাবশালী জমিনদারই তার অধীনস্থ সশস্ত্র বাহিনীর হিসেব দাখিল করত। হিসামপুর পরগনার গ্রাম সংক্রান্ত দুটি সাদামাটা দলিল থেকে এই সাধারণ ঘটনাটির পাকা প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমটিতে আছে একটি নৈশ আক্রমণের অভিযোগ। কথাচ্ছলেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এমনকি পাঁচটি গ্রামের জমিনদারীতেও (যেটি তিনি কিনেছিলেন) বিষয়-আশয় রক্ষা করার জন্য জমিনদারের তরফে 'কিলাচা' বা 'ছোট দুর্গ' তৈরি অত্যাবশ্যক মনে করা হতো।[১৯] দ্বিতীয়টি এক সরকারী আদেশনামা, একটি গ্রামের মাত্র একের-তিন ভাগের 'মালিক'-এর অভিযোগ প্রসঙ্গে এটি জারি করা হয়েছিল। অভিযোগ এই: "তাঁর লোকজনকে রাখার জন্য তিনি যে 'কিলাচা'টি তৈরি করেছিলেন," একজন জবরদখলকারী তা ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছে, আর তাঁর জমিও দখল করেছে। আদেশনামায় বলা হয়েছে, যারা ঐ 'কিলাচা' ধ্বংসের জন্য দায়ী তারা সেটি আবার তৈরি করে মালিককে ফিরিয়ে দেবে।[২০] দুটি নথিই কেবলমাত্র সরকারী কর্মচারীদের জন্য উদ্দিষ্ট। কিন্তু এর থেকেও দেখা যায়, জমিনদারদের পক্ষে 'কিলাচা' গড়া শুধু যে স্বাভাবিক ছিল তা-ই নয়, সরকারী কর্তৃপক্ষও ব্যাপারটিকে পুরোপুরি আইনসঙ্গত বলেই মনে করত। সারা দেশ নিশ্চয়ই ঐ ধরনের অসংখ্য দুর্গে ছেয়ে গিয়েছিল। জমিনদাররা যতদিন শুধুমাত্র চাষীদের ওপর তাদের অধিকার কায়েম রাখার জন্য এগুলি ব্যবহার করছিল, ততদিন কর্তৃপক্ষ কোন আপত্তি করেনি। কিন্তু এই সব দুর্গ যখন প্রশাসনকে অগ্রাহ্য করার কাজে লাগল, তখনই কর্তৃপক্ষের চোখে এগুলি নিন্দনীয় হয়ে উঠল। 'কিলাচা' বা 'গঢ়ী' বলে কথিত এই ধরনের দুর্গের বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থার বিবরণ আছে প্রচুর।[২১] তার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে শুধুমাত্র অযোধ্যার মতো প্রদেশেই নয়, মধ্য দোআবের মতো সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্রের অত কাছাকাছি এলাকাতেও দুর্গ দেখা যেত।

১৯. Allahabad 1225. 'কিলচা'টি তৈরি হয়েছিল পাঁচটি গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে বড় গ্রাম পসনাজং-এই। জমিনদার সৈয়দ মুহম্মদ আরিফ নিজেই অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। দলিলটিতে কোন তারিখ নেই, কিন্তু আক্রমণের তারিখ বলা হয়েছে ১২ ডিসেম্বর, ১৬৮৯। সৈয়দ আরিফ-এর কাগজপত্রে দেখা যায়, তাঁর জমিনদারীতে আরও কতকগুলি গ্রাম ছিল, কিন্তু তার কোনটিই পসনাজং গ্রামসমষ্টির লাগোয়া নয়।

২০. Allahabad 786 (জানুয়ারি, ১৬৮৪)।

২১. দরবারের কাছে জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর (সম্ভবত আকবরাবাদ (আগ্রা)-র সুবাদার) এক দরখাস্তে এই অভিযানের বিবরণ পাওয়া যায়। একজন অধস্তন কর্মচারী কন্নী ও এটওয়া থেকে শুরু করে কোল ও মারেহ্‌রা হয়ে আগ্রা পর্যন্ত জমিনদারদের দুর্গ ধ্বংস করতে করতে এগিয়েছিল। ঐ কর্মচারীটির সুকর্মের নিদর্শন হিসেবে তার হাতে ধ্বংস হওয়া 'গঢ়ী'র একটি পূর্ণ তালিকা ('তুমার')-ও উল্লেখ করা হয়েছে ('দুর-আল উলুম', পৃ. ৭৩ ক-৭৪ ক)। বাইসওয়ারা-য় ঐ দুর্গের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য 'ইন্‌শা-এ রোশন কলাম', বিশেষ করে

এই দুর্গগুলি ছিল জমিনদারদের সশস্ত্র শক্তির দৃশ্যমান প্রতীক। এগুলিই ছিল তাদের কেল্লা, সৈন্যদের আস্তানা ও ঘাঁটি। কিন্তু তাদের আসল ক্ষমতা নিহিত ছিল লক্ষ লক্ষ সশস্ত্র অনুচরের মধ্যে।

জমিনদারী স্বত্ব গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে 'কওম'-এর যেহেতু একটা বড় ভূমিকা ছিল, তাই এমন মনে করা যুক্তিসঙ্গত যে জমিনদার সাধারণত তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত যোদ্ধাদের বেছে নিত নিজের 'কওম'-এর ভেতর থেকে, যারা তার সঙ্গে এসে বসত করেছে। ১৭ শতকের লেখকরা যেভাবে 'উলুস' শব্দটি ব্যবহার করেছেন তার থেকেই বোঝা যায় এই ছিল সাধারণ রীতি। কথাটি এসেছে মঙ্গোলিয়া ও মধ্য-এশিয়া থেকে। যে-গোষ্ঠীকে সামরিক বাহিনী হিসেবে সংগঠিত করা হয়েছে, বা যে সামরিক বাহিনীর নাম দেওয়া হয়েছে কোন গোষ্ঠীর নামে—তাদের বোঝাতে ঐ সব অঞ্চলে এই শব্দটি ব্যবহার করা হতো।[২২] ভারতে বাদশাহী বাহিনীর একক বোঝাতে কথাটি প্রয়োগ করা হয়নি, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বরং ব্যবহার হয়েছে জমিনদারদের প্রসঙ্গে। একদিকে এর প্রয়োগ হতো জমিনদার-'কওম' অর্থে: তাই কচ্ছ, রাঠোর, গোণ্ড, বালুচ এবং আরও অনেকের 'উলুস'-এর কথা শোনা যায়।[২৩] আজমীর প্রদেশের একটি সরকারী সংবাদ-বিবরণে বলা হয়েছে সইঙ্কাল রাজপুতদের 'উলুস'রা মেবারের কোন এক জায়গায় জমিদারী করত।[২৪] শব্দটি দিয়ে আবার ঐ সঙ্গে একদল সশস্ত্র লোকও বোঝাত। তাই উপদ্রুত এলাকার জমিনদার হিসেবে কাউকে স্বীকৃতি দিতে হলে আশা করা হতো তার একটা 'উলুস' থাকবে।[২৫] 'উলুস' কথাটির এই ধরনের প্রয়োগ শুধু তখনই সম্ভব যখন কোন জমিনদার 'কওম' ও তার কাজে নিযুক্ত সৈন্যদলের মধ্যে তেমন কোন তফাৎ নেই বলেই ধরে নেওয়া হয়।

তবে 'আইন'-এর সৈন্যগণনায় যে ৪৫ লক্ষ সৈন্যের কথা আছে, তাদের সবাই জমিনদার 'কওম'-এর লোক—এও প্রায় অসম্ভব। পদাতিক বাহিনীর চেয়ে সংখ্যায় কম ও মর্যাদায় বেশি যে ঘোড়সওয়ার বাহিনী, হয়তো তাদের অধিকাংশই ছিল সেই

পৃ. ২ ক-৪ ক, ৬ ক-৮ ক দ্রষ্টব্য। এলাহাবাদ প্রদেশের কোরা-র জনৈক ফৌজদার দরবারকে জানায় যে ঐ এলাকার রাজদ্রোহী জমিনদাররা "প্রতি গ্রামে তিন চারটে 'কিলচা'" গড়ে তুলেছে ('অখবারাৎ' (৪৭/১৫০)। মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে 'জমিনদার'দের গ্রাম-দুর্গের এত বেশি উল্লেখ আছে যে তার সম্পূর্ণ তালিকা করা অসম্ভব। উদাহরণ হিসেবে নীচে কয়েকটির উল্লেখ করা হলো: 'ওয়াকাই-এ আজমীর', ২৩৬; 'অখবারাৎ' ৪৭/৫৬; 'আহ্কম-এ আলমগীরী', পৃ. ২০৫; বেকাস, পৃ. ৫২ খ-৫৩ ক।

২২. তুলনীয়: ওয়েই কোয়েই সুন, 'দা সিক্রেট হিস্ট্রি অফ দা মোঙ্গল ডায়নাস্টি', আলীগড়, ১৯৫৭, পৃ. ১৩-১৪, ১৬-১৭।

২৩. 'আকবরনামা', ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৬; 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৭, ৪৮৬; সুজান রায়, ৬৩।

২৪. 'ওয়াকাই-এ আজমীর' ৩৬৪। এতে আরও বলা হয়েছে যে রাণা মেবার থেকে সইঙ্কালদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। জালোর-এর কাছে তাদের একটি জমিনদারী দেওয়ার কথা হয়েছিল। "ঘোড়ায় চেপে ও হেঁটে সপরিবারে আড়াই হাজার লোক" এসেছিল।

২৫. 'ইনশা-এ রোশন কলাম', পৃ. ৩ খ-৪ ক; 'কলিমৎ-এ তৈয়্যাবৎ', পৃ. ১২৭ খ-১২৮ ক।

'কওম'-ভুক্ত অনুচর। কিন্তু এমন একটি দৃষ্টান্ত আছে যেখানে বাইসওয়ারা-য় কোন এক পরগনার জনৈক রাজদ্রোহী বাইস (রাজপুত) জমিনদার একজন আফগানকে নিয়োগ করেছে এবং তার হাতেই নিজের তৈরি একটি দুর্গের ভার ছেড়ে দিয়েছে।[২৬] জমিনদারী স্বত্বের 'কওম'-অধিকারের মধ্যেও যদি টাকার খেলা চলতে পারে, তবে কিছু কিছু জমিনদার যে অন্য 'কওম' বা অন্য সম্প্রদায়ের ভাড়াটে সৈন্য দলে নিতে তৈরি থাকবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

খুব সম্ভবত জমিনদারের পদাতিক বাহিনীর বেশির ভাগই ছিল গ্রামবাসী বা চাষী, দরকারের সময়ে যাদের জোর করে কাজে লাগানো হতো (যদিও এ বিষয়ে খুব বেশি প্রমাণ নেই)। প্রায়ই শোনা যায়, স্থানীয় সংঘর্ষে বা কর্তৃপক্ষকে বাধা দেওয়ার সময়ে জমিনদাররা বিরাট সংখ্যক 'গাঁওয়ার' বা গ্রামের লোক ব্যবহার করেছে।[২৭] বিহারে ফরিদ (পরে শের শাহ্)-এর বাবার জাগীরে যে সব জমিনদার তাঁর কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে ফরিদ-এর অভিযান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : ঝড়ের বেগে গ্রামে ঢুকে, যত লোক সেখানে ছিল তাদের সবাইকে মেরে, পুরনো বাসিন্দাদের তিনি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন, এবং সেই জমিতে নতুন চাষী বসিয়েছিলেন। এর পেছনে নিশ্চয়ই এমন ধারণা কাজ করেছিল যে পুরনো চাষীরা হয় জমিনদারদের অনুচর নয়তো, নিদেনপক্ষে, যুদ্ধের সময় তাদের হয়েই লড়েছিল।[২৮]

জমিনদাররা সম্ভবত নানাভাবে তাদের সশস্ত্র অনুচরদের পাওনা মেটাত। 'আমিল'-এর ফৌজের মোকাবিলা করতে চলেছে এমন একজন জমিনদারকে প্রথমেই "তার পুরনো ও নতুন ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক বাহিনী এবং যেসব অনুচরকে ('নৌকরান') জমি বা নগদ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে"[২৯] তাদের একটা তালিকা তৈরি করতে দেখা যায়। এও খুবই সম্ভব যে, জমিনদাররা সাধারণত নিজের 'কওম'-এর লোকজনকে জমির একটা অংশ দিয়ে দিত এই কড়ারে যে তারা জমিনদারের হয়ে লড়বে। স্বশাসিত প্রধানদের এলাকায় রাজপুতদের তা-ই করতে দেখা যায়।[৩০]

২৬. 'ইনশা-এ রোশন কলাম', পৃ. ৬ খ। শুধু তাই নয়, ঐ আফগানের নামে তিনি এই দুর্গের নাম রেখেছিলেন সলিমগড়।

২৭. আকবরের সময়ে একটি যুদ্ধে বাদশাহী সেনানায়কদের পরিচালনায় এক সৈন্যবাহিনীতে 'গাঁওয়ার'রা জলেসর পরগনা (আগ্রা)-র এক ছোট 'রাজা'র হয়ে লড়েছিল। বদাউনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫১ দ্রষ্টব্য। Allahabad 1202, তাং মে, ১৬৭৬-এ সৈয়দ আহ্‌মদ এবং অন্যান্যদের একটি অভিযোগ পাওয়া যায়: কয়েকজন লোক অন্যায়ভাবে কয়েকটি গ্রামে তাদের জমিনদারী স্বত্ব দখল করে নিয়েছে। জাগীরদার (নাকি ফৌজদার ?)-এর কাছে অভিযোগ করায়, তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কিছু ঘোড়সওয়ার পাঠানো হয়। তাদের বিরোধী পক্ষ অবশ্য "বহুসংখ্যক রাজদ্রোহের উস্কানিদার ও গাঁওয়ার" জড়ো করে ঘোড়-সওয়ারদের ভয় দেখিয়ে হটিয়ে দেয়।

২৮. আব্বাস খান, পৃ. ১৪ খ-১৫ ক।

২৯. বেকাস, পৃ. ৫২ খ।

৩০. "রাজপুতদের রীতিই এই যে তাদের বসতি অঞ্চলের ('ওয়তন') 'মহাল'গুলিতে তারা রাজপুতদেরই গ্রাম দান করে এবং যুদ্ধের সময় এ'লেই শেষোক্তরা তাদের জীবন উৎসর্গ করে" (দরবারে ইন্দর সিং রাঠোর-এর নিবেদন, 'ডকুমেন্টস্ অফ আওরঙ্গজেবস রেন', ১২১)। তুলনীয় বার্নিয়ে, ৩৯, ২০৮।

জমিনদারের স্বার্থ রক্ষায় যে সব 'গাঁওয়ার'-এর ডাক পড়ত, তাদের কি মাইনে দেওয়া হতো, নাকি শুধুই বেগার খাটিয়ে নেওয়া হতো—তথ্যের ঘাটতি থাকায় এর কোন পাকা জবাব দেওয়া যাচ্ছে না।

এই অংশে এবং এর আগের অংশে যে-তথ্য জড়ো করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে শ্রেণী হিসেবে জমিনদারদের অবস্থান সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য করা চলে। প্রথমত, চাষীদের উৎপন্নের উদ্‌বৃত্তে তারা ভাগ বসাত—এই অর্থে তারা ছিল শোষক-শ্রেণী। জায়গায়-জায়গায় এই ভাগের অংশে হেরফের হলেও, সব মিলিয়ে চাষীদের কাছ থেকে ভূমিরাজস্ব এবং অন্যান্য কর-উপকর বাবদ রাষ্ট্রের তরফে যা আদায় করা হতো তার তুলনায় জমিনদারের ভাগ ছিল গৌণ। দ্বিতীয়ত, জমিনদাররা ছিল নানাভাবে স্বৈরতন্ত্রের বা একেবারেই স্থানীয় কোন শক্তির প্রতিভূ। কোন বিশেষ জমির উপর তাদের অধিকার ছিল মৌরুসী। গোষ্ঠীর জায়গাবদল বা জমি বিক্রির দরুন জমিনদারী অধিকারে হাত পড়লেও, সাধারণত বহু পুরুষের জমির অনেক গভীরে থাকত জমিনদারের শেকড়। অবশ্যই তার একটা বিরাট সুবিধা ছিল: জমির উৎপাদন-ক্ষমতা এবং বাসিন্দাদের প্রথা ও পরম্পরার কথা তার খুব ঘনিষ্ঠভাবে জানা থাকত। এসব স্থানীয় যোগাযোগ অর্থে আবার এক ধরনের সংকীর্ণতাও বোঝায়। জমিনদারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় কখনোই তার 'কওম'-এর গণ্ডি পেরোত না (আদৌ যদি নিজের পরিবারের গণ্ডি ছাড়িয়ে বেরোতে পারে)। আমরা দেখেছি, শ্রেণী হিসেবে জমিনদারদের অনেকটাই গড়ে উঠেছিল কয়েকটি 'কওম' নিয়ে, যারা অনেকদিন ধরে পরস্পরকে উৎখাত বা পদানত করে চলেছিল। জমিনদারী কেনা-বেচার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই তাদের শ্রেণীর সামাজিক বিভাজন ছাড়াও ছিল ভৌগোলিক বিভাজন। তার কারণ, এই অধ্যায়ের শুরুতেই যেমন দেখানো হয়েছে, একটানা জমিনদারী অধিকারের এলাকা ভেঙে দিয়েছিল 'রাইয়তী' বা পুরোপুরি চাষী-অধিকৃত গ্রামের জোট।

জমিনদার শ্রেণীর অধীনস্থ সশস্ত্র বাহিনীর ধরনধারনেই তার শক্তি ও দুর্বলতার প্রতিফলন দেখা যেত। মৌরুসী সূত্রে পাওয়া পিতৃপুরুষের জমি রক্ষা করতে সে বদ্ধপরিকর—জমিনদারের দুর্গ ছিল তারই প্রতীক। সম্ভবত, প্রচুর সংখ্যায় চাষী থাকায় পদাতিক সৈন্যের কখনোই ঘাটতি হতো না। চল্লিশ লক্ষ পদাতিক সৈন্য নেহাৎ কম নয়। জমিনদারের উচ্চাশা স্থানীয় গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকত, দ্রুতবেগ বা দূরপাল্লার অভিযানের মহতী বাসনাও তার ছিল না। এই দু-এর সঙ্গেই পদাতিক বাহিনী বেশ ভালোভাবে খাপ খেয়ে যেত। জমিনদার তাই সাধারণত অনেক পিছিয়ে থাকত ঘোড়সওয়ার বাহিনীর ক্ষেত্রে, গতিশীল যুদ্ধের যা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অঙ্গ। 'আইন'-এর সেনাগণনা অনুযায়ী, জমিনদারদের প্রতি দশজন পদাতিক পিছু খুব বেশি হলে একজন করে ঘোড়সওয়ার থাকত। অন্যদিকে, শাহ্‌জাহানের আমলের একটি সরকারী হিসেবে দেখানো হয়েছে যে, বাদশাহী ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা (রাজস্ব আদায়ের কাজে ফৌজদার এবং রাজস্ব কর্মচারীরা যাদের নিয়োগ করত, তারা বাদে) ছিল ২০০,০০০ আর পদাতিক ৪০,০০০—অর্থাৎ একজন পদাতিক পিছু পাঁচজন ঘোড়সওয়ার।[৩১] রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত বাহিনীকে এর মধ্যে ধরা হয়নি,

৩১. লাহোরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১৫। 'মনসবদার'দের বাহিনীর নাম-তালিকা পরিদর্শনের ভিত্তিতে এই আনুমানিক হিসেব খাড়া করা হয়নি। লাহোরী, মনে হয়, এই সংখ্যাটি পেয়েছিলেন

কিন্তু তাই বলে এমন মনে করা চলে না যে, জমিনদারদের ঘোড়সওয়ারের যে-গুনতি 'আইন'-এ দেওয়া হয়েছে—মোট প্রায় ৪০০,০০০—এই সংখ্যা তার চেয়ে অনেক কম ছিল। তাছাড়া, ঘোড়ার জাতের দিক দিয়ে দেখলে জমিনদার বাহিনীর ঘোড়া বাদশাহী বাহিনীর ঘোড়ার পাশে দাঁড়াতেই পারত না। এছাড়াও জমিনদারের সেনাদল এককাট্টা হয়ে থাকত না। তারা থাকত ছড়িয়ে ছিটিয়ে, নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত। এর জন্যই বাদশাহী ফৌজের বিরুদ্ধে তাদের কোন কার্যকর প্রতিরোধ-ক্ষমতা গড়ে ওঠেনি।

জমিনদার শ্রেণী এত মারাত্মক রকমে বিভক্ত ছিল, জাতপাঁত এবং স্থানীয় বন্ধনে এত সঙ্কীর্ণভাবে বাঁধা পড়েছিল (যদিও কতক ক্ষেত্রে এগুলিই ছিল জমিনদারের আসল শক্তি আর এদের ওপরেই তার টিঁকে থাকা নির্ভর করত) যে কখনোই তারা একটি ঐক্যবদ্ধ শাসকশ্রেণীর রূপ নিয়ে সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারেনি। মধ্যযুগের ভারতে সাম্রাজ্য গঠনের উদ্যম বার বার কেন বিদেশী বিজেতাদের কাছ থেকে এসেছে, তার অন্তত একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সবচেয়ে ক্ষমতাশালী দেশীয় শ্রেণীর তরফে এই অক্ষমতা থেকে।[৩২]

৩, বাদশাহী প্রশাসন ও জমিনদার

এই অধ্যায়ের আগের অংশগুলিতে জমিদার ও করদ প্রধানদের মধ্যে তফাৎ করা হয়েছে। বাদশাহী প্রশাসন ও জমিনদারদের মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল সে বিষয়ে আলোচনার আগে তাব কথা স্মরণ করা দরকার। আমরা জানি করদ প্রধানদেরও জমিনদার বলা বলা হতো। তবু সরাসরি বাদশাহী প্রশাসনের অন্তর্গত এলাকার সাধারণ জমিনদারদের থেকে তাদের আলাদা করতে হবে। করদ প্রধানদের

শুধুমাত্র 'সওয়ার' বাহিনীর মোট সংখ্যাকে ৪ দিয়ে ভাগ করে, এবং তার সঙ্গে যেসব মনসবদার এবং ঘোড়সওয়ারদের সরাসরি বাদশাহী কোষাগার থেকে মাইনে দেওয়া হতো তাদের সংখ্যা যোগ করে। বাস্তব ক্ষেত্রে, যেসব মনসবদারের 'জাগীর' ছিল, তাঁরা যে-প্রদেশে কাজ করতেন সেখানেই, তাঁদের যথাযথ মানের ঘোড়সওয়ার আনতে হতো। তার সংখ্যা তাঁদের 'সওয়ার' পদের এক-তৃতীয়াংশ। অপরপক্ষে, মাস-হিসেবে যারা ৬ মাসের নীচে ছিল, তারা নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে কম ঘোড়সওয়ার আনত (তুলনীয় লাহোরী, ২য় খণ্ড, ৫০৬-৭)। তবুও, লাহোরীর দেওয়া আনুমানিক হিসেবে মোটামুটি কাজ চলে যায়। পদাতিক সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে এতে ছিল "বন্দুকচী, গোলন্দাজ, কামানচী ও তীরন্দাজ"। এর মধ্যে ১০,০০০ থাকত দরবারে এবং বাকিদের (ছাপা বইতে আছে ৩,০০০। এটি অবশ্যই ভুল। হবে ৩০,০০০) রাখা হতো প্রদেশ ও দুর্গগুলিতে"।

৩২. বিদেশ-জাত বা বিদেশী সূত্রের লোকের প্রাধান্য বৃদ্ধি বার্নিয়ে-র সময় থেকেই মন্তব্যের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল (পৃ. ২১৫)। 'আইন'-এ 'মনসবদার'দের যে তালিকা দেওয়া আছে তার ভিত্তিতে মোরল্যাণ্ড দেখিয়েছেন যে, আকবরের 'কৃত্যক' গঠিত হয়েছিল "মুখ্যত" বিদেশীদের নিয়ে, অর্থাৎ প্রধানত তুরাণী ও পারসী ('ইণ্ডিয়া অ্যাট দা ডেথ্ অফ আকবর', ৬৯-৭০)। বিষয়টি আরও অনুসন্ধানের যোগ্য।

কথা পরের অংশে আসবে, আপাতত আমরা শুধু সাধারণ জমিনদারদের নিয়েই আলোচনা করব।

আমরা দেখেছি, বাদশাহী অঞ্চলের অধিকাংশ প্রদেশে জমিনদারদের স্বত্ব ছিল কেবলমাত্র জমির একটা অংশের ওপর। আর ছিল রাইয়তী এলাকা। সেখানে চাষীদের স্বত্বই ছিল একমাত্র স্বত্ব। রাইয়তী এলাকায় প্রশাসনের কাজ-কারবার ছিল সরাসরি চাষীদের সঙ্গে। সমগ্র মুঘল রাজস্ব-প্রশাসন যন্ত্রের ওপরেই তার ছাপ পড়েছিল। চাষীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ, অর্থাৎ চাষীদের জমির ওপর রাজস্ব নির্ধারণ ও তাদের কাছ থেকেই রাজস্ব আদায়—সরকারী বিধানে সর্বদাই একে আদর্শ বলে সুপারিশ করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, বহু সরকারী বিধানে—বিশেষ করে তোডর মল, ফতহ্উল্লা সিরাজী, 'আইন' এবং আওরঙ্গজেবের বিধানে ; রসিকদাসের উদ্দেশে ফরমান[১])—জমিনদারের উল্লেখমাত্র নেই, যদিও ভূমিরাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের গোটা কার্যপ্রণালী সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া আছে। তাই মনে হয় রাজস্ব-ব্যবস্থার স্বীকৃত কাঠামোয় জমিনদারের কোন স্থানই ছিল না। সে-আমলের রাজস্ব-বিষয়ক পুস্তিকাগুলিতে তার নাম যেন গোপনে এখানে-ওখানে ঢুকে পড়েছে।

তাহলেও জমিনদার যে-জমির ওপর 'জমিনদার' হিসেবে তার স্বত্ব দাবি করত, সে জমির রাজস্ব দাখিল করার জন্য সাধারণত তাকেই ডাকা হয়েছে—আমাদের নথিপত্রে এমন নজির যথেষ্ট আছে। আওরঙ্গজেবের আমলে বাংলা থেকে রাজস্থান অবধি সাম্রাজ্যের নানান অংশ থেকে ঐ ধরনের ভূরিভূরি নজির পাওয়া যায়। ইংরেজ কম্পানি ক্রয়সূত্রে আধুনিক কলকাতার পূর্বপুরুষ 'ডহী কলকাত্তা' সমেত কতকগুলি গ্রামের জমিনদারী পেয়েছিল। ভূমিরাজস্ব ('মাল-এ ওয়াজিব') দেওয়ার ব্যাপারে তাদের তরফের মুচলেকার একটি নকল (কপি) আমাদের হাতে পৌঁছেছে।[২] ঐ একই ধরনের অন্যান্য বহু নজির বাংলা থেকে পাওয়া যায়[৩] ; অন্য-এক প্রসঙ্গে সেগুলি নিয়ে আমরা একটু পরেই আলোচনা করব। অযোধ্যা থেকে 'কওল-করার' নামে একগুচ্ছ দলিল পাওয়া যায়। সরকারী কর্মচারীরা এগুলির মারফৎ জমিনদারদের ওপর বিশেষ বিশেষ বছরের ভূমিরাজস্ব বেঁধে দিয়েছিল।[৪] ঐ একই সংগ্রহের অন্য কয়েকটি দলিলে দেখা যায়, জমিনদাররা কর্তৃপক্ষের কাছে 'জমা' (অর্থাৎ তাদের গ্রামের ওপর ধার্য রাজস্বের পরিমাণ) দাখিল করতে বাধ্য থাকত।[৫] বাইসওয়ারা-র

১. এতে অবশ্য একবার জমিনদারদের উল্লেখ আছে, কিন্তু রাজস্ব নির্ধারণ বা আদায়ের পদ্ধতি প্রসঙ্গে নয়।

২. Add. 24,039, পৃ. ৬৬ খ।

৩. 'দুর-আল-উলুম', পৃ. ৪৭ ক-৪৮ ক বিশেষভাবে তুলনীয় ; হেজেস, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯।

৪. Allahabad 897, 1206, 1223 ; আরও দ্রষ্টব্য 1220 (এটি নির্ধারিত রাজস্ব মেনে নেওয়ার কবুলিয়ৎ)। প্রথম দুটিতে রাজস্বদাতাকে 'তালুকদার' বলা হয়েছে, কিন্তু বিক্রয়-কোবালাগুলি থেকে জানা যায়, উভয় ক্ষেত্রেই রাজস্বদাতা ছিল গ্রামগুলির (যেমন পসনাজৎ গ্রামসমষ্টি, ইতিমধ্যেই আমরা বারবার যার উল্লেখ করেছি) জমিনদার। শেষ দুটি দলিলে রাজস্বদাতাদের গ্রামগুলির 'মালিক' বলা হয়েছে।

৫. Allahabad 782 দ্রষ্টব্য ; আরও দ্রষ্টব্য Allahabad 1234.

ফৌজদারের একটি চিঠিতে এক জায়গার "চাষী ও জমিনদার"দের কথা বলা হয়েছে, যারা "জাগীরদারের গোমস্তাদের আদেশ মেনে ঠিকমতো ভূমিরাজস্ব দেয়"।[৬] সম্ভল এবং কলপী 'সরকার'-এর জমিনদারদের আর্জির উত্তরে দুটি বাদশাহী আদেশনামা জারি হয়েছিল। সেখানে, জমিনদারদের তরফে অতীতে নিয়মিত ভূমিরাজস্ব দাখিলকে তাদের অভিযোগ বিচারে পূর্বশর্ত করা হয়েছে।[৭] একটি পরওয়ানায় জনৈক কাসিমকে মথুরার কাছে পঁচিশটি গ্রামের জমিনদারী মঞ্জুর করার কথা আছে। গ্রামগুলি ইতিমধ্যেই তার জাগীরের অধিকারে ছিল। নতুন জমিনদারকে জানানো হয়েছে "গ্রামগুলি যতদিন তাঁর জাগীরের মধ্যে আছে, ততদিন তিনি রাজস্ব এবং অন্যান্য সরকারী কর ('মাল-এ ওয়াজিব' ও 'হুকূক-এ দিওয়ানী') তাঁর হেফাজতে রাখতে পারেন। পরে, সেগুলি যখন অন্য কারও জাগীরে বরাত করা হবে তখন আদায়ীকৃত রাজস্ব ('ওয়াসিল')-এর জন্য তিনি সে জায়গার 'আমিল' (রাজস্ব সংগ্রাহক)-এর কাছে দায়ী থাকবেন" (অনুমান করা যায়, এই 'আমিল' নতুন জাগীরদারের লোক)।[৮] একটি সরকারী চিঠিতে দেখা যায়, হিসার-এর এক পরগনার কয়েকজন জমিনদার জনৈক আমিল-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে: তাদের কাছ থেকে সে অসময়ে রাজস্ব আদায় করে।[৯] আজমীর প্রদেশের সংবাদ-বিবরণীতে প্রায়ই জমিনদারদের ভূমিরাজস্ব দেওয়ার কথা আসে, যেন এমন ঘটনাই অবধারিত বা এ যেন তাদের তরফের এক দায় যা বলবৎ করার দরকার পড়েছে।[১০]

এ সব নজির দেওয়া হলো নেহাৎই দৃষ্টান্ত হিসেবে, কেননা জমিনদাররা রাজস্ব দিচ্ছে এমন উল্লেখ (যা সাধারণভাবে সব জমিনদারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বা কোন বিশেষ জায়গার সূত্রে বলা হয়নি) এত বেশি যে তার সমস্তটা এখানে হাজির করা অসম্ভব। যেসব প্রদেশ আকবরের তৈরি তথাকথিত 'জব্‌ৎ' ব্যবস্থার অধীনে ছিল—অর্থাৎ, মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যভাগের বেশির ভাগ জায়গা—সেখান থেকেও জমিনদারদের মাধ্যমে ভূমিরাজস্ব আদায় করা হতো। আগেই যেসব নজির হাজির করা হয়েছে—এ কথা সমর্থন করার পক্ষে সেগুলিই যথেষ্ট। সব নজিরই অবশ্য আওরঙ্গজেবের আমলের। তার কারণ মূলত এই যে, আগের সব আমলের তুলনায় তাঁর আমলের নথিপত্রের সম্ভার অনেক সমৃদ্ধ। যদি এমন সন্দেহ জাগে যে এই ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল আকবর ও আওরঙ্গজেবের মধ্যবর্তী আমলে, তারও নিরসন করা যায়। আকবরের আমলের একটি ফরমান এখনও রয়েছে। জনৈক ধর্মীয় নেতা কয়েকজন জমিনদারের কাছ থেকে মথুরার কাছে একটি গ্রামের জমি কিনেছিলেন। আকবরের রাজত্বের ৩৮তম বছরে ('ইলাহী') এই ফরমান মারফৎ তাঁকে ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য

৬. 'ইন্‌শা-এ রোশন কলাম', পৃ. ১৯ খ-২০ ক; আরও দ্রষ্টব্য পৃ. ৭ ক।

৭. 'দুর-আল-উলূম', পৃ. ৪৩ খ, ৫৬ খ-৫৭ ক; আরও দ্রষ্টব্য পৃ. ৬১ খ-৬২ ক।

৮. 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ১৯৯ ক-২০০ ক, Bodl. পৃ. ১৫৭ খ-১৫৮ ক।

৯. বালকৃষণ ব্রাহ্মণ, পৃ. ৬৩ খ-৬৪ ক। "ফসল যখন পাকেনি", আমিল "তখন বাদীদের পুত্রসন্তান ও গবাদি পশু বেচে দিয়ে, জুলুম করে ৫,০০০ টাকা কেড়ে নিয়েছে।"

১০. 'ওয়াকাই-এ আজমীর', ৫৭, ৬৩৮ ইত্যাদি।

কর ('মাল ও জিহাৎ') থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে।[১১] এর থেকে এমন একটি ব্যতিক্রম পাওয়া গেল যা আসলে নিয়মেরই প্রমাণ।

মনে হয়, ১৭ শতকের শেষভাগে ভূমিরাজস্বদাতা হিসেবে জমিনদারকে বোঝাতে একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছিল। 'তাল্লুকদার' মানে 'তাল্লুক'-এর অধিকারী। 'তাল্লুক' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'সংযোগ', কিন্তু ব্যবহারিক অর্থ দাঁড়িয়েছিল : যে জমি বা এলাকার ওপর কোন ধরনের স্বত্ব দাবি করা হয়।[১২] ১৮ শতকে 'তাল্লুকদার'-এর সংজ্ঞায় দুটি আলাদা বক্তব্য পাওয়া যায়। প্রথমটি অনুযায়ী তিনি ছিলেন নেহাৎই এক ধরনের ইজারাদার ;[১৩] আর দ্বিতীয়টি অনুসারে তিনি ছিলেন ক্ষুদে জমিনদার।[১৪] ইয়াসিন-এর পরিভাষাকোষে অবশ্য এমন একটি ব্যাখ্যা দেওয়া আছে যাতে দেখা যায় দুটি বক্তব্যই একই সঙ্গে সত্য হতে পারত। বলা হয়েছে, 'তাল্লুকদার' মানে সেই জমিনদার যে শুধু নিজের জমিনদারী-ই নয়, অন্য লোকের জমিনদারীর রাজস্ব দিতেও চুক্তিবদ্ধ। বেশি লোকের সঙ্গে কাজ-কারবার এড়াবার জন্যই কর্তৃপক্ষ সাধারণত এই ধরনের ব্যবস্থা করত।[১৫] সুতরাং, এমন কোন কথা নেই যে, 'তাল্লুকদার' যে-এলাকার রাজস্ব দেয় সে নিজেই তার পুরোটার জমিনদার হবে ; সে ছিল শুধু তার একটা অংশের জমিনদার। বাকি অংশের ক্ষেত্রে সে নেহাৎই মধ্যব্যক্তি। সুতরাং, 'তাল্লুকদার' হওয়া মানে ঐ একই এলাকার জমিনদার হওয়ার চেয়ে ছোট ব্যাপার, কারণ জমিনদার যে শুধু তার এলাকার প্রদেয় রাজস্ব আদায় ও দাখিল করত তা নয়, তার ওপর সে ছিল জমিনদারী স্বত্বের ভিত্তিতে তার পুরো এলাকার অধিকারী, কেবলমাত্র একটা অংশের নয়। এর থেকে শুধু যে ১৮ শতকের ঐ সংজ্ঞার—'তাল্লুকদার' একজন ক্ষুদে জমিনদার—ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তা-ই নয়, 'ফথিয়া ইব্রিয়া'র একটি জায়গাও পরিষ্কার বোঝা যায়। আরাকান সিংহাসনের দাবিদাররা শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম অভিযানের সময় মুঘলদের পক্ষে ছিল। বলা হয়েছে, তাদের আশা ছিল অন্তত "রাজা না হলে জমিনদার ; জমিনদার না হলে তাল্লুকদার হবে।"[১৬] অবশ্য এ কথার ওপরেই জোর দিতে হয় যে, তাল্লুকদার ছিল এক

১১. জাভেরি, 'ডক্যু', ৪র্থ খণ্ড। ঐ একই গ্রাম সম্পর্কে একই মর্মে শাহ্‌জাহানের ফরমান দ্রষ্টব্য (ঐ, 'ডক্যু.' ৬ষ্ঠ খণ্ড)।

১২. 'তাল্লুক' শব্দটি এইভাবে জাগীরদার, জমিনদার এবং স্বাধীন শাসকদের অঞ্চল বোঝাতে নির্বিশেষে ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা প্রায়ই এই জাতীয় সূত্র দেখতে পাই : "অমুক গ্রাম, অমুক জাগীরে 'তাল্লুক-এ' (সংযুক্ত, অন্তর্ভুক্ত)" (উদাহরণত, 'ইন্‌শা-এ রোশন কলাম' দ্রষ্টব্য)। এর থেকেই জাগীরদারকে বরাদ্দ জমি অর্থে 'তাল্লুক' কথাটি এসেছে ('অখবারাৎ' ক, ৪৯)। জমিনদারের আয়ত্তাধীন অঞ্চলে এর ব্যবহার প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য 'ডকুমেণ্টস্ অফ আওরঙ্গজেবস্ রেন', ১৫, Allahabad 1234. সবশেষে, 'মআসির-এ আলমগীরী', পৃ. ২৬০-এ "হীন" সজ্জীর 'তাল্লুক' বা জায়গার কথা আছে।

১৩. Add. 19,504, পৃ. ১০০ ক।

১৪. 'দস্তুর-আল আমল-এ খালিসা শরিফা', পৃ. ৯ খ, ১৯ ক।

১৫. Add. 6603, পৃ. ৫৪ খ-৫৫ ক। আরও দ্রষ্টব্য 'রিসালা-এ জিরাৎ', পৃ. ৯ ক।

১৬. 'ফথিয়া-এ ইব্রিয়া', ১৫৫ খ-১৫৬ ক।

বিশেষ ধরনের জমিনদার মাত্র ; দুটি শব্দের কোন্‌টিকে ব্যবহার করা হলো বহু ক্ষেত্রেই তাতে কিছু এসে যেত না। অযোধ্যার যে-দুটি রাজস্ব সংক্রান্ত নথিতে রাজস্বদাতাকে 'তাল্লুকদার' বলা হয়েছে, সেখানে 'জমিনদার' লিখলেও তথ্যের হেরফের হতো না, কারণ ঐ লোকটি আসলে ছিল (রাজস্ব-) নির্ধারিত গ্রামগুলির 'মালিক' বা জমিনদার।[১৭] একইভাবে ইংরেজ কম্পানি যখন 'ডহী কলকাত্তা' ইত্যাদি কেনে, তার স্বীকৃতিতে প্রাদেশিক 'দিওয়ান'-এর পরওয়ানায় বিক্রেতাদের বলা হয়েছে "জমিনদার", আর ইংরেজরা তাদের অর্জিত এলাকার "স্থায়ী তাল্লুকদার"।[১৮]

কোন জমিনদার (বা তাল্লুকদার) তার জমিনদারীর অন্তর্গত জমির রাজস্ব দিতে বাধ্য থাকলে আমরা এইমাত্র তার ক্ষেত্রে 'রাজস্বদাতা' শব্দটি প্রয়োগ করেছি। কিন্তু সরকারী অভিমত, মনে হয়, এই ছিল যে জমিনদার সর্বদাই একজন মধ্যস্বত্বভোগী যে চাষীদের কাছ থেকে ভূমিরাজস্ব আদায় করে কর্তৃপক্ষের খিদমতে লাগে। রসিকদাসের কাছে আওরঙ্গজেবের ফরমানে একবার মাত্র জমিনদারদের উল্লেখ আছে (অনু. ১১) সেখানে বলা হয়েছে, গ্রামের হিসাব-পরীক্ষকদের একটা কাজ হলো, চাষীদের কাছ থেকে "রাজস্ব-নির্ধারক ও সংগ্রাহক ('আমিন' ও 'আমিল') এবং জমিনদার, ইত্যাদি" কত নিয়ে থাকে, তার সন্ধান করা। জমিনদার ও রাজস্ব কর্মচারীদের একযোগে ধরা হয়েছে—এর একটা তাৎপর্য আছে। বোঝা যায়, চাষীদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ তার নিজের কর্মচারীদের রাজস্ব-আদায়ের ওপর যতটা নিয়ন্ত্রণের দাবি রাখত, জমিনদারদের আদায়ের বেলায়ও তার অন্যথা হতো না। সুতরাং প্রশাসনিক দলিলপত্রে স্বভাবতই সে কথাও সাধারণভাবে বলে দেওয়া থাকত।[১৯] জমিনদারকে তাই প্রধানত দেখা যায় কর্মচারী বা কর-আদায়কারীর ভূমিকায় : করদাতা হিসেবে নয়। জমিনদারী মঞ্জুর বা বহাল করার দুটি ফরমানে,

১৭. Allahabad 897 এবং 1206 (এই অংশের ৪নং টীকা দ্রষ্টব্য) ; 897-এ রাজস্বদাতাকে বাস্তবিকই "মালিক ও তাল্লুকদার" আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

১৮. Add. 24,039, পৃ. ৩৬ ক। মোরল্যাণ্ড যদিও এই সংগ্রহের পৃ. ৩৯ ক-য় বিক্রয়-কোবালাটির উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এই পরওয়ানা ও তার উল্টোপিঠের পৃষ্ঠলেখটি বোধহয় তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে। তাঁর ধারণা ছিল কম্পানির স্বত্বের ব্যাপারে তাল্লুকদারী শব্দটি কেবলমাত্র ১৭১৭ সালে ফারুকশিয়ারের ফরমানেই প্রয়োগ করা হয়েছে। এর থেকে ভুল করে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, "তাহলে এই সময়ে দিল্লীতে তাল্লুকদারী বলতে যা বোঝাত কলকাতায় জমিনদারী মানে ছিল তা-ই" ('এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', ১৯১-২)। অবশ্য এসব দলিলে এই শব্দদুটির ব্যবহার Add. 6603, পৃ. ৫৫ ক-এ 'তাল্লুকদার' শব্দের অধস্তন অর্থের সংজ্ঞার সঙ্গে মেলে। শব্দটি দিয়ে বোঝানো যেত এমন জমিনদার, যার স্বত্ব খুব বনেদী নয়, বা বাদশাহী অনুদান ('হুজুরী') থেকেও আসেনি, নেহাৎই ক্রয়সূত্রে পাওয়া। তাই কলকাত্তা ইত্যাদির বিক্রেতারা ছিল জমিনদার, কিন্তু ইংরেজরা শুধু তাল্লুকদার-ই হতে পারত।

১৯. ওপরে উল্লিখিত ফরমান দুটি দ্রষ্টব্য। আরও দ্রষ্টব্য বাংলায় ইংরেজদের কলকাত্তা ইত্যাদি ক্রয় সংক্রান্ত দিওয়ানের পরওয়ানা, Add. 24,039, পৃ. ৩৬ ক ; এবং রাজস্ব-কর্মচারীদের

এই স্বত্বকে 'খিদমত' বা চাকরির একটি পদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২০] এ কেবল পরিভাষা বা কাগুজে নির্দেশনামার ব্যাপার নয়। রাজস্ব আদায় ও দাখিল করার 'খিদমত' বাবদ জমিনদারদের সত্যই 'নানকার' বলে একটি ভাতা দেওয়া হতো—হয় দাখিলী রাজস্বেরই একটা অংশরূপে বা জমিনদারকে দেওয়া লাখেরাজ জমি হিসেবে।[২১] মনে হয়, 'নানকার'-এর গৃহীত হার ছিল রাজস্ব-দাবির শতকরা দশ ভাগ।[২২] কিন্তু পরবর্তী আমলের একটি দলিলে (সেখানেও এই শতকরা হারের উল্লেখ আছে) বলা হয়েছে, এই হারের হেরফের হতো, এবং কোন কোন প্রদেশে হার ছিল শতকরা পাঁচ ভাগ।[২৩]

জমিনদারী মানে কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে এক ধরনের 'খিদমত'—এমন ধারণা করলে পদটি মূলত 'চৌধুরী' পদের খুব কাছাকাছি চলে আসে। রাজস্ব সংগ্রহ যন্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে থাকত 'চৌধুরী', সাধারণত সে নিজেই হতো জমিনদার। খিদমতের জন্য সে যে-ভাতা পেত, তাকেও বলা হতো 'নানকার'।[২৪] জমিনদারী বলতে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বও পড়ে বলে ধরা হতো। তাই মুঘল নথিপত্রে মাঝে মধ্যে 'জমিনদারী' এবং 'চৌধুরাই' শব্দদুটি একযোগে দেখা দিলে আশ্চর্যের কিছু নেই।[২৫]

তাহলে আমাদের নজিরগুলি থেকে এই গৃহীত নীতিই বেরিয়ে আসে যে, ভূমি-

'কওল-করার' (Allahabad 897, 1206, 1223)। এই সব 'কওল-করার'-এ ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত সূত্রে একটি কড়ার থাকে: জমিনদারকে নির্ধারিত রাজস্ব দাখিল করতে হবে। তারপরেই এই মর্মে কড়ার করা হয়: "ভালো ব্যবহার করে চাষীদের তুষ্ট রাখতে হবে এবং চাষ-আবাদের প্রসার ও কৃষকদের উন্নতি (বা সংখ্যাবৃদ্ধি)-র জন্য সচেষ্ট হতে হবে।"

২০. মুঙ্গের 'সরকার' (বিহার)-এর কয়েকটি 'টপ্পা'য় জমিনদারী ও 'চৌধুরাই' সংক্রান্ত বিষয়ে জাহাঙ্গীরের ১৩তম বছরে জারি ফরমান দ্রষ্টব্য (*IHRC*, খণ্ড ১৮, পৃ. ১৮৮)। দ্বিতীয় শাহ্ আলম-এর ১৫তম বছরে জারি এক ফরমানেও 'খিদমত-এ জমিনদারী' সূত্রটি ব্যবহার করা হয়েছে (জমিনদারীর বদলে শুধু 'খিদমত' কথাটিও আছে)। এটি দিয়ে আগ্রা প্রদেশের কোল 'সরকার' এর একটি পরগনায় জমিনদারীতে রাজা শালিবাহনের বংশধরদের বহাল করা হয়। এর একটি আলোকচিত্র আছে ছত্রীর নবাব সাহেবের কাছে। দলিলটি অবশ্যই পরের দিকের, কিন্তু ১৭ শতকে এ ধরনের দলিলে ব্যবহৃত রূপটিই বোধহয় বজায় রাখা হয়েছে।

২১. Add. 6603, পৃ. ৬৫ ক, ৭৯ খ, ৮২ খ।

২২. বেকাস, পৃ. ৫২ খ-য়, এক জমিনদার জনৈক রাজস্ব-কর্মচারীকে জানায় যে "'তাল্লুক'-এর 'জমা' (রাজস্ব) যদি 'নানকার' বাবদ একের-দশ ভাগ ছাড় সমেত গত দশ বছরের বিবরণী ('মুওয়াজনা-এ দহ্-সালা') অনুযায়ী নির্ধারিত হয়" তবে ঐ কর্মচারীকে সে ঠিকমতো খিদমত করতে রাজি আছে।

২৩. Add. 19504, পৃ. ১০০ ক।

২৪. এই কর্মচারীদের কর্তব্য ও তাৎপর্য কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হবে সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে।

২৫. জাহাঙ্গীরের ফরমান, *IHRC*, খণ্ড ১৮, পৃ. ১৮৮; Allahabad 1192 (১৬৬৯ খৃস্টাব্দের)।

রাজস্ব বসানো হতো সরাসরি চাষীদের ওপর; যদিও-বা জমিনদার সেই রাজস্ব বাদশাহী কোষাগারে জমা দিত, চাষীই কিন্তু ছিল আসল রাজস্বদাতা। আকবর ও আওরঙ্গজেবের আমলের রাজস্ব-সংক্রান্ত প্রামাণ্য বিধিবিধানে জমিনদারদের কেন পুরোপুরি অগ্রাহ্য করা হয়েছে—তার একটা কারণ হয়তো এই। জমিনদারী-রাইয়তী গ্রাম নির্বিশেষে, কোন এলাকার মধ্যে রাজস্ব-দাবির মাত্রা ও নির্ধারণ পদ্ধতি একই হতে পারত। কর্তৃপক্ষের একটি অধিকারের ভেঁতর (১৮ শতকে স্বীকৃত) এই নীতিই নিহিত ছিল। সেই অধিকারবলে কর্তৃপক্ষ যখন ইচ্ছা জমিনদারী জমিকে 'সীর'-এ পরিণত করতে পারত, অর্থাৎ জমিনদারকে একেবারেই এড়িয়ে গিয়ে চাষীদের ওপর সরাসরি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় করা যেত, যদিও জমিনদারের স্বত্বাধিকারের ভাগ বা 'মালিকানা'-য় হাত পড়ত না।[২৬] ১৭ শতক থেকেই দুটি সুনির্দিষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় যেখানে রাইয়তী জমির মতোই জমিনদারী জমির ওপরেও একই মাত্রায় ও একই পদ্ধতিতে রাজস্ব-দাবি ধার্য হয়েছিল। শাহ্‌জাহানের আমলের একটি পুস্তিকায় হিসাবপত্রের নমুনায় দেখা যায়, একই গ্রামের ভেতর জমিনদারদের 'খুদকস্তা' জমি ও রাইয়তী জমিতে একই সঙ্গে রাজস্ব নির্ধারণের 'কনকূত' পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে।[২৭] আরেকটি নিদর্শন পাওয়া যায় আওরঙ্গজেবের আমলে সরকারী নথিপত্র সংগ্রহের একটি আদেশনামায়। এক গ্রামের জমিনদার খুব বেশি রাজস্ব নির্ধারণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। তখন এই মর্মে আদেশ জারি করা হয় যে, তার কাছ থেকে রাজস্ব নেওয়া হোক শস্যভাগের মারফতে: রাষ্ট্রের ভাগ হবে মোট উৎপন্নের অর্ধেক। এই ছিল প্রমাণ হার, যদি-না আওরঙ্গজেবের আমলে এটিই সর্বোচ্চ অনুমোদিত হার হয়ে থাকে।[২৮] অযোধ্যা থেকে পাওয়া দুটি দলিলে জনৈক জমিনদারের রাজস্ব নির্ধারণের কথা আছে। সেখানে দেখা যায় প্রতিবার ফসলের মরসুমে রাজস্ব-দাবি নতুন করে ধার্য করা হচ্ছে। সুতরাং এর থেকেও বোঝা যায়, বাদশাহী নিয়মকানুনে সাধারণ জমির ক্ষেত্রে যেমন নিয়ম বেঁধে দেওয়া ছিল, এক্ষেত্রেও তেমনি প্রতি মরসুমে নতুন করে রাজস্ব নির্ধারণ করা হতো।[২৯]

তাহলেও, মনে হয়, এমন জায়গা ছিল যেখানে একবার রাজস্ব নির্ধারণ হয়ে গেলে কিছু কাল তা-ই চালু থাকত। অযোধ্যার প্রায় ঐ একই এলাকা থেকে দুটি নথি পাওয়া গেছে। সেখানে কয়েকটি গ্রামের 'মালিক'দের ওপর রাজস্ব বেঁধে দেওয়া

২৬. ইয়াসিনের পরিভাষাকোষ Add. 6603, পৃ. ৬১ খ, ৬৬ ক-খ। দিল্লী এবং বাংলা দু-জায়গাতেই ইয়াসিনের রাজস্ব-প্রশাসনের অভিজ্ঞতা ছিল। 'সীর'-এর জন্য এই অধ্যায়ের প্রথম অংশের ৩৫নং টীকা দ্রষ্টব্য।

২৭. 'দস্তুর-আল আমল-এ নভিসিন্দগী', পৃ. ১৮৩ ক।

২৮. 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ১২৬ ক-খ; Bodl. পৃ. ৯৮ ক; Ed. 98. আওরঙ্গজেবের অধীনে রাজস্বের হার ছিল মোট উৎপন্নের অর্ধেক ভাগ। ষষ্ঠ অধ্যায়, প্রথম অংশ দ্রষ্টব্য।

২৯. Allahabad 1206 এবং 897 (১৬৭৭ ও ১৬৮৫ খৃস্টাব্দের)। প্রতি ফসলের জন্য 'জমা'- এর নীচে একটি সংখ্যা আছে, এটি ঐ ফসলের জন্য আগের বছরের নির্ধারিত রাজস্ব। এর পরেই আছে 'ইজাফা' (বাড়তি) বা 'কমী' (কমতি), যেখানে যেমন; তারপরে চলতি বছরের মোট প্রাপ্যের।

হয়েছে 'বিলমক্তা'য়—অর্থাৎ স্থায়ীভাবে একই অঙ্কে।[৩০] কিন্তু এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেছিল ঐ একই জাগীরদারের গোমস্তারা। তার পরের জাগীরদারের গোমস্তারা ঐ ব্যবস্থা না-ও মেনে থাকতে বা চালু রাখতে পারে।

বাংলার ব্যবস্থা ছিল সত্যই অন্যরকম। মনে হয়, সেখানকার জমিনদাররা দীর্ঘ, কিন্তু অনির্দিষ্ট, সময় ধরে প্রশাসনের নির্দিষ্ট এক বাঁধা অঙ্কেই ভূমিরাজস্ব দিত। এই ব্যবস্থার নজির মেলে 'আইন-এ আকবরী'তে। সেখানে বলা হয়েছে, বাংলার 'জমা' ছিল "পুরোটাই নক্‌দী"।[৩১] এখন 'নক্‌দ্' মানে টাকাকড়ি, অতএব আলাদা করে ধরলে এর সরল অর্থ এই হতে পারে যে বাংলার রাজস্ব আদায় হতো নগদ টাকায়।[৩২] কিন্তু এই ব্যাখ্যা টেঁকে না যখন দেখি বিহার ও এলাহাবাদের 'জব্‌তী' পরগনাগুলির 'জমা'কে 'নক্‌দী' থেকে আলাদা করা হয়েছে।[৩৩] 'জব্‌ৎ' ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই ছিল নগদ টাকায় রাজস্ব হার চাপানো। একেও যদি 'নক্‌দী'র থেকে আলাদা কিছু মনে করতে হয়, তবে নিশ্চয়ই 'নক্‌দী' বলতে কেবলমাত্র টাকায় রাজস্ব দেওয়া ছাড়াও অন্য কিছু বোঝাত। 'আইন'-এর পরিসংখ্যানের কতক জায়গায় 'জমা'র অঙ্কের আগে 'নক্‌দী' বা 'অজ করার-এ নক্‌দী' (যেভাবে নগদে কড়ার করা হয়েছে) এই শব্দটি আছে।[৩৪] এর দিকে তাকালে 'নক্‌দী'র অর্থ সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া

৩০. Allahabad 1220 এবং 1223 (১৬৮৭-র)। কোন গ্রামের ক্ষেত্রেই পর পর দু-বছরের সংখ্যায় কোন পরিবর্তন হয়নি। আরও দ্রষ্টব্য ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৪র্থ অংশ ('মুকতাই'-এর জন্য)।

৩১. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৩।

৩২. আবুল ফজল যখন 'বারোটি প্রদেশে'র পরিসংখ্যান-সারণিতে 'জমা' (রাজস্ব) স্তম্ভের অঙ্কগুলির শীর্ষক হিসেবে 'নক্‌দী' শব্দটি ব্যবহার করেন, তখন 'টাকায় নির্দিষ্ট' এই অর্থই বোঝায়।

৩৩. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৭, ৪২৪। ইলাহাবাস 'সরকার' (এলাহাবাদ)-এর ক্ষেত্রে ব্লখমানের পাঠ অত্যন্ত গোলমেলে। পাণ্ডুলিপিতে যেখানে আছে "এর মধ্যে 'জব্‌তী' ৯ 'মহাল': ২,০৮,৩৮,৩৮৪ 'দাম'; এবং 'নক্‌দী', ৬ 'মহাল': ১৯,৯৩,৬১৫ 'দাম'", সেখানে ব্লখমানের পাঠ: "এর মধ্যে আছে ৯ 'মহাল': ২,০৮,৩৩,৩৭৪½ 'দাম' এবং নক্‌দী।"

৩৪. ব্লখমান-সম্পাদিত মূলের পাঠক আবার এখানে ভুল পথে চলে যেতে পারেন। ব্লখমান যেহেতু স্তম্ভগুলি বর্জন করেছেন, তাই 'জমা' স্তম্ভের শীর্ষক হিসেবে ব্যবহৃত 'নক্‌দী' শব্দটি বসানোর কোন জায়গা তাঁর ছিল না। কয়েকটি 'সরকার' এবং পরগনার 'জমা'র অঙ্কের পাশে তিনি এখানে-ওখানে 'নক্‌দী' শব্দটি বসিয়েছেন; মূলে কিন্তু এমন কোন তফাৎ নেই। সুতরাং পাণ্ডুলিপি না দেখা পর্যন্ত জানবার কোন উপায়ই নেই যে 'জমা' অঙ্কের বিশেষণ হিসেবে 'নক্‌দী' কথাটি ব্লখমানের প্রক্ষেপের ফল, না আবুল ফজল নিজেই তা-ই চেয়েছিলেন।

'প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট', পৃ. ৩১৫-র ড: শরণ 'নক্‌দী' এবং 'অজ করার-এ নক্‌দী'-র মধ্যে পার্থক্য করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই পার্থক্য যে অসঙ্গত তা দেখানো যায় নীচের ঘটনা থেকে: প্রথম শব্দটি ব্যবহার হয়েছে বিহার প্রদেশের 'জমা'র একটা অংশের ক্ষেত্রে, দ্বিতীয় শব্দটি ঐ প্রদেশেরই অন্তর্গত বিহার 'সরকার'-এর 'জমা'র একটা অংশের ক্ষেত্রে ('আইন', ১ম খণ্ড, ৪১৭-১৮)।

যেতে পারে। যে সব 'মহাল'-এর ক্ষেত্রে এই শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে তার কোনটিতেই জরিপ-করা এলাকার পরিসংখ্যান নেই।[৩৫] তাছাড়া গুজরাটের সোরাট 'সরকার' (কাথিয়াবাড়)-কেও 'নক্‌দী' বলে ঘোষণা করা হয়েছে।[৩৬] 'আইন' এবং 'মিরাৎ-এ-আহ্‌মদী' থেকে জানা যায়, এই 'সরকার'টি পুরোপুরিই করদ প্রধানদের এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল। রাজপুত প্রধানদের আদিভূমি আজমীর প্রদেশে বিশেষভাবে মাত্র কয়েকটি 'মহাল'কে 'নক্‌দী' বলা হয়েছে। এর থেকে প্রথম নজরে মনে হতে পারে, 'নক্‌দী' এবং নজ়রানা-র মধ্যে কোনরকম সম্পর্ক থাকতে পারে না। কিন্তু বড় রাজপুত প্রধানরা আসলে নজরানা দিতেন না; তাঁরা জাগীরদার হয়ে গিয়েছিলেন। পূর্বপুরুষের রাজ্য তাঁরা নিজেদের অধিকারে রেখেছিলেন 'ওয়তন' হিসেবে, সেখানকার রাজস্ব তাঁদের হেফাজতেই থাকত। অল্প কয়েকটি এলাকার প্রধানরাই জাগীরদার হিসেবে বাদশাহী খিদমতে যোগ দেননি। আজমীর প্রদেশের 'নক্‌দী 'মহাল'গুলির প্রধানরা বোধ হয় এই দলেই পড়তেন। তাঁরা নজরানা দিতেন নগদে। তাহলে, বাংলার ক্ষেত্রে আমরা 'নক্‌দী'র যে-অর্থ নির্ণয় করেছি[৩৭] তাদের ক্ষেত্রে সেটি প্রয়োগ করলে ধরে নিতে পারি : সেখানকার জমিনদারদের কাছ থেকে ভূমিরাজস্ব নেওয়া হতো সরাসরি বাঁধা অঙ্কের টাকায়, যেন এটিই তাদের নজরানা, জমি বা তার উৎপন্নের ওপর পরিবর্তমান কর নয়।

বাংলায় যে ঐ ধরনেরই ব্যবস্থা চালু ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় আওরঙ্গজেবের আমলের দুটি দলিল থেকে। প্রথমটিতে (একটি 'হসবুল-হুকুম্') বলা হয়েছে মীর জুমলা তাঁর ইচ্ছামতো দুটি পরগনার জমিনদারীর শরিকদের ওপর 'জমা' বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ ছিল তাদের কোন দোষের শাস্তি, জমির রাজস্বপ্রদায়ী ক্ষমতা স্থির করে 'জমা' বাড়ানো হয়নি। উপরন্তু এই বাড়তি 'জমা' শুধুমাত্র কোন বিশেষ বছরের জন্য নয়, এটি চাপানো হয়েছিল স্থায়ীভাবে।[৩৮] দ্বিতীয়টি হলো ইংরেজ কম্পানির

৩৫. 'মহাল'গুলি হলো : কালিঞ্জর 'সরকার'-এ অজয়গড় (এলাহাবাদ); খান্দেলা, নরনাউল 'সরকার' (আগ্রা); উদয়পুর, ইসলামপুর (মোহন), সানওয়র ঘাটি, 'আবাদী জমি সহ' সৈম্বল, মণ্ডলগড় এবং মাদারিয়া চিতোর 'সরকার'-এ এবং রণথাম্ভোর 'সরকার'-এ (আজমীর) আমখোরা এবং দেবলানা; হান্দিয়া 'সরকার'-এ সেওনি এবং গগরুন 'সরকার'-এ (মালওয়াল) ঔনরমল এবং 'শহর সহ' গগরুন, এবং বান্দার সোলা, 'সরকার' 'আহ্‌মেদাবাদ (গুজরাট)। এছাড়াও ব্লথমান নরনাউল 'সরকার'-এর সিংহানা-উদয়পুর এবং আহ্‌মেদাবাদ 'সরকার'-এর থমনার পাশে 'কয়ার-এ নগদী' লিখেছেন, যদিও Add. 7652 বা 6552 কোনটিতেই এর সমর্থন মেলে না।

৩৬. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৩।

৩৭. মোরল্যাণ্ড ও ইউসুফ আলী (*JRAS*, ১৯১৮, পৃ. ৩৩) এই ধরনেরই একটি ব্যাখ্যার আভাস দিয়েছেন, কিন্তু বিবৃত করেননি।

৩৮. 'দুর-আল-উলুম', পৃ. ৪৭ ক-৪৮ ক। 'জমা' মেটানোর জন্য তাদের নৌকোর ব্যবস্থা করতে হতো যার সংখ্যা বাড়িয়ে ২০ থেকে ২৯ করা হয়েছিল।

কাছে 'ডহী কলকাত্তা' এবং অন্য দুটি গ্রাম বিক্রির স্বীকৃতিসূচক দিওয়ানী পরওয়ানা। এই গ্রামগুলির ভূমিরাজস্ব হিসেবে প্রদেয় বাঁধা অঙ্কের 'জমা'র পরিমাণ এতে দেওয়া আছে। পরওয়ানার উল্টোপিঠে ঐ অঙ্কটিকেই গ্রাম পিছু ভেঙে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কম্পানির 'ওয়কীল' (প্রতিনিধি) যা অঙ্গীকার করেছিলেন এটি তারই নকল।[৩৯] অযোধ্যার এই ধরনের রাজস্ব-সংক্রান্ত দলিলপত্রে যে-নির্দেশ দেওয়া থাকে, এখানে ঘটেছে তার উল্টো: কোন বিশেষ বছরের জন্য 'জমা' নির্দিষ্ট করা নেই; ইংরেজদের নথিপত্র থেকেও জানা যায় যে, বছরের পর বছর একই পরিমাণ টাকা দিয়ে যাওয়া হতো।[৪০] কৌতূহলের বিষয় এই যে, কম্পানিকে জারি করা একটি 'নিশান'-এ 'জমা-এ তুমার' অনুযায়ী তাদের রাজস্ব ('ওয়াসিল') দিতে বলা হয়েছে। বাংলায় যে-'জমা'র ভিত্তিতে জাগীর বরাদ্দ করা হতো, তারই নাম ছিল 'জমা-এ তুমার'।[৪১] সুতরাং ধরে নিতে পারি যে, জমিনদারের কাছ থেকে রাজস্ব পাওয়া এবং জাগীর বরাত করার জন্য[৪২] বাংলায় একই ধাঁচের অঙ্ক ব্যবহার করা হতো।[৪৩] তার মানে দাঁড়ায় এই যে, 'ওয়াসিল'-এর (অর্থাৎ, জাগীরদাররা প্রকৃতপক্ষে যে ভূমিরাজস্ব আদায় করেছে) কোন হেরফের হতো না। এর থেকেই প্রমাণ হয়, অন্য সব প্রদেশে যেমন 'ওয়াসিল'-এর সঙ্গে মেলানোর জন্য বা তার কাছাকাছি আনার জন্য 'জমাদামী' (যার ভিত্তিতে জাগীর বরাত করা হতো) বদলাবার ঝোঁক ছিল, এখানে তেমন কিছু করা হতো না। ১৭ শতকে বাংলায় 'জমাদামী' অঙ্ক এতটা স্থির থাকার কারণ বোধহয় এ-ই।[৪৪]

কেবলমাত্র আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর আগের আমলের সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকেই বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থার সাধারণ রূপরেখা এখানে খাড়া করা হয়েছে। লক্ষণীয় এই যে ১৮ শতকের সমস্ত রাজস্ব-বিষয়ক লেখাপত্র থেকেও তার সমর্থন মেলে।[৪৫] এই মিলের

৩৯. Add. 24,039, পৃ. ৩৬ ক-খ।

৪০. "(এই সমস্ত গ্রামগুলির) খাজনার পরিমাণ বাদশাহের হিসাব বহি অনুযায়ী কিঞ্চিদধিক ১১৯৪.১৪ যা প্রতি বছর কোষাগারে দাখিল করতে হয়" (সি. আর. উইলসন, 'আর্লি অ্যানালস অফ দি ইংলিশ ইন বেঙ্গল', ২য় খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ. ৬০, 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', পৃ. ১৯২ টীকায় উদ্ধৃত)। দিওয়ানের পরওয়ানায় ও কম্পানির ওয়কীল-এর অঙ্গীকার-এ উল্লিখিত এই অঙ্ককেই 'জমা' বলা হয়েছে।

৪১. Add. 24,039, পৃ. ৩৬ খ, ৩৭ ক।

৪২. Add. 6586, পৃ. ২২ খ।

৪৩. মুঘল সাম্রাজ্যের অন্য প্রদেশগুলির ক্ষেত্রে 'ওয়াসিল' ('জমা'র থেকে আলাদা করে) পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলা ও বিহারের ক্ষেত্রে কিছুই দেওয়া নেই—এই ঘটনা থেকেও তার আভাস পাওয়া যায় (পরিশিষ্ট 'ঘ' দ্রষ্টব্য)।

৪৪. পরিশিষ্ট 'ঘ'-এ সারণির অঙ্কগুলি দ্রষ্টব্য। বাংলার মোট 'জমাদামী' 'আইন'-এ ছিল ৪২,৭৭,২৩,৬৮১, আওরঙ্গজেবের আমলের শেষের দিকে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৫২,৪৬,৩৬,২৪০।

৪৫. এর দৃষ্টান্ত হিসেবে দু-তিনটি ঘটনার বিস্তারিত উল্লেখ করলেই চলবে। Add. 6586, পৃ. ২২ খ-এ বলা হয়েছে যে, "জমিনদাররা এখনও পর্যন্ত 'জমা-এ তুমারী' অনুযায়ী 'সনদ'

ওপর আরও বেশি জোর দেওয়া দরকার, কারণ পরবর্তী আমলের রাজস্ব-বিষয়ক লেখাপত্রের ঐতিহাসিক যাথার্থ্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। এর বেশির ভাগই প্রথম দিকের ইংরেজ প্রশাসকদের সুবিধার্থে লেখা।[৪৬] 'ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত'—

পায় আর এর ভিত্তিতেই জাগীরদারদের তন্‌খা ('তন্‌খওয়াহ্‌') দেওয়া হতো।" আরও বলা হয়েছে যে 'জমা-এ তুমারী' যেহেতু জমিতে যা উৎপন্ন হয় তার চেয়ে অনেক কম ছিল, তাই দেশ (মূলে তা-ই আছে; কিন্তু আমাদের বোধহয় বলা উচিত, 'জমিনদাররা') হয়ে উঠেছিল আরও সম্পদশালী। 'রিসালা-এ জিরাৎ' নামে আনুমানিক ১৭৫০ সালে লেখা একটি বইতে বলা হয়েছে (পৃ. ১২ খ): আকবরের আমলে 'জমা-এ তুমারী' প্রবর্তন করেছিলেন তোডর মল; এটি আর কখনোই প্রকৃত রাজস্ব নির্ধারণের মাধ্যমে সংশোধন করা হয়নি; 'লোকে' (অর্থাৎ জমিনদাররা) যখন 'জমা-এ তুমারী' অনুসারে কর্তৃপক্ষের কাছে রাজস্ব দাখিল করল, তখন তারা তাদের ভূ-সম্পত্তির ('জাইদাদ্‌') আয় বুঝল, আর ভূমি-রাজস্ব ('হাল-এ ওয়াসিল') আদায় করল প্রকৃত নির্ধারণের মাধ্যমে। জমির উপর প্রকৃত নির্ধারিত পরিমাণকে বলা হতো 'জমা-এ-তশখিশ'। বইটিতে আরও বলা হয়েছে যে, 'জমা-এ তশখিশ' সাধারণত 'জমা-এ তুমারী'র চেয়ে বহুগুণ বেশি হতো, আর বাংলায় এমন জায়গা প্রায় ছিল না যেখানে 'জমা-এ তশখিশ' 'জমা-এ তুমারী'-র চেয়ে কম। প্রাক্‌-বৃটিশ আমলের রাজস্ব-ব্যবস্থার একটি প্রতিবেদনেও (জানুয়ারি ২৫, ১৭৭৫-এ বড়লাট ও তাঁর কাউন্সিলের নির্দেশে রায় রায়ান ও কানুনগোরা এটি তৈরি করেছিলেন) বলা হয়েছে যে জমিনদাররা রাজস্ব ('মাল-গুজারী') দিত তোডর মলের 'জমা-এ তুমারী' অনুসারে (Add. 6592, পৃ. ৭৭ ক; Add. 6586, পৃ. ৫৩ ক)। আরও দ্রষ্টব্য জুন ১৭৮৯-এ শোর-এর বিখ্যাত 'মিনিট', বিশেষ করে ৩৭৯ ও ৩৮০ অনুচ্ছেদ।

গুলাম হুসেন তাঁর সুপরিচিত বাংলার ইতিহাস 'রিয়াজুস সালাতিন' (১৭৮৭-৮ তে সমাপ্ত)-এ বলেছেন যে, আওরঙ্গজেবের আমলের শেষ দিকে নায়েব নাজিম (উপ-প্রদেশকর্তা) হিসেবে তাঁর কার্যকালে মুর্শিদ-কুলী খান পুরনো ব্যবস্থা একেবারেই উচ্ছেদ করার বা অন্তত খোলনলচে পাল্টানোর চেষ্টা করেছিলেন। জমিনদারদের জবরদস্তি আদায়কে তিনি কব্জায় এনেছিলেন তাদের শুধুমাত্র 'নানকার' দিয়ে। তিনি রাজস্ব নির্ধারণ করিয়েছিলেন এবং জমি জরিপের ব্যবস্থা করে চাষীদের কাছ থেকে তা সরাসরি সংগ্রহ করতেন। এর জন্য তিনি তাঁর নিজস্ব রাজস্ব-সংগ্রাহক ('আমিল') নিয়োগ করেছিলেন যাদের অধীনে থাকত 'শিকদার' ও 'আমিন' (বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা সংস্করণ, পৃ. ২৫২)। পরবর্তী তথ্যপ্রমাণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে মুর্শিদ কুলী খানের ব্যবস্থাগুলি নেহাৎই সীমিতভাবে সফল হয়ে থাকতে পারে। বিবরণটি আরও উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে মুর্শিদ কুলী খানের আগে কী ব্যবস্থা চালু ছিল তা এর থেকে পরোক্ষভাবে বেরিয়ে আসে।

৪৬. মোরল্যাণ্ড সন্দেহ করেছিলেন, এর পুরোটাই সাজানো হয়েছিল ইংরেজদের ভুল পথে চালানোর জন্য (*JRAS*, ১৯২৬, পৃ. ৫১-৫২)। 'আকবর টু আওরঙ্গজেব', পৃ. ৩২৫-এ তিনি বলেছেন যে একই উদ্দেশ্যে মুঘল পরিসংখ্যানে বাংলার 'জমা'র মিথ্যা অঙ্ক দেওয়া হয়েছিল। ঠকানোর ব্যাপারে উমিচাঁদ সত্যিই ক্লাইভকেও টেক্কা দিয়েছিলেন!

তা সে চিরস্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদী যে ধরনেরই হোক—সম্পর্কে ইংরেজরা যে-ধারণা দৃঢ়ভাবে পোষণ করত তার কিছুটা অন্তত বাংলার [বাস্তব] অবস্থা থেকেই নেওয়া, পুরোপুরি ভিন্নদেশী নয়। অভিনব ব্যাপার এই যে, এই ধারণাটিকে তারা নিয়ে গেল বাংলার বাইরে, যেখানে এর কথা আগে জানা ছিল না। সেসব জায়গায় 'ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত' হয়ে দাঁড়াল এক বিরাট যন্ত্র, লুঠেরা আর মহাজন তারই এক ছাঁচে ঢালাই হলো, বেরিয়ে এল বৃটিশ রাজের 'পাক্কা ভক্ত', আধুনিক ভারতীয় জমিদার (ল্যাণ্ডলর্ড)।

আগেই দেখা গেছে, আমাদের আলোচ্য পর্বে জমিনদারী স্বত্বকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বস্তু বলেই ধরা হতো। মুঘল প্রশাসন যেভাবে জমিনদারদের মধ্যে বিবাদের নিষ্পত্তি করত তার থেকেও এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায়। নথিপত্রে দেখা যায়, জমিনদারীর অধিকার নিয়ে ঝগড়া হলে তার ফয়সালা হতো আইনের আশ্রয়ে, অর্থাৎ 'কাজী'র মারফৎ বা তার সহায়তায়। এইভাবে আইনের মাধ্যমে স্বত্ব প্রতিষ্ঠা হলে, বা অন্যেরা আইনগত-ভাবে কোন আপত্তি না তুললে, সেই স্বত্ব বলবৎ করত ঐ এলাকার ফৌজদার বা 'সেনানায়ক'।[৪৭] জমিনদারীর অধিকার নিয়ে অভিযোগ দরবার অবধিও গড়াত। সেখান থেকে সাধারণত 'হসবুল-হুকুম্' নামে এক আদেশনামা পাঠানো হতো স্থানীয় কর্মচারীদের কাছে। নির্দেশ থাকত, তারা যেন যথাযথ ব্যবস্থা নেয়।[৪৮]

সম্ভবত, জমিনদারী স্বত্বের ব্যাপারে এই ছিল স্বাভাবিক রীতি : ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে এর একটা পবিত্রতা ছিল। কিন্তু এর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যার জন্য প্রশাসনকেও অন্য দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হতো। আমরা দেখেছি, জমিনদার যে ভূমিরাজস্ব আদায় ও দাখিল করবে—এমনই আশা করা হতো। সরকারী দলিলপত্রের পোশাকী ভাষায় জমিনদারের স্বত্বকে তাই বলা হয়েছে 'খিদমত'। সে যদি ঠিকমতো কাজ না করে ও ভূমিরাজস্ব না দেয়, তবে তাকে ছাড়িয়ে তার জায়গায় অন্য লোক বসানো যেত। দ্বিতীয়ত, জমিনদাররা সচরাচর সশস্ত্র অনুচর বাহিনী রাখত। সুতরাং তারা ছিল রাজদ্রোহের সম্ভাব্য উৎস এবং একই সঙ্গে

৪৭. সরাসরি কাজীর কাছে পেশ করা জমিনদারী সংক্রান্ত একটি বিবাদের জন্য দ্রষ্টব্য Allahabad 421. বিবাদের শুনানি হয়েছিল ফৌজদার ও কাজী দুজনেরই সামনে, রায় দিয়েছিলেন কাজী একা, Allahabad 359 ; স্বত্বের ভিত্তিতে কোন বাদীপক্ষ একটি জমিন-দারী জবরদখলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। আমিন-ও-ফৌজদার সেটি বিচারের জন্য কাজী ও 'মুতাবল্লী' ('মদদ-এ মআশ' জমির অছি)-র কাছে পাঠিয়ে দেন (Allahabad 175)। যখনই কোন ফৌজদারকে নিজের থেকে কোন বিবাদের বিচার করতে দেখা যায়, বাস্তবে তার সামনে ঐ বিষয়ে কোন কাজীর দেওয়া রায় থাকত (Allahabad 370 এবং 1201)। ন্যায্য দাবিদারকে জমিনদারী ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সরকারি ব্যবস্থার জন্য Allahabad 1202, 1203, 1225 দ্রষ্টব্য। এই টীকায় উল্লিখিত প্রায় সমস্ত দলিলই আওরঙ্গজেবের আমলের।

৪৮. এইরকম একটি মূল 'হসবুল হুকুম্' Allahabad 1214-এ রয়ে গেছে। আরও দ্রষ্টব্য 'দুর-আল উলুম', পৃ. ৪৩ ক-৪৪ ক, ৪৯ ক-খ, ৫২ খ-৫৩ ক, ৫৬ খ-৫৭ ক, ৬১ খ-৬২ ক।

রাজদ্রোহ দমনের সম্ভাব্য মিত্র। অবিশ্বস্ত জমিনদার স্বভাবতই তার স্বত্বের ওপর যাবতীয় দাবি হারাত, আর প্রশাসন তার জায়গায় কোন বিশ্বস্ত লোক বসানোর চেষ্টা করত।

ঐ ধরনের হস্তক্ষেপ দরকার পড়ত বলেই একটি নীতি গড়ে উঠেছিল : বাদশাহী সরকার খুশিমতো জমিনদারী দিতে বা ফিরিয়ে নিতে পারবে। এরকম একটা কথা চালু ছিল যে "একদিনের কর্মচারী ('হাকিম') পাঁচশ বছরের জমিনদারকে সরিয়ে তার জায়গায় এমন একজনকে বসাতে পারে জীবন-ভর যার কোন সাকিন ছিল না।"[৪৯] আরও পরবর্তীকালের একটি বই-এ ঐ একই নীতির কথা আছে, তবে অতটা রূঢ়ভাবে নয় : বাদশাহ্ যে কোন লোকের জমিনদারী অন্যকে দিয়ে দিতে পারেন, যদি কোন ত্রুটি ঘটে থাকে ; সুবাদার বা কর্মচারীর ('সুবা ও হাকিম') সে ক্ষমতা নেই।[৫০] ১৭ শতকের নজিরগুলি থেকেও এর সত্যতা প্রমাণ হয়। দেখা যায়, জমিনদারী সংক্রান্ত সব রদবদলই হতো একমাত্র বাদশাহী আদেশে, স্থানীয় কর্মচারীদের ক্ষমতা দরবারে তাদের সুপারিশ ('তজবীজ') পাঠানোতেই সীমাবদ্ধ থাকত।[৫১]

জমিনদারী অর্পণের সবচেয়ে পুরনো যে-আদেশনামা পাওয়া যায় সেটি জাহাঙ্গীরের আমলের।[৫২] কিন্তু বাকিদের ক্ষেত্রে আমাদের সব তথ্যই পাওয়া গেছে আওরঙ্গজেবের আমল থেকে, যে-আমলে প্রচুর জমিনদার বদল, বহাল ও বরখাস্তের কথা নথিভুক্ত আছে। কোথাও কোথাও পুরনো জমিনদারদের বরখাস্তের কারণ দে[illegible]য়েছে। সচরাচর তা হলো রাজস্ব না দেওয়া ও বিদ্রোহী আচরণ, সাধারণত এক[illegible] দুই-ই।[৫৩] রাজস্ব দিয়ে চললে জমিনদারদের বরখাস্ত করার কোন কথাই উঠত না।[৫৪] অন্যদিকে, জমিনদারীতে বহাল হলে রাজস্ব দাখিল ও রাজদ্রোহ দমনের দায়িত্বও নিতে হতো। একটি প্রশাসনিক পুস্তিকায় নতুন জমিনদার নিয়োগের নিয়মাবলি দেওয়া আছে। যে-স্বত্ব দেওয়া হলো তার থেকে প্রত্যাশিত আয় অনুযায়ী একটি 'মনসব' (বা পদ, 'সওয়ার' পদ সমেত অর্থাৎ সামরিক দায়িত্বসহ) দেওয়া চলতে পারে ; আর জমিনদারকে কথা দিতে হবে : সে তার জমিনদারীর মধ্যে রাজদ্রোহী লোকজনকে শায়েস্তা করবে।[৫৫] মথুরার কাছে এক জমিনদারীর প্রাপকের জন্য নির্দিষ্ট কর্তব্য-

৪৯. বেকাস, পৃ. ৫১ ক।

৫০. Add. 6603, পৃ. ৬৫ ক।

৫১. 'ওয়াকাই-এ আজমীর', ৩৯৬-৮ দ্রষ্টব্য, 'অখবারাৎ' ৩৮/১৩৭ এবং ইত্যাদি, 'নিগরনামা-এ মুন্শী', পৃ. ১৯৯ ক-খ, Bodl. পৃ. ১৫৭ খ-১৫৮ ক, Ed. 152 ; 'ইন্শা-এ রোশন ক[illegible]', পৃ. ৩ খ-৪ ক ইত্যাদি।

৫২. জাহাঙ্গীরের ফরমান, *IHRC*, খণ্ড ১৮, ১৯৪২, পৃ. ১৮৮-৯। বিহারের মুঙ্গের 'সরকার'-এর এক পরগনার কয়েকটি 'টপ্পা'র জমিনদারী ও চৌধুরাই মঞ্জুর করা হয়েছে।

৫৩. 'ওয়াকাই-এ আজমীর', ৩৬৫, ৩৯৬-৮ ; 'ইন্শা-এ রোশন কলাম', পৃ. ৭ খ-৮ ক ইত্যাদি ; বেকাস, পৃ. ৫০ ক-৫৩ ক।

৫৪. 'ইন্শা-এ রোশন কলাম', পৃ. ২০ খ।

৫৫. ক্রেজার ৮৬, পৃ. ৬২ ক-খ। তুলনীয় 'ইন্শা-এ রোশন কলাম', পৃ. ৩ খ। জমিনদারী-মঞ্জুরির জন্য এক প্রার্থীকে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে এবং "জমিনদারীর শর্তসাপেক্ষে" তাকে 'মনসব' দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া 'অখবারাৎ' ৪৪/১৪২।

তালিকার প্রথমেই আছে "দুরাচারী, রাজদ্রোহের উস্কানিদাতাদের বহিষ্কার।"[৫৬] একইভাবে অন্যান্য দলিলে 'উলূস' (একদল সশস্ত্র অনুচর) থাকাকে জমিনদারী পাওয়ার পূর্বশর্ত করা হয়েছে।[৫৭] সুতরাং কোন পরগনার জমিনদারী ও ফৌজদারী (সামরিক দায়িত্ব)-র দায়িত্ব একই সঙ্গে একই লোককে দেওয়া হচ্ছে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।[৫৮] কিন্তু বহালের বেলায় টাকাকড়িরও কিছু ভূমিকা থাকত। যে-জমিনদারী সে চায় সেটি পাওয়ার আগে প্রার্থীকে সাধারণত দরবারে একটা 'পেশকশ' বা মোটা টাকা কবুল করতে হতো।[৫৯] কয়েকটি নথি থেকে আভাস পাওয়া যায় যে বাদশাহী মঞ্জুরি সর্বদা মৌরুসী হতো না,[৬০] কয়েকটি ক্ষেত্রে অন্তত যাবজ্জীবন মঞ্জুরিও দেওয়া হয়নি, কেননা সেগুলিতে জাগীরের মতো একই শর্তে জমিনদারী বদলের ('তগাইয়ুর') কথা আছে।[৬১]

১৭ শতকের যে-নজিরগুলি ওপরে দেওয়া হলো তার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, সাধারণত জমিনদারী মঞ্জুরির অধিকারী ছিলেন বাদশাহী প্রশাসনেরই এক যন্ত্র। কিন্তু, সম্ভবত পরের শতকে জমিনদার হতে হলে প্রথমে ক্ষমতা অর্জন করতে হতো, পরে দরবারকে দিয়ে তার স্বীকৃতি করিয়ে নিতে হতো। জমিনদার বহাল ও বরখাস্তের বাদশাহী ক্ষমতা যদিও সাধারণত প্রয়োগ করা হতো না, তবুও জমিনদারদের তাঁবে রাখার এই ছিল একটা বড় অস্ত্র। এর ফলে জায়গায় জায়গায় জমিনদারদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল সরকারের প্রতি অনুগত কিছু লোক। তার কারণ: এই ব্যবস্থার সুবাদে তারা সেইসব জমি দখল করেছিল, অধিকারচ্যুত লোকেরা যে-জমি অনেক কাল দাবি করে চলবে। কখনও কখনও, মনে হয়, প্রাপকদের এমনভাবে বেছে নেওয়া

৫৬. 'নিগরনামা-এ মুনশী', পৃ. ১৯৯ খ. Bodl., পৃ. ১৫৮ ক, Ed. 152.

৫৭. 'ইন্‌শা-এ রোশন কলাম', পৃ. ৩ খ-৪ ক; 'কলিমৎ-এ তৈয়াবৎ', পৃ. ১২৭ খ-১২৮ ক।

৫৮. 'ওয়াকাই-এ আজমীর' ২১৮-১৯। মানসিংহ নামক জনৈক কর্মচারীকে একই সঙ্গে "ফৌজদারী ও জমিনদারী" থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল।

৫৯. 'অথবারাৎ' ৩৮/১৩৭ (দিল্লী প্রদেশের বরন পরগনার জমিনদারী); ৪৪/১৪২ (জাহাঙ্গীরাবাদ, অযোধ্যা): 'ইন্‌শা-এ রোশন কলাম', পৃ. ৮ ক।

৬০. বরন-এর জমিনদারী মঞ্জুরির ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়, প্রাক্তন অধিকারীর মৃত্যুর পর সেটি আরেকজন কর্মচারীকে দেওয়া হয়েছিল ('অথবারাৎ' ৩৮/১৩৭)। কিন্তু, 'অথবারাৎ' ৪৮/১৪৮-এ দেখা যায় সম্ভল 'সরকার'-এ জনৈক জমিনদার (যিনি মনসবের অধিকারীও ছিলেন) মারা যাওয়ার পর তার জমিনদারী বর্তেছে তার দুই ছেলের ওপর, আর সেই জমিনদারীর জন্য বরাদ্দ মনসবও তার দুই ছেলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। জাহাঙ্গীরের জমিনদারী এবং চৌধুরাই মঞ্জুরির ক্ষেত্রে, এই অনুদান যে গ্রহীতার মৃত্যুর পর তার ছেলেদের ওপর বর্তাবে তা বোঝা যায় মূলের 'বা ফরজিনদান' ('ছেলেদের সমেত') এই শব্দগুচ্ছের ব্যবহার থেকে (*IHRC*, ১৯৪২, পৃ. ১৮৮-৯)। সম্ভবত, জমিনদারী মঞ্জুরি মৌরুসী হলে বাদশাহী আদেশনামায় সেটি স্পষ্ট করে লিখে দিতে হতো।

৬১. 'ওয়াকাই-এ আজমীর' ২১৯; 'অথবারাৎ' ৩৮/২৮৩, ৪৪/১৪২, ৪৮/১০৩; 'মআসির-এ আলমগীরী', ৩১৪।

হতো যাতে অঞ্চল বিশেষে জমিনদারীর 'কওম'গত একচেটিয়া অধিকার ভাঙা যায়। বাইসওয়ারায় বাইস রাজপুতদের এলাকার ভেতরেই স্থানীয় মুসলিমদের বড় জমিনদারী দিতে দেখা যায়।[৬২] অথবা যে-গোষ্ঠীর আনুগত্য সম্পর্কে সন্দেহ আছে, স্পষ্টতই তাদের সরানোর উদ্দেশ্যে অন্য একটি রাজপুত গোষ্ঠীকে জমিনদার হিসেবে নিয়ে আসা হয়।[৬৩] 'আইন'-এর সময় থেকে বিভিন্ন 'কওম'-এর অধিকৃত জমিনদারীর সীমানা যে পাল্টে গেছে—অন্যান্য কারণের পাশাপাশি, ১৮ শতকের জমিনদারী মঞ্জুরিও তার অন্যতম কারণ হতে পারে। আবার এও সম্ভব যে আওরঙ্গজেবের আমলে যে সব রদবদল হয়, তার বেশির ভাগই মুসলমানদের কয়েকটি বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষে গিয়েছিল। দরবার থেকে বহাল-করা এক বিরাট সংখ্যক জমিনদার, যাদের নাম নথিপত্রে পাওয়া যায়, তারা অবশ্যই মুসলিম। ধর্মীয় ব্যাপারে আওরঙ্গজেবের সাধারণ বিভেদনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই হয়তো এসব করা হয়েছিল, কিন্তু এ বিষয়ে এমন নজির পাওয়া যায়নি যার ভিত্তিতে চূড়ান্ত মত দেওয়া যায়।

৪. স্বয়ংশাসিত প্রধান

এতক্ষণ পর্যন্ত এই অধ্যায়ের আলোচনা আমরা সীমাবদ্ধ রেখেছি সরাসরি বাদশাহী প্রশাসিত অঞ্চলের জমিনদারদের মধ্যে। আমরা দেখেছি, কোন লোককে (চাষীকে নয়) জমিনদার বলা হতো যখন জমিতে তার একটি বিশেষ অধিকার থাকত। এই অধিকারের বিভিন্ন আঞ্চলিক নাম ছিল, কিন্তু আমাদের নথিপত্রে এগুলিকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'স্বত্বমূলক' বলেই নির্দেশ করা থাকে। এই অধিকার যে বাস্তবিকই সর্বদা স্বত্বমূলক হতো তা নয়, কিন্তু এর তিনটি বিশেষ লক্ষণ ছিল: এটি ছিল চাষীর অধিকারের ঊর্ধ্বতন একটি অধিকার; এর উদ্ভব হয়েছিল তদানীন্তন বাদশাহী শক্তিনিরপেক্ষভাবে; এবং এই অধিকার দিয়ে বোঝানো হতো জমির উৎপন্নের ওপর একটা ভাগের দাবি, রাষ্ট্রের ভূমিরাজস্ব-দাবির পাশাপাশি থাকলেও তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। উপরন্তু, এই অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বলবৎ করার উপায়-স্বরূপ এর সঙ্গে সাধারণত যুক্ত থাকত সশস্ত্র বাহিনী। বাদশাহী অঞ্চলের জমিনদার ছিল পুরোপুরি প্রশাসনের অধীন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্বদাই জমিনদারকে শুধুমাত্র আদায়কারীতে পরিণত করার চেষ্টা চলত। কিন্তু বৃহত্তর শক্তির অধিকারী, যেমন, সর্দার ও ছোট রাজা, তথাকথিত রাজা, রাণী, রাও, রাওয়াত[১] ইত্যাদিদের মতো কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যও তার (জমিনদারের) ছিল। তাদের মতোই জমিনদারের আওতায় কিছুটা অঞ্চল থাকত যাকে সে বলতে পারত তার নিজের; তাদের মতোই জমিনদারও, সচরাচর, বাদশাহী সরকারের তৈরি জিনিস ছিল না, এবং তাদের

৬২. 'ইন্‌শা-এ রোশন কলাম', পৃ. ৩ খ-৪ ক, ৮ ক।

৬৩. 'ওয়াকাই-এ আজমীর', ৩৬৪-৫।

১. প্রধানরা অধীনতা স্বীকার করলে মুঘল বাদশাহরা সাধারণত তাঁদের এইসব প্রথাগত উপাধি দিতেন। কিন্তু প্রধান হিসেবে যাদের কোনো দাবিই ছিল না, এমন কিছু লোককেও এসব উপাধি দেওয়া হয়েছিল, যেমন আকবরের আমলে তোডর মল ও বীরবল।

মতোই বিষয়-আশয় রক্ষা করার জন্য তার অধীনে থাকত কিছু যোদ্ধা। কখনও কখনও এদের দুজনের মধ্যে স্পষ্ট তফাৎ করা যেত না। হয়তো দেখা যাবে যে নিজেকে 'রাজা' বলছে সে-ই আবার যে-কোন জমিনদারের মতো তার (ভাগের) গ্রামের স্বত্ব বিক্রি করছে।[২] দখিনে কোন 'দেশমুখ' (উত্তর ভারতের 'চৌধুরী'র সমতুল্য) প্রধানে পরিণত হতে পারত,[৩] আর ক্ষমতাশালী প্রধানের বংশধররা হয়ে যেত 'দেশমুখ'।[৪] বাদশাহী সদর-এ আদালত সাম্রাজ্যের সমস্ত শাসকের ক্ষমতা খর্ব করতে চাইত। এইসব মিলের দরুন তার দিক থেকে ঐ দুই দলকে এক বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ ছিল। বড় একটি রাজ্যের অধীশ্বর ও কোন গ্রামের বিষয়-আশয়ের একটা ভাগের নগণ্য দাবিদার—দুজনকেই একইভাবে জমিনদার ও 'বূমী' আখ্যা দেওয়া হতো।[৫]

নির্বিশেষে অর্থে প্রয়োগ করা হলে, প্রধান ও সাধারণ জমিনদারের ক্ষেত্রে একই নামের ব্যবহার কখনও কখনও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। এর অবশ্য একটা গুণের দিকও আছে। এর ফলে জোর পড়ে এই ঘটনার ওপর যে মুঘল সরকারের

২. Allahabad 1227 (তাং ১২ ডিসেম্বর ১৬৯৫)। বিক্রেতা এইভাবে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন: "নহস্কা গ্রামের জমিনদার রাজা মুরার সিংহের পুত্র রাজা প্রতাপ নারায়ণ, তস্য পুত্র রাজা বরথন সিং"। কিন্তু বিক্রি হয়েছিল অন্য একটি গ্রাম। দুটিই অবশ্য অযোধ্যার বাহ্‌রাইচ 'সরকার'-এর অন্তর্গত।

৩. বেরারের প্রধানদের মধ্যে তেলিঙ্গানায় ইন্দুরের প্রধান, চনানেরী দেশমুখ-এর কথাও 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৭-এ উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর বংশধরদেরও বলা হতো চনানেরী দেশমুখ। আওরঙ্গজেব যখন দখিনের নবাব তখন ঐ বংশধরদের আর্থিক দায়-দায়িত্ব ছিল তাঁর একটি চিঠির বিষয়বস্তু ('আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ১৬১ খ-১৬২ খ)।

৪. মহুয়ের প্রধান উদাজী রামের বংশধরদের ক্ষেত্রে তা-ই ঘটেছিল ('মআসির-আল উমরা', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২-৪৫)।

৫. স্বয়ংশাসিত প্রধানদের জন্য 'বূমী' এবং 'জমিনদার' শব্দদুটির ব্যবহার প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৭-৮২, ৪৮৬, ৪৯২; 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৩, 'আলমগীরনামা', পৃ. ৬৭৭ ইত্যাদি। দিল্লী সুলতানদের আমলেও 'জমিনদার' শব্দটি প্রধানদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হতো। বরনী, 'তারিখ-এ ফিরুজ শাহী', বিবলিওথেকো ইণ্ডিকা সংস্করণ, পৃ. ৩২৬, ৫৩৯ এবং শামস্ সিরাজ আফিফ, 'তারিখ-এ ফিরুজ শাহী', বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা, পৃ. ১৭০।

ভারতে কোন শাসককে উঁচু, বিশেষ করে রাজকীয় খেতাব দেওয়ার ব্যাপারে মুঘল সদর-এ আদালত সর্বদাই খুব সতর্ক থাকত। সমসাময়িক ভারতীয় শাসকদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে আবুল ফজল কখনই তাদের 'শাহ্' বলেননি, সাধারণত শুধু 'মর্জবান' অর্থাৎ 'একটি অঞ্চলের প্রধান' বলেছেন। মুঘলরা সর্বদাই জেদ করে আদিল শাহ্‌কে "আদিল খান" এবং কুৎব শাহ্‌কে "কুৎব-উল-মুল্ক" বলত। আকবরের সময় থেকেই এঁদের দুজনকে বলা হতো 'দুনিয়া-দার' ('পৃথিবীর লোক')।· শব্দটি জমিনদার-এর সমপর্যায়ের ('জমিন' মানে মাটি)। সেই সঙ্গে এমন ইঙ্গিতও আছে যে এই নামধারী লোকেদের ধর্মবিশ্বাস খুব দৃঢ় নয়, তারা নেহাৎই পৃথিবীর লোক।

দৃষ্টিকোণ থেকে গোটা সাম্রাজ্য জুড়ে ছিল একসার স্থানীয় স্বৈরতন্ত্র, কোথাও তারা আধা-স্বাধীন, কোথাও যথেষ্ট বশীভূত, এখানে তাদের প্রতিনিধি হলো প্রধান, ওখানে সাধারণ জমিনদার। কতক ক্ষেত্রে মনে হতে পারে: এই দু ধরনের লোক মিলে একটাই শ্রেণী গঠন করেছে।

কিন্তু, এ দু-এর তফাৎও খেয়াল রাখতে হবে। প্রধানরা সাধারণ জমিনদারদের চেয়ে বড় সামরিক ক্ষমতা ও অঞ্চল ভোগ করত—তফাৎ শুধু এইটুকুই নয়। চলতি প্রথা অনুযায়ীও দু-এর মধ্যে তফাৎ করা হতো: বিষয়-আশয়ের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও আলাদা নিয়ম করা ছিল।[৬] কিন্তু সবচেয়ে স্পষ্ট তফাৎ দেখা যেত বাদশাহী শক্তির সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে। প্রধানদের দেওয়া হয়েছিল স্বায়ত্ত-শাসন, কিন্তু সাধারণ জমিনদাররা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাদশাহের সম্পন্ন প্রজা মাত্র।

প্রধানদের সঙ্গে মুঘল সরকারের সম্পর্ক কখনোই এক ধরনের ছিল না। বড় রাজপুত রাণাদের মতো কেউ কেউ সরকারের কাজে যোগ দিয়ে 'মনসব' বা উঁচু পদ পেয়েছিল। তাদের পৈতৃক রাজ্যকে ধরা হতো বিশেষ ধরনের জাগীর: অ-হস্তান্তর-যোগ্য এবং বংশগত, সরকারী পরিভাষায় যার নাম 'ওয়তন'। চলতি রীতি ছিল এই: প্রথমে গোটা অঞ্চলের মোট রাজস্ব মোটামুটিভাবে নির্ধারণ করে একটা অঙ্ক দাঁড় করানো হবে, তারপর শাসককে একটা 'মনসব' দেওয়া হবে যার অনুমোদিত আয় ঐ অঙ্কটির সমান।[৭] এদের মধ্যে কারও কারও কাছ থেকে এবং অন্যান্য প্রায় সব

৬. সাধারণ জমিনদারীর ক্ষেত্রে, আমরা আগেই যেমন দেখেছি, পৈতৃক সম্পত্তি ছেলেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হতো। কিন্তু প্রধানদের বেলায় ছেলেদের মধ্যে মাত্র একজনই তার উত্তরাধিকারী হতো। বলা হয়েছে, রাজপুতদের মধ্যে সাধারণত বড় ছেলেই বাবার জায়গা নেবে —এই নিয়ম মানা হতো। কিন্তু রাঠোরদের বেলায়, যে-স্ত্রী তার স্বামীর সবচেয়ে অনুরাগের পাত্রী হতেন, তাঁর ছেলেই হতো উত্তরাধিকারী (লাহোরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৮)।

৭. রাজা ইন্দর সিংহের তরফে আওরঙ্গজেবের কাছে পাঠানো একটি আবেদনপত্রে এই নীতি উল্লেখ করা হয়েছে: "'ওয়তন'-এর অধিকারীর মৃত্যুর পর 'মনসব' দেওয়া হয় (তাঁর উত্তরাধিকারীদের), তাদের 'ওয়তন'-এর উপর ধার্য রাজস্ব ('দাম-হা') অনুযায়ী।" তাঁর নিজের 'ওয়তন'-এর 'জমা'র অঙ্ক থেকে দেখা যায়, সেটি তাঁর বেতনের চেয়ে ৪০ লক্ষ টাকা বেশি। তিনি অনুরোধ করেছেন, হয় এই ঘাটতি পূরণের জন্য তাঁর পদমর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হোক, বা ঐ অঙ্কটি কমিয়ে দেওয়া হোক (যাতে এর কোন অংশ জাগীর হিসেবে অন্য কাউকে না দেওয়া যায়)। তাঁর মনসব বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ('ডকুমেন্টস অফ আওরঙ্গজেবস্ রেন', ১২১)। বিহারে পালামৌ-এর জমিনদার পর্তব-এর আনুগত্য স্বীকার এবং বাদশাহী খিদমতে যোগদান সংক্রান্ত বিষয়ে (মোরল্যাণ্ড, 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম' ২৬৭-তে যেমন দেখিয়েছেন) লাহোরীর একটি অনুচ্ছেদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬০-৬১ থেকে এই একই রীতির ভালো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 'ওয়তন' শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত হিসেবে দ্রষ্টব্য: 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ১৯২, ৩৩৬; লাহোরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬১, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ. ৯৫, 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ৬৫ ক, 'রুকাৎ-এ আলমগীর', পৃ. ১৬৭-৮; 'ডকুমেন্টস অফ আওরঙ্গজেবস্ রেন', ৮৪, ১২১।

প্রধানদের কাছ থেকে (যারা সরকারী কাজে যোগ দেয়নি) সাধারণত বাঁধা হারে একটা বার্ষিক নজরানা বা 'পেশকশ' দাবি করা হতো। একেই ধরা হতো আনুগত্যের চিহ্ন তথা সার ভাগ।[৮] বহু প্রধানের অঞ্চলেও বিভিন্ন পরিমাণের 'জমা' ধার্য করা হতো। যাকে সেখানকার জাগীর বরাত করা হয়েছে তার কাছে (অথবা 'খালিসা'য় বরাত হয়ে থাকলে, বাদশাহী কোষাগারে)[৯] ফি-বছর সেই 'জমা' দাখিল করতে হতো। সুতরাং এটি ছিল 'পেশকশ' থেকে আলাদা ('পেশকশ' দাখিল হতো কেবলমাত্র বাদশাহী কোষাগারে)। আর, আমরা যতদূর জানি এ অঞ্চলে 'জমা' কখনই জাগীরে বরাত হতো না। অবশ্য এও সম্ভব যে প্রধানকে দুই-ই দিতে হতো : 'জমা' হিসেবে একটা পরিমাণ আর 'পেশকশ' হিসেবে আরও কিছু।[১০]

প্রধানদের কাছ থেকে একবার সামরিক কাজকর্ম বা টাকাকড়ি আদায় করতে পারলে বাদশাহী সরকার তাদের আর কিছুই বলত না। অভ্যন্তরীণ ব্যাপার তারা নিজেদের ইচ্ছামতো চালাতে পারত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন প্রধানের প্রজারা বাদশাহী দরবারে নালিশ জানিয়েছে—এমন কোন প্রমাণ নেই। নিজেদের এলাকার মধ্যে বাণিজ্যের ওপর তারা স্ব-নির্ধারিত হারে মাশুল ও উপকর আদায় করতে পারত।[১১] তাদের রাজস্ব প্রশাসন পদ্ধতি বাদশাহী সরকারের নির্দিষ্ট নিয়ম-

৮. উদাহরণত দ্রষ্টব্য 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৩ (কুমায়ুন), লাহোরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬০ (পালামৌ); 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ৪২ ক, 'রুকাৎ-এ আলমগীর', পৃ. ১০৯ (দেওঘর); মামুরি, পৃ. ১৭৯ ক, খাফী খান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৭, 'দিলকুশা', পৃ. ১৩৯ খ; 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫ ইত্যাদি।

৯. ইন্দুর-এর শাসক চনানেরী দেশমুখের উপর নির্ধারিত 'জমা'র বিস্তারিত বিবরণ (বিভিন্ন বছরে জাগীরদারদের ও খালিসায় যা দিতে হয়েছিল) দ্রষ্টব্য ('আদাব-এ আলমগীরী' পৃ. ১৬১ খ-১৬২ খ)। আজমগড়ের রাজাদের সম্পর্কে ১৯ শতকে লেখা একটি কৌতূহলজনক ইতিহাসে বলা হয়েছে : রাজা হরবংশ সিংহ আকবরের কাছ থেকে এক ফরমান পেয়েছিলেন, যার বলে নিজামাবাদ পরগনা ও দৌলতাবাদ টপ্পা তাঁর জমিনদারী হিসেবে মঞ্জুর হয়। বাঁধা 'জমা' ছিল ৬০,০০০ টাকা। প্রথমে তিনি এই টাকা দাখিল করতেন খান-এ খানান (আব্দুর রহিম)-এর কাছে, যিনি ছিলেন এই এলাকার জাগীরদার। পরে যার ওপরেই এই অঞ্চলের জাগীর বরাত হয়ে থাকুক, তিনি ও তাঁর বংশধররা তাঁকেই ঐ পরিমাণ টাকা দিয়ে চলতেন। (Edinburgh 238, পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়া নেই)।

১০. আকবরের রাজত্বের ১৮-তম বছরে নগরকোট-এর রাজার সঙ্গে এই শর্তে রফা হয়েছিল : "......দ্বিতীয়ত, তিনি যথাযোগ্য 'পেশকশ' দেবেন ; ......চতুর্থত, এই এলাকাটি যেহেতু রাজা বীরবরকে জাগীর হিসেবে দেওয়া আছে, তিনি [নগরকোট এর রাজা] তাঁকে একটা বড় অঙ্কের টাকা দিতে বাধ্য থাকবেন......" ('আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, ৩৬-৩৭)। ইন্দুর-এর চনানেরীর উপর ধার্য 'জমা' যখন প্রচুর বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তিনি বলেন বর্ধিত পরিমাপটি তাঁকে 'পেশকশ' হিসেবে দিতে অনুমতি দেওয়া হোক, 'জমা'র অংশ হিসেবে নয় ('আদাব-এ আলমগীরী', ঐ)।

১১. বগলানার জন্য 'ফ্যাক্টরিস, ১৬২৪-২৯', পৃ. ১৭৬ ; হাণ্ডিয়া (মালব)-র জন্য মান্ডি, ৫ ; আজমীর প্রদেশের জন্য ঐ, ২৬০, 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৪৬-৫০', পৃ. ১৯৩ এবং তাভার্নিয়ে, পৃ. ১৩১ এবং জয়সলমীর-এর জন্য 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৩৭-৪১', পৃ. ১৩৮ দ্রষ্টব্য।

কানুন মেনে চলত না। সামান্য কটি ব্যতিক্রম বাদে (পরে দ্রষ্টব্য) প্রধানদের অঞ্চলের রাজস্ব হার বা জরিপ-করা এলাকার পরিসংখ্যান 'আইন'-এ দেওয়া নেই। আমাদের তথ্যপ্রমাণে অবশ্য এ বিষয়ে আরও সুস্পষ্ট দুটি নজির আছে। কুচবিহারের সিংহাসনচ্যুত শাসকের সমর্থনে একটি গণ-অভ্যুত্থান প্রসঙ্গে তাঁরা বলেছেন যে শাসক হিসেবে জমিনদারদের রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি ছিল বাদশাহী সরকারের তুলনায় সাধারণত অনেক নমনীয়।[১২]

কিছু কিছু রাজপুত রাজ্যের ক্ষেত্রে, মনে হয়, মুঘল প্রশাসনের সাধারণ ধাঁচটির যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। যেমন, যোধপুর রাজ্যে জাগীরদারী জাতীয় একটা ব্যবস্থা ছিল। তাঁর নিজস্ব কোষাগারের জন্য রাজা প্রতি পরগনার কয়েকটি করে গ্রাম নিজের দখলে রাখতেন; বাকি সব গ্রাম, বেতনের বিনিময়ে, জাগীরের সমতুল্য 'পাট্টা' হিসেবে তাঁর কর্মচারীদের বরাত করে দিতেন।[১৩] টড-এর বিবরণ থেকেও মনে হয় মেবারে ঐ একই ধরনের একটা ব্যবস্থা চালু ছিল।[১৪] এমন কি 'আইন' থেকেও মনে হয় যে, কোন কোন রাজপুত রাজ্যে, বিশেষ করে করে অম্বর এবং যোধপুরে রাজস্ব নির্ধারণের জন্য বাদশাহী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত 'জব্‌ৎ' পদ্ধতি অনুকরণের একটা চেষ্টা হয়েছিল।[১৫] কিন্তু এই রাজ্যগুলি যদি মুঘল ব্যবস্থাই অনুকরণ করে থাকে, তবে সে কাজ তারা করেছিল নিজের ইচ্ছায়। আর কখনোই শতকরা একশ ভাগ অনুকরণ হয়নি। যেমন, যোধপুরে কোন 'কানুনগো' ছিল না, অথচ জাগীরদারী ব্যবস্থা চালু রাখার পক্ষে এই বিশেষ কর্মচারীর ভূমিকা অপরিহার্য।[১৬] এখানে 'জব্‌ৎ' ব্যবস্থাও চাপানো হয়নি, কারণ নগদে রাজস্ব-হার স্থির করা হলেও, মনে হয়, এখানে জরিপের কাজ হয়নি, এবং 'আইন'-এও এই অঞ্চলের এলাকা-পরিসংখ্যান দেওয়া নেই।[১৭] শেষ কথা এই যে, যতই হোক, এই রাজ্যগুলি ছিল ব্যতিক্রম, এবং এমন মনে করার কোন কারণ নেই যে প্রধানরা সাধারণভাবে তাদের দৃষ্টান্তই অনুসরণ করত।

১২. 'ফথিয়া-এ ইব্রিয়া', পৃ. ৪৭ খ-৪৮ ক, কলকাতা সংস্করণ, ১২৬৫ হিজরী, পৃ ৯০; 'আলমগীরনামা', পৃ. ৭৮১-২।

১৩. 'ওয়াকাই-এ আজমীর', পৃ. ৮২, ১১৪-এ রাজা যশবন্ত সিংহ জাগীর বা পাট্টা দিচ্ছেন—এমন উল্লেখ আছে। আরও দ্রষ্টব্য 'মিরাৎ-এ আহ্‌মদী', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৫-এ। ১৬৯০-৯১-এ মারোয়াড়ে মুঘল অধিকারের এক পর্বে শুজাঅত খান ভেবেছিলেন "বেশির ভাগ রাজপুত এবং পাট্টাওয়াৎকে, তাদের পূর্বপুরুষের পুরনো রীতি অনুযায়ী, জাগীরের বদলে 'পাট্টা' দেওয়াই" বিচক্ষণতার কাজ হবে।

১৪. টড, 'অ্যানালস অ্যাণ্ড অ্যাণ্টিক্যুইটিস অফ রাজস্থান', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৩ এবং টীকা।

১৫. 'আইন'-এ অম্বর ও যোধপুর দু জায়গাতেই 'জব্‌ৎ'-এর অধীনে 'দস্তুর' বা নগদ রাজস্ব-হার দেওয়া আছে। কিন্তু 'আইন'-এর পরিসংখ্যান সারণিতে অম্বরের ক্ষেত্রে জরিপ-করা এলাকার পরিসংখ্যান দেওয়া থাকলেও যোধপুরের বেলায় সেগুলি বাদ পড়েছে।

১৬. 'ওয়াকাই-এ আজমীর', ১৬৩, ১৭১।

১৭. ১৫নং টীকা দ্রষ্টব্য।

'আইন'-এ প্রায়ই বিভিন্ন প্রদেশের বিবরণে বড় জমিনদার বা 'বূমী'দের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। অন্য সূত্র থেকে আরও কিছু তথ্য এর সঙ্গে যোগ করা যায়। কিন্তু, এমন ইঙ্গিতও করা হয়েছে যে,[১৮] 'আইন'-এর নিজস্ব পরিসংখ্যান থেকেই বিভিন্ন 'মহাল'-এ ঐ ধরনের প্রধানদের উপস্থিতি সন্ধান করার উপায় পাওয়া যেতে পারে। রাজস্ব যেখানে পূর্ণসংখ্যায় দেওয়া আছে, সেখানে এই সম্ভাবনাই প্রবল যে 'জমা' চাষীদের ওপর ধার্য করা হয় নি, করা হয়েছে কোন মধ্যব্যক্তির ওপর।[১৯] তাছাড়া যেখানে জরিপ-করা এলাকা এবং 'সুয়ূরগাল' অঙ্ক-গুলি দেওয়া নেই, সেখানে প্রায় নিশ্চিতই ধরে নেওয়া যায় যে 'মহাল'টি কোন করদ প্রধানের অঞ্চলের অংশবিশেষ।

এই সূত্র ধরে আমাদের সমীক্ষার ফলাফল এখানে বিস্তারিতভাবে দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু মূল সিদ্ধান্তগুলি বলা যেতে পারে। লাহোর থেকে বিহার অবধি 'জব্‌তী' প্রদেশগুলির বিরাট এলাকায় (প্রান্তীয় দিক বাদে) ঐ ধরনের প্রধানদের বিশেষ কোন চিহ্ন নেই। জম্মু থেকে কুমায়ুন পর্যন্ত পর্বতমালা বরাবর ছড়িয়ে ছিল একসারি ছোট রাজ্য।[২০] তারপরেও এরকম রাজ্য ছিল আরও পূর্বদিকে, তরাই-এর এখানে-ওখানে।[২১] মুলতান প্রদেশে চন্দ্রভাগার পশ্চিমে ছিল বালুচ সর্দাররা।[২২] সমভূমির দক্ষিণপ্রান্তে, হরিয়ানার অংশবিশেষ ছিল রাজপুত প্রধানদের আওতায়।[২৩] একইভাবে আগ্রা, দিল্লী, এলাহাবাদ এবং বিহার প্রদেশের দক্ষিণ অংশ যেখানে বিন্ধ্য থেকে বেরোনো ছোট পাহাড়গুলিকে ছুঁয়েছে—সেগুলিও ছিল বাদশাহী প্রশাসনের আওতার বাইরে।[২৪] সুতরাং ব্যতিক্রমগুলি বাদ দিয়ে সাধারণভাবে বলতে গেলে,[২৫] পেলসার্ট

১৮. 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', ২৬৮-৯।

১৯. লক্ষণীয় এই যে, সুস্পষ্টভাবে প্রধানদের শাসনাধীন বলে ঘোষিত বহু 'মহাল'-এর 'জমা' পূর্ণসংখ্যায় দেওয়া নেই। হয়তো ছোটখাট হিসাব মেলানোর জন্য এরকম হয়েছিল, যার সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা নেই।

২০. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৩, ৫৮৮ দ্রষ্টব্য। 'আইন'-এ কুমায়ুন 'সরকার' দিল্লী প্রদেশের অন্তর্গত। এই 'সরকার'-এর ক্ষেত্রে শুধু 'জমা'র অঙ্ক দেওয়া আছে; সবগুলিই পূর্ণসংখ্যায় এবং নেহাৎই নামমাত্র। আরও তুলনীয় মাসুচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৮।

২১. সম্ভল 'সরকার' এবং কান্ত ও গোলা 'মহাল' শক্তিশালী ও অবাধ্য জমিনদারদের জন্য বিশেষভাবে কুখ্যাত ছিল (আব্বাস খান, পৃ. ১০৭ খ-১০৮ ক; সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ১৮৩ খ, Or. 1671, পৃ. ৯০ ক)। কিন্তু 'আইন'-এ এই এলাকার সব পরিসংখ্যানই পুরো দেওয়া আছে। খুব সম্ভবত মুঘল কর্তৃপক্ষ স্থানীয় জমিনদারদের সামন্ত-প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দিতেন না। গোরখপুর 'সরকার'-এর কয়েকটি 'মহাল', মনে হয়, করদ প্রধানদের অধীনে ছিল।

২২. সুজান রায়, ৬৩; মাসুচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৬।

২৩. হিসার 'সরকার'-এর কিছু 'মহাল'-এর পরিসংখ্যানের বৈশিষ্ট্য থেকে মনে হয়, সেগুলি এই শ্রেণীভুক্ত ছিল।

২৪. 'আইন'-এ ওরছা-র বুন্দেলা রাজ্যকে গণ্য করা হয়নি। বাধ ঘোরা 'সরকার' আসলে নিজ

ও মানুচির সঙ্গে একমত হওয়া যায় যে, মূল হিন্দুস্তানে সাধারণত 'রাজা' এবং রাজন্য জমিনদারদের শাসিত ভূখণ্ড পাওয়া যেত শুধু পাহাড় ও জঙ্গলের পেছনে।[২৬]

'আইন'-এ বাংলার পরিসংখ্যান এমন ভাবে দেওয়া নেই যার থেকে সাধারণ জমিনদার আর আসল রাজন্য বা ছোট রাজাদের অধীনস্থ 'মহাল'গুলোর মধ্যে তফাৎ করা যায়। কিন্তু, আমরা জানি, এই প্রদেশের বিরাট অংশ জুড়ে ছিল ছোট ছোট রাজ্য।[২৭] উত্তরে ছিল কুচবিহার,[২৮] পূর্বে কামরূপ ও আসাম,[২৯] ব-দ্বীপ অংশে দুটি ছোট রাজ্য[৩০], এবং আরও এগিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ছিল জলদস্যু-অধ্যুষিত আরাকান রাজ্য।[৩১] 'আইন'-এর 'মহাল'-তালিকা থেকে এও পরিষ্কার বোঝা যায় যে

অধিকারবলেই একটি রাজ্য ছিল (তুলনীয় শরণ, 'প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেণ্ট' ইত্যাদি, পৃ. ১২৩-৪)। বিহার এবং রোহ্‌টাস এর কয়েকটি 'মহাল'-এর সম্বন্ধে যা লেখা আছে তার থেকে দেখা যায় সমভূমির দক্ষিণে গোটা এলাকা জুড়ে প্রধানরাই ছিল শাসক (তুলনীয়, বীমস্, *JASB*, খণ্ড ৫৪ (১৮৮৫), পৃ. ১৬৮, ১৮১)। শুধু রোহ্‌টাসের জন্য দ্রষ্টব্য মাণ্ডি ১৬৭, পালামৌর জন্য লাহোরী, ২য় খণ্ড, ৩৬০-৬১। বাংলায় ঢোকার সঙ্কীর্ণ রাস্তা জুড়ে ছিল মুঙ্গের 'সরকার', রাজমহল পর্বতমালা থেকে হিমালয়ের পাদদেশ অবধি বিস্তৃত। সংক্ষিপ্ত রাজস্ব-নির্ধারিত 'মহাল'-এর সংখ্যা এখানে আনুপাতিকভাবে খুব বেশি ছিল।

২৫. এও সম্ভব যে কোন 'মহাল'-এ হয়তো এলাকা ও 'সুয়ুরগাল'-দুএরই অঙ্ক দেওয়া আছে, কিন্তু তারই একটা অংশ হয়তো কোন ছোট রাজার শাসনাধীন; তিনি বাঁধা হারে নজরানা দেন। ইতিমধ্যেই উল্লিখিত একটি কিংবদন্তী অনুযায়ী (সত্যতায় সন্দেহ করার কোন কারণ নেই) রাজা হরবংশ সিংহকে নিজামাবাদ পরগনা এবং দৌলতাবাদ 'টপ্পা' (জৌনপুর সরকার-এ) ৬০,০০০ টাকা 'জমা'র বিনিময়ে মঞ্জুর করা হয়েছিল (Edinburgh 238)। তিনি ছিলেন গৌতমী রাজপুত। 'আইন'-এর 'জমিনদারী' স্তম্ভে গৌতমীদের দেখানো আছে নিজামাবাদের পাশে। কিন্তু জমিনদার হিসেবে ব্রাহ্মণ এবং 'রহমতুল্লা'দেরও নাম রয়েছে। 'মহাল'-এর 'জমা' যা দেওয়া আছে তা ('দাম'কে টাকায় পরিণত করে) ১,৫০,৫১৫ টাকার কম নয়। সুতরাং, হরবংশ 'মহাল' এর একটা ছোট অংশই শাসন করে থাকতে পারেন।

২৬. পেলসার্ট, ৫৮-৫৯; মানুচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৪।

২৭. তুলনীয় রায়চৌধুরী, 'বেঙ্গল আণ্ডার আকবর অ্যাণ্ড জাহাঙ্গীর', পৃ. ১৭-২৪।

২৮. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৭। ১৬৬১ সালে এটি সাম্রাজ্যের আওতায় আনা হয়েছিল।

২৯. ঐ। মীর জুমলার অভিযানের ফলে কামরূপও সাম্রাজ্যের আওতায় এসেছিল।

৩০. ঐ; ফিচ্: রাইলি, ১১৮, 'আর্লি ট্রাভেলস', ২৭-২৮।

৩১. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৮। ফার্সী লেখাপত্রে আরাকানের নাম দেওয়া হয়েছে রাখাং। চাটগাওঁ (চট্টগ্রাম) ছিল এর প্রধান বন্দর। 'আইন'-এর পরিসংখ্যান সারণিতে চাটগাওঁ 'সরকার' আছে, যেন এটি নিয়মিত বাদশাহী প্রশাসনের অধীনেই ছিল। 'ফথিয়া-এ ইব্রিয়া'র একটি অনুচ্ছেদ থেকে অবশ্য এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় (পৃ. ১৬৪ ক)। সেখানে বলা হয়েছে, বাংলার সুলতানরা একবার এই ভূখণ্ড জয় করেছিলেন, সেই থেকে 'কানুনগোই'-এর তালিকায় এর রাজস্বের অঙ্ক দেখানো হচ্ছে। এখানকার 'মহাল'গুলির পারিভাষিক নাম ছিল

ওড়িশায় বাদশাহী অঞ্চল ছিল শুধুমাত্র উপকূল বরাবর একফালি সরু জায়গায় আর মহানদী ব-দ্বীপের একটা অংশে।[৩২]

আজমীর প্রদেশের কয়েকটি 'মহাল' ছিল বাদশাহী প্রশাসনের অধীনে কিন্তু এর বেশির ভাগ অংশেই ছিল বড় রাজপুত রাজাদের রাজ্য।[৩৩] মালবের মন্দসুর ও গুজরাটের সোরাট (কাথিয়াবাড়) 'সরকার'-এও অনেক করদ রাজ্য ছিল। গুজরাটের বাদশাহী অঞ্চল ঘিরে ছিল একসারি রাজ্য যাদের শেষ দক্ষিণে বগলানা রাজ্যে।[৩৪]

শেষত, মধ্যভারতে ছিল এই ধরনের রাজ্যের এক বিরাট সমাবেশ। তার কেন্দ্র ছিল জব্বলপুরের কাছে, আর বিস্তৃতি ছিল গড় থেকে তেলিঙ্গানার ইন্দুর পর্যন্ত।[৩৫] কিন্তু শাহ্‌জাহানের আমলের প্রাপ্ত নথিপত্র থেকে[৩৬] যতদূর বিচার করা যায়, তাতে মনে হয় পশ্চিম বেরার, খান্দেশ ও আওরঙ্গাবাদ প্রদেশগুলিতে কোন বড় বা উল্লেখ-যোগ্য করদ রাজ্য ছিল না।

এই রূপরেখা থেকে বোঝা যায় সাধারণত সবচেয়ে ধনী এবং জনবহুল এলাকাই বাদশাহী প্রশাসনের আওতায় থাকলেও, প্রধান এবং ছোটখাট রাজাদের শাসিত অঞ্চলের বিস্তারও কোন অংশেই নগণ্য ছিল না। এসব অঞ্চলে তাদের রাজত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করেছিল ভৌগোলিক বাধা, যেমন পাহাড়, জঙ্গল, নদী ও মরুভূমি। এই 'রাষ্ট্র'গুলির অস্তিত্ব থেকে বোঝা যায়, মুঘল সাম্রাজ্যের বিশাল শক্তি ও কেন্দ্রীভূত প্রশাসন সত্ত্বেও, তার সীমানার মধ্যে তখনও দু ধরনের শাসকশ্রেণী বহাল ছিল; আর ছিল অগুনতি জমিনদার, সরকার যাদের নামিয়ে এনেছিল খিদমতদার-এর পর্যায়ে। এই রাজ্যগুলির দিকে তাকিয়ে তারা হয়তো তখনও নিজেদের অতীত কথা স্মরণ করতে পারত, আর ভবিষ্যতের জন্য লালন করতে পারত রাজনৈতিক উচ্চাশা।

'পাইবাকী-এ গৈর আমালী' অর্থাৎ জাগীর বহির্ভূত অ-রাজস্বপ্রদায়ী অঞ্চল। অবশেষে ১৬৬৬ সালে চাটগাওঁ জয় করেছিলেন শায়েস্তা খান।

৩২. 'আইন-এ' কলিঙ্গ দণ্ডপত ও রাজমহীন্দ্র 'সরকার'-এর 'মহাল'ওয়ারি পরিসংখ্যান দেওয়া নেই। মনে হয়, শুধু কাগজে-কলমেই এই 'সরকার' দুটিকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করা হতো। অন্য তিনটি 'সরকার'—জলেশর, ভদ্রক ও কটকের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময়েই 'জমা'র ঘরে আছে পূর্ণসংখ্যা আর বারবারই দুর্গের উল্লেখ আছে। তুলনীয় মাসুচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৭। আরও দ্রষ্টব্য শরণ, 'প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেণ্ট', পৃ. ১৫২-৩।

৩৩. তুলনীয় শরণ, ঐ, পৃ. ১২৬-১৪৭।

৩৪. 'আইন', ১ম খণ্ড, ৪৮৬-৯৩; 'মিরাৎ', পরিশিষ্ট, পৃ. ১৮৮ ইত্যাদি, বিশেষত পৃ. ২১১-২২১ এবং ২২৪-২৩৬। কচ্ছও ছিল আলাদা রাজ্য। মুঘল সাম্রাজ্যের আওতায় বগলানা আসে ১৬৩৮-এ।

৩৫. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৭-৮২।

৩৬. কালপঞ্জিগুলি ছাড়াও যেসব তথ্যসূত্রের কথা এ ক্ষেত্রে আমার বিশেষ করে মনে ছিল, তা হলো 'আদাব-এ আলমগীরী' এবং 'সিলেক্টেড ডকুমেণ্টস অফ শাহ্‌জাহানস্ রেন'।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভূমিরাজস্ব

১. ভূমিরাজস্ব দাবির পরিমাণ

চাষীদের জীবনেব অবস্থা যে সাধারণত জীবনধারণের ন্যূনতম স্তরের কাছাকাছি থাকত সে বিষয়ে আমরা আগের একটি অধ্যাযে আলোচনা কবেছি। মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য এই যে উদ্‌বৃত্ত উৎপন্নের (অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত উৎপাদন) সঙ্গে কৃষকের কোন যোগ থাকত না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেই উদ্‌বৃত্ত রাষ্ট্রেব তরফে আদায় করা ভূমিরাজস্ব ('মাল')-এর রূপ নিত।[১] গেলেইনসেন বলেছেন যে চড়া মাত্রায় রাজস্ব দাবির কারণে "জীবনধারণের জন্য যতটুকু দরকার চাষীরা তার চেয়ে বাড়তি আয় করতে পারত না।" তিনি আরও বলেছেন, চাষীর জন্য এত অল্পই পড়ে থাকে যে "তাদের ভাগের অংশ জোটাবার আগেই সাধারণত তা খাওয়া হয়ে যায়।"[২] ভূমিরাজস্ব বরাত সম্বন্ধে পেলসার্ট জানিয়েছেন, "চাষীদের কাছ থেকে এত বেশি নিংড়ে নেওয়া হয় যে তাদের পেট ভরানোর জন্য এমনকি শুকনো রুটিও পড়ে থাকে না।"[৩] এ কথা ঠিক যে ভূমিরাজস্বের সঙ্গে উদ্‌বৃত্ত উৎপন্নকে এক করে দেখাটা প্রশাসনিক নথিপত্রে ব্যক্ত সরকারী নীতির অঙ্গ নয়। আবুল ফজলকে এসব ব্যাপারে সরকাবী দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে প্রামাণ্য ব্যাখ্যাকার বলে ধবা যায়। তিনি কিন্তু খোলাখুলিই বলেছেন যে, শাসকের কাছে প্রজার আর্থিক দায়ের কোনো নীতিগত সীমা ঠিক করা যায় না : তার জান ও মানের রক্ষক যদি তাকে সম্পত্তি ছেড়ে দিতেও বাধ্য করে, তবুও প্রজার উচিত [তার কাছে] কৃতজ্ঞ থাকা।[৪] ধার্য রাজস্ব যে সচরাচর উদ্‌বৃত্ত উৎপাদন পরিমাণকে ছাড়িয়ে যেত না, তার কারণ ঐ ধরনের ব্যবস্থা নিলে রাজস্বদাতারাই পুরোপুরি নির্মূল হয়ে যেত। ফলে মোট রাজস্বেব পরিমাণ বাড়ত না, ববং কমত, আর তার উদ্দেশ্যই যেত ব্যর্থ হয়ে।[৫]

১. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৪।

২. গেলেইনসেন, অনু. মোরল্যাণ্ড, *JIH*, খণ্ড ৪, পৃ. ৭৮-৯। এই বক্তব্য বিশেষ করে গুজরাট প্রসঙ্গে।

৩. *পেলসার্ট*, ৫৪।

৪. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ ২৯১। যদিও তিনি যোগ করেছেন যে "ন্যায়পরায়ণ সম্রাটরা" প্রয়োজনের অতিরিক্ত আদায় করেন না। তার পরিমাণ অবশ্য তাঁরা নিজেরাই ঠিক করবেন।

৫. কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময়ে ব্যাপক প্রাণহানি (দ্র. তৃতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় অংশ) থেকে আভাস পাওয়া যায় যে চাষীর বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় উৎপন্নের অংশ সম্বন্ধে সমসাময়িক ধারণায় শুধুমাত্র স্বাভাবিক সময়কেই হিসেবে ধরা হতো, দুর্ভিক্ষের সময়ে চাষী ও তার পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সঞ্চয় (চাষীর কাছে জমানো শস্যের মজুত রূপে) বাবদে কিছুই ধরা হতো না।

মুঘল ভারতে উদ্‌বৃত্ত উৎপাদনের গড় হার কী ছিল (মোট উৎপাদনের নিরিখে) তা জানার কোন উপায় নেই। জমির উৎপাদন ক্ষমতার তারতম্য এবং যে-জলহাওয়া ও সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী জীবনধারণের ন্যূনতম মাত্রা স্থির হয় তার পার্থক্যের দরুন এক-এক অঞ্চলে এই হার এক-এক রকম হতো।[৬] কৃষকের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নষ্ট না করে, তার উৎপাদনের কতটা অংশ নেওয়া যেতে পারে, নিশ্চয়ই প্রত্যেক এলাকায় সকলেরই তা জানা ছিল। ভূমিরাজস্ব সাধারণত উদ্‌বৃত্ত উৎপাদনের বেশি হতো না—আমাদের এই ধারণা যদি ঠিক হয়, তবে এই রাজস্বের হার নিশ্চয়ই এমনভাবে স্থির করা হতো যাতে সেটি এইসব প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় হারের কাছাকাছি বা তার তলায় থাকে। আমাদের সূত্রগুলিতে অসংখ্য বক্তব্য পাওয়া যায়, যাতে মোট উৎপাদনের অংশবিশেষ বলে ভূমিরাজস্বের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এইসব বক্তব্যের মূল্য অপরিসীম, কেননা এর থেকেই বিচার করা যায়, উৎপাদনের কতটা অংশ চাষীকে ছেড়ে দিতে হতো যার বিনিময়ে সে কোন কিছুই পেত না। অবশ্য এই তথ্য-প্রমাণে সবকিছু সোজাসুজি বলা নেই। বিশেষত যেখানে ভূমিরাজস্ব-দাবির পরিমাণ এবং প্রকৃত ফসল উৎপাদনের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না (যেমন 'জব্‌ৎ' ব্যবস্থায়)—সেই সংক্রান্ত নজিরে তো নেই-ই। রাজস্ব-নির্ধারণ ও আদায়ের বিভিন্ন ব্যবস্থা বিষয়ক সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য পরের দুটি অংশে এই সমস্ত বিষয়ে অনুসন্ধানলব্ধ সিদ্ধান্ত নীচের অনুচ্ছেদগুলিকে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা হয়েছে।

আবুল ফজল বলেছেন যে, শের শাহ্‌ তিন রকমের শস্য হার বেঁধে দিয়েছিলেন। প্রতি ফসলের জন্য প্রাপ্য রাজস্ব হিসেবে এই হারগুলির গড়ের একের-তিন ভাগ স্থির করার নীতি তখনই গ্রহণ করা হয়।[৭] এই পদ্ধতি 'জব্‌ৎ' নির্ধারণ ব্যবস্থার একটি

৬. কর্ণাটকের জমির প্রচুর উর্বরতার বিপরীতে সেখানকার জীবনধারণের নীচু মান প্রসঙ্গে ভীমসেনের মন্তব্য মনে রাখা কৌতূহলজনক। এর ফলেই, সেখানে তিনি যে সব চমৎকার মন্দির দেখেছিলেন রাজাদের পক্ষে সেগুলি গড়ে তোলার মতো প্রচুর সম্পদ সঞ্চয় করা সম্ভব হয়েছিল ('দিলকুশা', পৃ. ১১২ খ-১১৩ খ)।

৭. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৭-৩০০। এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় মোরল্যাণ্ড দেখিয়েছেন, এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে রাজস্ব-দাবির একের-তিন ভাগ অনুপাতটি আকবর পেয়েছিলেন শের শাহ্‌র প্রশাসন থেকে (*JRAS*, ১৯২৬, পৃ. ৪৫২-৪)। কিন্তু কারও কারও কাছে বোধহয় ঐ 'বিধর্মী'কে খাটো করে দেখার প্রলোভন খুব বেশি। ডঃ আই. এইচ. কুরেশী আবিষ্কার করেছেন যে আকবর রাজস্ব-দাবি বাড়িয়ে উৎপন্নের একের-চার ভাগ থেকে একের-তিন ভাগ করেছিলেন ('অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দ্য সুলতানেট অফ দিল্লী', ২য় সং, পৃ. ১১৮-১৯)। ১নং প্রমাণ: "আকবরের পূর্বপুরুষ তৈমুর তাঁর রাজত্বের কিছু কিছু অংশে (মাত্র কিছু অংশে!) উৎপন্নের একের-তিন ভাগ আদায় করতেন"। সত্যিই উত্তরাধিকারী-সূত্রে প্রাপ্ত লক্ষণ। ২নং প্রমাণ: "বাবুর একশ-র জায়গায় একশ তিরিশ (কিসের?) দাবি করেছিলেন"। বেশ রহস্যজনকভাবে (কেমন' গণিতটি পরিষ্কার নয়) "এর ফলে দাবি বেড়ে হবে মোটামুটি একের-চার ভাগ।" কিন্তু রাজস্ব-দাবি বা উৎপন্নের সঙ্গে উদ্ধৃত অংশটির

অঙ্গ। তাই কেবলমাত্র 'হিন্দুস্তান'-এর প্রদেশগুলিতে, অর্থাৎ লাহোর থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত অঞ্চলে এর প্রয়োগ করা যেত। মনে হয়, গোড়ার দিকে ইচ্ছেমতো বিভিন্ন শস্য হার ঠিক করা হতো। পরে অবশ্য তা আরও বাস্তবসম্মত হয়ে ওঠে, এলাকা অনুযায়ী তার হেরফেরও হয়, শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক এলাকার জন্য পৃথকভাবে গড় উৎপাদনের হিসেবে এই সব হার ঠিক করা হয়।[৮] কিন্তু রাজস্ব বেঁধে দেওয়া হয় টাকায়, জিনিসে নয়। যে-দর বা বাজার-দরের ভিত্তিতে রাজস্ব দাবিকে টাকায় পরিণত করা হতো, তা যে ফসল তোলার সময় (যখন বাজারে যোগান প্রচুর) যে-দামে চাষীরা শস্য বেচত তার সমান—এমন সম্ভাবনা খুবই কম। তাই যদি হয়, তবে প্রকৃত ধার্যের পরিমাণ গড়েও মোট উৎপাদনের একের-তিন ভাগের চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক বেশি হতো।[৯] এও অবশ্য লক্ষণীয় যে, যেহেতু 'জব্‌ৎ' ব্যবস্থায় রাজস্ব-দাবির ভিত্তি ছিল প্রথমে অপরিবর্তিত শস্য-হার ও সবশেষে অপরিবর্তিত নগদ-হার, তাই ফসলের অনিশ্চয়তার প্রায় সব ঝুঁকিই নিতে হতো চাষীকে। তাহলে, স্পষ্টতই, 'জব্‌ৎ' ব্যবস্থায় এই অনুপাত ততটা উঁচুতে বাঁধা হতো না যতোটা হত, ধরা যাক, ভাগচাষের বেলায়, যেখানে চাষী আর রাষ্ট্রের মধ্যে ঝুঁকিটা সমানভাবে ভাগ হয়ে যেত। 'জব্‌তী' প্রদেশগুলিতে ভাগচাষ এবং 'কনকৃত' প্রথা প্রয়োগের সময়েও যে একের-তিন ভাগ অনুপাতই খাটত—আবুল ফজলের লেখায় তেমন কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না।

এইসব প্রদেশের বাইরে, কাশ্মীরে, আকবরের প্রশাসন কাগজে-কলমে রাজস্ব-দাবি

কোন বাস্তব যোগাযোগ নেই। ১৫২৯ সালে বাবুর যখন লোদীদের ধনসম্পদ শেষ করে ফেললেন, তখন সেনাবাহিনীর খরচ মেটানোর জন্য বৃত্তিধারীদের ('ওয়ঝদার') অনুমোদিত ভাতা থেকে শতকরা ৩০ ভাগ কেটে নিতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন ('বাবুরনামা', অনু. বেভারিজ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১৭; হায়দরাবাদ পুঁথি, পৃ ৩৪৫ ক)। শেষত, ৩নং প্রমাণ: "আবুল ফজল এই ব্যবস্থা নেওয়ার যৌক্তিকতা দেখানোর প্রয়োজন মনে করেছিলেন। তিনি বলেছেন যে আকবর জিজিয়া সমেত আরও বহুরকম কর মুকুব করে দিয়েছিলেন…।" তাহলে জিজিয়া তুলে দেওয়াটা আসলে কোন ঔদার্যের ব্যাপার ছিল না। কিন্তু আবুল ফজল যেহেতু কখনও "এই ব্যবস্থা নেওয়া"র (অর্থাৎ রাজস্ব বাড়িয়ে উৎপন্নের একের-তিন ভাগ করার) উল্লেখই করেননি, তিনি এর যৌক্তিকতা দেখবেন কী করে? বলা বাহুল্য তাঁর বইতে এ ধরনের কোন কিছুই নেই।

৮. পরের অংশে আমরা দেখব যে, অর্থকরী ফসলের রাজস্ব হার স্থির করা হতো সাধারণত আরও খেয়ালখুশি-মাফিক।

৯. খাফী খান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬, ঘোষণা করেছেন যে বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল শস্যের ক্ষেত্রে তোডর মল রাজস্ব-দাবি স্থির করেন উৎপন্নের অর্ধেক। কৃত্রিম উপায়ে সেচ করা জমিতে খাদ্যশস্য বোনা হলে তিনি নিতেন একের-তিন ভাগ, আর ঐ জমিতেই অর্থকরী ফসল বোনা হলে আরও কম অনুপাতে। কিন্তু মোরল্যাণ্ড উদ্ধৃত অংশের ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে, এটি স্পষ্টতই দখিনে মুর্শিদ কুলী খানের সংস্কারের ভিত্তিতে তৈরি একটি পরবর্তী কাহিনী ('এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', ২৫৫-৮)।

ঠিক করেছিল উৎপন্নের একের-তিন ভাগ, কিন্তু বাস্তবে তা গিয়ে দাঁড়াত দু-এর তিন ভাগে। আকবর আদেশ দিয়েছিলেন যে অর্ধেকই দাবি করতে হবে।[১০] থাট্টা প্রদেশে একের-তিন ভাগ আদায় হতো ভাগচাষের মারফতে।[১১] কিন্তু ১৬৩৪ সালে লেখা সিন্ধু প্রদেশের প্রশাসন সংক্রান্ত একটি রচনা 'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী' অনুযায়ী, 'আইন' লেখার সময় থাট্টার জাগীর যাদের এখতিয়ারে ছিল সেই তরখানরা "চাষীদের কাছ থেকে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের বেশি নিত না এবং কোন কোন জায়গায় একের-তিন বা একের-চার ভাগও নিত।" এর থেকে মনে হয়, প্রমাণহার সত্যিই ছিল উৎপন্নের অর্ধেক।[১১ক] আজমীর প্রদেশে, মনে হয়, শুধুমাত্র মরু অঞ্চলে,[১২] ফসলের ঠিক একের-সাত বা একের-আট ভাগ নেওয়া হতো।[১৩]

পরবর্তী শতকের ব্যাপারে আমাদের প্রথম সাক্ষ্য হিসাবশাস্ত্র বিষয়ক একটি পুস্তিকা। এটি বোধহয় লেখা হয়েছিল দিল্লী প্রদেশে, শাহ্‌জাহানের রাজত্বের শেষ ভাগে। রাজস্ব নির্ধারণ হিসেবের যে-নমুনা এতে আছে তাতে 'কনকূত' ব্যবস্থায় গম বাদে সমস্ত রবি ফসলের ক্ষেত্রে (যেমন তুলো, বার্লি, ছোলা, সর্ষে বীজ) উৎপন্নের অর্ধেক হারই নেওয়া হয়েছে। গমের বেলায় হার ছিল একের তিন ভাগ। ভাগচাষ ব্যবস্থায় খারিফ-শস্যের (চাল, ডাল, রাই, মোঠ) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হার ছিল সর্বত্রই উৎপন্নের একের-তিন ভাগ।[১৪] রসিকদাসের কাছে আওরঙ্গজেবের ফরমানটি, ধরে নেওয়া যায়, সাম্রাজ্যের মধ্য অঞ্চলের অবস্থার ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক। তার মুখবন্ধে বলা হয়েছে, কর্তৃপক্ষকে যখন ভাগচাষের আশ্রয় নিতে হবে (সাধারণত নিঃস্ব ও পীড়িত চাষীদের ক্ষেত্রে) তখন আদায়ের অনুপাত হবে "অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ কিংবা দুই-পঞ্চমাংশ অথবা তার কম বা বেশি"। আওরঙ্গজেবের আমলের শেষদিকের একটি পুস্তিকায় লাহোরের কাছাকাছি একটি পরগনার নথিপত্র থেকে রাজস্ব নির্ধারণের হিসাব তুলে দেওয়া আছে। তাতে দেখা যায়, সেখানে 'কনকূত' এবং ভাগচাষ— দু-এর ক্ষেত্রেই গম ও বার্লির বেলায় অর্ধেক ভাগই খাটত। পুস্তিকাটিতে শস্য এবং ছোলার 'দস্তুর' (রাজস্ব-হার)-ও দেওয়া আছে।[১৫] ঐ একই রাজস্ব মণ্ডলের জন্য

১০. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭০। আরও তুলনীয় 'তুজুক্-এ জাহাঙ্গীরী', ৩১৫।

১১. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৬।

১১ ক. 'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী', পৃ. ৫১-২। বলা হয়েছে যে, সেহ্‌ওয়ান 'সরকার'-এ বখতিয়ার বেগ (আকবরের আমলে (১৫৯৩-৯৯) এই 'সরকার' যাঁর জাগীরে ছিল) "ফসলের অর্ধেক আদায় করতেন এবং কোন কোন অংশে মাত্র একের-তিন, একের-চার ও দু-এর পাঁচ ভাগও আদায় করতেন" (ঐ, ১০১; আরেকজন জাগীরদারের (ঐ লেখকের বাবা) অনুরূপ ব্যবস্থার জন্য পৃ. ১২১ দ্রষ্টব্য)।

১২. এই প্রদেশের বেশির ভাগ উর্বর অংশই ছিল 'জব্‌ৎ'-এর আওতায়। ঐ জায়গাগুলির জন্য 'আইন'-এ দেওয়া 'দস্তুর' বা রাজস্ব-হারগুলি সাধারণত অন্য যে কোন জায়গার মতোই চড়া।

১৩. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৫।

১৪. 'দস্তুর-আল আমল-এ নভিসিন্দগী', পৃ. ১৮৩ খ-১৮৫ ক।

১৫. 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৫ ক-৭৬ খ, Or. 2026, পৃ. ২৪ খ-২৮ ক। এই পুস্তিকাটির নগদ 'দস্তুর'গুলিতে বিশেষভাবে আস্থা রাখা যায় কারণ এদের সংশ্লিষ্ট গ্রাম ও পরগনার নাম এবং

'আইন'-এ প্রদত্ত 'দস্তুর'গুলির সঙ্গে এর তুলনা করে চলে। দেখা যায় যে, স্থানীয় বিঘা-র[১৬] বিভিন্ন মাপের কথা ধরেও এখানে এই তিন ফসলের জন্য নির্ধারিত হার 'আইন'-এর হারের চেয়ে যথাক্রমে ২.৬, ৩.২ ও ১.৯ গুণ বেশি। কিন্তু মধ্যবর্তী সময়ে সাধারণভাবে কৃষিপণ্যের দাম বেড়েছিল, যেমন, ঐ একই পুস্তিকায় আরেকটি নথিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, লাহোরে গমের দাম বেড়েছিল ২.৯ গুণ।[১৭] তাই রাজস্ব দাবির মাত্রায় বাস্তবিক কোন পরিবর্তন হয় নি বলেই মনে হয়।

'মজহার-এ শাহ্জাহানী'র লেখক বলেছেন, তাঁর আমলে (১৬৩৪) থাট্টার গ্রামাঞ্চলে বহু লোকের বাস হতে পারত, যদি ভাগচাষ ব্যবস্থায় "জাগীরদাররা অর্ধেকের বেশি না নিত"।[১৭ক] সেহ্ওয়ান 'সরকার'-এর কোন কোন অংশের জন্য তিনি আরও কম হারের সুপারিশ করেছিলেন, কিন্তু যেসব জায়গায় চাষীরা বেশ অনুগত এবং পাহাড় থেকে তাদের ওপর আক্রমণ আসে না, সেখানে তিনি অর্ধেক হার মঞ্জুর করেছেন।[১৭খ]

অন্য যেসব এলাকার ক্ষেত্রে অনুরূপ তথ্য পাওয়া যায় তা শুধু গুজরাট আর দখিন। ১৬২৯ সালে লিখতে বসে গেলেইনসেন বলেছেন যে গুজরাটের চাষীকে তার ফসলের তিনের-চার ভাগই দিয়ে দিতে হয়।[১৮] পরবর্তীকালে তাঁকে অনুসরণ করে দুজন লেখক এই কথারই একটু হেরফের করেছেন।[১৯] কিন্তু, আওরঙ্গজেবের রাজত্বের অষ্টম বছরে জারি-করা একটি বাদশাহী আদেশনামায় বলা হয়েছে, জাগীরদাররা খাতায়-কলমে দাবি করে অর্ধেক, কিন্তু কার্যত দাঁড়িয়ে যায় মোট উৎপন্নেরও বেশি।[২০] এর কিছু কাল পরে ফ্রায়ার দেখেছিলেন, সুরাটের কাছে চাষীরা নিজেদের জন্য রাখতে পারে উৎপন্নের মাত্র একের-চার ভাগ।[২১]

নির্দিষ্ট তারিখ দেওয়া আছে (রবি ফলন, আওরঙ্গজেবের আমলের ৪১-তম বছরে)। 'দস্তুর-অাল আমল-এ নভিসিন্দগী'-তে যে সব 'দস্তুর' আছে তাদের সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। সেখানকার নমুনা নির্ধারণপত্রগুলি পুরোপুরি অনুমাননির্ভর, না আছে তারিখ না অঞ্চলের নির্দেশ। সেখানে আখ, তামাক এবং বেগুনের হার দেওয়া আছে আর সে হার নেহাৎই নামমাত্র।

১৬ 'খুলাসতুস সিয়াক'-এ যে বিঘা ব্যবহার করা হয়েছে তা 'বিঘা-এ ইলাহী'-ও নয়, 'বিঘা-এ দফ্তরী'ও নয়। এর ভিত্তি হলো ৪৮ আঙুলের 'দিরা' (পৃ. ৭৫ ক ; Or. 2026, পৃ. ২৪ খ)। সুতরাং. এটি 'বিঘা-এ ইলাহী'র চেয়ে শতকরা ৩৭ ভাগ বড় হওয়ার কথা (দ্র. পরিশিষ্ট 'ক')।

১৭. দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় অংশ দ্রষ্টব্য।

১৭ক. 'মজহার-এ শাহ্জাহানী', পৃ. ৫১।

১৭খ. আরও কম হারের জন্য ঐ সূত্র, পৃ. ২০৪, ২০৭, ২১৪-২১৬, ২১৯, ২২৫, ২২৯, ২৩০ দ্রষ্টব্য ; ফলনের অর্ধেকের জন্য পৃ. ২০৯-১০, ২২০, ২২৩, ২২৭, ২২৯ দ্রষ্টব্য।

১৮. *JIH*, খণ্ড ৪, পৃ. ৭৮-৯।

১৯. "প্রায় তিনের-চার ভাগ" (দ্য লেৎ) ; "অর্ধেক বা কখনও কখনও তিনের-চার ভাগ" (ভান ট্যুইস্ট)। তুলনীয় : মোরল্যাণ্ড, *JIH*, খণ্ড ১৪, পৃ. ৬৪।

২০. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩।

২১. ফ্রায়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০-৩০১।

শাহ্‌জাহানের রাজত্বের শেষদিকে মুর্শিদকুলী খান দখিনে ভাগচাষ ব্যবস্থা চালু করেন। সাধারণ জমি থেকে তিনি নিতেন উৎপন্নের অর্ধেক, কুয়ো সেচের জমি থেকে একের-তিন ভাগ, আর উঁচু মানের ফসলের বেলায় আরও কম (একের-চার ভাগ পর্যন্ত)।[২২]

সর্বত্রই ভূমিরাজস্ব হবে উৎপন্নের অর্ধেক : আওরঙ্গজেবের আমলের রাজস্ব সংক্রান্ত লেখাপত্রের সব জায়গায়—সাধারণ নির্দেশনামায় এবং ক্ষেত্রবিশেষে জারি-করা আদেশেও—ছড়িয়ে আছে এই অনুশাসন। বাস্তবে প্রচলিত ব্যবস্থার এইসব নির্দিষ্ট দৃষ্টান্তের নিরিখেই একে দেখতে হবে। কখনও কখনও বলা হয়েছে, সর্বাধিক অনুমোদনযোগ্য অনুপাত হবে এই অর্ধেকই। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যে-পরিমাণ আদায় করতে হবে এটি তারই সূচক, তার কমও নয়, বেশিও নয়।[২৩] এই অর্ধেক ভাগাভাগির ওপর বারবার জোর দেওয়ার ব্যাপারটা সম্ভবত উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিল 'শরিয়ৎ' (মুসলিম আইন)-এর প্রতি আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধা থেকে। কয়েকটি দলিলে প্রকৃতপক্ষে তা পরিষ্কার বলাও আছে।[২৪] শরিয়ৎ-এর মতে এই হলো 'খরাজ' (ভূমিকর)-এর সর্বোচ্চ সীমা।

এর ফলে আগের অবস্থা থেকে কতটা পরিবর্তন বোঝায় তা বলা শক্ত। গুজরাটের কোন কোন অংশে জমি ছিল খুবই উর্বর। বাদশাহী নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সে সব জায়গার রাজস্ব নতুন করে বেঁধে দেওয়া সর্বোচ্চ পরিমাণকেও ছাড়িয়ে যেত বলে জানা যায়। কাশ্মীর, সিন্ধু এবং দখিন-এ আওরঙ্গজেবের ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই রাজস্ব দেওয়া হতো সাধারণ জমির উৎপন্নের অর্ধেক। সুতরাং এখানে এই নতুন হার হলো প্রচলিত রীতিরই স্বীকৃতি। আসল প্রশ্ন হচ্ছে : এর ফলে মধ্য প্রদেশগুলিতে রাজস্ব-দাবি বেড়েছিল কিনা। মোরল্যাণ্ডের দৃঢ় অভিমত : অবশ্যই বেড়েছিল, উৎপন্নের

২২. বর্তমান অধ্যায়ের তৃতীয় অংশ দ্রষ্টব্য।

২৩. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৫; মুহম্মদ হাসিমকে প্রদত্ত ফরমান, অনুচ্ছেদ ৪, ৬, ৯ ও ১৬; 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ৭৭ খ-৭৮ ক, ১০২ খ, ১১৯ ক, ১২৬ ক-খ, ১২৭ খ-১২৮ ক, ১৮৮ খ, Bodl. পৃ. ৫৬ খ, ৭৮ ক, ৯২ ক, ৯৮ ক-খ, ১৫০ ক, Ed., ৮০, ৯২, ৯৮, ১৪৪-৫; 'দুর-আল উলুম', পৃ. ৪২ খ-৪৩ ক, ৫১ ক, ৫৫ ক; 'খুলসাতুস-উল ইন্‌শা', Or. 1750, পৃ. ১১১ ক-খ; 'দস্তুর-আল আমল-এ আগাহী', পৃ. ২৮ ক; 'আহ্‌কম-এ আলমগীরী', পৃ. ২৪৪ ক-খ; 'খুলসাতুস সিয়াক', পৃ. ৭৩ খ, Or. 2026, পৃ. ২১ খ। আরও দ্রষ্টব্য ওভিংটন, পৃ. ১২০, সাধারণভাবে "ইন্দোস্তান" প্রসঙ্গে।

২৪. 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ ১০২ খ, Bodl. পৃ. ৭৮ ক ও 'খুলাসতুস-উল ইন্‌শা', পূর্বোক্ত সূত্র। মুহম্মদ হাসিমের কাছে আওরঙ্গজেবের ফরমানে (বিশেষ করে এর মুখবন্ধ দ্র.) দেখা যায় যে আওরঙ্গজেব তাঁর রাজস্ব প্রশাসনের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে শরিয়ৎ আইনের আনুষ্ঠানিক সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন। আবুল ফজলও "ইরান ও তুরানে"র প্রসঙ্গে বলেছেন, "প্রাচীনকাল থেকেই তারা (উৎপন্নের) একের-দশ ভাগ নিত, কিন্তু কখনও কখনও সে ভাগ অর্ধেককেও ছাড়িয়ে যেত। নিষ্ঠুর মনোবৃত্তির দরুন তাদের কাছে এটা খারাপ ঠেকত না" ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৩)। এ কথা বলার সময় মুসলিম আইনের এই বিশেষ নিষেধাজ্ঞাটি হয়তো তাঁর মাথায় ছিল।

একের-তিন ভাগ থেকে রাজস্ব গিয়ে দাঁড়ায় অর্ধেকে।[২৫] কিন্তু তিনি ধরেই নিয়েছেন যে আকবরের আমলে 'জব্‌ৎ' ব্যবস্থায় রাজস্বের ফরমাইশ প্রকৃত উৎপন্নের একের-তিন ভাগের বেশি ছিল না। আমরা আগেই দেখেছি যে বাস্তবে অবস্থা ছিল অন্য রকম, আসল হার সম্ভবত একের-তিন ভাগের অনেক বেশিই ছিল। অন্যদিকে এমন কোন প্রমাণ নেই যে আওরঙ্গজেব শস্য হারের অর্ধেকের ভিত্তিতে 'জব্‌ৎ' রাজস্ব হারগুলি নতুন করে নির্ণয় করেছিলেন। শরিয়ৎ-এর বিবেচ্য হলো আসল উৎপন্ন, গড় বা খুশিমতো নির্ধারিত খাতায়-কলমে উৎপন্ন নয়। তাছাড়া একটি ক্ষেত্রে আওরঙ্গজেবের আমলের শেষ ভাগের নগদ হারের সঙ্গে সেই একই অঞ্চলের (লাহোর) 'আইন'-এ উল্লিখিত অনুরূপ হারের তুলনা করা চলে। মধ্যবর্তী সময়ে দাম বেড়েছে বলে ধরে নিলে, কোন প্রকৃত বৃদ্ধি কিন্তু দেখানো যায়নি। আকবরের আমলে 'কনকূত' এবং ভাগচাষের জন্য কী অনুপাত ধার্য হতো তা জানা যায় না। কিন্তু শাহ্‌জাহানের আমলের একটি পুস্তিকায় দেখা যাচ্ছে 'কনকূত' ব্যবস্থার আওতায় গম ছাড়া অন্য শস্যের জন্যই ১ : ২ অনুপাত গ্রহণ করা হয়েছে। ভাগচাষের বেলায় রাষ্ট্রের ভাগ ঐ পুস্তিকায় দেখানো হয়েছে একের-তিন ভাগ, কিন্তু রসিকদাসের কাছে আওরঙ্গজেবের ফরমানেও ভাগচাষের ক্ষেত্রে ঐ একই অনুপাত মেনে নেওয়া হয়েছে। অন্য কথায়, হারবৃদ্ধির ব্যাপারে মোরল্যাণ্ডের কথা যতখানি আপাত [illegible] বাস্তবে ততখানি নয়। মনে হয় গোড়া থেকেই রাজস্ব-দাবি এতই চড়া হারে [illegible] চল যে আর বাড়ানোর প্রায় কোন উপায়ই থাকত না। চাষীদের উপর অ[illegible] যেসব কর চাপানো হতো আর বাদশাহী কর্মচারী ও অন্যান্যরা নিয়মমাফিক ও বেনিয়মে যা কিছু আদায় করত সেইসব হিসেবে ধরলে দেখা যাবে চাষীদের কী বিশাল বোঝা বইতে হতো। অনুমোদিত দাবি ও বকেয়া আদায় এবং যথাসময়ে ছাড় দিতে অস্বীকার করার সমূহ অধিকারের প্রশ্নে কর্তৃপক্ষ জিদ করলেই রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বিপদ-সীমা ছাড়িয়ে যেত। চাষীদের তখন বেঁচে থাকার পক্ষে অপরিহার্য অংশটুকুতেই টান পড়ত। কিন্তু এই মুহূর্তে সে কথা আমাদের আলোচ্য নয়। এই ধরনের অত্যাচার বেড়েছিল কিনা সে প্রশ্ন শেষ অধ্যায়ের জন্য মুলতুবি রাখা যেতে পারে।

২. ভূমিরাজস্ব নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতি

যে-কোন সংগঠিত কর-ব্যবস্থার মতো মুঘল প্রশাসনের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় [illegible] দুটি স্তর ছিল। প্রথমত, রাজস্ব-নির্ধারণ ('তশখীস'), দ্বিতীয়ত, আসল-[illegible] ('তহসীল')। 'ওয়াসিল' মানে আদায়ের পরিমাণ, তার বিপরীতে 'জমা' [illegible] বোঝাত ধার্য-রাজস্বের পরিমাণ।[১] ভারতীয় কৃষিবর্ষের প্রধান মরসুমী বিভাগ অনুযায়ী

২৫. 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', ১৩৫। অন্যত্র ('আকবর টু আওরঙ্গজেব', ২৬০-৬১) তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, 'দাম'-এ দাবি করা হয়ে চললে রাজস্ব ভার বেড়েও থাকতে পারে, কেননা ১৭ শতকে রুপোর অঙ্কে 'দাম'-এর মূল্য খুব বেড়ে গিয়েছিল। এই অধ্যায়ের পঞ্চম অংশে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১. হিসাবনিকাশে 'প্রাপ্তি' অর্থেও 'জমা' শব্দটি ব্যবহার হয়, এটি তাই 'খর্জ' অর্থাৎ খরচের বিপরীতার্থক। তুলনীয়, মোরল্যাণ্ড, 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', ২১২-১৫।

খারিফ (শরৎ) এবং রবি (বসন্ত) ফসলের জন্য রাজস্ব ধার্য হতো আলাদা-আলাদাভাবে। রাজস্ব ধার্য করে কর্তৃপক্ষ 'পাট্টা' 'কওল' বা 'কওল-করার' নামে লিখিত দলিল বিলি (প্রদান) করতেন, এতে রাজস্ব-দাবির পরিমাণ বা হার নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকত। একই সঙ্গে করদাতাকে দিতে হতো 'কবুলিয়ৎ' বা তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া দায়ের 'স্বীকৃতি', যাতে বলা থাকত কখন এবং কীভাবে সে তা দাখিল করবে।[২]

রাজস্ব-নির্ধারণ হতো বিভিন্ন পদ্ধতিতে। সেগুলো খুব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা উচিত। এই অংশে শুধু ঐ সব পদ্ধতির সংজ্ঞা ও প্রত্যেকটির মূল বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। পরের অংশে দেওয়া হবে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এগুলোর প্রয়োগের সমীক্ষা।

কিছুটা উল্টোদিক থেকে শুরু করে প্রথম যে-রীতিটির কথা আমরা বিবেচনা করব সেটি আদৌ রাজস্ব-নির্ধারণের পদ্ধতি নয়, বরং এমন একটা সংগ্রহ-পদ্ধতি যাতে রাজস্ব ধার্য না করলেও চলে। সেটি হলো ভাগচাষ, ফার্সীতে যাকে বলে 'গল্লা-বখ্‌শী' আর হিন্দী ও ঐ জাতীয় ভাষায় বলে 'বটাঈ' এবং 'ভাওলী'। 'আইন'-এ পরিষ্কার-ভাবে তিন ধরনের ভাগচাষের কথা বলা আছে। প্রথমটিতে "দু-দলের লোকের উপস্থিতিতে খামারে চুক্তি ('করার-দাদ')" অনুযায়ী শস্য ভাগাভাগি করা হয়। মনে হয় এটিকেই 'বটাঈ'-এর যথাযথ রূপ বলে গণ্য করা হতো। দ্বিতীয়টি হলো 'ক্ষেত-কটাঈ', অর্থাৎ ক্ষেত ভাগ বা কাটবার আগে মাঠের ফসল ভাগ। তৃতীয়টি 'লাঙ্গ বটাঈ' যেখানে শস্য কাটার পর তা স্তূপাকারে রাখা হতো, তারপর ভাগ করা হতো।[৩] একটি সরকারী নথিতে "রাজস্ব আদায়ের সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি" বলে শস্যভাগের বর্ণনা

২. 'ফরহঙ্গ-এ করদানী', পৃ. ৩৪ ক-৩৫ ক; 'দুর-আল উলুম', পৃ. ৬২ ক; 'সিয়াকনামা' ২৯-৩০, 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৩ খ-৭৫ ক, Or. 2026, পৃ. ২২ খ-২৪ খ। 'ফরহঙ্গ-এ করদানী', 'সিযাকনামা' এবং 'খুলাসতুস সিয়াক'-এ এইসব নথির নমুনাও পুনরুদ্ধৃত হয়েছে। Allahabad 177, 897, 1206 ও 1223 হলো 'পাট্টা' বা 'কওল করার', শীর্ষকেও এইভাবেই লেখা আছে। Allahabad 1220-র কোনো শীর্ষক নেই, কিন্তু এটি একটি 'কবুলিয়ৎ'। সবগুলোই আওরঙ্গজেবের আমলের।

'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৬-এ 'আমালগুজার' (রাজস্ব কর্মচারী) প্রসঙ্গে বলা আছে যে, রাজস্ব নির্ধারণ হয়ে যাওয়ার পর সে চাষীদের সঙ্গে কাগজপত্র বিনিময় করত, কিন্তু বিস্তারিত-ভাবে কিছু বলা নেই।

৩. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৬-তে তৃতীয় পদ্ধতি দিয়ে সম্ভবত বোঝানো হয়েছে যে চাষীরা সমান-সমান স্তূপ করে ফসল গাদা করে রাখত আর রাজস্ব-সংগ্রাহক রাষ্ট্রের ভাগের অনুপাত অনুযায়ী তারই কয়েকটি বেছে নিত।

'ফরহঙ্গ-এ করদানী', পৃ. ৩৩ ক (Edinburgh 83, পৃ. ৫৫ ক)-তে 'গল্লা-বখ্‌শী'-র থেকে একটি রীতিকে আলাদা করা হয়েছে, যেটিকে বলা হয়েছে 'পোলা-বন্দী'। কিন্তু মনে হয় এটি ছিল ভাগচাষেরই এক বিশেষ রূপমাত্র। কর্তৃপক্ষই ফসল কাটা ও ঝাড়াই-এর ব্যবস্থা করত এবং ঝাড়াই-হওয়া শস্য থেকে রাষ্ট্রের পাওনা ভাগ নিয়ে নিত।

দেওয়া হয়েছে।[৪] বোধহয় সাধারণভাবে চাষীদের কাছে এটাই ছিল সবচেয়ে পছন্দসই। এর মাধ্যমে তারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মরসুমের ঝুঁকি ভাগ করে নিতে পারত। যথেষ্ট দুর্দশাগ্রস্ত গ্রাম বা চাষীদের কাছে এই পদ্ধতিই সবচেয়ে লাগসই মনে হতো।[৫] কোন গ্রামে, চলতি নির্ধারণে সন্দেহের অবকাশ ঘটলে, প্রশাসনের পক্ষে সেখানকার উৎপাদনক্ষমতা পরখ করার এটাই ছিল ভালো উপায়।[৬] বাজারে যখন শস্যের চড়া দাম পাওয়া যেত তখন কর্তৃপক্ষের কাছেও এটা লাভের ব্যাপার হতো।[৭] সরকারী দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় আপত্তি ছিল (আবুল ফজল যেমন বলেছেন): "এর জন্য দরকার বিরাট সংখ্যক পাহারাদার, নইলে হতভাগারা তছরূপ করে তাদের অসাধু হাত নোংরা করে ফেলে"।[৮] এই পদ্ধতিতে তাই খরচ পড়ত বেশি। আওরঙ্গজেব বলেছেন যে, দখিনে যখন এটি চালু করা হয় তখন শস্যের ওপর প্রয়োজনীয় পাহারার ব্যবস্থা করতে গিয়ে রাজস্ব আদায়ের খরচ ঠিক দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল।[৯]

নির্ধারণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে সংক্ষেপে যেটি সম্পন্ন হতো তার নাম 'হস্ত-ও-বুদ্'। নির্ধারক গ্রাম পরিদর্শন করতেন, ভালো-মন্দ দু-ধরনের জমিই দেখে মোট উৎপাদনের একটা আনুমানিক হিসেব করতেন, ও তার ওপরেই রাজস্ব বেঁধে দিতেন।[১০] ঐ রকমই আরেকটি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি হচ্ছে শুধু লাঙল গুনতি করে এলাকা অনুযায়ী লাঙল পিছু নির্দিষ্ট হার প্রয়োগ করে রাজস্ব ঠিক করা।[১১]

এই দুই রীতির ত্রুটি পরিষ্কার বোঝা যায়। প্রথমটিতে সবটাই নির্ভর করত নির্ধারকের ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও সততার ওপর, দ্বিতীয়টিতে রাজস্ব-দাবির চূড়ান্ত অসম বণ্টন

৪. 'নিগারনামা-এ মুন্শী', পৃ. ৯৭ খ-৯৮ ক, Bodl. ৭৩ খ, Ed. 76।

৫. রসিকদাসকে দেওয়া ফরমান, প্রস্তাবনা।

৬. খুব বেশি হলেও ('নিগরনামাএ মুন্শী', পৃ. ১২৬ ক-খ, Bodl. পৃ. ৯৮ ক, Ed. 98) বা খুব কম হলেও ('আহ্কম-এ আলমগীরী', পৃ. ২৪৪ ক-খ) দু ক্ষেত্রেই।

৭. 'ফরহঙ্গ-এ করদানী', পৃ. ৩২ খ, Edinburgh 83, পৃ. ৩৫ ক।

৮. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৬। তুলনীয় 'নিগরনামা-এ মুন্শী', পৃ. ৯৭ খ-৯৮ ক, ১২৬ ক-খ, Bodl. পৃ. ৭৩ খ, ৯৮ ক, Ed. 76, 98; 'করহঙ্গ-এ করদানী', পূর্বোক্ত সূত্র, বেকাস, পৃ. ৭১ খ-য় একটি হিন্দী প্রবাদ উদ্ধৃত আছে: "বটাঈ লুটাই হৈ" অর্থাৎ ভাগচাষ করলে লুঠ হবেই।

৯. 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ১১৮ ক।

১০. 'ফরহঙ্গ-এ করদানী', পৃ. ৩২ খ, Edinburgh 83, পৃ. ৩৫ ক। Add. 6603, পৃ. ৮৪ ক-তে 'হস্ত-ও-বুদ'-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এই বলে, "হালফিল যা চাষ ও উৎপাদন করা হচ্ছে। 'ওয়াকিম' (রাজস্বের দাবিদার) যখন যোগ্য হয় তখন জমিনদার বলে: 'হস্ত-ও-বুদ' অনুযায়ী আমার জায়গায় (রাজস্ব) নির্ধারণ করুন।"

১১. দখিন-এ এই প্রথাই চালু ছিল। সাদিক খান এর বর্ণনা দিয়েছেন। Or. 174, পৃ. ১৮৫ ক-খ, Or. 1671, পৃ. ৯০ খ; খাফী খান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩২ টীকা।

হতে পারত। এই ত্রুটিগুলো কিছুটা কাটানো গিয়েছিল 'কনকূত' বা 'দানা-বন্দী'[১২] নামে আরও উন্নত একটি ব্যবস্থা দিয়ে। 'আইন' ও অন্যান্য প্রামাণিক রচনায় এর খুব বিশদ বর্ণনা আছে। মনে হয় এই পদ্ধতির দুটি স্তর ছিল: প্রথমে জমি মাপা হতো হয় দড়ি ('জরিব') দিয়ে বা পা ফেলে।[১৩] তারপর নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে প্রতিটি শস্যের ফলন, অর্থাৎ শস্য-হার হিসেব করা হতো এবং সেই শস্যটি যে-যে জায়গায় হয় তার সব এলাকাতেই সেই হার খাটত। শুধু চোখে দেখে শস্য-হার ঠিক করতে অসুবিধা হলে, নির্ধারক ভালো, মাঝারি আর খারাপ তিন ধরনের জমি থেকে নমুনা হিসেবে কিছুটা ফসল কেটে নিয়ে তার ভিত্তিতে হিসেব করতেন।[১৪]

১২. আবুল ফজল যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, 'কন' মানে শস্য আর 'কূত' মানে মূল্য নিরূপণ বা আনুমানিক হিসাব ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫)। অর্থাৎ একটি ব্যবস্থা যাতে খাদ্যশস্যের-উৎপাদন (বা আরও সঠিকভাবে শস্য-হার) হিসেব করা হতো। 'দানা' মানে শস্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'বন্দী' শব্দটি রাজস্ব সংক্রান্ত লেখাপত্রে ব্যবহার হয় সাধারণ অর্থে কোন কিছু বেঁধে দেওয়া বা স্থির করা বোঝাতে। যেমন, 'জমা-বন্দী' ইত্যাদি।

১৩. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫; 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৬ ক, Or. 2026, পৃ. ২৭ ক; বেকাস, পৃ. ৭০ ক-খ। তুলনীয় Add. 6603, পৃ. ৭১ খ। এলাকার জরিপ যে এই ব্যবস্থার একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ ছিল সে কথা 'দস্তুর-আল-আমল-এ নভিসিন্দগী', পৃ. ১৮২ ক-১৮৫ ক এবং 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৫ ক-৭৬ খ, Or. 2026, পৃ. ২৪ খ-২৮ ক-তে নির্ধারণ তালিকার যে নমুনাগুলি আছে তার থেকেও দেখা যায়। প্রথমটিতে মাপ দেওয়া আছে বিঘার হিসেবে। 'খুলাসতুস সিয়াক'-এ 'কনাল' বা পরিমাপের একটি ভারতীয় দৈর্ঘ্যমাত্রা ('জব্‌ৎ-এ হিন্দী')-র একক নির্দেশ করা আছে। কিন্তু এর ব্যবহার হতো একমাত্র পাঞ্জাবে।

১৪. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫-৬। এখানে বলা হয়েছে যে পোক্ত চোখে দেখা আন্দাজ বেশ নির্ভুল হতো। তুলনীয় 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৬ ক, Or. 2026, পৃ. ২৭ ক। বেকাস, পৃ. ৭০ খ-৭১ ক-তে শস্য-হার হিসেব করার দুটি পদ্ধতি সুপারিশ করা হয়েছে। একটি হলো, যথাক্রমে নির্ধারক এবং চাষীর পছন্দমতো জমির দুটি অংশ থেকে নমুনা-শস্য কেটে নেওয়া, অন্যটি হলো একটি গাদায় শস্য ওজন করা (এবং যে ক্ষেত থেকে কাটা হয়েছে তার মাপের সঙ্গে মিলিয়ে হিসেব করা?)।

প্রত্যেক শস্যের আওতার এলাকায় কীভাবে শস্য-হার প্রয়োগ করা হতো তা দেখানো আছে আগের টীকায় উল্লিখিত পুস্তিকাদুটির 'কনকূত' সারণিতে। 'দস্তুর-আল আমল-এ নভিসিন্দগী'-এর তালিকায় কোন শস্যই দুবার নেওয়া হয়নি। কিন্তু 'খুলাসতুস সিয়াক'-এর সারণিতে দুটি গম-ক্ষেতের কথা পাওয়া যায় যেখানে আলাদা-আলাদা শস্য-হার অনুযায়ী রাজস্ব নির্ধারণ করা হয়েছিল: 'কনাল' প্রতি ৪ এবং ৪·৩ মণ। এর অর্থ অবশ্যই এই যে কোন গ্রামের কিছু ক্ষেত যদি বেশি উর্বর হয় কিংবা সেখানে অন্যান্য ক্ষেতের চেয়ে ভালো সেচ ব্যবস্থা থাকে তাহলে গোটা গ্রামের জন্য একটিমাত্র শস্য-হার ঠিক করার দরকার পড়ত না। এই 'কনকূত' সারণিগুলোর আরও কৌতূহলজনক দিক এই যে, এখানে 'নাবুদ' অর্থাৎ মোট জরিপ-করা এলাকায় শস্যহানির দরুন ছাড়ের জন্য কোন স্তম্ভ নেই। সব 'জব্‌ৎ' সারণিতে এই স্তম্ভ পাওয়া যায়। এর কারণ সম্ভবত এই যে 'কনকূত'-এর আওতায় শস্য-হার ঠিক হতো প্রত্যেক গ্রামের (বা ক্ষেতের) ফসল তোলার সময় এবং আশা করা হতো যে শস্যহানি ঘটলে শস্য-হারের মধ্যেই তা পুষিয়ে দেওয়া হবে।

আবুল ফজল যেমন বলেছেন, 'কনকৃত' পদ্ধতির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রাপ্য রাজস্ব প্রধানত ধার্য হতো শস্যে, নগদে নয়।[১৫] তাই দেখা যায়, 'কনকৃত' কাগজ-পত্রের নিদর্শনে প্রথমে পুরো শস্যের ওপর রাজস্ব ধার্য করা হয়েছে (শস্য-হারের ভিত্তিতে); তারপর 'চাষীদের ভাগে'র অংশ তার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সবশেষে, অবশিষ্ট অংশটুকু রাজস্বের সূচক। আলাদা-আলাদা শস্যের ওপর দামের তালিকা প্রয়োগ করে তাকে নগদে পরিণত করা হয়েছে।[১৬]

পরে দেখা যাবে, 'কনকৃত' ব্যবস্থা ভাগচাষেরই অনুরূপ এক পদ্ধতি কারণ দু-এর ক্ষেত্রেই হিসেবের ভিত্তি হলো প্রকৃত ফলন। কিন্তু তুলনায় 'কনকৃত' ব্যবস্থা অনেক কম ব্যয়সাপেক্ষ, কেননা এতে শস্য কাটা ও ঝাড়াই-এর ওপর কোন নজরদারির দরকার পড়ে না। এর আগে যে-দুটি নির্ধারণ পদ্ধতি আমরা দেখেছি, তার যে-কোনটির চেয়ে এই পদ্ধতি স্পষ্টতই অনেক বেশি দক্ষ ও যথাযথ। তাহলেও নিজেকেই শস্য-হার ঠিক করতে হতো বলে, নির্ধারককে অনেক বেশি কাজের স্বাধীনতা দেওয়া হতো। এই ক্ষমতা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করার জন্যই সম্ভবত ভাক্করের প্রদেশকর্তা ১৫৭৫-৭৬ সালে 'কনকৃত' ব্যবস্থার আওতায় সমহারে রাজস্ব বেঁধে দেন বিঘা পিছু পাঁচ মণ।[১৭] দাম ঠিক করার মূল বিষয়ই আর এখানে নেই। এই ব্যবস্থা 'জব্‌ৎ'-এর অনুরূপ না হলেও তার খুবই কাছাকাছি।

ভারতের রাজস্ব সংক্রান্ত লেখাপত্রে 'জব্‌ৎ' কথাটির একটি বিশেষ পারিভাষিক অর্থ আছে, অভিধানে তা পাওয়া যায় না।[১৮] এটিকে 'জরিব' বা 'আমল-এ জরিব'-এর একে সমার্থক মনে করা হয়। পরিমাপ এবং তার ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ বোঝাতেই শব্দটি ব্যবহার হয়।[১৯] 'কনকৃত'কে তাই 'জব্‌ৎ-এ কনকৃত'ও বলা হয়েছে, কারণ

১৫. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫-৬: 'আমালগুজার' "শুধুমাত্র নগদ নেওয়াতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়বে না, সে অবশ্যই শস্যও সংগ্রহ করবে। এর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আছে ('বর-চন্দ্‌ গুনা বুঅদ'): কনকূত...বটাঈ..." ইত্যাদি।

১৬. 'দস্তর-আল আমল-এ নভিসিন্দগী', পৃ. ১৮২ ক-১৮৫ ক এবং 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৫ ক-৭৬ খ, Or. 2026, পৃ. ২৪ খ-২৮ ক-এর সারণিগুলো দ্রষ্টব্য। দাম ছিল (বা সেইরকমই ধরে নেওয়া হতো) বাজারের চালু দাম। তুলনীয় 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৬: "চাষীর পক্ষে যদি এটি ভারস্বরূপ না হয় তবে সে ('আমালগুজার') যেন ফসলের ভাগকে বাজারের দাম অনুযায়ী নগদে পরিণত করে।" যে প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে (আগের টীকা দ্রষ্টব্য) তার থেকে মনে হয়, ভাগচাষ ('বটাঈ') ও 'কনকৃত'—দুএর ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য।

১৭. মসুম, 'তারিখ-এ সিন্দ', পৃ. ২৪৫।

১৮. তুলনীয় 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', পৃ. ২৩৫। অধ্যাপক ল্যামটনের রাজস্ব সংক্রান্ত পরিভাষা-কোষ 'ল্যাণ্ডলর্ড অ্যাণ্ড পিজান্ট ইন পার্সিয়া'-য় 'জব্‌ৎ' শব্দটি নেই। সেখানে (পৃ. ৪৪৩) 'জবিত'-এর সংজ্ঞা দেওয়া আছে: "রাজস্ব-সংগ্রাহক, নিয়ন্ত্রক; 'বেলিফ', মনে হয় এই অর্থটি পাওয়া গিয়েছিল 'জব্‌'-এর আক্ষরিক অর্থ 'ক্রোক', পৃথক্‌করণ ইত্যাদি থেকে।"

১৯. বহু প্রসঙ্গে আবুল ফজল শব্দটি যেভাবে ব্যবহার করেছেন তার থেকে এই অর্থই নিশ্চিত-ভাবে প্রমাণ হয়। তুলনীয় মোরল্যাণ্ড, 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', পৃ. ২৩৫ ও অন্যত্র। 'খুলাসতুস

এই ব্যবস্থায় রাজস্ব-ধার্য জমির পরিমাণকে হিসেবে ধরা হয়।[২০] কিন্তু 'জব্ৎ' হচ্ছে স্বতই একটি বিশিষ্ট নির্ধারণ পদ্ধতি, মুঘল আমলে তা ছিল আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।[২১]

এই পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর বিবর্তন সবচেয়ে ভালোভাবে অনুসরণ করা যায় 'আইন'-এ। সেখানে বলা হয়েছে, শের শাহ্ এবং ইসলাম শাহ্ হিন্দুস্থানকে 'জব্ৎ'-এর আওতায় এনেছিলেন।[২২] আরও বলা হয়েছে, যে সব জমি একনাগাড়ে চাষ হতো ('পোলান') বা মাঝে মাঝে পতিত পড়ে থাকত ('পরৌতী'), শেরশাহ্ সেখানে 'রাই' বা শস্য হার চালু করেন।[২৩] ভালো, মাঝারি এবং খারাপ জাতের

সিয়াক'-এ বিভিন্ন মাপের জমির এলাকা হিসেব-বিষয়ক একটি অনুচ্ছেদে সঙ্কীর্ণভাবে জরিপ অর্থে সর্বদাই এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'খুলাসতুস সিয়াক' পৃ. ৭৫ ক, Or. 2026, পৃ. ২৪ খ, Add. 6603, পৃ. ৭১ খ-তে 'জব্ৎ'-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে "কোন কিছুর এলাকা পরিমাপ" ('মুহীত-বন্দী')।

২০. 'দস্তুর-আল আমল-এ নভিসিন্দগী', পৃ. ১৮২ ক; 'দস্তুর-আল আমল-এ আলমগীরী', পৃ. ১০৫ খ, বেকাস, পৃ. ৭০ ক। আরও দ্রষ্টব্য 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৬ ক, Or. 2026, পৃ. ২৭ ক-য় 'কনকৃত'-এর সংজ্ঞা। সেখানে নির্ধারককে বলা হয়েছে "(প্রথমে) জমিকে 'জব্ৎ'-এর আওতায় নিয়ে আসবে, ইত্যাদি।"

২১. দুটি আলাদা ব্যবস্থা হিসেবে 'জব্ৎ' এবং 'কনকৃত'-এর উল্লেখের জন্য 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫ এবং 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৪ ক, Or, 2026, পৃ. ২২ খ; 'ফরহঙ্গ-এ করদানী', পৃ. ৩২ খ, Edinburgh 83, পৃ. ৩৫ ক দ্রষ্টব্য। রসিকদাসের উদ্দেশে আওরঙ্গজেবের ফরমানের (মুখবন্ধে) 'আমল-এ জরিব' ও 'কনকৃত'-এর মধ্যে তফাৎ করা হয়েছে।

২২. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৬।

২৩. 'রাই' শব্দের আভিধানিক সংজ্ঞা দেওয়া হলো ('গয়াস-আল লুগাত'-এ যেমন দেওয়া আছে): "......চাষ করে যা পাওয়া যায়; রাজার জন্য চাষ থেকে রাজস্ব ('মহ্সুল'); করযোগ্য সম্পত্তির উপর শুল্ক।" সুতরাং এর মানে উৎপন্নের হার ও রাজস্বের হার দুইই হতে পারে। আবুল ফজল, মনে হয়, দুই অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করেছেন আর দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি সীমাবদ্ধ রেখেছেন শুধুমাত্র জিনিসে [শস্যে] প্রদেয় রাজস্ব-হার বোঝাতে। নৌশেরবান সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে একটি বিশেষ মাপ 'জরিব'-এর সমতুল্য স্থির করে তিনি "সেখানকার 'রাই', তিন 'দিরহাম' মূল্যে এক 'কফিজ' (গাদার হিসেব) বলে নির্দিষ্ট করেন। রাজস্ব হিসেবে তিনি নেন একের-তিন ভাগ।" ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯২-৩)—এ কথা বলার সময় তাঁর মাথায় নিশ্চয়ই 'রাই' কথাটির প্রথম অর্থটি ছিল। অন্যত্র অবশ্য 'মাল' বা ভূমিরাজস্বের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, এটি "আবাদী এলাকায় 'রাই' হিসেবে ধার্য করা হয়" (আইন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৪)। এখানে অবশ্য 'রাজস্ব-হার' অর্থটিই প্রসঙ্গের সঙ্গে বেশি খাপ খাবে। আবুল ফজল আরেক জায়গায় "কাশ্মীরে 'রাই' ঠিক করা"র কথা বলেছেন। এর দ্বারা বোধহয় তিনি বোঝাতে চেয়েছেন: বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষের জমির প্রতি 'পাট্টা' থেকে জিনিসে যে-রাজস্ব নেওয়া হতো তার হার ('আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৮-৯)।

ফলন—এই তিনের হার ছিল 'রাই'-এর ভিত্তি। উৎপাদনের সাধারণ হার পাওয়ার জন্য এগুলোর গড় নেওয়া হতো, আর সেই গড়ের একের-তিন ভাগকে বলা হতো "রাজার প্রাপ্য", অর্থাৎ ভূমিরাজস্ব। বিভিন্ন রবি ও খারিফ শস্যের বিঘা পিছু হারের একটি দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়।[২৪] এই তালিকাকেই শের শাহের 'রাই' বলে ধরা চলে।[২৫] মনে হয়, আকবর তাঁর রাজত্বের গোড়ার দিকে গোটা সাম্রাজ্যের জন্যই এই হারগুলো মেনে নিয়েছিলেন ও অনুমোদন করেছিলেন। 'আইন-এর আরেকটু পরের দিকের একটি কথার গূঢ় অর্থ বোধহয় এই যে, শুধু শস্য-হারই নয়, রাজস্বের জন্য বরাতের অনুপাতটাও আকবর সুর প্রশাসনের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন।[২৬]

শস্যে প্রকাশিত হার অবশ্য সরাসরি রাজস্ব-দাবি বোঝাত না, "সেনাবাহিনীর সুবিধার্থে" অর্থাৎ জাগীরদারের জন্য একে নগদে পরিণত করতে হতো।[২৭] আবুল ফজল বলেছেন আকবরের আমলের গোড়া থেকেই রীতি ছিল এই যে, ফি-বছর সাম্রাজ্যের প্রতিটি এলাকা থেকে দামের বিস্তারিত বিবরণ পাঠাতে হবে। পরে বাদশাহী দরবারে সেগুলি পরীক্ষা করে অনুমোদন করা হতো, আর অনুমোদিত মূল্য অনুযায়ী 'রাই'গুলোকে পরিণত করা হতো নগদ হারে। এর নাম ছিল 'দস্তুর-আল আমল' বা শুধু 'দস্তুর'।[২৮] "উনিশ বছর"-এর জন্য (রাজত্বের ৬ থেকে ২৪ বছর অবধি) প্রতিটি 'জব্‌তী' প্রদেশের (আজমীর ও বিহার ছাড়া) বিভিন্ন শস্যের বার্ষিক 'দস্তুর'-এর বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া আছে 'আইন'-এ।[২৯] এই তালিকাগুলিতে ৬ থেকে ৯ বছর

২৪. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৭-৫০০।

২৫. তুলনীয় মোরল্যাণ্ড, *JRAS*, ১৯২৬, পৃ. ৪৫৪ ইত্যাদি।

২৬. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০। প্রতিটি 'রাই' তালিকার শেষে বলা হয়েছে: "ওপরে যেমন দেওয়া হলো, বিচক্ষণ বাদশাহ্ সেই অনুযায়ী 'মাল' (রাজস্ব) অনুমোদন করেছিলেন, আর 'জিহাৎ' (উপকর)-এর একের-দশ-ভাগ মকুব করে দিয়েছিলেন।"

২৭. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৭।

২৮. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৩, ৩৪৭; 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮২-৩। কয়েকটি বিশেষ ফসল, যেমন তরমুজ, যোয়ান, পেঁয়াজ ও রবিশস্যের অন্যান্য সব্জী এবং খারিফ শস্যের মধ্যে নীল, পোস্ত, পান, হলুদ, পানিফল, শণ ইত্যাদির জন্য কোন 'রাই' তৈরি করা হয়নি। 'দস্তুর-আল-আমল' সরাসরি নগদেই স্থির করা হতো ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৮, ৩০০)।

'দস্তুর-আল আমল' শব্দটির অর্থ হওয়া উচিত শাসন সংক্রান্ত কাজকর্ম নির্দেশক নিয়মাবলী (তুলনীয় Add. 6603, পৃ ৬১ খ-৬২ ক)। বহু প্রশাসনিক পুস্তিকার তাই নাম দেওয়া হয়েছে 'দস্তুর-আল আমল'। কিন্তু 'আমল' শব্দটি দিয়ে রাজস্ব-সংগ্রহও বোঝায় (যার থেকে 'আমিল', রাজস্ব-সংগ্রহাক)। তাই রাজস্ব-হার বোঝাতে শব্দটির ব্যবহার বেঠিক নয়।

২৯. 'আইন-এ মুওয়াজদহ্-সালা', 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৩-৪৭। যে-সব প্রদেশ এর আওতায় পড়ে তা হলো আগ্রা, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, দিল্লী, লাহোর, মুলতান এবং মালব। আজমীরের নীচের সারণিটি ফাঁকা রয়েছে। 'আইন'-এ বিহারের 'দস্তুর'গুলো সম্বন্ধে কিছু বলা নেই, যদিও ঐ প্রদেশের অনেকটাই 'জব্‌ৎ'-এর আওতায় ছিল বলে জানানো হয়েছে।

অবধি সমস্ত প্রদেশের (মালব ছাড়া) প্রত্যেক শস্যের অঙ্কগুলি হয় পুরোপুরি এক, নয়তো প্রায় এক। তাছাড়া বছর-বছর 'দস্তুর'গুলোর নামমাত্র হেরফের হয়েছে।[৩০] সুতরাং ধরে নেওয়া চলে যে, শুরুতে গোটা সাম্রাজ্য জুড়ে ছিল একটিমাত্র 'রাই', শুধু তাই নয়, প্রতি বছর কার্যত সমস্ত অঞ্চলে সামান্য অদলবদল করে একটিমাত্র দামের তালিকাই ব্যবহার করা হতো।

লাহোর থেকে এলাহাবাদ—এই বিশাল এলাকা জুড়ে কোন সময়ে চাষীদের ওপর কী করে যে এই একই হার চাপানো যেতে পারে তা কল্পনা করা শক্ত। একে বড় জোর কাগুজে হার বলে মনে করা যেতে পারে। আবুল ফজল স্বীকার করেছেন যে রাজত্বের গোড়ার দিকে 'দস্তুর'গুলো জারি করায় "খুবই দুর্দশা দেখা দিত", আর তার ঠিক পরেই ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে 'জমা' বা সাধারণ ধার্য রাজস্ব (যেটি সে-সময় 'জমা-এ রকমী' নামে পরিচিত ছিল) অনেক ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো হতো আর ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে রাজস্ব ধার্য হতো হয় অনেক বাড়িয়ে, নয়তো অনেক কমিয়ে।[৩১] এই 'জমা'র প্রকৃত মূল্যায়নে মোরল্যাণ্ড মূলত নির্ভুল। 'দস্তুর' ও 'জমা'র মধ্যে তিনি কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ লক্ষ্য করেননি।[৩২] কিন্তু 'দস্তুর' প্রসঙ্গে আবুল ফজল যদি না অসঙ্গত-ভাবে এর উল্লেখ করে থাকেন, তবে স্বাভাবিকভাবেই মনে করা যেতে পারে যে, 'জমা' কিছুটা বাড়িয়ে ধরা হতো, বিশেষ করে এই কারণে যে তার ভিত্তি ছিল এই সব অবাস্তব নগদ হার। আকবরের প্রশাসন সুর বংশের সেরেস্তা থেকে নিশ্চয়ই জরিপ-করা এলাকার কিছু নথিপত্র উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল। 'দস্তুর' দিয়ে সেই জমির পরিমাণ গুণ করে প্রত্যেক এলাকার 'জমা'র পরিমাণ স্থির করা হতো। কিন্তু 'দস্তুর'গুলো সর্বত্রই সমহারের, তার সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের উৎপাদন ক্ষমতা বা দামের তারতম্যের প্রায় কোন সম্পর্কই ছিল না। তাই চাষীদের প্রকৃত ক্ষমতা আর যে-'জমা'য় জাগীরদারদের তা বরাত দেওয়া হতো—এ দুএর মধ্যে নিশ্চয়ই বিস্তর ফারাক থেকে যেত। তাছাড়া, এলাকার পরিসংখ্যানেও কারচুপি করা যেত বলে মনে হয়। কারণ আবুল ফজল বলেছেন যে, বেতনের চাহিদা মেটানোর জন্য কলমের এক খোঁচায় 'জমা'র পরিমাণ বাড়ানো যেত।[৩৩]

কার্যকর করা চলে এমন রাজস্ব হারের অনুপস্থিতির দরুন এবং জমির পরিমাণ সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য কোন পরিসংখ্যান না থাকায় আকবরের রাজত্বের ১১-তম বছরে মুজফ্‌ফর খান এবং তোডর মলের নির্দেশে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তার স্বরূপ বোঝা যায়।[৩৪] 'কানুনগো'দের কাছ থেকে তাঁরা দেশের স্থানীয় এলাকা ও

৩০. সাধারণভাবে বলতে গেলে অঙ্কগুলো এক হওয়ার ব্যাপারটি ব্লথমানের সংস্করণের চেয়ে আরও বেশি করে দেখা যায় Add. 7652 এবং Add. 6552-তে দেওয়া মূল পাঠের সারণিগুলোতে।

৩১. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৭। 'জমা-এ রকমী' ও তার পরবর্তী সাধারণ নির্ধারণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে সপ্তম অধ্যায়ে।

৩২. 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম' ২৪২।

৩৩. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৭।

৩৪. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৭-এ দেওয়া আছে ১৫-তম বছর। সবচেয়ে ভালো পাণ্ডুলিপিগুলো

রাজস্বের পরিসংখ্যান ('তক্সীম') জোগাড় করেছিলেন।[৩৫] 'মহ্সূল' (উৎপন্ন

থেকে এই পাঠের সমর্থন মেলে। কিন্তু ফার্সী রচনায় 'পান্জ্ দহুম' (১৫-তম) অতি সহজেই 'ইয়াজদহুম' (১১-তম)-এর সঙ্গে বদলে যেতে পারে। সম্ভবত বইটির প্রতিলিপি করার গোড়ার দিকেই এই গোলমাল হয়েছিল। এক্ষেত্রে 'আকবরনামা'র সাক্ষ্যই চূড়ান্ত বলে মানতে হয়, কারণ এই বই-এ সঠিক কালানুক্রমিক বিন্যাস অনুসরণ করা হয়েছে। 'আকবরনামা'য় ঘটনাটি আছে ১১-তম বছরে ('আকবরনামা', ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭০)। মোরল্যাণ্ড 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', ২৪৬-৭-এ স্বীকার করেছেন যে এই যুক্তি খুবই জোরালো, কিন্তু তিনি দুই পরস্পরবিরোধী সাক্ষ্যের সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন এই বলে যে লেখাটি শুরু হয়েছিল ১১-তম বছরে, শেষ হয়েছিল ১৫-তম বছরে। দুটি সূত্রের কোনটির থেকেই এর পাঠগত সমর্থন পাওয়া যায় না।

৩৫. 'তকসীমাৎ-এ মুল্ক্'। 'তকসীম' (বহুবচনে 'তকসীমাৎ') নামে পরিচিত কাগজপত্রগুলোর উল্লেখ আছে ১৭ শতকের প্রশাসনিক এবং হিসাবনিকাশ সংক্রান্ত পুস্তিকায়। 'মুওয়াজনা-এ দহ্-সালা' নামের কাগজপত্রগুলো যা, এগুলোকেও সেই একই জিনিস বলা হয়েছে ('দস্তুর-আল আমল-এ আলমগীরী' পৃ. ৩৬ খ; 'সিয়াকনামা' ১০০; এবং 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৪ ক, Or, 2026, পৃ. ২৩ ক)। " 'মুওয়াজনা-এ দহ্-সালা', যাকে 'তকসীম-এ সনওয়াৎ' (কয়েক সনের 'তকসীম')-ও বলে"; এই শীর্ষকে এসব কাগজপত্রে যেসব তথ্য থাকত 'দস্তুর-আল আমল-এ আলমগীরী'তে তার মূল বিষয় দেওয়া আছে। বিষয়বস্তুর মধ্যে আছে 'মুজমিল', আদায়ীকৃত রাজস্ব এবং স্থানীয় খরচের সংক্ষিপ্ত হিসেব (তুলনীয় 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৮২ খ, Or, 2026, পৃ. ৩৮ খ); ভূমিরাজস্ব এবং অন্যান্য করের ('মাল-এ-সাইর') বিস্তারিত বিবরণ, পরগনার গ্রামসংখ্যার বিশদ উল্লেখ এবং শেষত, এলাকা-পরিসংখ্যান। শেষেরটিতে দেওয়া আছে অনাবাদী জমির এলাকা (বসতি এলাকা, পুকুর, বাগান, নালা এবং জঙ্গল আলাদা করে নির্দিষ্ট করা) এবং তারপর আবাদী জমির এলাকা। এর পরেই আছে আর একটি নথির শীর্ষক 'তকসীম-এ ইয়ক-সালা', এক (ঠিক আগের ?) বছরের 'তকসীম'। এতে যে তথ্য দেওয়া আছে তা হলো: চাষীদের আবাদ-করা এলাকার ওপর ভূমিরাজস্ব, বাগান ও বাণিজ্যের ওপর কর, 'নানকার' ও 'মদদ-এ মআশ' জমি ইত্যাদি। 'হিদায়েৎ-আল কওয়াইদ', পৃ. ১০ ক-খ, আলীগড় পাণ্ডুলিপি, পৃ. ২৭ খ-২৮ ক-এ সংক্ষেপে কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে বলা আছে যে 'তকসীম' বা 'মুওয়াজন-এ দহ্-সালা'-য় বিবেচ্য তথ্যগুলোর প্রধান প্রধান বিষয় রাজস্ব এবং এলাকার মাপ, অবশ্যই শেষেরটি। এতে বলা হয়েছে যে 'আমিন' বা রাজস্ব-নির্ধারক অবশ্যই কানুনগোর কাছ থেকে " 'জমা' (নির্ধারিত রাজস্ব) এবং এলাকার মাপ দেখানো 'দহ্-সালা' কাগজপত্র" জোগাড় করবে এবং সেখানে যে তথ্য দেওয়া আছে তা ঠিক কিনা দেখবে। "প্রকৃত এলাকার সঙ্গে 'কানুনগো'র কাগজপত্রে যা দেওয়া আছে সে যেন তা মিলিয়ে দেখে। এলাকা যদি মিলে যায় তো ঠিক আছে; কিন্তু এলাকা যদি 'তকসীমে'র চেয়ে বেশি হয় তবে সে যেন 'কানুনগো'র কাছ থেকে কৈফিয়ৎ চায় ইত্যাদি"। ১৭ শতকের রাজস্ব-সংক্রান্ত রচনায় 'তকসীম' শব্দটি ব্যবহারের কথা মোরল্যাণ্ডের জানা ছিল না। 'কিসমৎ' শব্দ থেকে ব্যুৎপত্তি ধরে তিনি 'তকসীম'-এর অর্থ করেছিলেন 'স্থানীয়

বা রাজস্ব)[৩৬]-এর ব্যাপারটা রাজস্ব নির্ধারণ ও আনুমানিক হিসাবের ওপর ছেড়ে দিয়ে, একটা নতুন 'জমা' খাড়া করা হয়েছিল [৩৭] মনে হয়, প্রকৃত উৎপাদন বা শস্য-হার ঠিক করার এই সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থাই 'জমা'র ভুলত্রুটির জন্য দায়ী। বলা হয় যে; এই নতুন 'জমা' ও প্রকৃত সংগৃহীত রাজস্বের ('ওয়াসিল') মধ্যে ফারাক অনেক। কিন্তু সেই সঙ্গে, 'আইন'-এর "উনিশ বছরে"র তালিকাগুলোয় দশম বছর থেকে একটা পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন প্রদেশে এবং একই প্রদেশে বিভিন্ন বছরে হারের ফারাক খুবই লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রেই দুটি অঙ্কে হার প্রকাশ করা হতো: সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন। এই দুটি হার একই প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় ঘোষিত হারের মাত্রাভেদের সূচক। মনে হয় নতুন স্থানীয় শস্য-হার ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তার থেকেই প্রত্যেক এলাকায় প্রতি বছর আলাদা করে দামের তালিকাও তৈরি া হতো। ধরে নেওয়া চলে যে, নতুন 'জমা' চালু করার জন্য মুজফ্ফর খান ও তোডর মল নতুন রাজস্ব হার তৈরির যেসব ব্যবস্থা নিয়েছিলেন এই সমস্ত পরিবর্তন তারই ফলশ্রুতি।[৩৮]

তালিকা' বা রাজস্ব-হার। পারিভাষিক অর্থে বসলে 'কিসমৎ' বলতে বোঝায় রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে উৎপন্নের বাটোয়ারা ('এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', ২৪৪-৫) ডঃ আই. এইচ. কুরেশি, মনে হয়, নিশ্চিত যে 'তকসীম' মানে 'উৎপন্নের তালিকা'। বরনীর একটি বাক্যাংশ 'কিসমৎ-এ বূদ ও নাবূদ' তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, 'তকসীম' এরই "অন্য এক রূপ" ('জার্নাল অফ পাকিস্তান হিস্টরিক্যাল সোসাইটি', ১ম খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃ. ২১২)। কিন্তু বরনীর বাক্যাংশটির অর্থ যে "উৎপন্ন ও শস্যহানির তালিকা" তার প্রমাণ কী? একটিমাত্রই প্রমাণ আছে। তা হলো: 'আইন'-এ 'তকসীম' শব্দটির মোরল্যাণ্ড-কৃত ব্যাখ্যা (আই. এইচ. কুরেশি, 'অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দ্য সুলতানেট অফ দিল্লী', পৃ. ১০৮ টীকা)।

৩৬. আবুল ফজল ও অন্যান্য লেখকরা 'মহ্সুল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন দুটি অর্থে। প্রথম অর্থটি হলো 'উৎপন্ন', যেমন আছে 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৬-তে চাষীদের "'মহ্সুল' বয়ে নিয়ে যাওযা"র কথায় বা, আরও পরিষ্কারভাবে, শেরশাহের 'রাই' সংক্রান্ত অংশটিতে (ঐ, পৃ. ২৯৭-৮)। মুহম্মদ হাসিমের উদ্দেশে আওরঙ্গজেবের ফরমানের অনুচ্ছেদ ১১ ও ১৪-য় শব্দটি ঐ একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য শব্দটি যে 'রাজস্ব' এই দ্বিতীয় অর্থেও ব্যবহার হতো তাও এক জায়গা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। 'বিতিক্চী'কে বলা হয়েছে সে যেন প্রত্যেক চাষীর 'জমা' নথিবদ্ধ করে, তারপর সেগুলোর যোগফল থেকে গ্রামের 'মহ্সুল' বের করে ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৮)। আরও দ্রষ্টব্য তোডর মলের নিয়মাবলি ('আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮২)। আব্বাস খান, পৃ. ১০খ, রসিকদাসের উদ্দেশে ফরমানের মুখবন্ধ ও খাফী খান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬-তেও শব্দটি ঐ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তুলনীয়, 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', পৃ. ২৪৯।

৩৭. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৭।

৩৮. এখানে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হলো তা কতক বিষয়ে মোরল্যাণ্ড-এর 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', ৮৬-৭; ২৪৫-৭ থেকে অনেকটাই আলাদা। ১৫-তম বছরে হারগুলিতে যে-সব রদবদল হতে দেখা যায়, মোরল্যাণ্ড তার সঙ্গে এই ব্যবস্থাকে যুক্ত করেছেন এবং সেই বছর থেকে শুরু করে সেগুলিকে 'কানুনগো হার' বলেছেন।

'দস্তুর'গুলো ক্রমেই বাস্তবসম্মত হয়ে ওঠায় চাষীদের ওপর রাজস্ব-দাবি স্থির করার ক্ষেত্রে প্রশাসন সম্ভবত সেগুলো কিছুটা বলবৎ করতে সক্ষম হয়। ফি-বছর 'রাই'-কে নগদ হারে পরিণত করার ফলে যে-দুর্দশা দেখা দিত আবুল ফজল এবার সে সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন : সাম্রাজ্য অনেকদূর ছড়িয়ে পড়েছে, তাই দরবারে স্থানীয় দামের বিবরণ পৌঁছনো ও সে-বছরের হার মঞ্জুর করার ব্যাপারে অনেক দেরি হয়। ফলে, কোন কোন সময় চাষীরা অভিযোগ করে যে, শেষ অবধি যা মঞ্জুর করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে (ইতিমধ্যেই) তার চেয়ে বেশি নেওয়া হয়ে গেছে। কখনও জাগীরদাররা অভিযোগ করে যে, সম্ভবত,অনুমোদিত হার পেতে দেরি হওয়ার দরুনই রাজস্বের বাকি অংশ অনাদায়ী রয়ে গেছে।[৩৯] "তার ওপর, অবস্থা এমনই খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, যারা দামের খবর পাঠাত তাদেরই কেউ কেউ সততার পথ থেকে সরে গিয়েছিল।"[৪০]

এই অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য শেষে এক 'দাওয়াই'-এর ব্যবস্থা নেওয়া হলো। 'আইন' এবং 'আকবরনামা' দু জায়গাতেই একে ২৪-তম বছরে তৈরি 'জমা-এ দহ্সালা' বা "দশ বছরের জমা"-র সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। যদিও এই সাধারণ নির্ধারণ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা সপ্তম অধ্যায়ের জন্যই মুলতুবি রাখা উচিত, তবু যাকে চূড়ান্ত 'দস্তুর' বলা যেতে পারে তার বিবর্তনের সঙ্গে এটি এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে এখানে তার ওপর অন্তত কিছু মন্তব্য করা জরুরি বলেই মনে হয়। মোরল্যাণ্ড মনে করতেন, শুধুমাত্র আগের দশ বছরে চাষীদের ওপর প্রকৃতপক্ষে ধার্য মোট রাজস্ব-দাবির গড় করে 'জমা-এ দহ্সালা' খাড়া করা হয়েছিল।[৪১] কিন্তু এ কথা মেনে নেওয়া শক্ত, কেননা আবুল ফজল পরিষ্কার বলেছেন, "এই সংস্কারের সারমর্ম এই যে, আবাদের শ্রেণী এবং দামের স্তর অনুযায়ী প্রতি পরগনার দশ বছরের অবস্থা বিচার করে ('হাল-এ দহ্সালা') তার বার্ষিক রাজস্বের ('মাল-এ হরসালা') এক-দশমাংশ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।"[৪২] শুধু আগের দশকের রাজস্ব আদায়ের প্রকৃত পরিমাণ বার করাই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে উৎপাদন ও দাম সম্পর্কে এত খবর জোগাড় করার কোন দরকার পড়ে না, মামুলি রাজস্ব-হিসাব, যেমন 'তকসীম', দিয়েই কাজ চলে যেত। মোরল্যাণ্ড বোধহয় 'আইন'-এর সেই অংশটুকুর ওপরই প্রধানত নির্ভর করেছেন যেখানে বলা হয়েছে যে এই প্রক্রিয়াটি ছিল প্রথমে 'মহ্সূল-এ দহ্সালা' ঠিক করে নেওয়া, পরে

৩৯. 'আইন', ১ম খণ্ড. পৃ. ৩৪৮, 'আকবরনামা' ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮২। 'আইন'-এ বলা হয়েছে চাষীরা 'অফজূন খওয়াহী' অর্থাৎ অনুমোদিত রাজস্ব-দাবির চেয়ে বাড়তি আদায়ের বিরুদ্ধে 'বিচার দাবি' করেছিল। 'আকবরনামা'য় এর সমপর্যায়ী শব্দ হলো 'ফাজিল' (জমা বাকি)। জাগীরদাররা অভিযোগ করেছিল (এখানে বলা হয়েছে 'ইক্তাদার') বকেয়া ('বকায়া')-র বিরুদ্ধে। এই শব্দটি রাজস্ব সংক্রান্ত লেখাপত্রে চাষীদের না-দেওয়া খাজনার অবশিষ্ট বোঝাতে ব্যবহার করা হতো।

৪০. 'আকবরনামা', পূর্বোক্ত সূত্র।

৪১. 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', ৯৬-৭, ২৪৯-৫৪।

৪২. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮২-৩।

তার গড় করে ('মহ্সূল-এ' ?) 'হর-সালা' বার করা।[৪৩] আবুল ফজল অবশ্য 'মহ্সূল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন রাজস্ব এবং উৎপন্ন দুই-ই বোঝাতে।[৪৪] পরবর্তী একটি প্রশাসনিক পুস্তিকা থেকে জানা যায় যে, 'দহ্-সালা' নামে পরিচিত কাগজপত্রে প্রতি 'মহাল'-এর এলাকার পরিসংখ্যান থাকত এবং 'হর-সালা' কাগজপত্রে যে সব এলাকার পরিমাণ দেওয়া আছে তাও করা হতো এই নথির ভিত্তিতেই।[৪৫] সুতরাং, আগে ঠিক কত আদায় করা হতো বোধহয় শুধু সেটুকু বার করার চেষ্টাই হয়নি, তদন্তের উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেক জেলার উৎপাদন-ক্ষমতা এবং এলাকা স্থির করা। দামের খবরও যেহেতু দরকার হতো, তাই মনে হয় কাজের ধরন ছিল এই : প্রথমে প্রতি বছরের জন্য বিগত দিনের স্থানীয় শস্য-হার হিসেব করে নিয়ে পরে একই সঙ্গে আরেকটি দামের তালিকা তৈরি করা যাতে করে আগের প্রতিটি বছরের নগদ রাজস্ব-হার বার করা যায়। রাজস্ব-আদায়ের খবর জোগাড়ের চেয়ে এই তথ্য সংগ্রহ ছিল নিঃসন্দেহে অনেক কঠিন। জানা গেছে যে, "২০ থেকে ২৪-তম বছরের তথ্য জোগাড় হয় বাস্তব জ্ঞান ('তহ্কীক') থেকে, আর আগের পাঁচ বছরের (১৫ থেকে ১৯-তম) ক্ষেত্রে সত্যবাদী লোকদের বক্তব্য থেকে।"[৪৬] ১৯-তম বছরে যেসব পরিবর্তন করা হয়েছিল এখানে নিশ্চয়ই তারই উল্লেখ করা হচ্ছে। ঐ বছর গোটা হিন্দুস্থান (বিহার বাদে) আবার খালিসা-র আওতায় আসে (যে ব্যবস্থায় বাদশাহী কোষাগারের জন্য সরাসরি রাজস্ব আদায় করা হয়) এবং পুরোপুরি 'জব্ৎ'-এর অধীন হয়। শোনা যায়, নতুন রাজস্ব সংগ্রাহকদের ('করোড়ী') হাতে বিশেষ করে চাষ-আবাদ বাড়ানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।[৪৭] এও অসম্ভব নয় যে, কৃষি সংক্রান্ত যেসব বিস্তারিত তথ্য তাদের সরবরাহ কবতে হতো তার সঙ্গে এই দায়িত্বও যুক্ত ছিল। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমাদের নজিরগুলো এই আভাসই দেয় যে, বিগত

৪৩. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮।

৪৪. 'মহ্সূল' শব্দটির জন্য টীকা ৩৬ দ্রষ্টব্য।

৪৫. 'হিদায়ৎ-আল কওয়াইদ', পৃ. ১০ খ, আলীগড় পাণ্ডুলিপি, পৃ. ২৭ খ-২৮ ক। মনে হয় এই পুস্তিকাটির 'দহ্-সালা' ও 'হর-সালা' কাগজপত্র এবং 'মুওয়াজানা-এ দহ্-সালা' (বা 'তকসীম-এ সনওয়াৎ') ও 'তকসীম-এ ইয়ক-সালা' একই জিনিস। বইটির মধ্যেই একবার 'তকসীম'-এর জায়গায় 'দহ্-সালা' শব্দটি আছে। 'তকসীম'-সম্বন্ধে ওপরের টীকা দ্রষ্টব্য। সেখানে দেখানো হয়েছে এটি ছিল 'মুওয়াজানা-এ দহ্-সালা'র সমার্থক। রাজস্ব এবং এলাকার মাপের নথি হিসেবে এর স্বরূপ সম্পর্কেও সেখানে আলোচনা করা হয়েছে।

'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৮-এ 'মুওয়াজনা-এ দহ্-সালা-এ নক্‌দী ও জিন্‌সী'র কথা আছে। এর থেকে দেখা যায় যে নগদ-রাজস্ব ('নক্‌দী') সংক্রান্ত তথ্য ছাড়াও উৎপন্ন ('জিন্‌সী') সম্বন্ধেও এতে কিছু খবর থাকত। এও সম্ভব যে, 'জিন্‌সী' বলতে বোঝাত বিভিন্ন শস্য চাষের এলাকা সংক্রান্ত তথ্য।

৪৬. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮।

৪৭. 'আরিফ কান্দাহারী', পৃ. ১৭৭ ; 'তবাকৎ-এ আকবরী', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০০-৩০১ ; বদাউনী ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৯।

দশ বছরের ফলনের প্রকৃত হারের গড় করে, নতুন শস্য হার বা 'রাই' তৈরি করে প্রথমে এটি সব এলাকায় চালু করা হয়।[৪৮] তারপর এর থেকে জানা দামের ভিত্তিতে গত দশ বছরের নগদ হারের গড় করে চূড়ান্ত বা স্থায়ী 'দস্তুর-আল আমল'গুলো খাড়া করা হয়। আবুল ফজল যে-অধ্যায়ে চূড়ান্ত 'দস্তুর'-এর তালিকার সূত্রপাত করলেন, কেন তিনি সেটির নাম দিলেন 'আইন-এ দহ্-সালা', দশ বছরের 'আইন,' মনে হয় এটিই তার সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা। এলাকার অঙ্কগুলোর গড় করে সেগুলোকে এই 'দস্তুর' দিয়ে গুণ করেই 'জমা-এ দহ্সালা'র অঙ্ক পাওয়া গিয়েছিল।[৪৯]

'আইন-এ দহ্সালা' অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদে দেখা যায়, কয়েকটি শস্যের চূড়ান্ত 'দস্তুর' ঠিক করার ব্যাপারে সাধারণ নিয়মের কিছুটা ব্যতিক্রম করা হতো। এই অংশটি নানানভাবে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কিন্তু পাদটীকায় উল্লিখিত কারণে নীচের অনুবাদটিই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। "ভালো জাতের (বা 'অর্থকরী') ফসলের রাজস্বও বেঁধে দেওয়া (বা-ধরে নেওয়া) হয়েছিল। যে বছরের ঐ অঙ্কটি বেশি, সে বছরটিকেই তাঁরা গ্রাহ্য করতেন। সেই অনুযায়ী সারণিতে এটি দেখানো হলো"।[৫০] ঠিক তারপরেই যে-সব 'দস্তুর'-এর সারণি আছে, শেষ বাক্যটিতে নিশ্চয়ই তার কথাই বলা হয়েছে। এই পুরো অনুচ্ছেদটিকে 'আইন'-এর একটি পূর্ববর্তী

৪৮. শেরশাহের 'রাই' প্রসঙ্গে আবুল ফজল বলেন, "এগুলো থেকে এমন নিদর্শন পাওয়া যায় না যে এখন [কোন প্রদেশে] কোন ('রাই') [আগের 'রাই'-এর তুলনায়] কম"। এ কথা বলার সময় সম্ভবত বিভিন্ন অঞ্চলে এইভাবে প্রতিষ্ঠিত শস্য-হারগুলোর কথাই তাঁর মাথায় ছিল ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৭)।

৪৯. মোরল্যাণ্ড মনে করেন, বিগত দশ বছরের প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের গড় করে 'জমা-এ দহ্সালা' তৈরি হতো, কিন্তু 'দস্তুর'গুলো সম্ভবত পূর্ববর্তী দশকে জারি-করা প্রকৃত নগদ হারের গড়। 'আইন-এ' দহ্সালা'-র মূল পাঠের তিনি যে ব্যাখ্যা করেছেন সেই অনুযায়ী আমাদের তাহলে ধরে নিতে হয় যে আবুল ফজল এখানে আশ্চর্য মাত্রায় অপ্রাসঙ্গিক ও অসংলগ্ন বক্তব্যের দোষে দোষী। মোরল্যাণ্ডের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, আবুল ফজল বারে বারে অনেক মন্দ দিকের কথা বলেন যার যুক্তিসঙ্গত সমাধান হলো স্থায়ী নগদ হার ; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, এই প্রতিকারের কথা যখন আসে আবুল ফজল তখন সে কথা ছেড়ে সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে—অর্থাৎ, 'জমা-এ দহ্সালা'য়—চলে যান ('এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', ৮৭-৮৯, ২৫১-৪)।

৫০. 'আইন', ১ম খণ্ড, ৩৪৮। কয়েকটি পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে দেখে মোরল্যাণ্ড ব্লখমানের পাঠ সংশোধন করেছিলেন এইভাবে. "ওঅ নেজ মাল-এ জিন্স্-এ কামিল ইতিবার নমূদ। সালে কি অফ্জূন বূদ বর-গিরিফ্তন্দ। চুনাঙ্কি জদওয়ল আন-রা বরগুজারদ"। ব্লখমান প্রথম তিনটি শব্দ পড়েছিলেন 'ওঅ বর সাল'। পাণ্ডুলিপিগুলির পাঠ সত্যিই কোন দিক দিয়েই এক নয়। কিন্তু সবচেয়ে ভালো পাণ্ডুলিপি থেকে মোরল্যাণ্ডের পাঠই সমর্থিত হয়। এই পাঠ Add. 6552-এর সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায়, আর মেলে বার্লিন পাণ্ডুলিপি, Hamilton 1-এর সঙ্গে, যেটি সমান পুরনো। (শেষ পাণ্ডুলিপিটি সম্বন্ধে অনুগ্রহ করে আমাকে তথ্য জোগাড় করে দিয়েছেন বি. আর. গ্রোভার)। Add. 7652 এবং এর নকল I.O. 6-এর

বক্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। সেখানে বলা হয়েছে যে নীল, পোস্ত, পান, হলুদ, শণ ইত্যাদি শস্যের জন্য কোন 'রাই' তৈরি করা হয়নি। এগুলোর জন্য

পাঠ হলো 'ওম হয় মাল-এ' ইত্যাদি। তার মানে 'মাল' শব্দটির উপস্থিতি অন্তত নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

'জিন্‌স্‌-এ কামিল' শব্দটি আবুল ফজল এবং অন্যান্য লেখকরা ব্যবহার করেছেন উঁচু মানের শস্য অর্থে ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৬ ; রসিকদাসের উদ্দেশে ফরমান, মুখবন্ধ ; Add. 6603, পৃ. ৫৭ ক)। 'ইতিবার নমুদ' বাক্যাংশটি প্রথমে খাপছাড়া দেখায়। 'বহার-এ আজম'-এর মতো অভিধানেও এর সঙ্গে তুলনীয় কোন বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ নেই। কিন্তু 'আইন'-এর অন্যত্র, ১ম খণ্ড. পৃ. ২৬-এ, ঐ ধরনের একটি বাক্যাংশ দিয়ে এর ব্যবহার সমর্থিত হয়। ঐ অংশে বলা হয়েছে যে, যদিও টাকার সঙ্গে 'দাম'-এর হার "কখনও চল্লিশ 'দাম'-এর বেশি, কখনও বা কম হয়, তবুও বেতন দেওয়ার সময় এই হারই গৃহীত হয় ('ঈন কীমৎ ইতিবার রওয়াদ')।"

জ্যারেটের অনুবাদের কথা বাদ দিলেও (এটি পুরোপুরি বদলে অবশ্যই একটি নতুন তর্জমা হওয়া দরকার) এই তিনটি বাক্যের ক্ষেত্রে আমরা মোরল্যাণ্ডের এই অনুবাদ পাই : "সারণিগুলি থেকে যেমন দেখা যায়, 'মাল-এ জিন্‌স্‌-এ কামিল' (নামে পরিচিত অঙ্কগুলো) হিসেবে ধরে, 'তারা' সবচেয়ে বেশির বছরটি নিত"। ('এগ্রেরিয়ান সিস্টেম' পৃ. ২৪৯)। 'মাল-এ জিন্‌স্‌-এ কামিল'—এই কথাগুলির তিনি ব্যাখ্যা করেছেন উঁচু জাতের ফসলের ওপর 'দাবি' অর্থাৎ সেই ফসলের ওপর প্রযুক্ত রাজস্ব-হার নয়, সেগুলোর চাষের এলাকায় ধার্য মোট রাজস্বের পরিমাণ। স্বীকার করতেই হয় যে 'মাল' শব্দটির অর্থ দুই-ই হতে পারে : রাজস্ব ও রাজস্ব-হার। কিন্তু 'অফ্‌জুন'-এর তর্জমায় 'সবচেয়ে বেশি' এবং সবচেয়ে বেশি রাজস্বের বছর বলে 'সবচেয়ে বেশির বছরে'র ব্যাখ্যা (যার জন্য নির্দিষ্ট পারিভাষিক শব্দ আছে : 'সাল-এ কামিল' বা 'সাল-এ ওয়াসিল-এ কামিল') যেন একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়। তাছাড়া আবুল ফজল এখানে যা বলেছেন তা যদি 'দস্তুর' প্রসঙ্গে না হয়ে 'জমা' প্রসঙ্গে হয়, তবে 'সারণি'র উল্লেখই অর্থহীন হয়ে পড়ে, কারণ এর পরেই যেসব সারণি আছে, সেগুলো 'জমা'-র নয়, 'দস্তুর'-এর। মোরল্যাণ্ড এর মোকাবিলা করেছেন এই ধরে নিয়ে যে, 'আইন'-এর প্রথম খসড়া তৈরি হওয়ার পর সেটি সম্পাদনার সময় মালমশলা প্রচুর ওলটপালট করা হয়েছিল : আগে এখানে 'জমা'র সারণিই ছিল, পরে সেগুলো সরিয়ে দেওয়া হয়েছে (ঐ, ২৫১-৩)। কিন্তু এ নেহাৎই হতাশার যুক্তি। "তাড়াহুড়ো করে সম্পাদনার চিহ্ন" দেখা যায় বললে 'আইন'-এর ওপর অবিচার করা হবে। এর বিষয়বস্তু খুবই সযত্নে সাজানো, আর মোরল্যাণ্ড এর ঘাড়ে যে মারাত্মক ভুলের দায় চাপাতে চান তা মোটেই হেলাফেলায় নেওয়ার ব্যাপার নয়।

সবশেষে, ডঃ কুরেশির "সবচেয়ে সহজ ও সরল ব্যাখ্যা" পাওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে ('জার্নাল অফ পাকিস্তান হিস্টরিক্যাল সোসাইটি', ১ম খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃ. ২১৫-৬)। "লেখকরা" এখানে "অযথা হোঁচট খেয়েছেন" বলে তিনি দুঃখ করেছেন। কিন্তু মোরল্যাণ্ড যে পাঠগত সমস্যা তুলেছিলেন সেটি তিনি (নীরবে) অগ্রাহ্য করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

রাজস্ব-হার সরাসরি টাকার অঙ্কেই ঠিক করা হতো।[৫১] তাছাড়া, মোটা বা পৌঁড়া আখ বোধহয় 'রাই'-এর তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।[৫২] এই সব শস্যের উৎপাদনে, মনে হয়, প্রতিবার ফসল-কাটার সময় এত তারতম্য হতো[৫৩] যে কোন কার্যকর শস্য-হার বেঁধে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাহলে আবুল ফজল বোধহয় এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, ঐ সব শস্যের স্থায়ী 'দস্তুর' ঠিক করার সময়ে স্থানীয় শস্য-হারের গড় করে তা বেঁধে দেওয়ার কোন চেষ্টাই হতো না। যে-পদ্ধতি গ্রহণ করা হতো তা এই : বিশেষ কয়েকটি ভালো মরসুম বেছে নিয়ে সেগুলোর জন্য নির্দিষ্ট রাজস্ব হার মেনে নেওয়া।

এ কথা পুরোপুরি স্পষ্ট নয় যে "১৯ বছরে"র সারণিতে ১৫ থেকে ২৪-তম বছরের যে-অঙ্কগুলো আছে তা বছর-বছর জারি-করা প্রকৃত 'দস্তুর', নাকি 'জমা-এ দহ্‌সালা'র সূত্রে পরে সেগুলো ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু এমন কয়েকটি নিদর্শন আছে যা পরের বিকল্পটির পক্ষে যায়। ১৫-তম (এবং কোথাও কোথাও ১৪-তম) বছর থেকে প্রাদেশিক ও বাৎসরিক হারগুলোর ভেতরকার ফারাক অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তালিকায় অনেক নতুন শস্যও দেখা যায়। ১৯-তম বছরে বাঁশের মাপনী চালু হওয়ায় সরকারীভাবে ধরে নেওয়া হয় যে বিঘার আয়তন শতকরা ১৫ ভাগ বেড়ে গেছে।[৫৪] কিন্তু ১৯-তম বা ২০-তম বছরে যে সেই অনুপাতে শস্য-হারও বেড়েছিল

তারপর ব্লখমানের পাঠের প্রথম দুটি শব্দকে (অর্থাৎ 'হর সাল') আগের অংশের 'হরসালা'-র সঙ্গে এক করে দেখেছেন; 'জিন্‌স্-এ কামিল'-এর অর্থ করেছেন "পুরো উৎপন্ন, দুর্বিপাকে বা শস্যহানিতে যা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি"—রাজস্ব সংক্রান্ত রচনায় এ অর্থ আগে কখনও শোনা যায়নি। সবশেষে, 'অফ্‌জ়ূন' হলো 'বাড়তি'! এই সমস্ত থেকে তিনি নীচের ব্যাখ্যাটি খাড়া করেছেন: গত দশ বছরের ফসলের মোট উৎপন্ন থেকে প্রতি বছর গড় করে 'মহ্‌সুল' বা 'মাঝারি উৎপন্ন' (তিনি শব্দটির এই অর্থই ধরেছেন) বার করা হতো। ফলে প্রত্যেকবার নতুন বছর পড়লে অন্য দিকের এক বছর—পেছন থেকে গুণলে, একাদশ বছর—বাড়তি হয়ে যেত এবং বাদ দিয়ে দেওয়া হতো। এর সমর্থনে তিনি 'ফরহঙ্গ-এ কারদানী', আলীগড় পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই পুস্তিকায় কথাগুলো বলা হয়েছে 'নসক'-এর আওতায় 'জমা' নির্ধারণ প্রসঙ্গে। আর ডঃ কুরেশির মাথায় (মনে হয়) জব্‌ৎ-এর আওতায় রাজস্ব-হারের কথা ছিল।

৫১. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৮, ৩০০।

৫২. এই তালিকায় আখকে দেখা যায় 'কন্দ-এ সিয়াহ্' নামে, যার আসলে মানে 'গুড়' ('আইন', ১ম, পৃ. ২৯৯)। 'নেশকর-এ সিয়াহ্' বা মোটা বা পৌঁড়া আখের জায়গায় ভুল করে এই নাম লেখা হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে তালিকায় সাধারণ আখের কথা থাকত না।

৫৩. কয়েকটি অর্থকরী ফসলের চড়া দামের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল উৎপাদনের অনিশ্চয়তা। এভাবে, নীল চাষের ক্ষেত্রে "অন্যান্য ফসল বা উৎপন্নের চেয়ে আকস্মিক বিপদ ও দুর্ভাগ্য হতে পারত আরও অনেক বেশি" (পেলসার্ট, পৃ. ১৩)।

৫৪. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৬-এ বলা হয়েছে যে, 'বিঘা'র পরিমাপ আগে তার প্রকৃত আয়তনের চেয়ে শতকরা ১৩ ভাগ কম ছিল। বতালা শ্রেণীর 'মদদ-এ মআশ' নথিগুলোর

তার কোন আভাস নেই।[৫৫] যদি আমরা মনে করি, ২৪-তম বছরে, যখন জমির মাপের একটি অভিন্ন একক ধরে নেওয়া হয়েছে, তখন এই সব অঙ্ক বার করা হয়েছিল, তবেই এই ঘটনা সবচেয়ে ভালভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

চূড়ান্ত 'দস্তুর'গুলো ('আইন'-এ সবিস্তারে পুনরুল্লিখিত) ১৯-বছরের হারগুলোর মতো একই ধরনের সারণি আকারে দেওয়া আছে।[৫৬] তফাতের মধ্যে সারিগুলোর মাথায় বছরের বদলে আছে 'মহাল'-সমষ্টি আর তাদের নামের তলায় শুধু একটি অঙ্ক। সুতরাং প্রতি 'মহাল'-সমষ্টি নিয়ে গঠিত নির্ধারণ-মণ্ডলে প্রতি শস্যের জন্য একটিই হার বা 'দস্তুর' থাকত। যে-'মহাল'গুলো নিয়ে এইসব নির্ধারণ-মণ্ডল তৈরি হয়েছিল 'আইন'-এ তার পুরো তালিকাই আছে।[৫৭] মোরল্যাণ্ডের অভিমত এই যে, চাষ-আবাদের অবস্থার দিক দিয়ে দেখলে, এই ধরনের প্রতিটি মণ্ডলই সাধারণত এক-একটি সমজাতীয় ভূখণ্ড।[৫৮]

আবুল ফজলের বিবরণ এবং সারণিগুলোর প্রকৃতি থেকে, সরাসরি বলা না থাকলেও, এ কথা বোঝা যায় যে, চূড়ান্ত 'দস্তুর'গুলো ছিল স্থায়ী ধরনের; চলতি বছরের উৎপাদন বা দাম যাই হোক না কেন, এগুলোই প্রতি বছর প্রয়োগ করার কথা। প্রতি বছর রাজস্ব হারকে নগদে পরিণত করার প্রসঙ্গে যে বিভ্রান্তি ও দুঃখকষ্টের অভিযোগ উঠত, এর ফলে তা দূর করা গিয়েছিল।[৫৯] অবশ্য এও সম্ভব যে কিছুকাল অন্তর 'দস্তুর'-এর অদলবদল করা হতো, আর 'আইন'-এ যেসব চূড়ান্ত 'দস্তুর' আছে, সেগুলো ঠিক ২৪-তম বছরের নয়, ৪০-তম বছরে বা সেই সময় নাগাদ অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল, তার 'দস্তুর'। চূড়ান্ত তালিকাগুলোয় পানিফল ও হলুদের 'দস্তুর' কার্যত এক। দেখা যায়, "১৯-বছরের হারে"র তুলনায় এই অঙ্কগুলো বেড়েছে। ৩১-তম বছরে 'গজ-এ ইলাহী' চালু হওয়ায় বিঘার মাপ বেড়ে যাওয়ার ফলেই এমন ঘটেছিল।[৬০] মোরল্যাণ্ড দেখিয়েছেন যে, দুটি তালিকার উপস্থাপনার

মধ্যে ১৭৫৭ এর একটি পরওয়ানায় ১৫৬৯-এর একটি অনুদান বহাল করা হয়েছে এবং এর পৃষ্ঠলেখগুলোও দেওয়া আছে। এর থেকে দেখা যায় যে " 'তনাব' (মাপার দণ্ড)-এর দরুন" অনুদানের এলাকা কমে গেছে শতকরা ১৩.০৩ ভাগ (I.O. 4438 : (55))। আরও দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট 'ক'।

৫৫. এ কথা সবচেয়ে স্পষ্ট দেখা যায় সেসব ফসলের ক্ষেত্রে, যেগুলোর হার ছিল সমান বা প্রায় সমান : যেমন, পোস্ত, তরমুজ (মধ্য এশীয় ও ভারতীয়), পেঁয়াজ, পৌড়া আখ, হলুদ, পানিফল ইত্যাদি।

৫৬. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮-৮৫।

৫৭. এর দরুনই এলিয়ট ভুল করে ভেবেছিলেন যে, 'দস্তুর' হলো 'সরকার' এবং পরগনার মধ্যবর্তী এক আঞ্চলিক একক ('মেমোয়ার্স', ২য় ভাগ, পৃ. ২০১)। তুলনীয়, মোরল্যাণ্ড, *JRAS*, ১৯১৮, পৃ. ১২, ১৩।

৫৮. 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', ৮৮।

৫৯. 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', ৮৮।

৬০. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৭-এ 'বিঘা'র বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে তার আগের মাপের শতকরা ১০.০১ ভাগ। কিন্তু বতালা শ্রেণীর 'মদদ-এ মআশ' অনুদানগুলোর (I.O. 4438 : Nos. 7,

পার্থক্যের দরুন ১৫ থেকে ২৪-তম বছরের হারের গড় করে চূড়ান্ত 'দস্তুর' তৈরি হয়েছিল কিনা তা শুধুমাত্র অঙ্কগুলো পরীক্ষা করে বার করা শক্ত।[৬১] অবশ্য কয়েকটি সহজ উপায়ে বিষয়টি পরখ করা যায়। অর্থকরী শস্যের 'দস্তুর' গড় করে ঠিক হতো না। বিঘার মাপ বেড়ে যাওয়ার জন্য ছাড় দিয়েও, মনে হয়, তার কয়েকটি 'দস্তুর' সম্ভবত দশ বছরের (১৫ থেকে ২৪-তম) প্রদত্ত হারগুলোর কোন একটিরও ভিত্তিতে করা হয়নি।[৬২] আরও কয়েকটি শস্যের ক্ষেত্রেও অন্তত বেশ কিছু চূড়ান্ত 'দস্তুর' এই দশ বছরের হারের গড় অনুযায়ী হতে পারে না।[৬৩] চূড়ান্ত 'দস্তুর'

25 & 55) এবং Allahabad 879 এবং 1177-এ নতুন গজ চালু হওয়ার ফলে পুরনো অনুদানের হ্রাস হিসেব করা হয়েছে শতকরা ১০.৫ ভাগ। এর থেকে দাঁড়ায় এই যে ঐ এককের পরিমাণ বেড়েছিল প্রায় শতকরা ১১.৭ ভাগ (দ্র. পরিশিষ্ট 'ক')। ১৯-তম বছরের হারে পানিফল এবং হলুদের হার সমান, ১০০ 'দাম'। কিন্তু কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া চূড়ান্ত 'দস্তুর'গুলোতে ঐ অঙ্ক বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১১ 'দাম', ২০ 'জিতল'। বিন্দু চিহ্ন বসানোর ভুলে এই অঙ্কটিকে কখনও ১১১ 'দাম' ৮ 'জিতল' বা ১১৫ 'দাম' ৮ 'জিতল' বা ১১৫ 'দাম' ২০ 'জিতল' পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

৬১. 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', ৮৯।

৬২. ১৫ থেকে ২৪ বছর পর্যন্ত অযোধ্যা, লাহোর এবং মুলতানে পৌঁড়া বা মোটা আখের হার ছিল বিশ হেরফেরে ২০০ 'দাম'। তবু চূড়ান্ত 'দস্তুর'গুলোতে এই হার ওঠানামা করেছে: অযোধ্যায় ২৩০ 'দাম' ৮ 'জিতল' থেকে ২৪০ 'দাম' ৯ 'জিতল', লাহোরে ১৮০ 'দাম' ১২½ 'জিতল' (একটি 'দস্তুর'-এ) থেকে ২৪০ 'দাম', ১২ 'জিতল' (ছটি 'দস্তুর'-এ, তার মধ্যে একটিতে ২৪০ 'দাম' ১২½ 'জিতল')। মুলতানেও অঙ্কটি হলো ২৪০ দাম ১২½ জি. (দুটি 'দস্তুর'-এ)। লাহোর এবং মুলতানের দশ বছরের হারগুলোতে নীলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অঙ্ক হলো ১৩৬ 'দাম'। কিন্তু, এই দুটি প্রদেশের স্থায়ী 'দস্তুর' বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ১৫৮ 'দাম' ১৯ 'জিতল' এবং ১৫৯ 'দাম' ২২ 'জিতল'।

৬৩. যে-পরীক্ষা করা হয়েছে তার ভিত্তি হলো এই ধারণা যে চূড়ান্ত 'দস্তুর'গুলো যদি ১৫-তম থেকে ২৪-তম বছরের হারগুলোর গড় করে তৈরি হয়ে থাকে তাহলে তার কোনটিই সেই প্রদেশের সর্বোচ্চ বার্ষিক হারগুলোর গড়ের চেয়ে বেশি বা সর্বনিম্ন হারগুলোর চেয়ে কম হবে না (বিঘার মাপের পরিবর্তনের ফলে শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধির জন্য ছাড় দেওয়ার পরেও)। নীচের দুটি তালিকা থেকেই সম্ভবত ব্যাপারটা বোঝা যাবে:

সারণি ১

প্রদেশ	ফসল	'ক' সর্বোচ্চ হারগুলোর গড়	'খ' চূড়ান্ত 'দস্তুর'গুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ	'খ' : 'ক'
এলাহাবাদ	কাবুলী ছোলা	৫৬.৪০ 'দাম'	৭১ 'দাম' ১৪ জি. (৫ দস্তুর)	১২৬%
ঐ	কুসুমফুল	৭০.০০ 'দাম'	৮৩ 'দাম' ২১ জি. (৪ ,,)	১১৯.৬%
ঐ	রেপসিড	৪৭.০০ 'দাম'	১০১ 'দাম' (১ ,,)	২১৫%
অযোধ্যা	মসুর ('অদস-মসুর')	২২.৭০ 'দাম'	৩৫ 'দাম' ২০ জি. (১ ,,)	১৫৬%
ঐ	মটর	২৭.৩৫ 'দাম'	৩৮ 'দাম' (১ ,,)	১৩৫%
দিল্লী	যোয়ান	৭১.২০ 'দাম'	৮৯ 'দাম' ১৫ জি. (১ ,,)	১২২%
			৮৯ 'দাম' ১২ জি. (১ ,,)	

তৈরি হয়েছিল আগের এই বছরগুলির পূর্বব্যাপী গড় করে—এই মত যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে এই নেতিবাচক ফলাফলের দুটি মাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে। এমন হতে পারে যে, আগে যা বলা হলো তা সত্ত্বেও, 'আইন'-এর ১৫-থেকে ২৪-তম বছরের হারগুলি আদৌ পূর্বব্যাপী হার নয়, প্রকৃত ধার্য হার ; বা, যা আরও সম্ভাব্য বলে মনে হয়, স্থায়ী হারগুলি প্রাথমিকভাবে স্থির করার পর ষোলো বছর ধরে 'দস্তুর'গুলিতে যথেষ্ট অদলবদল করা হয়েছিল। স্থায়ী 'দস্তুর' চাপানোর অর্থই হলো, কোন বছরের ফলনের ভালোমন্দের সঙ্গে রাজস্ব হারের কোন সম্পর্ক থাকত না। ফসল নষ্ট হয়ে গেলে হার কমিয়ে ছাড় দেওয়া হতো না, 'নাবুদ' (আক্ষরিক অর্থে 'নষ্ট') নাম দিয়ে জরিপ-করা এলাকার পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হতো।[৬৪] অবশ্য হঠাৎ দাম পড়ে যাওয়ার দরুন অনিশ্চিত পরিস্থিতি দেখা দিলে তার মোকাবিলা করার কোন ব্যবস্থা ছিল না, আর খুব বেশি ফলন হলে দরবার থেকে বিশেষ মকুবের আদেশ দিতে হতো।[৬৫] অন্যদিকে এমন একটি নজিরও আছে যখন দাম বেড়েছে বলে সেই অনুযায়ী রাজস্ব দাবিও বাড়ানো হয়েছে।[৬৬]

সারণি ২

প্রদেশ	ফসল	'ক' সর্বোচ্চ হারগুলোর গড়	'খ' ক × ১১/১০০	'গ' চূড়ান্ত 'দস্তুর'গুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন
এলাহাবাদ	চানা ('অরজন') (রবি)	১৫.২০ 'দাম'	১৬.৮৭ 'দাম'	১৫ 'দাম' ১৯ জি. (১ দস্তুর)
অযোধ্যা	ঐ	১৫.১০ 'দাম'	১৬.৭৬ 'দাম'	৭ 'দাম' ২২ জি. (১ দস্তুর) ১৫ 'দাম' ৩ জি. (১ দস্তুর)

ব্লখমানের সংস্করণের সঙ্গে দুটি পাণ্ডুলিপি (Add, 7652 এবং 6552) মিলিয়ে অঙ্কগুলো নেওয়া হয়েছে। সন্দেহজনক অঙ্কগুলো অগ্রাহ্য করা হয়েছে। কাবুলী চানা এবং যোয়ান ছাড়া অন্য সমস্ত ফসলই শের শাহের 'রাই'-এ তালিকাভুক্ত আছে।

৬৪. জরিপ হয়ে যাওয়ার পর শস্যহানির খবর পাওয়া গেলে রাজস্ব কর্মচারীদের কাজ ছিল মাঠের শস্য পরিদর্শন করে 'নাবুদ' ঠিক করা। ফসল কাটার পর শস্যহানির খবর এলে প্রতিবেশীদের সাক্ষ্য এবং 'পাটোয়ারী'র কাগজপত্রের ভিত্তিতে এলাকা কমানো হতো ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৬-৮)। ২৭-তম বছরের সুপারিশে তোডর মল 'নাবুদ' বাবদে সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য হার বেঁধে দিয়েছিলেন : প্রচুর বৃষ্টিপাতের মরসুমে উর্বর অঞ্চলে বিঘা পিছু ২½ বিঘা (বা জরিপ করা এলাকার শতকরা ১২½ ভাগ), জঙ্গল ও মরু জমির ক্ষেত্রে ৩ বিঘা' বা শতকরা ১৫ ভাগ ('আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮২ ; সুপারিশের মূলপাঠের জন্য Add. 27, 247, পৃ. ৩৩২ ক দ্রষ্টব্য)।

৬৫. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৩, ৪১৪, ৫৩৩-৪, ৫৭৭-৮। এগুলো খাড়া করা হয়েছিল ৩০-তম, ৩১-তম, ৩৩-তম এবং ৩৫-তম বছরে এবং প্রযোজ্য ছিল এলাহাবাদ, অযোধ্যা, আগ্রা ও দিল্লী প্রদেশে। ছাড়ের পরিমাণ মোট রাজস্ব দাবির ১/৪ ভাগ থেকে ১/২০ ভাগ-এর মধ্যে থাকত।

৬৬. আকবর যখন লাহোরে তাঁর দরবার নিয়ে যান তখন দরবারের উপস্থিতির দরুন মূল্যস্তর

১৭ শতকে মূলত একই ধারায় 'জব্‌ৎ' ব্যবস্থায় কাজ চলতে থাকে। যেমন, ১৬৭৯-এ লেখা একটি পুস্তিকায় 'জব্‌ৎ'-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এই বলে যে, এটি এমন এক নির্ধারণ পদ্ধতি যাতে প্রতিবার ফসল তোলার সময় এলাকা জরিপ করা হয় আর তারপর 'জমা' বার করার জন্য 'দস্তুর-আল-আমল' ব্যবহার করা হয়।[৬৭] এই পুস্তিকা এবং সমসাময়িক অন্যান্য কয়েকটি পুস্তিকায় রক্ষিত রাজস্ব নির্ধারণের কাগজপত্রের নমুনাগুলো আরও তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে আমরা প্রথমে পাই 'খসড়া-এ জব্‌ৎ', যে-কাগজে জরিপের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া আছে।[৬৮] এতে ছটি স্তম্ভ আছে : (১) 'অসামী', যাতে কৃষকের নাম ও তার শস্য নির্দিষ্ট করা থাকে ; আর দুটিতে, (২) তার জমির প্রস্থ ও (৩) দৈর্ঘ্য দেওয়া হয়, (৪) 'অরাজী' বা মাপ, (৫) 'নাবুদ', (৬) 'বাকী, 'অরাজী' থেকে 'নাবুদ' বাদ দিয়ে যে এলাকা পড়ে থাকে। সব বাদ দেওয়ার পর এলাকার অঙ্ক (প্রতি ফসলের জন্যে আলাদা করে) অন্য একটি নথিতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তারপর বিঘা পিছু প্রতি শস্যের নগদ হার ব্যবহার করে মোট নির্ধারিত রাজস্ব ('জমা') বার করা হয়েছে।[৬৯]

বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখার জন্য পাঞ্জাবের রাজস্ব দাবি বাড়িয়ে 'দশ থেকে বারো' করা হয়েছিল। ৪৩-তম বছরে আকবর যখন লাহোর ছেড়ে চলে আসেন তখন এই বৃদ্ধি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় ('আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৪৭)।

৬৭. 'করহন্স-এ কারদানী', পৃ. ৩২ খ, Edinburgh 83, পৃ. ৩৪ খ।
"জব্‌তী" ব্যবস্থার আওতায় রাজস্ব ('আমল') আদায়ের ক্ষেত্রে 'সফেদ-বারী' (শরৎ) এবং 'সবজ্‌-বারী' (বসন্তের ফলন) শস্যের উপর 'দস্তুর' প্রয়োগের জন্য আরও দ্রষ্টব্য 'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী', পৃ. ১৩-১৪।

৬৮. তুলনীয় 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ ২৮৮ : "... 'জব্‌ৎ' এর নথি ('মুসখা-এ জব্‌ৎ'), হিন্দীতে যাকে 'খসড়া' বলে"।

৬৯. 'দস্তুর-এ আমল-এ নভিসিন্দগী', পৃ. ১৮২ ক-১৮৫ ক, 'করহন্স-এ কারদানী', পৃ ৩৩ খ, 'সিয়াকনামা', ৩২-৩৪, 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৫ ক-৭৬ খ, Or. 2026. পৃ. ২৪ খ-২৮ ক। 'করহন্স-এ কারদানী' এবং 'সিয়াকনামা'র খসড়াগুলোর নমুনায় সাতটি করে স্তম্ভ আছে। প্রথমটিতে ('অসামী') শুধু চাষীদের নাম থাকে, শস্য নির্দিষ্ট করা আছে সপ্তমটিতে ('জিন্‌স্‌')। 'দস্তুর-আল আমল-এ নভিসিন্দগী' শাহ্‌জাহানের আমলের বই, সম্ভবত সম্ভল 'সরকার'-এ বসে লেখা। 'জব্‌ৎ'-এর আওতায় সেখানে তিনটি শস্য দেখানো হয়েছে: তামাক, আখ এবং বেগুন। 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৬-তে দেখা যায়, আগে অন্য কোন ব্যবস্থার অধীনে জমিতে বোনা হলেও, উঁচু মানের শস্য বা অর্থকরী ফসলের বেলায় 'জব্‌ৎ' নির্ধারণ করা যেত। 'আইন'-এ বলা হয়েছে যে, আগে ভাগচাষের আওতায় ছিল এমন জমিতে যদি উঁচু মানের শস্য বোনা হয় তবে প্রথম বছর রাজস্ব ধার্য হবে স্বাভাবিক 'দস্তুর'-এর চেয়ে একের-চার ভাগ কম হারে।

'জব্‌তী' খাজনার দেখা পাওয়া যায় পাঞ্জাব, উচ্চ দোআব ও রোহিলাখণ্ডে। মুঘল 'জব্‌ৎ' ব্যবস্থার একমাত্র চিহ্ন হিসেবে এই সব খাজনাই টিঁকে আছে। কৌতূহলের ব্যাপার এই যে, এগুলোকে বলা হয়েছে প্রধানত অর্থকরী ফসলের ওপর এলাকার মাপ অনুযায়ী চাপানো নগদ

প্রশাসনিক দিক দিয়ে দেখলে, 'জব্‌ৎ'-এর অবশ্যই কিছু সুবিধা ছিল। পরিমাপ-গুলি সবসময়ই আবার পরখ করা যেত, আর স্থানীয় কর্মচারীরা যেসব এখতিয়ার অন্যথায় অপব্যবহার করতে পারত বাঁধা 'দস্তুর' থাকায় তারা সেগুলির থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। স্থায়ী 'দস্তুর' জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বার্ষিক দাবি ধার্য করার অনিশ্চয়তা এবং তার ওঠা-নামা অনেকটা দূর করা গিয়েছিল। আবার এই ব্যবস্থাও একেবারে ত্রুটিহীন ছিল না। যেখানে মাটির ধরন ঠিক সমজাতীয় নয়, সেখানে সম্ভবত এই ব্যবস্থা সহজে প্রয়োগ করা যেত না। আবার, এই ব্যবস্থায় যেহেতু চাষীকেই কার্যত সব ঝুঁকি বইতে হতো, তাই যেখানে ফসল খুবই অনিশ্চিত সেখানেও এই ব্যবস্থা চলত না।[৭০] তাছাড়া এই ব্যবস্থায় কোন মতেই আর্থিক সাশ্রয় হতো না। জরিপের লোকজনের খরচ চালানোর জন্য 'জাবিতানা' নামে বিঘা পিছু এক 'দাম' উপকর নেওয়া হতো।[৭১] এ ছাড়াও এই ব্যবস্থার ব্যবহারিক প্রয়োগে আরও বড় অনেক ফাঁক ছিল। জমির মাপ নথিভুক্ত করার সময়ে খুব জোচ্চুরি চলত।[৭২] বলা

খাজনা, যদিও পশুখাদ্য এবং রোজকার রোজ অন্যান্য যেসব ফসল জোগাড় করা হয় সেগুলোও এর আওতায় পড়ত। (প্রিন্সেপ, 'হিস্ট্রি অফ দা পাঞ্জাব', ১ম খণ্ড, লণ্ডন, ১৮৪৬, পৃ. ১৬৭; 'মিরাট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার', ১৯২২, পৃ. ১০৯; 'শাহারাণপুর ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার', ১৯২১, পৃ. ১৩২; *JRAS*. ১৯১৮, পৃ. ২৬; এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', ১৬৯ টীকা)।

৭০. কান্দাহার সংক্রান্ত অধ্যায়ে আবুল ফজল যখন বলেন যে, "চাষীদের যদি 'জব্‌ৎ' বইবার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে রাজস্ব হিসেবে ফসলের একের-তিন ভাগ নেওয়ার রীতিই ('সিহ্‌ তোড়া আমল') অনুসরণ করা হয়" ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮৭), তখন তিনি এ কথাই নিঃশব্দে স্বীকার করে নেন।

৭১. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ ৩০০-৩০১-এ বলা হয়েছে, জরিপের দল আগে 'জবিতানা' হিসেবে রোজ ৫৮ 'দাম' করে পেত (কোষাগার থেকে না গ্রাম থেকে?)। একেই বিঘা পিছু এক 'দাম' করে উপকরে পরিণত করা হয়। তোডর মলের নিয়মাবলীতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে জরিপ কর্মচারীদের দৈনিক ভাতা নগদে ও জিনিসে এই উপকর থেকেই দিতে হবে ('আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৩)। 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৬-তে জরিপ কর্মচারীদের ভাতা-ক্রমের সংশোধিত রূপ পাওয়া যায়। তোডর মলের নিয়মাবলীতে বলা আছে কর্মীদের রোজ ন্যূনতম কতটা এলাকা জরিপ করতে হবে। 'আকবরনামা'র পাঠে অবশ্য ফসল তোলার সময়ের নাম পাল্টাপাল্টি হয়ে গেছে। 'আইন', ১ম খণ্ড, ৩০১-এ সঠিক পাঠ পাওয়া যায়: খরিফ মরসুমে জরিপ করতে হবে ২৫০ বিঘা যখন দিন বড়, আর রবি মরসুমে ২০০ বিঘা যখন দিন ছোট। দুর্ভাগ্যবশত তোডর মলের সুপারিশগুলোর মূল রূপে এই অংশের পাঠে (Add. 27,247, পৃ. ৩৩২ খ) প্রচুর ভুলত্রুটি আছে।

৭২. জনৈক জাগীরদারের রাজস্ব কর্মচারীর পীড়ন সম্পর্কে মুকুন্দরামের উল্লেখ তুলনীয়। "মাপে কোণে দিয়া দড়া/পনর কাঠায় কুড়া [=বিঘা] (২০ কাঠায় নয়)/নাহি শুনে প্রজার গোহারি [=আবেদন]"। (সুকুমার সেন, 'হিস্ট্রি অফ বেঙ্গলি লিটরেচর', ১৯৬০, পৃ. ১২৪ (মূল উদ্ধৃতির জন্য দ্রষ্টব্য পৃ. ৩৯৩)। আরও দ্রষ্টব্য তপন রায়চৌধুরী, 'বেঙ্গল আণ্ডার আকবর অ্যাণ্ড জাহাঙ্গীর', পৃ. ২৫)।

হয়েছে, আকবরের রাজত্বের ১৩-তম বছরের আগে 'জব্‌ৎ-এ হরসালা' বা বার্ষিক জরিপ করতে খালিসা-য় "বিশাল খরচ পড়ত এবং লোকে টাকা মেরে দিত।"[৭৩] ১৯-তম বছরের তথাকথিত 'করোড়ী পরীক্ষা'র এক প্রধান দিক ছিল হিন্দুস্তানের সমস্ত প্রদেশকে জরিপের আওতায় আনা। শণের দড়িতে অনেক জোচ্চুরি করা যেত। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তার জায়গায় আরও নির্ভুল লোহার আংটা লাগানো বাঁশের দণ্ড ব্যবহার করা হয়।[৭৪] তা সত্ত্বেও, বদাউনী যেমন বলেছেন,[৭৫] করোড়ীরা চাষীদের উপর অত্যন্ত পীড়াদায়ক অত্যাচার করত, আর ঐরকম বিরাট অঞ্চলে হঠাৎ জরিপ চাপিয়ে দেওয়ার সঙ্গে এই নিপীড়নের যোগাযোগ খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। ক্ষুদে কর্মচারীদের কোন জরিপ দল যখন গ্রামে হাজির হয়ে উপরি দাবি করত আর ঠিক কিংবা ভুল তালিকাভুক্তির জন্য জুলুম করে টাকা আদায় করত, তখন কত গ্রাম যে উদ্‌বেগে কেঁপে উঠত তা বেশ ভালোই অনুমান করা যায়।

'নসক' নামে পরিচিত নির্ধারণ ব্যবস্থার যথার্থ স্বরূপকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে। আবুল ফজল অনেক জায়গায় এর কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু কোথাও সংজ্ঞা দেননি। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, শব্দটির ব্যাখ্যার সংখ্যা সম্ভবত এর মোট উল্লেখকেও ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু এই তালিকা যতই লম্বা হোক না কেন, কোন ব্যাখ্যাই যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না।[৭৬] আজ পর্যন্ত বিভিন্ন তত্ত্বের সমর্থনে যত ধরনের

৭৩. 'আকবরনামা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৩।

৭৪. ঐ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৭-১৮ : 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৬। শনের দড়ি ভিজে গেলে গুটিয়ে যেত আর শুকনো থাকলে লম্বায় বেড়ে যেত। তাই কর্মচারীরা যে-কোন "ছুতোয়" দড়িটা ভিজে রাখত। বদাউনী (২য় খণ্ড, পৃ ১৮৯) একটি ছড়া উদ্ধৃত করেছেন : "যে ঠকেছে তার হুঁশিয়ারি-ভরা নজরে জরিপের দড়ির চেয়ে দু-মুখো সাপও ভালো।"

৭৫. বদাউনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৭।

৭৬. গত একশ বছরে বা তার কাছাকাছি 'নসক' সম্বন্ধে যা যা বলা হয়েছে সংক্ষেপে (হয়তো পূর্ণাঙ্গ নয়) তা এইরকম : ১৮৫১-য় 'আইন' বিষয়ে মন্তব্য প্রসঙ্গে নজফ আলী খান এর অর্থ করেছিলেন ইজারা ('শরহ্-এ আইন-এ আকবরী', Or. 1667, পৃ. ১৭৭ ক-১৭৮ ক, ১৯৩ ক-খ)। ব্লখমান এর তর্জমা করেছিলেন : একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে 'আদায়কারী ও রাইয়ত ভূমি-কর স্থির করে' (*JASB*, খণ্ড ৪২ (১৮৭৩), পৃ. ২১৯ টীকা)। ইউসুফ আলীর সহযোগিতায় লিখতে বসে মোরল্যাণ্ড স্বীকার করেছিলেন যে শব্দটির সন্তোষজনক সংজ্ঞা তিনি দিতে পারবেন না, কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিল 'সাধারণত এটি ছিল জমিনদারী ব্যবস্থা, রাইয়তওয়ারী নয়' (*JRAS*, ১৯১৮, পৃ. ২৯-৩০)। পরে তিনি 'নসক'-এর অর্থ ধরেন 'গ্রাম বা কোন বড় এলাকাকে একক ধরে তার সংক্ষিপ্ত নির্ধারণ' (*JRAS*, ১৯২৬, পৃ. ৪৭), তিনি যাকে 'সমূহ নির্ধারণ' বলতেন শেষ পর্যন্ত 'নসক'কে তিনি তারই সমার্থক বলে ধরে নেন ('এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', ২৩৪-৩৭)। ডঃ আর. পি. ত্রিপাঠী 'সংক্ষিপ্ত নির্ধারণ' এই তর্জমায় সন্তুষ্ট হননি, কিন্তু 'নসক' যে আসলে কী সে কথা বলার ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতা স্বীকার করেছেন ('সাম আসপেক্টস অফ মুস্লিম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন', ৩৫৭-৬০)। এস. আর.

যুক্তি হাজির করা হয়েছে তার আলোচনা ক্লান্তিকর হতে পারে। তার চেয়ে সরাসরি আবুল ফজলের সাক্ষ্যপ্রমাণে চলে যাওয়াটাই সবচেয়ে ভালো বলে মনে হয়।

'নসক' সম্বন্ধে আবুল ফজলের সমস্ত উল্লেখ জড়ো করলে প্রথমেই যে-ব্যাপারটি নজরে পড়ে, তা এই : বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 'নসক'কে রাজস্ব নির্ধারণের কোন স্বতন্ত্র পদ্ধতি বলে গণ্য করা হয়নি। একে বরং অন্য সব পদ্ধতির সহায়ক হিসেবেই দেখা হয়েছে। যেমন, হিন্দুস্তানে 'নসক'কে 'জব্ৎ'-এরই আওতাভুক্ত মনে হয়, আবার কাশ্মীরে যেন এটি ভাগচাষের আওতায় পড়ে। সুতরাং, আশা করা যায় যে রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের মূল পদ্ধতি যাই হোক না কেন, এই ব্যবস্থা বা পদ্ধতিও গ্রহণ করা যেত।

'জব্ৎ' এলাকায় প্রয়োগ করা হলে 'নসক' শব্দের তাৎপর্য কী দাঁড়াত—মনে হয় এখন আমরা বেশ ভালোভাবেই তা বিচার করতে পারি। শব্দটির সর্বপ্রথম উল্লেখে, অর্থাৎ আকবরের আমলের ১৩-তম বছরে, বলা হয়েছে, শিহাবুদ্দীন খান খালিসা জমিতে " 'জব্ৎ-এ হরসালা' রদ করে এক 'নসক' ('নসকে') (-এর পদ্ধতি বা রূপ) চালু করেছিলেন।"[৭৭] লক্ষণীয় এই যে, 'নসক' যে-রূপে জারি করা হয়েছিল, সেটি ঠিক 'জব্ৎ'-এর জায়গায় আসেনি, এসেছিল শুধু "বার্ষিক 'জব্ৎ' "-এর জায়গায়। 'জব্ৎ'-এর মধ্যে ছিল দুটো জিনিস : নগদে বাঁধা রাজস্ব হার আর জমি-জরিপ আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে ২৪-তম বছর অবধি প্রতি বছর রাজস্ব হার বেঁধে দেওয়া হতো। সুতরাং ১৩-তম বছরে যার জায়গায় 'নসক' চালু করা হয়েছিল তা হলো বার্ষিক জরিপ। মনে রাখতে হবে যে, 'জব্ৎ'-এর প্রকৃত পারিভাষিক অর্থ ছিল জমি-জরিপ, এবং 'মদদ-এ মআশ' নথিতে 'জব্ৎ-এ হরসালা' শব্দটি আসলে ব্যবহার করা হয়েছে বাৎসরিক জমি-জরিপ বোঝাতে।[৭৮] ১৩-তম বছরে শিহাবুদ্দীন খান যা করেছিলেন বলে ধরা হয়, তোডর মল আবার তা-ই সুপারিশ করেছেন ২৭-তম বছরে। তিনি বলেছেন, এ কথা জানাই আছে যে খালিসা পরগনাগুলিতে (নথিভুক্ত) এলাকা ('অরাজী') প্রতি বছর কমে যায়। সুতরাং, আবাদী জমি একবার জরিপ হয়ে গেলে, বছর-বছর এটি (এলাকা) বাড়িয়ে আংশিক 'নসক' ('নসক-এ জুজব') প্রবর্তন করতে হবে।[৭৯] এখানে পরিষ্কার করেই বোঝানো হয়েছে যে, যদিও বার্ষিক জরিপের জায়গাতেই 'নসক' চালু করা হয়, তবু

শর্মা প্রস্তাব করেছেন, 'নসক' ছিল আগের দাবির গড় করে রাজস্ব নির্ধারণের একটি পদ্ধতি ('ইন্ডিয়ান কালচার', ৩য় খণ্ড, ৪৩-৫)। শেষত ডঃ পি. শরণ একে 'কনকূত'-এর সঙ্গে অভিন্ন হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন ('প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট...', ৩০১-৯, ৪৫৩-৭)।

৭৭. 'আকবরনামা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৩।

৭৮. রাজস্ব-কর্মচারীদের প্রতি প্রামাণ্য নিষেধাজ্ঞায় এই শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে : "মঞ্জুরির এলাকা একবার ঠিক হয়ে গেলে 'জব্ৎ-এ হর-সালা' নিয়ে জোর করা চলবে না" ('জব্ৎ-এ হর-সালা বাদ অজ তশখীস-এ চক' ইত্যাদি)। (রাজত্বের ৮ম বছরে জাহাঙ্গীরের ফরমান, I.O. 4438 : 3 ; আরও দ্রষ্টব্য I.O. 4435)।

৭৯. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮১-২। তোডর মলের সুপারিশগুলোর মূল পাঠের এই অংশটি (Add. 27, 247, পৃ. ৩৩১ খ) অর্থের দিক দিয়ে কার্যত একই, শুধু 'নসক-এ জুজ্ভ্'-এর জায়গায় আছে 'নসক'।

রাজস্ব নির্ধারণের কাজে আগের যে-কোন বছরের জরিপ-করা এলাকার নথিপত্র ব্যবহার করা হচ্ছিল। 'আইন'-এ এর যে শেষ পরিণতির কথা আছে সেটিও তেমন আলাদা কিছু নয়। রাজস্ব-সংগ্রাহককে "জরিপ করার সময়ে দূরদৃষ্টি ও ন্যায়বিচারের কথা খেয়াল রাখতে হবে। সব জায়গাতেই সে যেন কৃষকের ক্ষমতা ('নীরূ') বাড়ায় আর কড়ার ('করার-দাদ') মেনে নিয়ে বাড়তি চাষ করা (এলাকা) ('ফুজুন-কাস্তা') থেকে সে যেন কিছুই দাবি না করে।[৮০] কেউ যদি জরিপ ('পাইমাইশ') পছন্দ করে, আর অন্যরা পছন্দ করে 'নসক', তবে সে যেন তা-ই মেনে নেয়"।[৮১] একটিমাত্র উপায়েই এই অংশটুকুর ব্যাখ্যা করা যায় : রাজস্ব কর্মচারীকে আগের নির্দিষ্ট এলাকা মেনে নিতে হবে আর সম্ভবত তা বাড়াতে হবে মোটামুটি একটা হিসেব করে। যদি কোন চাষী তা মেনে না নিয়ে নতুন করে জরিপ দাবি করে, তবে রাজস্ব কর্মচারীকে তা-ই মেনে নিতে হবে ; কিন্তু অন্যথায় 'নসক'-ই ব্যবহার করা হবে। অন্যভাবে বললে, 'নসক' শব্দটিকে এইসব উদ্ধৃতাংশে 'জব্‌ৎ' এলাকার বার্ষিক জরিপের বিকল্প হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় যে পরবর্তী বছরগুলিতে রাজস্ব নির্ধারণের জন্য প্রকৃত জরিপ মারফৎ আগেকার নির্ধারিত মাপের অঙ্কই ব্যবহার করা হতো।

মাপের অঙ্কের পুনরাবৃত্তির সঙ্গে 'নসক'-এর এই যোগাযোগ থেকেই 'নুসখা-এ নসক', বা 'নসক-এর নথি' শব্দটি ব্যবহারের সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। এর নির্ভুল অর্থ হলো এলাকা সংক্রান্ত নথি যার থেকে 'নাবুদ', বা ফসল নষ্ট হওয়ার দরুন ছাড়-দেওয়া এলাকা, বাদ দিতে হবে।[৮২] 'আইন'-এর ঐ একই অধ্যায়ে 'নসক'-এর আরও একটি উল্লেখ আছে। এটি হলো 'আমলগুজার'-দের প্রতি একটি নিষেধাজ্ঞা, যাতে তাদের "গ্রামের হোমরা-চোমরা লোকদের সঙ্গে 'নসক' করতে" বারণ করা হয়েছে।[৮৩] 'নসক' বলতে একযোগে কয়েকজনের রাজস্ব-নির্ধারণ বোঝানো তো দূরের কথা, এর থেকে বরং প্রমাণিত হয় যে 'নসক' আদৌ তা নয়। 'জব্‌ৎ' এলাকার 'নসক' সম্বন্ধে পাওয়া অন্যান্য তথ্যের আলোয় দেখলে এই নিষেধাজ্ঞার সুনির্দিষ্ট অর্থ মনে হয় এই যে, রাজস্ব-কর্মচারীরা, গ্রামের মাথাদের সঙ্গে দরাদরি করে প্রমাণ মাপের অঙ্কগুলি বদলে দিতে কিংবা বাড়িয়ে নিতে পারবে না।

'জব্‌ৎ' এলাকার 'নসক' বলতে অবশ্য বোঝাত 'নসক'-এর নানান রূপের একটি, তাই আবুল ফজল একে বলতে পারেন 'নসকে', 'এক (ধরনের) নসক', এবং

৮০. এও বলা যেতে পারে যে বীজ বোনা ও ফসল কাটার মধ্যবর্তী সময়ে প্রকৃত জরিপ করা হলে "বাড়তি চাষ করা" কোন এলাকা থাকার কথা নয়। যে-এলাকার রাজস্ব নির্ধারণ করা হবে তা যদি আগের জরিপের ভিত্তিতে কাগজে-কলমে ঠিক করা হয়ে থাকে, একমাত্র তখনই ঐ ধরনের বাড়তির ঘটনা দেখা দিতে পারে।

৮১. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫।

৮২. "দরবারে 'নুসখা-এ নসক' পাঠানোর পর চাষবাসের ক্ষেত্রে যদি কোন দুর্বিপাক ঘটে, সে যেন সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে তদন্ত করে ও 'নাবুদ'-এর হিসেব তৈরি করে।" ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৬-৭)।

৮৩. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৬।

'নসক-এ জুজ্‌ব', 'আংশিক নসক'। গুজরাটে সম্ভবত ঐ ধরনের একটি 'নসক' চালু ছিল, যদিও গুজরাট ঠিক 'জব্‌তী' প্রদেশ ছিল না। 'আইন'-এ বলা হয়েছে, এখানে ছিল "অধিকাংশই 'নসকী' ('নসক'-এর আওতায়)", 'জরিপ' প্রায় হতো না বললেই চলে।[৮৪] পরের অংশে আমরা দেখব, যে-জরিপের জায়গায় এটি ব্যবহার হয়েছে তা আসলে বার্ষিক জরিপ। গুজরাটে শুধুমাত্র এই বার্ষিক জরিপের ব্যবহার দুর্লভ বলা চলে। অবশ্য রাজস্ব নির্ধারণের জন্য এলাকার পরিসংখ্যানের বিষয়ে এ কথা খাটে না।

কিন্তু বেরার, বাংলা এবং কাশ্মীরে 'নসক' নিশ্চয়ই ছিল একেবারেই অন্য রূপে। বলা হযেছে, বেরারে "নসকী" ছিল প্রাচীন কাল কাল থেকেই;[৮৫] তাই 'নসক' শব্দটির প্রয়োগে এমন এক ব্যবস্থা বোঝায় যার গায়ে মুঘল উদ্ভাবনের ছোঁয়া লাগে নি। সাদিক খানের বর্ণনায় পাওয়া যায় মুবল দখিনে ভূমিরাজস্ব চাপানোর রীতি অনুসৃত হয়ে আসছে অনেক দিন ধরে। অবশ্য বেরারে প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে এটি হুবহু মেলে। এই ব্যবস্থায়, আবাদী জমি বা প্রকৃত ফলনকে হিসেবে না ধরে, কোন গ্রামের লাঙলের সংখ্যার ওপর লাঙল পিছু চিরাচরিত হার প্রয়োগ করা হতো।[৮৬] বাংলায় ভাগচাষ ছিল না, জরিপও হতো কালেভদ্রে। সেখানে রাজস্ব দাবির ভিত্তি ছিল 'নসক'।[৮৭] বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থার প্রকৃতি নিয়ে আমরা আগেই অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছি যে, জমিনদারদের ধার্য রাজস্বের ('জমা') একটা আধা-স্থায়ী ভিত্তি ছিল, যদিও মাঝে মধ্যে খেয়াল খুশি-মতো তা বাড়ানো যেত।[৮৮] কিন্তু কাশ্মীরের বেলায় আবুল ফজল নিজেই একটি বিশেষ (রূপের) 'নসক'-এর কার্যপদ্ধতির সবচেয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। প্রদেশটিকে বলা হয়েছে 'নসকী-এ গল্লা-বখ্‌শ্‌' অর্থাৎ ভাগচাষের 'নসক'-এর আওতায়।[৮৯] এই

৮৪. ঐ, পৃ. ৪৮৫।

৮৫. ঐ, পৃ. ৪৭৮।

৮৬. সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ১৮৫ ক, Or. 1671, পৃ. ৯০ খ; খাফী খান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩২ টীকা। এও দেখে কৌতূহল হয় যে অধ্যাপক ল্যামটন তাঁর 'ল্যাণ্ডলর্ড অ্যাণ্ড পিজান্ট ইন পার্সিয়া', পৃ. ৪৩৬-এ অরক-এ ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ হিসেবে 'নসক'-কে তালিকাভুক্ত করেছেন। অর্থ: 'গ্রামে চাষের জমির পরিমাণ'।

৮৭. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৯।

৮৮. ৫ম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩ দ্রষ্টব্য।

৮৯. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭০। 'নসকী' এবং 'গল্লাবখ্‌শ্‌' শব্দদুটির মধ্যে ব্লখমান একটা ড্যাশ চিহ্ন দিয়েছেন। কিন্তু মূলের দিকে একবার নজর দিলেই দেখা যাবে যে দ্বিতীয় শব্দটি কেবল তখনই পরের বাক্যে যেতে পারত যদি তারপরে সংযোজক অব্যয় 'ওঅ' (এবং) থাকত, কিন্তু তা নেই। মোরল্যাণ্ড ও ইউসুফ আলী 'নসকী' এই পাঠ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন I.O. 265 পুঁথির ভিত্তিতে। সে পাঠে এর বদলে আছে 'নিসফী' (*JRAS*, ১৯১৮, পৃ. ৯-১০)। কিন্তু 'নিসফী' শব্দটি নিঃসন্দেহে 'নসকী'-ই লিপিকর-প্রমাদ, কারণ 'আইন'-এর সবচেয়ে পুরনো ও ভালো পাণ্ডুলিপিগুলো (Add. 7652, Add. 6552 ও I.O. 6) থেকেও ব্লখমানের পাঠই সমর্থিত হয় (অবশ্যই তাঁর সম্পাদকীয় যতিচিহ্ন বাদে)।

রাজস্ব-ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হলো : বিভিন্ন শস্যের 'রাই' (শস্য-হার) বেঁধে দেওয়া হতো আর প্রতি গ্রামের এলাকায় তা প্রয়োগ করা হতো। তারপর "তারা সেই অনুযায়ী প্রতি গ্রাম পিছু কিছু 'খরওয়ার' (গাধা-বোঝাই) ধান হিসেব করে বার করত আর নতুন করে তথ্য জোগাড় না করেই একই সংখ্যক 'খরওয়ার' দাবি করে চলত।"[৯০] সুতরাং, এখানে ভাগচাষ প্রথায় যে-বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেল তা হচ্ছে এই যে, রাজস্ব হিসেবে সংগৃহীত উৎপন্নের পরিমাণ প্রতি বছর বাঁধা বা অপরিবর্তিত থাকত।

যে-সব ব্যবস্থা সম্বন্ধে আবুল ফজল 'নসক' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন সেই বিষয়ক সমস্ত তথ্য জড়ো করলে দেখা যায় যে বিভিন্ন রূপের এই বৈচিত্র্যের মধ্যে আসলে একটিই মূল বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে আছে যা সর্বত্রই দেখা যেত। তা হলো এই : প্রতি বছর নতুন করে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে রাজস্ব নির্ধারণ করা হতো না, একবার নির্ধারণ করা হয়ে গেলে তার ফল বছরের পর বছর পুনরাবৃত্তি করা হতো। মাপের অঙ্ক, নগদের পরিমাণ, শস্যের পরিমাণ, কিংবা লাঙলের সংখ্যা—এ সব বিষয়ে কীভাবে একেবারে গোড়াতে নির্ধারণ হতো কিংবা কোন্ কোন্ বিষয়ে পুনরাবৃত্তি হতো, সেটা আসলে কোন ব্যাপারই ছিল না। আগে যা হিসেব করে বার করা হয়েছিল, তা মেনে নিয়ে প্রকৃত নির্ধারণ প্রক্রিয়া চালু ছিল। 'নসক' বলতে বোঝাত ঐ প্রক্রিয়াকে যে-কোনভাবে পাশ কাটিয়ে যাওয়া।

পাঠকের বোধহয় নজরে পড়েছে যে, এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শুধুমাত্র আবুল ফজলের লেখায় 'নসক'-এর যা উল্লেখ আছে সেগুলির ওপর নির্ভর করেই তত্ত্ব-তালাশ করেছি। একটি যুক্তির মোকাবিলা করার জন্য ইচ্ছা করেই এ কাজ করা হয়েছে। কথা উঠতে পারে যে অন্তর্বর্তী সময়ে হয়তো শব্দটির অর্থ-পরিবর্তন ঘটেছিল, সুতরাং আকবরের আমলে 'নসক' শব্দের প্রকৃত অর্থ কী ছিল তা ঠিক করার ব্যাপারে পরের সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রাহ্য নয়।[৯১] ঐ সব পরবর্তী সাক্ষ্যপ্রমাণে যা পাওয়া যায়, তা অবশ্য আগের অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে। আওরঙ্গজেবের আমলের একটি পুস্তিকায় 'নসক'-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইভাবে : "রাজস্ব-নির্ধারক 'মুওয়াজানা-এ দহ্‌সালা' (গত দশ বছরের রাজস্ব এবং এলাকার নথি) এবং ঠিক আগের বছরের (নথিপত্রের) কথা খেয়াল রেখে অথবা দশ-বারো বছরের 'জমা'র গড় করে 'জমা' নির্ধারণ করেন।"[৯২] এইভাবে বর্তমানের

৯০. আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৮।

৯১. শরণ, 'প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট...', পৃ. ৪৫৩-৫৭।

৯২. 'ফরহঙ্গ-এ কারদানী', পৃ. ৩২ খ। Edinburgh 83, পৃ. ৩৪ খ-তেও এই সংজ্ঞা পুনরুক্ত হয়েছে, কিন্তু সঙ্কলক বা লিপিকর স্পষ্টতই 'নসক' শব্দটি একেবারেই বুঝতে পারেননি। 'গড় করা'র আগে 'অথবা' শব্দটিও বাদ পড়েছে। এস. আর. শর্মা, 'ইণ্ডিয়ান কালচার', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৪-৫-এ রামপুরের রাজ্য গ্রন্থাগারে পাওয়া একটি পুস্তিকায় 'নসক'-এর একটি সংজ্ঞার উল্লেখ করেছেন। আশ্চর্য এই যে, তিনি ঐ সংজ্ঞার মূল পাঠ বা তর্জমা কিছুই দেননি, দিয়েছেন শুধু ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ। এমনকি তার থেকেও প্রায় নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় ঐ সংজ্ঞা 'ফরহঙ্গ-এ কারদানী'র সংজ্ঞার মতো একই ভাষায় দেওয়া; আর গড় করার নীতির উপর শর্মা যতটা জোর দিয়েছেন, ঐ সংজ্ঞায় তেমন বিশেষ জোর নাও থাকতে পারে।

নির্ধারণ ঠিক হয় অতীতের নির্ধারণ দিয়ে। ঐ একই আমলের শেষের দিকে লেখা আরেকটি পুস্তিকায় 'নসক' শব্দটিকে দেখা যায় ঠিক তার ১৬ শতকের চেহারায়, যখন 'নসক' সংশ্লিষ্ট ছিল 'জব্‌ৎ'-এর সঙ্গে। অর্থাৎ এর তাৎপর্য : কাগজে-কলমে নির্দিষ্ট এলাকা, রাজস্ব কর্মচারীরা যা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে।[৯৩]

৩. বিভিন্ন অঞ্চলে রাজস্ব নির্ধারণের পদ্ধতি

আবুল ফজল বলেছেন যে শের শাহ্‌ ও তাঁর ছেলে ইসলাম শাহের আমলে হিন্দুস্থানে শস্য ভাগাভাগি এবং 'মুক্তাঈ' (বাঁধা রাজস্ব দাবি চাপানো)-এর জায়গায় 'জব্‌ৎ' ব্যবস্থা চালু হয়।[১] আব্বাস খান এ কথা সমর্থন করেন। তিনি বলেছেন যে, 'জরিব' দিয়ে নির্ধারণ পদ্ধতি চালু করেন শের শাহ্‌; তাঁর আগে কোথাও এর ব্যবহার হতো না।[২] গোড়ার দিকে তিনি বিহারে তাঁর বাবার জাগীরে, চাষীদের 'জরিব' এবং শস্য-ভাগের মধ্যে যে কোন একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দিতেন।[৩] কিন্তু বাদশাহ হিসেবে তিনি, মনে হয়, 'জব্‌ৎ'-কেই নির্ধারণের একমাত্র পদ্ধতি করার চেষ্টা করেন। এই ঐতিহাসিক বলেছেন যে এমন কি পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলেও (নগরকোট ইত্যাদি) লোকের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় হতো 'জরিব' প্রয়োগ করে।[৪] আর সম্ভল শহরের চারপাশের লোকদেরও ঐ একই পদ্ধতিতে ধার্য রাজস্ব দিতে বাধ্য করা হয়েছিল।[৫] সম্ভবত, মালবেও 'জব্‌ৎ' চালু

৯৩. 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৯ খ, ৮০ ক; Or, 2026, পৃ. ৩৪ ক-খ। করোড়ী "আবাদে উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করে (এবং) 'নসক' স্থির করে (স্থানীয় ভাষায় যাকে বলে 'সর' বা 'সী')। তারপর চাষীদের অবস্থা অনুসারে সে ঘোড়া ও পদাতিক মোতায়েন করবে যাতে চাষীরা ধার্য অনুযায়ী বীজ বোনে। আবাদযোগ্য (এক) বিঘা বা 'বিশ্বা'ও যেন সে অনাবাদী পড়ে থাকতে না দেয়।" নসক-এর হিন্দী সমার্থক শব্দটি আমি সনাক্ত করতে পারিনি। ঠিক ঐ একই অর্থে ব্যবহৃত আবুল ফজলের বাক্যাংশ 'নুসখা-এ নসক' তুলনীয়।

১. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৬। 'মুক্তাঈ'-এর জন্য পরের অংশ দ্রষ্টব্য।

২ আব্বাস খান, পৃ. ১০৬ ক। 'জব্‌ৎ' ব্যবস্থা সম্ভবত শের শাহ্‌র আবিষ্কার, কিন্তু নির্ধারণের জন্য সরল জরিপ ব্যবস্থা, যেমন 'কনকুত'-এ, নিশ্চয়ই ভারতের এক পুরনো নীতি। ১৪ শতকে আলাউদ্দীন খলজী জরিপের মাধ্যমে একটি নির্ধারণ ব্যবস্থা চালু করেন ('ব-হুক্‌ম্‌-এ মিসাওয়াৎ ও ওয়াফা-এ বিশ্বা') (বরনী, 'তারিখ-এ ফিরুজ শাহী', বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা, পৃ. ২৮৭)। এই ধরনের জরিপ এবং তাঁর 'দাগ' ব্যবস্থা (ঘোড়া দাগানো)-র সূত্রেই আবুল ফজল অবজ্ঞাভরে বলেছেন যে 'শের খান' "সুলতান আলাউদ্দীনের অসংখ্য ব্যবস্থার ('তারিখ-এ ফিরুজ শাহী'তে যার বিস্তারিত বর্ণনা আছে) কয়েকটিকে কাজে লাগিয়েছিলেন" ('আকবরনামা', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৬)।

৩. আব্বাস খান, পৃ. ১১ খ। এখানে 'জরিব' মানে বোধ হয় 'কনকুত'।

৪. ঐ, পৃ. ১০৭ ক।

৫. ঐ, পৃ. ১০৮ ক।

করা হয়েছিল, কারণ আকবরের আমলের গোড়ার দিকে এই প্রদেশে জারি-করা 'দস্তুর'গুলি 'আইন'-এর "১৯ বছরে"র তালিকায় দেওয়া আছে। ব্যতিক্রম ধরা হয়েছিল শুধু মুলতানকে, লঙ্গাহ্‌দের ব্যবহৃত পদ্ধতিই এখানে বহাল রাখা হয়েছিল, 'জরিব' প্রয়োগ করা হয়নি এবং এক ধরনের শস্য-ভাগ ব্যবস্থাই অনুসরণ করা হয়।[৬]

১৯ বছরের হারের তালিকায় যেমন দেখা যায়, আকবরের আমলের গোড়ার দিকে হিন্দুস্তানের (আগ্রা, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, দিল্লী, লাহোর এবং মালব) অধিকাংশ প্রদেশেই 'জব্‌ৎ' ব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু এও সম্ভব যে, এই সময়ে এর প্রতিপত্তি কিছুটা কমে গিয়েছিল। ১৩-তম বছরে, 'খালিসা' জমিতে বার্ষিক জরিপের রীতি বদলে এক ধরনের 'নসক' চালু করা হয়।[৭] ১৯-তম বছরে অবশ্য বিহার ছাড়া হিন্দুস্তানের সব প্রদেশ 'খালিসা'-য় ফিরিয়ে নিয়ে 'জব্‌ৎ'-এর আওতায় আনা হয়।[৮] মুলতানে[৯] এবং আজমীর প্রদেশের অংশবিশেষেও এর বিস্তার ঘটানো হয়।[১০] 'আইন' যখন সঙ্কলিত হয়, ততদিনে বিহারের অধিকাংশ পরগনা ('জমা'র প্রায় তিনের-চার ভাগ যেখান থেকে আসত) 'জব্‌ৎ'-এর আওতায় এসে গিয়েছিল।[১১] অবশ্য এমন হতে পারে না যে কোন প্রদেশের সমস্ত জমিই 'জব্‌ৎ'-এর আওতায় থাকত।[১২] সম্ভবত, ১৯-তম বছরে যে 'করোড়ী' পরীক্ষা আরম্ভ করা

৬. ঐ, পৃ. ৯১ খ-৯৪ ক।

৭. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৩, 'ইকবালনামা', ২য় খণ্ড, লখনউ, পৃ. ২৩৩।

৮. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৭-১৮; আরিফ কান্দাহারী, ১৭৭-৭৮; বদাউনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৯-৯০।

৯. ১৯ বছরের হারগুলোতে মুলতান সম্পর্কে তথ্য দেওয়া শুরু হয় কেবলমাত্র ১৫-তম বছর থেকে। কিন্তু এও সম্ভব যে ১৫-তম থেকে ২৪-তম বছরের হারগুলো পরে পেছন থেকে হিসেব করে বার করা হয়েছিল। তাই মুলতান সম্ভবত 'জব্‌ৎ'-এর আওতায় এসেছিল ১৯-তম বছরে বা তারও পরে।

১০. ১৯ বছরের হারগুলোতে আজমীরের সারণিগুলো ফাঁকা রয়েছে, কিন্তু নটি 'মহাল'-সমষ্টির চূড়ান্ত 'দস্তুর আল-আমল' দেওয়া আছে।

১১. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৭।

১২. প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অংশে আমরা দেখেছি যে আওরঙ্গজেবের আমলের জরিপ-করা এলাকার পরিসংখ্যানগুলো 'আইন'-এর পরিসংখ্যানগুলোর চেয়ে যথেষ্ট বেড়েছে কিন্তু এও পরিষ্কার দেখা যায় যে বেশির ভাগ প্রদেশেই এক বিরাট অনুপাতের গ্রাম জরিপ করা হয়নি। এই পরিসংখ্যানগুলোর তুলনা করলে বোঝা যায় যে কেবলমাত্র আগ্রা ও দিল্লী প্রদেশের ক্ষেত্রেই 'আইন'-এর জরিপ-করা এলাকার পরিসংখ্যানগুলোকে পূর্ণাঙ্গ বলা চলে।

১৮১০ সালে লিখতে বসে গুলাম হজরৎ দাবি করেছেন যে আকবরের আমলের কিছু 'মুওয়াজানা' কাগজপত্র তিনি আজমগড় 'চাকলা'র কয়েকজন কানুনগোর কাছে দেখেছেন। তারপর তিনি আরও বলেছেন যে, "সেই (আকবরের) সময়ে গোরখপুর 'চাকলা'র গ্রামগুলো জরিপ ('জব্‌ৎ-এ পইমাইশ') করা হয়নি" ('কওয়াইফ্‌-এ গোরখপুর', Aligarh MS, পৃ. ১৫ খ)। গোরখপুর (অযোধ্যা) 'সরকার' -এর বেশ কিছু 'মহাল'-এর

হয় তার উদ্দেশ্য ছিল অন্তত একবার বা কয়েক বছরের জন্য যথাসম্ভব খুঁটিয়ে জরিপ করে নেওয়া, তারপর 'নসক'-এর কাজ চালাবার ভিত্তি হিসেবে এবং নতুন সাধারণ নির্ধারণ 'জমা-এ দহ্‌সালা' তৈরি করার জন্য সেটিকে কাজে লাগানো।[১৩] 'আইন'-এ 'আমলগুজার'দের প্রতি নির্দেশনামায় বলা হয়েছে : 'নসক' মেনে নেওয়া বা নতুন করে জরিপ করার মধ্যে যে কোনো একটিকে চাষীদের বেছে নিতে দেবে। এছাড়াও তাকে বারণ করা হয়েছে, সে যেন শুধু এই দুটিমাত্র পদ্ধতি, যাতে রাজস্ব দাবি ঠিক করা হয় নগদে, তার মধ্যেই নিজের কাজ সীমাবদ্ধ না রাখে। তাকে বলা হয়েছে 'কনকূত' ও শস্য-ভাগ পদ্ধতিও কাজে লাগাতে, যাতে রাজস্ব দাবি দেওয়া হতো জিনিসে।[১৪]. ঐ একই বই-এর অন্য জায়গায় বলা হয়েছে : 'চাচর' জমির ক্ষেত্রে (যে-জমি তিন বা চার বছর পতিত পড়ে আছে) এইসব পদ্ধতির যে-কোন একটিকে প্রয়োগ করতে হবে, যে এলাকায় যেমন খাপ খায় সেইভাবে। আর 'বনজর' জমি, যা আরও অনেকদিন ধরে না-চষা হয়ে পড়ে আছে তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে চাষী নিজে।[১৫] অন্যদিকে, মনে হয়, ধরেই নেওয়া হয়েছে যে আগেকার ভাগচাষের জমি 'জব্‌ৎ'-এর আওতায় আসবে, যদি সেখানে অর্থকরী ফসল বোনা হয়।[১৬]

মনে হয়, মূলগতভাবে এই ব্যবস্থাই ১৭ শতকে বিনা বদল চলে যাচ্ছিল। আওরঙ্গজেবের আমলের অষ্টম বছরে জারি-করা রসিকদাসের উদ্দেশে ফরমানের[১৭] মুখবন্ধে, তখনকার চলতি রীতি সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা এই :

"'সাল-এ কালি' (সর্বোচ্চ রাজস্বের বছর)[১৮] ও আগের বছরের রাজস্ব ('ওয়াসিল'), আবাদযোগ্য এলাকা এবং চাষীদের অবস্থা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের

ক্ষেত্রে 'আইন'-এ কেন অত কম এলাকার অঙ্ক বরাদ্দ করা হয়েছে তার একটা ব্যাখ্যা হয়তো এই।

১৩. ৯৮৪ হিজরীতে (আকবরের রাজত্বের ২৪-তম বছর) বায়াজীদ বয়াৎ-কে মালবের উজ্জয়নী 'সরকার'-এর রাজস্বের দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, তাঁর কাজের মধ্যে ছিল "জরিপ ('জরিব'), নির্ধারণ ('জমাবন্দী') এবং 'নসক' (স্থির করা)" (বায়াজীদ, পৃ. ৩৫৩)। আমরা আগেই দেখেছি, ২৭-তম বছরে তোডর মল সুপারিশ করেছিলেন যে খালিসা-য় প্রতি বছর জরিপ করতে হবে না, আর স্থানীয় 'নসক'-ই বহাল করতে হবে ('আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮১-২)।

১৪. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫-৬। আশ্চর্যের বিষয় এই যে মোরল্যাণ্ড কোথাও এই অংশটির কোন ব্যাখ্যা দেননি। রসিকদাসের উদ্দেশে আওরঙ্গজেবের ফরমানের মুখবন্ধে যা বলা আছে এখানেও কার্যত সেই একই কথা বলা হয়েছে। তবুও তিনি নির্দ্বিধায় বলেছেন, আকবরের ব্যবস্থা যে ততদিনে "প্রায় পুরোপুরি বাতিল হয়ে গিয়েছিল" শেষেরটির থেকেই তার "চূড়ান্ত" সাক্ষ্য পাওয়া যায় ('এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', পৃ. ১২৪)।

১৫. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০১; ৩০৩।

১৬. ঐ, ২৮৬। আগের একটি টীকায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১৭. এই ফরমানে যে বিশেষভাবে হিন্দুস্তানের অবস্থার কথাই বলা হয়েছে সে বিষয়ে খুবই দৃঢ় অনুমান আছে, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। রসিকদাস কোন্ সরকারী পদে কাজ

কথা খেয়াল রেখে বাদশাহী আধিপত্যের পরগনাগুলির নির্ধারকরা ('উমানা') বছরের শুরুতে পরগনার অধিকাংশ গ্রামের 'জমা' নির্ধারণ করে। কোন গ্রামের চাষীরা যদি এই পদ্ধতি ('আমল') মেনে না নেয়, তবে তারা ফসল পাকার সময় 'জরিব' বা 'কনকূত' পদ্ধতি অনুযায়ী 'জমা' নির্ধারণ করে। আর কিছু গ্রামে, যেখানকার চাষীদের তারা খুবই অভাবী এবং গরীব বলে জানে, তারা শস্য-ভাগ প্রথা প্রয়োগ করে। (রাজস্ব হিসেবে) ঠিক হয় অর্ধেক, একের-তিন ভাগ কিংবা দুএর-পাঁচ ভাগ অথবা তার কিছু কম বা বেশি।"

তাহলে, আমরা প্রথমে পেলাম 'জব্‌তী' অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত 'নসক'-এর রূপ, তারপর 'জব্‌ৎ' ('জরিব') বা 'কনকূত'—যে-কোন ব্যবস্থায় জমির পরিমাপ এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শস্য-ভাগ। আওরঙ্গজেবের আমলের শেষদিকে পাঞ্জাবে লেখা 'খুলসতুস সিয়াক'-এও এই একই ধরনের একটি বক্তব্য আছে।[১৯] বছর-বছর জরিপ করে কিংবা 'নসক' হিসেবে রেখে, যেভাবেই হোক না কেন, এলাকাভিত্তিক নির্ধারণ যে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল, আওরঙ্গজেবের আমলের পরিসংখ্যানে সে কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে। এইভাবে নথিভুক্ত এলাকা সাধারণত 'আইন'-এ নথিভুক্ত এলাকার চেয়ে বাস্তবিকই যথেষ্ট বেশি। এইসব পরিসংখ্যানে জরিপ না-হওয়া গ্রামের সংখ্যা বিহার, অযোধ্যা এবং মুলতানে সমগ্র প্রদেশের মোট গ্রামের একটা বেশ বড়

করতেন কিংবা কোন্ প্রদেশে তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। Add. 19,503, পৃ. ৬২ ক-৬৩ খ-তে রক্ষিত এই ফরমানের নকলে তাঁর নামের জায়গায় বিহারের 'দিওয়ান-এ খালিসা' মীর মহম্মদ মুইজ-এর নাম আছে। সুতরাং এটি বেশ কয়েকজন কর্মচারীর মধ্যে প্রচারিত হয়ে থাকতে পারে।

১৮. 'সাল-এ কামিল' শব্দটি প্রথম দেখা যায় আকবরের রাজত্বের ৩০-তম বছরে মীর ফতহ্উল্লা সিরাজীর সুপারিশগুলোর মূল পাঠে ('আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৭)। আক্ষরিক অর্থে 'কামিল' মানে নিখুঁত, কিন্তু শব্দটি এখানে 'যে কোন সময়ে আদায়ীকৃত সর্বোচ্চ রাজস্ব'—এই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। Add. 6603, পৃ. ৫৭ খ-তে 'জমা-এ কামিল'-এর সংজ্ঞা দ্রষ্টব্য। মরাঠা এবং ইংরেজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে ১৭৭৬-এর সুরাট চুক্তিতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল এবং এর অর্থ নিয়ে তর্ক উঠেছিল। মরাঠারা জেদ ধরেছিল যে রাজস্ব সংক্রান্ত রচনায় শব্দটির যা অর্থ, ঠিক সেই ভাবে এর ব্যাখ্যা করতে হবে (তুলনীয় গ্রাণ্ট ডাফ, 'এ হিস্ট্রি অফ দা মরাঠাস্', লণ্ডন, ১৮২৬, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৩)।

১৯. চাষীদের ক্ষমতা সম্বন্ধে তার জ্ঞানের ভিত্তিতে 'আমিন' বা নির্ধারককে প্রত্যেক গ্রাম ধরে ধরে বছরের গোড়ায় দুটি ফসলের জন্য আলাদা করে 'জমা' বা 'দৌল' তৈরি করতে হবে। ফসল পাকতে শুরু করলে চাষীদের কাছ থেকে সে একটা নতুন 'কবুলিয়ৎ' (নির্ধারিত রাজস্ব দাবি সম্পর্কে একমত হওয়ার স্বীকৃতি) নেবে। যদি কোন অঘটনের জন্য কেউ তার নির্ধারিত 'জমা' দিতে না পারে ও প্রকৃত নির্ধারণের ('আমল') অনুরোধ জানায় তবে 'জব্‌ৎ' বা শস্য-ভাগ বা 'কনকূত'-এর মধ্যে যেটি তার বিবেচনায় কর্তৃপক্ষের পক্ষে লাভজনক ও চাষীদের ওপর উৎপীড়নস্বরূপ নয়, সেটিই প্রয়োগ করবে ('খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৩ খ-৭৪ ক; Or. 2026, পৃ. ২২ খ)। আরও তুলনীয় বেকাস, পৃ. ৭০ ক-খ।

অংশ। আবার এলাহাবাদ, আগ্রা, দিল্লী এবং লাহোর প্রদেশে এই সংখ্যা তুলনায় নগণ্য।[২০]

১৮ শতক ছিল প্রশাসনিক নৈরাজ্যের পর্ব, কিন্তু মুঘলদের রাজস্ব নির্ধারণ পদ্ধতির কিছু কিছু উপাদান তখনও টি'কে ছিল। ১৭৮৮-র কিছু আগে বাংলার ইংরেজ কর্তৃপক্ষের জন্য অন্যান্য প্রদেশের রাজস্ব রীতি বিষয়ক একটি রিপোর্ট তৈরি হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছে যে, পাঞ্জাবে চাষীদের ওপর রাজস্ব-দাবি ঠিক করার জন্য জমিনদাররা সাধারণত জমি জরিপ করায়, যদিও কোন কোন জমিনদার ভাগচাষ প্রথাও কাজে লাগায়। শাহ্‌জাহানাবাদ প্রদেশের (দিল্লী) কোন কোন গ্রামে রাজস্ব দেওয়া হয় শস্য-ভাগ করে, অন্যান্য গ্রামে বিঘা অনুযায়ী। অযোধ্যা এবং এলাহাবাদ দু জায়গাতেই পরিমাপ করে, বা যেভাবেই হোক, বিঘা অনুযায়ী রাজস্ব দাখিল করাই ছিল সাধারণ রীতি।[২১] বিহারে, নিজামৎ-এর গোড়ার দিকে, কোন কোন মহাল'-এর ধার্য ছিল বাঁধা। অন্যান্য জায়গায় সাধারণত 'কনকূত' প্রয়োগ করা হতো।[২২]

এবার সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের কথা দেখা যাক। প্রথমেই আমরা পাই কাশ্মীর প্রদেশ। এখানকার অনুসৃত ব্যবস্থার কথা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। আবুল ফজল মোটামুটি বিস্তারিতভাবে তার বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর দেওয়া তথ্য সংক্ষেপে এইরকম : ধরা হতো, প্রত্যেক গ্রামেই রাজস্ব-প্রদায়ী জমির একটা নির্দিষ্ট এলাকা আছে। প্রতি 'পাট্টা'র (স্থানীয় এলাকার একক) প্রধান শস্যগুলির জন্য 'রাই' বেঁধে দেওয়া হতো। রাজস্বের ভাগ সাধারণত ধরা হতো উৎপন্নের একের-তিন ভাগ। এইভাবে নির্ধারিত পরিমাণই (গাধা-বোঝাই ধানের হিসেবে) প্রতি বছর [রাজস্ব হিসেবে] ধার্য করা হতো : তার হেরফের হতো না। আকবরের শাসনের ৩৪-তম বছরে তাঁর কর্মচারীরা খু'টিয়ে খোঁজখবর নিয়ে দেখলেন যে প্রশাসনের কাছে ঘোষিত 'রাই'গুলোর আদৌ কোন বাস্তব তথ্যভিত্তি নেই, আসলে রাজস্ব ধার্য হয় আরও উঁচু হারের 'রাই' অনুযায়ী। যেমন, গমের ক্ষেত্রে চাওয়া হয় চারগুণ বেশি, চালের ক্ষেত্রে দেড়গুণ।[২৩] আসলে এইভাবে, মোট উৎপন্নের একের-তিন ভাগ নয়, দুএর-তিন ভাগেরও বেশি আদায় করা হয়। আকবর তাই রাষ্ট্রের ভাগ বেঁধে দিলেন উৎপন্নের অর্ধেক। কিন্তু নতুন 'রাই' কোথাও দেওয়া নেই।[২৪] ১৮ শতকের শেষ দিকে, মনে হয়, কাশ্মীরে এক ধরনের বিশুদ্ধ শস্য-ভাগ প্রথা চালু ছিল।[২৫] কিন্তু অন্তর্বর্তী সময় সম্বন্ধে খুব কম খবরই জানা যায়।

২০. এই পরিসংখ্যানগুলো নিয়ে প্রথম অধ্যায়, প্রথম অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

২১. Add. 6586, পৃ. ১৬৪ ক-খ।

২২. ১৭৭৭-এ বাংলায় রায় রায়ান ও কানুনগোদের প্রাক্-বৃটিশ প্রশাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্ট (Add. 6592, পৃ. ১১২ খ, Add. 6586, পৃ. ৭১ খ)। এখানে 'কনকূত'কে ভাগচাষেরই ('ভাওলী') একটি বিশেষ রূপ বলে ধরা হয়েছে, যদিও স্পষ্টই বলা আছে যে 'জরিব'-ও কাজে লাগানো হতো।

২৩. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৮-৯।

২৪. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭০ ; 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭২৭।

২৫. Add. 6586, পৃ. ১৬৪ ক।

ভাক্কর ছিল মুলতান প্রদেশের একটি 'সরকার'। বলা হয়েছে যে ১৫৭৫-৬ সালে সর্বত্র সমান একটি 'দস্তুর-আল আমল' (অবশ্য, জিনিসে দেওয়া রাজস্ব দাবি) 'কনকূত' ব্যবস্থার উপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই নতুন প্রথা চালু হওয়ার ফলে খুব অত্যাচার ও হাঙ্গামা দেখা দেয়।[২৬] সম্ভবত একটু পরিবর্তিত রূপে এই ব্যবস্থাই বহাল ছিল। তাই, 'আইন'-এ যদিও এই 'সরকার'-এর জন্য কোন 'দস্তুর' দেওয়া নেই,[২৭] তবুও প্রাদেশিক পরিসংখ্যানে এর এলাকার অঙ্কগুলি দেওয়া আছে। ১৬৩৪-এ লেখা 'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী'তে বলা হয়েছে ভাক্কর 'সরকার'-এর আটটি পরগনাই ছিল 'জব্‌তী' রাজস্ব নির্ধারণ ব্যবস্থার আওতায়। খারিফ এবং রবি দু ধরনের শস্যের জন্যই 'দস্তুর' বাঁধা ছিল।[২৭ক] 'চাহার গুলশন'-এ এই প্রদেশ কিংবা মুলতান 'সরকার'-এর[২৮] ক্ষেত্রে কোন এলাকা-পরিসংখ্যান দেওয়া নেই। মনে হয় মুলতানও ১৭ শতকের মধ্যে 'জব্‌ৎ' ব্যবস্থার আওতায় চলে গিয়েছিল। দক্ষিণে সেহ্‌ওয়ান 'সরকার'-এ 'জব্‌তী' ও শস্য-ভাগ দুইই চলত পাশাপাশি।[২৮ক] 'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী'-তে বিভিন্ন শস্যের যে-'দস্তুর' দেওয়া আছে তার বেশির ভাগই অবশ্য বেঁধে দেওয়া হয়েছে জিনিসে, নগদ টাকায় নয়। সুতরাং, এটি আগের শতকে ভাক্কর-এ চালু করা 'কনকূত'-এরই একটি (পরিবর্তিত) রূপের কথা মনে করিয়ে দেয়।[২৮খ] আকবরের আমলে এবং তার পরেও থাট্টা প্রদেশ বরাবরই ছিল ভাগচাষের আওতায়।[২৯] আজমীর প্রদেশের বৃহত্তর অংশেও ঐ একই পদ্ধতি চালু ছিল।[৩০]

গুজরাটের অবস্থা নিয়ে কিছু মুশকিল আছে। 'আইন'-এ বলা হয়েছে গুজরাট ছিল "অধিকাংশই 'নসকী', আর জরিপ প্রায় হতোই না।"[৩১] একই সঙ্গে সোরট

২৬. মাসুম, 'তারিখ-এ সিন্দ', পৃ. ২৪৫।

২৭. ব্লখমানের পাঠে এ কথা স্পষ্ট করে বলা নেই, যদিও Add. 6552-এ এমনকি এই বর্জিত অংশটিও দেওয়া আছে। যে সব 'মহাল'-এর তালিকায় 'দস্তুর'-এর উল্লেখ আছে সেখানে বা 'দস্তুর'-এর সারণিতে ভাক্কর-এর কথা নেই। মুলতান প্রদেশের রাজস্ব পরিসংখ্যান সারণির আগের অংশে বলা হয়েছে যে এর তিনটি 'সরকার' (সম্ভবত মুলতান, দীপালপুর ও ভাক্কর; থাট্টা বাদ দিয়ে) ছিল পুরোপুরি "জব্‌তী" ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫০)। কিন্তু 'জব্‌ৎ' শব্দটি বোধহয় এখানে আলগাভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যার মধ্যে 'কনকূত'ও পড়ে যায়, কারণ 'কনকূত'-এও জরিপ করা হতো।

২৭ক. 'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী', ১৩-১৪।

২৮. ১ম অধ্যায়, ১ম অংশ দ্রষ্টব্য।

২৮ক. 'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী', ১৫৫, ১৮২-৫, ২০৩-৩০।

২৮খ. ঐ, ১৮৩-৪।

২৯. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৬; 'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী', ৫১।

৩০. ঐ, ৫০৫। মির্তা ও নাইনওয়া পরগনার জন্য আরও দ্রষ্টব্য 'ওয়াকাই-এ 'আজমীর', পৃ. ১১৪ ও ৪৪৮। জালোর-এর একটি প্রতিবেদন (ঐ, ৪৫১-২) থেকে জানা যায় যে ভাগচাষ সেখানে প্রথম চালু হয় আওরঙ্গজেবের রাজত্বের ২৩-তম বছরে।

৩১. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৫। প্রথম শব্দ 'অধিকাংশ' হলো মূলের 'বেশতর'। মোরল্যাণ্ড ও ইউসুফ আলী (*JRAS*, ১৯১৮, পৃ. ২৯-৩০) স্বীকার করেছেন যে অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতে

এবং অন্যান্য জায়গার কিছু কিছু 'মহাল' বাদে গোটা প্রদেশের জন্য বিস্তারিত এলাকা-পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া গুজরাটের সুবাদার শিহাবুদ্দীন আহ্‌মদ খান (১৫৭৭-৮৫) সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি "আহ্‌মেদাবাদের লাগোয়া ('ওয়াভেল্লী') একটি পরগনা ও অন্য কয়েকটি পরগনার চাষীদের অভিযোগ শুনে, আবাদযোগ্য এলাকা দ্বিতীয়বার জরিপ করিয়েছিলেন।"[৩২] গেলেইনসেন বলেছেন যে, শাহ্‌জাহানের আমলের গোড়ার দিকে রাজস্ব নির্ণয়ের জন্য শস্য "মাপা হতো ও দাম ঠিক করা হতো।"[৩৩] এর একমাত্র ব্যাখ্যা মনে হয় এই যে, 'জব্‌তী' প্রদেশ-গুলোতে যে-ধরনের 'নসক' চালু ছিল, গুজরাটের 'নসক' ছিল তা-ই। আবুল ফজলের কথা থেকে অনুমান করা যায়, দুএর মধ্যে পার্থক্য ছিল শুধুমাত্র এই যে, গুজরাটে রাজস্ব প্রশাসনের নিয়মমাফিক কাজের মধ্যে আবার জরিপ করার কোন ব্যবস্থা ছিল না, যেমনটি ছিল অন্যান্য নিয়মিত রাজস্ব-ব্যবস্থায়। শিহাবুদ্দীন খানের বিবরণেও এই একই কথা নিহিত আছে। সেখানে দেখানো হয়েছে, আগে একবার মাত্র জরিপ হয়েছিল, আবার জরিপ করানোর জন্য ব্যাপক অভিযোগ ওঠার দরকার পড়েছিল।

১৬৩০-৩২-এর দুর্ভিক্ষে গুজরাট খুবই দুর্দশায় পড়ে। সেখানকার চাষীদের যে চূড়ান্ত দমন-পীড়ন সইতে হয়েছিল, দরবার সে সম্বন্ধে পরের দশকে ওয়াকিবহাল হয়ে ওঠে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য মির্জা ঈশা তরখান-কে সুবাদার নিয়োগ করা হয় (১৬৫২-৪)। তিনি "শস্য-ভাগ প্রথা প্রবর্তন করেন" এবং "অল্প সময়ের মধ্যে দেশকে সমৃদ্ধিশালী করে তোলেন।"[৩৪] এমনও হতে পারে যে, জরিপ পুরোপুরি বাতিল করা হয়নি, কেননা আওঙ্গজেবের আমলের পরিসংখ্যানে প্রায় দুএর-পাঁচ ভাগ গ্রামে জরিপ হয়েছে বলে দেখানো আছে।[৩৫] শস্য-ভাগ প্রথা চাষীদের কাছে স্থায়ী আশীর্বাদ রূপে আসেনি। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের অষ্টম বছরে জারি-করা একটি বাদশাহী আদেশনামায় দেখা যায়, এই প্রথা অস্বাভাবিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল। এতে বলা হয়েছে, "শস্যের দাম খুব বেশি হওয়ার দরুন" তাঁর শাসনের গোড়ার দিকে " 'জমা' হয়েছিল সবচেয়ে বেশি ('কামাল')।" তারপর দাম পড়ে গেল, কিন্তু জাগীরদাররা তখনও খেয়ালখুশি মতো রাজস্ব নির্ধারণ করে আগের পরিমাণই দাবি করতে থাকে। তাই আনুষ্ঠানিকভাবে শস্য-ভাগ করলেও, আসল উৎপন্ন যেখানে ১০০ মণ সেখানে তারা ধরে নিত ২৫০ মণ। এই কাল্পনিক অঙ্কের অর্ধেকই তাদের দাবি হিসেবে ধরে সমস্ত শস্যই তারা নিয়ে নিত, আর বাকি ২৫ মণের

কোন পাঠান্তর নেই, তবুও তাঁরা প্রস্তাব দিয়েছেন যে 'বেশতর'-এর বদলে বরং 'পেশতর' (আগে) পড়া উচিত। তাঁরা এই বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে এ কথা শুধু আগের অবস্থা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে শেষের দুটি শব্দ 'কম রবদ' বদলে করতে হবে 'কম রফতে', যাতে অতীত কাল বোঝায়; এবং নিশ্চয়ই সেটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

৩২. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪১।
৩৩. *JIH*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৯।
৩৪. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৭-১৮।
৩৫. ১ম অধ্যায়, ১ম অংশ দ্রষ্টব্য।

জন্য চাষীকে সারা বছর খাটতে হতো। বাকিটুকু শোধ হতো মজুরি থেকে।[৩৬] এর পর প্রকৃত উৎপন্নের ওপর ভিত্তি করে রাজস্ব দাবি করার নির্দেশনামা কতটা সফল হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ১৬৭৪-৫ সালে ফ্রায়ার লক্ষ্য করেন যে সুরাট অঞ্চলের চাষীদের মাঠ থেকে শস্য তুলতে দেওয়া হয় না, যদি না তারা উৎপন্নের তিনের-চার ভাগ কর্তৃপক্ষের কাছে সমর্পণ করে।[৩৭]

বেরার 'নসক'-এর আওতায় ছিল—শুধুমাত্র এ কথা ছাড়া মুঘল দখিন সম্বন্ধে 'আইন'-এ আর কোন প্রাসঙ্গিক তথ্যই নেই।[৩৮] সাদিক খান অবশ্য বলেছেন যে দখিনের প্রদেশগুলিতে "প্রাচীন কাল থেকে" জরিপ বা শস্য-ভাগ কোনটিই করা হতো না। তিনি বলেছেন, "বরং প্রচলিত রীতি ছিল এই যে, প্রত্যেক গ্রামবাসী ও চাষী একটা লাঙল আর একজোড়া বলদ দিয়ে যতটা পারে ততটা জমিই চাষ করবে আর খুশিমতো ফসল বুনবে; শস্য কিংবা আনাজপাতি যাই হোক। কর্তৃপক্ষকে ('সরকার') লাঙল পিছু সে সামান্য কিছু টাকা দিত, অঞ্চল এবং পরগনা অনুযায়ী তার হেরফের হতো। এর পর ফসলের পরিমাণ সম্পর্কে আর কোন খোঁজ নেওয়া হতো না বা সে সম্পর্কে কিছুই ভাবা হতো না।"[৩৯] এই হয়তো ছিল সাধারণ রীতি, কিন্তু ১৬৪২-৩ সালে লেখা একটি নথি থেকে মনে হয়, কয়েকটি পরগনায় অন্তত জরিপের ভিত্তিতে এক ধরনের 'নসক' প্রয়োগ করা হচ্ছিল।[৪০] এও সম্ভব যে, এই রীতি এবং অন্যান্য রীতিগুলো মুঘল প্রশাসনই বিভিন্ন অঞ্চলে চালু করেছিল, আকবরের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের পাঁচ থেকে ছ দশকের মধ্যে। ১৬৫৩-য় দখিন থেকে আওরঙ্গজেব

৩৬. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৮। এই অংশটি আছে একটি ফরমানের 'শরহ্-এ জিম্ন্' ('পেছন পিঠে লেখা ব্যাখ্যা')-য়। আহ্মেদাবাদ প্রদেশে বেআইনী আদায় ('আবওয়াব-এ মমনুআ') বন্ধ করার সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে (ঐ, পৃ. ২৫৯)।

৩৭. ফ্রায়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০-৩০১।

৩৮. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৮।

৩৯. সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ১৮৫ ক-খ, Or. 1671, পৃ. ৯০ খ; খাফী খান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩২ টীকা।

৪০. এর শিরোনাম হলো 'জমির হিসাবের স্মারকলিপি' ('ইয়াদ্দাশ্‌ৎ-এ তজবীজ-এ জমিন')। আটাশটি পরগনা বিষয়ে এটি লেখা, কিন্তু তার মধ্যে তিনটি পরগনা প্রয়োজনীয় বিবরণ দাখিল করেনি। মোট এলাকা দাঁড়িয়েছিল ১,৯০,০০৬ বিঘা, ১৩ বিশ্বা। প্রত্যেক পরগনায় জমির একটা এলাকা বরাদ্দ করা হয়েছে চাষ আবাদের সাধারণ জমির জন্য, আর কিছুটা 'বাগাত'-এর জন্য। 'বাগাত' কথাটির আক্ষরিক অর্থ বাগান, কিন্তু দখিনে এর ব্যবহার হতো কুয়োর জলে সেচ করা জমি বোঝাতে (তুলনীয়, খাফী খান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩৫ টীকা)। কয়েকটি অঙ্কের আগে লেখা আছে 'তজবীজ-এ হাল', 'হালে প্রস্তাবিত'। তার মানে, এগুলো আগের বরাদ্দ এলাকার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছিল। দলিলটি কোন্ জমির বিষয়ে—খালিসা না আওরঙ্গজেবের জাগীর—তা স্পষ্ট নয় ('সিলেক্টেড ডকুমেন্টস্ অফ শাহ্জাহানস্ রেন', পৃ. ১০১-১০৭)।

লিখেছিলেন যে রাজস্ব কর্তৃপক্ষ যে "বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি" ('জওয়াবিৎ-এ গুনাগুন') অনুসরণ করে, তা-ই "ঐ দেশের দুরবস্থার একটি কারণ।"[৪১]

১৬৫২ সালে আওরঙ্গজেবকে যখন দ্বিতীয়বার দখিনের সুবাদার করে পাঠানো হয়, তখন তাঁর ওপর ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা উন্নতি করার বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।[৪২] এই সংস্কারের অধিকাংশই করেছিলেন মুর্শিদ কুলী খান, তাঁকে সাহায্য করেছিলেন মুলতাফৎ খান।[৪৩] শস্য-ভাগের সুবিদিত উপায় দিয়ে এই সংস্কার শুরু হয়। আওরঙ্গজেবের চিঠিপত্র থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায় যে জাগীরদারদের বরাতের জায়গা সমেত তাঁর দায়িত্বভুক্ত অঞ্চলের সর্বত্রই এর প্রয়োগ হয়েছিল।[৪৪] শস্য-ভাগের যে বিশেষ রূপটি ব্যবহার করা হয়েছিল, বলা হয় সেটি মুর্শিদ কুলী খানের নিজস্ব উদ্ভাবন।[৪৫] এই পদ্ধতিতে যে-যে অনুপাতে রাজস্ব সংগ্রহ করা হবে, তার মাত্রা ছিল বিভিন্ন। যেখানে শুধুমাত্র বৃষ্টির জলে চাষ হয় সেখানে নেওয়া হবে উৎপন্নের অর্ধেক; যেখানে কুয়োর জলে সেচ হয় সেখানে শস্যের একের-তিন ভাগ, কিন্তু আখ, ফল এবং মসলার ক্ষেত্রে, সেচের খরচ আর (ফলের ক্ষেত্রে) ফলনের সময় অবধি বাড়তে গাছের যতদিন লেগেছে, সে কথা খেয়াল রেখে ভাগের পরিমাণ হবে একের-তিন থেকে একের-চার ভাগ। খাল এবং নালার জলে সেচ হওয়া বিভিন্ন শস্যের জন্যও আলাদা আলাদা হার ধার্য করা হয়েছিল। সাদিক খান আরও বলেছেন যে লাঙলের সংখ্যা দিয়ে রাজস্ব নির্ধারণের পুরনো ব্যবস্থা তখনও কোন কোন এলাকায় বজায় ছিল, অন্যান্য এলাকায় চালু করা হয় জরিপের রীতি। বলা হয়, জরিপের উদ্দেশ্যে মুর্শিদ কুলী খান প্রতি শস্যের 'রাই' তৈরি করেছিলেন আর তার দাম হিসেব করে বিঘা প্রতি 'দস্তুর'ও বেঁধে দিয়েছিলেন।[৪৬] আওরঙ্গজেব জরিপ সম্বন্ধে কিছুই বলেননি। কিন্তু তিনি

৪১. 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ৩৬ ক; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', নদভী সম্পা. পৃ. ৯৭।

৪২. 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ২৬ খ; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', পৃ. ৬৯।

৪৩. মুর্শিদ কুলী খান গোড়ায় ছিলেন বালাঘাটের 'দিওয়ান', মুলতাফৎ খান ছিলেন পাইনঘাটের। মুলতাফৎ খানকে পরে অন্য দায়িত্বে বদলি করা হয়, মুর্শিদ কুলী খান-ই গোটা মুঘল দখিনের 'দিওয়ান' হয়ে যান।

৪৪. 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ৩৫ ক, ৩৬ ক-খ, ৩৮ খ, ৪৩ ক, ১১৮ ক; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', পৃ. ৯৭, ৯৯, ১০২, ১১৩ ও ১১৭।

৪৫. মুর্শিদ কুলী খানের সংস্কারের বিষয়ে সাদিক খানের বিবরণীতে এই তাৎপর্যপূর্ণ কথাটি পাওয়া যায়। খাফী খান কিন্তু এর কথা বলেননি। মোরল্যাণ্ড তাই জানতেন না যে, ইতিমধ্যেই একজন সমসাময়িক ঐতিহাসিক এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে ভারতের প্রচলিত রীতিতে এই জাতীয় "বিভিন্ন হারে ভাগাভাগি"র কথা জানা ছিল না। এটি এসেছিল সম্ভবত পারস্য প্রশাসন বিষয়ে মুর্শিদ কুলী খানের অভিজ্ঞতা থেকে ('এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', পৃ. ১৮৬)।

৪৬. সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ১৮৫ খ-১৮৬ ক, Or. 1671, পৃ. ৯১ ক; খাফী খান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩৩-৪ টীকা। বলা হয়েছে যে মুর্শিদ কুলী খান 'রাই' তৈরির ব্যাপারে এতই নজর দিতেন যে ভুলচুক এড়ানোর জন্য নিজেই জরিপের দড়ির এক দিক ধরতেন। মনে হয় রাজস্ব

এই ঘোষণা করেন যে, শস্য-ভাগ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য পদ্ধতি বলে প্রমাণ হয়েছে।[৪৭] তাই মনে হয় না তিনি এটিকে স্থায়ী করার কথা ভেবেছিলেন। সাদিক খান তো বলেইছেন যে মুর্শিদ কুলী খান অধিকাংশ পরগনার এলাকা জরিপ করিয়েছিলেন।[৪৮] আনুমানিক ১৬৭৯ সালে বেরারের পপল পরগনার রাজস্ব-নথিতে সেখানকার জরিপ-করা এলাকার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।[৪৯] কিন্তু চূড়ান্ত সাক্ষ্য পাওয়া যায় আওরঙ্গজেবের আমলের গ্রাম ও এলাকা পরিসংখ্যান থেকে। তাতে দেখা যায় বেরার এবং আওরঙ্গাবাদের গ্রামগুলির প্রায় নয়ের-দশ ভাগ আর খান্দেশের প্রায় অর্ধেক জরিপ করা হয়েছিল।[৫০] তাই মনে হয়, মুর্শিদ কুলী খানের সংস্কারের প্রধান ফল হয়েছিল জরিপের প্রবর্তন। শস্য-ভাগ করা হতো শুধু গোড়ার দিকে বিভিন্ন শস্যের ক্ষেত্রে কাজ চালানোর মতো 'রাই' ঠিক করার জন্য।[৫১]

আবুল ফজল বলেছেন, বাংলায় "চাষীরা অনুগত ও খেরাজী [রাজস্ব দিয়ে থাকে]। প্রতি বছরে আট মাস ধরে তারা কিস্তিতে কিস্তিতে (রাজস্ব) দাবি মিটিয়ে দেয় ও নিজেরাই নির্দিষ্ট জায়গায় টাকা ও 'মোহর' নিয়ে আসে। শস্য-ভাগ করা হয় না। সর্বদাই কম দামের অবস্থা ('অরজানী') বজায় থাকে। তারা জরিপেও আপত্তি করে না।[৫২] রাজস্ব দাবির ভিত্তি হলো 'নসক'। দুনিয়াজাদা দয়াপরবশ হয়ে এই ব্যবস্থাই ('আইন') চালু রেখেছেন।"[৫৩] আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে বাংলায়

নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সাধারণ জরিপ প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়নি। নমুনা এলাকা, যার মোট উৎপাদন জানা আছে, তার বিঘা পিছু উৎপাদনের হার, অর্থাৎ 'রাই' বা শস্য-হার তৈরির জন্য জরিপের কথাই এখানে বলা হয়েছে।

৪৭. 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ৩৮ খ, ১১৮ ক; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', ১১৭।

৪৮. সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ১৮৫ খ, Or. 1671, পৃ. ৯০ খ-৯১ ক; খাফী খান, ১ম খণ্ড, পৃ ৭৩৩ টীকা।

৪৯. *IHRC*, ১৯২৯, পৃ. ৮১, ৮৪-৮৬ দ্রষ্টব্য।

৫০. ১ম অধ্যায়, ১ম অংশ দ্রষ্টব্য।

৫১. এটি মূলে সেই একই পদ্ধতি, গ্রাণ্ট-ডাফ যার কৃতিত্ব মালিক অম্বরের ওপর আরোপ করেছেন। অর্থাৎ "মোট উৎপাদনের একটা মাঝারি গোছের অনুপাত জিনিসে" সংগ্রহ করা "যা কয়েক মরসুমের অভিজ্ঞতার পর নগদে পরিণত করে নেওয়া হতো আর বছর-বছর আবাদ অনুযায়ী ঠিক করা হতো।" ('হিস্ট্রি অফ দা মারাঠাস্', ১৮২৬, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫, 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', পৃ. ১৮২-তে উদ্ধৃত)।

৫২. এই বাক্যটি তর্জমা করা কোন মতেই সহজ নয়: ব্লখমানের সংস্করণে পাঠ আছে "ওঅ দর পয়মূদন-এ আন বাজ নগোইয়ন্দ", 'এবং তারা এটি নতুন করে জরিপ করতে বলে না (কিংবা শুধু, জেদ ধরে না)'। কিন্তু Add. 7652 এবং Add. 6552 দু জায়গাতেই গোড়ায় 'ওঅ' বাদ পড়েছে এবং 'অজ'-এর জায়গায় আছে 'দর'। ফলে ওপরে মূলের যে-তর্জমা দেওয়া হয়েছে তা-ই দাঁড়ায়। ঠিকমতো বললে "এটি" সর্বনামটির মানে হওয়া উচিত 'অরজানী' বা 'সুলভতা', কিন্তু তার কোন মানে হয় না। মোরল্যাণ্ডের মতো ধরে নিতে হবে (*JRAS*, ১৯২৬, পৃ. ৪৫) যে এখানে "এটি" মানে নিশ্চয়ই জমি।

৫৩. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৯।

কর্তৃপক্ষ রাজস্ব দাবি চাষীদের ওপর ধার্য করত না, করত জমিনদারদের উপর। অবশ্য, এই অংশে আবুল ফজল কোথায় যে জমিনদারদের কাছে চাষীদের রাজস্ব-দাখিলের কথা বলেছেন, আর কোথায় রাষ্ট্রের কাছে জমিনদারদের রাজস্ব দাখিলের কথা— তা পড়ামাত্রই পরিষ্কার বোঝা যায় না। প্রাথমিক বিবৃতিগুলিতে যেহেতু সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, তাই মনে হয় সেখানে শুধু চাষীদের কথাই বলা হয়েছে। এমনকি ইংরেজ প্রশাসনের গোড়ার দিকেও 'রায়ত'-রা সাধারণত খাজনা দিত নগদে আর শস্য-ভাগ অনুসৃত হতো শুধু "কয়েকটি জায়গায়"।[৫৪] জরিপ সংক্রান্ত বাক্যটি অবশ্য কিছু অসুবিধার সৃষ্টি করে। 'আইন'-এ বাংলার পরিসংখ্যানে কোন এলাকার অঙ্ক নেই। আওরঙ্গজেবের আমলের পরিসংখ্যানেও জরিপ-হওয়া গ্রামের সংখ্যা মোট গ্রামের অনুপাতে অতি সামান্য।[৫৫] অন্যদিকে, আফগান রাজত্বে এক জাগীর-দারের রাজস্ব কর্মচারী জরিপ করতে গিয়ে ঠকাচ্ছে এ কথার উল্লেখ করেছেন ১৬ শতকের জনৈক বাঙালী কবি।[৫৬] জাহাঙ্গীরের আমলেও একটি রাজস্ব-বরাতের 'জমা' ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য 'জরিপ'-এর উল্লেখ আছে।[৫৭] একটি পরবর্তী বিবরণ অনুযায়ী, আওরঙ্গজেবের আমলের শেষ দিকে বাংলা ও ওড়িশার নায়েব-নাজিম (উপ-প্রদেশকর্তা) নিযুক্ত হওয়ার পর, মুর্শিদ কুলী খান পুরনো রাজস্ব ব্যবস্থা আমূল সংস্কার করেছিলেন আর প্রতিটি গ্রামের সব ধরনের জমি—আবাদী ও অহল্যা ভূমি—জরিপ করার জন্য রাজস্ব কর্মচারীদের পাঠিয়েছিলেন।[৫৮] এমনও হতে পারে যে জমিনদারের ওপর নির্দিষ্ট পুরনো 'জমা' একেবারে বাতিল হয়ে গেলে, কর্তৃপক্ষ কখনও কখনও জরিপের আশ্রয় নিতেন। ১৮ শতকের মধ্যভাগের একটি প্রশাসনিক পুস্তিকায় বলা হয়েছে, এটাই ছিল বাংলার স্বীকৃত রীতি।[৫৯] তারা জরিপেও আপত্তি করে না—আবুল ফজলের এই ধোঁয়াটে কথার প্রকৃত অর্থও বোধহয় এ-ই। এমনও হতে পারে যে, এই ধরনের জরিপ হতো কালেভদ্রে, আর তা-ও আবার আঞ্চলিক মানের সাহায্যে,[৬০] তার ভিত্তিতে কোন নিয়মিত এলাকা-পরিসংখ্যান তাই

৫৪. শোর-এর 'মিনিট', জুন ১৭৮৯, অনুচ্ছেদ ২২৬, 'ফিফ্থ্ রিপোর্ট', মাদ্রাজ, ১৮৮৩, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪০।

৫৫. ১ম অধ্যায়, ১ম অংশ দ্রষ্টব্য (আওরঙ্গজেবের আমলের পরিসংখ্যান সারণি)।

৫৬. মুকুন্দরাম, 'চণ্ডীমঙ্গল', সুকুমার সেন, 'হিস্ট্রি অফ বেঙ্গলি লিটরেচর', ১২৪, ৩৯৩-এ উদ্ধৃত; তুলনীয় রায়চৌধুরী, 'বেঙ্গল আণ্ডার আকবর অ্যাণ্ড জাহাঙ্গীর', পৃ. ২৫।

৫৭. 'বাহারিস্তান-এ গাইবী', বোরা অনূদিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪১-২। এই অংশটি মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারিনি বলে আমি দুঃখিত। মূল রচনাটি কখনই প্রকাশিত হয়নি, এর একটি মাত্র পুঁথি আছে পারী-র জাতীয় গ্রন্থাগারে।

৫৮. 'রিয়াজ-উস সালাতিন', বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা, পৃ. ২৫২।

৫৯. 'রিসালা-এ জিরাৎ', পৃ. ৯ খ-১০ ক।

৬০. ১৮-শতকের শেষদিকে কোন কোন অঞ্চলে জমিনদাররা চাষীদের প্রদেয় খাজনা স্থির করতেন জরিপের ভিত্তিতে। কিন্তু শোর লক্ষ্য করেছিলেন যে স্থানীয় মানগুলোর মধ্যে প্রচুর হেরফের হতো (জুন, ১৭৮৯-এর 'মিনিট', অনুচ্ছেদ ২৩০ ও ২৩১, 'ফিফ্থ্ রিপোর্ট', পূর্বোক্ত সূত্র, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪০-৪১)।

সঙ্কলন করা যায়নি। রাজস্ব দাবি করা হতো 'নসক'-এর ভিত্তিতে—আবুল ফজলের এই উক্তি নিশ্চয়ই জমিনদারদের ওপর চাপানো দাবিরই প্রসঙ্গে। আগেই দেখানো হয়েছে যে, বাংলায় দীর্ঘ কয়েক বছর জুড়ে ঐ দাবি যে মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকত সে সম্পর্কে আমাদের হাতে ভালোই সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে।[৬১]

৪. নির্ধারণের মূল একক : কৃষকের ব্যক্তিগত জোত ও গ্রাম

আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে সরকারী ঘোষণায় যে বিষয়টি বারবার ঘুরে ফিরে আসে তা হলো এই যে, গ্রামের ক্ষমতাশালী লোকরা সর্বদাই তাদের দুর্বল ভাইদের কাঁধে নিজের বোঝাটা চাপিয়ে দিতে চায়। মুঘল প্রশাসনের লক্ষ্য ছিল (অন্তত 'হিন্দুস্তানে', যেখানে 'জব্ৎ' ব্যবস্থাই ছিল প্রধান) প্রত্যেক চাষীর সঙ্গে আলাদা করে বোঝাপড়া করা, বিশেষ করে রাজস্ব-দাবি নির্ণয় বা আদায় করার সময়ে। 'আইন'-এ বলা হয়েছে যে, 'আমলগুজার' কখনওই "গ্রামের হোমরা-চোমরা লোকদের সঙ্গে 'নসক' করবে না, কেননা তার থেকে দেখা দেয় প্রশয় ও অজ্ঞতা। আর এতে মদত দেওয়া হয় অত্যাচারপ্রবণ প্রভাবশালী লোকদের। সে বরঞ্চ প্রত্যেক কৃষকের কাছে গিয়ে ভদ্রভাবে তার হাতে একটি লিখিত দলিল দেবে ও তার কাছ থেকে একটি দলিল নেবে।"[১] এক শতাব্দী পরে লেখা একটি পুস্তিকায় ব্যক্তিগত নির্ধারণ নীতির সুপারিশ প্রসঙ্গে ঐ একই যুক্তি দেওয়া হয়েছে।[২]

এইমাত্র 'আইন'-এর যে অংশ উদ্ধৃত করা হল তাতে যে দুটি দলিলের উল্লেখ আছে, তা অবশ্যই 'পাট্টা' এবং 'কবুলিয়ৎ'। জনৈক চাষীকে ব্যক্তিগতভাবে দেওয়া 'পাট্টা'-র একটি নমুনা একটি পুস্তিকায় রক্ষিতও আছে।[৩] অন্যত্র আমরা এমন কিছু আদেশনামা পাই যা একজন মাত্র চাষীর অভিযোগের উত্তরে পাঠানো। তার অভিযোগ : তাকে যে পাট্টা মঞ্জুর করা হয়েছিল তা ঠিকমতো মানা হচ্ছে না।[৪]

'আইন'-এ বলা হয়েছে যে প্রত্যেক 'বিতিকৃচী' বা হিসাবরক্ষক অবশ্যই প্রত্যেক চাষীর নামের সঙ্গে পূর্বপুরুষের নাম,[৫] যে-শস্য সে বুনেছে, এবং সেই শস্যের ওপর নির্ধারিত 'জমা'র পরিমাণ নথিভুক্ত করাবে। তারপর সব ব্যক্তিগত ধার্যের পরিমাণ যোগ করে সেটিকে গ্রামের রাজস্ব ('মহ্সূল') বলে লিখে রাখবে।[৬] আরও সংক্ষেপে,

৬১. ৫ম অধ্যায়, ৩য় অংশ দ্রষ্টব্য।

১. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৬।

২. 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৮ ক, Or. 2026, পৃ. ৩০ ক।

৩. 'ফরহঙ্গ-এ কারদানী', পৃ. ৩৫ ক।

৪. 'দুর্-আল উলুম', পৃ. ৬২ ক।

৫. 'পূর্বপুরুষ' শব্দটির ক্ষেত্রে আবুল ফজল প্রচলিত শব্দ 'নিয়া'-র জায়গায় ব্যবহার করেছেন 'নিয়াগ'। পূর্বপুরুষের নাম যোগ করাটা সম্ভবত সনাক্ত করার প্রাথমিক প্রয়োজনেই লাগত। তবে 'ভাইয়াচারা' গ্রামে এর একটি অতিরিক্ত তাৎপর্যও থাকতে পারত : চাষীর হাল-হকিকত ঠিক করা।

৬. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৮।

কিন্তু ঐ একই ভঙ্গিতে, রসিকদাসের উদ্দেশে আওরঙ্গজেবের ফরমানের তৃতীয় অনুচ্ছেদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে : প্রত্যেক গ্রামের 'জমা' স্থির করতে হবে ব্যক্তিগতভাবে ('অসামী-ওয়ার') চাষীদের রাজস্ব-নির্ধারণের পর। একইভাবে ঐ আমলের দুটি পুস্তিকায় উদ্ধৃত নির্ধারণ-সংক্রান্ত কাগজপত্রের নমুনায় দেখা যায়, আলাদা করে প্রত্যেক চাষীর জন্য ('অসামী') সমস্ত বিবরণ দেওয়া আছে, বা সেগুলি পূরণ করে নিতে হবে।[৭]

আওরঙ্গজেবের ফরমানে এ কথার ওপরেও জোর দেওয়া হয়েছে যে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুন ক্ষয়ক্ষতি মেটাবার জন্য নির্ধারকের এক থোকে ছাড় দেওয়া উচিত নয়, 'চৌধুরী', 'কানুনগো', 'মুকদ্দম' এবং 'পাটোয়ারী'দের ওপর চাষীদের মধ্যে ছাড় বিলি করার কাজ যেন সে ছেড়ে না দেয়। তার উচিত নিজেই ক্ষেতগুলো ঘুরে দেখা, তারপর প্রত্যেক চাষীর জন্য ছাড়ের পরিমাণ আলাদাভাবে হিসেব করা।[৮]

সবশেষে, রাজস্ব আদায় হয়ে গেলে 'সরখাৎ' অর্থাৎ, চাষীদের কাছে দেওয়া 'মুকদ্দম' এবং 'পাটোয়ারী'দের রসিদ বা দলিল পরীক্ষা করে 'বিতিকচী' দেখবে 'ওয়াসিল' আর 'জমা' মিলেছে কিনা।[৯] আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি, কোন রকম অন্যায় আত্মসাৎ হচ্ছে কিনা তা খুঁজে বার করার জন্য প্রশাসন কীভাবে মাঝে-মধ্যে 'কাগজ-এ খাম' বা গ্রামের হিসেবপত্র পরীক্ষা করত। চাষীরা যা যা দাখিল করেছে তা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হতো। বিশেষভাবে বলে দেওয়া ছিল যে, পাওনার বেশি নেওয়া হয়েছে ধরা পড়লে সেই বাড়তি আদায় ফেরত দিতে হবে, আর সেইসব চাষীর প্রদেয় রাজস্বের বকেয়া অংশ থেকে তা বাদ দিতে হবে।[১০]

আসল প্রশ্ন হলো : এইসব নিয়মকানুন বাস্তব ক্ষেত্রে কতটা কার্যকর ছিল। প্রত্যেক চাষীর ওপর আলাদা করে প্রতি বছর রাজস্ব নির্ধারণ করায় অসুবিধা যে কী ছিল তা খুবই স্পষ্ট। শস্য-ভাগের বিশুদ্ধ রূপের বেলায় এই সমস্যাটির সমাধান সম্ভবত আপনা থেকেই হয়ে যেত, কেননা রাজস্বের ভাগ আদায় হতো সরাসরি মাঠ থেকে বা প্রত্যেক চাষীর শস্যের গাদা থেকে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাছে এই পদ্ধতিটি ছিল খুবই জটিল ও ব্যয়সাধ্য। অন্য যে কোন পদ্ধতিতে আলাদা করে প্রত্যেক

৭. 'দস্তুর-আল আমল-এ নভিসিন্দগী', পৃ. ১৮২ ক-১৮৫ ক ; 'ফরহঙ্গ-এ কারদানী', পৃ. ৩৩ খ ; 'সিয়াকনামা', ৩২-৩৩ ; 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৫ ক-৭৬ খ, Or. 2626, পৃ. ২৪ খ-২৮ ক।

৮. রসিকদাসের উদ্দেশে ফরমান, অনুচ্ছেদ ৯। 'নাবুদ' বা কোন বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জমিতে ছাড় দেওয়ার জন্য 'আইন'-এ 'আমলগুজার'দের প্রতি যে নির্দেশ আছে, তার থেকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে তাকে প্রত্যেক চাষীর জন্য আলাদা করে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করতে হতো। "চাষী"র কাছে তাকে লিখিতভাবে একটি হিসেব দিতে হতো, এবং ফসল কাটার পর বিপর্যয় ঘটে থাকলে, সাক্ষী হিসেবে "পড়শীদের" ডাকতে হতো ('আইন', ১ম খণ্ড, ২৮৬)।

৯. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৮।

১০. ফতহ্উল্লা সিরাজী-র সুপারিশ : 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৭-৮। সেই চাষীর যদি চলতি বছরে দেওয়ার মতো কোন 'বকেয়া' না থাকে, তবে তার পরের বছরের 'জমা' থেকে ঐ পরিমাণ বাদ যাবে।

জোতের ওপর নির্ধারণ করার চেয়ে গোটা গ্রামের রাজস্ব নির্ধারণ করা অনেক সহজ হতো। একটি পুস্তিকা থেকে আভাস পাওয়া যায় যে গ্রামের উপর যৌথভাবে ('সরবস্তা') রাজস্ব নির্ধারণই ছিল সাধারণ রীতি—যদিও তা ঠিক কাম্য নয়।[১১] আরেকটি পুস্তিকায় গ্রামের রাজস্ব নির্ধারণের উপায় সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে, কিন্তু ব্যক্তিগত জোতের ওপর রাজস্ব নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তার কোন উল্লেখই নেই।[১২] রসিকদাসের উদ্দেশে আওরঙ্গজেবের ফরমানে ব্যক্তিগতভাবে নির্ধারণ করতেই বলা হয়েছে, তবুও এর মুখবন্ধে রাজস্ব নির্ধারণ এবং আদায়ের চলতি পদ্ধতি-গুলোর যে-বিবরণ দেওয়া আছে, তাতে দেখা যায় গ্রামই হলো নির্ধারণের প্রাথমিক একক, চাষী নয়। তাছাড়া, ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে স্বয়ং 'দিওয়ান'কে বলা হয়েছে, তিনি যখন ঘুরে দেখতে বেরোবেন তখন যেন দেখেন গ্রামের 'জমা' তার [সেই গ্রামের] সঙ্গতির উপযোগী কিনা, আর, চাষীদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে সেই 'জমা'র বাঁটোয়ারা ('তফরীক-এ জমা') করার ক্ষেত্রে 'চৌধুরী', 'মুকদ্দম' বা 'পাটোয়ারী'রা পীড়নের দায়ে দোষী কিনা। এইভাবে, সাধারণ ক্ষেত্রে ধরেই নেওয়া যায় যে, 'আমিন' বা নির্ধারক শুধু গোটা গ্রামের রাজস্ব নির্ধারণ করে দিয়েই ক্ষান্ত থাকত, চাষীদের কাছ থেকে পাওনার খুঁটিনাটি ঠিক করত গ্রামের মোড়ল। এমনকি আকবরের আমলের নিয়মকানুনেও এমন ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায় যেখানে প্রকৃত নির্ধারণ করা হয়েছে গ্রামের ওপর, "অসামী"-র ওপর নয়। খালিসা-য় প্রত্যেক গ্রাম ফি-বছর জরিপ করা হবে না, কেবল এক ধরনের 'নসক' রূপে গ্রামের বরাদ্দ এলাকা আনুমানিক হিসেবমতো বাড়িয়ে যেতে হবে—তোডর মলের এই সুপারিশ এই ইঙ্গিতই দেয় যে, প্রত্যেক জোত খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে এলাকা বাড়ানো হবে না, বাড়ানো হবে শুধু গোটা গ্রামের ওপর নজর রেখে।[১৩] এই সমস্ত তথ্য মনে রাখলে এ কথা অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, যেখানে রাজস্ব নির্ধারণের সরকারী কাগজপত্রে 'অসামী-ওয়ার' অন্তর্ভুক্তি দেখা যায়, সেখানে অধিকাংশ সময়েই এগুলি হয় সম্পূর্ণ মনগড়া কিংবা সেগুলি নকল করা হয়েছে বা নেওয়া হয়েছে গ্রামের হিসাব-রক্ষক অথবা মোড়লদের কাগজপত্র থেকে।

'রাইয়তী' বা চাষীদের অধিকৃত গ্রামের অবস্থাই যদি এই হয়, তাহলে এ অনুমান আরও দৃঢ় হচ্ছে যে, যে সমস্ত গ্রাম ছিল জমিনদারদের দখলে সেখানে রাজস্ব কর্মচারী শুধু গোটা গ্রামের জন্য রাজস্ব নির্ধারণ করত, আর জমিনদারকে তা দাখিল করতে হতো। ব্যক্তিগতভাবে চাষীদের মধ্যে নির্ধারিত রাজস্ব ভাগ-বাঁটোয়ারা করার ব্যাপারে কর্মচারী মাথাই ঘামাত না। অবশ্য এটা যে একটা অনুমোদিত রীতি ছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। ইতিমধ্যেই পঞ্চম অধ্যায়ে দেখা গেছে, সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি বোধহয় এই ছিল যে, জমিনদার নেহাৎই একজন মধ্যস্বত্বভোগী, আসলে রাজস্ব ধার্য হতো চাষীদের ওপর।[১৪]

১১. 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৮ ক, Or. 2026, পৃ. ৩০ ক।

১২. 'হিদায়েৎ-আল কওআইদ', পৃ. ১০ ক-১১ ক।

১৩. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮১-২।

১৪. ৫ম অধ্যায়, ৩য় অংশ দ্রষ্টব্য।

১৫. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৬।

অবশ্য, এমন কতকগুলো ব্যবস্থা ছিল যাতে করে চাষীদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে বোঝাপড়া হচ্ছে— কাগজে-কলমেও এমন কোন ভান রাখা সম্ভব হয়নি। আবুল ফজল বলেছেন যে শস্য-ভাগের সঙ্গে 'মুক্তাঈ' নামে পরিচিত একটি পদ্ধতিও সুর বংশের আমলে বিলোপ করা হয়েছিল।[১৫] ব্যুৎপত্তিগতভাবে আরবী মূল 'কৎ' থেকে তৈরি বিভিন্ন শব্দ ভারতের ভিতরে ও বাইরে রাজস্ব সংক্রান্ত লেখাপত্রে সবচেয়ে বিচিত্র অর্থ বহন করে এসেছে।[১৬] 'মজহার-এ শাহ্জাহানী'তে 'মুক্তাঈ' শব্দটি বেশ কয়েকবার ব্যবহার করা হয়েছে নিশ্চয়ই 'নির্দিষ্ট পরিমাণ' অর্থে।[১৬ক] এটি আসলে একটি সমাসবদ্ধ পদ, যার অর্থ হলো এমন এক ব্যবস্থা যাতে 'মুক্তা' বর্তমান। 'মুক্তা' শব্দটি কখনই ১৭ শতকের রাজস্ব সংক্রান্ত লেখাপত্রে এককভাবে দেখা যায় না। এটি সর্বদাই 'বিল মুক্তা' এই বাক্যাংশের মধ্যে এসেছে। শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো 'চুক্তিবদ্ধ, নির্দিষ্ট'।[১৭] কিন্তু আমাদের নথিপত্রে সর্বদাই শব্দটিকে দেখা যায় পর্যায়ক্রমে প্রদেয় নির্দিষ্ট পরিমাণ বোঝাতে। কর্মচারীদের নির্দিষ্ট হারে যে বেতন দেওয়া হতো সেই প্রসঙ্গে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।[১৮] মুহম্মদ হাসিমের উদ্দেশে আওরঙ্গজেবের ফরমানের চতুর্থ অনুচ্ছেদে বিঘা প্রতি নির্দিষ্ট রাজস্ব হার বোঝাতেও শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। অন্যান্য নথিতে অবশ্য এর বিশেষ তাৎপর্য হলো গোটা গ্রাম বা আরও বড় এলাকার নির্দিষ্ট রাজস্ব দাবি।[১৯] ইজারার নথিপত্রে শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে এই যে, ইজারাদার চাষীদের কাছ থেকে যা-ই আদায় করুক না কেন,

১৬. যথা: 'ইক্তা', রাজস্ব-বরাত ও 'মুকাতআ', ইজারা। এ দু-এর কোন্‌টির সঙ্গে আবুল ফজলের শব্দটি যুক্ত করবেন মোরল্যাণ্ড সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন না ('এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', ৭৪)। ইজারা অর্থে 'মুকাতআ' শব্দটির জন্য দ্রষ্টব্য, বরনী, 'তারিখ-এ ফিরুজ-শাহী', ৪৮৭-৮; Add. 7721, পৃ. ১৪ খ; এফ. লকেগার্ড, 'ইসলামিক ট্যাক্সেশন ইন দ্য ক্লাসিক পিরিয়ড', কোপেনহেগেন, ১৯৫০, পৃ. ১০২-৮, ল্যামটন, 'ল্যাণ্ডলর্ড অ্যাণ্ড পিজাণ্ট ইন পার্সিয়া', পৃ. ৪৩৫।

১৬ক. 'মজাহার-এ শাহজাহানী', ১৩৪: "বারীছার যে বালুচরা বুবকান পরগনার পাহাড়ে বাস করে, তারা সেহ্‌ওয়ানের জাগীরদারকে প্রতি ফসলের সময় কিছু সংখ্যক উট ও ভেড়া দেয়। (শামশের খানের আমলে) তারা ঐ 'মুক্তাঈ'-এর চেয়ে কম দিতে শুরু করে" ইত্যাদি। আরও দ্রষ্টব্য পৃ. ২৮, ২৯, ৬০, ৮৫।

১৭. দ্রষ্টব্য: স্টাইনগাস, 'পার্সিয়ান-ইংলিশ ডিকশনারি', ১৫১; এলিয়ট, 'মেমোআর্স'…, ২য় ভাগ, পৃ. ২৪। আমি নিশ্চিত জানি না, কোন্ বানানটি ঠিক: 'মক্তা' (স্টাইনগাস) 'মুক্তা' (এলিয়ট)। শেষেরটিই নিলাম, কারণ এটিরই ভারতীয় উচ্চারণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

১৮. 'সিলেকটেড ডকুমেন্টস্ অফ শাহ্জাহানস্ রেন', পৃ. ৬৪, ১৭৯, 'ওয়াকাই-এ দখিন', ৪৯।

১৯. তুলনীয় এলিয়ট, পূর্বোক্ত সূত্র। তিনি বলেছেন যে 'বিল মুক্তা' মানে "লাঙল পিছু বা বিঘা পিছু এতটা করে" বাঁধা হার, আর সেই সঙ্গে "যে জমিতে চাষ হয় তার জন্য একটা বাঁধা অঙ্কের টাকা খাজনা দিতে চুক্তিবদ্ধ হওয়া"। শেষে তিনি যোগ করেছেন যে "এটি প্রায়ই 'থোক টাকায়' বা 'মোটমাট' অর্থে ব্যবহার করা হয়।"

জাগীরদারের কাছে তাকে একটা বাঁধা অঙ্ক দাখিল করতে হবে নগদে।[২০] অনুরূপ-ভাবে কয়েকটি গ্রামের স্বত্বাধিকারীদের ('মালিক') ওপর চাপানো নির্ধারিত রাজস্বকে বলা হয়েছে 'বিলমুক্তা'। যে অঙ্কগুলো সত্যিই দেওয়া আছে সেগুলো থেকে দেখা যায় পরপর দু-বছর নির্ধারণের পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল।[২১] আওরঙ্গজেবের আমলের নথিপত্রের একটি সংগ্রহে, মুহম্মদ হাসিমের উদ্দেশে ফরমানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া একটি অংশ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এমন গ্রামও ছিল যেখানে জমির মালিকানা থাকত চাষীদেরই হাতে। তাঁরা শুধু বাঁধা অঙ্কের রাজস্বই দিতে চাইতেন, তার বেশি নয়। "যদি এমন কোনো পরগনা বা গ্রাম থাকে যাদের ঝোঁক আইন না-মানার দিকে ('জোর-তলব'), গ্রামের চাষীরা শুধু 'বিলমুক্তা' বাবদে কিছু দেয় ও প্রকৃত অবস্থা অনুযায়ী রাজস্ব নির্ধারণ করতে দিতে গররাজি হয়, এবং ঐ ধরনের নির্ধারণ বলবৎ করা যদি সম্ভব না হয় ও (বলবৎ করা হলে) সেটি যদি পরগনা বা গ্রামকে সংঘাত ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, তবে (সেই) পরগনা বা গ্রামের রাজস্ব পুরনো হারেই আদায় করা হোক, আর এমন কিছু যেন না করা হয় যার ফলে সংঘাত দেখা দেবে।"[২২] তাহলে এ ছিল এমন এক পদ্ধতি যা সাধারণত অনুমোদন করা হতো না, একমাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতেই এর অনুমতি দেওয়া হতো। খুব সম্ভবত আবুল ফজল 'মুক্তাঈ' বলতে যা বুঝিয়েছেন এটিই তাহলে সেই পদ্ধতি। সুর-বংশীয় শাসকরা এই পদ্ধতি বিলোপ করার পর এটিকে ভূমি-রাজস্ব প্রশাসনের অনুমোদিত পরিকল্পনার বাইরে রাখা হয়। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, শের শাহের আমলে বা তার আগে রাজস্ব-আদায়ের তিন ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো। তার মধ্যে প্রথমটিতে, গ্রামের মোড়লের ওপর "বাঁধা অঙ্ক" চাপিয়ে দেওয়া হতো, সে তা আদায় করত অন্যান্যদের কাছ থেকে।[২৩]

সাধারণ রীতি হিসেবে বিশুদ্ধ ও সরল ইজারা সরকারী অনুমোদন পেত

২০. Allahabad 884 ; Add. 6603, পৃ. ৫১ খ, আরও দ্রষ্টব্য ৪৯ খ।

২১. Allahabad 1223. এই নথির রাজস্ব অঙ্কগুলির সঙ্গে Allahabad 1220-তে তার আগের বছরের রাজস্ব নির্ধারণের অঙ্কগুলো তুলনীয়।

২২. 'দুর্-আল উলুম', পৃ. ১৪১ খ। 'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী'. ২৮-৯, ৮৫, ১৩৪-এ উল্লিখিত 'মুক্তাঈ'-এর ব্যবস্থা করা হতো অবাধ্য উপজাতির লোক বা দুর্বিনীত চাষীদের সঙ্গে। মঞ্চর হ্রদের চারপাশের গ্রামবাসীরা যে মাছ ও ঘাস জোগাড় করত, তার জন্যও তারা 'মুক্তাঈ' দিত (ঐ, ৬৯)। এখানে অবশ্যই উৎপন্নের ধরনের দরুন অন্য কোন রকম ব্যবস্থা করা যেত না।

২৩. হাসান আলী খান, 'দৌলত-এ শের শাহী', ডঃ আর. পি. ত্রিপাঠী-কৃত অনুবাদ, 'মিডিয়েভাল ইণ্ডিয়া কোয়ার্টার্লি', ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৬২। দুর্ভাগ্যবশত ডঃ ত্রিপাঠী ব্যবহার ও অনুবাদ করার পর বইটির একমাত্র পাণ্ডুলিপির কিছু কিছু অংশ আবার হারিয়ে গেছে, মূলটির খণ্ডাংশ মাত্র পাওয়া যায়। তর্জমার এই অংশেও খানিক বাদ পড়েছে, কারণ তিন ধরনের "রাজস্ব প্রশাসন পদ্ধতি"র উল্লেখ থাকলেও আসলে কেবলমাত্র একটির (প্রথমটির) বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

না।[২৪] তবুও বাস্তব ক্ষেত্রে রাজস্ব-কর্মচারীরা কোন কোন সময়ে গ্রামবিশেষের রাজস্ব ইজারা দিতেন।[২৫] এ বিষয়ে জারি-করা আদেশনামায় অবশ্য বারবার বলা হয়েছে যে শুধুমাত্র সেসব গ্রামেই ইজারা দেওয়া হবে যেগুলো খুব দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং যেখানকার চাষীদের কোন অবলম্বনই নেই। তবে শর্ত থাকবে: ইজারাদার সেই গ্রামগুলোকে আবার ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।[২৬] রাজস্ব কর্মচারী বা 'চৌধুরী' বা 'কানুনগো' বা 'মুকদ্দম' বা তাদের সঙ্গে ষড় আছে এমন কোন লোককেই কোন গ্রামের ইজারা নেওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না।[২৭] তার ওপর ইজারাদার কখনই চাষীদের কাছ থেকে ভূমি-রাজস্বের সমমূল্যের চেয়ে বেশি কিছু নিতে পারবে না,[২৮] যদিও এ ব্যাপারে প্রায় নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, ইজারাদার কদাচিৎ এই নিষেধাজ্ঞা মেনে চলত।[২৯] প্রসঙ্গত মন্তব্য করা চলে যে আমরা এখানে শুধু আলাদা-আলাদা গ্রামের রাজস্বের ইজারার কথাই বলছি, জাগীর এবং খালিসা-র প্রশাসনের আরও ওপরতলায় যে প্রকাশ্য বা গোপন ইজারা দেখা যেত তার কথা নয়।[৩০]

সে আমলে 'মুস্তাঈ' এবং ইজারার চলন যে কতটা ব্যাপক ছিল তা বলা সহজ

২৪. 'খালিসা' ও 'জাগীর'—দুএর ক্ষেত্রেই ইজারা বন্ধের নিঃশর্ত নির্দেশ দেওয়া আছে। এর জন্য দ্রষ্টব্য 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯২ (গুজরাট) এবং 'অখবারাৎ' ৩৭/৩৮ (কাশ্মীর)।

২৫. এই মর্মে একটি বিবৃতি এবং কবুল রাজস্বের পরিমাণ দাখিল করার ব্যাপারে চাষীর কাছ থেকে নেওয়া 'কবুলিয়াৎ'-এর খসড়ার জন্য দ্রষ্টব্য 'ফরহঙ্গ-এ কারদানী', পৃ. ৩৫ ক-খ।

২৬. 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ১২৬ খ, ১৯৫ ক-খ, Bodl. পৃ. ৯৭ খ-৯৮ ক; ১৫৪ খ-১৫৫ ক, Ed. ৯৭-৮, ১৪৯।

২৭. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯২; 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ১৯৫ ক-খ, Bodl. পৃ. ১৫৪ খ-১৫৫ ক, Ed. 149, Fraser 86, পৃ. ৯৩ খ। 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী'-তে মালিকের অনুমতির ব্যাপারেও জোর দেওয়া হয়েছে।

২৮. 'নিগরনামা-এ মুনশী', পৃ. ১১৯ খ, ১৯৫ খ, Bodl. পৃ. ৯২ ক, ১৫৫ ক, Ed. 92, 149.

২৯. 'দুর-আল উলুম', পৃ. ৬৫ ক-খ-র একটি 'হসবুল-হুকম্'-এর বিষয়বস্তু হলো জনৈক ইজারাদারের হাতে চাষীর নিগ্রহ: "...এই সময়ে দাসোন্ধী, সিয়াম, ফলাদ এবং পলওয়াল পরগনার হিসামপুর গ্রামের অন্যান্য চাষীরা সর্বরক্ষক দরবারে পৌঁছে অভিযোগ করেছিল যে, ভাইয়া, সেই জায়গার 'চৌধুরী', ঐ 'মহাল'-এর রাজস্ব আদায়কারীর ('আমিল') সঙ্গে ষড় করে, নিজেই সেই গ্রামটি (যেটি আগে জনৈক দোস্ত মুহম্মদের ইজারায় ছিল) ইজারা নিয়েছে। খরিফ মরশুমে সে জোরজুলুম করে ৮০০ টাকা আদায় করেছে। রবি শস্যের ফলন ক্রোক ('কুর্ক') করে তাদের সমস্ত রকমে উত্ত্যক্ত করেছে। এছাড়াও, পাঁচ বছরের মধ্যে অনুমোদিত রাজস্ব ('মাল-এ ওয়াজিব') ছাড়াও আবেদনকারীদের কাছ থেকে সে নিজের জন্য ১,৩০০ টাকা নিয়েছে। গ্রামের হিসাবপত্র ('কাগজ-এ খাম') সে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে..."। শেষ কাজটি সম্ভবত তার জবরদস্তি আদায়ের চিহ্ন লোপাট করার জন্য।

৩০. এর জন্য ৭ম অধ্যায়, ২য় অংশ দ্রষ্টব্য।

নয়।[৩১] প্রথমটি যে বাতিল হয়ে গিয়েছিল সে সম্বন্ধে সরাসরি বিবৃতি পাওয়া যায় এবং সরকারী আদেশনামাগুলোতে দ্বিতীয়টির বিরুদ্ধে খুব কড়া মন্তব্য করা হয়েছে। রাজস্ব নির্ধারণের সাধারণ নিয়মকানুন ও তার সঙ্গে এইসব মন্তব্য থেকে মনে হয় যে 'জব্‌তী' প্রদেশগুলোতে এবং গুজরাটে ও (মুর্শিদ কুলী খানের সংস্কারের পর) মুঘল দখিনের মতো অঞ্চলে এই ব্যবস্থা দুটি খুব চালু ছিল না।[৩২] কিন্তু যৌথ নির্ধারণের কয়েকটা মধ্যবর্তী রূপও ছিল বলেই মনে হয়। যেমন, 'গ্রামের হোমড়া-চোমড়া লোকদের সঙ্গে 'নসক' করা' আর 'মুকদ্দম'দের রাজস্ব ইজারা দেওয়া—এ দুএর মধ্যে সত্যিই খুব একটা ফারাক ছিল না।

৫. রাজস্ব দাখিলের মাধ্যম

উত্তর ভারত, বা অন্তত তার মধ্য অঞ্চলের চাষীরা নগদে তাদের রাজস্ব দিত অনেক আগে থেকে—প্রায় ১৩ শতক থেকে।[১] মুঘল আমলে প্রধানত হিন্দুস্তানে যে-নির্ধারণ পদ্ধতি চালু ছিল তা হলো 'জব্‌ৎ' এবং তার ভিত্তিতে এক ধরনের 'নসক'। এক্ষেত্রে, প্রত্যক্ষ রাজস্ব দাবির বিবরণ দিতে হতো নগদে। কোন পরিস্থিতিতেই নগদকে দ্রব্যে রূপান্তরের অনুমতি বিষয়ক কোন ব্যবস্থার কথা নথিবদ্ধ নেই। অন্যদিকে, যখন শস্য-ভাগ এবং 'কনকূত' পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় (যে দুটি পদ্ধতিতেই রাজস্ব-দাবি ঠিক হতো উৎপন্নের হিসেবে) তখন ফসলকে বাজার-দামে রূপান্তরের অনুমতি দেওয়া হতো, "যদি না চাষীদের পক্ষে তা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।"[২] বস্তুত, সেই আমলের দুটি পুস্তিকায় কনকূত হিসাবের যে-নমুনা রাখা আছে তার দুটিতেই ধার্য দাবি পরিণত করা আছে নগদে। আর, একটিতে শস্য-ভাগের দাবি পরিণত করা আছে নগদে, অন্যটিতে তা করা হয়নি।[৩] এও তাৎপর্যপূর্ণ যে, রাজস্বের অংশ হিসেবে বিঘা পিছু দশ সের করে ফসল আদায়ের বিশেষ আদেশ জারি

৩১. এ বিষয়ে মুঘল প্রশাসনেরও বোধহয় খুব ভালোভাবে কিছু জানা ছিল না। রসিকদাসের উদ্দেশে আওরঙ্গজেবের ফরমানের মুখবন্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে, "'মুস্তাজির' (ইজারাদার) ও চাষীদের ('রিআয়া') আলাদাভাবে শ্রেণীবিভাগ ('তফরীক') করে" প্রত্যেক গ্রামের চাষীদের সংখ্যা বিষয়ক তথ্য সদর দপ্তরে পাঠানো হয় না।

৩২. আওরঙ্গজেবের আমলে বেরারের পপল পরগনার নথিপত্রে দেখানো হয়েছে যে, একটি 'হুণ্ডিসরি' (চুক্তিবদ্ধ) গ্রাম থেকে মাত্র ৮০০ টাকা পাওয়া গেছে, যেখানে নিয়মিত প্রশাসনের অধীনস্থ জমি থেকে নীট রাজস্ব পাওয়া গিয়েছিল ২৫,৮৭৭ টাকা (*IHRC*, ১৯২৯, পৃ. ৮৬)।

১. তুলনীয় 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', পৃ. ১১, ৩৭-৮।

২. 'আইন', পৃ. ২৮৬।

৩. 'দস্তুর-আল আমল-এ নভিসিন্দগী', পৃ. ১৮৩ খ-১৮৫ ক; 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৬ খ, Or. 2026, পৃ. ২৮ ক, Add. 6603, পৃ. ৬২ ক-তে 'দমাউ' শব্দটির অর্থ দেওয়া আছে: শস্য-ভাগ ব্যবস্থায় জিনিসে দেওয়া রাজস্বকে টাকায় পরিণত করার পদ্ধতি। এতে আরও বলা হয়েছে যে "তারা সব সময় এটি (নগদ টাকা) নেয় বাজারের চেয়ে বেশি হারে।"

করেছিলেন আকবর। এই ফসল গুদামজাত করে রাখতে হবে দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করতে, কিংবা, সম্ভবত, বিশেষ করে বাদশাহী আস্তাবলের পশুদের প্রয়োজন মেটাতে।[৪] এর থেকে পরিষ্কার দেখা যায় যে জিনিসে রাজস্ব আদায়ের রীতিটি ব্যতিক্রম বলেই ধরা হতো। অযোধ্যার এক অংশ থেকে পাওয়া মূল নথিপত্রে দেখা যায়, গোটা গ্রামের ওপর রাজস্ব দাবি চাপানো হয়েছে নগদে।[৫] হরিয়ানায় বরাত দেওয়া একটি জাগীরের অন্তর্ভুক্ত তিনটি গ্রামের রাজস্ব আদায়ের প্রকৃত তথ্যের বিবরণ আছে একটি চিঠিতে। 'জব্‌তী' প্রদেশগুলির সাধারণ অবস্থা কী ছিল—এই বিবরণই তার ভালো দৃষ্টান্ত হতে পারে। কারণ, এই তিনটি গ্রামের দুটিতে রাজস্ব নির্ধারণ করা হতো নগদে, দাখিলও করা হতো নগদে। তৃতীয়টি ছিল শস্য-ভাগের আওতায় আর রাজস্ব সংগ্রহ করা হতো জিনিসে। এইভাবে যেসব উৎপন্ন দ্রব্য পাওয়া যেত তার মধ্যে বজরা "কিছুদিন পরে সেখানেই উপযুক্ত দামে বেচে দেওয়া হতো।" আর বাদ বাকি—যার মধ্যে থাকত মোঠ, তিসি এবং তুলো—গরুর গাড়িতে তুলে নিয়ে আসা হতো সদর দপ্তর হিসারে।[৬] সুতরাং, মনে হয়, রাজস্ব যখন জিনিসেও নেওয়া হতো, তখনও সময়াবশেষে সেটিকে তৎক্ষণাৎ বাজারে বেচে, তার বদলে নগদ টাকা নিয়ে আসাই কাম্য বলে মনে করা হতো।

কাশ্মীরে ছিল এক অদ্ভুত ব্যবস্থা : "শস্য-ভাগের নসক"। ভূমি-রাজস্ব ঠিক করা হতো 'গাধা-বোঝাই' চালের হিসেবে, এবং রাজস্ব কখনই নগদে দেওয়া হতো না। এমনকি উপকর হিসেবে যা নেওয়া হতো, নির্ধারণের জন্য তার হিসেব করা হতো চালের পরিমাণ দিয়ে।[৭] বলা হয়েছে যে, "এই শস্য-ভাগের দেশে" জাগীরদাররা "সোনা ও রুপো দাবি" করতে শুরু করলে তার ফলে বিরাট অত্যাচার হয়। কিন্তু আকবর তাঁর রাজত্বের ৪২-তম বছরে এই নতুন প্রথা দৃঢ়ভাবে নিষিদ্ধ করে দেন।[৮]

থাট্টা এবং আজমীরের অংশবিশেষেও শস্য-ভাগ প্রচলিত ছিল। পরে এই প্রথা ছড়িয়ে পড়েছিল সম্ভবত মুলতান এবং ভাক্কর 'সরকার'-এও। জিনিসে রাজস্ব দাবিকে বাজার-দামে নগদে রূপান্তর করাটাই যদি সাধারণ রীতি হয়ে থাকে, একমাত্র তবেই আওরঙ্গজেবের রাজত্বের ৪৪-তম বছরে মুলতানের প্রদেশ কর্তা শাহজাদা মুইজুদ্দীন যে অভিযোগ করেছিলেন তা সহজে বোধগম্য হয়ে ওঠে। তিনি বলেছিলেন : যেহেতু ভালো ফসল হয়েছে তাই জিনিসপত্রের দাম খুব কমে গেছে, তাঁর জাগীরের 'জমা'ও যথেষ্ট পড়ে গেছে।[৯]

ধরে নেওয়া যেতে পারে, গুজরাটে জরিপের পুরনো পদ্ধতি এবং 'নসক'-এর

৪. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯-২০০।

৫. Allahabad 897, 1206, 1220, 1223 দ্রষ্টব্য।

৬. বালকৃষণ ব্রাহ্মণ, পৃ. ৬৩ ক-খ। গ্রামগুলো ছিল সিরসা পরগনায়।

৭. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭০।

৮. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭২৬।

৯. 'অখবারাৎ' ৪৪/১৬২। সমস্যাটি এখানে যেভাবে বলা হয়েছে আর 'জব্‌তী' প্রদেশে যা হতে পারত—তার মধ্যে বোধহয় একটু সূক্ষ্ম তফাৎ আছে। 'জব্‌ৎ'-এর আওতায় দাম কমার সঙ্গে 'জমা'র কোন হেরফের হতো না, যদিও সে ক্ষেত্রে অবশ্যই আসলে তা, আদায় করা যেত

আওতাভুক্ত অঞ্চলে রাজস্ব দাবি ঠিক করা হতো নগদে, কিন্তু শস্য-ভাগের এলাকায় জিনিসে। তবু এখানেও ১৭০৩ সালের জানুআরিতে আমরা একটি অভিযোগ পাই। তাতে বলা হয়েছে যে, পৎলাদ পরগনায় 'রাজস্বের পরিমাণ' ('জর-এ মহ্সুল') আদায় করা যায়নি, কারণ খাদ্যশস্য ছিল শস্তা আর রাস্তায় মাশুল চাপানো ও জবরদস্তি আদায়ের ফলে আহ্মেদাবাদে রপ্তানিতে বাধা পড়েছিল।[১০]

বলা হয়েছে যে, মুঘল দখিনে, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত নির্ধারণের ভিত্তিতে নগদে রাজস্ব দাখিল করাটাই ছিল পুরনো রীতি।[১১] মুর্শিদ কুলী খান প্রবর্তিত শস্য-ভাগের সময়টুকু বাদ দিয়ে, নগদ টাকায় জমা দেওয়ার ব্যবস্থা আবার চালু হয়, যদিও এবার তা করা হয় জরিপে নির্ধারণের ভিত্তিতে।[১২]

'আইন'-এর উল্লেখ অনুযায়ী মধ্য ভারতে গড়-এর চাষীরা রাজস্ব জমা দিত সোনার মোহরে আর তামার পয়সায়।[১৩] পূর্ব দিকে, ওড়িশায় অবশ্য গ্রামবাসীরা ধাতুর মুদ্রার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। এর বদলে তাঁরা ব্যবহার করতেন কড়ি, যদিও তারা কীভাবে রাজস্ব দাখিল করতেন তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না।[১৪]

আমরা আগেই যেমন দেখেছি, বাংলায় চাষীরা সাধারণত রাজস্ব দাখিল করতেন নগদে আর শস্য-ভাগ প্রায় করাই হতো না। জাহাঙ্গীর বলেছেন, রাজস্ব দাবি মেটাতে

না। শস্য-ভাগের ক্ষেত্রে নির্ধারক যেহেতু নিজেই বাজার দাম অনুযায়ী রাজস্ব দাবি নগদে পরিণত করত, তাই বাজার দাম পড়ে গেলে আপনা থেকেই 'জমা' কমে যেত।

'ওয়াকাই-এ আজমীর', ১১৪-য় এক বিবরণীতে বলা হয়েছে যে মির্তা পরগনার ২৩টি গ্রামে বাদশাহী কর্মচারীরা শস্য-ভাগ প্রথা বলবৎ করেছিল। তার ফলে রাজস্ব হিসাবে ১৫,০০০ মণের মতো খাদ্যশস্য পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ একই অঞ্চলের যোধপুর পরগনায় ভূমি-রাজস্ব আদায় হতো সরাসরি নগদে কিংবা কোন এক পর্যায়ে নগদে পরিণত করা হতো। এখানকার ২৯৪টি গ্রামের মোট রাজস্ব দাবি নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৩,৪০০ টাকা ১৩ আনা (ঐ, ১৮৪)।

১০. 'অখবারাৎ' ক ৭৭।

১১. সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ১৮৫ ক-খ, Or. 1671, পৃ. ৯০খ; খাফী খান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩২ টীকা।

১২. ৩য় অংশ দ্রষ্টব্য। যদি বোম্বাই এবং সালসেট দ্বীপের নজির দিয়ে বিচার করতে হয়, তাহলে কোঙ্কন হবে ব্যতিক্রম (মুর্শিদ কুলী খানের সময়ে কোঙ্কন মুঘল দখিনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না)। ভূমিরাজস্ব দেওয়া হতো চালের 'মোরাই'-তে ('ফ্যাক্টরিস্, ১৬৬৮-৯', পৃ. ২১৬-৭; কারেরি ১৭৯)।

১৩. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৬। মূলের পাঠে আছে 'মুহ্র ও পীল', কিন্তু আমার মনে হয় 'পুল'-এর জায়গায় ভুল করে 'পীল' লেখা হয়েছে। জ্যারেট (সম্পা. যদুনাথ সরকার, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৭), মনে হয়, কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব না করেই বাক্যটির তর্জমা করেছেন: "চাষীরা 'মুহ্র' এবং হাতী দিয়ে রাজস্ব দাখিল করে"।

১৪. মাস্টার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৫; বাউরি, ১৯৯।

সিলেটে চাষীরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের খোজা হিসেবে দিতে চাইতেন।[১৫] মুসলিম অভিজাতদের হারেমের জন্য খোজাদের যে বিরাট বাজার ছিল, তার হিসেবে নিঃসন্দেহে এরা ছিল নগদ টাকার সমান।

উপরের তথ্য থেকে সম্ভবত নির্দ্বিধায় সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কাশ্মীর এবং ওড়িশার মতো কিছু বিচ্ছিন্ন অঞ্চল বা রাজপুতানার জনহীন অংশবিশেষ বাদ দিলে, সাম্রাজ্যের প্রায় সমস্ত অংশেই 'নগদ সম্পর্ক' বেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। এর প্রচলন থেকে এই কথাই বোঝা যায় যে রাজস্ব দাবি মেটানোর জন্য চাষীকে সাধারণত তার উৎপন্নের বেশ বড় একটা অংশ—অনেক ক্ষেত্রেই বৃহত্তর অংশ—বেচে দিতে হতো। যেসব পরিস্থিতিতে বাজারের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্বাহ হতো দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা ইতিমধ্যেই সে বিষয়ে আলোচনা করেছি। এ কথা স্পষ্ট যে, নগদ দাবির ফলে উদ্‌বৃত্ত উৎপন্নের ওপর আরেকটি শ্রেণীর অর্থাৎ গ্রামের মহাজন ও গ্রামীণ ব্যবসায়ীর ভাগ তৈরি হলো এবং তা বাড়ল। অন্যদিকে, একবার যেই কৃষি-বাণিজ্যের পর্যাপ্ত উন্নতি ঘটল, চাষীরা তখন বাজারের দিকে নজর রেখে চাষবাস করতে বাধ্য হলো। ঠিক তখনই কর্তৃপক্ষ চাষীর উৎপন্ন সমস্ত শস্যে তাদের ভাগ জিনিসে দাবি করলে চাষীর পক্ষে তা খুবই কষ্টের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারত।[১৬]

'নগদ সম্পর্ক' ব্যাপারটাই অপেক্ষাকৃত উন্নত ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক সমাজের সৃষ্টি। আবার এই সম্পর্কই ছিল মুঘল সাম্রাজ্য-ব্যবস্থার কাঠামোর আসল ভিত্তি। এই ব্যবস্থায় জমির অধিকারের ওপর জোর দেওয়া হতো না, জোর দেওয়া হতো শাসক শ্রেণীর সদস্যদের ভূমিরাজস্ব আদায় করার অধিকারের ওপর। সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপের তুলনায় মুঘল ভারতে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার উপাদান হিসেবে কেন দাস প্রথা ও বেগার প্রথা দেখা যায় না—তার ব্যাখ্যাও এর থেকেই পাওয়া যাবে। তাই যখন দাসপ্রথার সাক্ষাৎ পাই সচরাচর সেটি গৃহ-দাস প্রথা। আর জোর করে খাটানো বা বেগার সম্বন্ধে বলা যায়, সাধারণত সেটি উৎপাদন বর্মের নিয়মিত অংশ ছিল না, ছিল এক বিশেষ রূপের শ্রম। কিছু অধিবাসীর ওপর কর্তৃপক্ষ এটি চাপিয়ে দিত।[১৭]

এই অংশ শেষ করার আগে মোরল্যাণ্ডের উত্থাপিত একটি প্রশ্ন সম্পর্কে

১৫. 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ৭১-২। জাহাঙ্গীর বলেছেন যে, তিনি এই রীতি বন্ধ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু এটি নিশ্চয়ই ভাব দেখানোর বেশি আর কিছু হতে পারে না।

১৬. যেমন, ধরা যাক, কোন চাষী, খারিফ মরসুমে তার জমির এক অংশে বুনল তুলো, আরেক অংশে জোয়ার। প্রথমটি বাজারে বিক্রির জন্য, দ্বিতীয়টি তার পরিবারের খাওয়ার জন্য। যদি তাকে নগদে রাজস্ব দিতে হয়, তাহলে প্রথম ফসলটি বিক্রি করে যা পাওয়া যাবে সে শুধু তাই দেবে। কিন্তু যদি দুটি ফসল থেকেই ভাগ নেওয়া হয়, তাহলে তার খাওয়ার জন্য অল্পই পড়ে থাকবে। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সে তাই আবার ঐ খাদ্যশস্য কিনতে বাধ্য হবে এবং কর্তৃপক্ষ হয়তো নিজেদের ইচ্ছামতো দাম হাঁকবে। বোধহয় করমণ্ডলের চাষীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করার আরও এক ফিকির হিসেবে এই জাতীয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো (তুলনীয় রায়চৌধুরী, 'ডাচ ইন করমণ্ডল', পৃ. ৩৩২-৩)।

১৭. কর্তৃপক্ষের তরফে চাপানো বেগার-এর নানান রূপের জন্য ষষ্ঠ অংশ দ্রষ্টব্য।

কয়েকটি মন্তব্য করা যায়, তিনি নিজে যার অর্ধেক মাত্র উত্তর দিয়েছিলেন। প্রশ্নটি হলো, ১৭ শতকে চাষীদের ওপর রাজস্ব দাবি কিসে হিসেব করা হতো : 'দাম' (তামার পয়সা)-এ না টাকায়, আর তা দেওয়াই বা হতো কিসে।[১৮] প্রশ্নটি কিছুটা কৌতূহলজনক এই কারণে যে, আলোচ্য পর্বে রুপোর অঙ্কে তামার মূল্য যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল।[১৯] আর যদি দেখানো যায় যে রাজস্ব তখনও দেওয়া হচ্ছিল 'দাম'-এ, তাহলে এ কথাই বোঝাবে যে রুপোর অঙ্কে সেটা ছিল চাষীদের ওপর এক বাড়তি বোঝা। এ কথা ঠিক যে, 'আইন'-এ 'দস্তুর'গুলো সাজানো হয়েছে 'দাম' এবং 'জীতল'-এ। কিন্তু পরবর্তী পর্বের সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে, আকবরের সময়ে নির্দিষ্ট তামা-রুপোর অনুপাত তখন অচল হয়ে গিয়েছিল। প্রায় বিনা ব্যতিক্রমেই চাষীদের ওপর রাজস্ব দাবি রাখা হতো টাকার অঙ্কে, ভগ্নাংশ লেখা হতো আনা-য়।[২০] নগদ-হার, চাষীদের ওপর নির্ধারিত 'জমা'র হিসাবনিকাশ, এবং আয়-ব্যয়ের হিসাবের ক্ষেত্রে—এমন কি গ্রামের হিসাবপত্রের বেলায়ও—এ কথা সমান সত্য।[২১] চাষীদের ওপর ধার্য 'জমা' সম্পর্কিত সমসাময়িক নথিপত্রের সমস্ত প্রাসঙ্গিক উল্লেখ সম্বন্ধেও এ কথা খাটে।[২২] রসিকদাসের উদ্দেশে ফরমানের ৮নং অনুচ্ছেদে চাষীদের কাছ থেকে রাজস্ব নেওয়ার সময় আসলে কোন্ মুদ্রা নিতে হবে সে সম্বন্ধে আলোচনা আছে। সেখানেও টাকা ছাড়া কোন এককের উল্লেখ নেই। জাগীর বরাতের জন্য যখন 'জমা'র ব্যবহার হয়েছে শুধু তখনই তা লেখা হয়েছে 'দাম'-এর অঙ্কে (তাই একে বলা হতো 'জমা-দামী')। কিন্তু পরে আমরা দেখব, এর একমাত্র কারণ এই যে, মনসবদারদের মাইনে 'দাম'-এর অঙ্কে দেওয়া থাকত এবং এই 'দাম'-ও আবার সেখানে ব্যবহার হতো শুধুমাত্র হিসাবের অর্থ বাবদে। বাস্তবে, 'ওয়াসিল' অর্থাৎ প্রকৃত আদায়ীকৃত রাজস্ব (এমন কি 'জমা-দামী'-র সঙ্গে দেওয়া থাকলেও) সর্বদাই লেখা থাকে টাকায়। এর থেকে বোঝা যায়, টাকাই ছিল প্রকৃত ব্যবহৃত মুদ্রা।[২৩]

১৮. 'আকবর টু আওরঙ্গজেব', পৃ. ২৬০-৬১।

১৯. পরিশিষ্ট 'গ' দ্রষ্টব্য।

২০. বেরারে হয়তো স্থানীয় টাকা বা টঙ্কা ব্যবহারই চলছিল, কিন্তু এ ছিল পুরোপুরি হিসেবের জন্য ব্যবহৃত টাকা। পরিশিষ্ট 'গ' দ্রষ্টব্য।

২১. নানা জাতীয় এইসব নথিপত্র দেখা যাবে ১৭ শতকে লেখা হিসাব বিষয়ক পুস্তিকায়, যেমন, পাঞ্জাবে লেখা 'খুলসাতুস সিয়াক', সম্ভল সরকার-এ (দিল্লী প্রদেশ) লেখা 'দস্তুর-আল আমল-এ-নভিসিন্দগী', এলাহাবাদ প্রদেশে লেখা 'সিয়াকনামা', বিহারে 'দস্তুর-আল আমল-এ আলমগীরী' এবং বাংলায় 'ফরহঙ্গ-এ কারদানী'।

২২. তুলনীয় বালকৃষণ ব্রাহ্মণ, পৃ. ৬৩ ক-খ (হরিয়ানা) ; 'দুর-আল উলুম', পৃ. ৫৪ খ-৫৫ ক, Add. 24,039, পৃ. ৩৬ খ (বাংলা)।

২৩. তুলনীয় লাহোরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩০, ৩৯৭ ; 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ৩১ খ-৩২ ক, ৪৯ ক-খ ; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', নদভী সম্পা. পৃ. ৮৮, ১৬৩-৪ ; 'দস্তুর-আল আলম-এ আলমগীরী', পৃ. ১৭৯ ক-খ। 'জাওয়াবিৎ-এ আলমগীরী' Add. 6598, পৃ. ১৩১ ক, ১৩২ ক,

৬. ভূমিরাজস্ব আদায়

শস্য-ভাগ ছাড়া অন্যান্য ব্যবস্থায় রাজস্ব নির্ধারণ ও তার আদায় ছিল সম্পূর্ণ আলাদা দুটি প্রক্রিয়া। শস্য-ভাগ ব্যবস্থায়, ভাগ করার সময়েই রাষ্ট্রের অংশ মাঠ বা খামার থেকে সরাসরি নিয়ে নেওয়া হতো, যাতে নির্ধারণ আদৌ না করলেও চলে। অন্যান্য ব্যবস্থায় নির্ধারণের কাজ হতে পারত ফসল বোনা ও তোলার মাঝামাঝি কোন সময়ে। কিন্তু নগদে বা জিনিসে—যে মাধ্যমেই রাজস্ব দেওয়া হোক না কেন, তা অবশ্যই সংগ্রহ করা হতো ফসল তোলার সময়ে।

আবুল ফজল বলেছেন যে, রাজস্ব আদায়কারী ('আমালগুজার') রবি (মরসুম)-এর আদায় শুরু করবে হোলি থেকে (এই উৎসবের দিন পড়ে মার্চ-এ), আর খারিফের বেলায় দশহরা থেকে (অক্টোবর মাসে পড়ে)। এমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে "যে-ফসল তোলা হচ্ছে সে শুধু তার ওপরই ঠিক করে রাজস্ব আদায় করবে, আর পরের ফসল ওঠা অবধি দেরি করবে না।"[১] খারিফ মরসুমে বিভিন্ন ফসল তোলা হয় বিভিন্ন সময়ে আর সেই অনুযায়ী রাজস্বও আদায় করা হয় তিনটি ধাপে।[২] তাহলে অন্তত খারিফ মরসুমে শুধুমাত্র কিস্তিতে কিস্তিতে রাজস্ব আদায় করা যেত। রসিক-দাসের উদ্দেশে আওরঙ্গজেবের ফরমানের ৪নং অনুচ্ছেদে সাধারণভাবে এই ব্যবস্থাই দেওয়া আছে।

সমস্ত রবি ফসল খুব অল্প সময়ের মধ্যে তোলা হতো আর কর্তৃপক্ষ, মনে হয়, ফসল কেটে মাঠ থেকে সরানোর আগেই রাজস্ব আদায় করার ব্যাপারে খুব দুশ্চিন্তায় থাকত।[৩] রাজস্ব না দেওয়া অবধি চাষীরা মাঠ থেকে ফসল তুলতে পারবে না—এই রীতির জন্ম হয়েছিল বোধহয় ঐ দুশ্চিন্তা থেকেই। এই ধরনের জবরদস্তি ব্যবস্থাপত্র রয়েছে আওরঙ্গজেবের আমলের দুটি প্রশাসনিক পুস্তিকায়।[৪] মনে হয় কেবল ১৭ শতকেই এই জবরদস্তি ব্যাপক হয়ে ওঠে। ১৬৩১ সালে কোয়েলে (বর্তমান আলীগড়) গিয়ে মাণ্ডি দেখেছিলেন যে সেখানে এটিকে নতুন উদ্ভাবন বলেই গণ্য করা হচ্ছে। "এখানকার দুর্গে তাদের (গ্রামবাসীদের) প্রায় ২০০ জনকে বন্দী করে

Or. 1641, পৃ. ৪৪ ক, ৬ খ ; Fraser 86, পৃ. ৫৭ খ-৬১ খ ; 'ইন্তিখাব-এ দস্তুর-আল আমল-এ পদশাহী', পৃ. ১ খ-৩ খ, ৮ ক-১১ খ-এ যে রাজস্ব পরিসংখ্যানগুলো আছে সেখানে' জমা-দামী' অঙ্কের পরেই টাকায় 'ওয়াসিল' দেওয়া হয়েছে।

১. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৭।

২. প্রথমে সনওয়ান ('শামাখ')-এ, তারপর বাজরীতে, সবশেষে আখে ('সিয়াকনামা', ৪৮-৯)।

৩. 'সিয়াকনামা', ৪৯।

৪. 'সিয়াকনামা', ৪৯-এ এর সুপারিশ করা হয়েছে কেবলমাত্র রবি ফসলের জন্য, কিন্তু 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৮০ ক. Or. 2026, পৃ. ৩৫ ক-এ মরসুমের কোন উল্লেখ না করেই বলা হয়েছে যে, "ফসল পেকে উঠলে, সে (রাজস্ব-আদায়কারী) ঘোড়সওয়ার এবং পদাতিকদের পাহারায় রাখবে যাতে করে চলতি বছরের রাজস্ব, 'তকাবী' ঋণ এবং আগের বছরের বকেয়া রাজস্ব দাখিল না করা পর্যন্ত চাষীদের ফসল কাটতে অনুমতি দেওয়া না হয়"।

রাখা আছে, কারণ তারা তাদের ওপর ধার্য কর দিতে পারেনি। এতদিন পর্যন্ত তারা ফসল বিক্রি করার পর কর দিত, এখন কিন্তু তাদের শস্য মাঠে থাকতে-থাকতেই তা দিতে হবে। এই হলো হিন্দু বা হিন্দুস্তানের বাসিন্দাদের জীবন"।[৫] আওরঙ্গজেবের আমলের নথিপত্র থেকে এই রীতির বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রথমটি হলো জনৈক 'চৌধুরী'র বিরুদ্ধে, যে "রবি শস্যের চাষ বন্ধ করে দিয়ে তাদের (চাষীদের) সবরকমের ক্ষতি করেছে।"[৬] অন্যটি হলো জনৈক রাজস্ব-আদায়কারীর বিরুদ্ধে—"মাঠ যখন সবুজ ছিল তখন বাদীদের (যারা ছিল 'জমিনদার') ছেলেপুলে এবং গরু বেচে দিয়ে" সে প্রচুর টাকা উপায় করেছে।[৭] এই উদাহরণগুলো থেকে দেখা যায় যে ফসল তোলার আগে চাষীর কাছ থেকে রাজস্ব দাবি করাটা কী রকম অত্যাচারের ব্যাপার ছিল, কারণ তখন তার (চাষীর) হাতে একেবারে কিছুই থাকত না। একই সঙ্গে এই রীতি হলো সুউন্নত এক মুদ্রা-অর্থনীতির লক্ষণ। কর্মচারীরা নিশ্চয়ই আশা করত, শস্য-ব্যবসায়ী বা মহাজনদের কাছে আগেভাগেই ফসল বাঁধা দিয়ে চাষীরা রাজস্ব দাবি মিটিয়ে দেবে, তা না হলে এই আদায় একেবারেই সম্ভব হতো না।

সাধারণত, কোষাগারে রাজস্ব দাখিল করা হতো 'আমিল' বা রাজস্ব-আদায়কারীর মাধ্যমে, যদিও আকবরের প্রশাসন চাষীদের সরাসরি দাখিল করায় উৎসাহ দেয়।[৮] চাষীরা, বা বরং বলা ভালো, তাদের প্রতিনিধি ও গ্রামের কর্মচারীরা রাজস্ব দাখিল করলে যথাযথ রসিদ পাওয়ার অধিকারী ছিলেন, সে-রাজস্ব তাঁরা সরাসরিই দিন বা কারও মাধ্যমেই দিন। অন্যদিকে খাজাঞ্চিকে সব সময়েই বলা হতো, দাখিলের পরিমাণ প্রতিপন্ন করার জন্য গ্রামের হিসাবরক্ষক 'পাটওয়ারী'কে দিয়ে সে যেন তার খাতায় সই করিয়ে নেয়।[৯] এসব নিয়মকানুনের অধিকাংশই হলো সর্তকতামূলক ব্যবস্থা। এতে করে প্রশাসন নিজেকেও বাঁচাতে পারত আর সম্ভবত, সেই সঙ্গে রাজস্বদাতাকেও জাল ও তছরূপের হাত থেকে রক্ষা করত।

৫. মাণ্ডি ৭৩-৪। তিনি কোলিতে গিয়েছিলেন ডিসেম্বর মাসে, রাজস্ব দাবি তাহলে নিশ্চয়ই ছিল রবি-শস্যের জন্য।

৬. 'দুর-আল উলুম', পৃ. ৬৫ ক-খ।

৭. বালকৃষণ ব্রাহ্মণ, পৃ. ৬৩ খ-৬৪ ক।

৮. তোডর মলের সুপারিশ, অনু. ৬: "বিশ্বস্ত গ্রামের চাষীরা, যাদের কথা ও কাজে ফারাক নেই, তাদের ক্ষেত্রে রাজস্ব-কর্মচারীরা ('উম্মাল') কোষাগারে রাজস্ব দাখিল করার মেয়াদ ঠিক করে দেবে, যাতে তারা নিজেরাই সেই মেয়াদের মধ্যে কোষাগারে রাজস্ব জমা দিয়ে রসিদ নিতে পারে। কোন সংগ্রাহককে ('তহ্‌সীলদার') (ঐ ধরনের গ্রামে পাঠানোর) প্রয়োজন নেই"। ('আকবরনামা', Add. 27, 247, পৃ. ৩৩২ খ; বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৭-তে সংক্ষেপে ও গুছিয়ে এই কথাই বলা হয়েছে)।

৯. আগের টীকায় যেমন দেখা গেছে, তোডর মলের সুপারিশে মূল রচনায় অনু. ৮-এ বলা হয়েছে (Add. 27, 247, পৃ. ৩৩২ ক-খ) যে চাষীরা সরাসরি কোষাগারে রাজস্ব দাখিল করলে তাদের রসিদ দিতে হবে। ঐ রচনারই অনু. ৯-এ সুপারিশ করা হয়েছে, 'আমিল'

৭. ভূমিরাজস্ব বাদে অন্যান্য গ্রামীণ কর ও জবরদস্তি আদায়

প্রত্যেক গ্রামকে অর্থসংস্থানের যে-বোঝা বইতে হতো কোন অর্থেই তার পুরোটা শুধু ভূমিরাজস্ব ছিল না। আরও কয়েক ধরনের করও ছিল, যেগুলোকে বলা হতো 'ওয়ুজুহাৎ'।[১] এগুলোকে আবার ভাগ করা হতো : 'জিহাৎ' বা বিশেষ কয়েকটি ব্যবসার ওপর কর,[২] এবং 'সাইর-জিহাৎ', বাজার এবং মাল চলাচল বাবদ মাশুল।[৩] কার্যক্ষেত্রে অবশ্য দু-এর মধ্যে তফাৎ করা দুর্ঘট। যেমন, একটি তালিকা পাওয়া যায় যাতে ভূমিরাজস্ব বাদে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ করের প্রায় সবই 'সাইর' করের মধ্যে পড়ে।[৪] এ ছাড়াও ছিল কর্মচারী ও জমিনদার ইত্যাদিদের জবরদস্তি আদায় ও উপরি-আয়। যথানিয়মে এগুলো 'জমা' থেকে বাদ দেওয়া হতো। এদের বলা হতো 'ফরুমাৎ'।[৫] কিন্তু আরও চলতি নাম ছিল 'ইখরাজাৎ'[৬]

(রাজস্ব আদায়কারী) "যে-রাজস্ব ('মাল') সংগ্রহ করেছে, তা সে কোষাগারে জমা দেবে এবং খাজাঞ্চি তার জন্য চাষীদের রসিদ দেবে। হিসাবরক্ষক ('কারকুন') বা খাজাঞ্চি যদি রসিদ না দিতে পারে, কিংবা চাষীরা যদি ভুল করে রসিদ না নেয়, তবে, দোষ যারই হোক না কেন, তার দায়িত্ব বর্তাবে 'আমিল'-এর ওপর। আর চাষীরা যদি অভিযোগ করে (বকেয়ার পরিমাণ সম্পর্কে ?) তাহলে 'আমিল'দের কথা শোনা হবে না"। অনেক সংক্ষেপে এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে এই অংশটি পাওয়া যাবে 'আকবরনামা'য়, বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮২-৩। চাষীদের রসিদ দেওয়ার ব্যবস্থা 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৯-এও আছে. এবং খাজাঞ্চির হিসাব-বইতে পাটওয়ারীর অনুমোদিত পৃষ্ঠালেখ বিষয়ে আরেকটি ধারা যোগ করা হয়েছে।

১. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৪, ৩০১।

২. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৪।

৩. ঐ ; 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৭ ক, Or. 2026, পৃ. ২৮ ক-খ।

৪. 'দস্তুর-আল আমল-এ আলমগীরী', পৃ. ২৩ খ-২৪ ক। 'দস্তুর-আল আমল-এ নভিসিন্দগী', পৃ. ১৮৫ ক-য় 'সাইর-জিহাৎ'-এর তালিকার সবই কর্মচারীদের নানান উপরি পাওনা। কিন্তু ঐভাবে শব্দটির ব্যবহার বোধহয় ঠিক নয়।

পুস্তিকায় এবং অন্যত্র যে সব রাজস্বের হিসেব দেওয়া আছে সেখানে 'জমা' সাধারণত দুভাগে ভাগ করা থাকে : 'মাল-ও জিহাৎ' ও 'সাইর-জিহাৎ'। প্রথমটিতে থাকত মূলত ভূমিরাজস্ব, পরেরটিতে অন্যান্য কর। বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৭ ক, Or. 2026, পৃ. ২৮ ক-খ।

৫. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৪।

৬. 'ইখরাজাৎ' (সাধারণভাবে অর্থ, খরচ) শব্দটি রাজস্ব সংক্রান্ত লেখাপত্রে কী অর্থে ব্যবহার হতো তা স্থির করার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো 'মদদ-এ মআশ' ফারমানগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা। সেখানে সাধারণত একটি বাঁধা বয়ান থাকে। সচরাচর তার মধ্যে থাকে এই বাক্যাংশটি : " 'ইখরাজাৎ', যেমন…"। তারপর জবরদস্তি আদায়ের যে তালিকা থাকে তার পুরোটাই অর্থসংস্থান-বহির্ভূত আদায়।

ও 'আবওয়াব' ও 'হুবুবাৎ'।[৭]

আবাদী ক্ষেত ছাড়া গ্রামে কর ধার্যের দুটি প্রধান বিষয় ছিল সম্ভবত গবাদি পশু ও ফলের বাগান। 'আইন'-এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে : যদি কোন লোক চারণভূমি হিসেবে এমন জমি রাখে যার ওপর অন্যথায় ভূমিরাজস্ব ধার্য হতে পারে ('খরাজী'), তাহলে তার ওপর মহিষ পিছু ৬ 'দাম' ও প্রতি গরু (বা বলদ) পিছু ৩ 'দাম' করে কর চাপানো হবে। কিন্তু কোন চাষীর লাঙল পিছু চারটে ষাঁড়, দুটো গরু ও একটা মহিষ থাকলে তাকে আর কর দিতে হবে না। তাছাড়া, 'গোশালা' বা ধর্মীয় কারণে অথবা দান-খয়রাতির জন্য রাখা গরুর পালের ওপরেও কোন কর চাপানো হবে না।[৮] মজার ব্যাপার এই যে আকবর যেসব করের ছাড় দিয়েছিলেন তার মধ্যে 'গো-শুমারী' (গরুর উপর কর)-ও ছিল।[৯] উল্লিখিত করগুলোর থেকে এই কর আলাদা কিনা, অথবা শুধু ছাড় দেওয়ার ফলেই আবুল ফজল একে মকুব আদায়ের তালিকায় ঢুকিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট কারণ ভেবেছিলেন—সে কথা বলা অসম্ভব।[১০] জাহাঙ্গীরের আমলে আবার এই করের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়, ১৬৩৪ অবধি তা বলবৎ

আরও দ্রষ্টব্য তোডর মলের সুপারিশের প্রথম ও নবম অনুচ্ছেদ ('মাল-ও জিহাৎ' এর অতিরিক্ত 'মলবা' ও 'ইখরাজাৎ') এবং দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ (পরগনায় দুজন হিসাব-রক্ষকের উপস্থিতির দরুন 'ইখরাজাৎ' বৃদ্ধি) (মূল পাঠ, 'আকবরনামা', Add. 27, 247, পৃ. ৩৩১ খ, ৩৩২ খ); মীর ফতহুউল্লা শিরাজীর স্মারকপত্র (কর্মচারীদের কাছ থেকে "'মলবা', মুন্শীরা যাকে বলেন 'ইস্তিসওযাবী' ও 'ইখরাজাৎ'", ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছিল) ('আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৮)। রসিকদাসের উদ্দেশে আওরঙ্গজেবের ফরমানের ১১নং অনুচ্ছেদেও 'ইখরাজাৎ' শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। 'মলবা' শব্দটির তাৎপর্য আলোচনা করা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে। শব্দটির অর্থ ছিল ভূমিরাজস্ব দাখিল বাদে গ্রামের আর যা কিছু খরচ। কর্মচারী ও জমিনদারদের জবরদস্তি আদায় এবং 'গ্রামের খরচ'ও এর মধ্যেই পড়ত। এইভাবে, 'ইখরাজাৎ' ছিল 'মলবা'রই এক অংশ। কিন্তু যে-প্রশাসনের নজর শুধু তার নিজস্ব কর্মচারীদের জবরদস্তি আদায়ের ওপরেই কেন্দ্রীভূত, তার পক্ষে 'ইখরাজাৎ'-এর সংকীর্ণ অর্থে 'মলবা' শব্দটি ব্যবহার করাই হয়তো স্বাভাবিক।

'ইখরাজাৎ' শব্দটির অর্থ বিষয়ে এই নির্দেশের জন্য আমি অধ্যাপক এস. এ. রসিদের কাছে ঋণী।

৭. তুলনীয় Add. 6603, পৃ. ৪৯ খ, ৫৯ খ। একই অর্থে, 'আবওয়াব-এ মলবা' শব্দটির ব্যবহারের জন্য দ্রষ্টব্য 'নিগরনামা-এ মুন্শী', পৃ, ১৭৫খ, ১৮৯ ক, Bodl, পৃ. ১৪০ খ, ১৫০ ক, Ed. 145; 'খুলসাতুল ইন্শা', Or. 1750, পৃ, ১১১ খ।

৮. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৭।

৯. ঐ, ৩০১।

১০. আকবরের আমলের ৩৩-তম বছরে খান-এ খানানের জারি করা একটি 'হুকুম্'-এ সাভী প্রভৃতি গ্রামের চারণভূমির ওপর 'গো-শুমারী' বসাতে বারণ করা হয়েছে। 'গোবর্ধনের গরু ও ষাঁড়ে'র জন্য এগুলো ব্যবহার করা হতো (জাভেরী, ডকু্য, ৩ ক)।

ছিল।[১০ক] এর পরেও এক ধরনের চারণ কর ছিল 'কাহ্-চড়াই', 'সর্বসাধারণের' চারণভূমিতে যে সব পশুপাল চরানো হতো বোধহয় তারই ওপর এটা বসানো হতো।[১১] কোন কোন তথ্যসূত্র থেকে মনে হবে যে আওরঙ্গজেব 'গো-শুমারী' ও 'কাহ্-চরাই' দুই-ই তুলে দিয়েছিলেন।[১২] কিন্তু অন্তত শেষটির সম্বন্ধে একটি 'হসবুল হুকুম্' পাওয়া যায়, যাতে স্থানীয় কর্মচারীদের নিয়মমাফিক এই কর আদায় করতে বলা হয়েছে।[১৩]

জাহাঙ্গীর খুব জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে সমস্ত ফলের বাগানে কর মকুব করা হয়েছিল, এমনকি আগে চাষ হতো, পরে ফলের গাছ লাগানো হয়েছে—এমন জমির ক্ষেত্রেও। আর 'সরদরখ্‌তী' নামে পরিচিত বৃক্ষ কর "এই চিরস্থায়ী রাষ্ট্রে" কখনই চাপানো হয় নি।[১৪] আকবরের মকুব করের তালিকাতেও এ করটির নাম আছে।[১৫] তা সত্ত্বেও আওরঙ্গজেবের আমলের কয়েকটি নথি থেকে পরিষ্কার মনে হয় যে তখনও পর্যন্ত সব ফলের বাগানেই এই কর ধার্য হচ্ছিল। যেসব বাগানে কবরখানা রয়েছে বা যেগুলো থেকে কোন লাভ হয় না, শুধু সেগুলোই বাদ পড়ত। ফলনের পরিমাণ হিসেব হতো গাছ পিছু: হিন্দুদের কাছ থেকে নেওয়া হতো ফলনের একের-পাঁচ ভাগ, মুসলমানদের কাছ থেকে একের-ছয় ভাগ।[১৬]

১৬৭৯ সালে আওরঙ্গজেব অ-মুসলমানদের ওপর 'জিজিয়া' বা মাথাপিছু কর চাপান। তার ফলে গ্রামীণ করের পরিমাণ যথেষ্ট বেড়ে যায়। এই উদ্দেশ্যে আদায়কারীদের একটি আলাদা সংস্থা ('উমনা') তৈরি করা হয়।[১৭] শহরে এই কর

১০ক. 'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী', ১৫৫। শাহ্‌জাহানের রাজত্বের গোড়ার দিকে সেহ্‌ওয়ানের জনৈক জাগীরদার এই বেআইনী কর চাপিয়েছিল বলে তার বিরুদ্ধে এখানে প্রতিবাদ করা হয়েছে।

১১. মার্চ ১৪, ১৬৫৮তে জারি-করা একটি কৌতূহলজনক আদেশনামা পাওয়া যায়। এতে দুটি 'তুগরা' আছে, যার সুবাদে এটি একই সঙ্গে শাহ্‌জাহানের ফরমান এবং দারা শুকোহ্-র 'নিশান-এ আলীশান'-এর রূপ পেয়েছে। যে সব গরুর পাল গোবর্ধন নাথের 'দেবাল'-এর সঙ্গে যুক্ত, সেগুলোকে একটি গ্রামের চারণভূমিতে আনা হতো। ঐ আদেশনামায়, সেই পালগুলোর কাছ থেকে জোর করে 'কাহ্-চরাই' আদায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে (জাভেরী, ডক্যু ১২)।

১২. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৫, ২৮৬: 'আওয়াবিৎ-এ আলমগীরী', Ethe. 415, পৃ. ১৮১ ক, Or. 1641, পৃ. ১৩৬ ক; Add. 6598, পৃ. ১৮৯ ক, 'ওয়কাই-এ আজমীর', ৬৩-৪, ১৭৩।

১৩. 'দুর-আল উলুম্', পৃ. ৫৩ ক-খ।

১৪. 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ২৫১-২।

১৫. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০১।

১৬. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩-৪; 'নিগরনামা-এ মুন্শী', পৃ. ১২৭ ক-খ, ২০০ক, Bodl. পৃ. ৯৮ ক-খ, ১৫৮ ক-খ, Ed. 98; 'দুর-আল উলুম্', পৃ. ৫৫ খ-৫৬ ক।

১৭. ঈশরদাস, পৃ. ৭৪ খ; 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৬; মাসুচি, ২য় খণ্ড, ২৯১; 'দিলকুশা', পৃ. ১৩৯ খ।

প্রত্যেক প্রজার কাছ থেকে সরাসরি আদায় করা হতো। গ্রামের ক্ষেত্রে প্রথমে আদেশ দেওয়া হয় সমহারে ১00,000 'দাম' (ধরে নেওয়া যায় 'জমা'র) পিছু ১00 টাকা আদায় করতে, অর্থাৎ নির্ধারিত রাজস্বের শতকরা ৪ ভাগ। খালিসা-র কর্মচারী ও জাগীরের অধিকারীরা এই পরিমাণ দাখিল করবে, তারপর চাষীদের কাছ থেকে এই কর আদায় করবে অনুমোদিত হারে।[১৮] আওরঙ্গজেবের আমলের শেষের দিকে সঙ্কলিত একটি পুস্তিকায় অবশ্য দেখা যায় যে গ্রাম এবং শহর দু জায়গাতেই এই করের আওতাভুক্ত লোকদের বিস্তারিত আদমশুমারী করা হয়েছিল।[১৯] পুস্তিকাটিতে হিসেবের যে-নমুনা আছে তাতে মনে হয়, করভার নেহাৎ হালকা ছিল না। গ্রামে ২৮0 জন পুরুষের মধ্যে ১৮৫ জনকে কর ধার্যের যোগ্য বলে ধরা হয়, আর তাদের মধ্যে ১৩৭ জন বছরে ৩ টাকা ২ আনা এই ন্যূনতম হারে কর দিত।[২০] সে আমলে এটাই ছিল শহরের অদক্ষ শ্রমিকের প্রায় এক মাসের মজুরি।[২১] কর হিসেবে জিজিয়া ছিল অত্যন্ত নিম্নমুখী, সব চেয়ে গরীবদের ওপর তার চাপ পড়ত সব থেকে বেশি।[২২] একটি সনদের নমুনা থেকে দেখা যায় যে ঘোর দুর্দশার সময়ে

১৮. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৮; কিন্তু, বিশেষ করে, 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ৯৮ ক-খ, Bodl., পৃ. ৭৪ ক, Ed. 77 (বৃটিশ মিউজিয়ামের পাণ্ডুলিপিতে নথিটির গোড়ার দিকের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পংক্তি বাদ গেছে)। "প্রধান ক্রেতা" বা "হুগলী ও কাশিমবাজারের গভর্নর" বুলচন্দ-এর প্রতিনিধি "পরমেশরদাস" ১৬৮৩ সালে হুগলীতে "সমস্ত লোককে তার সামনে ডেকে ৩ বছরের জিজিয়া বা মাথাপিছু টাকা দাবি করেছিলেন। তিনি এমন ভাব করেছিলেন যেন তাঁর কাছে এ টাকা তাদের বাকি পড়ে আছে। যতটা বর্বর কঠোরতা কল্পনা করা যায় তার সব খাটিয়ে তিনি তাদের কাছ থেকে এই টাকা জুলুম করে আদায় করেছিলেন"। (হেজেস, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৬)। এইভাবে একটি অসঙ্গত দৃশ্য দেখা গেল যেখানে হিন্দু জাগীরদারের হিন্দু গোমস্তা জিজিয়া কর আদায় করছে, যে-করের তাত্ত্বিক উদ্দেশ্য ছিল বিধর্মীদের চেয়ে প্রকৃত ধর্ম-বিশ্বাসীদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো।

১৯. 'খুলাসতুস সিয়াক', Aligarh MS, পৃ. ৩৮ খ-৪১ খ, Or. 2026, পৃ. ৫৩ ক-৫৫ খ। আরও তুলনীয় 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ৯৮ ক-খ, Bodl. পৃ. ৭৪ ক, Ed. 76.

২০. 'খুলাসতুস সিয়াক', Aligarh MS, পৃ. ৪০ ক, ৪১ খ, Or. 2026, পৃ. ৫৬ ক-খ। শরিয়তে 'দিরহাম'-এর অঙ্কে জিজিয়া-র তিনটি হার দেওয়া আছে। আওরঙ্গজেবের প্রশাসনকে এগুলো টাকায় পরিণত করে নিতে হতো। বিভিন্ন তথ্যসূত্রে যে সমমান দেওয়া আছে তাতে হেরফের হয় অল্পই। যেমন, ওপরে উদ্ধৃত বিবরণীগুলোতে যে-হার দেওয়া আছে তার তুলনা করা যেতে পারে: ঈশরদাস, পৃ. ৭৪ খ-য় ৩ টাকা ৪ আনা; মানুচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪-এ ৩ টাকা ৮ আনা।

২১. মোটামুটি একই সময়ের মধ্যে সুরাটে ৪ টাকা হারে মজুরি দেওয়ার সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় (ওভিংটন, পৃ. ২২৯), আহমেদাবাদে ২ টাকা ১০ আনা ('মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯১), হুগলীতে ২ টাকা ১৩ আনা থেকে ৩ টাকা ১২ আনা (মাস্টার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১)।

২২. ব্যাপারটি বোঝা যায় এই ঘটনা থেকে: যে-ধনীদের ১০,০০০ 'দিরহাম' বা তারও বেশি ছিল, তাদের ৪৮ 'দিরহাম'-এর বেশি দিতে বলা হতো না; অন্যদিকে, যে-গরীবদের ২০০-র

অঞ্চলবিশেষের চাষীরা এর থেকে ছাড় পেতে পারত।[২৩] ১৭০৪ সালে দুর্ভিক্ষ এবং মারাঠা যুদ্ধের দরুন দুর্দশা বিবেচনায় আওরঙ্গজেবের যুদ্ধ চলাকালীন দখিনে জিজিয়া কর মকুব করে দেন।[২৪] তা হলেও, আওরঙ্গজেবের সাধারণ নীতি ছিল জিজিয়া মকুব না করা।[২৫] অন্যান্য তথ্যসূত্রে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে এই কর আদায় করার জন্য খুবই অত্যাচার করা হতো, আর প্রকৃত আদায়ের বেশির ভাগই তছরূপ করত কর্মচারীরা। ফলে বাদশাহী কোষাগারে পৌঁছত খুবই সামান্য অংশ।[২৬]

যেসব লোক কোন ওয়ারিশ না রেখেই মারা গেছে তাদের সম্পত্তি ছিল রাজস্বের আরেক উৎস।[২৭] বাংলায় এই আইনটি কিছুটা ছড়িয়ে ব্যাখ্যা করা হতো। কোন চাষী বা ভিনদেশী লোক অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তার স্ত্রী-কন্যাদি সমেত সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতো। সম্পত্তি কোথায় অবস্থিত তার উপর নির্ভর করত সেটা কার উপকারে লাগবে—খালিসা, না জাগীরদার, না "প্রধান জমিনদার"। এই "ঘৃণ্য রীতি"কে বলা হতো 'অনুকোরা'। বলা হয়েছে যে শায়েস্তা খান এটি তুলে দেন।[২৮]

রাজস্ব কর্মচারীদের জবরদস্তি এবং উপরি-পাওনা ছিল অসংখ্য। এই সব কর্মচারীদের কাজের বেতন দেওয়া হতো আদায়ীকৃত রাজস্ব থেকে—হয় একটা বাঁধা হারে, নয়তো শতকরা হিসেবে। আওরঙ্গজেবের একটি ফরমান থেকে মনে হয়, যেসব লোককে রাজস্ব আদায় করতে ও ফসল পাহারা দিতে পাঠানো হতো গ্রাম থেকেই তাদের রোজকার খরচ যোগানো হতো, কিন্তু রাজস্ব দাবি থেকে এই খরচ বাদ

বেশি ছিল না তাদের দিতে হতো ১২ 'দিরহাম' ('মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৬-৭। আরও তুলনীয় ঈশরদাস, পৃ. ৭৪ ক-খ)।

২৩. 'নিগরনামা-এ মুনশী', পৃ. ১৮০ ক-খ, Bodl. পৃ. ১৪৩ খ-১৪৪ ক, Ed. 139। পরবর্তীকালের একটি সংগ্রহ, জনৈক মুনশী লালচাঁদের 'নিগরনামা' থেকে নিয়ে এই নথিটি ছেপে বার করেন প্রয়াত এস. সুলেমান নদভী, 'মআরিফ', খণ্ড ৪০ (১৯৩৭) সংখ্যা ৪, পৃ. ২৯৪-৬-এ। প্রকাশিত পাঠের প্রথম কয়েকটি বাক্যে গুরুতর ত্রুটি আছে। মূলের 'জিম্মী-এ নাদার', অর্থাৎ 'নিঃস্ব অ-মুসলমান'-এর জায়গায় আছে 'জমিনদারান'। সনদটি জনৈক 'দিওয়ানে'র উদ্দেশে প্রচারিত। এতে বলা হয়েছে, দুঃস্থ লোকের ওপর জিজিয়া চাপানো চলবে না। যেহেতু দেখা যায়, যে-গরীব চাষীরা ('রেজা রিআয়া') শুধু চাষবাসই করে, তারা তাদের বীজ ও গবাদি পশুর জন্য ('মআরিফ'-এর পাঠ অন্যরকম) ঋণে ডুবে থাকে, তাই চাষীদের জিজিয়া দেওয়ার থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। তাহলেও, কর কিন্তু আদায় করতে হবে 'তাল্লুকদার', 'চৌধুরী', 'কানুনগো', 'তরফদার' এবং গ্রাম-শহরের অন্যান্য অধিবাসীর কাছ থেকে।

২৪. 'অখবারাৎ' ৪৮/৩৬ এবং A 245. আরও তুলনীয় 'অখবারাৎ' ৪৭/৩২৩।

২৫. তুলনীয় মামুরী, পৃ. ১৭৯ ক, খাফী খান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৭-৮।

২৬. 'দিলকুশা', পৃ. ১৩৯ খ; মাসুচি. ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯১।

২৭. 'দস্তুর-আল আমল-এ আলমগীরী', পৃ. ২৩ খ।

২৮. 'ফথিয়া-এ ইব্রিয়া', পৃ. ১৩১ খ।

যেত।[২৯] জরিপ দলের ক্ষেত্রে অবশ্য, আমরা ইতিমধ্যেই যেমন দেখেছি, বিঘা পিছু এক 'দাম' করে শুল্ক চাপানো হতো। যার নাম ছিল 'জবিতানা'। কিন্তু, শুধুমাত্র কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ভাতা পেয়েই সন্তুষ্ট এমন কর্মচারী বোধ হয় খুবই কম ছিল। সে যাই হোক, চাষীদের কাছ থেকে এই সব বেআইনী জবরদস্তি আদায় সরকারীভাবে বারবার নিষেধ করা হতো, কিন্তু বোধহয় খুব একটা ফল হতো না। ঐ জাতীয় নিষিদ্ধ আদায়গুলির মধ্যে ছিল প্রথাগত এবং বাধ্যতামূলক উপকার, যেমন 'সালামী'[৩০] ও 'ভেন্ট'; জরিমানা এবং ঘুষ, যৌথভাবে যাদের বলা হতো 'বালাদস্তী'; আর ছিল নির্দিষ্ট কিছু কাজ যেগুলো করে দিলে কর্মচারীরা কিছু পাওয়ার আশা করত, যেমন, 'পাট্টা' মঞ্জুর করার সময় 'পাট্টাদারী', ফসল কাটার অনুমতি দেওয়ার সময় 'বল্‌কতী', সম্ভবত রাজস্ব জমা নেওয়ার সময় 'তহশীলদারী' এবং সবশেষে 'খরজ-এ সাদির ও ওয়ারিদ' অর্থাৎ কর্মচারীরা পরিদর্শনে গেলে তাদের প্রয়োজন মেটানোর খরচ।[৩১] এ ছাড়াও ছিল অন্যান্য জবরদস্তি আদায়, কিন্তু এখানে তার তালিকা করে বোধহয় বিশেষ লাভ হবে না।[৩২] এইসব উপকরের হার ঠিক কত ছিল তা জানা যায় না, তবে সব জায়গায় এগুলো সমান ছিল না। কিন্তু সব মিলিয়ে কখনও কখনও বেশ

২৯. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৫-৬।

৩০. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৭, ৩০১। আবুল ফজল ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে 'সালামী' (আক্ষরিক অর্থে সেলামের টাকা) নাম দেওয়া হয়েছিল এক 'দাম'-মুদ্রার সেই উপহারকে, 'আমালগুজার' তাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেই 'মুকদ্দম ও পাটওয়ারী'রা স্বেচ্ছায় তাকে যা দিতে চাইত। এ ছাড়াও, আকবর কর্তৃক নিষিদ্ধ (ঐ, ৩০১) জবরদস্তি আদায়ের তালিকার আরেকটি হলো 'কুনলগা'। 'মদদ-এ মআশ' নথিপত্রে প্রাপকদের কাছ থেকে যে-সব কর-উপকর জোর করে আদায় করতে কর্মচারীদের বারণ করা হয়েছে তার তালিকায় প্রায়ই এর নাম থাকে। শব্দটি মূলে তুর্কী; চার্লস এলিয়ট যখন অনুসন্ধান করেছিলেন তখন শব্দটির সঠিক অর্থ জানা ছিল না ('ক্রনিকলস অফ উনাও', পৃ. ১১৯)। Add. 6603, পৃ. ৭৫ ক-খ-তে অবশ্য এর সংজ্ঞা: 'হাকিম'কে দেওয়া উপহার, আরও বিশেষভাবে এক পাত্র দই বা ঘোল—হাকিমের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় জমিদার তার সঙ্গে যা নিয়ে যাবে বলে প্রত্যাশিত ছিল।

৩১. কেবলমাত্র 'সালামী' এবং 'বলকতী' বাদে এই সমস্ত জবরদস্তি আদায় নিষিদ্ধ করা আছে: 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৪; 'নিগরনামা-এ মুন্সী', পৃ. ১০২ ক, ১৭৫ খ, ১৭৭ ক, ১৮৯ ক, Bodl. পৃ. ৭৮ ক, ১৪০ খ, ১৫০ ক, Ed. 80, 136, 145; 'খুলাসতুল ইন্‌শা', Or. 1750, পৃ. ১১১ খ। 'বলকতীর'-র জন্য দ্রষ্টব্য: 'আইন', ১ম খণ্ড, ২৮৭, ৩০১। 'আইন', ১ম, ৩০১-এ 'তহশীলদারী'-র উল্লেখ আছে। 'ভেন্ট' এবং 'পাট্টাদারী'-র সংজ্ঞার জন্য দ্রষ্টব্য এলিয়ট, 'ক্রনিকলস্ অফ উনাও', পৃ. ১২০-২১, 'বলদস্তী'র জন্য Add. 6603, পৃ. ৫৭ খ।

৩২. এগুলোর তালিকা আছে 'আইন', ১ম খণ্ড, ২৮৭, ৩০১, এবং 'দস্তুর-আল আমল-এ নভিসিন্দগী', পৃ. ১৮৫ ক-তে। অন্য দুটি দফা 'চিট্‌ঠীআনা' ('চিট্‌ঠী' অর্থাৎ চিঠি থেকে) এবং 'ফসলানা' ('ফসল' অর্থাৎ শস্য থেকে) যোগ করা আছে 'নিগরনামা-এ মুন্সী', পৃ. ১৮৯ ক, Bodl. পৃ. ১৫০ ক-তে।

বড় ধরনের অঙ্ক হয়ে দাঁড়াত। একটি গ্রামের অধিবাসীদের অভিযোগ থেকে এর একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তারা বলছে যে, রাজস্ব কর্মচারীরা ('উম্মাল') তাদের ওপর যে " 'পাট্টাদারী', 'ভেন্ট ও অন্যান্য বেআইনী 'আবওয়াব' " চাপিয়েছে সব মিলিয়ে তা সেই গ্রামের জন্য নির্দিষ্ট মোট 'জমা'র প্রায় একের-তিন ভাগ হবে।[৩৩]

আবুল ফজল বলেছেন (স্পষ্টতই ব্যাপারটি অনুমোদন না করে) যে কাশ্মীরে পুরনো প্রথা অনুযায়ী রাজস্ব হিসেবে যে জাফরান ফুল পাওয়া যেত, চাষীদের মধ্যেই সেগুলো আবার ভাগ করে দিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে সেগুলোর বীজ বেছে বার করতে তাদের বাধ্য করা হতো। এছাড়াও দূর থেকে তাদের কাঠ বয়ে আনতে হতো। বলা হয়েছে যে, আকবর এই দুটি রীতিই রদ করে দিয়েছিলেন।[৩৪] তার থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে যে 'বেগার', বা বাধ্যতামূলক শ্রম, সচরাচর হিন্দুস্তানের রাজস্ব ব্যবস্থার অঙ্গ ছিল না। অন্য দিকে, এও সম্ভব যে, কাজ উপলক্ষে ভ্রমণরত কর্মচারীদের মালপত্র বইবার জন্য জোর করে লোক খাটানোর ব্যাপারটা সাম্প্রতিক কালের আবিষ্কার নয়।[৩৫] একটি সরকারী দলিলে দেখা যায়, কোন এক শহরের অধিবাসীরা অভিযোগ করছে : রাজস্ব কর্মচারীরা তাদের ওপর যে অপ্রীতিকর বোঝা চাপায়, " 'বেগার' ও খাটিয়া বইবার কাজ" তার মধ্যে পড়ে।[৩৬] 'মদদ-এ মআশ' নথিগুলোকে প্রাপকের ক্ষেত্রে মকুব করের তালিকায় 'বেগার' এবং 'শিকার'-ও পাওয়া যায়।[৩৭] কোন রাজা-রাজড়ার সুবিধার্থে শিকারের ব্যবস্থা করা হলে চাষীকে যে শ্রম দিতে হতো, এখানে নিশ্চয়ই সেই অর্থে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। জঙ্গল কাটা, রাস্তা সাফ করা, তাঁবুর

৩৩. 'জমা' হয়েছিল ১,৩৫০ টাকা এবং বেআইনী জবরদস্তি আদায় ৪০০ টাকা ('দুর-আল উলুম', পৃ. ৫৪ ক-৫৫ ক)। 'দস্তুর-আল আমল-এ আলমগীরী', পৃ. ৪১ খ-৪২ খ-এ পুনরুদ্ধৃত 'বরামদ' হিসাবগুলোর নমুনায় কোষাগারের মোট আদায় হয়েছিল ৪,৪২৭ টাকা আর বিভিন্ন কর্মচারীরা আত্মসাৎ করেছিল ১৭২ টাকা। 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৯১খ-৯৪ ক, Or. 2026, পৃ. ৫৯ ক-৬৪ ক-এ হামীদপুর গ্রামের এই অঙ্কগুলো হলো ১,০১১ টাকা ও ৯২ টাকা ১২ আনা, এবং 'সিয়াকনামা', ৭৭-৭৯-তে ১০৬ টাকা ও ২৭ টাকা। অবশ্য হিসাব-নিরীক্ষকদের কাছে দাখিল করা গ্রামের হিসাবপত্রে আসল অবস্থা কতটা প্রকাশ পেত তা বিচার করা কঠিন।

৩৪. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭২৭, ৭৩৪।

৩৫. 'তশরিহ্-আল আকওয়াম', পৃ. ১৮১ খ-১৮২ ক থেকে জানা যায়, চামারদের বলা হতো 'বেগারী', কারণ তাদের বিনা মজুরিতে মাল বইতে বাধ্য করা হতো। তুলনীয় চার্লস এলিয়ট, 'ক্রনিকলস অফ উনাও', পৃ. ১১৯ ; এলিয়ট, 'মেমোআর্স…', ২য় ভাগ, পৃ. ২৩২।

৩৬. 'দুর-আল উলুম', পৃ. ৫৩ ক-খ। শহরটি ছিল মুরাদাবাদ, এখন খুব বিখ্যাত শহর। তখন এটি ছিল সম্ভল 'সরকার'-র অন্তর্গত।

৩৭. তুলনীয় এলিয়ট, 'ক্রনিকলস্ অফ উনাও', পৃ. ১১৯।

মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া, জন্তু-জানোয়ার খেদিয়ে আনা—সবই করতে হতো শুধু একটিমাত্র শিকারের প্রস্তুতিতে।[৩৮]

৮. ত্রাণব্যবস্থা ও কৃষির উন্নতি

মুঘল প্রশাসনের মূল লক্ষ্য ছিল ক্রমবর্ধমান মাত্রায় রাজস্ব জোগাড় করা। নানান প্রাকৃতিক ঘটনার ওপর নির্ভরশীল বলে প্রতি বছরেই অবশ্য কৃষিজ উৎপাদনের তারতম্য দেখা যেত। আর কৃষিজ উদ্‌বৃত্তের বৃহত্তর অংশই যেহেতু ছিল ভূমিরাজস্ব, তাই তার পরিমাণও স্থির থাকতে পারত না; তাছাড়া রাজস্বের হার তো বাড়তই। এ কথা ঠিক যে, মুদ্রার হিসেবে এই হ্রাস-বৃদ্ধি অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছিল 'নগদ সম্পর্ক', কেননা সাধারণভাবে বলতে গেলে দাম উৎপাদনের উল্টো মুখে যাবেই। সেই সঙ্গে এই ব্যবস্থা নিজস্ব কিছু অসুবিধাও তৈরি করেছিল। পুঁজিবাদী সঙ্কট ও 'মন্দা'র যুগের অনেক আগেই, জিনিসের দাম অস্বাভাবিক রকমে পড়ে যাওয়ার ফলে মুঘল প্রশাসনকে কখনও কখনও বিব্রত হতে হতো। সরকারী নিয়মকানুনে তাই "উৎপাদন কমে যাওয়া, হাজাশুখা" এইসব প্রাকৃতিক "বিপর্যয়ে"র পাশাপাশি "দাম পড়ে যাওয়া"-ও তার যথাযোগ্য জায়গা নিয়েছে।[১]

আমরা আগেই বিশদভাবে দেখেছি, সব ধরনের রাজস্ব নির্ধারণ ব্যবস্থাতেই ফসল নষ্ট হয়ে গেলে কিছু ছাড়ের ব্যবস্থা ছিল। শস্য-ভাগ এবং 'কনকুত'-এর ক্ষেত্রে আপনা থেকেই এটা ঘটে যেত, কোন বছরের উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ অনুযায়ী রাষ্ট্রের ভাগও বাড়ত বা কমত। রাজস্ব দাবিকে বাজার-দামে রূপান্তরিত করে নেওয়ার অর্থ দাঁড়াত এই যে, কর্তৃপক্ষও দাম কমা-বাড়ার কিছুটা ঝুঁকি বইবে। 'জব্‌ৎ' এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক ধরনের 'নসক'-এ ফসল নষ্ট হওয়ার জন্য একটা ব্যবস্থা রাখতেই হতো। তা করা হতো নির্ধারিত এলাকা থেকে 'নাবুদ' কমিয়ে দিয়ে। কিন্তু মূল্যমানের ক্ষেত্রে বড় রকমের পরিবর্তন হলে তার সঙ্গে রাজস্বের সঙ্গতি আনা যেত একমাত্র সরকারের বিশেষ নির্দেশে।

একবার চূড়ান্ত নির্ধারণ হয়ে গেলে রাজস্ব আদায়কারী বা 'আমিল'দের কাজ ছিল কিছু অনাদায়ী ('বাকি') না রেখে সমস্তটাই আদায় করা।[২] শের শাহ্‌ নাকি ঘোষণা

৩৮. গুজরাটে শাহ্‌জাদা আজমের শিকারযাত্রার সূত্রে কর্মচারী এবং জাগীরদাররা 'জঙ্গল-বারী' (জঙ্গল পরিষ্কার) করত। বিষয়টি প্রায়ই তাঁর সদর দপ্তর থেকে পাঠানো সংবাদ-পত্রগুলোতে দেখা যায় ('অখবারাৎ' ক ৪৯ ইত্যাদি)। 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ১৯৬ ক-খ, Bodl. পৃ. ১৫৫ খ, Ed. 150-এ পুনরুক্ত একটি পরওয়ানায় আদেশ দেওয়া হয়েছে শাহ্‌জাদার (মুয়জ্জম ?) শিকারযাত্রার প্রস্তুতি হিসেবে দিল্লী থেকে খিজরাবাদ অবধি পাহাড়ের পাদদেশে সমস্ত ছোট ছোট নদীতে সেতু বাঁধতে হবে। আর সেইসব পরগনার কর্মচারীদের বলা হয়েছে, তারা যেন এই কাজে নিযুক্ত কর্মচারীকে মালমশলা এবং শ্রমিক জোগাড় করে দেয়।

১. রসিকদাসের উদ্দেশে আওরঙ্গজেবের ফরমান, প্রস্তাবনা।

২. তোডর মলের সুপারিশ, 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮২; রসিকদাসের উদ্দেশে ফরমান, অনু. ৪।

করেছিলেন যে, নির্ধারণের সময়ে ছাড় দেওয়া যেতে পারে কিন্তু আদায়ের সময়ে কখনই ছাড় দেওয়া হবে না।[৩] রসিকদাসের উদ্দেশে আওরঙ্গজেবের ফরমানের মুখবন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতির নাম করে নির্ধারিত অঙ্কে যে ছাড় দেওয়া হয়েছে তার অধিকাংশই অসত্য। ঐ বাদশাহেরই আরেকটি ফরমানে বলা হয়েছে, একবার ফসল কাটা হয়ে গেলে আর কোন ছাড় দেওয়া হবে না।[৪] যাই হোক, বাস্তবে সবসময় সম্পূর্ণ আদায় করা সম্ভব হতো না; বাকিটা সাধারণত পরের বছরের সঙ্গে নিয়ে আসা হতো। দুর্বৎসরে তাই কৃষকের ঘাড়ে প্রায়ই ঐ ধরনের বকেয়ার এক দুঃসহ বোঝা চাপত।[৫] এই বকেয়া পরিমাণের ঝোঁক ছিল বেড়ে ওঠার। তাই, ঠিক আগের বছরের বাকি, যা সেই বছরেই পুরো আদায় করতে হবে, তার সঙ্গে তারও আগের যে সব বকেয়া (পারিভাষিক নাম 'সনওয়াৎ বাকি') তার পার্থক্য করতে হতো।[৬] একটি পুস্তিকায় সুপারিশ করা হয়েছে যে, দ্বিতীয়টি পুনরুদ্ধার করতে হবে ক্রমিক বাৎসরিক কিস্তিতে, যে কিস্তি কখনোই চলতি 'জমা'র শতকরা পাঁচ ভাগের বেশি হবে না।[৭] যে সব চাষী পালিয়েছে বা মারা গেছে তাদের পড়শিদের কাছ থেকে অনাদায়ী রাজস্ব দাবি করাটাও চলতি রীতি ছিল বলে মনে হয়। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের ১৬-তম বছরে জারি করা একটি 'হসবুল হুকুম্'-এ খালিসা ও জায়গীরদারের বরাত—দু জায়গাতেই এই রীতিতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে: অন্য কারও কাছে বকেয়া পাওনার জন্য কোন চাষীকে দায়ী করা চলবে না, আর ঠিক আগের বছরের পাওনাটুকুই আদায় করা হবে, খাতা থেকে পুরনো সমস্ত পাওনা কেটে দিতে হবে।[৮]

দুর্ভিক্ষের সময় কখনও কখনও বড় রকমের ছাড় দিতে হতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অবশ্য এর অর্থ দাঁড়াত: নিতান্ত প্রয়োজনীয় একটা ব্যাপারকে পুণ্যের মোড়ক পরানো—তার বেশি কিছু নয়। সবচেয়ে উদার যে কর মকুবের কথা নথিবদ্ধ আছে, সেটি ঘটেছিল শাহ্‌জাহানের রাজত্বের চতুর্থ ও পঞ্চম বছরে, গুজরাট ও দখিনে ১৬৩০-২ সালের বিরাট দুর্ভিক্ষের সময়ে। যে-খালিসা জমির মোট 'জমা' ছিল প্রায়

৩. আব্বাস খান, পৃ. ১২ ক।

৪. মুহম্মদ হাসিমের উদ্দেশে ফরমান, অনু. ১০ এবং ১৮।

৫. যে-মুকদ্দম এবং গ্রামবাসীরা ১৬২৩ সালে ইংরেজদের জাহাজ 'হোএল'-এর ধ্বংসাবশেষ চুরি করেছিল তাদের সঙ্গে ফয়সালা করতে দেরি হওয়ার কারণ হিসেবে সুরাটের কাছে নভসরাই-এর 'করোড়ী' যুক্তি দেখিয়েছিল যে, "এখন ফসল তোলার আসল সময়, আর মুকদ্দম এখনও গত বছরের 'ওয়াসিল' দেয়নি।" এখানে আরও বলা হয়েছে যে 'করোড়ী এসব লোকদের মারতে ভয় পাচ্ছে কারণ সে এদের কাছ থেকে টাকা পায়, এবং মারলে এরা পালিয়ে যেতে পারে'। ('ফ্যাক্টরিস, ১৬২২-২৩', পৃ. ২৫৩-৪)।

৬. রসিকদাসের উদ্দেশে ফরমান, অনু. ৫।

৭. 'খুলাসাতুল ইনশা'. Or. 1750, পৃ. ১১২ ক।

৮. 'নিগরনামা-এ মুন্শী', পৃ. ১১৪ খ-১১৫ ক, Bodl. পৃ. ১৫৪ ক-খ, Ed. 149; 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯০-৯১।

৮০ 'করোড়' 'দাম',[৯] তার ৭০ লাখ টাকা মকুব করা হয়েছিল। জায়গীরদারদেরও একই ধরনের ছাড় দিতে হয়েছিল, 'জমা-দামী' কমিয়ে তাদের তাই সাহায্য করা হয়। শুধু দখিন প্রদেশেই 'জমা-দামী' কমানো হয়েছিল ৩০ 'করোড়' 'দাম'।[১০] ঐ আমলেই কাশ্মীরে দুর্ভিক্ষ হলে চাষীদের উপর নির্ধারিত 'জমা' কমিয়ে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়।[১১] আর অনটনের অবস্থা দেখা দেওয়ায় লাহোর প্রদেশের খালিসা জমিতে একবার বিশেষভাবে 'জমা' কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[১২]

বিশেষ দুর্দশার অবস্থা অতিক্রম করতে চাষীদের সাহায্য করার জন্য এইসব ত্রাণ ব্যবস্থা ছাড়াও কৃষির উন্নতিতে সাহায্য দানের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই নেওয়া হতো, যাতে তা রাজস্ব বাড়ানোর কাজে লাগে। কৃষির উন্নতি বিষয়ে মুঘলদের ধারণা কী ছিল নথিপত্রে প্রায়ই তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এর লক্ষ্য ছিল মাত্র দুটি: আবাদী এলাকার বিস্তার ঘটানো আর অর্থকরী ফসল ('জিন্‌স্‌-এ কামিল') এর উৎপাদন বাড়ানো।[১৩] বিশাল পরিমাণে জমি অনাবাদী পড়ে থাকায় প্রথম লক্ষ্যটি গুরুত্ব পেয়েছিল। আর দ্বিতীয়টি আকর্ষণীয় ছিল এই কারণে যে অর্থকরী ফসলের জমিতে করের হার বেশি, তাই এর চাষ বাড়লে স্বভাবতই রাজস্ব বাড়বে।

মুঘল প্রশাসন যে-ধরনের পরিসংখ্যানগত তথ্য জোগাড় করেছিল তার অন্তত আংশিক উদ্দেশ্য ছিল চাষবাস বাড়ানো ও তার উন্নতির সম্ভাবনা খুঁজে বের করা, এবং সেই উদ্দেশ্যে কাজ কতটা এগোচ্ছে তার বিচার করা। আকবরের আমলের 'করোড়ী' পরীক্ষায় ব্যাপকভাবে এলাকা-জরিপের কাজ করা হয়েছিল। তিনটি

৯. লাহোরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪। মোট 'জমা'-র অঙ্কটি মনে হয় সমগ্র সাম্রাজ্যের খালিসা-র অঙ্ক। কাজবিনী, Add. 20734, পৃ. ৪৪৪, Or. 173, পৃ. ২২১ ক-খ-তে খালিসা-র ছাড় দেওয়া হয়েছে বলে আরও একটি অঙ্ক দেখানো আছে (৫০ লাখ টাকা), মোট 'জমা'-র কোন অঙ্ক দেওয়া নেই।

১০. সাদিক খান, Or. 171, পৃ. ৩১ খ-৩২ ক। Or. 1671, পৃ. ১৮ খ। খাফী খান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৮-এ আছে '৩০ বা ৪০ লাখ'। কাজবিনী এবং লাহোরী, পূর্বোক্ত গ্রন্থে সাধারণ-ভাবে জাগীরদারদের দেওয়া ছাড়ের উল্লেখ আছে। 'জমা-দামী' কমে যাওয়ার (যার পরিভাষিক নাম ছিল 'তখফীফ-এ দামী') ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জাগীরদাররা অন্যত্র সম পরিমাণ 'জমা'র বরাত দাবি করতে পারত।

১১. সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ৯৯ খ, Or. 1671, পৃ. ৫৪ ক।

১২. ওয়ারিস, ক: পৃ. ৪৪৫ ক, খ: পৃ. ৭৬ ক-খ।

১৩. কর্মচারীদের উদ্দেশে আকবরের সাধারণ আদেশ ('দস্তুর-আল আমল')-এর জন্য দ্রষ্টব্য 'ইন্‌শা-এ আবুল ফজল', ৬০ এবং 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৫; 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫-৬; রসিকদাসের উদ্দেশে ফরমান, প্রস্তাবনা এবং অনু. ২ ইত্যাদি; 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ৯৮ খ, ১০৪ ক-খ, Bodl, পৃ. ৭৪ ক-খ, ৭৯ খ-৮০ ক, Ed. 77, 81. মুহম্মদ বিন তুঘলক এই দুটি লক্ষ্যকেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বের শেষদিকে দোআব অঞ্চলে কৃষি প্রশাসন পুনর্বিন্যাসের জন্য তাঁর চেষ্টার পেছনে এই দুটি লক্ষ্যই ছিল (বরনী, 'তারিখ-এ ফিরুজ শাহী', পৃ. ৪৯৮-৯)।

সমসাময়িক তথ্যসূত্রে এর ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে এর চেষ্টা ছিল প্রধানত অনাবাদী জমি চাষের আওতায় আনা।[১৪] খালিসা এবং জাগীর—দু এর জমিতেই চাষের অবস্থা সম্বন্ধে শাহ্‌জাহানকে ব্যক্তিগতভাবে খবরাখবর জানানো হতো।[১৫] বিদ্যমান একটি নথি থেকে দেখা যায়, নতুন বসতি-করা গ্রাম ও তার চাষীদের সংখ্যা সদর দপ্তর থেকে জানতে চাওয়া হতো।[১৬] কিন্তু আওরঙ্গজেবের আমলে সরকারীভাবে অভিযোগ করা হয়েছে যে 'কানুনগো' এবং 'চৌধুরী'রা প্রশাসনকে শুধু আবাদযোগ্য এলাকার অঙ্কই জানায়, প্রকৃতপক্ষে চাষ হওয়া এলাকার অঙ্ক বা অর্থকরী ফসলের অবস্থা সম্পর্কে খবরাখবর দেয় না। সেই কারণে উন্নতি বা অবনতির মাত্রা খুব একটা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।[১৭]

মুঘল প্রশাসন প্রধানত রাজস্ব ছাড় দিয়েই উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার স্বীকৃত দুটি দিকে উৎসাহ দিত। যেমন, যে জমিতে কয়েক বার চাষ হয়নি, সে জমিতে চাষ করা হলে, প্রথম বছর রাজস্বের প্রমাণ হারের অর্ধেক বা তার চেয়েও কম নেওয়া হতো। তারপর বছর-বছর হার বাড়িয়ে যাওয়া হতো যতক্ষণ-না পঞ্চম বছরে পরিমাণটি পাওনার পুরো অঙ্কে পৌঁছয়।[১৮] সেই বছরে রাজস্ব কর্মচারীদের নির্দিষ্ট জমির ('নসক'-এর আওতায়) চেয়ে বেশি জমিতে ধান বুনলে কৃষককে অতিরিক্ত এলাকার ওপর কোন

১৪. 'আরিফ কান্দাহারী', ১৭৭, 'তবকৎ-এ আকবরী', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০০-৩০১; বদাউনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৯-৯০।

১৫. 'চার-চমন-এ ব্রহামন', ক: পৃ. ৩২ ক-খ, খ: পৃ. ২৬ ক-খ।

১৬. 'সিলেকটেড ডক্যুমেন্টস্ অফ শাহ্‌জাহানস্ রেন', পৃ. ২৪৪-৫।

১৭. রসিকদাসের উদ্দেশে ফরমান, প্রস্তাবনা; 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ৯৯ ক, Bodl. পৃ. ৭৪ খ-৭৫ ক, Ed. 77. এও সম্ভব যে, রাজস্বের হিসাবেও 'অসলী' (মূল), 'ইজাফা' (অতিরিক্ত, নতুন করে বসানো) এবং 'দাখিলী'-র (নতুন গ্রাম, সেখানকার 'জমা' তখনও কোন 'অসলী' গ্রামের 'জমা'-র অংশ হিসেবে গণ্য করা হতো) মধ্যে খুব সতর্কভাবে তফাৎ করা হতো ঐ একই উদ্দেশ্যে ('খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৭ ক, Or. 2026, পৃ. ২৮ ক-২৯ ক এবং Add. 6603, পৃ. ৮০ ক)।

১৮. 'পোলাজ' এবং 'পরতী' জমিতে শের শাহের 'রাই' উল্লেখ করার পর 'আইন'-এ বলা হয়েছে যে, 'চাচর' (তিন বা চার বছর ধরে অনাবাদী জমি)-এর ক্ষেত্রে প্রথম বছর আদায় করতে হবে প্রামাণ্য দাবির ২/৫ ভাগ, দ্বিতীয় বছর ৩/৫ ভাগ, তৃতীয় বছর ৪/৫ ভাগ এবং পঞ্চম বছর পুরোটাই। 'বন্‌জর' (পাঁচ বছরের বেশি অনাবাদী) জমিতে বিভিন্ন বছর বিভিন্ন ধরনের শস্যের জন্য রাজস্ব-হার দেওয়া আছে কিন্তু সম্পূর্ণ পরিমাণে (অর্থাৎ, 'পোলাজ'-এর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে) পৌঁছেছে পঞ্চম বছরে। প্রাথমিক হারটি নামমাত্র: যেমন গমের ক্ষেত্রে 'পোলাজ'-এর একের-আট ভাগ ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০১-৩)। চূড়ান্ত নগদ 'দস্তুর'গুলি যখন প্রয়োগ করা হতো তখনও এই সব অনুপাতই মানা হতো কিনা তা খুব স্পষ্ট নয়। আকবরের ২৭-তম বছরে তোডর মল সুপারিশ করেছিলেন, যে-জমিতে তিন বা চার বছর চাষ করা হয়নি, সেখানে প্রথম বছর ধরে নেওয়া উচিত প্রমাণ হারের অর্ধেক, পরের বছর ৩/৪ ভাগ, তৃতীয় বছর পুরো হার ('আকবরনামা', Add. 27,247, পৃ. ২৩১ খ; বিবলিওথেকা

রাজস্ব দিতে হতো না।[১৯] বাদশাহী আদেশে বলাই ছিল যে কোন গ্রামের কুয়ো নষ্ট হয়ে গেলে যে সেগুলো মেরামত করতে চাইবে তাকে আর কোন ভূমিরাজস্ব দিতে বলা হবে না, শুধু কুয়ো পিছু বাঁধা হারে একটা কর দিতে হবে। পঞ্চম বছর পর্যন্ত এই কর প্রতি বছর বাড়িয়ে যাওয়া হবে, তারপর থেকে দশ বছর অবধি একই থাকবে, অবশেষে স্বাভাবিক ভূমিরাজস্ব ধার্য করা হবে।[২০] ১৬৩০-২-এর দুর্ভিক্ষের পর কোন কোন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় আবার বসত গাড়তে উৎসাহ দেওয়ার জন্য অস্বাভাবিক রকমের কম হার প্রস্তাব করা হয়েছিল।[২১] একইভাবে অর্থকরী ফসলের ক্ষেত্রে আদেশ দেওয়া হয়েছিল : যে-জমিতে ঐ ফসল নতুন চাষ করা হচ্ছে সেখানে প্রথম-প্রথম সাধারণ হারের চেয়ে কম নিতে হবে।[২২] এইভাবে, যে জমিতে আগে শস্য-ভাগ হতো সেখানে উঁচু মানের ফসল বোনা হলে প্রথম বছরে ঐ শস্যটির রাজস্ব স্বাভাবিক 'দস্তুর' অনুযায়ী যা দাঁড়ায়, তার চেয়ে একের-চার ভাগ কম হবে।[২৩]

উন্নয়নে উৎসাহ দেওয়ার জন্য আর্থিক ছাড়াও অন্য কয়েকটি ছাড়েরও সুপারিশ করা হয়েছিল। 'বনৃজর' জমির চাষী তার খুশিমতো রাজস্ব নির্ধারণ পদ্ধতি বেছে নিতে পারত।[২৪] যদি কোন গ্রামে 'বনৃজর' জমি আর পড়ে না থাকে অথচ দেখা

ইণ্ডিকা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮২)। এর অর্থ কি এই যে 'চাচর' জমির ক্ষেত্রে পূর্ব-অনুমোদিত অনুপাত তিনি পরিবর্তন করেছিলেন?

কাশ্মীরে দশ বছর ধরে লাঙল না-পড়া জমিতে প্রথম বছর দাবি করা হতো ফসলের একের-ছয় ভাগ, চার থেকে দশ বছর চাষ না-হওয়া জমিতে একের-পাঁচ ভাগ ; এবং দুই থেকে চার বছরের অনাবাদী জমিতে একের-তিন ভাগ। সর্বাধিক অনুপাত ½-এ পৌঁছনো হতো যথাক্রমে চতুর্থ, তৃতীয় ও দ্বিতীয় বছরে ('আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭২৭)।

১৯. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫ ; 'হিদায়েৎ-আল কোয়াইদ', পৃ. ১০ খ।

২০. কুয়ো পিছু রাজস্ব ছিল প্রথম বছর ১০ টাকা ; তারপর বছর-বছর বেড়ে হতো ১৫-২৩-৩৪ টাকা আর পঞ্চম বছরে ৫০ টাকা ('নিগরনামা-এ মুন্শী', পৃ. ১৮৭ ক-১৮৮ ক, Bodl. পৃ. ১৪৮ খ-১৪৯ ক, Ed. 144)।

২১. সাদিক খান বলেছেন যে সৈয়দ খান-এ জাহান বরহা-র 'আমিল' গঙ্গারাম, নাদুরপুর ও সুলতানপুর সরকার-এ নতুন চাষী এনে বসিয়েছিলেন। তিনি তাদের একটি 'কৌল' দিয়েছিলেন যে, আগের ১০০০ বা ২০০০ টঙ্কার বদলে মাত্র ১০০ বা ২০০ টঙ্কা নেওয়া হবে। (Or. 174, পৃ. ৩১ খ-৩২ ক, Or. 1671, পৃ. ১৮ খ. টঙ্কা'র জায়গায় 'বিঘা'ও পড়া সম্ভব)। ইংরেজদের একটি চিঠিতে অবশ্য গুজরাটের ক্ষেত্রে অন্য ছবি দেওয়া হয়েছে। দুর্ভিক্ষ পার হয়ে গেছে, তবু "গ্রামগুলো ধীরে ধীরে ভর্তি হচ্ছে" আর "সব ধরনের শাসকদের মাত্রাছাড়া স্বৈরাচার ও অর্থগৃধ্নুতা যদি গরীব মানুষকে একবছরের জন্যেও অত্যাচারমুক্ত হয়ে মাথা তোলবার সুযোগ দেয়, তারা তাদের গবাদি পশু রক্ষা করতে পারবে ও জমি থেকে যে প্রচুর উৎপন্ন হয় তা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে", ইত্যাদি ('ফ্যাক্টরিস, ১৬৩৪-৩৬', পৃ. ৬৫)।

২২. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫।

২৩. ঐ, ২৮৬।

২৪. ঐ, ৩০৩।

যায় যে, চাষীদের আরও চাষ করার ক্ষমতা রয়েছে, সে ক্ষেত্রেও রাজস্ব-কর্মচারী বা 'আমালগুজার'কে অন্য গ্রাম থেকে সেই গ্রামে জমি সরিয়ে আনতে হতো।[২৫] যদি কোন বছরে অর্থকরী ফসলের চাষ বেড়ে থাকে, কিন্তু মোট আবাদী জমির পরিমাণ কমে যায়, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত না 'জমা'র কোন হেরফের হচ্ছে ততক্ষণ 'আমালগুজার' কোন আপত্তি করতে পারত না।[২৬]

আবাদে উৎসাহ দেওয়ার আরেকটি পদ্ধতি ছিল চাষীদের 'তকাবী' (আক্ষরিক অর্থে : শক্তিদায়ী) ঋণদান। আবুল ফজল শুধু এটুকুই বলেছেন যে, 'যেসব চাষীর হাত খালি', 'আমালগুজার' তাদের এই ঋণ দিয়ে সাহায্য করবে।[২৭] তোডর মল অবশ্য তাঁর সুপারিশে আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, সেই সমস্ত চাষীকেই 'তকাবী' দিতে হবে যারা খুব দুর্দশাগ্রস্ত, যাদের বীজ বা বলদ নেই।[২৮] পরবর্তীকালের একটি পুস্তিকায় সুপারিশ করা হয়েছে যে নির্ধারক ('আমিল') লক্ষ্য রাখবে গ্রামের লাঙলের সংখ্যা সমস্ত জমি চাষ করার পক্ষে যথেষ্ট কিনা। যদি তা না হয় তাহলে বলদ ও বীজের জন্য চাষীদের সে 'তকাবী' দেবে।[২৯] দখিনে মুর্শিদ কুলী খানের সংস্কারগুলোর একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল ঐ ধরনের উদ্দেশ্যে 'তকাবী' বণ্টন।[৩০] এও জানা যায় যে তাঁর সহকর্মী মুলতাফৎ খান একটি বড় মাপের প্রস্তাব দিয়েছিলেন : বেরার (পাইনঘাট) এবং খান্দেশ অঞ্চলের প্রদেশগুলোতে বাঁধ তৈরির জন্য সরকারী কোষাগার থেকে "তকাবী বাবদে" অগ্রিম ৪০,০০০ থেকে ৫০,০০০ টাকা দেওয়া হোক। এই ঋণ ভাগ করে দেওয়া হবে জাগীর এবং সম্ভবত খালিসা-তেও।[৩১]

সাধারণত 'তকাবী' ঋণ দেওয়া হতো 'চৌধুরী' (বা 'দেশমুখ') এবং 'মুকদ্দম', (বা 'পাটেল')-দের মাধ্যমে। তারাই চাষীদের মধ্যে জনে-জনে এই ঋণ বিলি করত আর নিজেরাই ঋণশোধের জামিনদার হতো।[৩২] মনে হয়, গ্রামের

২৫. ঐ, ২৮৫।

২৬. ঐ, ২৮৬।

২৭. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫। তুলনীয়, মুহম্মদ হাসিমের উদ্দেশে ফরমান, অনু ২।

২৮. Add. 27,247, পৃ. ২৩১ খ-তে মূল রূপ দ্রষ্টব্য। 'আকবরনামা'র চূড়ান্ত পাঠে (খণ্ড ৩, পৃ. ৩৮২) এত খুঁটিনাটি দেওয়া নেই।

২৯. 'হিদায়েৎ-আল কোয়াইদ', পৃ. ১০ খ।

৩০. "ষাঁড়, মোষ এবং চাষের জন্য দরকারী অন্যান্য জিনিস কেনার জন্য" (সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ১৮৫ খ, Or. 1671, পৃ. ৯১ ক ; খাফী খান ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩৩ টীকা)।

৩১. 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ৫৩ ক-খ, 'রুকাৎ-এ আলমগীর', পৃ. ১৩১-২।

৩২. তোডর মলের সুপারিশ, অনুচ্ছেদ ৩ (মূল পাঠ, Add. 27,247, পৃ. ২৩১ খ) : 'তকাবী' ঋণ ফেরৎ দেওয়ার জন্য " 'মুকদ্দম'দের কাছ থেকে চুক্তিপত্র নিতে হবে।" 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮২-র এই অংশে "তকাবী", "চুক্তিপত্র" এবং "মুকদ্দম" শব্দগুলো বাদ গেছে, তার জায়গায় এসেছে "সাহায্য", "লিখিত কাগজ" এবং "মান্য ব্যক্তি" ; 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ১২৩ খ, সাদিক খান এবং খাফী খান, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, 'ফরহঙ্গ-এ করদানী', পৃ. ৩৫ খ ; 'হিদায়েৎ-আল কোয়াইদ', পৃ. ১০ খ।

মোড়লরা নিজেদের খাত থেকে চাষীদের যে সব ঋণ দিত সেগুলোকেও বলা হতো 'তকাবী'।[৩৩]

আবুল ফজল সুপারিশ করেছেন, এই ঋণ আদায় করতে হবে "ধীরে ধীরে"।[৩৪] অন্য দিকে, তোডর মল লিখে গেছেন যে, ঋণশোধের টাকা খানিকটা আদায় করতে হবে প্রথমবার ফসল তোলার সময়ে, পরের ফসল তোলার সময়ে পুরোপুরি।[৩৫] পরবর্তী সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে চলতি রীতি ছিল প্রথমবার ফসল তোলার সময়েই পুরোটা আদায় করে নেওয়া, তা না পারলে অন্তত সেই বছরের মধ্যেই আদায় করা।[৩৬] মুলতাফৎ খান কথা দিয়েছিলেন যে তাঁর পরিকল্পনা গৃহীত হলে অগ্রিম হিসেবে যা দেওয়া হবে দু বছরের মধ্যেই তা উঠে আসবে।[৩৭] কিন্তু কখনও কখনও বার্ষিক কিস্তিতে আদায়ও অনুমোদন করা হতো।[৩৮] একটি পুস্তিকায় বলা হয়েছে : অনাদায়ী 'তকাবী' 'সনওয়াৎ বাকি'-র সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে, আর তা আদায় হবে বকেয়া রাজস্বের অংশ হিসেবে।[৩৯] 'তকাবী' ঋণের ওপর সুদ নেওয়া হয়েছে এমন কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবত ধর্মীয় প্রভাবে পড়ে কর্তৃপক্ষ এই রীতিকে নিন্দনীয় মনে করত। অবশ্য এও খুবই সম্ভব যে 'চৌধুরী' ও মোড়লরা চাষীদের তরফে জামিন দাঁড়াতে গিয়ে এই অনুগ্রহের সুবাদে তাদের দস্তুরি বা ঘুষ উসুল করে নিত।

কোন চাষী মারা গেলে কিংবা পালিয়ে গেলে তার জামিনদার এই দুই কর্মচারীকেই সেই ঋণ শোধ দিতে হতো। কিন্তু, অন্তত একটি নির্দেশ সম্বলিত চিঠিতে আদেশ দেওয়া হয়েছে : যদি কোন চাষী উপস্থিত থাকে অথচ তার হাল এতই খারাপ যে, শোধ দেওয়ার মতো অবস্থা একেবারেই নেই, তাহলে সেই ঋণ পুরোপুরি মকুব করে দেওয়া হবে।[৪০]

এ কথা বলা অবশ্য পুরোপুরি ঠিক হবে না যে কৃষির উন্নতিবিষয়ক মুঘল ব্যবস্থাপত্র শুধুমাত্র রাজস্ব সংক্রান্ত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। উদাহরণস্বরূপ, কর্তৃপক্ষকেই যে সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ করতে হবে এই ধারণা প্রকাশ পেয়েছে রাজস্ব কর্মচারীদের

৩৩. 'দুর-আল উলুম', পৃ. ৪৩ ক, ৫৫ খ।

৩৪. 'বা-আগিসৃতাগী'। 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫।

৩৫. সুপারিশ, অনু. ৩ (আকবরনামা' Add. 27,247, পৃ. ২৩১ খ; বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা, ৩য় খণ্ড, ৩৮২)।

৩৬. 'খুলাসাতুল্ ইন্শা', Or. 1750, পৃ. ১১২ ক : 'ফরহঙ্গ-এ করদানী', পৃ. ৩৫ খ; 'হিদায়েৎ-আল কোয়াইদ', পৃ. ১০ খ। বলা হয়েছে যে মুর্শিদ কুলী খান ফসল তোলার সময় [ঋণ] ফেরৎ চেয়েছিলেন কিন্তু দিতে বলেছিলেন দু কিস্তিতে। (সাদিক খান, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, খাফী খানের লেখায় শেষ অংশটি বাদ পড়েছে)।

৩৭. 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ৫৩ ক-খ; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', পৃ. ১৩১-২।

৩৮. 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ১২৩ খ।

৩৯. 'খুলাসাতুল্ ইন্শা', পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৪০. 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ১২৩ খ।

উদ্দেশে জারি করা কয়েকটি নির্দেশে। সেখানে বলা হয়েছে যে, চাষের উন্নতি ও আবাদ বাড়ানোর জন্য তারা কুয়ো খোঁড়াবে ও মেরামত করাবে।[৪১] মুলতান প্রদেশে, 'খাল-তত্ত্বাবধায়ক'কে নতুন খাল খোঁড়াতে হতো ও বাঁধ তৈরি করাতে হতো।[৪২] একটি উল্লেখযোগ্য স্মারকপত্রে হান্সী অবধি সেচের ব্যবস্থা করার জন্য চুতাং নদী আরও গভীর করে খোঁড়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।[৪৩] এ ছাড়াও, শাহ্‌জাহানের আমলে খোঁড়া নালাগুলোও নেহাৎ কম ব্যাপার ছিল না। তাহলেও এই দিকটির ওপর সত্যিই খুব একটা মনোযোগ দেওয়া দেওয়া হয় নি। স্পষ্টতই, শাহ্‌জাহান যে দুটি বড় খাল কাটিয়েছিলেন, ক্ষেতে জল দেওয়াটাই তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না। একটির উদ্দেশ্য ছিল লাহোরের বাগানে জলসেচ করা, অন্যটির উদ্দেশ্য শাহ্‌জাহানবাদের দুর্গে জল সরবরাহ করা। কিন্তু, সবচেয়ে বড় কথা এই যে, যদিও এমন দু-তিনটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায় যেখানে কর্তৃপক্ষ সেচের ব্যাপারে কিছুটা আগ্রহ দেখিয়েছিল, তবু ঐ আমলের রাজস্ব সংক্রান্ত বিপুল লেখাপত্র এ বিষয়ে নীরব। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সেচব্যবস্থা নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রণ মুঘল ভারতের কৃষি জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক—মার্কস বললেও, এ কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব।[৪৪]

৪১. রসিকদাসের উদ্দেশে ফরমান : প্রস্তাবনা।

৪২. 'নিগরনামা-এ মুন্শী', পৃ. ১৯৮, খ-১৯৯ ক. Bodl. পৃ. ১৫৭ ক-খ, Ed. 151-2, ভাক্কর প্রদেশে চাষীদের দিয়ে কিংবা 'জাগীরদার'দের দিয়ে নালা কাটানোর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আরও দ্রষ্টব্য 'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী' ১৭-১৮।

৪৩. বালকৃষণ ব্রাহ্মণ, পৃ. ১০৭ ক-১০৯ খ।

৪৪. ১৮৫৩-য় 'ভারতে বৃটিশ শাসন' বিষয়ে তাঁর অসাধারণ প্রবন্ধে মার্কস এই বক্তব্য রেখেছিলেন (মার্কস ও এঙ্গেলস, 'সিলেকটেড ওয়ার্কস', মস্কো, ১৯৫১, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৪-১৫-য় পুনর্মুদ্রিত)। বিষয়টিতে তিনি আবার ফিরে যান 'ক্যাপিটাল', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২৩ টীকা-য়। সেখানে তিনি বলেছেন : "ভারতের ছোট ছোট অসংলগ্ন উৎপাদন-এককগুলোর ওপর রাষ্ট্রের প্রভুত্বের অন্যতম বাস্তব ভিত্তি ছিল জল সরবরাহ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ। মুসলিম শাসকরা তাদের পরবর্তী ইংরেজ শাসকদের চেয়ে এ ব্যাপারটি অনেক ভালোভাবে বুঝেছিলেন। ওড়িশায়…১৮৬৬-র দুর্ভিক্ষের কথা মনে রাখাই যথেষ্ট" ইত্যাদি। এও হতে পারে যে, দখিন-এর পুষ্করিণী ব্যবস্থা এবং মধ্যযুগের পারস্য ও মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যই মার্কসকে ভুল পথে নিয়ে গিয়েছিল।

সপ্তম অধ্যায়

রাজস্ব বরাত

১. জাগীর ও খালিসা

মুঘল ভারতে—আসলে মধ্যযুগের ভারতেই—রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, রাষ্ট্র শুধু শোষক শ্রেণীদেরই রক্ষা করত না, নিজেই ছিল শোষণের প্রধান হাতিয়ার। আগের অধ্যায়েই আমরা দেখেছি রাজস্ব দাবি কীভাবে উদ্বৃত্ত উৎপন্নের (অর্থাৎ চাষীদের টিকে থাকার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত উৎপাদনের সবটুকুর) প্রায় সমান হতো। এই বিপুল রাজস্বের বিলি-ব্যবস্থা পুরোপুরি বাদশাহের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করত। সাম্রাজ্যের বৃহত্তর অংশেই, ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য করের ওপর তাঁর অধিকার তিনি হস্তান্তর করে দিতেন কয়েকজন প্রজার হাতে। যে সব এলাকার রাজস্ব বাদশাহ্ এইভাবে বরাত দিতেন সেগুলোকে বলা হয় জাগীর।[১] 'তুয়ূল' এবং 'ইক্তা' শব্দদুটিও 'জাগীর'-এর সমার্থক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু সাধারণত ততটা ব্যবহার হতো না।[২] যারা জাগীর পেত তাদের বলা হতো 'জাগীরদার' (জাগীরের অধিকারী)।

১. মোরল্যাণ্ড-ই প্রথম আধুনিক লেখক যিনি তাঁর 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম'-এ জাগীর ব্যবস্থার মূল দিকগুলো সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তখনও পর্যন্ত জাগীর-এর তর্জমায় 'ফিয়েফ' (fief) শব্দটি ব্যবহার করা হতো। তিনি সেটি বাতিল করে তার জায়গায় 'রাজস্ব বরাত' বা শুধু 'বরাত' (Assignment) শব্দটি চালু করেন।

'জাগীর' শব্দটি আসলে দুটি ফার্সী শব্দের সমাস। এর সঠিক বানান হওয়া উচিত 'জাই-গীর', যদিও প্রায় কখনোই তা করা হয় না। শব্দটির আক্ষরিক অর্থ, "কোন জায়গার অধিকারী বা দখলদার।" ১৭৩৯-৪০-এ ভারতে সঙ্কলিত বড় ফার্সী শব্দকোষ 'বাহার-এ আজম'-এ 'জাগীর'-এর পারিভাষিক অর্থের একটি সংজ্ঞা দেওয়া আছে: "জাইগীর, জাগীর। একটি ভূখণ্ড, বাদশাহ যা মনসবদার বা ঐ ধরনের (লোকদের) মঞ্জুর করেন, যাতে তারা সেই জমির আবাদ থেকে যে-রাজস্ব ('মহ্সূল') হয় তা দিতে পারে, সে রাজস্ব যা-ই হোক না কেন।" (নবল কিশোর সম্পা. পৃ. ২৮৩)। এই পারিভাষিক অর্থে 'জাগীর' শব্দটির ব্যবহার, মনে হয়, শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন, অধ্যাপক ল্যামটনের 'ল্যাণ্ডলর্ড অ্যাণ্ড পিজান্ট ইন পার্সিয়া'-র পরিভাষা-অংশে শব্দটি দেখা যায় না। ভারতেও শব্দটির ব্যবহার শুরু হয় মাত্র ১৫ শতকে, বরানী ও অন্যান্য লেখকরা সর্বদাই এর জায়গায় 'ইক্তা' শব্দটি ব্যবহার করতেন। (বরানীর 'তারিখ-এ ফিরুজশাহী', বিব্লিও. ইণ্ডিকা সংস্করণ, পৃ. ৪০-এ অবশ্য একবার 'জাগীর' শব্দটি আছে, কিন্তু সেখানে এর ব্যবহার হয়েছে সামরিক অর্থে। অধ্যাপক এস. এ. রশীদ-সম্পাদিত-পাঠে (আলীগড়, পৃ. ৪৮) এর জায়গায় আছে 'চাকর'। সেটিই যথার্থ)।

২. 'ইক্তা' কথাটি আরবী, প্রায় ইসলাম ধর্মের মতোই প্রাচীন। প্রথমে এর অর্থ ছিল রাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়া খানিকটা ভূ-সম্পত্তি। কিন্তু ক্রমশ এর অর্থ দাঁড়ায় রাজস্ব বরাত "যাতে সম্পত্তির

এদের 'তুয়ূলদার' ও 'ইক্তাদার'ও বলা হতো, কিন্তু এই শব্দ দুটিও, যে শব্দ থেকে এদের উৎপত্তি তাদের মতোই, ব্যবহার হতো কম। মুঘল সাম্রাজ্যের শাসক শ্রেণীর আয়ের প্রধান উৎস ছিল এইসব বরাত। জাগীরদাররা সাধারণত হতেন মনসবদার, বাদশাহ্ তাঁদের যে-পদ ('মনসব') দিয়েছেন তার অধিকারী। এই সব পদ সাধারণত দু ধরনের ছিল: 'জাত' এবং 'সওয়ার'; প্রথমটি দিয়ে প্রধানত বোঝাত ব্যক্তিগত বেতন, দ্বিতীয়টি দিয়ে ঠিক হতো কর্মচারীটিকে কত সৈন্য রাখতে হবে।[৩] দুরকম পদের বেতন হারই খুব বিস্তারিতভাবে দেওয়া থাকত।[৪] মনসবদাররা হয় কোষাগার থেকে নগদে ('নক্দ্') তাদের মাইনে পেত, নয়তো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের জাগীর হিসেবে

আসল অধিকার রাষ্ট্রের" (তুলনীয় এফ. লকেগার্ড, 'ইস্লামিক ট্যাক্সেশন ইন দা ক্লাসিক পিরিয়ড', পৃ. ১৪ ইত্যাদি)। দিল্লী সুলতান আমলে লেখাপত্রে শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু মুঘল আমলে এসে 'ইক্তা'র বদলে, সাধারণ ব্যবহারে, 'জাগীর' কথাটিই চালু হয়ে যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লেফাফাদুরস্ত ধাঁচে লিখতে হলে 'ইক্তা' শব্দটি প্রয়োগ করা হতো। তারও উদ্দেশ্য ছিল ঘরোয়া শব্দ 'জাগীর'কে পরিহার করা। 'ইক্তা' যদি প্রাচীন প্রয়োগ হয়, 'তুয়ূল' ছিল বিদেশী শব্দ। পারস্যে ১৪ শতক থেকে এই শব্দটির ব্যবহার শুরু হয় (ল্যামটন, 'ল্যাণ্ডলর্ড অ্যাণ্ড পিজান্ট ইন পার্সিয়া', ১০১-২)। ভারতে সম্ভবত এই শব্দটির প্রয়োগ 'ইক্তা'র চেয়ে বেশি চালু হয়ে পড়ে, তবু এটি 'জাগীর'-এর গৌণ প্রতিশব্দই থেকে যায়।

'মিরাৎ-আল-ইশ্তিলাহ্'-এর লেখক অবশ্য 'তুয়ূল' এবং 'জাগীর'-এর সঠিক পারিভাষিক অর্থের পার্থক্য করতে চেয়েছেন (পৃ. ২৬ক)। তাঁর মতে, প্রথমটির ব্যবহার হতো রাজবংশের শাহ্জাদাদের অধিকৃত বরাতের ক্ষেত্রে, দ্বিতীয়টি 'উমরা' (উঁচু মনসবধারী) অভিজাত এবং মনসবদারদের অধিকৃত বরাতের ক্ষেত্রে। ১৭ শতকের লেখাপত্রে ঐ ধরনের চুলচেরা বিচারের কোন নজির নেই, এবং সব রকম বরাতের ক্ষেত্রেই নির্বিচারে কথাদুটি ব্যবহার করা হয়েছে। শাহ্জাদাদের বরাতের ক্ষেত্রে সাধারণত 'তুয়ূল-এ (বা জাগীর-এ) উকলা-এ সরকার-এ আলা' (বা 'সরকার-এ দৌলত-মদার' ইত্যাদি) ধরনের বাঁধাগৎ ব্যবহার করা হতো। 'নিগরনামা-এ মুন্শী'-র নথিপত্র (যার অনেক-কটিই শাহ্জাদা মুয়জ্জমের জাগীর সংক্রান্ত) বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

৩. আবদুল আজিজের 'দা মনসবদারী সিস্টেম অ্যাণ্ড দা মুঘল আর্মি'-তে বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা আছে। আরও দ্রষ্টব্য মোরল্যাণ্ড, 'র‍্যাংক (মনসব) ইন দা মুঘল স্টেট সার্ভিস', *JRAS*, ১৯৩৬, পৃ. ৬৪১-৬৫।

৪. আকবরের আমলের বেতন-হার দেওয়া আছে 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৮-১৮৫-তে। জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ হওয়ার সময়ে এই হার কী ছিল তা পাওয়া যায় 'ইকবালনামা', ২য় খণ্ড, Or. 1834, পৃ. ২০৩ক-এ। আফজল খানের সই করা, শাহ্জাহানের রাজত্বের ১১-তম বছরে ঘোষিত বেতন-হার পুনরুক্ত হয়েছে 'ফরহঙ্গ-এ করদানী', পৃ. ২১ক-২৪ক (Edinburgh No. 83, পৃ. ১৯ক-২১খ)-তে; ইসলাম খানের সই করা, ১৪-তম বছরের ঘোষিত হার দেওয়া আছে 'সিলেকটেড ডকুমেন্টস্ অফ শাহ্জাহানস্ রেন', পৃ. ৭৯-৮৪-তে। আরও পরে, সাদুল্লাহ্ খানের সই হয়ে যেসব হার ঘোষিত হয়েছিল সেগুলো আছে 'দস্তুর-আল আমল-এ আলমগীরী', পৃ-

বিশেষ বিশেষ এলাকা বরাত দেওয়া হতো। জাগীরের মতো একই ভিত্তিতে, কিন্তু কোন বিশেষ পদ বা দায়িত্ব না নিয়ে যে-জমি ভোগ করা যেত, তার নাম 'ইনাম'।[৫] যে এলাকা বরাত দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছে কিন্তু তখনও জাগীরে বরাত হয়নি, তার পারিভাষিক নাম ছিল 'পাইবাকী'।[৬] শেষত, 'খালিসা' বা আরও সঠিকভাবে 'খালিসা-এ শরিফ' ছিল সেই সব জমি ও রাজস্বের উৎস যা বাদশাহী কোষাগারের জন্যই সংরক্ষিত থাকত।[৭]

বরাতীই রাষ্ট্রের প্রাপ্য পুরো রাজস্ব আদায়ের অধিকারী ছিলেন।[৮] যদিও এর

১২১ক-১২৩ক-য়। 'আইন' এবং 'ইকবালনামা'র মতো করে না দিয়ে এই সব হার দেওয়া আছে 'দাম'-এর অঙ্কে। আওরঙ্গজেবের আমলের হার (যেমন, 'জওয়াবিৎ-এ আলমগীরী', Add 6598, পৃ. ১৪৯খ-১৫২ক, Or, 1641, পৃ. ৪৩ক-৪৭খ-তে দেওয়া আছে) আর শাহ্জাহানের আমলের হার প্রায় একই।

৫. শাহ্জাদী জাহানারাকে 'ইনাম' হিসেবে সুরাট বরাতের বিষয়ে লাহোরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৭ তুলনীয়। এবং তুলনীয় 'আলমগীরনামা', পৃ. ৬১৮, যেখানে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, সর্বোচ্চ যে-পদ কোন অভিজাতকে অনুদান দেওয়া যায় যেহেতু তা জয়সিংহকে দেওয়া হয়ে গেছে, তাই তাঁকে আরও সম্মান দেওয়া যেতে পারে শুধু 'ইনাম' বরাত দিয়ে। 'মিরাৎ-আল ইশ্‌তিলাহ্', পৃ. ২৬ক-য় বলা হয়েছে, শাহ্জাদীদের অধিকৃত বরাতকে বলা হতো 'বর্গ-বহা' কিন্তু ১৭ শতকে এই শব্দটি ব্যবহারের কোন দৃষ্টান্ত আমি পাইনি। শাহ্জাদারা সাধারণত তাঁদের পদ অনুযায়ী বরাতী জাগীর ছাড়াও বড় বড় 'ইনাম' বরাতের অধিকারী হতেন।

৬. 'পাইবাকী' শব্দটি হিসাবরক্ষকরা ব্যবহার করেন হিসাবের নীচে দেখানো জমা-খরচের মিল অর্থে। সম্ভবত এর থেকেই পরে শব্দটির এই অদ্ভুত অর্থ দাঁড়িয়েছিল : জাগীরের জন্য যে-জমি পাওয়া যাবে, বা, একটি প্রশাসন-সংক্রান্ত পুস্তিকায় যেমন সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে : "একটি জাগীর, কোন লোকের কাছ থেকে যা নেওয়া হয়েছে এবং অন্য লোককে বরাত দেওয়ার আগে পর্যন্ত যার সব রাজস্ব বাদশাহী সরকারই নেবে" ('খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৮৯ক-৯০ক, Or, 2026, পৃ. ৫১ক-৫২খ)। স্পষ্টতই এই অর্থে শব্দটির ব্যবহারের জন্য 'ওয়কাই-এ আজমীর', ৭৪, ৩৭৫-৬ ; 'অখবারাৎ' ৪৭/১৬৭ ; 'দস্তুর-আল আমল-এ আগাহী', পৃ. ৩১ক ; এবং মামুরি, পৃ. ১৫৬খ-১৫৭ক, ১৮২খ, খাফী খান, Add. 6574, পৃ. ১০৭ক, বিবলিও. ইণ্ডিকা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৬-৭ দ্রষ্টব্য।

৭. শব্দটির সংজ্ঞার জন্য 'মিরাৎ-আল ইশ্‌তিলাহ্', পৃ. ২৬ক দ্রষ্টব্য, যদিও এটি এতই সুপরিচিত যে কোন সূত্রে উল্লেখের প্রয়োজন নেই বললেই হয়।

৮. বরাতের আদেশনামায় বাঁধাগতের যে-সব কথা ব্যবহার করা হতো সেই অনুযায়ী 'চৌধুরী' (বা 'দেশমুখ') 'কানুনগো' (বা 'দেশপাণ্ডিয়া') এবং 'মুকদ্দম' (বা 'পাটেল') এবং চাষী ও আবাদকারীরা পুরো 'মাল-এ ওয়াজিব' (রাজস্ব) এবং 'হকুক-এ দিওয়ানী' (রাজস্ব দাবি)-র জন্য বরাতীর কাছে দায়ী থাকবে (হরকরণ, পৃ. ৫৩, ৫৪ ; 'সিলেকটেড ডকুমেন্টস্' ইত্যাদি, পৃ. ৪, ৫, ১৭, ১৮, ২১, ২৩, ১৪৭, ১৫১, ১৫৮, ১৭১, ১৭৫-৬ ; 'নিগরনামা-এ মুন্শী', পৃ. ১১৮ক-১২১খ, Bodl. পৃ. ৯১ক-৯৬ক, Ed. 91-2)।

মধ্যে মূলত ভূমিরাজস্বই পড়ে, তবু নানারকম উপকর ও খুচরো করও থাকত। এমনকি দূরতম গ্রামীণ এলাকা থেকেও সম্ভবত সেগুলো আদায় করা হতো।[৯] সাধারণভাবে বলতে গেলে, বৃহত্তর নগর ও বন্দরের বাজার নিয়ে গঠন করা হতো আলাদা 'মহাল' (পরগনা বা আঞ্চলিক 'মহাল' থেকে আলাদা করে)। কিন্তু এগুলোও আবার, অন্যান্য এলাকার মতোই, প্রায়ই 'জাগীর' হিসেবে বরাত দেওয়া হতো।[১০]

খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে বারবার জাগীর হস্তান্তর হতো, তাই কোন বিশেষ জাগীর প্রায়শই একই লোকের হাতে তিন-চার বছরের বেশি থাকত না।[১১] আকবর তাঁর রাজত্বের ১৩-তম বছরে অটকা পরিবারের কর্মচারীদের পাঞ্জাবের 'জাগীর'গুলো

৯. ষষ্ঠ অধ্যায়, সপ্তম অংশ দ্রষ্টব্য। চাষীদের ওপর অন্যান্য করভার ছাড়াও, কারিগর ('মুহ্তরিফা') এবং ব্যবসাদারদের ওপর ধার্য কর ও রাহ্দা-করও ছিল। সবই 'সাইর' এই সাধারণ নামের মধ্যে পড়ত ('দস্তুর-আল আমল এ আলমগীরী', পৃ. ২৩ব-২৭ক)।

১০. বালকৃষণ ব্রাহ্মণের একটি চিঠি, পৃ. ১০৩খ-১০৪খ থেকে দেখা যায় যে হাঁসি ও হিসার পরগনার বাজার বাবদ মাশুল ('মহ্সুল-এ সাইর') পরগনার সাধারণ রাজস্বের থেকে আলাদা হিসেবে গণ্য হতো। শাহ্জাদা মুয়জ্জমকে (?) যখন রাজস্ব বরাত দেওয়া হয়, তখন ঐ সব মাশুল খালিসা-তেই রেখে দেওয়া হয়েছিল। কিছু সময়ের জন্য সুরাট জাগীর হিসেবে বরাত দেওয়া হয়েছিল, কিছুদিন খালিসা-র আওতায় রাখা ছিল (পেলসার্ট, ৪২); হুগলীর ক্ষেত্রেও তা-ই (মাস্টার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯-৮০)। কাম্বের ক্ষেত্রে ফস্টার, 'সাপ্লি. ক্যাল', ৬৯ তুলনীয়।

১১. 'তগাইয়ুর' বা অল্প সময় অন্তর অন্তর জাগীর বদল সে সময়ের এতই চালু প্রশাসনিক রীতি ছিল যে এটা সাধারণত ধরেই নেওয়া হতো আর ভারতীয় তথ্যসূত্রগুলোতে কদাচিৎ এর কথা পাওয়া যায়। আবুল ফজল এই রীতিটি নিয়ে দার্শনিকতা করেছেন। একটি অংশে এর বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছেন যে গুণের দিক দিয়ে রীতিটি ছিল গাছ তুলে অন্য জায়গায় পোঁতার মতো। গাছের ভালোর জন্যই মালীরা এ কাজ করে ('আকবরনামা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩২-৩৩)। সব রকম নথিপত্র, কালপঞ্জী, চিঠিপত্রের সংগ্রহ, দলিল ইত্যাদিতে কোন বিশেষ জাগীর বদলের উল্লেখ এত বেশি যে তার সবগুলোর তালিকা করার চেষ্টা করলে তা পাতার পর পাতা গড়াবে, কখনোই শেষ হবে না। কিন্তু 'মজহার-এ শাহ্জাহানী' থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। এতে সেহ্ওয়ান 'সরকার'-এর প্রশাসনিক ইতিহাসের বিস্তারিত ইতিহাস দেওয়া আছে। এই 'সরকার'টি সাধারণত পুরোপুরি জাগীর-দারদের বরাত দেওয়া হতো। দেখা যায়, তেতাল্লিশ বছরের (১৫৯২-১৬৩৪) মধ্যে 'সরকার'টির জাগীর বদল হয়েছিল সতের বার। সুতরাং গড়ে মাত্র আড়াই বছর ধরে এটি জাগীর হিসেবে কোন বরাতীর দখলে থাকত (খালিসা সমেত) ('মজহার-এ শাহ্জাহানী', পৃ. ৯০-১৭১)। ইউরোপীয় পর্যটকরা সাধারণত এই রীতি দেখে অবাক হয়েছেন ও এর বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে হকিন্স এবং পেলেইনসেন আরও নির্দিষ্ট করে বলতে পেরেছেন সাধারণত একই লোকের হাতে কতদিন জাগীর থাকত। হকিন্স-এর মতে "কোন লোক বছরের অর্ধেকও কাটাতে পারে না, তার কাছ থেকে এটি ফিরিয়ে নেওয়া হয়" ('আর্লি ট্রাভেলস', ১১৪)। পেলেইনসেন-এর বিবৃতি এর চেয়ে আরেকটু সংযত। "কিছু" বরাত, তিনি বলেছেন, "প্রতি বছর বা ছ-মাস, বা দুই বা তিন বছর অন্তর বদল করে দেওয়া হয়।" (*JIH*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭২)।

থেকে সরিয়ে দেন।[১২] তাঁর মতে তিনিই এই রীতি পাকাপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় থেকে আলোচ্য পর্বের শেষ অবধি এই রীতি কঠোরভাবে মেনে চলা হতো। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল জমিনদারদের 'ওয়াতন জাগীর'[১৩] এবং, আরও অনেক ছোট পরিসরে 'আল-তমগা' বরাত। এর কথা আমরা প্রথম শুনি জাহাঙ্গীরের আমলে, পরে ক্বচিৎ-কদাচিৎ শোনা যায়।[১৪]

সাধারণত জাগীর দেওয়া হতো বেতনের বদলে, তাই প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এমন একটা এলাকা ঠিক করার দরকার পড়ত যেখানকার রাজস্ব অনুমোদিত বেতনের সমান হবে।[১৫]

মনে হয়, কতদিন জাগীর দখলে থাকতে পারে তার কোন বাঁধা সময়সীমা ছিল না। বার্নিয়ে বলেছেন, জাগীরদারদের (যাদের তিনি বলেন Timariots) "যে কোন মুহূর্তে" জাগীর হারানোর ভয় থাকত (বার্নিয়ে, ২২৭)। তাঁর এই কথাকে যদি আমরা এক বিদেশীর (যার নিজের কিছু স্বার্থ ছিল) অতিরঞ্জিত উক্তি বলে ছেড়েও দিই, তাহলেও আওরঙ্গজেবের আমলের শেষদিকের জনৈক স্থানীয় লেখকের একই রকমের একটি বিবৃতি থেকে যায়। "জাগীরদারদের প্রতিনিধিরা", ভীমসেন বলেছেন, "দরবারের কেরানীদের কৃপণ আচরণের কথা জানত। এরা যে কোন ছুতোয়...বদলি করে দিত। তাই পরের বছরে জাগীর পাকা হওয়ার ('বহালী') কোন আশাই ছিল না" ('দিলকুশা', পৃ. ১৩৯ক)।

১২. বয়াজিদ, ২৫৩, 'আকবরনামা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩২-৩।

১৩. পঞ্চম অধ্যায়, চতুর্থ অংশ দ্রষ্টব্য।

১৪. জাহাঙ্গীর বলেছেন যে তাঁর পূর্বপুরুষদের অনুসরণে তিনিও 'আল-তমগা' (বা 'আলতুন-তমগা', তাঁর দেওয়া নাম) চালু করেছিলেন এই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যাতে প্রত্যেকটি খানদানী লোক তার বাস্তুভিটা পায়—বা, সম্ভবত, পাকাপাকি সেই জায় বরাত পায় যেখানে সে তারপর পরিবার রাখতে চাইবে ('তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', পৃ. ১০; তর্জমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩ এবং টীকা)। পরে, আওরঙ্গজেবের আমলে দেখা যায়, জনৈক কর্মচারীর সন্দেহ হয়েছে যে তার পরিবারের লোকরা পারস্যে শাহজাদা আকবরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে; সে তাই নিজের জন্য "লাহোর প্রদেশে দশ লাখ 'দাম'-এর একটি বরাতের মঞ্জুরি প্রার্থনা করে যাতে তার আত্মীয়দের পারস্য থেকে এনে সেখানে বসানো যায়" ('মতিন-আল ইনশা', পৃ. ৯৯খ-১০০ক)। 'ইনাম-আল তমগা'র জন্য অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

'ফরহঙ্গ-এ রশিদী', বিব্লিও. ইণ্ডিকা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭১-এ বলা হয়েছে যে 'আল' শব্দটি তুর্কী ভাষায় ব্যবহার হয় লাল শীলমোহর অর্থে, রাজস্ব মকুবের ('তমগা') অনুদানগুলোতে যা দিয়ে ছাপ মারা হয়। এর থেকেই এসেছে 'আল-তমগা'। জাহাঙ্গীর গোড়ার শব্দটি পাল্টাতে চেয়েছিলেন কারণ তিনি একটি সোনার ('আলতুন') শীলমোহর ব্যবহার করতেন। ইয়াসিনের রাজস্ব সংক্রান্ত শব্দের পরিভাষাকোষে (Add. 6603, পৃ. ৪৮খ-৪৯ক) বলা হয়েছে, 'আল' মানে মেয়ের তরফের সন্তান, তাই শুরুতে শুধু মেয়েদেরই 'আল-তমগা' দেওয়া হতো। এই ব্যাখ্যাটি অবশ্য অনায়াসেই বাতিল করা যায়।

১৫. 'দা সিলেক্টেড ডকুমেন্টস্ অফ শাহ্জাহানস্ রেন'-এ অনেক বরাতের আদেশনামা দেওয়া আছে। সর্বদাই প্রথমেই দেওয়া থাকে বরাতীর পদ; তারপর এই পদের জন্য অনুমোদিত

তাই প্রতি একক এলাকার জন্য একটা স্থায়ী নির্ধারণ বা 'জমা' তৈরি করা হতো। এই একক হতো গ্রাম ও, আরও বিশেষভাবে, 'পরগনা' বা 'মহাল'।[১৬] সবচেয়ে ভালো করে কাজ চালানোর জন্য এই 'জমা' প্রকৃত আদায় বা 'ওয়াসিল'-এর যথাসম্ভব কাছাকাছি হওয়ারই কথা। আবুল ফজল বেশ স্পষ্ট করে বলেছেন যে ঐ ধরনের 'জমা' বার করাই ছিল আকবরের রাজস্বনীতির অন্যতম মূল উদ্দেশ্য।

আগের জমানা থেকে পাওয়া যেসব 'জমা'র অঙ্ক আকবরের আমলের গোড়ার দিকে ব্যবহার করা হতো তার নাম ছিল 'জমা-এ রকমী'। একেবারেই খেয়ালখুশি মাফিক বাড়ানোর ফলে এই সব অঙ্ক অবশ্য প্রচুর বেশি হয়ে গিয়েছিল।[১৭] আকবরের রাজস্বের

বেতন। এই বই-এর পৃ. ৭৯-৮৪-তে যেসব বেতন-হার দেওয়া আছে, তার সঙ্গে এই বেতনের তুলনা করলে দেখা যায় সব ক্ষেত্রেই তা মিলছে। এগুলো দেওয়া আছে 'দাম'-এর অঙ্কে। সবশেষে আসে এক বা একাধিক জাগীর, যার 'জমা' এই অনুমোদিত বেতনের ঠিক সমান।

১৬. গ্রাম-পিছু 'জমা'র নাম ছিল 'দেহ্ বা দেহী' এবং এর নথিপত্র রাখা হতো দরবারে (Fraser 86, পৃ. ৬৩ক ; মাসুচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০)। বলা হয়েছে, একটা গ্রাম একাধিক লোককে বরাত দেওয়া চলবে না (Fraser 86 পৃ. ৬৩ক)। কিন্তু, একটিমাত্র গ্রামের রাজস্ব চারজন জাগীরদারের (যদি তাদের প্রত্যেককে গ্রামটির 'জমা'র একটা অংশ বরাত দেওয়া থাকে) মধ্যে ভাগ করে দিলে, সেই ভাগ হিসেব করার পদ্ধতি আরেকটি পুস্তিকায় দেওয়া আছে ('দস্তুর-আল আমল-এ নভিসিন্দগী', পৃ. ১৭৯ক-খ)। যেখানে একই পরগনায় দুই বা তার বেশি জাগীর বরাত দেওয়া হতো, সেখানে, মনে হয়, পদ্ধতি ছিল এই রকম : প্রথমে প্রত্যেক জাগীরের 'জমা'র পরিমাণ দেওয়া থাকত ('- পরগনা থেকে এত 'দাম''), তারপর জাগীরগুলোর মধ্যে সেই পরগনার গ্রামগুলোর 'কিসমৎ' বা ভাগ হিসেব করা হতো, যাতে প্রত্যেকটি জাগীরের 'জমা'র সঙ্গে সেই 'কিসমৎ' মেলে। যে-কাগজপত্রে এই ভাগ লেখা থাকত তাকে বলা হত 'কিসমৎ-নামা' বা 'চিট্‌ঠি-এ কিসমৎ'। এটি তৈরি হতো প্রাদেশিক দিওয়ানের দপ্তরে ('আহ্‌কম-এ আলমগীরী', পৃ. ২৪২ক ; 'ওয়কাই-এ আজমীর', ৪৭০, ৬৩৭)। Allahabad 888, তাং মার্চ ২, ১৬৫৩-য় দেখা যায়, সরকারী 'কিসমৎ' অনুযায়ী তাদের যে গ্রামগুলো বরাত দেওয়া হলো, জাগীরদাররা পরস্পরের সম্মতি নিয়ে তা নিজেদের মধ্যে ঠিকঠাক করে নিতে পারত। অবশ্য সাধারণভাবেই এক-একজন বরাতীকে পুরো ('দর বস্ত') পরগনা বরাত দেওয়াই সবচেয়ে ভালো রীতি বলে স্বীকৃত ছিল, যতদূর পর্যন্ত তার মোট পাওনা বেতন সেই বরাতের পরিমাণের সঙ্গে মেলে ('আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ১১৭ক ; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', ১২৬-৭, 'ফথিয়া-এ ইব্রিয়া', পৃ. ১১৭ক-খ)।

১৭. 'আকবরনামা', ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭০ (Add. 27,247, পৃ. ২০২ক) ; 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৭, 'ইকবালনামা', লখনউ সংস্করণ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৩। 'আকবরনামা'য় (চূড়ান্ত পাঠে) আবুল ফজল 'জমা'কে বলেছেন 'রকমী-এ কলমী' এবং Add. 27,247-এ 'রকম-এ রকমী'। কিন্তু, 'আইন'-এ শুধু 'রকমী'-ই আছে। শেষের রচনাটিতে বলা হয়েছে, যা তাদের মনে আসত) সেই অনুযায়ী তারা (রাজস্ব মন্ত্রকের কর্মচারীরা) কলমের এক খোঁচায় ('ব-কলম আফজুদা' এটি বাড়িয়ে দিত এবং বরাত দিয়ে দিত ('তন নমুদন্দ')।" তাই মনে হয়, ইংরেজী 'পেপার'

১১-তম বছরে কানুনগো এবং "ওয়াকিবহাল লোকদের" কাছ থেকে তথ্য জোগাড় করে অঙ্কগুলো সংশোধনের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু নতুন 'জমা'টি অপেক্ষাকৃত উন্নত বলে স্বীকার করা হলেও, বলা হয় "এও ছিল 'ওয়াসিল' থেকে অনেক দূরে।"[১৮] আট বছর পরে আকবর একই সঙ্গে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের ব্যবস্থা নেন।[১৯] এই ছিল সম্ভবত তাঁর কর্মজীবনের সবচেয়ে সাহসী পদক্ষেপ। বাংলা, বিহার ও ওড়িশা বাদে আর সব জায়গার জাগীর তিনি ফিরিয়ে নেন। তারপর বিভিন্ন ফসলের জন্য স্থায়ী স্থানীয় নগদ হার বেঁধে দেন ও রাজস্ব নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটি নতুন 'জমা' বার করেন। আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি কীভাবে 'জমা-এ দহ্-সালা' স্থির করা হতো। পূর্বব্যাপী নির্দিষ্ট বার্ষিক নগদ হারের ভিত্তিতে হিসেব করে, গত দশ বছরের (১৫-তম থেকে ২৪-তম বছর) জরিপ এলাকার অঙ্ক দিয়ে তাকে গুণ করে বার্ষিক রাজস্বের গড় বার করা হতো। এই গড় দিয়েই স্থির হতো 'জমা-এ দহ্-সালা'। এই 'জমা' অবশ্য তৈরি হয়েছিল কেবলমাত্র 'জব্‌তী' প্রদেশের ক্ষেত্রে। আবুল ফজল বলেছেন, বারবার কাশ্মীরের সঠিক 'জমা' স্থির করার চেষ্টা হয়েছিল। প্রথাগতভাবে যে-হারে আসলে রাজস্ব দেওয়া হতো তা খুঁজে বার করা হয়, আর বরাতীরা যে-হারে তাদের মজুত বিক্রি করত তারও তল্লাস করা হয়। শেষ পর্যন্ত বোধহয় কাজটি করা হয় এই দু-এর ভিত্তিতেই।[২০] তোডর মলকে দুবার (১৫৭৪ ও ১৫৭৬-৭) গুজরাটের 'জমা' ঠিক করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি কোন্ পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন তা ঠিক বোঝা যায় না।[২১] বাংলায়, মনে হয়, 'জমা' ঠিক করা হয়েছিল

শব্দটির মতো 'কলমী'রও একটি বিশিষ্ট অর্থ ছিল। অর্থাৎ 'জমা-এ কলমী' ছিল নেহাৎই কাগুজে নির্ধারণ। অন্যদিকে 'রকমী' শব্দটি বোধ হয় পারিভাষিক, কারণ বাবুরের এক ফরমানে 'সুয়ুরগাল' হিসেবে বহাল একটি গ্রামে "২০০০ 'টঙ্কা'র 'জমা-এ রকমী' " বরাত দেওয়া হয়েছে (I.O. 4438 : 1)। 'রকম' মানে চিহ্ন বা লেখা, এক বিশেষ ধরনের অর্থসংস্থান বিষয়ক নথির ক্ষেত্রে এর পারিভাষিক অর্থান্তরে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই (তুলনীয় 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', পৃ. ২৪০-৪১)। এ-ও দেখে কৌতূহল হয় যে, Bodl. O. 390, পৃ. ৯ক ইত্যাদি-তে বিভিন্ন প্রদেশের 'জমা-দামী' আবার টাকার অঙ্কে দেওয়া আছে (হিসাবরক্ষকের হার অনুযায়ী এক টাকা সমান ৪০ 'দাম') আর সেই অঙ্কগুলোকে বলা হয়েছে 'জমা-এ রকমী'। স্যার রিচার্ড বার্ন বলেছিলেন, বিজয়নগর সাম্রাজ্যে ব্যবহৃত 'রায়া-রেখা-মর' অর্থাৎ জরিপের মাধ্যমে নির্ধারণ, এই কথা থেকেই 'রকমী'র উৎপত্তি হয়েছে (*JRAS*, ১৯৪৩, পৃ. ২৬০-৬১) কিন্তু, এ বোধহয় এক অসম্ভব ব্যাখ্যা।

১৮. 'আকবরনামা', ২য় খণ্ড, পৃ, ২৭০ ; ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৭ ; 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৭-৮।

১৯. 'জমা-এ দহ্‌সালা' চালু করার পেছনে যে এই উদ্দেশ্যই ছিল তা দেখানো আছে মোরল্যাণ্ডের 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', পৃ. ৯৮-এ।

২০. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৮-৯, ৫৯৫, ৬১৭-৮, ৬২০, ৬২৬-৭; 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭০-৭১।

২১. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৫, ৬৭; 'তবকৎ-এ আকবরী', ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৫, ৩৩০; 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩১-২, ১৩৪-৫। আরিফ কান্দাহারী, ২১০ অনুযায়ী, ১৫৭৭-৭৮

সরাসরি আগের সরকারের "কানুনগোঈ" কাগজপত্র থেকে।[২২] আগেই ঐ প্রদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে যেমন দেখেছি, তার থেকে মনে হয়, এখানকার 'জমা' বলতে বোধ-হয় বোঝাত স্থানীয় জমিনদারদের কাছে প্রশাসনের বাঁধা বার্ষিক পাওনা। দখিন প্রদেশগুলির ক্ষেত্রে, মনে হয়, খুব সংক্ষিপ্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, কারণ আকবর খান্দেশের 'জমা' বাড়িয়েছিলেন শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। আসল আদায় সম্বন্ধে খুঁটিয়ে তদন্ত করা হয়ে থাকলে এ রকম ব্যবস্থা প্রায় অকল্পনীয়।[২৩]

১৭ শতকে রাজস্ব বরাতের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত 'জমা'কে 'জমা-এ দামী' বা 'জমা-দামী' বলা হতে থাকে, কারণ সেটি লেখা হতো 'দাম'-এ। এর পরিসংখ্যান পাওয়া যায় প্রচুর (পরিশিষ্ট 'ঘ' দ্রষ্টব্য)। এর থেকে দেখা যায় যে, বাংলা বাদে আর সব প্রদেশেই এই পরিসংখ্যান বারবার সংশোধন করা হতো। এই আমলের নথিপত্র থেকে জানা যায়, বাদশাহী প্রশাসন, মামুলি কাজ হিসেবেই, জাগীরগুলোতে রাজস্ব আদায়ের বিবরণ ('হাল-এ ওয়াসিল') চেয়ে পাঠাত, আর স্থায়ী 'জমা' ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য এলাকা ও রাজস্বের দশ বছরের নথিপত্রও ('মুওয়াজানা-এ দহ্-সালা') দরবারে রাখা থাকত।[২৪] যেসব 'মহাল'-এ সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় হতো (যার নাম

সালে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে মুজফ্ফর খান এবং তাঁর সঙ্গে "কিছু করণিক" গুজরাট এবং মাণ্ডু দেশে 'ওয়াসিল'-এর পরিমাণ কী ছিল তা পরীক্ষা করবেন ('মুওয়াজানা মুমায়ন্দ')"; সম্ভবত এইভাবে স্থিরীকৃত অঙ্কের ভিত্তিতে গুজরাটের 'জাগীর' বরাত দেওয়ার কথা ছিল।

২২. দ্রষ্টব্য 'ফথিয়া-এ ইব্রিয়া', পৃ. ১৩৪ক। এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কেন মুঘল প্রশাসনে 'জমা' নথিপত্রে চাটগাঁও-র নাম ছিল, যদিও শায়েস্তা খানের আমলের আগে চাটগাঁও পুনর্বিজিত হয় নি। আরও তুলনীয় মোরল্যাণ্ড, *JRAS*, ১৯২৬, পৃ. ৪৮-৫০ এবং 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', পৃ. ১৯৬-৭।

২৩. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৪। ঐ গ্রন্থেরই পৃ. ৪৭৮-এ বেরারে 'জমা'র বিবরণ থেকে এই ধারণাই হয় যে আগের জমানার স্থিরীকৃত 'জমা'র অঙ্কই ছিল এর ভিত্তি আর মুঘল প্রশাসন তা বাড়িয়েছিল একেবারেই খেয়ালখুশি মাফিক।

২৪. 'ওয়াসিল'-এর প্রতিবেদন যে চেয়ে পাঠানো হতো তার সাক্ষ্যপ্রমাণের জন্য দ্রষ্টব্য 'সিলেকটেড ডকুমেণ্টস্' ইত্যাদি, পৃ. ৮৮-৯০; ১৯৪-৫; 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ৩১খ-৩২ক, ৪৩ক, ৪৯ক-খ, ১০৪খ-১০৫ক; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', পৃ. ৮৮, ১০৭, ১৬৩-৪। Fraser 86, পৃ. ১৬২খ বলেছে যে কেন্দ্রীয় মহাকরণে জাগীর বরাতের উদ্দেশ্যে "দশ বছরের 'ওয়াসিল'-ও তার সঙ্গে…রাজস্বের হিসাব-খাতা রাখার নিয়ম ছিল।" 'সিয়াকনামা', ১০২-এ সাম্রাজ্যের 'দিওয়ান'-এর দপ্তরে রক্ষিত কাগজপত্রের তালিকার মধ্যে আছে "বছর-বছর 'জমা' স্থির করার (আক্ষরিক অর্থে: জানার) উদ্দেশ্যে 'মুওয়াজানা-এ দহ্সালা', যাতে (এই) অনুযায়ী প্রত্যেককে বেতন-বরাতের সুপারিশ করা যায়।" "'হাল-এ ওয়াসিল'-এর কম-বেশি দেখানোর একটি হিসাবখাতা" ইত্যাদি রাখা হতো (ঐ, ১০১)। প্রসঙ্গত, 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৬-৭-এ দেখা যায় যে 'দেসাই' এবং 'মুকদ্দম'দের কাছ থেকে ঐ পরগনার রাজস্ব আদায়ের হিসাব 'হাল-এ ওয়াসিল' এবং প্রদেশটির 'মুওয়াজানা-এ দহ্সালা' জোগাড় করার জন্য ১৬৯১-৯২-এ

'ওয়াসিল-এ কামিল')[২৫] সেগুলোর নথিও থাকত। 'করোড়ী'দের আদায় ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য এসব তথ্য আকবরের প্রশাসনের কাজে লাগত।[২৬] আর, এও সম্ভব যে কোন জায়গার 'জমা' সংশোধন করার সময় মনে রাখা হতো এসবের কথাও।

'জমা-এ দহ্-সালা' বা 'জমা-দামী'-র অঙ্ক—কোনটিই সব জায়গার বরাবরের প্রকৃত আদায়ের সূচক হতে পারে না। এমনকি আকবরের আমলেও দেখা যায়, দিল্লী প্রদেশের একটি জাগীরের 'জমা' নিয়ে প্রশাসন ও ভাবী বরাতীর মধ্যে দর-কষাকষি চলছে।[২৭] পরের আমলে. হকিন্স-এর অভিযোগের মূল কথা ছিল এই যে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত বেতনের চেয়ে তাঁর জাগীরগুলোর রাজস্ব-প্রদায়ী ক্ষমতা কম।[২৮] পেলসার্ট বলেছেন, কাগজপত্রে যে-রাজস্ব নির্ধারণ করা থাকে, বরাতী সাধারণত তার মাত্র অর্ধেক আদায় করতে পারে।[২৯] বিভিন্ন জাগীরে প্রকৃত আদায় ও 'জমা-দামী'র মধ্যে ফারাকের দরুন যেসব অসুবিধা ও অবিচার হতো তা দূর করার জন্য শেষ পর্যন্ত শাহ্জাহানের আমলে একটা নতুন পদ্ধতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এখন আর 'ওয়াসিল' -এর সঙ্গে 'জমা-দামী'কে পুরোপুরি মেলানোর চেষ্টা করা হয়নি। তার বদলে, তথ্য হিসেবে এ-দু-এর ফারাক স্বীকার করে নেওয়া হয়। আর প্রতি 'মহাল'-এর ক্ষেত্রে আদায় ও স্থায়ী নির্ধারণের মধ্যে বার্ষিক পরিবর্তনের হার হিসেব করে সেটিকে 'মাস-অনুপাতে'র ('মাহ্ওয়ার') অঙ্কে লেখা হয়। এইভাবে, যে-জাগীরে চলতি 'ওয়াসিল' 'জমা'র সমান, তার নাম দেওয়া হয় 'বারোমাসী' ('দোয়াজদহ্-মাহা'), যেখানে অর্ধেক, তার নাম 'ছ-মাসী' ('শশ-মাহা') ইত্যাদি।[৩০] এরই স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে

দরবার থেকে একজন মনসবদারকে গুজরাটে পাঠানো হয়েছিল। তিনি অবশ্য অভিযোগ করেছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে 'দেসাই'দের বাধা দিচ্ছে জাগীরদাররা। শাহ্জাহানের কাছে আওরঙ্গজেবের একটি চিঠি ('আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ৩২খ; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', পৃ. ১১৮) থেকে মনে হয়, জাগীরগুলো থেকে পাওয়া 'ওয়াসিল'-এর বিবরণী সব সময় নির্ভরযোগ্য মনে করা হতো না। আওরঙ্গজেবের একবার মনে হয়েছিল তাঁর 'জাগীর'-গুলোর হিসাব-নিকাশ সম্বন্ধে দরবার ঐ ধরনের সন্দেহ পোষণ করছে। তিনি প্রস্তাব দেন: সব জাগীরই তিনি খালিসা-র আওতায় দিয়ে দেবেন ও তার বদলে নগদ বেতন নেবেন।

২৫, Fraser 86, পৃ. ১৬২খ।

২৬. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৭।

২৭. বয়াজিদ, ৩৬৩-৪, ৩৭২-৩। এই পরগনাটি হলো সনাম এবং ঘটনাটি ঘটেছিল ১৫৮৪-তে।

২৮. হকিন্স: 'আর্লি ট্রাভেলস্', পৃ. ৯১, ৯৩।

২৯. পেলসার্ট, ৫৪।

৩০ 'মাস-অনুপাত'—বা মোরল্যাণ্ড যাকে বলেছেন, 'মাসিক বিধি'—তার ব্যাখ্যা, আমি যতদূর জানি, এখনও পর্যন্ত কোন লেখকই দেননি। প্রশাসন সংক্রান্ত যেসব লেখাপত্রের সাক্ষ্য-প্রমাণ এর ভিত্তি, উদ্ধৃতি দেওয়ার পক্ষে তা সংখ্যায় প্রচুর। শুধু কয়েকটি প্রধান নথি নীচে উল্লেখ করা হলো: 'সিলেকটেড ডকুমেন্টস' ইত্যাদি, পৃ. ৬৪, ২৪৮; 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ৮ক, ৩১খ-৩২খ, ৪০খ, ৪২খ-৪৩ক, ৪৯ক-খ, ৫১ক, ৫২খ-৫৩ক, ৫৮খ, ১০৪খ-১০৫ক; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', পৃ. ১০, ৮৮, ১০৭, ১১৮, ১২১-২, ১৩০-৩১, ১৩৫, ১৬৩-৪; ওয়ারিস, ক:

নগদ বেতনের ক্ষেত্রেও 'মাস-অনুপাত' ব্যবস্থা চালু করা হয়।[৩১] যেসব মনসবদারের পদ একই কিন্তু আলাদা 'মাস-অনুপাতে'র নগদ মাইনে বা জাগীর বরাত দেওয়া হয়েছে,

পৃ. ৪৯৭ক, খ : পৃ. ১৪৩খ ; Allahabad 884, 885, 'অখবারাৎ' ৩৮/১৪৫। প্রত্যেক জাগীরের মাস-অনুপাতের বার্ষিক হেরফেরের জন্য (আদায় কমা-বাড়ার ফলে) দ্রষ্টব্য Fraser 86, পৃ. ১৬২খ। সেখানে বলা আছে, 'ওয়াসিল-এ দহ্ সালা' এবং 'সাল-এ কামিল'-এর সঙ্গে বছর-বছর মাস-অনুপাতগুলোর ('মাহ্ওয়ার সাল-বা-সাল') নথিপত্রও দরবারে রেখে দিতে হবে। 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ১০৪খ-তে-ও বলা হয়েছে : "রাজত্বের ২৮-তম বছরে বির পরগনার 'ওয়াসিল' ছিল প্রায় ৮-মাসিক ('হশ্ৎ মাহা'), ২৯-তম বছরে এটিকে আরও বেশি করতে হবে।" ঐ একই সংগ্রহের অন্যত্র (ঐ, পৃ. ৮ক ; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', পৃ. ১০) একটি জাগীরের কথা দেখা যায়, যেখানে "এই বছর"-এর 'ওয়াসিল' '৫-মাসিকে'র বেশি নয়।

'জমা' নথিপত্রগুলোতে ব্যবহৃত 'দাম' ছিল শুধু হিসাবের একক। 'দাম'কে টাকার একের চল্লিশ ভাগের সমান বলে ধরা হতো। তাই জাগীর 'বারো-মাসিক' হলে এক লাখ 'দাম' 'জমা'র মানে হতো ২,৫০০ টাকার 'ওয়াসিল' (উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য লাহোরী, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ. ২০৫ ; 'সিলেকটেড ডকুমেণ্টস…', পৃ. ৭৭)। Allahabad 885 এবং 884 (দুটিই আওরঙ্গজেবের আমলের)-তে জাগীরের 'জমা'র দাম' এবং ইজারাদার প্রতিবার জাগীরদারকে দেওয়ার জন্য যত টাকা আদায়ের কড়ার করত, তার মধ্যে সম্পর্ক স্থির করা হয়েছে মাস-ক্রমের হিসেবে : ৪,৪০,০০০ 'দাম' ; ৭,৩৩৩ টাকা ৪ আনা ; মাস-অনুপাত : "৮-মাসিক"। ২,১০,০০০ 'দাম' ; ৩,১৬২ টাকা ; মাস-অনুপাত "৭ মাস ৭ দিন"। দুটি অনুপাতই গাণিতিকভাবে সঠিক। 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ৪০ খ, 'রুকাৎ-এ আলমগীর', পৃ. ১২১-২-এ মুঘল দখিনের প্রদেশগুলো সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তাদের ৮৮ লাখ টাকা 'ওয়াসিল', "৩-মাসিক" ('সিহ্-মাহা') 'জমা'র (১,৪৪,৯০,০০,০০০ 'দাম') সমান ছিল না, কারণ এটি ছিল 'ওয়াসিল'-এর অঙ্কের চারগুণ।

মনে হয়, মুঘল প্রশাসন সাধারণভাবে 'মাস-অনুপাত' ব্যবহার করতে শুরু করে শাহ্জাহানের আমলে, তবু জাহাঙ্গীরের আমলে লেখা সিন্ধু প্রদেশের একটি ইতিহাস 'তারিখ-এ তাহিরী'র একটি অংশ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এই রীতিটির একটি পুরোনো ইতিহাস ছিল। ১৬০৫-৬-এ, সিন্ধুর সুবাদার মীর্জা গাজী বেগ তরখান কার্যত ছিলেন অধস্তন শাসক। তিনি আদেশ দিয়েছিলেন, তাঁর বাহিনীর বেতন "৮-মাসিক" থেকে কমিয়ে "৬-মাসিক" করা হোক। তাঁর কর্মচারীরা এতে খুবই বিরক্ত হয়েছিল, কারণ তারা ঘোষণা করে যে এর ফলে তাদের জাগীর প্রায় সিকিভাগ করে কমে যাবে ('তারিখ-এ তাহিরী', Or. 1685, পৃ. ১১৮ক-১১৯ খ)।

৩১. তুলনীয় 'সিলেকটেড ডকুমেণ্টস্…', পৃ. ৬৪, ৭৬-৭ ; 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ৮ ক, ৩২ খ, ৪২ খ-৪৩ ক, ২০২ খ, ৩২৮ খ-৩২৯ ক ; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', ১০, ১০৫-৭, ১১৭-৮, ২২৮ ; 'মআসির-এ আলমগীরী', পৃ. ৮৮। 'দস্তুর-আল-আমল-এ ইল্ম্-এ নভিসিন্দগী', পৃ. ১৪৭ খ-১৪৮ ক ; Bodl. O. 390, পৃ. ৪০ ক-৪১ ক ; Or. 1840, পৃ. ১৪৩ খ-১৪৪ খ ; এবং 'খরজ-এ করদানী', পৃ. ২৪ ক-খ-র সারণিগুলোতে প্রতি মাস পিছু 'লাখ-দাম'-এর সমমূল্য

তাদের আয়ের তফাৎও বিরাট হওয়ার কথা। তাই প্রত্যেক মাস-অনুপাত পিছু আলাদা ভাবে সামরিক দায়িত্বও ঠিক করে দেওয়া হলো যাতে এই পার্থক্যের মধ্যে কিছুটা সামঞ্জস্য আসে।[৩২]

'নক্দী' দেওয়া আছে টাকার অঙ্কে। তার সঙ্গে আছে এই সুস্পষ্ট বিবৃতি যে এগুলো ব্যবহার করা হবে 'জাত' পদের বেতন স্থির করার জন্য। এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে 'নক্দী' মনসবদারদের 'সওয়ার' পদের বেতন স্থির করার অন্য কোন পদ্ধতিও ছিল। এই পদ্ধতি কী ছিল সে সম্বন্ধে পরের টীকায় আভাস দেওয়া হয়েছে। অবশ্য উল্লিখিত সারণিটির মতো আরেকটি সারণি আছে 'জাওয়াবিৎ-এ আলমগীরী', Add. 6598, পৃ. ১৪৯ ক-খ, Or. 1641, পৃ. ৪২ক-৪৩ খ-তে। কেবলমাত্র 'জাত' পদের বেতনের ক্ষেত্রেই ঐ সারণি প্রয়োগ করার সম্বন্ধে বিশেষ কোন নির্দেশ সেখানে দেওয়া নেই।

৩২. বল্খ্ এবং বদখশান অভিযানের জন্য বিভিন্ন মাস-ক্রমের অধীনে 'মনসবদার'দের যে সেনা-বাহিনীর ব্যবস্থা করতে হবে, তার সম্বন্ধে লাহোরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০৬-৭-এ যে খুঁটিনাটির বিবরণ দিয়েছেন, তার থেকেই এটি সবচেয়ে পরিষ্কার দেখা যায়। অবশ্য এটি ছিল ব্যতিক্রম, যেখানে তথাকথিত 'পাঁচ ভাগের নিয়ম' প্রয়োগ করা হয়েছিল, অর্থাৎ, তাদের 'সওয়ার' পদের এক-পঞ্চমাংশ সংখ্যক ঘোড়সওয়ার যোগাড় করে দিতে হতো মনসবদারদের। সব মাসের জন্যই মনসবদারদের যে সেনাবাহিনী যোগান দিতে হবে তার কথা আছে 'ইন্‌তিখাব-এ দস্তুর-আল আমল-এ পাদশাহী', পৃ. ৭ ক-৯ খ; এবং 'খুলাসতুস সিয়াক', আলীগড় পাণ্ডুলিপিতে। 'রিকাব' (যাদের জাগীরগুলো প্রদেশের বাইরে: ঘোড়সওয়ার বাহিনী হবে তাদের 'সওয়ার' পদের একের-চার ভাগ) এবং 'তাঈনাৎ' (কর্মক্ষেত্র এবং 'জাগীর' একই প্রদেশে: ঘোড়-সওয়ার বাহিনী হবে পদের একের-তিন ভাগ)—দুএর ক্ষেত্রেই কর্মরত মনসবদারদের বেলায় এটি প্রযোজ্য হতো। আরও দ্রষ্টব্য 'সিলেকটেড ডকুমেণ্টস...', পৃ. ২৪৯; 'করহঙ্গ-এ করদানী', Edinburgh 83, পৃ. ২২ ক-২৩ ক।

২৭-তম বছরে জারি করা শাহ্‌জাহানের এক ফরমানে ('মিরাৎ', ১ম খণ্ড, ২২৭-৯) এবং কিছু প্রশাসনিক পুস্তিকায় (Bodl. O. 390, পৃ. ৪২ খ-৪৩ ক; Or. 1840, পৃ. ১৪৩ খ-১৪৪-খ, 'করহঙ্গ-এ করদানী', পৃ. ২৪ক-খ, Edinburgh 83, পৃ. ২১ খ-২২ ক) 'নক্দী মনসবদার'-দের বাহিনীর বেতন দেওয়া আছে এক অদ্ভুত কায়দায়: '১২ মাস'-এর অধীনে প্রতি ঘোড়া (বা ঘোড়সওয়ার) পিছু ৪০ টাকা; '৮ মাস'-এর অধীনে ৩০ টাকা ইত্যাদি। শাহ্‌জাহানের ২৭-তম বছরের ফরমানে বলা হয়েছে যে, আগে ৭ এবং ৬ মাসের মনসবদাররাও প্রতি ঘোড়া (ঘোড়সওয়ার) পিছু ৩০ টাকা করে পেত, এই ফরমানের উদ্দেশ্যই হলো সেটি পাল্টে যথাক্রমে ২৭½ ও ২৫ টাকা করা। দখিনে এই আদেশ জারি করার বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেবের প্রতিবাদ এবং শাহ্‌জাহান কর্তৃক এই আদেশের শর্তাবলীর পরিবর্তন (স্পষ্টতই শুধুমাত্র দখিনেই প্রযোজ্য)—এর জন্য দ্রষ্টব্য 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ৩৮ ক-খ, ৪৫ খ-৫৬ ক, ১১৭ খ-১১৮ ক; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', ১১৬-১৭, ১২৯। এর থেকে মনে হয়, জাগীরদারদের যেমন 'সওয়ার' পদের প্রতি এককের দরুন ৮,০০০ 'দাম' করে নেওয়া হতো, 'নক্দী' মনসবদারদের তেমন কিছু দেওয়া হতো না। তাদের দেওয়া হতো ঘোড়সওয়ার পিছু। নতুন ঘোড়ার সংখ্যা কম হলে এবং নীচু মানের ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ার হলে এই হার মাস-ক্রমের সঙ্গে সঙ্গে কমে যেত।

মনে হয়, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বাদশাহী প্রশাসন রাজস্ব আদায়ে বাড়া-কমার ঝুঁকিটা জাগীরদারের ঘাড়েই চাপিয়ে দিত ; বাড়তি আদায় ফেরৎ দিত না, কম হলেও পুষিয়ে দিত না।[৩৩] কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য 'জমা-দামী'র অতিরিক্ত বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কোন জাগীরদার তীব্র প্রতিবাদ জানালে দরবার থেকে 'জমা-দামী' কমানো হতো। এর নাম ছিল 'তখফীফ-এ দামী'। জাগীরদারের যে এ বাবদে একটা পাওনা ('তলব') আছে আর সে জন্যে তাকে কোষাগার থেকে কিছু মঞ্জুর করে বা সমপরিমাণ 'জমা'র জাগীর বরাত দিয়ে সন্তুষ্ট করা যেতে পারে সে কথা স্বীকার করা হতো।[৩৪] সেই সঙ্গে যদি দেখা যেত, প্রকৃত আদায় 'জমা-দামী'র চেয়ে বা সেই জাগীরের জন্য অনুমোদিত 'জমা'র মাস-অনুপাতের চেয়ে যথেষ্ট বেশি, তাহলে বাড়তি অংশটুকু তার কাছ থেকে সরাসরি আদায় করা যেত বা 'মুতালবা' (অর্থাৎ তার কাছে রাষ্ট্রের আর্থিক প্রাপ্য)-র সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যেত।[৩৫] আকবর অবশ্য এই প্রস্তাব অনুমোদন করেছিলেন যে

৩৩. জাগীরগুলোর আয় সংক্রান্ত অভিযোগ এবং সরকারী আদেশনামা পড়ে পরিষ্কার এই ধারণাই হয়। যথা, 'ওয়াকাই-এ আজমীর', ১৯৯ দ্রষ্টব্য। জনৈক কর্মচারী অভিযোগ করেছেন যে, তাঁর জন্য বরাত দেওয়া নতুন জাগীরটির রাজস্ব ইতিমধ্যেই বাদশাহী রাজস্ব-সংগ্রাহক ('করোড়ী') আদায় করে নিয়েছে। জায়গাটি, সম্ভবত, আগে খালিসা-র আওতায় ছিল। আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ তাঁর বেতনের সঙ্গে মেলে না এবং তিনি জাগীরটি নিতে অস্বীকার করেছেন। আজমীরের সুবাদার অবশ্য তাঁকে বলেন যে, এটা নেহাৎই "ভাগ্যের ব্যাপার", এবং তাঁর পক্ষে বরাত নিতে অস্বীকার করাটা শোভন হয়নি, যদিও তিনি এর জন্য দরবারে আবেদন করতে পারেন (আরও ভালো 'জাগীর'-এর জন্য ?)।

জাগীরের বাড়তি আয় যে জাগীরদাররাই রেখে দিতে বা খরচ করতে পারতেন তা দেখা যায় শায়েস্তা খানের একটি আদেশনামা থেকে। যেখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে তাঁর জাগীরে 'জমা-এ মুকর্‌রারী'র অতিরিক্ত আদায় চাষীদের ফেরৎ দিয়ে দিতে হবে। বাড়তি আয় যদি বাদশাহের প্রাপ্য হতো তাহলে কখনোই এই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যেত না ('ফখিয়া-এ ইব্রিয়া', পৃ. ১২৭ ক-খ দ্রষ্টব্য)।

৩৪. 'সিলেকটেড ডকুমেণ্টস…', পৃ. ১৭৭ ; 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ৩১ খ-৩২ খ, ৩৬ ক-খ, ৩৯ ক-খ, ৪২ খ-৪৩ ক, ৪৭ খ-৪৮ ক ; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', পৃ. ৮৮, ৯৫-৬, ৯৮, ১০৭, ১১১-১২; ১৩৬ ; 'অখবারাৎ' ৩৮/৩০ ; 'আহ্‌কম-এ আলমগীরী', পৃ. ৯২ খ-৯৩ ক ; 'করনামা', পৃ. ২০৮ খ-২০৯ ক।

৩৫. 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ৫২ খ-৫৩ ক ; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', পৃ. ১৩০-৩১ ; 'মআসির-এ আলমগীরী', পৃ. ১৭০ ; 'অখবারাৎ' ৩৮/১৪৫। আকবর যখন ২৯ লাখ 'দাম' 'জমা'র সনদ-এর জাগীর বয়াজিদ-কে দিতে চেয়েছিলেন (অতিরিক্ত রাজস্ব তাঁর নিজের কাছেই রাখার অনুমতি সহ), তখন বয়াজিদকে অবশ্যই একটা বাড়তি সুবিধা দেওয়া হয়েছিল (বয়াজিদ, ৩৬৩)। বাংলায় যখন কয়েকজন জাগীরদারকে এমন জাগীর দেওয়া হয়, যেখানকার 'জমা' তাদের অনুমোদিত বেতনের চেয়ে বেশি, তখন বাড়তি অংশটুকু তাদের খালিসা-য় দিয়ে দিতে হতো ('ফখিয়া-এ ইব্রিয়া', পৃ. ১১৭ ক-খ)।

বরাতীর সু-প্রশাসনের ফলে রাজস্ব বাড়লে সেই অনুযায়ী তার পদোন্নতি করে বাড়তি অংশ বরাতীকেই দিয়ে দেওয়া হবে।[৩৬]

কয়েক বছর অন্তর বদলি করার দরুন জাগীরদারের পক্ষেও কিছু জটিলতা ও অসুবিধা দেখা দিত। যেমন, বরাতের সময় ধরেই নেওয়া হতো যে বাংলা ও ওড়িশা ছাড়া সর্বত্র খারিফ ও রবিশস্যের মূল্য সমান।[৩৭] বাস্তবে কিন্তু কদাচিৎ এমন হতো। যদি কোন জাগীরদারের জাগীর খারিফ মরসুমে থাকে এক জায়গায়, আর রবি মরসুমে আরেক জায়গায়, আর কোনটিই ঐ দু জায়গার প্রধান ফসল না হয়, সে-বছর তিনি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হতেন।[৩৮] তাছাড়া, শুধু যে ফসল কাটার শুরুতেই বদলি করা হতো তা নয়, যে কোন মাসের প্রথমেই বদলি করা হতো। ফসল কাটার মরসুমে বদলি করা হলে পুরনো ও নতুন বরাতীকে (তাদের মধ্যে একজন সম্ভবত 'খালিসা') পুরো মরসুমের আদায় ভাগ করে নিতে হতো, যার অধিকারে যত মাস বরাত ছিল সেই অনুযায়ী।[৩৯] প্রদেয় রাজস্বের পুরোটা আদায় করে ওঠার আগেই জাগীরদারকে হঠাৎ বদলি করে দিলে তাকে কিছুটা অসুবিধায় পড়তে হতো।[৪০] সেই সঙ্গে, বকেয়া রাজস্ব আদায় করা ও খালিসা-র হাতে তুলে দেওয়ার কাজও তাকেই করতে হতো।[৪১]

জাগীর হস্তান্তর সর্বদাই নির্বিবাদে হতো না। কোন বিশেষ এলাকার জাগীর যাতে কোন এক সময়ে একজনমাত্র লোককেই বরাত দেওয়া হয় সে ব্যাপারে মুঘল প্রশাসন সাধারণত সতর্ক থাকত বলেই মনে হয়।[৪২] কিন্তু বদলি বা নতুন বরাতের আদেশ জারি করতে সময় লাগত। যে-রাজস্ব একজনের আদায় করার কথা তা হয়তো আরেকজন জাগীরদারের গোমস্তারা আদায় করে নিয়েছে।[৪৩] এমনকি কখনও কখনও এক বরাতী আর এক বরাতীর বিরুদ্ধে গায়ের জোরও খাটাত, যদিও, মনে হয়,

৩৬ 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৯।

৩৭. 'সিলেকটেড ডকুমেণ্টস...', পৃ. ৭৬-৭৭ তুলনীয়। বাংলা এবং ওড়িশার ক্ষেত্রে যে ব্যতিক্রম করা হয়েছিল তার জন্য দ্রষ্টব্য Or. 1840, পৃ. ১৪০ ক-খ; Fraser 86, পৃ. ৬০খ।

৩৮. 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ৫৮খ। তুলনীয় 'নিগরনামা-এ মুনশী', পৃ. ৩৭ ক-খ; Bodl. পৃ. ২৮ খ-২৯ ক, Ed. 29.

৩৯. বিশেষভাবে 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৮৯ ক-৯০ ক, Or. 2026, পৃ. ৫১ ক-খ দ্রষ্টব্য; আরও দ্রষ্টব্য, 'মিরাৎ' ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৫; 'দস্তুর-আল আমল-এ নভিসিন্দগী', পৃ. ১৮০ ক-খ; Fraser 86, পৃ. ৭৬ ক-খ; 'ফরহঙ্গ-এ করদানী', পৃ. ২৪ খ-২৫ ক; Edinburgh 86, পৃ. ১৯ক; Allahabad 890.

৪০. 'তুজুক-এ জাহাঙ্গিরী', ২২; 'ওয়কাই-এ আজমীর', ৪১৩।

৪১. ঐ; 'ফথিয়া-এ ইব্রিয়া', পৃ. ১৩০ খ; 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৫।

৪২. মামুরি, পৃ. ১১৯ খ, বলেছেন, বিজাপুর সরকারের সবচেয়ে বড় অন্যায় হয়েছিল এই যে, তারা একই 'মহাল' জাগীর হিসেবে একসঙ্গে একাধিক লোককে বরাত দিয়েছিল এবং বরাতীরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে তা ঠিক করে নেবে বলে ছেড়ে দিয়েছিল।

৪৩. 'নিগরনামা-এ মুনশী', পৃ. ১৮৬ খ-১৮৭ ক, Bodl. পৃ. ১৪৮ ক-খ; Ed. 143; 'ওয়কাই-এ আজমীর', ১৯৯।

এরকম হতো শুধু তখনই, যখন একজন বদলিব আদেশ পেয়ে গেছে, অথচ অন্যজন পায়নি।[৪৪]

কোন লোক মনসবে তার নিয়োগের দিন থেকে, বা আরও উঁচু মনসবে পদোন্নতির দিন থেকে, জাগীর পেয়ে গেলে তাকে অসাধারণ ভাগ্যবান মনে করা হতো।[৪৫] কখনও কখনও জাগীরদারের হাতে আগে যে জাগীর ছিল সেটি তার কাছ থেকে বদলি হয়ে যাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে তাকে নতুন বরাত দেওয়া হতো না।[৪৬] মনসবদারের হাতে যে-সময়ের জন্য কোন জাগীর থাকত না, তার জন্য তিনি কোষাগারে 'তলব', অর্থাৎ তাঁর বেতনের দাবি, পেশ করতে পারতেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের আমলের শেষ দিকে আদেশ দেওয়া হয় যে নিয়োগের ঠিক পরের সময়টুকুর জন্য ঐ ধরনের কোন দাবি গ্রাহ্য হবে না। কার্যত, অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রায়ই 'তলব' মেটানো হতো না।[৪৭]

'মুতালবা', অর্থাৎ জাগীরদারদের কাছে সরকারী রাজস্ব বিভাগের পাওনা, মেটানোর জন্য অনেক সময় সাময়িকভাবে বরাত ফিরিয়ে নেওয়া যেত।[৪৮] এইসব পাওনার পরিমাণ জমে উঠত নানাভাবে: শোধ না করা ঋণ ('মুসাআদৎ'),[৪৯] মনসবদার হিসেবে জাগীরদারদের ওপর যেসব দায়িত্ব চাপানো হতো সেগুলো পালন করতে অক্ষমতা (যেমন, দাগানোর জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যায় ঠিক জাতের ঘোড়া না আনা,[৫০] বা আনলেও, যথাসময়ে না আনা,[৫১] বাদশাহী আস্তাবলের পশুদের জন্য খাবার যোগান না

৪৪. 'আর্জদস্ত-হ্-এ মুজক্ফর', Add. 16,859, পৃ. ৩ খ-৪ ক; বালকৃষণ ব্রাহ্মণ, পৃ. ৬৪ খ-৬৫ ক; 'ওয়াকাই-এ আজমীর', ৩৭, ৪২, ১৮৭; 'মতিন-আল ইন্শা', পৃ. ৩২ খ-৩৩ ক, ৪৪খ-৪৫ক; 'আহ্কম-এ আলমগীরী', পৃ. ১৬৯ ক।

৪৫. বয়াজিদ, ৩৭২-৭৪; 'ওয়াকাই-এ আজমীর', ৪০৫-৬। আওরঙ্গজেবের 'বখ্শী'র করণিক মীর্জা ইয়ার আলী নাকি বলেছিলেন যে, মনসবে নিয়োগের সময় কেউ যদি যুবক থাকে তবে বেতন হিসেবে 'জাগীর' পেতে পেতে তার দাড়ি পেকে যাবে (খাফী খান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৯)।

৪৬. মামুরি, পৃ. ১৮২ খ; খাফী খান, ২য় খণ্ড, ৩৯৬; 'নিগরনামা-এ মুন্শী', পৃ. ৪৬ ক; Ed. 35.

৪৭. মামুরি, পৃ. ১৮২ খ, খাফী খান, ২য় খণ্ড, ৩৯৬-৭। তুলনীয় 'আহ্কম-এ আলমগীরী', পৃ. ১৯ ক।

৪৮. ওয়ারিস, ক: পৃ. ৪০০ ক-খ, খ: পৃ. ১৫ ক-খ; 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ৫৮ খ, 'রুকাৎ-এ আলমগীর', পৃ. ১২২-৩; 'দিলকুশা', পৃ. ১৩৯ ক; 'মতিন-আল ইন্শা', পৃ. ৪৮ ক-খ, ৪৯ খ, ৫০ ক, ৫২ খ-৫৩ খ।

৪৯. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৬-৭; 'ওয়াকাই-এ-আজমীর', ২২; 'দিলকুশা', পৃ. ১৩৯ ক। আরও তুলনীয় 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৫৫-৬০', পৃ. ৬৭।

৫০. 'তফাওয়ৎ-এ দাগ'। 'সিলেকটেড ডকুমেন্টস্...', পৃ. ১৯৫; 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ৩৮ ক-খ; ১১৮ ক; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', পৃ. ১১৬-১৭।

৫১. 'দের-তসীহ্'। 'জাওয়াবিৎ-এ আলমগীরী', Add. 6598, পৃ. ১৪৮ ক, Or. 1641, পৃ. ৩৯খ; Fraser 86, পৃ. ৬৮ ক-খ।

দেওয়া,[৫২] ইত্যাদি), আগের বছরগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বেতন হ্রাস,[৫৩] এবং আমরা যেমন দেখেছি, বাড়তি রাজস্ব আদায় ও আগের বছরের বকেয়া রাজস্ব থেকে।

নকলনবীশ ও হিসাবরক্ষকদের এক বিরাট বাহিনীর সাহায্য না নিয়ে অনড় ও জটিল নিয়মকানুন-সম্বলিত বরাত ব্যবস্থার কাজ চলতে পারত না। জাগীরদারের চোখে বাদশাহী প্রশাসনের নিযুক্ত এই ক্ষুদে কেরানীই তার যাবতীয় ঝামেলার মূল কারণ বলে মনে হতো। তাকে জাগীর বিলি করা এবং তার কাছে পাওনা 'মুতালবা' ঠিক করার সময় সে-ই যেন তার স্বার্থনাশ করতে চায়।[৫৪] সেই সঙ্গে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রত্যংশ হিসেবে প্রায় সর্বব্যাপী ঘুষের চল ছিল। বরাতীরা যাতে তাদের দায়-দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করে তার পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের কঠোর ব্যবস্থার অনেকটাই বোধ-হয় ছিল শুধু কাগজে-কলমেই।[৫৫]

বরাত ব্যবস্থায় সঙ্কট দেখা দিতে শুরু করে আওরঙ্গজেবের আমলের শেষ দিকে। ১৬৮২ সাল থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আওরঙ্গজেব দখিনে এক অন্তহীন যুদ্ধ চালিয়ে যান। মুঘল সাম্রাজ্যের যাবতীয় সামরিক শক্তি কেন্দ্রীভূত করা সত্ত্বেও সে যুদ্ধে তাঁর জয় হয়নি। এই সময়ে মনসবদার পদে বিপুল সংখ্যক 'দখিনী' বা দখিনের রাজ্যগুলোর কর্মচারী ঢুকে পড়েছিল। আর ঢুকেছিল মারাঠারা, যাদের অন্তত নিরপেক্ষ রাখার জন্য কিনে নেওয়ার দরকার ছিল। এর ফলে মনসবদারের সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, তাদের মাইনে মেটানোর জন্য যা জাগীর ছিল তাতে আর কুলল না।[৫৬] আওরঙ্গজেব স্বয়ং তাঁর একটি চিঠিতে "'পাইবাকী'-র অপ্রাচুর্য ও দলে-দলে লোকের মাইনে দাবি করা"র কথা উল্লেখ করেছেন, এবং ঘোষণা করেছেন যে, সমস্ত কিছু, "মাংস ও হাড়", বরাত হয়ে গেছে, দরবারের পক্ষে আর কোন বরাতের দাবি বিবেচনা করা সম্ভব নয়।[৫৭] মামুরি ও খাফী খান একই ধরনের বিবৃতি দিয়েছেন। বলা হয়েছে যে, "বিস্তর লোক (আক্ষরিক: 'এক দুনিয়া') বে-জাগীর হয়ে গেছে।" যে সব লোককে মনসবে নিয়োগ করা হচ্ছে

৫২. 'খুরাক-এ দোআব'। দানাপানি সহ কোন্ কোন্ প্রাণী কতগুলো করে যোগান দিতে হবে—তার জন্য দ্রষ্টব্য 'দস্তুর-আল আমল-এ নভিসিন্দগী', পৃ. ১৪৬ ক-১৪৭ ক; Fraser 86, পৃ. ৭৫খ-৭৬ ক। বাস্তবিকই যে-ক্ষেত্রে এই ধরনের যোগান চেয়ে পাঠানো হয়েছিল তার জন্য 'মতিন-আল ইন্‌শা', পৃ. ৭১ ক-খ, ৭৪ ক-খ দ্রষ্টব্য। পরে ঘোড়ার যোগান না চেয়ে তার বাবদ পাওনাকে নগদ উপশুল্কে পরিণত করা হয় ('অখবারাৎ' ৪৬/২৬৭; খাফী খান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০২-৩)।

৫৩. 'মতিন-আল ইন্‌শা', পৃ. ৫৫ ক-খ তুলনীয়।

৫৪. তুলনীয় 'ফখিয়া-এ ইব্রিয়া', পৃ. ১২৯ খ-১৩১ ক; 'দিলকুশা', পৃ. ১৩৯ ক-১৪০ খ।

৫৫. 'দিলকুশা', পৃ. ১৪০ খ। দাগানো ঘোড়া পরীক্ষার সময় ঘুষ দেওয়ার ব্যাপারে দ্রষ্টব্য মানুচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৭-৮; 'মতিন-আল ইন্‌শা', পৃ. ৬৬ খ-৬৭ ক, ৭০ ক-খ, ৮০ ক-খ।

৫৬. মামুরি, পৃ. ১৫৬ খ-১৫৭ ক; খাফী খান, Add. 6574, পৃ. ১০৬ ক-১০৭ ক। দখিনীদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কঠোর বিদ্রূপ করে লেখা এই চমক-লাগানো অংশটি খাফী খানের বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা সংস্করণে বাদ দেওয়া হয়েছে।

৫৭. 'দস্তুর-অল আমল-এ আগাহী', পৃ. ৩১ ক; Add. 18,422. পৃ. ১৭ খ-১৮ ক।

তারা বছরের পর বছর 'জাগীর' পাচ্ছে না, আর কারও কাছ থেকে জাগীর হস্তান্তর করা হলে আরেকটি জাগীর সে না-ও পেতে পারে।[৫৮] যেভাবে তাদের দাবি উপেক্ষা করে দখিনীদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছিল, পুরোনো অভিজাতরা (তথাকথিত "খানা-জাদান") তাতে খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।[৫৯] কিন্তু এই সঙ্কটের আসল বলি হয়েছিল ছোট মনসবদাররা। তাদের সেই টাকা কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল না, যার বিনিময়ে দরবারের কর্মচারীদের দিয়ে জাগীর বরাত করিয়ে নিতে পারবে।[৬০]

'খালিসা'-কে মূলত অনেক কটি বরাতের সমষ্টি বলে ধরা উচিত, যা সরাসরি বাদশাহী প্রশাসনের অধিকারে থাকত। নতুন বরাত না হওয়া পর্যন্ত যেসব এলাকা অল্প সময়ের জন্য 'পাইবাকী'র আওতায় রয়েছে,[৬১] তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে বিভিন্ন 'মহাল'-এর খালিসা হস্তান্তর বা বরাতের উল্লেখ সর্বদাই দেখা যায়। অবশ্য গৃহীত নীতি, মনে হয়, এই ছিল যে, 'খালিসা'-র জন্য এমন জমিই রাখা হবে যা সবচেয়ে উর্বর ও প্রশাসন করার পক্ষে সুবিধাজনক।[৬২] খালিসা-র সঙ্গে তাই প্রায় স্থায়ীভাবে জুড়ে দেওয়া থাকত কয়েকটি পরগনা।[৬৩]

৫৮. মামুরি, পৃ. ১৫৭ ক, খাফী খান, Add. 6574, পৃ. ১০৭ ক।

৫৯. মামুরি, পৃ. ১৮২ খ; খাফী খান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৯, ৩৮৬-৭।

৬০. মামুরি, পৃ. ১৫৬ খ-১৫৭ ক; খাফী খান, Add. 6574, পৃ. ১০৬ খ-১০৭ ক। আওরঙ্গজেব নিজেই স্বীকার করেছেন যে এই পরিস্থিতিতে "ছোটখাট লোকদের ('রেজা-হা') প্রতি খুবই অবিচার করা হয়।" ('দস্তুর-আল আমল-এ আগাহী', পৃ. ৩১ ক; Add. 6574, পৃ. ১০৭ক।

৬১. 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৮৯ ক-খ; Or. 2026, পৃ. ৫১ ক-খ। তুলনীয় 'ওয়কাই-এ আজমীর', পৃ. ৩৭৫-৬।

৬২. ১৬৭৬-এ মালবের সরংপুর 'সরকার'-এর রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনার জন্য যখন বয়াজিদকে পাঠানো হয়, তিনি বলেছিলেন যে, এটি খালিসা-র মধ্যে নেওয়ার "উপযুক্ত" নয়। সেই অনুযায়ী 'সরকার'টি জাগীর হিসেবে বরাত দেওয়া হয় (পৃ. ৩৫৩)। একইভাবে, আওরঙ্গজেব আদেশ দিয়েছিলেন যে বিশেষ কয়েকটি পরগনাকে আবার জাগীর হিসেবে বরাত দিতে হবে, যেহেতু সেগুলো খালিসা-র "যোগ্য" নয় ('অখবারাৎ' ৪২/১৪)। কোন এলাকা খালিসা-র অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পক্ষে "উপযুক্ত" বা "যোগ্য" হওয়ার প্রধান মাপকাঠি কী ছিল তা বোঝা যায় হকিন্স-এর এক বিবৃতি থেকে। তিনি বলেছেন যে-কোন জমিই "বাদশাহ্ তাঁর নিজের জন্য নিয়ে নেন (যদি সেই জমি উর্বর হয় এবং উৎপাদন বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে)" ('আর্লি ট্রাভেলস', ১১৪)। আর, জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ দিকে খালিসা-য় থাকত শুধুই জনশূন্য ভূখণ্ড—কাজবিনীর এই নিন্দাবাদ থেকেও সে-কথা বোঝা যায় (Or. 20,734, পৃ. ৪৪৪; Or. 173, পৃ. ২২১ ক-খ)। 'ওয়াকাই-এ আজমীর', ৪-৫ এ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যে রণথম্ভোর দুর্গের কাছাকাছি পরগনাগুলো খালিসা-র মধ্যে নিয়ে নেওয়া উচিত, কারণ সেগুলো শাসনে রাখা সহজ। আরেকটি পরগনা ছিল 'সাইর-ওয়াসিল' (অর্থাৎ নির্ধারিত পরিমাণের সমান রাজস্ব-প্রদায়ী)। পরগনাটি খালিসা-য় রেখে দেওয়ার পক্ষে এটাই যথেষ্ট কারণ বলে মনে করা হয়েছে। তুলনীয় 'রিয়াজ-উস সালাতিন', ২৪৫-৬, সেখানে বলা হয়েছে যে আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষদিকে বাংলার "সাইর-ওয়াসিল" জাগীরগুলো খালিসা-য় ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

৬৩. বার্নিয়ে ২২৪। শাহ্জাদা মুয়াজ্জমের জাগীর থেকে যখন হিন্দৌনকে বদল করে দেওয়া হয়,

বিভিন্ন সময়ে 'খালিসা'-র আয়তনের হেরফের হতো। আকবর তাঁর রাজত্বের ১৯-তম বছরে বাংলা, বিহার ও গুজরাট বাদে তাঁর সাম্রাজ্যের পুরোটাই (তখন যা ছিল) খালিসা-র আওতায় এনেছিলেন।[৬৪] শেষ পর্যন্ত দেখা যায়—হয়তো গোড়া থেকেই উদ্দেশ্য তা-ই ছিল—এটি নেহাৎই সাময়িক ব্যবস্থা, কিছু কাল পরে আবার জাগীর মঞ্জুর করা শুরু হয়।[৬৫] একটি প্রাসঙ্গিক উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, আকবরের রাজত্বের ৩১-তম বছরে দিল্লী, অযোধ্যা এবং এলাহাবাদের খালিসা-র 'জমা' হতো ঐ প্রদেশ-

আওরঙ্গজেব তখন আদেশ দিয়েছিলেন যে পুরনো আমল থেকেই সর্বদা যেমন চলছিল, এটিকে তেমনি খালিসাতেই রেখে দিতে হবে ('অখবরাৎ', ৪২/১৪)।

৬৪. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৭; আরিফ কান্দাহারী, ১৭৭-৮। বোধহয় আকবরের আগেই এ ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন ইসলাম শাহ্। গোটা রাজ্যকে তিনি সরাসরি তাঁর নিজস্ব প্রশাসনের আওতায় নিয়ে আসেন ('খাসা-এ খুদ') এবং হোমরা-চোমরা লোকদের নগদ বেতন দেন ('বদাউনী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৪; 'তারিখ-এ দাউদী', ১৬৫)।

৬৫. তুলনীয় 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', ৯৬-৮। কী করা হয়েছিল তা সবচেয়ে ভালো দেখা যায় সদ্য উল্লিখিত সরংপুর 'সরকার'-এর ক্ষেত্রে। এখানকার জাগীরদার শিহাবুদ্দীন আহ্‌মদ খানকে গুজরাটে বদলি করে জায়গাটিকে খালিসা-র অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। এখানকার রাজস্ব ব্যবস্থা ঠিকঠাক করার জন্য নিয়োগ করা হয় বয়াজিদকে। ২০-তম বছর বা ১৫৭৬-এর শেষদিকে তিনি দায়িত্ব বুঝে নেন। 'সরকারটি'কে তিনি খালিসা হিসেবে না-রাখার সিদ্ধান্ত নিলে পর এটি আবার বরাত দেওয়া হয় (বয়াজিদ, ৩৫৩)। 'আইন'-এ এই 'সরকার'টিকে উজ্জয়নীর 'দস্তুর'-মণ্ডলের অধীনে রাখা আছে এবং এর জরিপ-করা এলাকার পরিসংখ্যানও দেওয়া আছে।

অবশ্য এও সম্ভব যে, ১৫৮০-৮১-র ঘটনাবলীর ফলে জাগীরগুলো আরও তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলোতে বিদ্রোহ এবং উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে মীর্জা হাকিমের আক্রমণের দরুন আকবরের অবস্থা খুব সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে। তাঁর সর্বোচ্চ অভিজাতরা এই সুযোগে তদানীন্তন 'দিওয়ান' এবং 'করোড়ী' পরীক্ষার অন্যতম স্রষ্টা শাহ্ মনসুরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। মীর্জা হাকিমের বিরুদ্ধে আকবরের অভিযানের সময় দুর্ভাগা লোকটিকে সাজানো অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে, বদাউনীর (২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৬) কথা অনুযায়ী যে 'মীর বখ্‌শী' আগ্রার প্রশাসনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, সেই শাহ্‌বাজ খান কম্বু, "বাদশাহের অনুপস্থিতির সময়ে, গরহি থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল, তাঁর নিজের দায়িত্বে জাগীর হিসেবে লোকের মধ্যে বিলি করে দেন।...বাদশাহ্ যখন (ফিরে এসে) তাঁর এতদূর সাহসের কারণ জানতে চাইলেন, উত্তরে তিনি বলেন যে, তিনি যদি সৈন্যদের (অর্থাৎ, নিশ্চয়ই, সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থদের) সন্তুষ্ট না করতেন, তবে তারা তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহ করত।" মীর বখ্‌শী বলেছিলেন যে-সমস্ত জাগীর এবং মনসব তিনি বিলি করেছেন বাদশাহ্ ইচ্ছা করলে সেগুলো ফিরিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু আকবর সেই অনুযায়ী কাজ করেছিলেন কিনা সে কথা বলা যায় না। মনে হয়, আবার ১৫৭৫-৬-এর মতো ব্যবস্থা নেওয়াটা আর যুক্তিযুক্ত মনে করা হয়নি।

গুলোর মোট 'জমা'-র প্রায় একের-চার ভাগ।[৬৬] বলা হয়েছে, জাহাঙ্গীরের আমলে খালিসা খুব কমে গিয়েছিল ; শেষে খালিসা-র 'জমা' সমগ্র সাম্রাজ্যের 'জমা'র শতকরা পাঁচ ভাগেরও নীচে চলে যায়।[৬৭] শাহ্‌জাহান অবশ্য চিন্তা-ভাবনা করেই খালিসা-র এলাকা ও রাজস্ব বাড়ানোর নীতি নিয়েছিলেন, তাঁর রাজত্বের চতুর্থ বছরের মধ্যে খালিসা-র 'জমা' বেড়ে সমগ্র সাম্রাজ্যের 'জমা'-র $\frac{১}{১৫}$ ভাগ হয়ে দাঁড়ায়।[৬৮] সম্ভবত পরের কয়েক বছরের মধ্যেই এই অনুপাত বেড়ে ভাগে দাঁড়িয়েছিল $\frac{১}{১১}$ ভাগ[৬৯] আর ২০-তম বছরের মধ্যে হয়ে দাঁড়ায় প্রায় $\frac{১}{৭}$ ভাগ।[৭০] ৩১-তম বছরে খালিসা-র নির্ধারিত রাজস্বের অঙ্ক সামান্য কমে,[৭১] কিন্তু পরের আমলের গোড়ার কয়েক বছরেই আবার তা বাড়তে দেখা যায়। আওরঙ্গজেবের আমলের দশম বছরের মধ্যেই খালিসা-র

৬৬. বলা হয়েছে, আকবর সে বছর এই সব প্রদেশের 'জমা'-র একের-ছয় ভাগ মকুব করে দিয়েছিলেন, আর খালিসা-য় এই মকুবের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৪,০৫,৬০,৫৯৬ 'দাম' ('আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১৪)। তাহলে, ঐ সব প্রদেশের খালিসা-য় মোট 'জমা' নিশ্চয়ই ২৪৩০ লক্ষ 'দাম' ছাড়িয়ে গিয়েছিল। 'আইন'-এ যে প্রাদেশিক পরিসংখ্যান দেওয়া আছে, তাতে তিনটি প্রদেশের মোট 'জমা' হয়েছে প্রায় ১০১৬০ লক্ষ 'দাম'। 'আকবরনামা'য় অন্যান্য যে-সব রাজস্ব মকুবের উল্লেখ আছে, তাতে এরকম সরাসরি তুলনার কোন সুযোগ নেই।

৬৭. কাজবীনী (Add. 20734, পৃ. ৪৪৪-৫, Or. 173, পৃ. ২২১ ক-খ) বলেছেন যে এটি কমিয়ে করা হয়েছিল ২৮ 'করোড় দাম'। ১৬২৭-২৯ সাল নাগাদ সাম্রাজ্যের মোট 'জমা' ছিল ৬৩০ 'করোড় দাম' ('মজালিসুস্ সালাতিন', পৃ. ১১৫ ক-খ)।

৬৮. কাজবীনী, Add. 20734, পৃ. ৪৪৪, Or. 173, পৃ. ২২১ ক-খ। ১৬৩০-৩২ সালের বিশাল দুর্ভিক্ষের সময় যে ৫০ 'লাখ' টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল তার উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন যে তখ্‌তে বসার পর শাহ্‌জাহান খালিসা বাড়ানোর আদেশ দিয়েছিলেন যাতে 'জমা' বেড়ে ৬০ 'করোড দাম' হয়।

৬৯. কাজবীনীর মতো একই প্রসঙ্গে লাহোরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪, এ কথা বলেছেন। কিন্তু খালিসা-র মকুব এবং 'জমা' দুটি অঙ্কই তিনি বাড়িয়ে করেছেন যথাক্রমে ৭০ 'লাখ' এবং ৮০ 'করোড়-দাম'। এই দুই তথ্যসূত্রের অঙ্কগুলোর পার্থক্যের একমাত্র ব্যাখ্যা করা যায় বোধহয় এই ধরে নিয়ে যে, লাহোরী শেষ দিকের বছরগুলোর তথ্যও ব্যবহার করেছিলেন। ডঃ শরণ তাঁর 'প্রভিন্সিয়াল গর্ভনমেণ্ট...'-এ (পৃ. ৪৩২-৩) আগেই দেখিয়েছেন যে লাহোরীর একের-এগারো ভাগ অনুপাতটি মকুব রাজস্বের পরিমাণ সংক্রান্ত নয়, এটি হলো মোট 'জমা' এবং খালিসা-র 'জমা'-র অনুপাত। লাহোরী আসলে ২০-তম বছরের মোট 'জমা' দেখিয়েছেন ৮৮০ 'করোড়' (২য় খণ্ড, পৃ. ৭১০), এবং খালিসা-র ক্ষেত্রে তিনি যে অঙ্কগুলো দিয়েছেন সেটি ঠিক তার এগারোগুণ।

৭০. সাম্রাজ্যের 'জমা' ৮৮০ 'করোড়'-এর তুলনায় এটি এখন দাঁড়িয়েছিল ১২০ 'কড়োর দাম' (লাহোরী, ২য় খণ্ড, ৭১০, ৭১২-১৩)।

৭১. 'জাওয়াবিৎ-এ আলমগীরী', Add. 6598, পৃ. ১৮৭ খ ; Or. 1641, পৃ. ১৩৩ ক-এ ১১৮ 'করোড় দাম'-এর সামান্য বেশি দেখানো আছে।

'জমা' সমগ্র সাম্রাজ্যের 'জমা'-র প্রায় ১/২ ভাগ হয়ে ওঠে।[৭২] আওরঙ্গজেবের আমলের ৩৫-তম বছরে খালিসা-র প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের অঙ্কটি পাওয়া যায়। এই অঙ্ক আগের আমলের ৩১-তম বছরের অঙ্কের চেয়ে শতকরা প্রায় ৩৩ ভাগ বেশি।[৭৩]

আওরঙ্গজেবের আমলের খালিসা-র আয়তন সম্বন্ধে পরের দিকে আর কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু এও সম্ভব যে, তাঁর রাজত্বের শেষের বছরগুলোতে বরাতের জন্য যেটুকু জমি ছিল তার ওপর বিরাট চাপ পড়ে, তাই জাগীর হিসেবে বরাত দেওয়ার জন্য কিছু খালিসাও ছাড়তে হয়েছিল।

২. রাজস্ব প্রশাসনের পরিচালন-ব্যবস্থা

বরাত ব্যবস্থায় প্রশাসনিক কাঠামো খাড়া করা হয়েছিল মূলত দুটি সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য। প্রথমটি বাদশাহী নিয়ন্ত্রণের সমস্যা। রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের অধিকারী ছিল বরাতী, কিন্তু দুটি ব্যাপারেই তাকে কিছু বাদশাহী নিয়মকানুন মেনে চলতে হতো। বিশেষভাবে খালিসা-র জন্যই কিছু আদেশনামা ও বিধিব্যবস্থা স্থির করা হয়েছিল, কিন্তু যথার্থই মৌলিক নিয়মকানুনের বেশির ভাগই দেওয়া থাকত সাধারণভাবে। সেগুলো প্রযোজ্য হতো জাগীর এবং খালিসা—দু-এর ক্ষেত্রেই। আবুল ফজলের বিবৃতি থেকে দেখা যায়, এমনকি আকবরের আমলের গোড়ার দিকেও, জাগীরদারদের দরবার-অনুমোদিত বার্ষিক নগদ হার অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করা হতো।[১]

৭২. 'মিরাৎ-আল আমল', Add. 7657, পৃ. ৪৪৫ খ।

৭৩. 'জাওয়াবিৎ-এ আলমগীরী', Add. 6598, পৃ. ১৮৭ খ, Or. 1641, পৃ. ১৩৩ ক। এখানে পরিমাণ দেওয়া আছে ৩,৩৩,১২,৪৮০ টাকা তুলনায় শাহ্জাহানের রাজত্বের ৩১-তম বছরে খালিসা-র 'ওয়াসিল'-এর অঙ্কটি হলো ২,৪৮,৭৯,৫০০ টাকা। তাঁর রাজত্বের ১৩-তম বছরে আওরঙ্গজেব নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, প্রতি বছর খালিসা-র আয় ৪ 'কয়োড়' টাকার কম হবে না ('মআসির-এ আলমগীরী', পৃ. ৯৯-১০০)। 'জাওয়াবিৎ-এ আলমগীরী'র (Ethe 415, পৃ. ১৭৭ ক-খ, Or. 1641, পৃ. ৮১ ক-খ) আর এক জায়গায়, শাহ্জাহান এবং আওরঙ্গজেবের আমলের খালিসা-র তুলনামূলক পরিসংখ্যান দেওয়া আছে। কিন্তু এখানে সঠিক বছরগুলো নির্দিষ্ট করা নেই।

	'মহাল'-এর সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	'জমা' ('দাম')	'ওয়াসিল' (টাকা)
শাহ্জাহানের …	৪০৭	৭৮,০০০	১,৩৪,৪৬,০৩,২৪৫	… ২,৮১,২১,২২৭
আমল …	৪৭৮	৭৫,০০০	১,২৫,৭৬,৬০,৯৪৭	… ২,৪৭,১৬,৯৮৩
আওরঙ্গজেবের …	৯৫০	৯৫৮ ?	১,৩১,৩৫,৬১,৩৬৪	… ২,৬১,১৮,০৭৯
আমল …	৭৮৭	৯৩৮ ?	১,২৪,৫৪,৬৪,৬৫০	… ২,৩৪,৫১,৯৫৬

টাকা ৬ আনা।

১. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮; 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮২। আরও তুলনীয় 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', ৯১-২।

২৭-তম বছরের নিয়মাবলীর গোড়াতেই তোডর মল একটি অনুচ্ছেদে ঠিক করে দিয়েছিলেন : সমস্ত রকম রাজস্ব আদায় হবে সরকার-অনুমোদিত হারে—তা সে জাগীরদার কিংবা খালিসা-র কর্মচারী যে-ই আদায় করুক। তার বেশি কিছু আদায় করলে জরিমানা সমেত বাড়তি অংশ কেড়ে নেওয়া হবে।[২] শাহ্‌জাহানের রাজত্বের শেষ দিকে যখন দখিনের রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কার করা হয়, তখন শুধু খালিসা অঞ্চলে নয়, জাগীরদারের বরাতী এলাকাতেও শস্য-ভাগ বলবৎ করা হয়।[৩] রসিকদাসের উদ্দেশে আওরঙ্গজেবের ফরমানেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে : ফরমানের প্রাপক লক্ষ্য রাখবেন যাতে "জাগীরদারদের মহালগুলোর" সব "রাজস্ব সংগ্রাহক ('আমিল')" এই নির্দেশনামায় প্রকাশিত নিয়মকানুন মেনে চলে। তাহলে নিশ্চয়ই এমন কোন পরিচালন-ব্যবস্থা ছিল যার মাধ্যমে বরাতী এলাকায় সরকারী নির্দেশনামা মেনে চলার ব্যাপারটি নিশ্চিত করা যেত।[৪]

দ্বিতীয়ত, যে জাগীরদারকে কিছুদিন অন্তরই এক-একটি নতুন বরাত সামলাতে হয় তার সমস্যাও ছিল। প্রত্যেক নতুন জাগীরের রাজস্ব-প্রদায়ী ক্ষমতা বা স্থানীয় রীতির খুঁটিনাটির সঙ্গে পরিচয় থাকবে—সে বা তার কর্মচারীরা এমন আশা করতে পারত না। জাগীরদার বা তার গোমস্তা যে কোন জায়গায় অত অল্প সময়ের মধ্যে একেবারে শূন্য থেকে একটা স্থানীয় প্রশাসন গড়ে তুলবে—এমনও সম্ভব হতো না। স্থানীয় নথিপত্র ও রাজস্ব-রীতির পারম্পর্য রক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকলে বরাত প্রথা পুরোপুরি নৈরাজ্যে পরিণত হতো।

এই দুটি প্রান্ত মেলানোর জন্য প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে থাকত তিনটি সুনির্দিষ্ট উপাদান। প্রথমে বরাতীদের কর্মচারী ও প্রতিনিধিরা, বরাতীর হাতে খালিসা বা জাগীর যা-ই থাকুক। তারপর ছিল স্থায়ী স্থানীয় কর্মচারী। এদের পদ নির্ভর করত কিছুটা জন্মসূত্র আর কিছুটা বাদশাহী কর্তৃপক্ষের ওপর। কিন্তু বরাতীর অদল-বদলে তাদের কিছু এসে যেত না। সবশেষে, পুরোদস্তুর বাদশাহী প্রশাসনের কর্মচারী, বরাতীদের সাহায্য ও নিয়ন্ত্রণ—দু কাজেই যাদের লাগানো যেত।

খালিসা সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে সংক্ষিপ্ত বিবরণের বেশি কিছু দেওয়া যাবে না। শের শাহের অধীনে প্রতি পরগনায় একজন 'শিকদার' থাকত। তার কাজ ছিল রাজস্ব আদায় ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা।[৫] তার একজন সহকর্মীও ছিল,

২. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮১ (Add. 27, 247, পৃ. ৩৩১ খ)।

৩. 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ১১৮ ক থেকে তাই মনে হয়।

৪. মোরল্যাণ্ড স্বীকার করেছেন যে, ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত বাদশাহী নিয়মকানুন বরাতীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতো। কিন্তু তাঁর বোধহয় মনে হয়েছে যে, সেগুলো বলবৎ করার ব্যাপারটা পুরোপুরি নির্ভর করত বাদশাহের ব্যক্তিত্বের ওপর : আকবরের আমলে "রাজস্ব সম্বন্ধে তাঁর আদেশগুলো খোলাখুলিভাবে অমান্য করলে" সম্ভবত তাকে রেয়াৎ করা হতো না ('এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', ৯২)। কিন্তু আকবরেরও নিশ্চয়ই কিছু প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল যার সাহায্যে অনিয়ম খুঁজে বের করা ও বাদশাহের ইচ্ছা বলবৎ করা যেত।

৫. মুশ্‌তাকী, পৃ. ৪১ ক; আব্বাস খান, পৃ. ১০৬ ক, ১১৩ খ। 'ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন, ১ম খণ্ড, সংখ্যা ৩, মে, ১৯৩৩, পৃ. ১২১-২, ১২৫-৮-এ প্রকাশিত শের শাহের 'মদদ-এ মআশ'

'মুন্সিফ' বা 'আমিন'।[৬] তার কাজ ঠিক কী ছিল তথ্যসূত্র থেকে তা জানা যায় না, কিন্তু পরবর্তীকালে তার নামে যে-গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তাতে ধরে নেওয়া যায় তার দায়িত্ব ছিল রাজস্ব নির্ধারণ।

এসব ব্যবস্থা সম্ভবত আকবরের আমলের গোড়ার দিক অবধি চলেছিল। সে সময়ে 'শিকদার'দের সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়।[৭] অবশ্য পরগনা স্তরে 'মুন্সিফ' বা 'আমিন'দের কথা আর শোনা যায় না। সম্ভবত তার পদের গুরুত্ব কমে গিয়েছিল। ১৯-তম বছরে খালিসা-র প্রশাসন ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন করা হয়। সেই সময়ে তিনটি প্রদেশ বাদে সমস্ত সাম্রাজ্যকে আনা হয় খালিসার আওতায়। সারা দেশকে জেলায় ভাগ করা হয়, ধরা হয় প্রত্যেক জেলা থেকে এক 'করোড় টাকা' পাওয়া যাবে। প্রতি জেলায় একজন করে 'আমিল' বা 'আমালগুজার' নিয়োগ করা হয়, পরে তার নাম হয়েছিল 'করোড়ী'।[৮] মনে হয়, এই রাজস্ব-আদায়কারীদের কাজে প্রচুর স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল, কারণ বহু অত্যাচারের জন্য তারাই নাকি দায়ী।[৯] 'করোড়ী পরীক্ষা' তুলে দিয়ে ফের যখন বরাত মঞ্জুর শুরু হয় তখনও কোন পরগনা বা পরগনা-সমষ্টির সঙ্গে যুক্ত খালিসা-র 'আমিল' বা 'আমালগুজার'কে 'করোড়ী'ই বলা হতো।[১০] 'আইন'-এ তার কাজের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায়, এই কর্মচারীকে রাজস্ব নির্ধারণ

ফরমানগুলো "বর্তমান 'শিকদার' এবং ভবিষ্যৎ 'আমিল'দের" উদ্দেশ্যে প্রচারিত। এর থেকে মনে হয় 'শিকদার' এবং 'আমিল' বা রাজস্ব-আদায়কারী ছিল সমার্থক শব্দ। আরও তুলনীয়: Allahabad 318 এবং আব্বাস খান, পৃ. ১১২ খ-১১৩ ক। দুটি ফরমানের একটিতে (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১২৭) বলা হয়েছে, কোন রকম গোলযোগ দেখা দিলে বরাতীরা 'শিকদার'দের সাহায্য করতে যাবে। এইভাবে তাঁর পদটির সামরিক বা পুলিশী দিকটি সম্পর্কেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আকবরের মুখ্য অভিজাতবর্গের একজন, মুনিম খানের হয়ে বয়াজিদ কয়েক বছর (১৫৬১ থেকে) হিসারের 'শিকদারে'র পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দাবি করেছেন যে এই পদে থাকাকালীন তিনি যথেষ্ট পরিমাণে রাজস্ব বাড়িয়েছিলেন এবং একবার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে হিসাব রক্ষার কাজে সফল হয়েছিলেন (বয়াজিদ, ২৭৮-৯, ২৯৯)।

৬. মুশ্‌তাকী, পৃ. ৪৯ ক-তে পাঠ আছে 'মুন্‌সিফ', আর আব্বাস খান, পৃ. ১০৬-এ আছে 'আমিন'। এই দুটি শব্দের জন্য বদাউনী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৫-এ একই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তুলনীয় 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৯ ক, Or. 2026, পৃ. ৩৩ ক। 'মুন্সিফ' যে শের শাহের অধীনে একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী ছিল তা দেখা যায় 'লতিফ-এ কুদ্দুসী' থেকে। এস. এন হাসান-কৃত এর নির্বাচিত অংশের অনুবাদ আছে 'মিডিয়েভাল ইন্ডিয়া কোয়ার্টার্লি', ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৫৬-য়।

৭. যেমন বয়াজিদ, ২৭৮, ৩০৩।

৮. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৭; আরিফ কান্দাহারী ১৭৭-৮; 'তবাকৎ-এ আকবরী', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০০-৩০১; বদাউনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৯।

৯. বদাউনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৯।

১০. কোথাও এ কথা সরাসরি বলা নেই, কিন্তু পরবর্তী আমলের নথিপত্রে 'করোড়ী'র অজস্র উল্লেখ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

এবং আদায়—দু-এরই দায়িত্ব নিতে হতো।[১১] 'শিকদার' নামটি সম্ভবত 'আমিল'-এর সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার হতে থাকে,[১২] কিন্তু পরবর্তীকালে শব্দটি দিয়ে, মনে হয়, 'করোড়ী'র অধীনে কোন অধস্তন আদায়কারীকেই বোঝাত।[১৩] 'আমিন'কে এখন শুধু দেখা যায় রাজস্ব নির্ধারণের উদ্দেশ্যে জরিপের জন্য করোড়ীর পাঠানো জরিপ দলের নেতা হিসেবে।[১৪] রাজস্ব আদায় করার জন্য করোড়ী 'সিহ্-বন্দিস' নামের ঘোড়সওয়ারদেরও কাজে লাগাত।[১৫]

১১. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫-৮।

১২. 'আইন'-এ, মনে হয়, 'শিকদার' শব্দটির উল্লেখ আছে মাত্র দুটি অংশে। ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০-৩০১-এ 'করোড়ী' নিয়োগের আগে সম্ভবত পুরনো 'শিকদার'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। পৃ. ২৮৯-এ স্পষ্টই এটি ব্যবহার হয়েছে 'আমিল'-এর নামান্তর হিসেবে : এইভাবে 'শিকদার' এবং 'কারকুন'-এর পরামর্শ অনুযায়ী খাজাঞ্চীকে খাজাঞ্চীখানা বসাতে হবে; কিন্তু 'আমিল' ও 'কারকুন'কে না জানিয়ে সে তার দরজা খুলবে না। একইভাবে বিনা অনুমতিতে সে কোন-রকম টাকা বিলি করতে পারবে না, আর জরুরি প্রয়োজনে টাকা দেওয়ার সময় অবশ্যই শিকদার ও কারকুন-এর লিখিত আদেশ নেবে। 'আমিল' কিন্তু এই সব হিসাব 'কারকুন'-এর হিসেবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবে আর তার ওপর নিজের শিলমোহরের ছাপ দেবে।

১৩. 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৯১ খ-৯৪ ক, Or. 2026, পৃ. ৫৯ ক-৬৪ ক-এ উদ্ধৃত 'বরু-আমদ' হিসাবগুলোর নমুনায় করোড়ীর অধস্তন সহযোগীদের ('মুতাল্লিকান') মধ্যে 'কারকুন'-এর সঙ্গে 'শিকদার'কেও দেখান হয়েছে। Add. 6603, পৃ. ৬৭ ক-এ 'শিকদার'-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে: আদায় বলবৎ করার জন্য 'আমিল'-এর পাঠানো প্রতিনিধি।

১৪. তুলনীয় 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৩। ঐ একই ধরনের ব্যবস্থার জন্য 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৬-এ, সম্ভবত তার আগের শব্দ 'আইন'-এর সঙ্গে গুলিয়ে যাওয়ার ফলে 'আমিন' কথাটি বাদ পড়ে গেছে। কিন্তু ঐ একই প্রসঙ্গে তার উল্লেখ আছে, ঐ, পৃ. ৩০০-৩০১-এ। কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়-জনিত ক্ষয়ক্ষতি সম্বন্ধে 'আমালগুজার'-এর প্রতিবেদন পরীক্ষা করার জন্য সদর দপ্তর থেকে পাঠানো কর্মচারীকেও বলা হতো 'আমিন' ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৬-৭; 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৯ ক, Or. 2026, পৃ. ৩৩ ক)।

১৫. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৮; আসাদ বেগের স্মৃতিকথা, Or. 1996, পৃ. ৪ ক; 'হিদায়েৎ-আল কওয়াইদ', পৃ. ১১ ক; খাফী খান, Add. 6573, পৃ. ৮৩ ক, Add. 26226, পৃ. ৬০ ক। 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৯ খ-৮০ ক, Or. 2026, পৃ. ৩৪ ক-খ-এ বলা হয়েছে, 'নসক' হিসেবে ধার্য এলাকার সব জায়গায় যাতে বীজ বোনা হয় তার জন্য এবং পুরো রাজস্ব দাখিল করার আগে ফসল তোলা আটকানোর জন্য 'করোড়ী'কে "ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক" মোতায়েন করতে হবে।

'সিহ্-বন্দী' শব্দটির প্রকৃত অর্থ, মনে হয়, কোন বিশেষ সময়ে ভাড়া-করা সৈন্য। স্থায়ীভাবে নিযুক্ত সৈন্যবাহিনীর থেকে এরা আলাদা। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য 'বাবুরনামা', অনু. বিভারিজ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭০ (অনুবাদিকা, মনে হয়, শব্দটি ঠিক পড়তে পারেননি এবং লিপ্যন্তর করেছেন এইভাবে "ব : দ-হিন্দী")। ইয়াসিনের পরিভাষাকোষে শব্দটি সম্বন্ধে যা লেখা আছে

এর পরের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয় শাহ্‌জাহানের আমলে। তাঁর দিওয়ান ইসলাম খান প্রতি 'মহাল'-এ একজন করে 'আমিল' নিয়োগ করেন। রাজস্ব-নির্ধারণের দায়িত্ব করোড়ীর বদলে তাঁর এই নতুন সহকর্মীকে দেওয়া হয়।[১৬] এর পর থেকে করোড়ীর কাজ হয় প্রধানত 'আমিন'-এর নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করা।[১৭] বলা হয়েছে ইসলাম খানের পরবর্তী পদাধিকারী সাদউল্লাহ্ খান একই লোকের যুগপৎ করোড়ী ও ফৌজদার হওয়ার রীতি বন্ধ করে দেন। এর ফলে করোড়ীদের ক্ষমতা আরও কমে যায়। 'মহাল'-সমষ্টি নিয়ে 'চাকলা' নামে এক নতুন আঞ্চলিক একক চালু করা হয়।[১৮]

(Add. 6603, পৃ ৬৬ ক) তাতে বলা হয়েছে যে, "'ফৌজদার' এবং অন্যান্য কর্মচারীরা শুধুমাত্র ফসলের মরসুমে ঘোড়া ও পদাতিক ভাড়া করার প্রথা অনুসরণ করে। বৃষ্টি এলে তারা এদের ছাড়িয়ে দেয় এবং দশেরার দিন থেকে আবার নিয়োগ করে। তাই দিল্লীতে একটা কথা আছে, "কোয়েল (ভারতীয় কোকিল) গান গায় আর 'সিহ্ বন্দী'রা ঘুরে বেড়ায় (বেকার হয়ে)।" ভারতে কোকিলকে বর্ষার দূত বলে ধরা হয়।

শব্দটির ব্যুৎপত্তি জানা যায় না। 'সিহ্-বন্দী' এসেছে 'সিপাহ্-এ হিন্দী', অর্থাৎ ভারতীয় সেনাবাহিনী, এই শব্দটি থেকে—ইয়াসিনের প্রস্তাবিত এই ব্যাখ্যা (ঐ) ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়।

১৬. 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৯ খ, Or. 2026, পৃ. ৩৩ ক-৩৪ ক।

১৭. দুটি পদ আলাদা করে দেওয়ার পর 'আমিন' এবং 'আমিল' (বা 'করোড়ী') পদের দায়িত্ব কী ছিল, বিভিন্ন নথিতে তার বর্ণনা দেওয়া আছে। যথা, 'দস্তুর-আল আমল-এ আলমগীরী', পৃ. ৩৩ ক; রসিকদাসের উদ্দেশে ফরমান, প্রস্তাবনা; 'দস্তুর-আল আমল-এ নভিসন্দগী', পৃ. ১৫৩ খ-১৫৪ ক; নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ১৭৫ ক-১৮৭ ক, ১৮৮ খ-১৮৯ ক, Bodl. পৃ. ১৪০ খ-১৪১ খ, ১৪৯ খ-১৫০ খ, Ed. 135-7; 'ফরহঙ্গ-এ করদানী', পৃ. ২৯ ক-খ, Edinburgh No. 83, পৃ. ৩৯ ক-৪০ ক; 'দুর-আল উলূম', পৃ. ১৩৬ খ-১৩৭ ক; 'সিয়াকনামা', ২৬-২৮, ৪৮-৫০; 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৩ খ-৭৪ ক, Or. 2026, পৃ. ২১ খ-২২ খ; 'হিদায়েৎ-আল কওয়াইদ', পৃ. ১০ ক-১১ ক। 'আমিন'-এর সঙ্গে নির্ধারণের এবং 'আমিল'-এর সঙ্গে আদায়ের যোগাযোগের ব্যাপারে সর্বত্রই জোর দেওয়া হয়েছে।

এই দুটি পদকে আলাদা করাটা মুঘল প্রশাসকদের একটা বাঁধা নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে মনে হয়। জনৈক সাদউল্লাহ্ খান একই সঙ্গে মির্তার ফৌজদার, আমিন এবং করোড়ী ছিলেন। তিনি যখন প্রচুর টাকা তছরুপ করেছেন বলে সন্দেহ করা হয়, তখন আজমীরের সুবাদার মন্তব্য করেছিলেন যে একই লোকের হাতে একসঙ্গে তিনটি পদ থাকলে এমনই হওয়ার কথা ('ওয়কাই আজমীর', ৩১১)।

১৮. 'খুলাসতুস সিয়াক'-এ বলা হয়েছে (সূত্রের জন্য নীচের টীকা দ্রষ্টব্য) যে সাদউল্লাহ্ খানই 'চাকলা' নামক একক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মনে হয় এই ঘটনা থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায় যে শাহ্‌জাহানের আমলের নথিপত্র এবং কালপঞ্জীগুলোতেই প্রথম এই আঞ্চলিক বিভাগের উল্লেখ পাওয়া গেছে। হিসার এবং সিরহিন্দ 'চাকলার' মতো চাকলাগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 'সরকার' এরই সমান (বালকৃষণ ব্রাহ্মণ, পৃ. ১৮০ ক-খ ও অন্যান্য জায়গায় এর ভৌগোলিক

এর ওপর নিযুক্ত হন একজন 'আমিন-ফৌজদার', করোড়ী আসলে এই কর্মচারীর অধীন হয়ে যান।[১৯]

গোটা পরগনা বা বড় এলাকার রাজস্ব ইজারা দেওয়ার রীতি, মনে হয়, খুব একটা চলত না। অন্তত পক্ষে, খালিসা-য় এটি ছিল ব্যতিক্রম।[২০] দুজন বিদেশী পর্যবেক্ষক অবশ্য জোর দিয়ে বলেছেন, খালিসা-র সবটাই ছিল ইজারাদারদের দখলে।[২১] সম্ভবত, 'তাহুদ' ব্যবস্থা দেখে সাধারণত যা ধারণা হয়, তার থেকেই তাঁদের এ রকম মনে হয়েছিল। 'তাহুদ' মানে হলো : ভাবী কর্মচারী কী পরিমাণ রাজস্ব নির্ধারণ বা আদায় করবে তার অঙ্গীকার। আদতে 'করোড়ী'রা তাদের দায়িত্বাধীন এলাকা থেকে এক 'করোড় টঙ্কা' আদায় করবে বলে ধরা হতো। সরকারী বর্ণনা মতো আকবরের ৩০-তম বছরে চলতি রীতি ছিল এই যে, 'আমিল' যে-পরিমাণ আদায় করবে বলে কথা দিয়েছে ('নুস্কা-এ করোড়-বন্দী') (বা সবচেয়ে ভালো বছরের রাজস্বের যা পরিমাণ, 'সাল-এ কামিল') তা আদায় করতে না পারলে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। এই ব্যবস্থা এখন

তথ্য থেকে তা-ই মনে হয়)। কিন্তু 'চাকলা'গুলোকে সাধারণত 'সরকার'-এর চেয়ে ছোট একক বলে ধরা হতো (Add. 6603, পৃ. ৬৫ খ)। বাংলায় অবশ্য আলাদা আলাদা 'সরকার'-এর এলাকা খুব ছোট হওয়ার দরুন, একটি 'চাকলা'-য় সাধারণত কয়েকটি 'সরকার' থাকত (তুলনীয়, 'দস্তুর-আল আমল-এ খালিসা শরিফা', পৃ. ৯ ক)। যেমন, সাতগাম 'সরকার' ছিল হুগলী 'চাকলা'র অংশ (Add. 24,039, পৃ. ৩৬ ক)।

১৯. 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৯ খ, Or. 2026, পৃ. ৩৪ ক-খ। তুলনীয় লাহোরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৭, ১৫-তম বছরের অধীনে, "সিরহিন্দ 'চাকলা'-র ফৌজদার ও আমিন", রায় তোডর মলের উল্লেখ। তোডর মল ঐ জেলার খালিসা জমির দায়িত্বে ছিলেন। 'দস্তুর-আল আমল-এ আলমগীরী', পৃ. ৩৩ ক-এ ঘোষণা করা হয়েছে যে ক্ষমতার দিক দিয়ে 'আমিন' ছিল 'আমিল'-এর চেয়ে বড়।

২০. ১৭ শতকে, বাস্তব ক্ষেত্রে এই ধরনের ইজারার উল্লেখের একান্ত অভাব দেখা যায়। তার ভিত্তিতেই এ কথা বলা হচ্ছে। 'ওয়কাই-এ আজমীর', ২০৯ ও ৩৫৯-এ দুটি উদাহরণ আছে যেখানে যেসব জাগীরদারের বরাত খোয়া গিয়েছিল তারা খালিসা থেকে একই এলাকা ইজারা পেয়েছে বা পাওয়ার চেষ্টা করেছে। আওরঙ্গজেবের জারি-করা একটি আদেশনামায় ঘোষণা করা হয়েছে যে বাংলায় 'খালিসা'-র পরগনাগুলো ইজারাদারদের ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। আদেশনামায় এই রীতি পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর চলতি নাম ছিল 'ইজারা', কিন্তু এই নথিতে লক্ষ্য করা হয়েছে যে বাংলায় এর নাম ছিল 'মাল-জামিনী' ('আহ্কম-এ আলমগীরী', পৃ. ২০৭ ক-খ)।

সম্ভবত ফাররুকসিয়ারের রাজত্বে, সৈয়দ ভাইদের নেতৃত্বে, প্রথম ব্যাপকভাবে খালিসা ইজারা দেওয়া হয় (খাফী খান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৭৩)। মুহম্মদ শাহের কাছে নিজামুল মুল্‌ক্‌ যে সংস্কারের পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন তার পয়লা দফাই হলো "খালিসার 'মহাল'গুলো ইজারা, যার ফলে দেশ উচ্ছন্ন ও ধ্বংস হয়ে গেছে" তার অবলোপ (ঐ, ৯৪৮)। তুলনীয় শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ্‌, 'সিয়াসী মকতুবাৎ', ৪৩।

২১. জে. জেভিয়ার, হুস্টেন অনু., *JASB*, N. S., ২৩ (১৯২৭), পৃ. ১২১ ; বার্নিয়ে, ২২৪।

অসমীচীন মনে হলো। নিয়ম করা হলো : শুধুমাত্র আগের বছরের প্রাপ্ত রাজস্বের তুলনায় কোন বছরের রাজস্ব কমে গেলে তবেই তাদের কৈফিয়ৎ তলব করা হবে।[২২] 'আমিন'-এর থেকে 'করোড়ী'র কাজ আলাদা করে দেওয়ার পর 'করোড়ী' শুধু এই কথাই দিত যে সে শুধু আমিনের নির্ধারিত পরিমাণটুকু আদায় করে দেবে।[২৩] আমিন সম্ভবত আরও কঠোর ও দক্ষ উপায় প্রয়োগের দাবি করে নির্ধারণের পরিমাণ বাড়ানোর অঙ্গীকার করত।[২৪] অবশ্য এও বলা হয়েছে যে বহু আমিন প্রথমে শুধু তাদের অঙ্গীকারের শর্ত পূরণ করার জন্য বেশি মাত্রায় রাজস্ব নির্ধারণ করত, তারপর নানান ছুতোয় প্রচুর ছাড় দিত।[২৫] তাছাড়া একটি দলিল থেকে আভাস পাওয়া যায় যে খালিসা-র নিয়ম-কানুন অনুযায়ী 'তাহুদ' এবং প্রকৃত আদায়ীকৃত রাজস্বের অন্তর আমিল-এর কাছ থেকে আদায় করা যেত না, যদিও তার স্বীকৃত পরিমাণ আদায় করতে না পারলে তাকে বরখাস্ত করা যেত।[২৬]

'আমালগুজার'-এর বেতন সম্পর্কে 'আইন'-এ কিছুই বলা হয়নি। কিন্তু পরবর্তী একটি সূত্র থেকে জানা যায় যে শাহ্‌জাহানের আমলে এর পরিবর্তন হওয়ার আগে পর্যন্ত করোড়ীকে তার নিজের জন্য ও তার কর্মচারীদের জন্য মোট আদায়ের শতকরা ৮ ভাগ

২২. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৭ (মীর ফত্‌হুউল্লাহ্ শিরাজীর সুপারিশ)। তিন বছর আগে তোডর মল খেয়াল করে এই নিয়ম করেছিলেন যে কোন 'আমিল' যদি তার দায়িত্বাধীন এলাকার মোট 'জমা' বাড়াতে পারে তাহলে তার অধীনস্থ কোন বিশেষ 'মহাল'-এর 'জমা' কমে যাওয়ার জন্য তার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করা চলবে না (ঐ, ৩৮২)।

২৩. 'সিয়াকনামা', ৫০-এ একজন 'করোড়ী'র 'তাহুদ'-এর বয়ান দ্রষ্টব্য। এই বিশেষ কর্মচারী-টির কর্তব্য ও ভূমিকার জন্য ১৭ নং টীকায় উদ্ধৃত তথ্যসূত্রগুলোও দ্রষ্টব্য। এগুলোর মধ্যে অনেক কটিতেই এই বিশেষ বিষয়টির ওপর সুস্পষ্ট বক্তব্য আছে।

২৪. 'সিয়াকনামা', ২৮-এ আমিন-এর 'তাহুদ'-এর যে-বয়ান আছে তাতে কোন বিশেষ পরিমাণ উল্লেখ করা নেই। 'আমিন' শুধু "বাস্তব অবস্থা ('মউজুদাৎ') এবং (প্রতিষ্ঠিত) শস্য-হার ('রাই-এ জিন্‌স্')" অনুযায়ী রাজস্ব নির্ধারণ করার কথা দিচ্ছে।

২৫. রসিকদাসের উদ্দেশে আওরঙ্গজেবের ফরমানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে কর্মচারীরা ('মুৎসদ্দিয়ান') সাধারণত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ছুতোয় 'জমা' থেকে প্রচুর ছাড় দেয়। 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ৮৬ খ-৮৭ ক, Bodl. পৃ. ৬৪ ক, Ed. 69-এ দিওয়ান এনায়েৎ খানের কাছে পাঠানো একটি চিঠি আছে। দুজন আমিন তাদের কবুল পূরণ করা সত্ত্বেও তাদের ছাঁটাই করার বিরুদ্ধে এখানে অভিযোগ করা হয়েছে। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে যে, "সেই সমস্ত লোক, যারা বছরের শুরুতে বাড়ানোর ('ইজাফা') কবুল করে, কিন্তু বছরের শেষে হিসাব উল্টে দেয়, তাদের ভালো কাজের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করা চলবে না।" এখানে কিসের কথা বলা হচ্ছে—খালিসা না শাহ্‌জাদা মুয়জ্জমের জাগীর—তা স্পষ্ট নয়।

২৬. 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', Bodl. পৃ. ৫৩ ক, Ed. 58. 'তাহুদ' এবং আদায়ের মধ্যে তফাৎ হয়েছে বলে জনৈক 'আমিন'-এর বিরুদ্ধে শাহ্‌জাদা মুয়জ্জমের কর্মচারীরা যে অভিযোগ করেছিল এই চিঠিতে তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। নিন্দা করে বলা হয়েছে এটি "কোন নিরীক্ষাই নয়", এবং জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে "কোন 'আমিল'-এর কাছ থেকেই 'তাহুদ' অনুযায়ী রসিদ

দেওয়া হতো।[২৭] আমিন-এর পদ তৈরি হওয়ার পর এটি কমিয়ে শতকরা পাঁচ ভাগ করা হয়, পরে আরও কমে যেতে পারে[২৮]—এমনও বলা থাকত। কিন্তু বিভিন্ন এলাকায় এই হারের হেরফের হতো বলেই মনে হয়।[২৯] এই ভাতার একের-পাঁচ ভাগ[৩০] —বা, অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে, রাজস্বের শতকরা এক ভাগ[৩১]—হিসাব নিরীক্ষা না হওয়া অবধি আটকে রাখা হতো। আকবরের আমলে সাধারণত বকেয়া রাজস্ব আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমিল-এর ভাতার একের-চার ভাগ আটকে রাখা হতো।[৩২] কিন্তু পরের আমলে, মনে হয়, আগের বছরগুলোর বকেয়ার ওপর ভাতার পুরোটা বরাদ্দ করাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৩৩] আমিন কী করে তাঁর মাইনে পেতেন তা খুব স্পষ্ট নয়।

দাবি করা হয়নি।" সবশেষে বলা হয়েছে যে, শাহ্‌জাদার 'সরকার'-এর নিয়মাবলীর সঙ্গে সঙ্গে খালিসা-র নিয়মও মেনে চলতে হবে। ধরে নেওয়া যায় যে খালিসা-র নিয়ম লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিকেই সমর্থন করত।

২৭. 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৯ ক-তে পাঠ আছে শতকরা ২০ ভাগ, যে-অঙ্কটি অবশ্যই খুব বেশি। Or. 2026, পৃ. ৩৩ ক-তে এর জায়গায় আছে ৮%। ফার্সী লেখায় এই দুটি সংখ্যার জন্য যে-দুটি শব্দ আছে তা সহজেই বদলে যেতে পারে, তাই শেষের পাঠটি নেওয়া হয়েছে। 'করোড়ী'র ভাতার পারিভাষিক নাম ছিল 'হুকুকুৎ তহ্‌সীল'।

২৮. 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৯ খ, ৮৪ খ, ৮৬ খ; Or. 2026, পৃ. ৩৪ ক-খ, ৪২ ক, ৪৫ খ-৪৬ খ। প্রধান ছাড় ছিল, মনে হয়, 'সাইর', যার পরিমাণ হতো মোট ভাতার শতকরা ১৭ ভাগ। পুস্তিকার বয়ান থেকে এটি ততটা পরিষ্কার বোঝা যায় না, কিন্তু খসড়া হিসাবে স্পষ্টই এটি দেখানো আছে। আরও তুলনীয় 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', Bodl. পৃ. ৯৪ খ, Ed. 94. 'খুলাসতুস সিয়াক'-এর হিসাব থেকে আরও দেখা যায় যে 'করোড়ী'দের দেওয়া ভাতার মধ্যে রাজস্বের শতকরা একভাগ ছিল তাদের ব্যক্তিগত বেতন ('জাত') এবং শতকরা চার ভাগ ছিল তারা যে সব কর্মচারী ('মাহিয়ান') নিযোগ করত তাদের মাইনে।

২৯. এইভাবে, একটি বিশেষ পরগনার জন্য 'সাইর' ছাড় দেওয়ার পর হার দেখানো হয়েছে আদায়ের শতকরা ৭ ভাগ ('নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ১২২ ক, Bodl. পৃ. ৯৪ ক-খ, Ed. 94)। 'করহঙ্গ-এ করদানী'-তে, Edinburgh No. 83, পৃ. ৫৫ ক-খ, এটিকে শতকরা ৫½ হারে ৩ টাকা বলে দেখানো হয়েছে।

৩০. 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৮৬ খ, Or. 2026, পৃ. ৪৬ ক।

৩১. 'খুলাসতুল ইন্‌শা', পৃ. ১১২ ক। তুলনীয় 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ১২২ ক-খ, Bodl. পৃ. ৯৪ ক, Ed. 94, সেখানে বলা হয়েছে, শাহজাদা মুয়জ্জমের "সরকার-এর নিয়মাবলী অনুযায়ী।"

৩২. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৮। ফত্‌হুউল্লাহ্‌ শিরাজী সুপারিশ করেছেন যে 'আমাল-গুজার'-এর কর্মচারীদের বেতন প্রাক্তন 'আমিল'দের ফেলে যাওয়া বকেয়া খরচের খাতে লেখা না, কারণ তা আদায় করা শক্ত (ঐ)।

৩৩. 'খুলাসতুল ইন্‌শা', পৃ. ১১২ ক। এখানে শুধু বলা আছে 'বকেয়া', কিন্তু 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী' (পূর্বোক্ত সূত্র)-র সনদে একটু এগিয়ে বলা হয়েছে যে ভাতাগুলো প্রথমে বাদ দিতে হবে আগের বছরের বকেয়া থেকে ('বকায়া-এ সনওয়াৎ'), তারপর শুধুমাত্র চলতি বকেয়া থেকে। স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে খালিসার নিয়মের সঙ্গে এর সঙ্গতি আছে।

একটি পুস্তিকা থেকে মনে হয় তিনিও প্রাপ্ত রাজস্বের অল্প একটা শতকরা ভাগ পেতেন,[৩৪] কিন্তু আরও আগের একটি নথিতে দেখা যায় খালিসা-র নিয়ম অনুযায়ী আমিনকে একটা বাঁধা মাস-মাইনে দেওয়া হতো।[৩৫]

অনেক ক্ষেত্রেই, গ্রামের পাটওয়ারীদের কাগজপত্রের সাহায্যে আমিল ও তার প্রতিনিধিদের প্রকৃত আদায়ের হিসাব নিরীক্ষা করা হতো।[৩৬] প্রধানত বেআইনী আদায় বন্ধ করার উদ্দেশ্যে আকবরের আমলে মীর ফত্‌হুউল্লাহ্ শিরাজী এই রীতির সুপারিশ করেন।[৩৭] অন্যদিকে, শাহ্‌জাহানের কর্মচারীরা, মনে হয়, শুধু এই দেখতেন যেন ঐ ধরনের সমস্ত আদায় (অনুমোদিত বা অননুমোদিত) বাদশাহের কোষাগারে জমা পড়ে। যাই হোক, বলা হয়েছে যে 'বরামদ' নামে পরিচিত হিসাব নিরীক্ষার এই পদ্ধতিকে তাঁরা বাঁধা প্রশাসনিক কাজের অংশ করে নিয়েছিলেন।[৩৮]

বরখাস্ত করার পর আমিলদের হিসাবপত্র খুব খুঁটিয়ে নিরীক্ষা করা হতো। কিন্তু সে কাজে সময় লাগত; হতভাগ্য কর্মচারীরা ততদিন তাদের কাছ থেকে পাওনার ব্যাপারে ফয়সালার অপেক্ষায় কয়েদে পড়ে থাকত।[৩৯] আওরঙ্গজেব আদেশ দিয়েছিলেন

৩৪. 'ফরহঙ্গ-এ করদানী', Edinburgh No. 83, পৃ. ৫৫ ক। হার দেখানো হয়েছে শতকরা ১০½ ভাগ হারে ১ টাকা।

৩৫. 'সিলেকটেড ডকুমেন্টস···', পৃ. ১৭৯। "'খাসা-এ শরীফা'-র নিয়মকানুন অনুযায়ী" মাইনে হতো মাসিক ১২০ টাকা। 'খাসা' এবং খালিসা' শব্দ দুটি প্রায়ই পরস্পরের পরিবর্তে ব্যবহার হতো।

৩৬ এ কথা অবশ্যই মনে করা ঠিক নয় যে গ্রামের কাগজপত্রে সর্বদাই বাস্তব অবস্থা প্রকাশ পেত। শের শাহ্ নাকি সুপারিশ করেছিলেন যে 'আমিল'দের হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য যেসব লোককে পাঠানো হবে, 'মুকদ্দম'রা কোন খবর পাওয়ার আগেই তারা যেন গ্রামের কাগজপত্র দখল করে (আব্বাস খান, পৃ. ১৮ ক-খ)। আরও তুলনীয় এলিয়ট, 'ক্রনিকল্‌স্ অফ উনাও', ১০৮-৯ টীকা।

৩৭. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৭-৮।

৩৮. 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৯ ক, ৯১ খ, Or. 2026, পৃ. ৩৪ ক, ৫৯ ক-খ। আরও তুলনীয় রসিকদাসের উদ্দেশে ফরমান, অনু. ১১; 'সিয়াকনামা', ৭৫-৭৬, 'ওয়াকাই-এ আজমীর', ২৭-২৮, ৩২, ৩৮, ৪৪-৪৫।

৩৯. তোডর মলের হাতে করোড়ীদের অবস্থার জন্য দ্রষ্টব্য বদাউনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৯-৯০; ৩য় খণ্ড, ২৭৯-৮০। ৩০-তম বছরে ফত্‌হুউল্লাহ্ শিরাজী জানিয়েছেন, আমিলরা যে সর্বোচ্চ রাজস্ব বা, যে রাজস্ব আদায় করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তা আদায় করতে না পারার জন্য বহু আমিলকে কয়েদ করা হয়েছে ('আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৭)। কয়েকজন 'করোড়ী' বিশ বছরের বেশি সময় আটকে ছিলেন। সাদউল্লাহ্ খান মারা যাওয়ার পর শাহ্‌জাহান তাদের ছেড়ে দেওয়ার আদেশ দেন ('চার চমন-এ বরহামন', Add. 16,863, পৃ. ৩২ ক)। আওরঙ্গজেব তাঁর আদেশনামাগুলোতে বলেছিলেন যে খালিসা-র টাকা তছরুপের সন্দেহে যে-সব আমিল ও অন্যান্যদের বন্দী করে রাখা হয়েছে তাদের মামলাগুলোর যেন দ্রুত নিষ্পত্তি করা হয় ('দুর-আল উলুম', পৃ. ৫৮ ক-৫৯ খ; 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৪, ২৮২-৩)।

যে তছরুপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হলে তাদের ব্যক্তিগত ভাতার সবটাই এবং তাদের কর্মচারীদের ভাতার তিনের-চার ভাগ নিয়ে নেওয়া হবে।[৪০]

করোড়ী ও আমিন ছাড়াও, প্রতি পরগনায় আরও দুজন কর্মচারী নিয়োগ করা হতো। তারা হলো 'ফোতাদার' বা 'খিজানা-দার' অর্থাৎ কোষাধ্যক্ষ[৪১] এবং 'কারকুন' বা 'বিতিকচী' অর্থাৎ হিসাব-রক্ষক।[৪২] শের শাহের অধীনে দুজন 'কারকুন' ছিল: হিন্দীতে হিসাব রাখার জন্য একজন, অন্যজন ফার্সীতে।[৪৩] বলা হয়, তোডর মলই নাকি ফার্সীকে হিসাবের একমাত্র ভাষা করেছিলেন।[৪৪] আকবরের রাজত্বের ২৭-তম বছরে আমিল-এর সঙ্গে যুক্ত দুজন বিতিকচী-র বদলে তিনি রেখেছিলেন মাত্র একজন—এই ঘটনাটি তার দরুনও হয়ে থাকতে পারে।[৪৫]

'পাইবাকী' অর্থাৎ জাগীরদারদের পুনর্বরাত দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে রক্ষিত জমি মূলত খালিসা-রই অংশ ছিল, যদিও প্রশাসনিক সুবিধার জন্য অন্য একটি বিভাগে রাখা থাকত। অবশ্য, এর প্রশাসন হতো খালিসা-রই ধাঁচে। সেই তিনজন মুখ্য কর্মচারী—আমিন, করোড়ী ও ফোতাদার—নিয়োগ করা হতো, সমস্ত হিসাব ও নথিপত্র তৈরির ক্ষেত্রে খালিসা-র নিয়মকানুনই মানা হতো।[৪৬] তার ওপর 'পাইবাকী'র সমস্ত প্রশাসনই ছিল কেন্দ্রীয় 'দিওয়ান-এ খালিসা'র নিয়ন্ত্রণে।[৪৭]

৪০. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৪ ; 'দুর আল উলূম', পৃ. ৮৩ ক-খ।

৪১. এর কার্যভারের জন্য দ্রষ্টব্য 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৯ ; হরকরণ, ৫৪, ৫৬ ; 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ১৭৭ ক-খ, Bodl. পৃ. ১৪১ খ-১৪২ ক ; Ed. 137 ; 'দুর-আল উলূম', পৃ. ১৩৭ খ।

৪২. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৮ ; হরকরণ ৫৬, ৫৮ ; 'দুর-আল উলূম', পৃ. ১৩৭ ক-খ।

৪৩. মুশ্‌তাকী, Or. 1929, পৃ. ৪৯ ক ; আব্বাস খান, পৃ. ১০৬ ক-খ। শের শাহের যেসব ফরমানে 'মদদ-এ মআশ' জমি মঞ্জুর করা হয়েছে, তার একটি বিচিত্র লক্ষণ এই যে, ('ওরিয়েণ্টাল কলেজ ম্যাগাজিন', ৯ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, মে ১৯৩৩-তে প্রকাশিত ফরমান দুটিতে যেমন দেখা যায়) ফার্সী বয়ানের পর নাগরী হরফে সেই বয়ানই দেওয়া হয়েছে, যারা আরবী হরফ পড়তে পারে না স্পষ্টতই তাদের সুবিধার্থে।

৪৪. সুজান রায়, ৪০৯ ; 'খুলাসতুল ইনশা', পৃ. ১১৫ ক, 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৬৫ ক, Or. 2026, পৃ. ৪ খ।

৪৫. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, ৩৮১ (Add. 27, 247, পৃ. ৩৩১ খ): এও লক্ষণীয় যে পুরোপুরি ফার্সীতে কাজকর্ম শুরু হওয়ার সময় প্রসঙ্গে 'খুলাসতুস সিয়াক' (পূর্বোক্ত সূত্র) এ বলা হয়েছে আকবরের রাজত্বের ২৭-তম বছর, আর 'খুলাসতুল ইন্‌শা' (পূর্বোক্ত সূত্র)-য় বলা আছে ২৮-তম বছর।

৪৬. 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৮৯ খ, Or. 2026, পৃ. ৫১ ক। তুলনীয় 'ওয়কাই-এ আজমীর', ২৭-২৮, ৩২, ৪০১ : পৃ. ২৭, ২৮ এবং ৩২-এ যে সব কর্মচারী 'পাইবাকী'-র দায়িত্বে ছিলেন বলা হয়েছে, তাদেরই আবার পৃ. ২৭ ও ৩৮-এ নির্বিচারে খালিসার কর্মচারী আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

৪৭. আজমীর প্রদেশের বিশেষ কয়েকটি 'পাইবাকী' 'মহাল'-এর রাজস্ব কর্মচারীদের কাজকর্ম পরীক্ষা করেছিলেন ঐ প্রদেশে খালিসা-র সব কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষক ('বর-আমদ নবীশ')

আয়তনের দিক থেকে 'খালিসা-এ শরিফা'র পরেই ছিল রাজবংশের শাহ্জাদাদের জাগীর। শাহ্জাদারা সবচেয়ে উঁচু 'মনসব' পেতেন। খানদানী লোককে সর্বোচ্চ যে-মনসব দেওয়া যেতে পারত, শাহ্জাদাদের মনসব প্রায়ই হতো তার বহুগুণ বেশি। স্বভাবতই তাঁদের বরাতী জাগীরও হতো বিশাল।[৪৮] শাহ্জাদার 'সরকার'[৪৯]-এর প্রশাসনিক কাঠামো সাধারণভাবে প্রায় খালিসা-র ধাঁচেই তৈরি হতো। সাধারণত এখানকার আমিলদের বলা হতো 'করোড়ী'.[৫০] তাদের সঙ্গে থাকত সেই একই কর্মচারী : 'আমিন', 'ফোতাদার' ও 'কারকুন'।[৫১] জনৈক শাহ্জাদার দপ্তরের কিছু নথিপত্রে স্পষ্টই বলা আছে যে, নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে তাঁর 'সরকার'-এ খালিসা-র নিয়মই প্রযোজ্য

কোন 'পাইবাকী' কর্মচারীর আচরণে সন্তুষ্ট না হলে তিনি কেন্দ্রীয় 'দিওয়ান-এ খালিসা'-র কাছে একটি প্রতিবেদন পাঠাতেন। কেন্দ্রীয় 'দিওয়ান'-এর বিষয়বস্তু বাদশাহ্কে জানাবেন বলে আশা করা হতো ('ওয়কাই-এ আজমীর', ১১, ২৭-২৮)।

৪৮. শাহ্জাহানের রাজত্বের ২০-তম বছরে দারা শুকোহ্ ছিলেন ২০,০০০ 'জাত'. ২০,০০০ 'সওয়ার', ১০,০০০ 'দো-অস্‌পা সিহ্-অস্‌পা'-র অধিকারী আর সেই অনুযায়ী তাঁর বেতন হতো ৪০ 'করোড়' 'দাম' (লাহোরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১৫), অর্থাৎ তদানীন্তন খালিসা-র 'জমা'র একের-তিন ভাগ। শাহ্জাহানের রাজত্বের ৩০-তম বছরের মধ্যে তাঁর পদ বাড়িয়ে করা হয় ৪০,০০০ 'জাত'. ২ ,০০০ 'সওয়ার', ২০,০০০ 'দো-অস্‌পা সিহ্-অস্‌পা'। সেই সময়ে তাঁর ভাই শুজা ও আওরঙ্গজেব দুজনেই ২০,০০০/১৫,০০০/১০,০০০ পদের অধিকারী ছিলেন, আর মুরাদের পদ ছিল ১৫,০০০/১২,০০০/৮,০০০ (ওয়ারিস, ক: পৃ. ৫২৩ খ, খ: পৃ. ২০০ ক)। কোন অভিজাতকে সর্বোচ্চ যে-পদের অনুমতি দেওয়া হতো তা হলো ৭,০০০ 'জাত', ৭০০০ 'সওয়ার' (লাহোরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২১; 'আলমগীরনামা', পৃ. ৬১৮)।

৪৯. আলোচ্য পর্বের লেখাপত্রে, শাহ্জাদা বা অভিজাতদের প্রশাসনের ক্ষেত্রে 'সরকার' শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার হতো (তুলনীয় 'মিরাৎ-অল ইশ্‌তিলাহ্', পৃ. ১৬৭ খ)। এটিকে কিন্তু আঞ্চলিক একক 'সরকার'-এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না।

৫০. তুলনীয় 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ১৬৯ ক; 'সিলেকটেড ডকুমেন্টস্…', পৃ. ১২১; 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ১১১ ক-১১২ ক; Bodl. পৃ. ৮৫ খ-৮৬ খ, Ed. 86-87 এবং আরও অন্যত্র। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, শাহ্জাদাদের তরফে জারি-করা আদেশগুলোকে 'হসবুল অম্‌র্' এই সূত্রে দিয়ে চেনা যায়। দরবারের কর্মচারীদের মাধ্যমে জারি-করা বাদশাহী আদেশগুলোর থেকে এগুলো আলাদা। সেগুলোকে বলা হতো 'হসবুল হুকুম্'।

৫১. আমিন-এর জন্য 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ১১০ ক-১১১ ক, Bodl. পৃ. ৫৩ ক খ, ৮৫ ক-খ, Ed. 58, 85-6; খাজাঞ্চীর জন্য ঐ, পৃ. ১১৪ খ, Bodl. পৃ. ৮৮ খ, Ed. 87 এবং কারকুন-এর জন্য ঐ, পৃ. ১১৬ খ, Bodl. পৃ. ৯০ খ, Ed. 90 দ্রষ্টব্য। শাহ্জাদাদের জাগীরেও আমিন এবং ফৌজদারের যুক্ত দপ্তর চালু ছিল, দ্রষ্টব্য ঐ, পৃ. ১০১ ক-১০২ ক; Bodl. পৃ. ৭৬ খ, ৭৮ ক, Ed. 79-80; 'দুর-আল উলূম', পৃ. ১৩৮ খ-১৩৯ ক। শাহ্জাদাদের জাগীরে 'তাহুদ' আদায়ের জন্য দ্রষ্টব্য 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', Bodl. পৃ. ৫৩ ক, Ed. 58; 'মতিন-আল ইন্‌শা' পৃ. ৩৮ খ-৩৯ ক।

হবে।[৫২] তা হলেও, এখানে-ওখানে খালিসা-র রীতির কিছু হেরফের চোখে পড়ে। যেমন, শাহ্‌জাদা মুয়াজ্জম-এর জারি করা একটি আদেশনামা ('অমর') পাওয়া যায় যাতে বলা হয়েছে, তাঁর সব জাগীরে আমিন এবং করোড়ীর পদ এক করে দেওয়া হবে এবং একজন লোকই সেই পদে থাকবেন।[৫৩]

শাহ্‌জাদারা নিজেদের বরাত থেকে কখনও কখনও তাঁদের নিজস্ব কর্মচারীদের জাগীর মঞ্জুর করতেন।[৫৪] ঐ ধরনের দর-বরাতের জন্য বাদশাহী অনুমোদনের প্রয়োজন হতো—এমন ভাবার কোন কারণ নেই। শাহ্‌জাদাদের জাগীর বদলের সঙ্গে সঙ্গে সেই কর্মচারীদেরও সম্ভবত সেই জায়গায় বদলি করে দেওয়া হতো।

জাগীরের দেখাশুনা করার জন্য সাধারণ বরাতী যে সব ব্যবস্থা নিত কদাচিৎ তা একই ছক মেনে চলত। তার বরাত সময়ে-সময়ে বদল করে দেওয়া হতো, সে নিজেও বিভিন্ন জায়গায় বদলি হতে পারত। তাই 'জাগীরদার' সাধারণত তার হয়ে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করার জন্য প্রতিনিধি বা গোমস্তা পাঠাত।[৫৫] স্বাভাবিকভাবেই, বরাতীর পক্ষে নিশ্চয়ই (এক বা পাশাপাশি 'মহাল'-এ কেন্দ্রীভূত বরাতের চেয়ে) ছড়িয়ে-থাকা একাধিক বরাত চালানো আরও কঠিন ও খরচের ব্যাপার হতো।[৫৬] একটা পরগনাকে কয়েকটি জাগীরে বরাত করার (যার পারিভাষিক নাম, 'মুতাফারিকা আমল') ফল খুবই মারাত্মক হয় বলে ধরা হতো। সরকারও যতদূর সম্ভব একজন বরাতীকেই পরগনার পুরোটা ('দরবস্ত') মঞ্জুর করা পছন্দ করত।[৫৭] যেসব 'মহাল'-এর সব লোক ঠিক বংশবদ ছিল না, বিশেষ করে সেখানকার জন্যই এই নিয়ম ঠিক করা

৫২. যেমন, 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ১০৭ খ, ১২২ খ, Bodl. পৃ. ৫৩ ক, ৮৩ ক, ৯৪ খ, Ed. 58, 84, 94.

৫৩. ঐ, পৃ. ৯৮ খ-৯৯ ক, Bodl. পৃ. ৭৪ খ, Ed. 77.

৫৪. দ্রষ্টব্য 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ২৩৮। শাহ্‌জাদা শাহ্‌জাহানকে 'ইনাম' হিসেবে একটা পরগনা বরাত দেওয়া হয়েছিল, যাতে তিনি "তাঁর একজন প্রধান ভৃত্য" ('বান্দা-হা-এ উমদা'), রাজা বিক্রমজিৎকে এটি জাগীর হিসেবে বরাত দিতে পারেন। শাহ্‌জাদা মুয়জ্জমের 'সরকার'-এ জাগীর বরাত এবং তা ফিরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে জারি করা আদেশনামার জন্য দ্রষ্টব্য 'নিগর-নামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ১১৮ ক-১২১ খ, Bodl. পৃ. ৯১ ক-৯৩ ক, Ed. 91-93.

৫৫. তুলনীয় হকিন্স, 'আর্লি ট্রাভেলস্', পৃ. ৯১ ; পেলসার্ট, ৫৪।

৫৬. তুলনীয় 'ফথিয়া-এ ইব্রিয়া', পৃ. ১১৭ ক-খ। এতে বলা হয়েছে যে, বাংলায় শায়েস্তা খানের নিয়োগের সময় জাগীরদারদের অধিকৃত বরাতগুলো সাধারণত কয়েকটি 'মহাল' জুড়ে ছড়িয়ে থাকত। এর ফলে তাঁরা বহুসংখ্যক শিকদার ও আমিল নিয়োগ করতে বাধ্য হতেন এবং খুবই ক্ষতি হতো। 'জমি-আল ইন্‌শা', Or. 1702, পৃ. ৫৩ ক-র একটি চিঠিতে জনৈক মুখলিস খান আশা করেছেন যে তাঁর বেতন বাড়ার ফলে তাঁকে যে-জাগীর বরাত দেওয়া হবে তা যেন "অন্য কোন জায়গায়" না দেওয়া হয়, কারণ তাহলে তাঁকে অনেক আমিল রাখার হাঙ্গামা পোয়াতে হবে।

৫৭. 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ১১৭ ক ; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', পৃ. ১২৬-৭ ; 'ফথিয়া-এ ইব্রিয়া', পৃ. ১১৭ ক-খ।

হয়েছিল।[৫৮] এরই অনিবার্য ফল হিসেবে ছোট বরাতীদের উপদ্রুত বা বিদ্রোহী এলাকায় জাগীর দেওয়া হতো না।[৫৯]

জাগীরদারের নিযুক্ত মুখ্য প্রতিনিধি ছিল আমিল। তাকে শিকদারও বলা হতো।[৬০] খালিসা বা শাহ্‌জাদারা যত কর্মচারী রাখতেন, খুব অল্প বরাতীর পক্ষেই তত লোক রাখা সম্ভব হতো। বোধ হয়, শিকদারের ঘাড়েই 'আমিন'[৬১] এবং/অথবা খাজাঞ্চীর[৬২] কাজ প্রায়শই চাপানো হতো। একটি পরওয়ানার নমুনায় এমনও দেখা যায় যে একজনমাত্র লোককেই "জাগীরের 'মহাল'গুলোর আমিন, শিকদার, কারকুন এবং ফৌজদার-এর কাজে" নিয়োগ করা হচ্ছে, তার সহকর্মী শুধু খাজাঞ্চী।[৬৩]

সম্ভবত, খালিসা-য় যেমন হতো, জাগীরদাররাও তেমনি তাদের গোমস্তাদের কাছ থেকে ভাবী আদায় কবুল করিয়ে নিত। কিন্তু এছাড়াও সাধারণত কিছু আগামও নেওয়া হতো, যার নাম ছিল 'কবৃজ্'। মনে হয়, জাগীরদারকে আরও বেশি 'কবৃজ্'-এর প্রস্তাব দিয়ে একজনকে সরিয়ে আরেক জনকে 'আমিল' করার ঘটনা আকছারই দেখা

৫৮. 'কালিমৎ-এ তইয়াবাৎ', পৃ. ৯৮ ক-য় এই মর্মে আওরঙ্গজেবের একটি মন্তব্য রক্ষিত আছে যে মির্তা-য় যেহেতু কেবল রাজপুত চাষীই আছে, তাই এটিকে সবসময় 'দর-বস্ত' বরাত দেওয়া হবে এবং কখনোই 'মুতাফর্‌রিকা আমল'-এর অধীন করা হবে না।

৫৯. 'হিদায়েৎ-আল কোয়াইদ', পৃ. ৩ খ। এতে বলা হয়েছে যে 'নাজিম' বা প্রদেশকর্তার জাগীরের একের-চার ভাগ হবে 'জোর-তলব', অর্থাৎ রাজদ্রোহী 'মহাল'-এ, আর বাকিটা হবে মাঝারি 'মহাল'-এ। দিওয়ান, বখ্‌শী এবং বড় মনসবদারের জাগীরের অর্ধেক দেওয়া হবে মাঝারি 'মহাল'-এ, অর্ধেক রাইয়তী 'মহাল'-এ (অর্থাৎ স্পষ্টতই যেখানে বিনীত, রাজস্ব-প্রদায়ী চাষীদের বাস)। ছোট মনসবদারদের জাগীরের একের-চার ভাগ দেওয়া হবে মাঝারি 'মহাল'-এ, বাকিটা 'রাইয়তী মহাল'-এ।

৬০. I.O. 4434 একটি 'পরওয়ানা', ১৬৫৮-র নভেম্বরে এটি জারি করেছিলেন জনৈক লস্কর খান। এর মাধ্যমে মুলতান প্রদেশে তাঁর এক বরাতী পরগনায় একজন 'শিকদার' নিয়োগ করা হয়েছিল। আরও তুলনীয় হাদিকী, Br. M. Royal 16 B XXIII, পৃ. ১৪ ক; 'বিয়াজ-আল-ওয়াদাদ', পৃ. ১১ ক; 'দুর্‌-আল উলুম', পৃ. ১৩৭ ক। এইসব নথিপত্র এবং খালিসা-র শিকদার-এর অবস্থা সম্পর্কে সদ্য উদ্ধৃত নজিরটি থেকে সন্দেহাতীতভাবে দেখা যায় যে শিকদার ছিল রাজস্ব কর্মচারী। সুতরাং ডঃ শরণের এই বক্তব্য মানা সম্ভব নয় যে, সে ছিল "শাসন-বিভাগের কর্মচারী", রাজস্ব আদায়ের "সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়" ('প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট…', পৃ. ২৯১)।

৬১. হাদিকী, পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ১৫ ক-১৬ ক। এক্ষেত্রে শিকদার বা আমিল-এর সঙ্গে থাকত কারকুন এবং ফোতাদার। রাজস্ব নির্ধারণের জন্য সে একজন আমিল চেয়ে পাঠায়, কিন্তু কাজটি তাকেই করতে বলা হয়।

৬২. দ্রষ্টব্য I.O. 4434: এর বিষয়বস্তু থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে শিকদারকে নির্ধারক এবং খাজাঞ্চী—দুএর কাজই করতে হতো।

৬৩. 'দস্তুর-আল আমল-এ নভিসিন্দগী', পৃ. ১৯৪ ক-১৯৫ ক।

যেত।[৬৪] অন্যদিকে, জাগীরদারের পক্ষে আমিলকে বশে রাখা বা তার পাওনা রাজস্বের তছরুপ আটকানো কখনো কখনো খুবই শক্ত হতো, বিশেষ করে তার কাজ যদি হতো অন্য প্রদেশে।[৬৫]

বহু বরাতীই তাই তাদের বরাত ইজারা দেওয়াটাই আরও সহজ মনে করত।[৬৬] এই রীতিকে বিরাট অত্যাচারের মূল কারণ বলে মনে করা হতো, কেননা ইজারাদাররা কাজ পাওয়ার জন্য খুব উঁচু দর হাঁকত, তারপর চাষীদের কাছ থেকে সম্ভাব্য সব রকম উপায়ে টাকা আদায় করে মোটা লাভ করতে চাইত।[৬৭] জাগীরে কতটা ইজারাদারি চলত তা ঠিকমতো বলা কঠিন। প্রশাসন সংক্রান্ত লেখাপত্রে এর উদাহরণ খুব সুলভ নয়। তবে গোলকুণ্ডা রাজ্যে যে-অবস্থা চলছিল তেমন নিশ্চয়ই আর কোথাও চলত না।[৬৮] তবুও অযোধ্যার জাগীরগুলোতে ইজারা সংক্রান্ত কিছু দলিলপত্র আমাদের হাতে আছে।[৬৯] তাছাড়া, এও সম্ভব যে বহু ক্ষেত্রেই প্রচ্ছন্নভাবে ইজারাদারির চল ছিল, আর নামে যদি

৬৪. 'দিলকুশা', পৃ. ১৩৯ ক।

৬৫. ইজাদ বখ্শ্ 'রসা' তাঁর চিঠিপত্রে প্রায়ই তাঁর আমিলদের অসৎ আচরণের উল্লেখ করেছেন, 'রিয়াজ-আল ওয়াদাদ', পৃ. ৩ খ-৪ ক, ৫ খ, ১০ খ, ১৬ খ। একটি চিঠিতে তাঁর জাগীরের কাজকর্ম দেখাশুনা করার ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ বাদশাহী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাঁকে মোতায়েন করা হয়েছিল সম্ভবত দখিনে (পৃ. ৩ খ-৪ ক)। আরেকটি চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন যে, "তাঁর জাগীরের নৌকা তাঁর দুর্ধর্ষ 'আমিল'দের তৈরি তছরুপের বন্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে" (পৃ. ৫ খ)। তুলনীয় 'ওয়কাই-এ আজমীর', ৬৭৯।

৬৬. "কয়েকজন প্রাপক ('জাগীরদার')......তাদের কয়েকজন কর্মচারীকে পাঠায় তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কিংবা তাদের অনুদানগুলো করোড়ীদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য (মূলে তাই আছে!) যাদের ফসল ভালো-মন্দ হওয়ার ঝুঁকি নিতে হয়।" (পেলসার্ট ৫৪)।

"ছোট মনসবদার"দের নগদে বেতন দিতে হবে, এই সুপারিশ করে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেখিয়েছিলেন যে, ঐ ধরনের লোকেরা "তাদের জাগীর থেকে নিজেরা রাজস্ব আদায় করতে পারে না ও সেগুলি ইজারা দিতে বাধ্য হয়" ('সিয়াসী মক্তুবাৎ', ৪২)।

৬৭. সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ১১ ক; Or. 1671, পৃ. ৬ খ।

৬৮. গোলকুণ্ডায় ইজারার প্রচলন প্রসঙ্গে 'রিলেশনস্', ১০-১১, ৫৭, ৮১-৮২; 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৬৫-৬৭', পৃ. ২৪৫; মাস্টার, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৩। কর্ণাটকে ইজারা সংক্রান্ত দুটি ফার্সী নথির নকল দেওয়া আছে Br. M. Sloane 4092, পৃ. ৫ খ-৬ ক, ৮ খ-৯ ক। এর মধ্যে একটিতে তারিখ আছে ১৬৫৩-র, আরেকটি ১৬৭৭-৭৯-র।

৬৯. Allahabad 884-887, 889-90. Allahabad 884 ও 885-তে ইজারা-র যে শর্ত দেওয়া আছে, তা এই যে, ইজারাদারকে প্রতি বছর দুটি মরসুমী কিস্তিতে একটা বাঁধা অঙ্ক দিতে হবে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিলে পরগনার ক্ষেত্রে ('শরহ্-এ পরগনা') (বাদশাহী প্রশাসনের?) অনুমোদিত হারে ছাড় দেওয়া হবে। অন্য দিকে, ইজারাদার যদি চুক্তির পরিমাণের চেয়ে বেশি আদায় করতে পারে, তাহলে বাড়তি অংশটুকু তার নিজের কাছেই থাকবে।

না-ও হয়, বাস্তবে কিন্তু অনেক আমিলই ইজারাদার ছাড়া আর কিছু ছিল না।[৭০] বরাতীদের পক্ষে বোধ হয় প্রকাশ্যে দর হাঁকাটা খুব একটা বুদ্ধির কাজ হতো না, কেননা ইজারার রীতি দরবারের অনুমোদন পায়নি। আওরঙ্গজেবের আমলের দরবারের খবর থেকে এর একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। বাদশাহ্‌কে জানানো হয়েছিল, যেসব মনসবদারদের জাগীর কাশ্মীরে, স্থানীয় লোকেদের তারা সেগুলো ইজারা দিয়ে দিচ্ছে, আর এই ইজারাদাররা খুবই অত্যাচারী। আওরঙ্গজেব তখন ঐ প্রদেশের দিওয়ানকে আদেশ দেন : তিনি যেন অবশ্যই এই রীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন আর রাজস্ব আদায়ের জন্য তাদের আমিলদের পাঠানোর ব্যাপারে চাপ দেন।[৭১]

কোন জাগীরদার তার কোন কর্মচারী বা ঘোড়সওয়ার বাহিনীর লোককে নিজের জাগীরের অংশবিশেষ দর-বরাত করলে তাকে আটকানোর কিছু ছিল না। জাহাঙ্গীরের আমলে দেখা যায়, সিন্ধুর তরখান প্রদেশকর্তা ঐ প্রদেশের একটা বড় অংশের জাগীরের অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর কর্মচারীদের ইচ্ছামতো জাগীর মঞ্জুর করতেন ও ফিরিয়ে নিতেন।[৭২] বলা হয়েছে, ঐ একই আমলে আব্দুর রহিম খান-এ খানান সাধারণত তাঁর আশ্রিত লোক ও কর্মচারীদের নগদ ভাতা ও নিজের বরাত থেকে জাগীর দিয়ে পুরস্কৃত করতেন।[৭৩] শাহ্‌জাহানের আমলে অযোধ্যা থেকে পাওয়া একটি দলিলে বলা হয়েছে যে, জনৈক খানদানী লোককে একটি বিশেষ গ্রাম তনখা হিসেবে ('তনখওয়াহ্‌') বরাত দেওয়া হয়। তিনি আবার তাঁর চারজন ঘোড়সওয়ার সেপাইকে সেই গ্রাম বরাত দিয়ে দেন।[৭৪] পরের আমলের আরেকটি সূত্রে দখিনে নিযুক্ত জনৈক উচ্চপদস্থ রাজপুত কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। একটা পরগনার সমস্ত গ্রাম তাঁর জাগীরে ছিল। সেগুলো তিনি তাঁর রাজপুত সৈন্যদের মধ্যে 'তনখওয়াহ্‌'য় বরাত দিয়েছিলেন। এখানে বেশ

৭০. এ প্রসঙ্গে খাফী খানের রচনার একটি অংশ পড়তে মজা লাগে যেখানে তিনি তোডর মলের আমলের সঙ্গে তাঁর নিজের আমলের (মুহম্মদ শাহের রাজত্বে) তুলনা করেছেন। তাঁর আমলে 'উম্মাল এ ইজারাদার', অর্থাৎ যেসব আমিল জমি ইজারা নিয়েছে, তারা জমি নষ্ট করে ফেলেছিল (খাফী খান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৭)।

৭১. 'অখবারাৎ', ৩৭/৩৮।

৭২. 'তারিখ-এ তাহিরী', Or. 1685, পৃ. ১০২খ-১০৩খ, ১১৮ক-১১৯খ। শাহ্‌জাহানের রাজত্বের গোড়ার দিকে সেহ্‌ওয়ানের (সিন্ধু) জনৈক জাগীরদারের উল্লেখ করে 'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী', ১৬৪-৫-তে বলা হয়েছে যে তিনি "সমস্ত অঞ্চলই জাগীর হিসেবে তাঁর সৈন্যদের বরাত দিয়ে শুধু কয়েকটিমাত্র 'মহাল' তাঁর নিজের খালিসা-য় রেখে দেন।" এখানে অবশ্য 'খালিসা' মানে জাগীরদারের নিজের জন্য রাখা জমি, বাদশাহের জন্য নয়।

৭৩. 'মআসির-এ রহিমী', ৩য় খণ্ড, বহু জায়গায়, এই ওমরাহের পৃষ্ঠপোষিত ও নিযুক্ত কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী, সৈনিক ইত্যাদির উল্লেখ দ্রষ্টব্য। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য পৃ. ১৬৩৪, খান-এ খানানের জনৈক কর্মচারীর সম্বন্ধে সেখানে বলা হয়েছে যে, "সারা বছর তিনি এই 'সরকার' থেকে জাগীর এবং ভাতা বাবদে মোটা অঙ্কের টাকা পেয়েছিলেন।"

৭৪. Allahabad 789.

পরিষ্কার করেই দেখানো হয়েছে যে, মূল জাগীর বদলের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ধরনের দর-বরাতের মেয়াদও ফুরিয়ে যেত।[৭৫]

জাগীরদাররা যখন তাদের জাগীর ইজারা দিত, মনে হয়, ইজারাদার হতো সচরাচর স্থানীয় লোকেরাই।[৭৬] কিন্তু বরাতীরা—জাগীরদার এবং খালিসা উভয়ক্ষেত্রেই—যে-রাজস্ব কর্মচারীদের নিয়োগ করত, সাধারণত তাদের কোন স্থানীয় স্বার্থ বা সংযোগ থাকত না।[৭৭] সম্ভবত, এর আংশিক কারণ এই যে, জাগীর যেখানেই হোক না কেন, প্রত্যেক জাগীরদার সেখানে নিজের বিশ্বস্ত প্রতিনিধিদের পাঠাত।[৭৮] কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে

৭৫. 'ওয়কাই-এ আজমীর', ৩৫৯। 'জাগীরদার' মান সিং নিবেদন করেছিলেন যে, ঐ পরগনায় তাঁর জাগীরের একটা অংশ ফিরিয়ে নিলে তাঁর লোকজনের বিরাট ক্ষতি হবে। জাগীরের সব গ্রামই তিনি এদের বরাত দিয়েছিলেন। তিনি প্রস্তাব দিয়েছেন যে, এলাকাটি তাঁকে ইজারা হিসেবে রাখতে দেওয়া হোক, যাতে তিনি যে দর-বরাত দিয়েছেন তা চলতে পারে।

৭৬. ওপরে উদ্ধৃত এলাহাবাদ নথিগুলো থেকে (৮৮৪-৭, ৮৮৯-৯০) এ কথা দেখা যায়: মুহম্মদ আরিফ জাগীরের 'ইজারা'র জন্য চুক্তি করেছেন হিসামপুর পরগনায় (বাহ্‌রাইচ 'সরকার', অযোধ্যা), যেখানে তিনি নিজেই কয়েকটি গ্রামের জমিনদারীর অধিকারী ছিলেন। একইভাবে 'অখবারাৎ' ৩৭/৩৮-এ "কাশ্মীরের লোকদের" উল্লেখ করা হয়েছে, যারা ঐ প্রদেশে বরাতী জাগীরগুলো ইজারা নিয়েছিল।

৭৭. তুলনীয় এলিয়ট, 'ক্রনিকল্‌স্ অফ উনাও', পৃ. ১০৬: "আমিল, ক্রোরী, তহসীলদার (রাজস্ব-আদায়কারী)…কদাচিৎ পরগনার স্থানীয় লোক হতো।" সাধারণত এলিয়টের বিবৃতি খুবই মূল্যবান কেননা তিনি মুঘল আমলের বহুসংখ্যক সনদ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক নথিপত্র পরীক্ষা করেছিলেন এবং স্থানীয় ইতিহাসের সঙ্গেও তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এলাহাবাদ নথিপত্রগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলে ঐ একই সিদ্ধান্ত করতে হয়। যেসব স্থানীয় লোকের নথিপত্র আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে তাদের মধ্যে এমন লোক খুবই বিরল যে (১৭ শতকে) কোন জাগীরদারের গোমস্তা হয়েছিল।

৭৮. বয়াজিদের বিবরণের ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি থেকে (২৪৮-৫০, ২৯৯) এটি দেখা যায়। তিনি মুনিম খানের অধীনে কাজ নেন এবং মুনিম খান তাঁকে হিসার ফিরোজা 'সরকার'-এর শিকদার নিয়োগ করেন। 'এই 'সরকার'টি তাঁর জাগীরের মধ্যে পড়ত। তাঁর সব জাগীর যখন পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলোতে বদল করে দেওয়া হয়, তখন তিনি বয়াজিদকে বেনারস সরকার-এর শিকদার নিয়োগ করেন। ভীমসেনের কাছ থেকে ('দিলকুশা', পৃ. ৮০ ক-খ) জানা যায় যে, গুজরাটের বাসিন্দা, জনৈক কেকারাম নাগর, খান-এ জাহান বাহাদুরের 'সরকার'-এ দিওয়ান-এর পদ পর্যন্ত উঠেছিলেন। আওরঙ্গজেবের শাসনের ১৪-তম বছরে খান-এ জাহান বাহাদুরকে যখন দখিনে পাঠানো হয়, তখন তাঁর বিহারের জাগীরগুলো দেখাশুনা করতে তিনি কেকারামকে পাঠিয়েছিলেন। এলাহাবাদ নথিগুলোতে প্রায়ই যেসব রাজস্ব কর্মচারীর নাম পাওয়া যায় তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, প্রত্যেক নতুন জাগীরদারের সঙ্গে সঙ্গে কর্মচারীও পাল্টাত।

হয়তো ইচ্ছা করেই এ ধরনের লোক বেছে নেওয়ার ব্যাপার ছিল। স্থানীয় যোগাযোগ থাকলে আমিলরা জমিনদার ও অন্যান্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বরাতীর স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে—এমন সম্ভাবনাই ছিল বেশি।[৭৯] জাহাঙ্গীর তখ্‌ত-এ বসার পর একটি আদেশ জারি করেন। তার স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় বাবুসমাজের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন থেকে এইসব কর্মচারীদের ("খালিসা-র ও জাগীরদারদের আমিল") বিরত করা।[৮০]

সুতরাং বরাতীদের পরিচালন-ব্যবস্থায় স্থানীয় লোকজনকে প্রায় পুরোপুরি বাদ রাখা হতো। তবে তাদের প্রতিনিধিত্ব করত দুজন কর্মচারী যাদের সঙ্গে বরাতীর কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু তার পক্ষে যারা অপরিহার্য: তারা হলো কানুনগো এবং চৌধুরী। যদিও এই শব্দ দুটি খুবই পরিচিত, তবুও, মনে হয়, মুঘল যুগের এই দুজন কর্মচারীর অবস্থান ও কার্যাবলী আধুনিক গবেষণায় যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি।[৮১]

'কানুনগো' (বা দখিনে তারা যে-নামে পরিচিত ছিল, 'দেশপাণ্ডিয়া')[৮২] সাধারণত

৭৯. আনু. ১৭৫০ সালে লেখা 'রিসালা-এ জিরাঅৎ'-এ বাংলায় "অতীতের 'নাজিম'দের" রীতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁদের অধীনে, "খালিসা-র কর্মচারীদের ('মুত্তাসদ্দিয়ান') কোনরকম 'তাল্লুক' বা 'জমিনদারী' ইত্যাদি থাকত না। কোন কর্মচারীর 'তাল্লুক' বা গ্রাম থাকলে, আরেক ধাপ সতর্কতা হিসেবে, আগেকার 'নাজিম'রা কখনোই তাকে খালিসা-র কোন পদে নিয়োগ করেননি, কারণ, তাদের বেশির ভাগ লোকের সঙ্গেই জমিনদারদের আত্মীয়তা থাকে..." (পৃ. ১৯ খ)।

৮০. ঐ আদেশে বলা হয়েছে: বিনা অনুমতিতে ('বে-হুক্‌ম্‌') তারা এ কাজ করবে না ('তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', পৃ. ৪)। সেন্ট্রাল রেকর্ড অফিস, হায়দ্রাবাদে এই স্মৃতিকথার সবচেয়ে পুরনো বলে জানা যে-পাণ্ডুলিপিটি আছে তার পৃ. ৯ ক ও Add. 26,215, ১৭ শতকের পাণ্ডুলিপি, দিয়ে এই পাঠ সমর্থিত হয়। অবশ্য 'মআসির এ জাহাঙ্গীরী'তে (Or. 171, পৃ. ২৫ ক) 'বে-হুক্‌ম্‌'-এর জায়গায় আছে 'বা-তহক্কুম' ('জোর করে')। এতে আদেশটির সম্পূর্ণ অর্থই বদলে যাবে, আর মানে দাঁড়াবে এই যে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে আমিলদের যোগ-সাজসে বাধা দেওয়াটা জাহাঙ্গীরের উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি কেবল তাদের ওপর আমিলদের অত্যাচার বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। 'তুজুক'-এর সাক্ষ্য অবশ্যই এর ওপরে স্থান পাবে।

৮১. চার্লস এলিয়ট তাঁর 'ক্রনিকল্‌স্‌ অফ উনাও', পৃ. ১১৬-য় নিঃসন্দেহে "কানুনগো ও চৌধুরী" এবং অস্থায়ী কর্মচারী, "আমিল, ক্রোরী, তহসীলদার"-এর মধ্যে তফাৎ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই ভুল ধারণা ছিল যে "কানুনগো ও চৌধুরীর কাজের মধ্যে কোন বড় ধরনের পার্থক্য ছিল না" এবং এই যুক্ত পদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল একের কাজে অন্যের নজর রাখা (ঐ, পৃ. ১১২)। মোরল্যাণ্ড এই মত মেনে নিয়েছেন এবং বলেছেন যে 'কানুনগো' ও 'চৌধুরী' গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল কেবল তখনই যখন আকবরের 'নিয়ম ব্যবস্থা'র বদলে (তিনি যেমন মনে করেছিলেন) 'সামূহিক নির্ধারণ' চালু করা হয় (*JRAS*, ১৯৩৮, পৃ. ৫২১)।

৮২. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৬; 'মালুমৎ-আল আফাক', পৃ. ১৭৪ ক।

'হিসাব-রক্ষক জাতে'র (কায়স্থ, ক্ষত্রী ইত্যাদি) লোক হতো।[৮৩] সাধারণত, এই পদে থাকত একই পরিবারের লোক।[৮৪] কিন্তু যে-কোন কর্মচারীর অধিকারের স্বীকৃতির জন্য বাদশাহী সনদের দরকার পড়ত।[৮৫] মনে হয়, প্রয়াত কানুনগোর উত্তরাধিকারীরা সচরাচর তাদের উত্তরাধিকারের পদে বহাল হওয়ার জন্য দরবারে একটা আদেশ বা সনদের জন্য দরখাস্ত করত।[৮৬] একবার দেওয়া হলে, সে চাকরি সাধারণত আজীবন চলত।[৮৭] তাহলেও বাদশাহী আদেশবলে কানুনগোকে বরখাস্তও করা যেত। সে কাজ করা যেত অনেক কারণে। প্রথমত, অসাধুতা বা কাজে ফাঁকি দেওয়ার শাস্তি হিসেবে।[৮৮] দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র এই পদে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা কমানোর জন্য, কারণ

৮৩. তুলনীয় এলিয়ট, 'ক্রনিকলস্ অফ উনাও', ১১২, 'মআসির আল উমরা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫০। বলা হয়েছে যে আদিল শাহ্ সুরের মন্ত্রী হেমুন সব কানুনগো ও চৌধুরীকে সরিয়ে তার জায়গায় নতুন লোক নিয়োগ করেছিলেন। এই নতুন লোকেরা সবাই ছিল, হেমুন নিজে যে জাতের লোক ছিলেন, সেই শস্য-ব্যবসায়ী জাতের ('তারিখ-এ দাউদী', ২০০)।

৮৪. এইভাবে ফারুকসিয়ারের আমলে বিহারে সাসারামের যে-কানুনগোদের পদচ্যুত করা হয়েছিল মুহম্মদ শাহের তৃতীয় বছরে তারা সেই পদ ফিরে চায় এবং তাদের পুনর্বহাল করা হয়। তাদের দাবি ছিল যে এই পরগনার কানুনগো-র পদটি "'আর্শ আশইয়ানী' (আকবর)-এর সময় থেকে তাদের পূর্বপুরুষদের প্রাপ্য।" নতুন সনদে তাদের ঐ পদ দেওয়া দেওয়া হয় "আগের মতোই বংশানুক্রমিকভাবে" (কিয়ামুদ্দীন আহ্মদ-কৃত নথিগুলোর অনুবাদ *IHRC*, খণ্ড ৩১, ২য় ভাগ, ১৯৫৪, পৃ. ১৪১-৪৭)। আওরঙ্গজেবের আমলের জনৈক কর্মচারী ইখলাস খান সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে "তাঁর পূর্বপুরুষরা" কালানৌর 'কসবা'র কানুনগো পদের অধিকারী ছিলেন ('মআসির-আল উমরা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫০)।

৮৫. 'চার-চমন-এ বরহামন' Add. 16,863, পৃ. ২৩ খ, Or. 1892, পৃ. ১৩ ক; 'নিগরনামা-এ মুন্শী', পৃ. ১১৬ খ-১১৭ ক, Bodl., পৃ. ৯০ খ-৯১ ক, Ed. 90, 91, *IHRC*, পূর্বোক্ত সূত্র, 'অখবারাৎ' ৪৪/১৩-এ জনৈক কানুনগোর সম্বন্ধে একজন জাগীরদারের অভিযোগ নথিভুক্ত আছে। এই কানুনগো "কোন সনদ ছাড়াই" তাঁর বরাতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছিল। আরও তুলনীয় Add. 6603, পৃ. ৭৫ খ।

৮৬. তুলনীয় 'আহ্কম্-এ আলমগীরী', পৃ. ২১৬ খ, যেখানে মৃত কানুনগোর এক নাতি "কানুনগো পদে তার ভাগের জন্য সনদ" পাওয়ার আবেদন করেছে।

৮৭. একটি আবেদনপত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে এক বাদশাহী আদেশনামায় বলা হয়েছে যে কানুনগোরা বহু অসৎ আচরণের দোষে দোষী, কারণ "তাদের বদলি হওয়ার বা পদ হারানোর ভয় নেই" ('নিগরনামা-এ মুন্শী', পৃ. ১৮২ ক, Bodl. পৃ. ১৪৫ ক; Ed. 140)। আরও দ্রষ্টব্য Add. 6603, পৃ. ৭৫ খ। ১৮ শতকের এই পরিভাষাকোষটিতে আরও বলা হয়েছে যে, আগেকার দিনে কানুনগো পদ বিক্রি করা যেত না, যদিও বইটি যখন লেখা হয় তখন এই রীতি বেশ চালু হয়ে গিয়েছিল।

৮৮. 'নিগরনামা-এ মুন্শী', পৃ. ১০৩ ক, ১৮২ ক, Bodl. পৃ. ৭৮ খ, ১৪৫ ক, Ed. 140; 'খুলাসতুল ইন্শা', পৃ. ১১১ ক-১১২ খ; 'অখবারাৎ' ৩৮/১১৩।

উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগাভাগির দরুন এর সংখ্যা দিনকে-দিন বেড়ে যাচ্ছিল। শের শাহ্ এবং আকবরের আমলে প্রত্যেক পরগনায় একজনমাত্র কানুনগো থাকত।[৮৯] আওরঙ্গজেব আদেশ দেন : কোন পরগনায় দুজনের বেশি কানুনগো থাকবে না, তার বেশি থাকলে তাদের বরখাস্ত করতে হবে।[৯০] ঐ বাদশাহ্ই হিন্দু কানুনগোদের জায়গায় মুসলমানদের বসানোর নীতি চালু করেন।[৯১] কিন্তু এর মধ্যে নগদ-নারায়ণও ঢুকে পড়েছিল। বাদশাহী কোষাগারে ভালোমতো উপহার ('পেশকশ') দিয়ে একজনকে সরিয়ে অন্য কাউকে নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেত।[৯২]

কানুনগো ছিল পরগনার রাজস্ব-আদায়, এলাকার পরিসংখ্যান, স্থানীয় রাজস্ব-হার এবং রীতি ও প্রথা সংক্রান্ত তথ্যের স্থানীয় ভাণ্ডারী। বাদশাহী প্রশাসনকে রাজস্ব এবং এলাকার অঙ্ক যোগান দিত সে-ই।[৯৩] জাগীর বরাতের জন্য প্রামাণ্য নির্ধারণ স্থির করার ক্ষেত্রে এই অঙ্কগুলোই ব্যবহার করা হতো।[৯৪] অবশ্য তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল বরাতীর পাঠানো আমিন-এর (বা অন্য কোন কর্মচারী যে নির্ধারক হিসেবে কাজ করছে, তার) কাছে নিজের নথিপত্র (বিশেষ করে আগের নির্ধারণের হিসাব,

৮৯. আব্বাস খান, পৃ. ১০৬ ক, 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০।

৯০. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩ (ছাপা সংস্করণের 'দশ' নিশ্চয়ই 'দুই'-এর মুদ্রণপ্রমাদ), 'দুর-আল উলুম্', পৃ ৬৫ খ।

কাশ্মীরে, মনে হয়, কানুনগোর সংখ্যা এতই বেড়ে যায় যে প্রত্যেক গ্রামে বেশ কয়েকজন সম-দায়িত্বের কানুনগো ('কানুনগোইয়ান-এ জুজ ভ্') ছিল। শাহ্জাহান আদেশ দিয়েছিলেন, প্রতি গ্রামে কেবল একজন কানুনগোকেই স্বীকৃতি দেওয়া হবে, বাকিদের ছাঁটাই করতে হবে (কাজবীনী, আলীগড় পাণ্ডুলিপি, ৫১০।)

৯১. তুলনীয় 'আহ্কম্-এ আলমগীরী', পৃ. ২১৬ খ-২১৭ ক। সাসারামের ছাঁটাই-হওয়া কানুনগোরা পদ ফিরে পাওয়ার জন্য যে আবেদন জানায় তাতে বলা হয়েছে তাঁদের ছাঁটাই-এর কারণ ছিল "শোভাচাঁদের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মামলা, যাতে তার বিরুদ্ধে মসজিদ ও সমাধি ধ্বংস করার অভিযোগ আনা হয়েছিল" (*IHRC*, পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ১৪৩)।

৯২. 'অখবারাৎ', ৩৮/১১৩।

৯৩. তুলনীয় 'ওয়কাই-এ আজমীর', ১৬৩, ১৭১, 'মালুমাৎ-আল আফাক্', পৃ. ১৭৪ ক, 'দস্তুর-আল আমল-এ খালিসা-এ শরিফা', পৃ. ৩১ ক; Add. 6603, পৃ ৭৫ খ। শেষের বইতে বলা হয়েছে যে, কানুনগোকে যদি গত একশ বছরের রাজস্ব সংক্রান্ত নথিপত্র হাজির করতে বলা হয়, তবে তার তা-ই করতে পারা উচিত। সাসারামের ছাঁটাই করা কানুনগোদের মামলাসংক্রান্ত নথিপত্রে তাদের সপক্ষে বলা হয়েছে যে তাদের অধিকারে ছিল ১০১৩ থেকে ১০৭৪ 'ফসলী'র (১৬০৪ থেকে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ) 'মুওয়াজানা' কাগজপত্র (*IHRC*, পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ১৪৪-৪৫)।

৯৪. 'আকবরনামা', ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭০; 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৭; *IHRC*, খণ্ড ১৮ (১৯৪২), পৃ. ১৮৮-৯-তে জাহাঙ্গীরের ফরমান, 'নিগরনামা-এ মুন্শী', পৃ. ১১৬ খ-১১৭ ক, Bodl. পৃ. ৯০ খ-৯১ ক, Ed. 91; 'হিদায়াৎ-আল কওয়াইদ', পৃ. ১৮ খ, আলীগড় পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৬৪ ক-খ।

'মুওয়াজানা-এ দহ্‌সালা' ইত্যাদি) ও নিজের যা জানা আছে তা পেশ করা।[৯৫] আমিন নির্ধারণের কাগজ তৈরি করলে কানুনগো তার ওপর সই করত[৯৬] আর চৌধুরী এবং 'মুকদ্দম'-এর সঙ্গে একটি কবুলিয়ৎ বা গ্রহণপত্রেও দস্তখৎ করত।[৯৭] কানুনগোর কাছে 'আমিল' বা রাজস্ব-সংগ্রাহককে তার আদায়, বকেয়া এবং খরচের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাবের একটা নকল দিতে হতো। আমিল-এর কাছে যা কিছু দাখিল করা হয়েছে তার সবটাই সে ঠিকমতো তার হিসাবে লিখেছে কিনা তা দেখার জন্য কানুনগোকে জমিনদার ও অন্যান্যদের হিসাবের সঙ্গে সেটি মিলিয়ে দেখতে হতো।[৯৮] সাধারণভাবে, বাদশাহী প্রশাসন আশা করত যে, বরাতীদের গোমস্তারা বাদশাহী নিয়মকানুন ঠিকমতো মেনে চলছে কিনা কানুনগো সেদিকে নজর রাখবে ও "চাষীদের বন্ধু" হিসেবে কাজ করবে।[৯৯] আমিল জোর করে কোন বেআইনী আদায় করলে কানুনগোকে তার খবর পাঠাতে হতো, নয়তো তার চাকরি যেত।[১০০] অথচ অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, একটি বাদশাহী আদেশ-নামায় কানুনগো পদের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এই বলে যে, তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো সবচেয়ে বেশি রাজস্ব নির্ধারণ ('জমা-এ কামিল ও আকমল') তৈরির কাজে সাহায্য করা।[১০১]

৯৫. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৮ (যেখানে কানুনগো 'মুওয়াজানা' কাগজপত্র দিয়েছে 'বিতিকচী'কে); 'দস্তুর আমল-এ আলমগীরী' পৃ. ৩৬ ক-খ, 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৪ ক, ৭৮ ক, Or. 2026, পৃ. ২২ খ, ৩০ ক; 'হিদায়াৎ-আল কওয়াইদ', পৃ. ১০ ক-খ। শেষের বইটিতে সুপারিশ করা হয়েছে যে, আমিন ঘটনাস্থলেই 'মুকদ্দম'দের জিজ্ঞাসাবাদ করে কানুনগোদের দেওয়া এলাকার অঙ্কগুলো ভালোভাবে পরীক্ষা করবে।

৯৬. রসিকদাসের উদ্দেশে ফরমান, প্রস্তাবনা; 'দস্তুর-আল আমল-এ ইল্‌ম্-এ নভিসিন্দগী', পৃ. ১৫৩ খ; 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৮ ক, ৭৮ খ, Or. 2026, পৃ. ২২ খ, ৩১ ক; 'ফরহঙ্গ এ করদানী', পৃ. ২৯ ক, Edinburgh No. 83, পৃ. ৫৪ খ, 'সিয়াকনামা', ২৮।

৯৭. তুলনীয় 'ফরহঙ্গ-এ করদানী', পৃ. ২৪ ক (কবুলিয়ৎ-এর নমুনা)।

৯৮. 'হিদায়াৎ-আল কওয়াইদ', পৃ. ১৮ খ-১৯ ক।

৯৯. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০। কানুনগোরা এ ব্যাপারে আশানুরূপ কাজ করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে 'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী'র লেখক অবশ্য সন্দেহ প্রকাশ করেছেন (পৃ. ১৮৯), কারণ "কানুনগোদের লোকে তত সম্মান করে না, জাগীরদারকে তারা অত্যাচার করা থেকে বিরত করতে পারে না, কার্যত বরং প্রতিপত্তিশালী জাগীরদারের অত্যাচারের ভাগীদার হয়।" তিনি স্বীকার করেছেন যে, বাদশাহী প্রশাসন কানুনগোদের রক্ষিত কাগজপত্র ব্যবহার করে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে জাগীরদারদের বেনিয়মী কাজকর্ম বন্ধ করতে পারত (পৃ. ৫১)। কিন্তু তিনি একটি ঘটনার উল্লেখও করেছেন। দরবার থেকে একবার আদেশ দেওয়া হয়েছিল কানুনগোরা যেন তাদের কাগজপত্র সমেত দরবারে হাজিরা দেয়। সেহ্‌ওয়ানের জাগীরদার তাদের আসতে দেয়নি (পৃ. ১৭৭);

১০০. 'নিগারনামা এ মুন্‌শী', পৃ. ১০৩ ক, Bodl. পৃ. ৭৮ খ, Ed. 80; 'খুলাসতুল ইন্‌শা', পৃ. ১১১ খ-১১২ ক।

১০১. 'নিগারনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ১৮১ খ; Bodl. পৃ. ১৪৪ খ; Ed. 140.

বরাতীদের গোমস্তারা সাধারণত স্থানীয় রীতিনীতি জানত না, তাই কানুনগোর দেওয়া তথ্যের ওপর তাদের খুব বেশি নির্ভর করতে হতো। সুতরাং কানুনগো প্রায়ই এমন একটা অবস্থায় থাকত যাতে নিজের সুবিধার জন্য তার পদকে সে প্রচুর কাজে লাগাতে পারে। আওরঙ্গজেবের একটি আদেশে বলা হয়েছে, কানুনগোদের সাধারণ রীতিই ছিল আমিলদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাল্পনিক হিসাব তৈরি করা আর তৎস্বরূপ-করা অংশ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া। কোন আমিল তাদের সঙ্গে এ কাজ করতে রাজি না হলে, কানুনগো-রা জমিনদারদের বোঝাত তারা যেন ঐ আমিল-এর কাছে রাজস্ব দাখিল না করে, তারপর মধ্যস্থের ভূমিকায় নিজেরা কিছু কামিয়ে নিত। শেষত, জমিনদারদের ওপর ধার্য নির্ধারণে তারা প্রচুর ছাড় দেওয়ার সুপারিশ করত, কেননা প্রায়ই তারা কাজ করত জমিনদারদের সঙ্গে একজোটে।[১০২] অন্যত্র বলা হয়েছে যে, এক পরগনার কানুনগো রা ফৌজদারের সঙ্গে যড় করে অসাধু উপায়ে 'জমা' কমিয়ে দিয়েছে।[১০৩]

আবুল ফজল বলেছেন, আগে রাজস্ব থেকেই কানুনগোদের শতকরা এক ভাগ হারে একটা ভাতা দেওয়া হতো। কিন্তু আকবর তার জায়গায় বাঁধা মাইনের ব্যবস্থা চালু করেন, যার বদলে তাদের মঞ্জুর করা হতো জাগীর, অর্থাৎ ধরা যেতে পারে লাখেরাজ জমি।[১০৪] পরবর্তী নথিপত্রে দেখা যায় অন্তত কতক ক্ষেত্রে কানুনগো-রা তাদের অধিকৃত 'ইনাম' জমি ছাড়াও 'নানকার' বলে নগদ ভাতাও পাচ্ছে।[১০৫]

'চৌধুরী'রাও (গুজরাটে যাদের বলা হতো 'দেসাই', আর দখিনে 'দেশমুখ')[১০৬]

১০২. ঐ, পৃ. ১৮১ ক-১৮২ খ, Bodl. পৃ. ১৪৪ খ-১৪৫ ক, Ed. 140. তুলনীয় 'ওয়কাই-এ আজমীর', ১০৮, ২১৮।

১০৩. 'অখবারাৎ' ৩৮ ১১৩।

১০৪. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০-এ বলা হয়েছে যে 'সদ-দোই' (শতকরা দুভাগ) ভাতার মধ্য থেকে পাটওয়ারী পেত অর্ধেক, বাকি অর্ধেক যেত কানুনগোর কাছে। 'মদদ-এ মআশ' নথিগুলোতে প্রাপকদের ওপর যেসব উপকর চাপাতে কর্মচারীদের বারণ করা হয়েছে তার তালিকায় 'সদ-দোই ও কানুনগোই' (বা, কখনও কখনও 'সদ-দোই ও কানুনগোই') কথাটি বার বার আসতে দেখা যায়। তিন শ্রেণীর কানুনগোর জন্য আকবর একটা হার বেঁধে দিয়েছিলেন : যথাক্রমে মাসিক ৫০ টাকা, ৩০ টাকা ও ২০ টাকা।

'মজহার-এ শাহ্জাহানী', ১৮৬, অনুযায়ী, সেহওয়ান 'সরকার' (সিন্ধুপ্রদেশ)-এ কানুনগো-রা 'রুসুম', বা একটি চিরাচরিত উপকর, আদায় করতে পারত। এটি ছিল রাজস্বের শতকরা এক ভাগ, আদায় হতো চাষীদের কাছ থেকে।

১০৫. তুলনীয়. 'দস্তুর-আল আমল-এ নভিসিন্দগী', পৃ. ৪০ খ এবং *IHRC*, ১৯২৯, পৃ. ৮৪-৮৬-তে বিশ্লেষিত পপল পরগনার নথিপত্র।

১০৬. 'চৌধুরী'কে 'দেসাই'-এর সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে অনুমানের ভিত্তিতে। সমসাময়িক লেখাপত্রে এ বিষয়ে এমন কোন সরাসরি বিবৃতি নেই যা উদ্ধৃত করা যায়। 'দেশমুখ' ও 'চৌধুরী'র অভিন্নতার বিষয়ে দ্রষ্টব্য 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ ৪৭৬; 'মালুমৎ-আল আফাক্', পৃ. ১৭৪ ক।

ছিল সম্ভবত কানুনগোর মতোই প্রশাসনের পক্ষে সমান গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী। সব ক্ষেত্রেই 'চৌধুরী' হতো জমিনদার।[১০৭] বেশির ভাগ জায়গায় সে হতো সেই এলাকার নেতৃস্থানীয় জমিনদার,[১০৮] কিন্তু সর্বদাই এমন ঘটত বলে মনে হয় না।[১০৯] সবচেয়ে শক্তিশালী জমিনদার সবচেয়ে কম বিশ্বস্ত হতে পারত;[১১০] আর সেক্ষেত্রে সম্ভবত আরেকটু ছোট মাপের লোককে 'চৌধুরী' করা হতো। সাধারণত পদটি ছিল বংশগত,[১১১]

'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী'তে চৌধুরীর উল্লেখ নেই, কিন্তু 'অরবাব' নামে জনৈক কর্মচারীর কথা আছে। মনে হয় সিন্ধুপ্রদেশে আসলে এই কর্মচারীই ছিল 'চৌধুরী'র প্রতিরূপ (পৃ. ১৯-২১, ১০১-২, ১৮২, ১৮৫-৬, ১৮৮, ১৯১)। "অরবাব ও মোড়ল"দের উল্লেখের জন্য তুলনীয় 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৪৬-৫০', পৃ ১১৮-৯।

১০৭. Add. 6603, পৃ. ৫৮ ক: "চৌধুরী খেতাব দেওয়া হয় জমিনদারদের মধ্যে বিশ্বাসভাজন কোন লোককে।" খসরুর বিদ্রোহ দমন করার পর জাহাঙ্গীর, চন্দ্রভাগার ধার বরাবর অঞ্চলের জমিনদারদের (যারা বাদশাহের অনুকূলে কাজ করেছিল) 'চৌধুরাঈ' মঞ্জুর করেছিলেন ('তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', পৃ. ৩২)। *IHRC*, খণ্ড ১৮ (১৯৪২), পৃ. ১৮৮-৯-তে প্রকাশিত তাঁর একটি ফরমানে কয়েকটি নির্দিষ্ট 'টপ্পা'য় একই লোকের ক্ষেত্রে যুগপৎ "জমিনদার ও চৌধুরাঈ-এর কাজ" (অর্থাৎ পদ) মঞ্জুর করা হয়েছে। ইংরেজরা যার কাছ থেকে নতুন কুঠির জন্য জমি কিনেছিল সেই রাজরায়কে 'মালদা ডায়েরী অ্যাণ্ড কনসালটেশনস্'-এ কখনও বলা হয়েছে 'চৌড্রী' কখনও বা 'জিম্মেদার' (*JASB*, N. S., খণ্ড ১৪, পৃ. ৮১, ১২২, ১৭৪, ১৮২, ১৯৬, ২০২)। আরও তুলনীয় এলিয়ট, 'ক্রনিকলস্ অফ উনাও', পৃ. ১১২।

'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী', ১৯১-এ বলা আছে যে জমিনদাররা "অরবাব ও মুকদ্দম পদেরও অধিকারী (আক্ষরিক: সঙ্গে যুক্ত) হতেন।" আগের টীকায় যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে, 'অরবাব' সম্ভবত ছিল সিন্ধুপ্রদেশে 'চৌধুরী'র সমার্থক।

১০৮. তুলনীয়, এলিয়ট, পূর্বোক্ত সূত্র। ইতিমধ্যেই পঞ্চম অধ্যায়, চতুর্থ অংশে উল্লিখিত চানানেরী দেশমুখদের ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়, দখিনেও নিশ্চয়ই দেশমুখ হতো এলাকার প্রভাবশালী জমিনদার।

১০৯. 'দস্তুর-আল আমল-এ খালিসা-এ শরিফা' ১৮ শতকের শেষদিকে বাংলা সুবায় লেখা একটি বই। কিন্তু এর মূল্য এই যে, এখানে 'চৌধুরী'র সংজ্ঞায় বলা হয়েছে এর অর্থ "একজন ছোট জমিনদার" (পৃ. ৩২ খ)। উনাও জেলার আশেপাশে খোঁজখবর নিয়ে এলিয়ট বলেছিলেন যে চৌধুরী পদের অধিকারীরা ছিল "সম্ভ্রান্ত কিন্তু একেবারেই দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিবার"। বেনেট তাঁর 'চিফ ক্ল্যানস্ অফ দা রায়বেরিলী ডিস্ট্রিক্ট', ৫৮-৯-এ স্পষ্টই এর বিরোধিতা করেছেন।

১১০. 'হিদায়াৎ-আল কওয়াইদ', পৃ. ৭ ক-তে বলা হয়েছে যে, "বিদ্রোহী জমিনদার হলো জমিনদারদের মাথা", যেন নির্বিশেষভাবে এটাই সত্য।

১১১. এলিয়ট, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১১২। *IHRC*, খণ্ড ১৮, ১৯৪২, পৃ. ১৮৮-৮৯-তে প্রকাশিত জাহাঙ্গীরের ফরমানে বিহারের কিছু 'টপ্পা'র "জমিনদারী ও চৌধুরাঈ" মঞ্জুর করা হয়েছে "সপুত্রক" জনৈক হীরানন্দকে। দেশমুখ পদের বংশানুক্রমিক ধরনের জন্য *JRAS*, ১৯৩৮,

কিন্তু প্রত্যেক পদাধিকারীকেই বাদশাহী সনদ জোগাড় করতে হতো।[১১২]

বাদশাহী আদেশবলে 'চৌধুরী'কে পদচ্যুতও করা যেত। আওরঙ্গজেব আদেশ দিয়েছিলেন, কোন পরগনায় অনেক 'চৌধুরী' থাকলে তাদের দুজন বাদে বাকিদের বরখাস্ত করতে হবে।[১১৩] আমিলরা বেআইনীভাবে জবরদস্তি আদায় করছে[১১৪]— তার খবর না দিলে, বা হয়তো আরও বেনিয়মী কাজকর্মের জন্যও চৌধুরী'কে সরিয়ে দেওয়া যেত।

'কানুনগো'র কাজের বড় অংশই ছিল রাজস্ব-নির্ধারণের পরিমাণ ঠিক করা, 'চৌধুরী'র মূল কাজ ছিল রাজস্ব আদায়। বরাতীর কর্মচারীরা 'জমা' স্থির করার পর 'চৌধুরী' তাতে সই করে দিত। 'কবুলিয়ৎ' বলে আলাদা একটি নথিতেও সে সই করত।[১১৫] 'মুকদ্দম'দের কাছ থেকেও তাদের নিজ নিজ গ্রামের জন্য ঐ ধরনের 'কবুলিয়ৎ' নেওয়া হতো।[১১৬] এই সব নথিতে স্বাক্ষরকারী কবুল করত যে নির্ধারিত পরিমাণ সে আদায় করে দেবে। 'চৌধুরী' আবার ছোটখাট জমিনদারদের হয়ে জামিন দাঁড়াত।[১১৭] এও সম্ভব যে, 'চৌধুরী'ই 'মুকদ্দম' ও জমিনদারদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করত, তারপর আমিল-এর কাছে পাঠিয়ে দিত।[১১৮] আগেই দেখা গেছে,

পৃ. ৫১৬-য় মোরল্যাণ্ডের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। প্রবন্ধটি ঐ পর্বের কিছু নথিপত্র সমীক্ষার ভিত্তিতে লেখা। ঐ একই সিদ্ধান্তের জন্য নথিপত্রের সাক্ষ্য পাওয়া যাবে 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ১৬১ খ-১৬২ খ; খারে, 'পার্সিয়ান সোর্সেস্ অফ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি', ২য় খণ্ড, ১৯৩৭, পৃ. ১১-১২; *IHRC*, ১৯৪৮, ১৫-১৭।

১১২. 'চার-চমন-এ বরহামন', পূর্বোক্ত সূত্র; 'অখবারাৎ' ৪৪/১৩, ৪৭/৩৩৭।

১১৩. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩; 'দুর-আল উলুম', পৃ. ৬৫ খ। তুলনীয়: 'বুলন্দশহর ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার', ১৯২২, পৃ. ১৪৮-এ উদ্ধৃত ঐ একই বাদশাহের আদেশনামা।

১১৪. 'নিগরনামা-এ মুন্শী', পৃ. ১০৩ ক, Bodl. পৃ. ৭৮ খ, Ed. 80; 'খুলাসতুল ইন্শা', পৃ. ১১১ খ-১১২ ক।

১১৫. কানুনগোর সঙ্গে একযোগে তিনি এ কাজ করতেন। ঐ কর্মচারীর প্রসঙ্গে ঐ একই বিবৃতিতে উদ্ধৃত তথ্যসূত্রগুলো দ্রষ্টব্য।

১১৬. 'ফরহঙ্গ-এ করদানী', পৃ. ৩৪ ক-খ; 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৪ ক-৭৫ ক, Or. 2026, পৃ. ২৩ ক-২৪ খ।

১১৭. Add. 6603, পৃ. ৫৮ ক-খ।

১১৮. 'দস্তুর-আল আমল-এ নভিসিন্দগী', পৃ. ৪১ খ-৪২ খ-য় উদ্ধৃত 'বার-আমদ' হিসাবগুলোর নমুনায়, প্রথমে আদায়ের ওপর বিভিন্ন দফার ছাড়গুলো দেখান হয়েছে 'চৌধুরী'দের দায়িত্বের ভেতরে, তারপর বিস্তারিতভাবে ভাগ বাঁটোয়ারা করা হয়েছে 'মুকদ্দম'দের দায়িত্বের ভেতরে। সুরাটের চারপাশের গ্রামগুলো সম্বন্ধে বলার সময়, ফ্রায়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০-৩০১-এ বলেছেন যে, যে-বরাতীদের 'জাগীরা' (জাগীর)-এ এগুলো পড়ে, তারা "বছরে একবার মুনাফা তুলতে ছাড়ে না। এই মুনাফা আসে 'দেসী' (দেসাই) বা ইজারাদারের হাত দিয়ে, যে গ্রামের লোককে নিংড়ে নেয়", ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুন ফসল নষ্ট হলে প্রায়ই 'জমা'র কিছুটা মকুব করা হতো।[১১৯] কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোন কারণে 'চৌধুরী' যদি রাজস্ব আদায় করতে না পারে বা করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে কঠোরতম শাস্তিও দেওয়া যেতে পারত। দেখা যায়, জনৈক বরাতীর কর্মচারী প্রস্তাব দিচ্ছে : তার প্রভুর মৃত্যুর খবর গোপন রাখা হোক, যাতে "কয়েকজন অবাধ্য 'চৌধুরী'কে দুর্গে (চুণার) নিয়ে এসে বকেয়া আদায়" করা যায়। বোঝাই যায়, বেশ কড়া দাওয়াই খাটিয়েই সে এ কাজ করতে যাচ্ছিল।[১২০] পরের শতকে জনৈক ইউরোপীয় পর্যটক ঐ এলাহাবাদ প্রদেশেই দেখেছিলেন, "এক ফৌজদার কয়েকজন 'চৌধুরী' বা নগর-প্রধানকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। কারণ, তারা হয় রাজার প্রাপ্য কর দেবে না বা দিতে পারবে না।"[১২১]

তার প্রধান কর্তব্য রাজস্ব আদায় ছাড়াও, 'চৌধুরী'কে কতক ছোটখাট কাজও করতে হতো। যেমন, 'মুকদ্দম'-এর সহযোগিতায় সে 'তকাবী' ঋণ[১২২] বিলি করত ও ফেরতের জামিন থাকত। কানুনগো-র কাজে পালটা নজর রাখার জন্যও তাকে ব্যবহার করা হতো, কারণ কানুনগো-র সই করা 'মুওয়াজানা' কাগজপত্র ও স্থানীয় রীতিনীতির নথিপত্র বাদশাহী দরবারে পাঠানো হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারেও তাকে লক্ষ্য রাখতে হতো।[১২৩]

'চৌধুরী'দের বেতন হারে সম্ভবত যথেষ্ট তারতম্য ছিল। 'মিরাৎ'-এ বলা হয়েছে, আকবরের অধীনে প্রথম দিকে দেসাইদের দেওয়া হতো রাজস্বের শতকরা ২½ ভাগ। কিন্তু পরে তা কমিয়ে শতকরা ১¼ ভাগ এবং শেষ পর্যন্ত শতকরা ⅝ ভাগ করা হয়।[১২৪] আরেকটি লেখায় যে নমুনা-হিসাব দেওয়া আছে তার থেকেও মনে হয় রাজস্ব থেকে 'চৌধুরী'দের যে-ভাগ বা 'নানকার' দেওয়া হতো তা খুব বড় অঙ্কের নয়।[১২৫] কিন্তু এও সম্ভব যে তার হাতে প্রচুর লাখেরাজ ('ইনাম') জমি থাকত।[১২৬] তাছাড়া, এও বলা হয়েছে যে অন্য জমিনদারের হয়ে জামিন দাঁড়ালে চৌধুরী সাধারণত তাদের কাছ থেকে (রাজস্বের) শতকরা ৫ ভাগ দস্তুরি নিত।[১২৭]

১১৯. ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ ও অষ্টম অংশ দ্রষ্টব্য।

১২০. বয়াজিদ, ৩৫০। এটি ঘটেছিল ১৫৭৪-৫-এ, যখন বয়াজিদ চুণারে মুনিম খানের প্রতিনিধি ছিলেন।

১২১. মান্ডি, পৃ. ১৮৩।

১২২. ষষ্ঠ অধ্যায়ের অষ্টম অংশ দ্রষ্টব্য।

১২৩. নিয়মটি দেওয়া আছে জাহাঙ্গীরের ফরমানে, *IHRC*, খণ্ড ১৮, ১৯৪২, পৃ. ১৮৮-৮৯।

১২৪. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৩ এবং পরিশিষ্ট, পৃ. ২২৮।

'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী'-তে একই ধরনের একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সেহ্‌ওয়ান (সিন্ধু)-এ 'অরবাব'দের ভাতা কমানো হয়েছিল। আকবরের রাজত্বের শেষদিকে এক জাগীরদারের অধীনস্থ 'অরবাব' এবং 'মুকদ্দম'রা রাজস্বের শতকরা পাঁচভাগ তাদের ভাতা হিসেবে ভাগ করে নিত। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের গোড়ার দিকে আরেকজন জাগীরদার এটি কমিয়ে শতকরা দু-ভাগ করে দিয়েছিলেন।

১২৫. 'দস্তুর-আল আমল-এ আলমগীরী', পৃ. ৪০ খ-এ মোট ওয়াসিল রাজস্ব দেখানো হয়েছে ৪,৩৩৮ টাকা, যার মধ্যে দুজন 'চৌধুরী'কে 'নানকার' দেওয়া হয়েছিল মাত্র ১২০ টাকা।

১২৬. *IHRC*, ১৯২৯, পৃ. ৮৩-৮৬-তে পপল পরগনার দলিলপত্রের বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য।

১২৭. Add. 6603, পৃ. ৫৮ ক।

'কানুনগো' বা 'চৌধুরী'দের বহাল-বরখাস্তের ক্ষমতা সংরক্ষিত ছিল বাদশাহী সরকারের হাতে। এইভাবে, খালিসা-র বাইরের বরাত-প্রশাসনে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য সরকার নিজের হাতে একটি প্রয়োজনীয় অস্ত্র রেখে দিয়েছিল। কিন্তু কমবেশি পাকা মেয়াদের স্থানীয় কর্মচারী ছাড়াও থাকত কিছু নিয়মিত বাদশাহী কর্মচারী। জাগীরের ভেতরে কী হচ্ছে না হচ্ছে তার তত্ত্বাবধান করাও তাদের কাজের মধ্যে পড়ত।

প্রথমত, প্রতি প্রদেশে থাকত একজন 'দিওয়ান' যে অর্থ-দপ্তরেরও প্রতিনিধিত্ব করত। চাষীদের ওপর জাগীরদারের অত্যাচার বন্ধ করাও তার অন্যতম কাজ বলে ধরা হতো।[১২৮] জাগীরের অব্যবস্থা সম্পর্কে সে দরবারে খবর পাঠাতে পারত।[১২৯] বরাতী বা তার গোমস্তার আচরণ বিষয়ে বাদশাহের জারি করা আদেশও হয়তো খোদ দিওয়ান-কেই বলবৎ করতে হতো।[১৩০] বরাতী ও তার নিজের আমিল-এর মধ্যে প্রাপ্যের ফয়সালা হতো দিওয়ান-এর কাছারিতে,[১৩১] সুতরাং তাদের ওপরেও নিশ্চয়ই দিওয়ান-এর যথেষ্ট কর্তৃত্ব ছিল।

মনে হয় আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে প্রাদেশিক দিওয়ান-এর পাশাপাশি আরও একজন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল; তার কাজই ছিল রাজস্ব আদায়ের সময় জাগীরদার ও তার গোমস্তা যাতে সরকারী নিয়মকানুন মেনে চলে তা নিশ্চিত করা। আকবরের আমলের ২৪-তম বছরে প্রত্যেক প্রদেশে যেসব কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল বলা হয়, তার তালিকায় ঐ ধরনের কোন কর্মচারীর নাম নেই।[১৩১ক] কিন্তু চার বছর পরে, গুজরাটে প্রদেশকর্তা এবং দিওয়ান-এর সঙ্গে আরও একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করা হয়, যার নাম 'আমিন'।[১৩১খ] এই কর্মচারীটির ক্ষমতার সীমা এবং কার্যাবলী সম্বন্ধে আবুল ফজল কোথাও নির্দিষ্ট করে কিছু বলেননি। কিন্তু 'মজহার-এ শাহজাহানী'র একটি বড় অংশ এবং আরও নানান উল্লেখ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় তার কাজ ঠিক কী ছিল। এতে সুপারিশ করা হয়েছে যে কোন 'সরকার'-এ আমিন নিযুক্ত হওয়ার পর সে প্রত্যেক পরগনায় তার প্রতিনিধি পাঠাবে। তারা দেখবে জাগীরদার বা স্থানীয় কর্মচারীরা (চাষীদের কাছ থেকে) অনুমোদিত হারের ('দস্তুর-আল-আমল') চেয়ে বেশি আদায় করছে কিনা। যদি কোথাও বাদশাহী নিয়মকানুন লঙ্ঘন করতে দেখা যায়, তাহলে সে ঐ বিষয়ে জাগীরদারের গোমস্তার দৃষ্টি আকর্ষণ

১২৮. খান্দেশের দিওয়ানের পাঠানো পরওয়ানা দ্রষ্টব্য, যাতে বগলানা 'সরকার'-এ তাঁর একজন প্রতিনিধি নিয়োগের কথা বলা আছে (আওরঙ্গজেবের রাজত্বের চতুর্থ বছর) ('দফ্তর-এ দিওয়ানী ও মাল ও মুল্কী', পৃ. ১৮৬)।

১২৯. বেরারের উপ-দিওয়ান-এর কাছ থেকে পাঠানো একটি প্রতিবেদনের জন্য 'অখবারাৎ', ৩৬/১৫ তুলনীয়।

১৩০. 'অখবারাৎ', ৩৭/৩৮।

১৩১. তুলনীয় 'রিয়াজ-আল ওয়াদাদ', পৃ. ৩খ-৪ক; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', কানপুর সং., পৃ. ৪১-৪২।

১৩১ক. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮২।

১৩১খ. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৩; 'তবাকৎ-এ আকবরী', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৮।

করবে। গোমস্তা যদি তার পরামর্শ না শোনে, তবে সে জাগীরদারের কাছে অভিযোগ জানাবে। জাগীরদারও যদি সন্তোষজনক ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে দরবারের কাছে সে বিষয়টি জানাবে এবং তার প্রতিবেদন অনুযায়ী বাদশাহ্‌কে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব দেবে। বইটি যখন লেখা হয়েছিল (১৬৩৪) তখন আর এই কর্মচারী নিয়োগ করা হতো না। মনে করা হয়েছিল (লেখকের মতে, ভুল করে) যে ঐ কাজের জন্য কানুনগোই যথেষ্ট।[১৩১গ] শাহ্‌জাহানের আমলে 'আমিন' নামে রাজস্ব নির্ধারকের পদ তৈরি হওয়ার পর ঐ নামধারী প্রাক্তন পদাধিকারীর স্মৃতি বোধহয় আরও ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। তারপরে আর কখনোই বোধ হয় আবার ঐ পদ চালু করার কোন চেষ্টা হয়নি।

বাদশাহী সরকারের সামরিক বা পুলিশী ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করত 'ফৌজদার'। তার অন্যতম প্রধান কাজ ছিল সেই সব জাগীরদার বা খালিসার আমিলদের সাহায্য করা যারা নিজ ক্ষমতায় স্থানীয় বিক্ষুব্ধদের (অর্থাৎ, যেসব জমিনদার ও চাষী রাজস্ব দিতে অস্বীকার করছে)[১৩২] মোকাবিলা করে উঠতে পারছে না। মনে হয় গোড়া থেকেই বড় বড় বরাতীদের নিজস্ব জাগীরের মধ্যে ফৌজদারী অধিকার দেওয়া থাকত।[১৩৩] আওরঙ্গজেবের আমলে নিশ্চিতভাবেই এই ছিল সাধারণ রীতি।[১৩৪] এই ধরনের অধিকার মঞ্জুর করার ফলে বাদশাহী ফৌজদারের ক্ষমতা খুবই কমে গিয়েছিল, কারণ ঐ সব জাগীরের ব্যাপারে তাদের হস্তক্ষেপ করার এক্তিয়ার ছিল না।[১৩৫]

মুঘল সাম্রাজ্য ছেয়ে ছিল 'ওয়াকিআ নবীশ', 'সওয়ানিহ্‌-নিগর' ইত্যাদি নামের এক দল কর্মচারী। এদের বলা যায় খবর-লিখিয়ে।[১৩৬] এদের কাজই ছিল বেনিয়ম ও অত্যাচারের খবর পাঠানো। এমন ঘটনাও নথিভুক্ত আছে যেখানে তারা বাস্তবিকই সে কাজ করেছে।[১৩৭] তবে ব্যাপক দুর্নাম ছিল এই যে এরা দুর্নীতিগ্রস্ত আর কেবলমাত্র স্বার্থসিদ্ধির জন্যই খবর চেপে যায় বা অভিযোগ দায়ের করে।[১৩৮]

জাগীরদারের যে কোন অত্যাচারের বিরুদ্ধে চাষী ও জমিনদার দুজনেই সরাসরি দরবারে অথবা প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা দিওয়ান-এর কাছে নালিশ জানাতে

১৩১গ. 'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী', ১৮৭-৯০, আরও দ্রষ্টব্য ২১-২২, ৫১-২, ২৪৪।

১৩২. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৩; 'দুর্‌-আল উলুম', পৃ. ৫৭ খ; 'অখবারাৎ' ৩৭ ২৫; 'ইন্‌শা-এ রোশন কলাম', পৃ. ৯ ক-খ, ৩১ ক-খ, ৪০ খ, 'সিয়াকনামা', ৬৭-৬৮।

১৩৩. আকবর এবং জাহাঙ্গীরের আমলে জাগীরদারদের নিযুক্ত ফৌজদারের উল্লেখের জন্য দ্রষ্টব্য বদাউনী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৪-৫ এবং 'মআসির-এ রহিমী', ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৪৩।

১৩৪. 'কলিমৎ-এ তৈয়্যাবৎ', পৃ. ১২৫ ক-এ আওরঙ্গজেব লক্ষ্য করেছেন যে "জাগীরের ফৌজদারী ন্যস্ত আছে কিছু 'মহাল'-এর জাগীরদারের ওপর।" বরাতীদের ফৌজদারী মঞ্জুরির নির্দিষ্ট ঘটনার জন্য দ্রষ্টব্য 'ইন্‌শা-এ রোশন কলাম', পৃ. ২৪ খ; 'অখবারাৎ' ৩৬/১৫, ৩৬/৩৭, ৩৮/২৪, ৩৮/২৪২, ৪৭/৩২১, ৪৭/৩৬৭, ৪৮/২১৭; 'আহ্‌কম্‌-এ আলমগীরী', পৃ ৪৩ ক-খ।

১৩৫. তুলনীয় 'অখবারাৎ', ৪৩/১১৩; 'ইন্‌শা-এ রোশন কলাম', পৃ. ১৩ ক।

১৩৬. 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ১২০-২১।

পারতেন।[১৩৯] খাতা-কলমে তাঁদের সে অধিকার ছিল। কিন্তু চাষীরা দরবারে নালিশ করতে গেলে বরাতীর গোমস্তারা গায়ের জোরে তাঁদের আটকে দেবে—মনে হয় এমন ঘটনাই স্বাভাবিক বলে ধরা হতো।[১৪০]

সাধারণভাবে, বরাতীর কোন বেনিয়মের ব্যাপারে বাদশাহী সরকার কড়া হতে চাইলে তার জাগীর বদল করে দেওয়া হতো।[১৪১] কিংবা প্রতিদানে অন্য বরাত না দিয়েই সে-জাগীর ফিরিয়ে নেওয়া হতো।[১৪২] আগেই দেখা গেছে যে, বরাতী অবাধে তার নিজের কর্মচারী বহাল-বরখাস্ত করতে পারত। তবুও জাগীর বদল বা ফিরিয়ে নেওয়ার ভয় দেখিয়ে তাকে লোক পালটানোর নির্দেশও দেওয়া যেত।[১৪৩]

তাহলে জাগীরদারদের নিষ্ঠুরতম অত্যাচারের শাস্তি ছিল লঘু। 'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী'র লেখক প্রতিবাদ করে বলেছেন, যে-জাগীরদারের অত্যাচারের কথা দরবারে জানানো হয়েছে, তাকে সেহ্‌ওয়ান থেকে মুলতানে বদলি করাটা কোন শাস্তিই নয়: এ তো রাজরোষ নয়, বরং অনুগ্রহ![১৪৪] দুঃখ করে তিনি বলেছেন, "সেহ্‌ওয়ানের নিপীড়িত মানুষ আজ একই অবস্থায় রয়েছে আর আহ্‌মেদ বেগ খান (সেই জাগীরদার) ও তার (অত্যাচারী) ভাই ডুবে আছে সম্পদ-বিলাসে।"[১৪৫]

১৩৭. যেমন, 'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী', ১৬৪, ১৭৪, ১৭৬-৭; 'অখবারাৎ' ৩৭ ৩৮; 'ইন্‌শা-এ রোশন কলাম', পৃ. ৩৮ খ-৩৯ খ।

১৩৮. বার্নিয়ে, পৃ. ২৩১; মানুচি ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫২। 'অখবারাৎ', ৩৬/১৫-এ বেরারের উপ-দিওয়ান-এর একটি প্রতিবেদনের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে "'ওয়াকিআ-নিগর' গোমস্তাদের কাছ থেকে কিছু নিয়ে থাকে এবং আসল ঘটনার খবর দেয় না।" 'ইন্‌শা-এ রোশন কলাম'-এ রাদ-আন্দাজ খান দাবি করেছেন যে লখনউ-এর 'ওয়াকিআ-নিগার' একজন 'সওয়ানিহ্‌-নিগর'-এর বিরুদ্ধে বেআইনী উপকর চাপানোর খবর জানিয়েছিল। তারও কারণ শুধু এই যে ঐ 'ওয়াকিআ-নিগর' ঐ অঞ্চলের এক "রাজদ্রোহী" জমিনদার ও এক জাগীরদারের গোমস্তার সঙ্গে জোট বেঁধেছিল, আর 'সওয়ানিহ্‌-নিগর'-এর ওপর শেষের দুজনেরই রাগ ছিল।

১৩৯. 'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী' ১৭৪; 'আদাব-এ আলমগীরী' পৃ. ৩৩ ক, 'রুকাৎ-এ আলমগীর' পৃ. ১১৯, বালকৃষণ ব্রাহ্মণ, পৃ. ৫৫ খ-৫৭ খ, ৬৩ খ-৬৪ ক; 'ওয়কাই-এ আজমীর', ২১৭-১৯; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', কানপুর সং., পৃ. ৪০-৪১।

১৪০. বালকৃষণ ব্রাহ্মণ, পৃ. ৬০ ক।

১৪১. 'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী', ১৬৪, ১৭৭; 'সিলেকটেড ডকুমেণ্টস্‌...', পৃ. ১৩৩, 'ইন্‌শা-এ রোশন কলাম', পৃ. ১২ ক।

১৪২. 'রুকাৎ-এ আলমগীর', কানপুর সং., পৃ. ৪০-৪১।

১৪৩. বয়াজিদ, পৃ. ১৪৮-৫০; 'ওয়কাই-এ আজমীর', ২১৯; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', কানপুর সং., পৃ. ৪০-৪১।

১৪৪. 'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী', ১৭৭।

১৪৫. ঐ, ১৮০।

বাদশাহী সরকারের এই সদয় মনোভাবের ফলে জাগীরদারদের অত্যাচারী আচরণে বাধা দেওয়ার মতো কিছুই প্রায় ছিল না। আমাদের লেখক বলেছেন, "সেহ্ওয়ানের জাগীরদার যদি অন্যায়ভাবে একশজন লোককে খুন ও লুঠ করে, কেউ তাকে আটকাবে না। আর কোন গরীব লোক যদি অনেক কষ্টে, বহু দূর থেকে বাদশাহী দরবারে এসে অভিযোগ দায়ের করে ও বাদশাহী ফরমান নিয়ে আসে, এখানে তা গ্রাহ্য হয় না ও সে-অনুযায়ী কাজ হয় না। সে-ই বরং উল্টে এ দেশের গুপ্তচরদের বলি (আক্ষরিক : শত্রু) হয়ে যায়, যারা কিছু দিনের মধ্যেই জাগীরদারের হাতে তার সর্বনাশ করে ছাড়ে... এমন একজন কর্মচারীও নেই—তা সে 'সদর', 'কাজী', 'কানুনগো' বা 'অরবাব' ('চৌধুরী') যেই হোক না কেন—যে জাগীরদারকে যথাসময়ে বলে তার কী করা উচিত। সবাই বরং নিজের ভালো দেখে। আর তাই 'বাঁচাও! বাঁচাও!' আর্তনাদের মধ্যে সত্যিই দেখা যাচ্ছে কেয়ামতের তোলপাড়।"[১৪৬]

১৪৬. ঐ, ১৭৩-৪।

অষ্টম অধ্যায়

রাজস্ব অনুদান

এক ধরনের অনুদানের মাধ্যমে রাজা কোন নির্দিষ্ট এলাকার জমি থেকে তাঁর ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য কর আদায়ের অধিকার হস্তান্তরিত করতেন। প্রাপককে এই অনুদান দেওয়া হতো আজীবন বা চিরদিনের জন্য। ভারতে এই জাতীয় অনুদানের এক পুরনো ইতিহাস আছে।[১] মুঘল আমলে এদের কখনও বলা হতো 'মিল্‌ক্' বা 'অম্‌লাক' (দিল্লী সুলতানদের থেকে পাওয়া শব্দ),[২] কখনও বা 'সুয়ূরগাল' (শব্দটি মুঘলরা মধ্য এশিয়া থেকে এনেছিল)[৩]। কিন্তু সরকারী দলিল ও অন্যান্য নথিপত্রে যে-নামটি সাধারণত ব্যবহার হতো তা হলো 'মদদ-এ মআশ' (আক্ষরিক অর্থে : জীবনধারণের জন্য সাহায্য)।[৪] পরে অন্য একটি নাম চালু হয় : 'আইম্মা', 'ইমাম' শব্দের বহুবচন। এর আক্ষরিক অর্থ (ধর্মীয়) নেতৃবৃন্দ, কিন্তু অর্থবিকৃতির ফলে শব্দটি ঐ ধরনের অনুদানভুক্ত জমির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হতে থাকে।[৫] এই ধরনের

১. গুপ্তযুগে ও তারপরে ঐ ধরনের অনুদানের জন্য দ্রষ্টব্য রামশরণ শর্মা, 'দি অরিজিনস্ অফ ফিউডালিজম্ ইন ইণ্ডিয়া' (আনু. ৪০০-৬৫০)', 'জার্নাল অফ ইকনমিক অ্যাণ্ড সোশ্যাল হিস্ট্রি অফ দি ওরিয়েন্ট', ১ম খণ্ড, ৩য় ভাগ, অক্টোবর ১৯৫৮। এটি লেখকের 'আসপেক্টস্ অফ পলিটিক্যাল আইডিয়াস অ্যাণ্ড ইনস্টিটিউশনস্ ইন এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া', পৃ. ২০২ ইত্যাদিতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। শ্রী শর্মা এই জাতীয় অনুদানগুলোকে মুঘল আমলের জাগীরের সঙ্গে তুলনা করতে চেয়েছেন, আসলে কিন্তু এগুলো 'মদদ-এ মআশ' অনুদানের সঙ্গেই তুলনীয়।

২. অনুদান হিসেবে বরাত দেওয়া জমি অর্থে 'মিল্‌ক্' শব্দটি ব্যবহারের উল্লেখ আছে 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮-তে। আরও দ্রষ্টব্য 'তারিখ-এ দাউদী', ৪৪। এর বহুবচন, 'অমলাক', শব্দটির, মনে হয়, আরও বেশি চল ছিল। আরিফ কান্দাহারী, ১৭৭; 'তারিখ-এ দাউদী', ৩৮; বেকাস, পৃ. ৩১খ দ্রষ্টব্য। দিল্লী সুলতানদের আমলে একই অর্থে 'মিল্‌ক্' ব্যবহারের একটি দৃষ্টান্তের জন্য দ্রষ্টব্য বরনী, 'তারিখ-এ ফিরুজ-শাহী', বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা সং. পৃ. ২৮৩।

৩. 'আইন', ১ম খণ্ড, ১৯৮ ইত্যাদি। আবুল ফজল এই শব্দটি ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছেন যদিও ১৭ শতকে শব্দটি প্রায় শোনাই যেত না। বাবুরের একটি ফরমানে (I.O. 4438 : (1)) অবশ্য শব্দটির ব্যবহার আছে, কিন্তু তাঁর আরও দুটি পরিচিত ফরমানে (একটি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে আছে, অন্যটি 'ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন', ৯ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, মে ১৯৩৩, পৃ. ১২১-২-এ প্রকাশিত) শুধু 'মদদ-এ মআশ'-ই ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. 'আইন', ১ম খণ্ড, ১৯৮। অনুদান সংক্রান্ত প্রায় যাবতীয় সরকারী নথিপত্র ও ফরমানে (আকবরের ফরমান সমেত) এই শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে, অন্য কোন শব্দ নয়।

৫. 'আইম্মা' শব্দটি, মনে হয়, প্রথমে প্রাপকদের সম্মানসূচক একটি উপাধি হিসেবে ব্যবহার করা হতো (আরিফ কান্দাহারী, ১৭৭; বদাউনী, ১ম খণ্ড, ৩৮৪, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৪, ২৫৪;

অনুদান তদারক করার দায়িত্ব ছিল একটি আলাদা বাদশাহী দপ্তরের। দরবারে এই দপ্তরের কাজ দেখতেন 'সদর' বা 'সদরুস সুদূর'। তাঁর অধীনে থাকতেন প্রাদেশিক 'সদর' ('সদর-এ জুজ্‌ভ্‌') এবং আরও নীচের তলায় 'মুতাওয়াল্লী' নামের কর্মচারীরা।[৬]

সাধারণত 'মদদ-এ মআশ' অনুদানের অধিকারীদের উদ্দেশে জারি-করা ফরমানের একটি অংশে, তাদের যেসব অধিকার ও অনুগ্রহ দেওয়া হলো তা বলা থাকত। আকবরের আমলের গোড়ার দিকে এই অংশের প্রায় বাঁধা একটা গৎ ঠিক করা হয়, পরে তা-ই চলতে থাকে: প্রাপকরা জমি থেকে সব রাজস্ব ('ওয়াসিলাৎ') পাবে, তাদের ভূমিরাজস্ব ('মাল-ও-জিহাৎ') ও 'ইখরাজাৎ' (কর্মচারীদের চাপানো ছোটখাট দায়) দিতে হবে না। এরপর ঐ ধরনের দায়গুলো বিস্তারিতভাবে বলা থাকে। সুতরাং, সব আর্থিক বাধ্যবাধকতা এবং বাদশাহী দাবি ('হুকূক্-এ দিওয়ানী ও মুতালিবাৎ-এ সুলতানী')[৭] থেকেই তাদের রেহাই দেওয়া হতো। অন্য কথায়,

আব্বাস খান, পৃ. ১১২ খ; 'তুজুক-এ জাহাঙ্গারী', ৫; 'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী', ১৪৬-৭, ১৫৮, ১৮০, ১৯০; আওরঙ্গজেবের ফরমান, Allahabad II, ৫৩ এবং ৫৫)। পরে 'আইম্মা' শব্দটির অর্থান্তর হয়ে দাঁড়ায় অনুদান দেওয়া জমি। তখন প্রাপক অর্থে 'আইম্মা-দার' (আইম্মা-র অধিকারী) শব্দটি তৈরি করা হয়। সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ১৮৬ ক, Or. 1671, পৃ. ৯১ ক, খাফী খান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩৫ টীকা, 'ফথিয়া-এ ইব্রিয়া', পৃ. ১১৭খ-১২১ ক; 'দস্তুর-আল আমল-এ খালিসা শরিফা', পৃ. ৫৯খ-৬০ক, Add. 6603, পৃ. ৪৮ ক)।

৬. এই দপ্তরটির ধরন ও ইতিহাস সম্পর্কে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ভালো সমীক্ষা পাওয়া যাবে ইবন হাসানের 'সেণ্ট্রাল স্ট্রাকচার অফ দা মুঘল এম্পায়ার', ৮ম অধ্যায়ে। পাঠ্য-পুস্তকে মুঘল প্রশাসনের বিবরণে সাধারণত 'সদর-এ জুজ্‌ভ্‌' এবং 'মুতাওয়াল্লী' শব্দ দুটি পাওয়া যায় না। Allahabad 1187 (শাহ্‌জাহানের আমলের) থেকে দেখা যায় যে 'সদর-এ জুজ্‌ভ্‌'-এর অর্থ ছিল প্রাদেশিক 'সদর'। আরও তুলনীয় লাহোরী, ২য় খণ্ড, ৩৬৫-৬৬। 'মুতাওয়াল্লী' ছিল পরগনা স্তরের এক কর্মচারী, যে অনুদানের মঞ্জুরের ওপর নজর রাখত (যথা, Allahabad 851 দ্রষ্টব্য)।

৭. প্রাপকদের যেসব দায় মকুব করা হতো তার একটি প্রমাণ-তালিকা প্রথম দেখা যায় ১৫৬৭-তে জারি-করা আকবরের একটি ফরমানে (আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত)। সেই আমল থেকে মুঘল সদর আদালতের শেষদিন পর্যন্ত ফরমানগুলোতে সামান্য হেরফের করে একই তালিকা দেওয়া হয়েছে।

অবশ্য, এটা ভাবা ঠিক নয় যে প্রাপকদের ওপর কোন করই চাপানো হতো না। জাগীরদারের কাছে তাদের 'মুকররারী-এ আইম্মা' নামে একটি কর দিতে হতো। অযোধ্যার একটি অঞ্চলে এর পরিমাণ ছিল প্রকৃত আবাদী জমির বিঘা পিছু এক টাকা (Allahabad 5, ১৬৫০ খৃস্টাব্দের)। আওরঙ্গজেবের আমলের গোড়ার দিকে এই কর এবং অন্যান্য কয়েকটি কর আদায়ের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় (রাজা রঘুনাথের পরওয়ানা, Allahabad, II, 284 এবং 'মিরাৎ' ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৭। আরও দ্রষ্টব্য Allahabad 1117)। সদর থেকে প্রাপকদের ওপর 'সদরানা' নামে একটি উপকর চাপানো হয় (Allahabad 1204 এবং 1230)। 'মুতাওয়াল্লী'-রও কিছু উপরি পাওনা থাকত (Allahabad I)। এছাড়াও আরও

ভূমিরাজস্ব আদায় করা ও [নিজের কাছে] তা রাখার অধিকার মঞ্জুর করা হতো।[৮]

সুতরাং, 'মদদ-এ মআশ' অনুদান প্রাপককে এমন কোন অধিকার দিত না আগে যার ওপর প্রশাসনের কোন অধিকার ছিল না। অনুমোদিত ভূমিরাজস্বের চেয়ে বেশি দাবি সে বৈধভাবে করতে পারত না। আকবরের আমলের গোড়ার দিকের একটি ফরমানে চাষীদের সুনির্দিষ্টভাবে "জরিপের ভিত্তিতে ভূমিরাজস্ব ('আজ করার-এ মসাহত') দিতে" বলা হয়েছে।[৯] চাষীদের দখলী স্বত্বের ওপরেও 'মদদ-এ মআশ' অধিকারী হাত দিতে পারত না। তাই কয়েকটি ফরমান ও তার আনুষঙ্গিক নথিপত্রে 'রাইয়তী' (চাষী-অধিকৃত) এবং 'খুদ-কাস্তা' (প্রাপকদের নিজেদের চাষ করা) জমি আলাদা করে নির্দিষ্ট করা আছে।[১০] আর 'আইন'-এ বলা আছে যে প্রাপকরা যদি 'রাইয়তী' জমিকে 'খুদ-কাস্তা' জমিতে পরিণত করতে যায় তাহলে রাজস্ব আদায়কারী তাতে বাধা দেবে।[১১] ১৭ শতকের নথিপত্রে এমন কিছু দৃষ্টান্ত আছে যেখানে চাষীরা ছিল অবাধ্য, প্রাপকদের তারা ভূমিরাজস্ব দিতে অস্বীকার করে। এর ফলে অনুদান হিসেবে সেই প্রাপকদের অন্য গ্রাম দিতে হয়।[১২] গ্রামের মোড়ল

কিছু কর ছিল (Allahabad 1117 এবং 1204)। এইসব নথি থেকে দেখা যায় যে, কখনও কখনও আদায়কারী কর্মচারীরা নিজেরাই প্রাপকদের এইসব করভার মকুব করে দিত।

৮. ১৭৬৪ সালে অযোধ্যার একটি বিক্রয় কোবালায় বাদশাহী আদেশের (সনদ) বলে অধিকৃত 'আইম্মা' অনুদানকে ভূমিরাজস্ব আদায়ের অধিকারের ('হক্-এ আখজ-এ খরাজ') সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে (Allhabad 457)।

৯. অক্টোবর ৩, ১৫৬৭-র ফরমান, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, আলীগড়ে রক্ষিত।

'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী'র লেখক বলেছেন যে, চাষবাস বজায় রাখার জন্য প্রাপকরা চাষীদের সঙ্গে সদয় আচরণ করত, জাগীরদাররা যা করত না (পৃ. ১৮০)। তারা চাষীদের ধার দিত এবং নিজেদের ভাগের ফসলের একটা অংশ দিয়ে দিত; কিন্তু লেখক নিজেই যেহেতু 'মদদ-এ মআশ'-এর অধিকারী ছিলেন তাই প্রাপকদের সম্পর্কে তাঁর ভালো ধারণা কিছুটা অতিরঞ্জিত হতে পারে (পৃ. ১২২)।

১০. দ্রষ্টব্য আকবরের ফরমান, ৯৬৬-৯৮৩ হিজরী (Allahabad II, 23-র অনুলিপি Or. 1757, পৃ. ৩৯ক-৫১খ ও ৯৮৩ হিজরী (আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস বিভাগ, গবেষণা গ্রন্থাগার - ঋণস্বত্রে) এবং মোমীর 'পার্সীস্ অ্যাট অফ দা কোর্ট অফ আকবর'-এর ৪নং নথি (নথিটির আলোকচিত্র-লিপি দ্রষ্টব্য, মুদ্রিত পাঠ নয়। সেখানে আমাদের বিবেচ্য অংশটি বাদ গেছে)। এটি নভেম্বর ২৭, ১৫৯৬ তারিখের জনৈক কর্মচারীর প্রতিবেদন। এতে শুধু 'রাইয়তী' জমির এলাকাই দেওয়া নেই, চাষীদের নাম এবং তাদের বোনা বিভিন্ন ফসলের এলাকাও দেওয়া আছে।

১১. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৭।

১২. Allahabad 873 এবং 1213 (দুটিই শাহ্‌জাহানের আমলের)।

'মুকদ্দম'ও মনে হয়, প্রাপকদের অধীন ছিল না, এমনকি প্রাপক যখন পুরো গ্রামের অধিকারী হতো তখনও না।[১৩]

একইভাবে, 'মদদ-এ মআশ' অনুদান কোনভাবেই জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত জমিনদারী বা 'মিলকিয়াৎ' স্বত্বে হাত দিতে পারত না। নথিপত্র থেকেই এ কথা পরিষ্কার বেরিয়ে আসে। প্রাপকদের সেখানে এইসব স্বত্বে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।[১৪] এগুলোর অন্যতম এক সরকারী আদেশনামায় বলা-ই হয়েছে যে প্রাপকরা অবশ্যই 'স্বত্বাধিকারীদের' 'হক-এ মিলকিয়াৎ' দেবে। এর আক্ষরিক অর্থ 'স্বত্বাধিকার', কিন্তু এখানে স্পষ্টতই উৎপন্ন দ্রব্যের ওপর স্বত্বাধিকারীদের প্রতিষ্ঠিত ভাগ বোঝাচ্ছে।[১৫] 'স্বত্বাধিকারীদের' শত্রুতার দরুন অনেক সময়ই প্রাপক তাঁর অনুদান অন্য কোথাও বদল করিয়ে নিতে বাধ্য হতেন।[১৬]

'মদদ-এ মআশ' অনুদান সাধারণত নির্দিষ্ট এলাকার বিঘার অঙ্কে দেওয়া হতো।[১৭] আকবরের আমলে যখন এই অনুদান দেওয়া শুরু হয়, তখন থেকেই

১৩. 'মুকদ্দম' প্রাপকের মাথার উপরে থেকে গোয়েন্দাগিরি করছে—এমন একটি ঘটনার কথা ফৈজী সিরহিন্দী লিখে রেখে গেছেন (পৃ. ১৪৮ক-১৪৯ক)। ফৈজী সিরহিন্দী যে গ্রামের 'মদদ-এ মআশ'-এর অধিকারী ছিলেন, আকবর একবার সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে 'মুকদ্দম'-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং তার কাছ থেকে গ্রাম ও অনুদান-অধিকারী সম্পর্কে জানতে চান। অনুদানগুলো জোচ্চুরি করে বা দাক্ষিণ্যের বিনিময়ে জোগাড় করা হয়েছে কিনা তা খুঁজে বার করার জন্য তিনি নিজে সেগুলো দেখতে চেয়েছিলেন। বেকাস. পৃ. ৩১খ-তে বলা হয়েছে যে প্রাপকরা যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ('সনদ') জোগাড় করতে পারছে, ততক্ষণ তারা মাঠ থেকে কিছু আদায় করতে গেলে 'মুকদ্দম'দের কাজ ছিল তাদের বাধা দেওয়া। 'মুকদ্দম'-এর সঙ্গে প্রাপকের সদ্ভাব না থাকায় এক গ্রাম থেকে অন্যত্র অনুদান বদল করার বর্ণনা আছে Allahabad 881 এ।

১৪. Allahabad 782 এবং 1203.

১৫. Allahabad 1203. এই দুটি অধিকারের ভেতরকার পার্থক্যটি স্পষ্ট দেখানো আছে ১৮ শতকের একটি দলিল, Allahabad 457-এ (১৭৬৪ খৃস্টাব্দের)। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একই দুবিঘা জমির "'মিলকিয়াৎ' এবং জমিনদারী' অর্থাৎ 'সতায়হী'" এবং "আইম্মা-অনুদান" মারফৎ পাওয়া "ভূমিরাজস্ব আদায়ের অধিকার" বিভিন্ন সময়ে বিক্রি করা হয়েছিল।

১৬. Allahabad 1190.

১৭. অবশ্য কিছু কিছু ব্যতিক্রমও ছিল। বাবুরের দুটি ফরমানে (I.O. 4438 : (1) এবং আলীগড়) শুধু গ্রামের নাম দেওয়া আছে, প্রথমটিতে 'জমা-এ রকমী' (নির্ধারিত রাজস্ব)-ও দেওয়া আছে। ১৫৬৭-র জলন্ধর সম্পর্কে আকবরের ফরমানেও (বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, আলীগড়) গ্রামের নাম দেওয়া আছে এবং 'জমা' নির্দিষ্ট করা আছে, কিন্তু এলাকা নির্দিষ্ট করা নেই। গুজরাটের পট্টান 'হাভেলী'তে জনৈক কাজীকে অনুদান দেওয়া একটি গ্রাম সম্পর্কে আওরঙ্গজেবের রাজত্বের ৩৫-তম বছরে জারি-করা একটি ফরমানে এলাকার কথা বাদ পড়েছে, কিন্তু গ্রামটির 'জমা' ও 'ওয়াসিল' (প্রকৃত আদায়ীকৃত রাজস্ব) দেওয়া আছে। (I.O.

বোধহয় তার বিঘা মাপার জন্য সমভাবে 'গজ-এ ইলাহী' ব্যবহার হচ্ছিল।[১৮] নতুন অনুদান দেওয়া হলে ফরমানে সচরাচর স্থানীয় কর্মচারীকে নির্দেশ দেওয়া থাকত : ফরমানে যেমন বলা আছে, সেই অনুযায়ী একটি বিশেষ গ্রামে বা পরগনার যে-কোন জায়গায় "এলাকা জরিপ করে 'চক' (অর্থাৎ অনুদানের জমি) নির্দিষ্ট করে দিতে হবে"।[১৯] প্রাপক যাতে শুধু তার অনুদানের এলাকাতে অধিকার সীমাবদ্ধ রাখে, আর কোন বাড়তি এলাকা ('তৌফীর') দখল না করে সে-ব্যাপারে জাগীরদার ও রাজস্ব কর্মচারীরা স্বভাবতই উদ্বিগ্ন থাকতেন।[২০]

আকবর দেখেছিলেন, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গ্রামগুলোতে 'মদদ-এ মআশ' বরাত দিলে তার প্রচুর অপব্যবহার হতে পারে। তঞ্চকতা করে প্রাপক কখনও কখনও

11,698)। কোন কোন প্রদেশে অনুদানের এলাকার একক বিঘা ছাড়া অন্য কোন এককে লেখা হতো : যেমন দখিনে 'চবার' ('সিলেকটেড ডকুমেণ্টস্ অফ শাহজাহানস্ রেন', ১৮৯-৯০) এবং কাবুলে 'কলবা' (আবাদযোগ্য জমি), (*IHRC*, খণ্ড ১৮ (১৯৪২), পৃ. ২৪২-৩)।

১৮. বাঁশের 'তনাব' (শতকরা ১৩.০৩ ভাগ কমানো) এবং 'গজ-এ ইলাহী' (শতকরা ১০.৫ ভাগ কমানো) এই দুটি জিনিস প্রবর্তনের মাধ্যমে আকবর পূর্বতন অনুদান মারফৎ অধিকৃত এলাকা কমিয়ে দিয়েছিলেন। I.O. 4438 : 7, 25 এবং 55 সংখ্যক পৃষ্ঠলেখগুলো থেকে এটি দেখা যায়। আরও দ্রষ্টব্য Allahabad 154, 879 এবং 1177. সাদিক খান (Or. 174, পৃ. ১৮৬ক ; Or. 1671, পৃ. ৯১ক, খাফী খান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩৪-৫ টীকা) বলেছেন যে ১৭ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, সাধারণ জমির জন্য যেখানে 'দিরা-এ শাহজাহানী' (দিরা = গজ)-ভিত্তিক 'বিঘা-এ দফ্তরী'র ব্যবহার চালু ছিল, তার বদলে " 'আইম্মা-দার'দের দেওয়া বাদশাহী অনুদানের ফরমানে উল্লিখিত 'বিঘা' হলো 'বিঘা-এ ইলাহী'।" বস্তুতপক্ষে, অনুদানের বিঘা জরিপ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 'গজ' হিসেবে 'গজ-এ ইলাহী'-র উল্লেখ শাহজাহান এবং আওরঙ্গজেবের আমলের নথিপত্রেও চলতে থাকে (Allahabad 783, 881, 1190 ইত্যাদি ; 'দুর-আল উলুম', পৃ. ১৩৮ ক-খ ; আরও দ্রষ্টব্য বেকাস, পৃ. ৪০ ক, ৪১ ক)। পরিশিষ্ট 'ক'-ও দ্রষ্টব্য।

১৯. 'চক' শব্দটির জন্য দ্রষ্টব্য এলিয়ট, 'মেমোআর্স...', ২য় ভাগ, পৃ ৭৯। সাধারণভাবে এর অর্থ হলো জোত। প্রাপকদের দেওয়া জমির এলাকা জরিপ করার পর কর্মচারীরা একটি নথি তৈরি করত যার নাম ছিল 'চকনামা'। এতে দেওয়া থাকত জরিপ-করা জমির এলাকা ও সীমানা। ১৭ শতকের এইসব নথির কিছু কিছু এখনও রয়েছে : Allahabad 36, 869, 873, 874, 879, 881, 1190 ; I.O. 4438 : (59), আরও তুলনীয় Add. 6603, পৃ. ৫৮ খ।

২০. Allahabad 179. আরও দ্রষ্টব্য Allahabad 36.

'মজহার-এ শাহজাহানী', ১৪৬-৭-এ, জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ দিকে সেহওয়ানের জনৈক জাগীরদারের গোমস্তাদের 'দমনমূলক' আচরণের কথা আছে। তারা আবার এলাকা জরিপ করেছিল এবং রাজস্ব দাবি করেছিল (সম্ভবত, অনুদানে নির্দিষ্ট এলাকার চেয়ে অতিরিক্ত অংশে)। প্রাপকরা দরবারে গিয়েছিলেন, আর তাঁদের সন্তুষ্ট করার জন্য জাগীরদার তার কর্মচারীকে অনুদানের পূর্বনির্ধারিত সীমা মেনে চলার আদেশ ('পরওয়ানচা') জারি করেছিলেন।

একই অনুদানের ভিত্তিতে দুই বা ততোধিক জায়গায় জমি পেয়ে যেতে পারে। আবার সাধারণ কোন গ্রামের ছোট প্রাপকের ওপর 'খালিসা' ও 'জাগীরদার'-এর কর্মচারীরা পীড়ন করতে পারে। সুতরাং ১৫৭৮ সালে তিনি স্থির করেন যে বিদ্যমান সব অনুদান কয়েকটি গ্রামে কেন্দ্রীভূত করা হবে। সমস্ত নতুন অনুদানও ঐ গ্রামগুলোর জমি থেকেই দেওয়ার আদেশ জারি হয়।[২১] পরবর্তী শতকে 'মদদ-এ মআশ' অনুদানের জন্য কয়েকটি গ্রাম চিহ্নিত করে রাখাটা একটা প্রতিষ্ঠিত রীতিতে পরিণত হয়েছিল এমন কিছু সাক্ষ্য প্রমাণ আছে।[২২]

আবুল ফজল বলেছেন, বাঁধা নিয়ম ছিল এই যে অনুদানের অর্ধেক এলাকা দেওয়া হবে ইতিমধ্যেই আবাদ-হওয়া জমি থেকে, বাকি অর্ধেক আবাদযোগ্য অহল্যাভূমি থেকে। দ্বিতীয় ধরনের জমি যদি না পাওয়া যায়, তবে অনুদানের এলাকা একের-চার ভাগ কমিয়ে দেওয়া হবে।[২৩] অনুদানের মধ্যে কোন্ এলাকা আবাদযোগ্য অহল্যাভূমি আর কোন্‌টা আবাদী জমি, বহু নথিতে তা সযত্নে নির্দিষ্ট করা আছে।[২৪] কিন্তু কয়েকটিতে আরও এগিয়ে কড়ার করা হয়েছে যে পুরো অনুদানেই থাকবে আবাদযোগ্য অহল্যাভূমি, যেখান থেকে আগে রাজস্ব পাওয়া যেত না।[২৫]

২১. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, ২৪০; 'আইন', ১ম খণ্ড, ১৯৮, বদাউনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৪। সৌভাগ্যবশত, Allahabad 24-এ আকবরের আদেশনামাটির মূল পাঠ পাওয়া যায়। জুন ১৩, ১৫৭৮-এ এটি জারি করা হয়েছিল। এখানে বলা হয়েছে যে প্রাপকদের যাতে কোন স্থাবর সম্পত্তি ছেড়ে যেতে না হয়, তাই যেসব গ্রামে তাদের "মসজিদ, কুয়ো, বাড়ি, 'চৌপাল' (সর্বসাধারণের চালা), বাগান, ইত্যাদি" আছে, সেগুলোকে সেই সমস্ত গ্রামের মধ্যে নিয়ে আসা উচিত যেখানে সমস্ত অনুদান কেন্দ্রীভূত হওয়ার কথা। কিন্তু এ ব্যাপারে সর্বদা মনোযোগ দেওয়া হতো কিংবা যেত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বদাউনী অন্তত এ কথা বলতে ছাড়েননি যে এই ব্যবস্থার ফলে প্রাপকদের খুব দুর্দশায় পড়তে হতো।

২২. এইভাবে, 'সিয়াকনামা', ৪০ ইত্যাদি এবং 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৮খ, ৮২খ জাতীয় প্রশাসনিক পুস্তিকাগুলোয় কয়েকটি গ্রামকে 'দর-ও-বস্ত আইম্মা-এ উজ্জাম' শ্রেণীতে দেখানো আছে। অর্থাৎ এগুলোকে পুরোপুরি বাদশাহী 'আইম্মা' অনুদানের মধ্যে দেওয়া আছে এবং রাজস্ব-নির্ধারণের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আরও দ্রষ্টব্য 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬ যেখানে গুজরাটের ১০৩টি গ্রামকে 'মদদ-এ মআশ' অধিকারভুক্ত বলা হয়েছে।

২৩. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯।

২৪. শব্দ দুটি ছিল যথাক্রমে 'উফ্‌তাদা' ও 'মজরূ'। বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য শের শাহের ফরমান, 'ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন', ৯ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১২০-২ এবং Allahabad 318; আকবরের ফরমান, Allahabad II, 23 (Or. 1757, পৃ. ৩৯ক-৫১খ) এবং ৯৮৩ হিজরীর (গবেষণা গ্রন্থাগার, ইতিহাস বিভাগ, মুস্লিম বিশ্ববিদ্যালয়—ঋণসূত্রে); Allahabad 869 ও অন্যান্য।

২৫. চলতি নাম ছিল 'জমিন-এ উফ্‌তাদা লাইক-এ জিরাৎ-খারিজ-এ জমা'। দ্রষ্টব্য: I.O. 4438: (3); Or. 11,697; Allahabad 874, 881; 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ১১৭ক-১১৮ক, Bodl. পৃ. ৯১ক; I.O. 4435; 'দুর-আল উলূম', পৃ. ১৩৮ক-খ; বেকাস,

প্রাপকরা সম্ভবত তাদের বরাদ্দ অহল্যাভূমিতেই সচরাচর তাদের 'খুদ-কাস্তা' জোত কায়েম করত। এই ধরনের জমি ('খুদ-কাস্তা') কখনও মূল অনুদানে দেখা যায় না, শুধুমাত্র বহালের আদেশনামাতেই দেখা যায়।[২৬] এও সম্ভব যে 'খুদ-কাস্তা' জমির অধিকাংশই ছিল প্রাপকদের রোপন-করা বাগিচা।[২৭]

আওরঙ্গজেবের একটি ফরমানে 'মদদ-এ মআশ'-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এই বলে যে এটি হলো ঋণ হিসেবে ('আরিয়ৎ') অধিকৃত [জমি]।[২৮] অর্থাৎ পুরো স্বত্বাধিকারের দখল দিয়ে প্রাপককে এটি হস্তান্তর করা হতো না, শুধুমাত্র বাদশাহের খুশিমতো তার অধিকারে থাকত। ফরমানে কোন বছরের মেয়াদ দেওয়া থাকত না, প্রাপক সাধারণত তাঁর জীবদ্দশায় অবাধে এই অনুদান ভোগ করতেন। কিন্তু যে কোন সময়ে এটি ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার বাদশাহের ছিল। আকবরের আমলে পাইকারী হারে অনুদান ফিরিয়ে নেওয়া ও কমিয়ে দেওয়ার ঘটনা দেখা যায়। এরকম করা হতো এই সন্দেহের বশে যে অনুদান নেওয়া হয়েছে অসৎ উপায়ে বা তঞ্চকতা করে, কিংবা এটি ছিল শুধু বিশেষ কয়েক শ্রেণীর প্রাপকের বিরুদ্ধে গৃহীত নীতির অঙ্গ।[২৯]

পৃ. ৩১খ ('উফ্‌তাদা'-র জায়গায় 'বন্‌জর' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে)। অহল্যাভূমি অনুদানের ওপর বিশেষ জোর দেওয়াটা বোধহয় মুঘলদের আবিষ্কার নয়। তুলনীয় 'ইন্‌শা-এ মাহ্‌রু', ফিরুজ শাহ্‌ তুঘলকের সমসাময়িক আইনুল মুল্‌ক্‌ মুলতানীর চিঠিপত্র, ডঃ আই. এইচ. কুরেশী কর্তৃক উদ্ধৃত, *IHRC*, খণ্ড ২১ (১৯৪৪), পৃ ৬১।

কর্তৃপক্ষ, মনে হয়, এ ব্যাপারেও চিন্তিত থাকতেন যাতে প্রাপকরা মামুলী রাজস্ব-প্রদায়ী জমি থেকে চাষীদের টেনে নিয়ে আবাদ বাড়ানোর কাজে না লাগায়। তাই বেকাস, পৃ. ৩১-খ-তে দেখা যায়, এক 'মুকদ্দম' কড়ার করেছে যে যতদিন-না বাকি জমি চাষ হচ্ছে ততদিন 'অমলাক'-এ (বা 'মদদ-এ মআশ' জমিতে) বীজ বোনার কাজ সে হতে দেবে না।

২৬. যেমন, আকবরের একাধিক ফরমান। Allahabad II, 23 (Or. 1757, পৃ. ৩৯ক-৫১খ) এবং হিজরী ৯৮৩-র (গবেষণা গ্রন্থাগার, ইতিহাস বিভাগ, মুস্লিম বিশ্ববিদ্যালয়—ঋণসূত্রে)। এখানে অনুদানের জমি প্রথমে ভাগ করা হয়েছে 'উফ্‌তাদা' ও 'মজরূআ' এই দুভাগে; পরে 'মজরূআ' জমিকে আবার 'রাইয়তী' ও 'খুদ-কাস্তা'য় ভাগ করা হয়েছে।

২৭. আবুল ফজল ভরসা দিয়েছেন যে "শান্তি এবং নিরাপত্তা আসার ফলে" প্রাপকরা "তাদের জমিতে ফলের বাগান করত এবং প্রচুর মুনাফা করত"। ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯)। মোদীর 'পার্সীস্‌ অ্যাট দা কোর্ট অফ আকবর'-এর ৪নং নথিতে দেখানো হয়েছে যে 'খুদ্‌-কাস্তা' জমির বেশির ভাগটাই ছিল খেজুর, নারকেল এবং অন্যান্য গাছের বাগান।

২৮. ৩৪-তম বছরে জারি-করা ফরমান, Allahabad II, 53 এবং 55.

২৯. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৩-৪; 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮-৯; বদাউনী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৪-৫, ২৭৪-৭, ৩১৫, ৩৪৩, ৩৬৮; ফৈজী সিরহিন্দী, পৃ. ১৪৭ক-১৪৯ক, ১৮৫ক-১৮৬ক; আব্বাস খান, পৃ. ৮৬ ক-খ। আকবরের রাজত্বের ৪৮-তম বছরে জারি-করা খান-এ খানান-এর একটি হুকুম থেকে মনে হয় যে বাদশাহী নির্দেশ অনুযায়ী সেই বছর গুজরাটে 'মদদ-এ মআশ' অনুদান কমিয়ে অর্ধেক করা হয়েছিল। (মোদীর 'পার্সীস্‌ অ্যাট দা কোর্ট অফ আকবর', ৩নং নথি)।

তাঁর বাবার দেওয়া সমস্ত অনুদান জাহাঙ্গীর বহাল করেছিলেন—এই ঘটনার মধ্যেও বাদশাহী অধিকারের কথা নিহিত আছে।[৩০] শাহ্‌জাহানের আমলে, তখনও পর্যন্ত প্রদত্ত সমস্ত অনুদান পরীক্ষা করে অযোগ্য লোকদের হাত থেকে অনুদান ফিরিয়ে নেওয়ার একটা চেষ্টা সত্যিই হয়েছিল।[৩১] 'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী'তে দেখা যায়, 'সদর'দের বলা হয়েছে তারা যেন সেই সমস্ত লোকদের অনুদান খালিসা-য় ফিরিয়ে নেয়, যারা পালিয়ে গেছে বা মারা গেছে অথবা একই অনুদান ব্যবহার করে অন্য জায়গায় জমি নিয়েছে কিংবা অনুদানটিই পেয়েছে জালিয়াতি বা জোচ্চুরি করে।[৩১ক] এতে অবশ্য বলা হয়েছে, জাগীরদারদের হামলার হাত থেকে অন্যান্য প্রাপকদের রক্ষা করতে হবে। জাগীরদাররা প্রায়ই তাদের অনুদান ফিরিয়ে নিত এবং কোন-না কোন ছুতোয় তাদের ওপর রাজস্ব ধার্য করত।[৩১খ]

'মদদ-এ মআশ' থেকে যে কোন স্বত্বাধিকার জন্মাত না—তা এই ঘটনা থেকেও বোঝা যায় যে প্রাপক কখনোই এই অধিকার হস্তান্তর বা বিক্রি করতে পারত না।[৩২]

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, অনুদান পাওয়ার জন্য, বিশেষ করে অনুমোদিত এলাকার চেয়ে বেশি পাওযার জন্য, প্রাপকরা এত বেশি জাল-জোচ্চুরি করত যে, জাল করে ফরমানে অদল-বদল থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য শেরশাহ্ কিছু ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছিলেন (আব্বাস খান, পৃ. ১১২খ-১১৩ক)। আওরঙ্গজেবকে জানানো হয়েছিল যে, এমনকি অনুদানের সরকারী দলিলগুলোতেও জালিয়াতি হয়েছে ('ইয়াদ্দাস্ত-এ আইম্মা-এ মদদ-এ মআশ') ('অখবারাৎ' ৪৭/৩২৩)।

৩০. 'তুজুক্-এ জাহাঙ্গীরী', পৃ. ২১। আওরঙ্গজেবও অনুরূপ একটি আদেশ জারি করেছিলেন। রাজা রঘুনাথের পরওয়ানায় এর উল্লেখ দ্রষ্টব্য, Allahabad II, 284.

৩১. লাহোরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৫-৬; সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ১০৩খ-১০৪খ; Or. 1671, পৃ. ৫৬খ-৫৭ক। শাহ্‌জাহানের রাজত্বের ১৭-তম বছরে এই ব্যবস্থা নেওয়ার কথা হয়েছিল, কিন্তু কোন কাজ হয়নি। শাহ্‌জাহানের প্রিয় কন্যা জাহানারা খুব গুরুতরভাবে পুড়ে যান। প্রাপকদের অভিশাপকেই এই দুর্ঘটনার কারণ মনে করে কুসংস্কারাচ্ছন্ন পিতা তাঁর আদেশ কার্যত ফিরিয়ে নেন।

৩১ক. 'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী', ১৯২।

৩১খ. ঐ, ১৯১-২; আরও দ্রষ্টব্য ১৫৮।

৩২. একটি বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্তে (জানুয়ারি, ১৬৬৬) স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে "শরীয়ৎ অনুসারে 'মদদ-এ মআশ'-এর জমি হস্তান্তরযোগ্য নয় ('কাবিল-এ তমলীক নীস্ত')" (Allahabad 1189)। "বাদশাহী নিয়ম এই যে 'আইম্মা' জমি বিক্রি করা যাবে না" (Add. 6603, পৃ. ৪৮ক)। ১৮ শতকে মুঘল প্রশাসন ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়ম স্বভাবতই আর বলবৎ করা যেত না এবং 'মদদ-এ মআশ' অধিকার তখন খোলাখুলিই বিক্রি হতে থাকে (যেমন, ১৭৬৪ খৃস্টাব্দের Allahabad 457 দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু, প্রাপকরা তাঁদের অনুদান হস্তান্তর করতে না পারলেও, নিজেরা যতদিনের জন্য জমির অধিকারী হতেন, তার মধ্যে, মনে হয়, অন্য লোককে জমি হস্তান্তর করতে পারতেন।

এইভাবে, বাদশাহী আদেশ ছাড়া এটি ওয়ারিশদের হাতে যেত না। আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ে, মনে হয়, ওয়ারিশদের কোন নিয়মিত ব্যবস্থা করা হয়নি। অনুমোদন পুনর্বহাল করার জন্য ওয়ারিশদের আবেদন করতে হতো এবং তাকে সাধারণত অংশমাত্র রাখতে দেওয়া হতো।[৩৩] শাহ্‌জাহানের আমলে প্রথম কিছু

তাই Allahabad 296-এ দেখা যায়, ১৫৯৬-এর মতো অত আগেও একদল 'মদদ-এ মআশ' অধিকারী ঘোষণা করছে যে, তারা তাদের অনুদানের মধ্যে থেকে ২৯ বিঘা জমি হস্তান্তর করেছে জনৈক মিঞা হমীদউদ্দীনের কাছে, কারণ তার বদলে সে 'পসমানা'-র কাজ, অর্থাৎ তাদের বাকি জমি পাহারা দেওয়া বা রক্ষা করার কথা দিয়েছে। অনুদানের সময়সীমা ছিল "যতদিন পর্যন্ত গ্রামে তাদের 'মদদ-এ মআশ' হস্তান্তরকারীদের কাছে থাকবে" (তুলনীয় Allahabad 279 এবং 280)। সুতরাং, হমীদউদ্দীন জমিটির ওপর তাঁর নিজের কোন স্বাধীন অধিকার প্রতিষ্ঠা করেননি। প্রাপকরা এক বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য তাদের অধিকার দিতে পারত (Allahabad 892 এবং 1230), কিন্তু অনুদান ফিরিয়ে নেওয়া হলে বা সেটির হাতবদল হলে সম্ভবত ইজারার মেয়াদও শেষ হয়ে যেত।

৩৩. কোন লোক মারা গেলে বা ফেরারি হলে রাজস্ব আদায়কারীকে তার অনুদান বাজেয়াপ্ত করতে বলা হয়েছে ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৭)। এতে আরও বলা হয়েছে (১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯) যে, স্থির করা হয়েছিল, "যদি একদল লোককে অনুদান দেওয়া হয়, এবং 'জিমন'-এর ওপর প্রত্যেক প্রাপকের ভাগ না নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে, আর প্রাপকদের মধ্যে একজন যদি মারা যায় তবে 'সদর' সেই মৃত লোকটির ভাগ ঠিক করবে এবং যতদিন পর্যন্ত না জীবিতরা (ওয়ারিশরা?) তাদের নিজেদের (নাকি তাদের মামলা?) দরবারে হাজির করছে, ততদিন সেই অংশটুকু খালিসা য় ফিরিয়ে নিতে হবে।" ফৈজী সিরহিন্দীকে কীভাবে পিতার মৃত্যুর পর তাঁর অধিকৃত অনুদান নতুন করে নিতে হয়েছিল, সে বিষয়ে তাঁর বিবরণী দ্রষ্টব্য (পৃ. ১৩৯খ-১৪১খ)। মনে হয়, আকবর এটা দেখে খুবই অবাক হয়েছিলেন যে বাবার অনুদানের পুরোটাই ছেলেকে দেওয়া হয়েছে (পৃ. ১৪৮ক-১৪৯ক)। আরও তুলনীয় বদাউনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৮। সেখানে বলা হয়েছে যে, প্রাপকরা "অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার জন্য" (অর্থাৎ মৃত্যুর জন্য) মীর ফতহ্‌উল্লা সিরাজীর 'শিকদার' "বিধবা এবং অনাথদের" কাছ থেকে অনুদান ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। জাহাঙ্গীরের একটি ফরমানে বিহারে ৩,৫০০ বিঘার একটি অনুদান সম্পর্কে আলোচনা আছে। অনুদানটির অধিকারী মারা গিয়েছিলেন। এর মধ্যে ১০০০ বিঘা আবার অনুদান দেওয়া হয়: ৭০০ বিঘা বিধবাটিকে আর ৩০০ বিঘা যে-ছেলেটি দরবারে হাজির ছিল তাকে। অন্য যে-ছেলেটি তখনও পর্যন্ত কোন আবেদন করেনি, তার সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি (*IHRC*, খণ্ড ২৬, ২য় ভাগ, পৃ. ৩-৪)। শাহ্‌জাহানের ১৬-তম বছরে পাঞ্জাবের বতালা পরগনার একটি অনুদান সংক্রান্ত পরওয়ানা জারি করা হয়। অনুদানটি আসলে দেওয়া হয়েছিল ১৫৭১ সালে। এই অনুদান যে-লোকদের নামে ছিল তাঁদের সবাই ততদিনে মারা গিয়েছিলেন। আগের 'সদর'রা তাই মোট অনুদান ১০৭ বিঘা ৮ 'বিশ্বা'-র মধ্যে ৪৯ বিঘা ফিরিয়ে নিয়েছিলেন আর বাকি অংশটুকু আবার ভাগ করে দিয়েছিলেন ওয়ারিশদের মধ্যে। সেই সময় উত্তরাধিকারীরা আবার নতুন করে আবেদন

নিয়মের কথা শোনা যায় যাতে ওয়ারিশদের একটা অংশের ভাগ সরাসরি উত্তরাধিকারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের তৃতীয় বছরে দিওয়ান রাজা রঘুনাথের জারি-করা একটি পরওয়ানায় শাহ্জাহান এবং আওরঙ্গজেবের আমলের গোড়ার দিকের আদেশনামাগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া আছে।[৩৪] শাহ্জাহানের রাজত্বের পঞ্চম বছরে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, ৩০ বিঘা বা তার কম সমস্ত অনুদানেরই পুরোটাই প্রাপকের মৃত্যুর পর ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। অনুদানের এলাকা যদি আরও বড় হয় তবে ওয়ারিশদের মধ্যে তার অর্ধেক ভাগ করে বাকি অর্ধেক ফিরিয়ে নেওয়া হবে, যদি-না ওয়ারিশরা দরবারে এসে তাদের যোগ্যতার (ইস্তিহ্কাক') প্রমাণ দিয়ে এই অংশের জন্যও সনদ পায়। ১৮-তম বছরের একটি আদেশে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রাপকের নামের পর যদি "তাঁর সন্তানাদি সমেত" এই কথা লেখা থাকে, শুধুমাত্র তবেই ওয়ারিশদের অর্ধেক অংশ পাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে ; নাহলে পুরো অনুদানই ফিরিয়ে নেওয়া হবে।[৩৫] আওরঙ্গজেব তাঁর রাজত্বের গোড়ার দিকে এই শর্ত তুলে নেন এবং শাহ্জাহানের আমলের পঞ্চম বছরে যে অবস্থা ছিল তাঁর রাজত্বের তৃতীয় বছরে কার্যত সেখানেই ফিরে যান। তফাৎ শুধু এই যে, ওয়ারিশদের কাছে পুরো অনুদান বর্তানোর ঊর্ধ্বসীমা ঠিক হয় ২০ বিঘা। তার ওপরের সমস্ত অনুদানের ক্ষেত্রে আগের মতোই অর্ধেক ফিরিয়ে নেওয়া হবে, যদি-না ওয়ারিশরা দরবার থেকে নতুন অনুদান হিসেবে সেই ভাগ পেয়ে থাকে।

অবশ্য ৩৪-তম বছরে (১৬৯০) আওরঙ্গজেব একটি ফরমান জারি করেন, যাতে

করেছিলেন এবং বাজেয়াপ্ত অংশটিও (পারিভাষিক নাম 'বাজেয়াফ্‌ৎ-এ মুতাওয়াফ্‌ফি') মঞ্জুর করার আদেশ দেওয়া হয় (I O. 4138 : (7))।

৩৪. Allahabad II, 284 (তাং জানুয়ারি ১০, ১৬৬১)।

৩৫. 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ১৫৫খ থেকেও এ ব্যাপারে নিশ্চিত সমর্থন পাওয়া যায়। লাহোরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৬, মনে হয়, ঐ একই আদেশ প্রসঙ্গে বলেছেন যে কোন অনুদানের ফরমানে "তাঁর সন্তানাদি সমেত" এই কথাগুলো ব্যবহার করা হলে যেন পুরো অনুদানই ছেলেদের দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এ কথাটি বোধহয় কলম ফস্‌কে বেরিয়ে গেছে। "তাঁর সন্তানাদি সমেত" এই বাঁধাগৎ ফরমানগুলোতে তুলনামূলকভাবে কমই পাওয়া যায়। আমি যেসব নথি দেখেছি তার মধ্যে এটি পাওয়া যায় হিজরী ৯৮৩-র আকবরের ফরমানে, জাহাঙ্গীরের ২১-তম বছরের ফরমানে (হোদিবালা, 'স্টাডিস্ ইন পার্সী হিস্ট্রি,' পৃ. ১৭৫-এ মূলপাঠ, বই-এর শেষে আলোকচিত্র-প্রতিলিপি), হাদিকীর সংগ্রহের একটি অনুদানের আদেশনামার নমুনায় Br. M. Royal 168, XXIII, পৃ. ১৭ক-খ, এবং আওরঙ্গজেবের ৪০-তম বছরে মুয়াজ্জমের 'নিশান'-এ (*IHRC*, খণ্ড ১৮ (১৯৪২), পৃ. ২৪২-৩)। শাহ্জাহানের আদেশের কড়া শর্তগুলো, মনে হয়, ব্যাপকভাবে এড়িয়ে যাওয়া হতো, কারণ রঘুনাথের পরওয়ানায় স্বীকার করা হয়েছে যে স্থানীয় 'সদর'রা ('সদর এ জুজ্‌ভ্') কোন কোন ক্ষেত্রে ওয়ারিশদের মূল অনুদানের অর্ধেক, কখনও বা পুরোটাই দিয়ে দিতেন। পরবর্তী 'সদর'রা ঐ ধরনের অনুদান ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু আওরঙ্গজেবের রাজত্বের তৃতীয় বছরের একটি আদেশে এ কাজ করতে নিষেধ করা হয়।

'মদদ-এ মআশ'কে পুরোপুরি বংশগত করে দেওয়া হয়। এতে ঘোষণা করা হয় যে, এরপর থেকে "মৃত প্রাপকদের ওয়ারিশরা পুরনো ও নতুন, বৈধ ফরমান মারফৎ দেওয়া প্রাপকদের জমি ('আইম্মা-এ উম্মাম'), অখণ্ড ও সম্পূর্ণভাবে, বিনা ক্ষয়ক্ষতিতে, পুরুষানুক্রমে রক্ষা করতে পারবে"। তাহলেও ফরমানে বলা হয়েছে যে, 'মদদ-এ মআশ' যেহেতু ঋণের ('আরিয়ৎ') বস্তু, সম্পত্তি নয়, তাই এর ওয়ারিশন বাদশাহী আদেশ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে, (অর্থাৎ পরোক্ষে বলা হলো) 'শরীয়ৎ' অনুযায়ী নয়। এইভাবে ঠাকুর্দার মৃত্যুর আগেই বাবার মৃত্যু হলে নাতিকে সরাসরি একটা ভাগের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে; মেয়েকে তার ভাগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং ফরমানে বলা হয়েছে, বিধবা তার স্বামীর অনুদান আজীবন রেখে দিতে পারবে, তারপর সেটি তার স্বামীর ওয়ারিশদের হাতে চলে যাবে।[৩৬]

খাতায়-কলমে 'মদদ-এ মআশ' অনুদান ছিল "আল্লার দরিদ্র ও নিঃস্ব জীবদের" ভরণপোষণের জন্য বদান্যতা।[৩৭] যারা চাকরি বা অন্য ব্যবসা করত এবং জীবিকার অন্য উপায় ছিল তারা ঠিক এই অনুদান পাওয়ার অধিকারী ছিল না।[৩৮] আবুল ফজলের কথা অনুযায়ী 'মদদ এ মআশ' ছিল বিশেষভাবে চার শ্রেণীর লোকদের জন্য: জ্ঞানী; ধার্মিক; জীবিকার উপায়হীন অসহায় লোক; এবং যে-অভিজাত বংশীয়রা "অজ্ঞতার দরুন" কোন চাকরি নেবে না।[৩৯] সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের

৩৬. Allahabad, II, 53 এবং 55 (ফরমানটির দুটি কপি)। বাবার মৃত্যু আগেই ছেলে মারা গেলে তার সন্তানদের ওয়ারিশনের ভাগ দেওয়াটা শুধু শরীয়ৎকেই অমান্য করত না, এটি ছিল পূর্বতন রীতিরও বিরোধী। ১৮-তম বছরে জারি-করা শাহ্জাহানের আদেশের যে-শর্তগুলো রাজা রঘুনাথের পরওয়ানায় সংক্ষেপে দেওয়া আছে, তার থেকে দেখা যায় যে, ওয়ারিশ হিসেবে নাতিও ভাগ পেতে পারে কেবলমাত্র যদি প্রাপকের নামের পাশে "তাঁর সন্তানাদি সমেত" এই কথাগুলো থাকে। এমন একটা ঘটনা নথিভুক্ত আছে: শাহ্জাহানের আমলে একজন লোককে তার ঠাকুর্দার অনুদানের ভাগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। সে তার দাবি পেশ করে ১৬৯৭ সালে। এই দাবি মানা হয়নি। তার কারণ বোধহয় এই যে ১৬৯০ সালে আওরঙ্গজেবের জারি-করা ফরমানটি যে পূর্বানুক্রমিকভাবে কার্যকর হবে এমন কথা ছিল না (Allahabad 1228 এবং 1229)।

৩৭. ১৬৯০ সালে আওরঙ্গজেবের জারি-করা ফরমানের প্রস্তাবনা দ্রষ্টব্য (Allahabad II, 53 এবং 55)।

৩৮. যদি দেখা যেত যে প্রাপকের "চাকরি আছে" ('নৌকর') তাহলেও অনুদান বাজেয়াপ্ত করা যেত ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৭)। শাহ্জাহানের রাজত্বের ১৮-তম বছরে শর্ত অনুযায়ী প্রাপক "'কাসব' (অর্থাৎ কোন ব্যবসা করতে) বা 'নৌকর' (চাকরিতে নিযুক্ত) হতে পারবে না।" রাজা রঘুনাথের 'পরওয়ানা'য় আদেশটির সংক্ষিপ্তসার অনুযায়ী ব্যাপারটা তাই দাঁড়ায়। লাহোরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৬, আরও নির্দিষ্ট করে ঐ একই আদেশের উল্লেখ করেছেন এবং কেবলমাত্র সেইসব অনুদানকেই প্রত্যর্পণযোগ্য বলেছেন যার প্রাপকরা ছিলেন 'সৈনিক বা কারিগর'।

৩৯. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮, 'মজহার-এ শাহ্জাহানী', ১৯০-৯১-এ তিন শ্রেণীর লোককে 'মদদ-এ মআশ' অনুদান পাওয়ার যথার্থ উপযুক্ত বলা হয়েছে: ১. যেসব কর্মচারী

মেয়েরাও প্রায়ই এই অনুদান পেতেন,[৪০] কিন্তু তাঁরাও সম্ভবত আবুল ফজলের তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়েন। তবু, আরও কিছু প্রাপক ছিলেন যাঁরা এই চারটি শ্রেণীর কোনোটিতেই পড়েন না, যদিও তাঁদের সংখ্যা বোধহয় খুব কম। গুজরাটে অনুদান-সংক্রান্ত একগুচ্ছ নথি থেকে দেখা যায় যে একটি বিশেষ কারণে এই অনুদান দেওয়া হয়েছে। অনুদানের ফলে উপকৃত হয়েছিলেন কয়েকজন চিকিৎসক, যাঁরা ঐ অঞ্চলের "গরীব ও নিঃস্ব"দের চিকিৎসা করতেন।[৪১] বার্ধক্য বা অন্য কোন কারণে যেসব কর্মচারী আর চাকরি করতে পারতেন না তাঁদেরও 'মদদ-এ মআশ' অনুদান মারফৎ অবসরবৃত্তি দিয়ে দেওয়া হতো।[৪২] এছাড়াও কখনও কখনও অনুগ্রহের চিহ্ন বা কাজের পুরস্কার হিসেবে ছোটখাট কর্মচারী ও অন্যান্যদের এই অনুদান দেওয়া হতো।[৪৩]

বেতনের বদলে অনুদান পেত; ২. "পণ্ডিত ও ('কুরান'-এর) স্মৃতিধর"; এবং ৩. "সৈয়দ, শেখ এবং মুঘল বংশের লোক, যারা আরও বড় প্রাপ্তির লোভ ত্যাগ করে এক কোণে চলে গেছে আর দরবার থেকে সামান্য 'মদদ-এ মআশ' পেয়েই সন্তুষ্ট থাকছে এবং যাদের জীবিকার অন্য কোন উপায় নেই।" বাদশাহী কর্মচারীদের যে শ্রেণীটি ('কাজী' ইত্যাদি) এই অনুদান পেত, তার কথা নীচে দ্রষ্টব্য।

৪০. জাহাঙ্গীর তাঁর বাবার একজন পালিতা কন্যাকে মেয়েদের দেওয়া অনুদানগুলোর দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন ('তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ২১)। আবুল ফজলও "ইরানী এবং তুরানী মহিলাদের" অধিকৃত অনুদানের কথা বলেছেন ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ ১৯৮-৯)। মহিলাদের দেওয়া প্রকৃত অনুদানের অল্প কয়েকটি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্তের জন্য দ্রষ্টব্য 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ৮৩; Allahabad 5 এবং 874; I.O. 4435; 'দুর্-আল উলুম', পৃ. ১৩৮ক-খ ইত্যাদি। 'মজহার-এ শাহ্জাহানী', ১৫৮-য় প্রসঙ্গক্রমে দু শ্রেণীর 'আইম্মা চক' (জমি)-এর উল্লেখ করা হয়েছে: 'চক-হা-এ মুসম্মাতী' (মহিলাদের অধিকৃত জমি), 'মুজক্করাতী' (পুরুষদের অধিকৃত)।

৪১. হোদিবালা, 'স্টাডিস্ ইন পার্সী হিস্ট্রি', পৃ. ১৬৭-১৮৮-র নথিগুলো (মূল ও অনুবাদ) দ্রষ্টব্য এবং বিশেষত দ্রষ্টব্য আওরঙ্গজেবের আমলের একটি নথিতে এই মর্মে একটি প্রকাশ্য সাক্ষ্য (পৃ. ১৮৫-৬-য় মূল পাঠ এবং বইটির শেষে আলোকচিত্র-প্রতিলিপি, এবং পৃ. ১৮৮-তে হোদিবালার নিজের মন্তব্য)।

৪২. লাহোরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৮-৯, 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ১৫৩খ, ওয়ারিস, ক: পৃ. ৪৯৯ক; খ: পৃ. ১৪৮খ-১৪৯ক।

৪৩. 'তবাকৎ-এ আকবরী', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৬; 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', পৃ. ৩২। সমস্ত 'চৌধুরী'কে আকবর তাদের 'সুয়ুরগাল' থেকে বঞ্চিত করেছিলেন ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮)।

'মজহার-এ শাহ্জাহানী', ১৯১, অনুযায়ী, উল্লিখিত তিন শ্রেণীর যথার্থ অনুদানযোগ্য প্রাপক (৩৯নং টীকা দ্রষ্টব্য) ছাড়াও ছিল একটি চতুর্থ শ্রেণী। এই শ্রেণীতে পড়ত সেইসব "জমিনদার যারা 'অরবাব' ('চৌধুরী') এবং 'মুকদ্দম'ও বটে।" বইটিতে বলা হয়েছে যে, আকবর এবং জাহাঙ্গীরের আমলে এইসব লোকদের অনুদান দেওয়া হতো না কিন্তু নুরজাহানের

'মদদ-এ মআশ' অনুদানের বেশির ভাগটাই, মনে হয়, ভোগ করতেন সেইসব লোক যাঁরা প্রকৃতপক্ষে আবুল ফজলের প্রথম দুটি শ্রেণীর মধ্যে পড়েন বা পড়েন বলে ভান করতেন। জ্ঞান ও ধর্মচর্চা ছিল তৎকালীন মুসলিমদের একটিমাত্র বিশেষ শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার। এই শ্রেণীর লোকরা ভাবতেন, 'মদদ-এ মআশ' অনুদান শুধু তাঁদেরই উপকারে লাগবে।[৪৪] এই বিশ্বাস খুব একটা অবাস্তব ছিল না। প্রাপকদের সাধারণ নাম হিসেবে এমনকি সরকারী নথিপত্রেও 'আইম্মা' এবং 'মখাদীম' শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়েছে। দুটি শব্দেরই অর্থ ধর্মগুরু।[৪৫] 'মদদ-এ মআশ'-এর জন্য যোগ্যতা ('ইস্তিহ্কাক') প্রমাণ করার শ্রেষ্ঠ উপায়টি ফৈজী সিরহিন্দীর লেখায় সংরক্ষিত আছে। তা হলো শরীয়ৎ-এর কোন তুচ্ছাতিতুচ্ছ দুর্বোধ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান ফলানো।[৪৬] কিন্তু অনুদান পাওয়ার জন্য বোধহয় ঐ জাতীয় জ্ঞানও অবশ্য-

রাজত্বে তারা টাকা দিয়ে ফরমান পেয়ে যায়। এখানে এই পদ্ধতি অনুমোদন করা হয়নি, কারণ এই সব স্থানীয় কর্মচারী তাদের কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে সবচেয়ে ভালো জমি আদায় করত আর নিজেরা একটুও গতর না খাটিয়ে চাষীদের সেই জমি চাষ করতে বাধ্য করত।

৪৪. আব্বাস খান, পৃ. ১১৩ ক (তিনি নিজেই একজন প্রাপকের পুত্র) শের শাহের মুখে এই কথাগুলো বসিয়েছেন: "'আইম্মা'কে 'মদদ-এ মআশ' দেওয়া বাদশাহের অবশ্য কর্তব্য, কারণ ভারতের শহরগুলোর জাঁকজমকের কারণ হলো এই সব ধর্মজ্ঞ ('আইম্মা ও মখাদীম')।" শের শাহ্ সত্যিই এরকম ভাবতেন বলে মনে হয় না, কারণ তাঁর একজন বিশ্বস্ত অনুচর, হাসান আলী খান বলেছেন যে, তিনি সব "মোল্লা"কে ফাঁসিতে লটকাতে চেয়েছিলেন! (ত্রিপাঠী-কৃত অনুবাদ, 'মিডিয়েভাল ইণ্ডিয়া কোয়ার্টার্লি', খণ্ড ১, নং ১ (জুলাই ১৯৫০), পৃ. ৬৫)। শুধু মুসলমান ধর্মজ্ঞরাই অনুদান পাবার যোগ্য—এই ধারণার জন্য বদাউনী, ২য় খণ্ড, ২০৪-৫ দ্রষ্টব্য। তাঁর কথা অনুযায়ী, 'মদদ এ মআশ'-এর সবচেয়ে যোগ্য দাবিদার হতে পারতেন, "'হিদায়া' (মুসলিম আইনের বিখ্যাত পাঠ্যপুস্তক) ও অন্যান্য উচ্চতর গ্রন্থের শিক্ষকরা।" তিনি দুঃখ করেছেন যে ১৫৭৫ সালে যখন অনুদানগুলো পরীক্ষা করে দেখা হয়, তখন এমনকি এই সমস্ত লোকদের খুব বেশি হলে ১০০ বিঘা অনুদান দেওয়া হয়েছিল, তাও বিস্তর ঝক্কি-ঝামেলা করে।

৪৫. 'আইম্মা' শব্দটির ব্যবহার নিয়ে আগের একটি টীকায় আলোচনা করা হয়েছে। ঐ একই অর্থে 'মখাদীম' শব্দটির ব্যবহারের জন্য আকবরের একটি আদেশনামা দ্রষ্টব্য। সেখানে অনুদানগুলোকে কয়েকটি গ্রামে কেন্দ্রীভূত করতে বলা হয়েছে (Allahabad 24)। আরও তুলনীয় আব্বাস খান, পৃ. ১১২খ-১১৩ক।

৪৬. 'সইদানা আকবরিয়া' নামে একটি সন্দর্ভ রচনা করে, ফৈজী সিরহিন্দী সেটি 'সদর' শেখ আবদুল নবী-র কাছে পেশ করেন ও তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তাঁর পুরো অনুদানই পেয়ে যান। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শরীয়ৎ-এর বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই সন্দর্ভে তিনি "আস্থাভাজন গ্রন্থাদি থেকে নির্ভরযোগ্য পরম্পরা" সংগ্রহ করেন। বিষয়টি ছিল: চিতা যদি হরিণের ঘাড় কামড়ে ধরে তবে আইন মোতাবেক কী করে হরিণটিকে জবাই করা যায়! আকবরের দরবারী ধর্মজ্ঞদের মধ্যে তখন এই নিয়ে উত্তপ্ত বিচার-বিতর্ক চলছিল (ফৈজী সিরহিন্দী, পৃ. ১৩৯খ-১৪১খ)।

প্রয়োজনীয় ছিল না। পীর-মুর্শিদ ও ফকিরের বংশধরকে এই অনুদান পাওয়ার যোগ্য বলে ধরা হতো। কিন্তু প্রায়শই বিদ্যা বা গোঁড়ামির জন্য বিখ্যাত, বা সম্ভ্রান্ত বলে গণ্য, পরিবারের লোক হলেই চলত; ব্যক্তিগত গুণপনার প্রসঙ্গ উঠত না।[৪৭] এদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল এক পরগাছা শ্রেণী। চাকরি ও ব্যবসা থেকে এরা বাদ পড়ে গিয়েছিল, সর্বক্ষণ ধর্ম নিয়ে পড়াশুনা করার ক্ষমতাও এদের ছিল না। তাই মনে হয়, জমিকেই এরা উচ্চাশার সেরা লক্ষ্য বলে ধরে নিয়েছিল। অযোধ্যা থেকে পাওয়া ১৭ শতকের একটি পরিবারের দলিল-দস্তাবেজ থেকে স্পষ্টই দেখা যায় কীভাবে বড় 'মদদ-এ মআশ' অনুদানের অধিকারীরা অবাধে জমিনদারী অর্জন করছে, এমনকি ইজারাদারের কাজও করছে।[৪৮] এইসব ঐহিক কাজকর্মেই তারা ডুবে থাকত। যখনই কেউ তাদের পরিচয়পত্র যাচাই করে দেখার প্রস্তাব দিত, স্বভাবতই তারা প্রচণ্ড আতঙ্কিত হয়ে উঠত।[৪৯]

এই শ্রেণীটিকে রক্ষা করায় রাষ্ট্রের নিজেরও স্বার্থ ছিল। জাহাঙ্গীর এদের বলেছেন 'প্রার্থনার সেনাবাহিনী'।[৫০] তিনি নাকি বলেছিলেন, এই বাহিনী সাম্রাজ্যের পক্ষে

৪৭. তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত (ওপরের ৩৯নং টীকা দ্রষ্টব্য) প্রাপকদের বর্ণনার জন্য দ্রষ্টব্য 'মজহাব-এ শাহ্জাহানী', ১৯১। বংশধারার ভিত্তিতে দেওয়া একটি অনুদানের জন্য দ্রষ্টব্য Allahabad 8, আর যারা সংসার ত্যাগ করেছে বলে মনে করা হয়েছিল তাদের উদ্দেশে একটি অনুদানের জন্য দ্রষ্টব্য I.O. 4433 এবং Allahabad 1117. মনে হয় বেশির ভাগ অনুদান শেখ এবং সৈয়দদেরই দেওয়া হতো। বলা হয়েছে যে তাদের সকলেরই যথেষ্ট "যোগ্যতা" ('ইস্তিহ্কাক') ছিল, কিন্তু নথিপত্রে কখনোই তাদের গুণাবলী সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছু বলা হয়নি। "সম্ভ্রান্ততা"ই তাদের একমাত্র গুণ ছিল বলে মনে হয়। একটি পরগনার রাজস্ব থেকে নগদ-অনুদান বহাল করার এক আবেদনের সপক্ষে একমাত্র যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, "সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের ('সুরাফা'), বিশেষত উক্ত ব্যক্তিকে ঐ জনশূন্য স্থানে (নিশ্চয়ই, আলঙ্কারিক অর্থে) প্রতিষ্ঠা করা বস্তুতপক্ষে সমগ্র জেলার (ঐশ্বরিক) অনুগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় এবং আশীর্বাদের চিহ্নস্বরূপ" (মুহম্মদ জাফর, 'ইন্শা-এ আজীব', ১৭০৬-৭ খৃস্টাব্দে সঙ্কলিত, প্রকাশন: নবল কিশোর, কানপুর, ১৯১০, পৃ. ১৮)।

৪৮. এটি হলো সৈয়দ মুহম্মদ আরিফের পরিবার। অযোধ্যায় বাহ্‌রাইচ 'সরকার'-এর দু-একটি পরগনায়, বিশেষ করে পসুনাজৎ গ্রামসমষ্টিতে তাঁর জমিনদারী অধিকারের কথা ইতিমধ্যেই পঞ্চম অধ্যায়ে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে তার সম্পূর্ণ সূত্র নির্দেশ করলে অনাবশ্যক পুনরুক্তি করা হবে। Allahabad 886, 889 এবং 890 হলো 'ইজারা' নথি, সৈয়দ আরিফ এখানে আলাদা-আলাদা বছরে আলাদা-আলাদা জাগীরদারের সঙ্গে পরগনার পুরো বা আংশিক রাজস্বের চুক্তি করেছেন। তিনি বাহ্‌রাইচেরই আশেপাশে 'মদদ-এ মআশ' জমির অধিকারী ছিলেন (Allahabad 879, 1202, 1217, 1228-30)।

৪৯. শাহ্জাহানের আমলে অনুদানগুলো আবার পরীক্ষা করার প্রয়াস প্রসঙ্গে সাদিক খানের তীব্র নিন্দা দ্রষ্টব্য (Or. 174, পৃ. ১০৩খ-১০৪ক; Or. 1671, পৃ. ৫৬খ-৫৭ক)।

৫০. 'তুজুক্-এ জাহাঙ্গীরী', ৫।

আসল সেনাবাহিনীর মতোই গুরুত্বপূর্ণ।[৫১] প্রাপকরা ছিল সাম্রাজ্যেরই সৃষ্টি, তাই এরা ছিল সাম্রাজ্যের স্বাভাবিক সমর্থক ও প্রচারকর্তা। কিন্তু সেই সঙ্গে এরাই ছিল রক্ষণশীলতার দুর্গ, কেননা রাষ্ট্রের খয়রাতিতে তাদের পাওনার সমর্থনে গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছুই তাদের [দাবির] সপক্ষে ছিল না। আকবর যখন ভারতে বাদশাহী সার্বভৌমত্বের জন্য একটা নতুন তাত্ত্বিক ভিত্তি খাড়া করতে শুরু করেন এবং তাঁর ধর্মসহিষ্ণুতার নীতি চালু করতে যান, তখন তাঁর সঙ্গে এই শ্রেণীর বিরোধ ছিল অবশ্যম্ভাবী। তাঁর রাজত্বের গোড়ার দিকে যে চরম উদারতা দেখানো হয়েছিল, তার জায়গায় এখন মুসলমান ধর্মজ্ঞদের 'মদদ-এ মআশ' অনুদান নিয়ন্ত্রণ করা ও কমিয়ে দেওয়ার জন্য একের পর এক ব্যবস্থা নেওয়া হতে থাকে।[৫২] সেই সঙ্গে অ-মুসলমান

৫১. 'ইন্‌তিখাব-এ জাহাঙ্গীর-শাহী', Or. 1648, পৃ. ১৮২ক-খ। 'লস্কর-এ দুয়া' ('প্রার্থনার সেনাবাহিনী') এই শব্দগুচ্ছ খুবই লাগসই, কারণ 'মদদ-এ মআশ' অনুদানের ফরমানগুলোতে সাধারণত একটি শর্ত থাকত যে সাম্রাজ্যের চিরন্তন সমৃদ্ধির জন্য প্রাপকদের প্রার্থনা করতে হবে।

৫২. বদাউনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১, ২০৪-৫, ২৭৪, ৩১৫, ৩৪৩। আকবরের সঙ্গে 'মখাদীম' বা ধর্মজ্ঞদের বিরোধের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্তের বিবরণ দিয়েছেন ফৈজী সিরহিন্দী, পৃ. ১৮৫ক-১৮৬ক। ১৫৮৫ খৃস্টাব্দে আকবর যখন সিরহিন্দ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন চারপাশের পরগনার 'মখাদীম'-রা তাঁকে সম্মান জানাতে আসেননি। রেগে গিয়ে আকবর আদেশ দেন : এদের 'মদদ-এ মআশ' অনুদান যেন তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে নেওয়া হয়। কেবল তার পরেই তাঁদের কয়েকজন দেখা দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, আবুল ফজলের মধ্যস্থতায়, প্রায় সকলেই অনুদান ফিরে পান।

এও কৌতূহলজনক যে শেখ আহ্‌মদের জন্মদাতার সম্মানও সিরহিন্দেরই প্রাপ্য। তাঁর অনুগামীদের কাছে শেখ আহ্‌মদ 'মুজাদ্দিদ-এ অল্‌ফ্‌-এ শানী' নামে পরিচিত ছিলেন। জাহাঙ্গীরের আমলে তিনি আকবরের বিরুদ্ধে এবং হিন্দু ও শিয়া-দের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালান। ধর্মীয় ব্যাপারে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব তিনি নিজের ওপরেই দাবি করেন। এর পাশাপাশি তাঁর একটি তত্ত্ব ছিল যে, বাদশাহ্‌কে স্বপক্ষে আনতে পারলে তবেই শরীয়ৎ-এর দুনিয়া কায়েম করা যাবে। এই দুটি বৈশিষ্ট্যই তাঁকে 'মখাদীম'দের প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত করে, যাদের ঔদ্ধত্যের সঙ্গে শাসকশ্রেণীর দাক্ষিণ্যের ওপর চূড়ান্ত নির্ভরশীলতা বেশ ভালোভাবেই খাপ খেয়ে যেত। (বিষয়টি খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় তাঁর নিজের চিঠিপত্র থেকে। 'মকতুবৎ-এ ইমাম রব্বানী', ৩ খণ্ড, নবল কিশোর প্রকাশিত। কিন্তু সেই সময়ের অন্যতম সার্থক ব্যঙ্গলেখকের কলমে শেখ ও তাঁর নাতিদের দৃষ্টিভঙ্গির বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য 'ওয়কাই-এ নিমৎ খান আলী', নবল কিশোর, লখনউ, ১৯২৮, পৃ. ২৫-৩০)। জাহাঙ্গীর যখন একজন রাজপুত কর্মচারীর অধীনে শেখকে বন্দী করতে আদেশ দেন এবং তাঁকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেন, তখন তিনি খুব ভালো করেই জানতেন কী লোকের সঙ্গে তাঁকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে ('তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ২৭২-৩, ৩০৮)। ঐ রকম একজন লোক যে ভারতের আধুনিক মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার মুরুব্বি হবেন, সেটা কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়।)

ধর্মগুরুদের ক্ষেত্রেও অনুদানের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হলো।[৫৩] জাহাঙ্গীর সম্ভবত আকবরের কঠোর নীতি কিছুটা সংযত করেছিলেন, কারণ তিনি এই অনুদান বিতরণের ব্যাপারে বিরাট ঔদার্যের জন্য সুখ্যাতি লাভ করেন।[৫৪] আওরঙ্গজেব কিন্তু আকবরের নীতি একেবারেই উল্টে দেন। ১৬৭২-৭৩ সালে তিনি হিন্দুদের অধিকৃত সমস্ত অনুদান ফিরিয়ে নেওয়ার আদেশ দেন।[৫৫] আর, আমরা আগেই যেমন দেখেছি, ১৬৯০ সালে এই অনুদানকে তিনি পুরোপুরি বংশগত করে দেন—প্রাপকদের শেষ যে সুবিধা দেওয়া যেতে পারে এটি ছিল সম্ভবত তা-ই।

বেশির ভাগ 'মদদ-এ মআশ' অনুদান দেওয়া হতো তার বদলে কোন দায়িত্ব না চাপিয়েই। এর সৃষ্টিই হয়েছিল কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর ভরণপোষণের জন্য। কিন্তু কিছু অনুদান ছিল শর্তসাপেক্ষ ('মশ্‌রূত')। 'কাজী' (বিচারক) পদটির সঙ্গে 'মদদ-এ মআশ' দেওয়া হতো, কিন্তু চাকরির সঙ্গে সঙ্গে অনুদানের মেয়াদও যেত ফুরিয়ে।[৫৬] শের শাহের দেওয়া কয়েকটি অনুদানে বিধান দেওয়া হয়েছে যে প্রাপকদের নিয়মিত ধনুর্বিদ্যা চর্চা করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে স্থানীয় দুর্বৃত্তদের মোকাবিলা

৫৩. বদাউনী, ২য় খণ্ড, ২০৫। মোদীর 'পার্সীস্ অ্যাট দা কোর্ট অফ আকবর এবং হোদিবালার 'স্টাডিস্ ইন পার্সী হিস্ট্রি', পৃ. ১৬৭-১৮৮ (বইটির শেষে কয়েকটি নথির আলোকচিত্র-প্রতিলিপি আছে)-তে পুনর্মুদ্রিত এবং আলোচিত নথিগুলো দ্রষ্টব্য। আরও তুলনীয় ঝাভেরী, 'ডক্যুমেন্টস', ৫ম-৭ম এবং ১১-শ, যদিও সঠিকভাবে বলতে গেলে এগুলো ঠিক 'মদদ-এ মআশ' অনুদান নয়।

৫৪. 'ইন্‌তিখাব-এ জাহাঙ্গীর-শাহী', Or. 1648, পৃ. ১৮১ খ-১৮২ খ।

৫৫. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৮ (তুলনীয় বার্নিয়ে, ৩৪১)। মনে হয় এটি বিনা ব্যতিক্রমে নিঃশর্তভাবে প্রযুক্ত আদেশ ছিল না, বরং ছিল নীতি বা কাম্য লক্ষ্য সম্পর্কিত বিবৃতি। রাজসেবার বিনিময়ে যে সব জমি মঞ্জুর হয়েছিল, সেগুলোর ক্ষেত্রে কোন রদবদল হয়নি। 'মিরাৎ', পূর্বোক্ত সূত্র এবং আজমের 'নিশান' (*IHRC*, ১৯৪৫, পৃ. ৫৩-৫৫-য় অনূদিত) দ্রষ্টব্য। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে গুজরাটের নবসারিতে একজন পারসী চিকিৎসক পরিবার-অধিকৃত 'মদদ-এ মআশ' অনুদান ১৬৬৪ এবং ১৭০২ সালে জারি-করা দুটি ফরমানের মাধ্যমে বহাল করা হয়েছিল (হোদিবালা, 'স্টাডিস্ ইন্ পার্সী হিস্ট্রি', পৃ ১৭৮)। 'জার্নাল অফ দা পাকিস্তান হিস্টরিকাল সোসাইটি', ৫ম খণ্ড, ৪র্থ ভাগ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম ভাগ এবং ৭ম খণ্ড, ১ম, ২য় ভাগ-এ প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে অ-মুসলমানদের দেওয়া কয়েকটি নগদ বা ভূমি-অনুদানের দিকে বোম্বাই-এর জ্ঞান চন্দ্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এগুলো জারি বা বহাল হয়েছিল আওরঙ্গজেবের আমলে।

৫৬. Or. 11,697; 'সিলেকটেড ডকুমেন্টস্ অফ শাহ্‌জাহানস্ রেন', ১৮৯-৯০; 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ১০৩ ক-খ, Bodl. পৃ. ৮২ ক, ১৪৫ খ-১৪৬ ক; 'সিয়াকনামা', ৮৬; I.O. 4370; Or. 11,698 দ্রষ্টব্য। কাজীদের অধিকৃত অনুদান প্রসঙ্গে আবুল ফজল বলেছেন: "এইসব পাগড়ি-পরা, অশুভ-হৃদয় ও লম্বা-আস্তিনওয়ালা ছোট মনের লোক" ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮-৯)। Allahabad 782 এবং 1203-এ যে ধরনের কাজীর ছবি পাওয়া যায়, সেরকম

করায় সাহায্য করতে হবে।[৫৭] বদাউনী যখন একটি অনুদান পেয়েছিলেন, তখন এর শর্ত অনুযায়ী তিনি একদল সৈন্য যোগান দিতে বাধ্য ছিলেন।[৫৮] ১৭ শতকের ফরমানগুলোতে অবশ্য ঐ ধরনের সামরিক কাজের শর্ত আর দেখা যায় না। মনে হয় 'মদদ-এ মআশ' অনুদানের সঙ্গে ঐ ধরনের শর্ত আর জোড়া হতো না।

কয়েকটি বিশেষ ধরনের অনুদান ছিল, যেগুলো নামে 'মদদ-এ মআশ' না হলেও, তারই সামিল: জাহাঙ্গীরের প্রবর্তিত 'আল-তমঘা' জাগীর থেকে কর্মচারীদের পরিবারগুলোর এক ধরনের বংশানুক্রমিক অনুদান গড়ে উঠেছিল, যার নাম 'ইনাম-এ আল তমঘা'।[৫৯] 'ইনাম' হিসেবে অধিকারভুক্ত লাখেরাজ জমিও ছিল। গুজরাটে আমরা ঐ ধরনের একটি গ্রামের কথা শুনি যেটি ছিল 'কওম'-এর লোকদের অধিকারে। শর্ত ছিল এই যে তারা চৌকিদারের কাজ করবে।[৬০] একইভাবে, মালবের একটি গ্রাম 'নগরশেঠ' (নগরের প্রধান ব্যবসায়ী) এই বংশানুক্রমিক পদের সঙ্গে যুক্ত ছিল।[৬১] এছাড়াও একেবারে নিঃশর্তে রাজস্ব মকুব করা হয়েছে—এমনও দেখা যায়। আকবর এবং শাহ্‌জাহানের আমলে একটি হিন্দু ধর্মগুরু পরিবারের উদ্দেশে জারি-করা একগুচ্ছ

লোক যদি আদৌ সুলভ হয়ে থাকে, তাহলে আবুল ফজলের তাচ্ছিল্যের যথেষ্ট কারণ আছে। এই লোকটিকে অনুদান হিসেবে ৭৫০ বিঘা বরাদ্দ করা হয়েছিল, কিন্তু লোকটি জোগাড় করে ছিল ৫,৩৭৫ বিঘা! তুলনীয় চার্লস এলিয়ট, 'ক্রনিকলস্ অফ উনাও', পৃ. ১১৫।

কাজী ছাড়াও 'মদদ-এ মআশ' অনুদানের অন্যান্য আরও প্রাপক ছিলেন, যাঁরা আধা-বিচারবিভাগীয় আধা-ধর্মীয় পদের অধিকারী: 'মুফতী', 'সদর' এবং 'মুহ্‌তসব' ('মজহার-এ শাহ্‌জাহানী', ১৯০)।

৫৭. Allahabad 318 এবং 'ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন', ৯ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা (মে, ১৯৩৩), পৃ. ১২৭-এ মুদ্রিত ফরমান (একই পত্রিকায় শের শাহের অন্য যে-ফরমানটি ছাপা হয়েছে তাতে এসব শর্ত নেই)। ধনুর্বিদ্যা অভ্যাসের ব্যাপারটা বলা হয়েছে খুব অদ্ভুতভাবে। মসজিদে পাঁচটি জমায়েতেই প্রাপকদের দুয়া করতে হবে এবং প্রত্যেক 'জুহর' (বৈকালিক) দুয়া-র পর দশটি করে তীর ছুঁড়তে হবে। তুলনীয় এলিয়ট, 'ক্রনিকলস্ অফ উনাও', পৃ. ৯৫।

৫৮. তাঁর ১০০০ বিঘা মঞ্জুর করা হয়েছিল এই শর্তে যে, ২০-'সওয়ার' পদ-মর্যাদার জন্য যে মান প্রয়োজন, সেই অনুযায়ী তাঁকে একটি সেনাবাহিনী মজুত রাখতে হবে। এই দায়িত্ব পালনে তিনি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন (বদাউনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৬-৭, ২৭৫-৬)।

৫৯. 'আল-তমঘা' জাগীরগুলোর জন্য সপ্তম অধ্যায়, প্রথম অংশ দ্রষ্টব্য। সুজান রায়, ৭৪, বলেছেন যে, 'ইনাম-এ আল তমঘা' হিসেবে সোধরার কাছের একটি গ্রামের অধিকারী ছিলেন আলী মর্দান খান (-এর পরিবার)। এর আয় থেকে ইব্রাহিমবাদে ঐ সম্ভ্রান্ত লোকটির বাগান ও বাড়িঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করা হতো। প্রথম বাহাদুর শাহের একটি ফরমান পাওয়া যায় যাতে 'ইনাম-এ আল তমঘা' মঞ্জুর করা হয়েছে (Or. 2285)। ফরমানে খেয়াল করে গ্রামের 'ওয়াসিল' (রাজস্ব)-ও দেওয়া আছে। 'মদদ-এ মআশ' অনুদানগুলোতে সাধারণত এই বিশেষ তথ্যটির উল্লেখ থাকে না।

৬০. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৮।

৬১. *IHRC*, খণ্ড ২২ (১৯৪৫), পৃ. ৫৩-৫৫।

সনদে দুটি গ্রামের ক্ষেত্রে এই ধরনের ছাড় দেওয়া হয়েছে। অনুগৃহীত ব্যক্তিরা আগে থেকেই ঐ জমি তাদের দখলে রেখেছিলেন বলে মনে হয় ; বলা হয়েছে, তাঁরা আসলে এর একটি গ্রাম কিনেছিলেন জমিনদারের কাছ থেকে। ফরমানগুলোতে তাঁদের রাজস্ব-দাবি ও অন্যান্য উপকর থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে, 'মদদ-এ মআশ' অনুদানের বয়ানের মতো একই ভাষায়। অবশ্য একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য এই যে, ঘোষণাই করা আছে : শুধুমাত্র প্রথম অনুগৃহীতরাই অনুদান ভোগ করবেন না, তাঁদের উত্তরাধিকারীরাও এটি ভোগ করবেন "পুরুষানুক্রমে"।[৬২]

আরও এক শ্রেণীর অনুদান ছিল যার নাম 'অউকাফ' ('ওয়াক্ফ্'-এর বহু-বচন)।[৬৩] কোন ব্যক্তি সরাসরি এই অনুদান পেতেন না, পেত প্রতিষ্ঠান। দরগা, সমাধি এবং মাদ্রাসা-র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশেষ কিছু জমির রাজস্ব পাকাপাকিভাবে বরাত দেওয়া হতো। সেই টাকায় ঐ প্রতিষ্ঠানগুলো মেরামত হতো, সেখানকার 'কর্মচারী'দের ভরণপোষণ হতো এবং তাদের মাধ্যমে খয়রাত করা হতো।[৬৪]

বাদশাহী অনুদানের মোট এলাকা বা তার থেকে আয় ঠিক কত ছিল তা বার করা শক্ত। প্রথম নজরে মনে হতে পারে যে 'আইন'-এ প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান দেওয়া

৬২. জাভেরী, 'ডক্যুমেণ্টস', ৫ম-৭ম, এবং ১১শ। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, ছাড়টির কোন পারিভাষিক নাম দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয় শাহ্ আলম যখন অনুদানটি বহাল করেন তখন একে বলা হয়েছে 'ইনাম-এ আল তমঘা' ('ডকু'. ১৪শ এবং ১৫শ)।

৬৩. 'মদদ-এ মআশ'-এর পাশাপাশি 'অউকাফ'-এর উল্লেখের জন্য বদাউনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১, ২০৪ দ্রষ্টব্য। বরনীর লেখাতেও কথাটি পাওয়া যায় 'মিল্ক্' এবং 'ইনাম'-এর সঙ্গে ('তারিখ-এ ফিরুজ-শাহী', পৃ. ২৮৩)।

৬৪. 'ওয়কাই-এ আজমীর', ৩০-৩২-এ (এবং ৪৩৬-এও) আজমীরের বিখ্যাত শেখ মুইন চিস্তীর সমাধিস্থলে যে দাতব্য বিতরণ করা হতো তার খবর আছে। বড় বড় 'অউকাফ' কীভাবে সংগঠিত হতো অন্তত সে বিষয়ে এটি কিছুটা আলোকপাত করে। এই ধর্মস্থানটির জন্যে বাদশাহ্ বেশ কয়েকটি গ্রাম বরাদ্দ করে দিয়েছিলেন। এই গ্রামগুলো থেকে রাজস্ব আদায় করত 'মুতাওয়াল্লী'র প্রতিনিধিরা। ধর্মস্থানের বদান্যতার ওপর অসংখ্য লোকের আসল বা সাজানো দাবি ছিল। এইভাবে আদায়ীকৃত পরিমাণ থেকে 'মুতাওয়াল্লী' তাদের খুবই কম পরিমাণে দান করতেন। এ ব্যাপারে 'সজ্জাদা-নশীন' (বা ধর্মস্থানের মুখ্য ব্যক্তি)-এর কোন হাতই ছিল না। যদিও কোথাও বলা নেই, তবু মনে হয়, 'মুতাওয়াল্লী' ছিলেন বাদশাহের নিযুক্ত কর্মচারী। লাহোরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩০-৩১-এ বলেছেন যে, তিরিশটি গ্রাম এবং তার কাছাকাছি তৈরি বাজার এবং সরাইখানার দোকান থেকে পাওয়া রাজস্ব তাজমহলের জন্য 'ওয়াক্ফ্' করে দেওয়া হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল বছরে আনুমানিক তিন লাখ টাকার ওপর আয় ব্যবহার করা হবে তাজ মেরামত, চাকরদের মাইনে, কর্মচারীদের খানা পাকানো এবং ভিখারী ও গরীবদের জন্য। বাদশাহ্ নিজেই হবেন 'মুতাওয়াল্লী'। আরও পরিমিত ধরনের একটি 'ওয়াক্ফ্'-এর বর্ণনা আছে বায়াজিদ, ৩১০-১১-এ। বায়াজিদ বেনারসের একটি পরিত্যক্ত হিন্দু মন্দিরকে মাদ্রাসায় পরিণত করেছিলেন। মাদ্রাসায় শিক্ষকদের ভাতা বাবদে বাদশাহ্ (আকবর) নগরটির কাছে দুটি গ্রাম বরাদ্দ করে দিয়েছিলেন।

আছে, কারণ এর প্রাদেশিক সারণিগুলোতে কিছু অঙ্কের ('দাম'-এ লেখা) 'সুয়ুরগাল' শীর্ষক একটি স্তম্ভ আছে। কিন্তু এও সম্ভব যে 'সুয়ুরগাল' অঙ্কগুলোতে 'মদদ-এ মআশ' (এবং সম্ভবত 'ওয়াকফ্') অনুদান ছাড়াও, কোষাগার থেকে যে নগদ ছাড় দেওয়া হতো তা-ও ধরা আছে ; আবার এও পুরোপুরি নিশ্চিত নয় যে 'মদদ-এ মআশ' ছাড়া যেসব রাজস্ব মকুব, 'ইনাম' অনুদান ইত্যাদি দেওয়া হতো তাও 'সুয়ুরগাল'-এর মধ্যে পড়ে কিনা। তাছাড়া অনুদানের অঙ্কগুলো কীভাবে স্থির করা হয়েছিল, তাও সরাসরি বোঝা যায় না। এখানে নিশ্চয়ই এইসব অনুদানের সম্ভাব্য আয় দেখানো থাকবে না : দেখানো থাকবে নির্ধারিত রাজস্ব, অনুদান হিসেবে রাজস্বপ্রদায়ী জমি হস্তান্তর করার ফলে যা হাতছাড়া হয়ে গেছে।[৬৫] অর্থাৎ, প্রাপকরা অহল্যাভূমিকে চাষের আওতায় আনার ফলে যে-আয় হয়েছে, তা সম্ভবত এখানে ধরা হয়নি। এতসব উপাদান অজানা থাকা সত্ত্বেও অঙ্কগুলো থেকে মোটামুটি কিছু নির্দেশ পাওয়া যায়। মোট রাজস্বের হিসেব ধরলে সবচেয়ে বেশি অঙ্ক দেখা যায় উচ্চ গাঙ্গেয় প্রদেশগুলোতে : দিল্লীতে শতকরা ৫.৪, এলাহাবাদে ৫.২, অযোধ্যায় ৪.২, আর আগ্রায় ৩.৯। লাহোর এবং গুজরাটে এগুলো কমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ১.৮ ভাগে।[৬৬] ১৭ শতকে গোটা সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে এসব অনুদান সংক্রান্ত কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না : কিন্তু 'মিরাৎ-এ আহ্‌মদী'র সূত্রে গুজরাট সম্বন্ধে কিছু খবর পাওয়া যায়। দেখা যায়, 'আইন'-এর আমল এবং মুহম্মদ শাহের আমলের গোড়ার দিকের মধ্যে এসব অনুদানের মাধ্যমে হস্তান্তরিত রাজস্বের অনুপাতে খুব বড় মাপের কোন পরিবর্তন হয়নি।[৬৭] অবশ্য এর এমন অর্থ করা উচিত নয় যে মোট রাজস্বের তুলনায় এইসব

৬৫. পরগনার রাজস্বের হিসেব থেকে দেখা যায় যে এইসব ছাড়-এর নথিপত্র রাখা হতো। 'দস্তুর-আল-আমল-এ আলমগীরী', পৃ. ১২৬খ-১২৮খ-তে এগুলো পুনরুদ্ধৃত হয়েছে। পরগনার 'জমা' দেখান হয়েছে ৬,০৫৮ টাকা, তার থেকে আইম্মা-এ মুআফী' হিসেবে ২০ টাকা 'কেটে নেওয়া হবে। এও লক্ষণীয় যে, 'আইন'-এর সারণিগুলোতে 'নকদী' বা নির্ধারিত রাজস্বের ঠিক পরেই 'সুয়ুরগাল'-এর স্তম্ভটি আছে।

৬৬. 'আইন'-এ আগ্রা এবং গুজরাটের অধীন প্রদেশের জন্য যে অঙ্কগুলো দেওয়া আছে সেগুলো 'সরকার'-এর তলায় দেওয়া অঙ্কগুলোর সঙ্গে আদৌ মেলে না। তাই দুএর ক্ষেত্রেই 'সরকার'-অঙ্কগুলোর মোট যোগফল ব্যবহার করা হয়েছে।

একদিকে সব গাঙ্গেয় প্রদেশ, অন্যদিকে লাহোর ও গুজরাটের মধ্যে পার্থক্যের কারণ কি এই যে শেষোক্ত প্রদেশগুলোতে অহল্যাভূমির জন্য আরও বেশি এলাকা পাওয়া যেত ? অহল্যাভূমি বরাত দেওয়ার সময়ে সাধারণত অনুদান বাবদে রাজস্ব-প্রদায়ী জমি হস্তান্তর করা হতো না। তাই যেসব প্রদেশে আবাদযোগ্য অহল্যাভূমি বেশি, সেখানে অনুদানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত 'জমা'র পরিমাণ কম হওয়া উচিত।

৬৭. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫-২৬ : "কর্মচারীরা তাদের 'জাগীর' থেকে যে 'ইনাম' দিত, তা বাদেই—১,২০,০০,০০০ 'দাম', ৫০,০০০ বিঘা জমি এবং ১০৩টি গ্রাম এবং কোষাগার থেকে ৪০,০০০ টাকা নগদ —'মদদ-এ মআশ' এবং 'ইনাম' হিসেবে বরাত দেওয়া হয়েছিল···বাদশাহী ফরমান অনুযায়ী" ইত্যাদি। 'আইন'-এর 'সরকার'-অঙ্কগুলোর সমষ্টি অর্থাৎ ৭৬,১৯,৮০৩-

অনুদানের অনুপাত সর্বত্র অপরিবর্তিত ছিল। কারণ, আমরা জানি 'আইন'-এর পরিসংখ্যানের কয়েক বছর পরেই আকবর গুজরাটের সমস্ত অনুদান কমিয়ে অর্ধেক করে দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন।[৬৮] পরের শতকে আসলে দেখা গেল : কমানো অংশ আবার পুরোপুরি আগের অবস্থায় ফিরে গেছে।

এমন মনে করার কোন কারণ নেই যে, গুজরাট ছিল ব্যতিক্রম ; আকবরের পরবর্তী আমলে মঞ্জুরের এলাকা প্রচুর বেড়েছিল ধরে নেওয়াটা তাই নিরাপদ হবে না। সুতরাং মোট রাজস্বের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে, 'আইন'-এর অঙ্কগুলো, মনে হয়, পুরো মুঘল আমলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। বিভিন্ন প্রদেশে এই অনুপাতের শতকরা হারের স্বল্পতা থেকে দেখা যায়, অনুদানগুলো সাম্রাজ্যের মোট আবাদী এলাকার খুব কম অংশ জুড়েই থাকতে পারত। এই অধ্যায়ে যেসব খুঁটিনাটির আলোচনা করা হলো তার থেকে যদি কারও এমন ধারণা হয় যে, সেই সময়ের কৃষি-অর্থনীতিতে এই প্রাপকদের স্থান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তারা আবাদ বাড়াতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল ইত্যাদি, বা তাদের উপস্থিতি ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের সাধারণ ধাঁচটিতে খুব বড় রকমের রদবদল ঘটাত—তবে ওপরের তথ্য তাঁকে ঐ ভুল পথে যাওয়া থেকে নিরস্ত করবে।

এই অধ্যায় শেষ করার আগে, বাদশাহ্ ছাড়া অন্যান্য কর্তৃপক্ষ যেসব অনুদান দিত সংক্ষেপে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। যে কোন জাগীরদার তার বরাতের এলাকার মধ্যে অনুদান দিতে পারত এবং তার রাজস্ব মকুব করতে পারত। ঐ ধরনের

'দাম'-এর সঙ্গে ১,২০,০০,০০০ 'দাম' অঙ্কটির তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু ঐ অন্তর্বর্তী সময়ে 'জমা' বেড়েছিল, তাই 'মিরাৎ'-এর অঙ্কটি হয়েছে গোটা প্রদেশের ক্ষেত্রে প্রদত্ত 'জমা-দামী'র শতকরা ১.৫ ভাগ। যেহেতু 'আইন'-এ, সম্ভবত, 'সুয়ুরগাল' পরিসংখ্যানের মধ্যে নগদ ভাতার পরিমাণও ধরা আছে, তাই সঠিক তুলনা সম্ভব হবে 'মিরাৎ'-এর ভূমি অনুদানের অঙ্কগুলোর সঙ্গে নগদ অনুদানগুলো যোগ করে। মিলিতভাবে এই দুটি অঙ্ক 'জমা-দামী'র শতকরা ১.৭ ভাগের চেয়ে সামান্য বেশি দাঁড়ায়। এলাকার পরিমাণ সম্বন্ধে বলতে গেলে. যদি ধরে নেওয়া হয় 'মিরাৎ'-এ যে-অনুদানের এলাকা দেওয়া আছে সেটি 'বিঘা-এ ইলাহী'তে এবং আবাদযোগ্য এলাকা দেওয়া হয়েছে 'বিঘা-এ দফ্‌তরী'তে, তাহলে প্রথম ও শেষেরটির মধ্যে অনুপাত দাঁড়ায় ১.০০ : ১০০-এর সামান্য কম। অনুদান-দেওয়া মোট গ্রামের সংখ্যাটিকেও সমগ্র প্রদেশের গ্রাম সংখ্যা ১০,৪৩৫-এর সঙ্গে তুলনা করা যায়। এলাকার মতো এখানেও একই শতকরা অনুপাত দাঁড়াবে। কিন্তু এই অঙ্কগুলো তুলনা করার সময়ে খেয়াল রাখতে হবে যে শস্য-ভাগ এলাকার আওতাভুক্ত, আর সেইজন্য জরিপ হয়নি বলে কয়েকটি জেলাকে আবাদযোগ্য এলাকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে গুজরাটে এমন কিছু অনুদানও ছিল (Or. 11698 থেকে যেমন দেখা যায়) যার এলাকা দেওয়া নেই। একইভাবে 'মদদ-এ মআশ' হিসেবে অধিকৃত গ্রামের সংখ্যার মধ্যে বোধহয় শুধু পুরোপুরি অধিকৃত ('দর ও বস্ত') গ্রামগুলোই ধরা হয়েছে। তাই যে সব গ্রাম মুখ্যত বা অংশত রাজস্ব-প্রদায়ী, অনুদানের মধ্যে পড়লেও সেগুলোকে আর ধরা হয়নি।

৬৮. আকবরের ৪৮-তম বছরে খান-এ খানানের 'হুকুম্' দ্রষ্টব্য : মোদীর 'পার্সীস্ অ্যাট দ্য কোর্ট অফ আকবর'-এ ও নথি-দ্রষ্টব্য।

অনুদানেরও নাম ছিল 'মদদ-এ মআশ' বা 'আইম্মা'।[৬৯] জাগীরদার কিন্তু ঐ ধরনের অনুদান দিতে পারত শুধু নিজের বরাতের মেয়াদের ক্ষেত্রে। এই মেয়াদ প্রায়ই তিন-চার বছরের বেশি হতো না,[৭০] তাই এই শ্রেণীর প্রাপকরা চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতেন। নতুন জাগীরদার তার আগের লোকের দেওয়া অনুদান বহাল রাখতে পারত বা না-ও পারত, যদিও সম্ভবত বহাল রাখাই ছিল চলতি রীতি।[৭১] যে সমস্ত অনুদান বাদশাহী আদেশের বলে পাওয়া যায়নি, মীরজুমলার নির্দেশে 'খালিসা' এবং 'জাগীর' দু জায়গাতেই তা ফিরিয়ে নেওয়ার ফলে বাংলায় খুব দুর্দশা হয়েছিল বলে জানা যায়। প্রাক্তন প্রাপকদের জমি চাষ করে সাধারণ চাষীর মতোই রাজস্ব দিতে বলা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পরবর্তী প্রদেশকর্তা শায়েস্তা খান নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে প্রত্যেক জাগীরদার ঐ ধরনের লোকদের অনুদান রাখতে দেবে যদি এইভাবে রাজস্বের ক্ষতির পরিমাণ তার বরাতের মোট রাজস্বের শতকরা ২½ ভাগের বেশি না হয়।[৭২] পরে আওরঙ্গজেবের আমলে সৌরাঠ (গুজরাট)-এর রাজস্ব-কর্মচারীদের একটি ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রদেশকর্তা এবং জাগীরদারদের সনদ-ভিত্তিক সমস্ত অনুদান তারা ফিরিয়ে নেয় এবং জেদ করে যে, অনুদানের সমর্থনে বাদশাহী সনদ থাকলে তবেই সেগুলো গ্রাহ্য হবে।[৭৩]

নিজস্ব অঞ্চলের মধ্যে রাজস্ব অনুদান দেওয়ার ব্যাপারে স্ব-শাসিত প্রধানদের কোন বাধাবন্ধ ছিল না। ব্রাহ্মণ, চারণ (কবি) এবং বাজপাখি-পালকরা যে-জমি চাষ করত যোধপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহ তার রাজস্ব মকুব করতেন।[৭৪] সাধারণ জমিনদাররাও ঐ জাতীয় অনুদান দিতেন, মনে হয়, যে-লাখেরাজ জমি তাঁরা 'মালিকানা' ও 'নানকার' হিসেবে ভোগ করতেন তার থেকে। কিছু কিছু জমি দেওয়া হতো সেবার বিনিময়ে,[৭৫] কিন্তু বেশির ভাগই বদান্যতা করে। ১৮ শতকের

৬৯. I.O. 4433 হলো আকবরের আমলে এক জাগীরদারের কাছ থেকে তার 'শিকদার'-কে পাঠানো একটি পরওয়ানা। এতে সাণ্ডিল পরগনায় কিছু আবাদী জমি ও অহল্যাভূমির বিশেষ কয়েকটি এলাকা অনুদানের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

৭০. যথা, মানুচি বলেছেন যে, কর্ণাটকের নবাব-নাজিমের কাছ থেকে তিনি অনুদান পেয়েছিলেন "দুটি গ্রাম এবং সংলগ্ন পল্লীগুলোর আয়। যতদিন তিনি ঐ প্রদেশের শাসক থাকবেন, ততদিন এটি তাঁর অধিকারে রাখা চলবে" (মানুচি, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৮)।

৭১. ইজাদ-বখ্‌শ্‌ রসা-র 'রিয়াজ-আল ওয়াদাদ'-এ, জনৈক জাগীরদারকে লেখা তাঁর একটি চিঠি আছে (Or. 1725, পৃ. ১২ক)। এতে সুপারিশ করা হয়েছে যে, তাঁর জাগীরে এক বন্ধুর 'মদদ-এ মআশ' জমি যেন বহাল করা হয়।

৭২. 'ফথিয়া-এ ইব্রিয়া', পৃ. ১১৭খ-১২১ক।

৭৩. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৪।

৭৪. 'ওয়াকাই-এ আজমীর', ৩১৮। এটি মির্তা পরগনা সম্বন্ধে। রাজা মারা যাবার পর আওরঙ্গজেব যখন তাঁর অঞ্চল দখল করে নেওয়ার আদেশ দেন, রাজস্ব কর্মচারীরা তখন রাজার দেওয়া ছাড়গুলো অগ্রাহ্য করেন।

৭৫. জমিনদারদের অনুচরবর্গের সম্বন্ধে বেকাস, পৃ. ৫২খ, তাই বলেছেন যে এদের বেতন দেওয়া

শেষদিকের একটি রাজস্ব-সংক্রান্ত পরিভাষা-কোষে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে : 'পীরপাল', জমিনদাররা তাদের পুরনো অনুচরদের যে-অনুদান দিতেন, এবং 'ব্রহ্মোত্তর', ব্রাহ্মণদের অধিকৃত জমি।[৭৬]

হতো নগদে বা ভূমি-অনুদান দিয়ে। অযোধ্যার দুটি নথিতে (Allahabad 279 এবং 280) দেখা যায় যে 'খিদমতানা' ('খিদমৎ' অর্থাৎ সেবা থেকে) হিসেবে একটি গ্রামের ৫০ বিঘা জমি অনুদান দেওয়া হয়েছে। এর বদলে প্রাপককে গ্রামটির 'খসমান' (অর্থাৎ অনুদানকারীর স্বত্বে হস্তক্ষেপ)-এর ওপর নজর রাখতে হবে। দুজন আদি অনুদানকারী বা একজনের বিধবা স্ত্রী (দ্বিতীয় নথিটিতে যিনি অনুদান বহাল করেছেন)—তাঁদের কেউই গ্রামটির ওপর তাঁদের স্বত্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলেননি। সম্ভবত তাঁরা ছিলেন এখানকার জমিনদার কিন্তু হয়তো বা 'মদদ-এ মআশ'-এরও অধিকারী ছিলেন (তুলনীয় Allahabad 296)।

৭৬. Add. 6603, পৃ. ৫১ ক-খ। এতে বলা হয়েছে যে বদান্যতা বাবদে জমিনদারদের দেওয়া জমির নাম ছিল 'বাজী জমিন'। দিল্লী এবং বাংলার রাজস্ব-প্রশাসন সম্পর্কে লেখকের অভিজ্ঞতা ছিল, তাই 'ব্রহ্মোত্তর' (বা 'ব্রহ্মণোত্তর' এই বানানও হয়) এবং 'পীরপাল' শব্দদুটি সম্ভবত দু এলাকাতেই ব্যবহার করা হতো। একথাই আরও সম্ভব বলে মনে হয়, কারণ লেখক যখন 'বিষণ-প্রীত' শব্দটির (জমিনদাররা যে জমি বিষ্ণুকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের মঞ্জুর করেছিলেন) সংজ্ঞা দিয়েছেন তখন তিনি খেয়াল রেখেছেন যে শব্দটি শুধুমাত্র বাংলাতেই চালু ছিল (পৃ. ৫১ খ)।

নবম অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্যের কৃষি-সঙ্কট

১. সাম্রাজ্য ও বরাত ব্যবস্থা

আমাদের আলোচ্য পর্বের দেড়শ বছরের বেশির ভাগ সময়েই পুরো উপ-মহাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিল মুঘল সাম্রাজ্য আর এই সাম্রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছিল অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত একটি প্রশাসন-ব্যবস্থা। কিন্তু এই বিরাট সাফল্যের কারণ কী? কয়েকজন প্রামাণ্য লেখকের মতে ১৬ ও ১৭ শতকে এশিয়ার বিরাট সাম্রাজ্যগুলো গড়ে ওঠার অন্তর্নিহিত কারণ আগ্নেয়াস্ত্রের উন্নতি।[১] কিন্তু ভারতীয় মুঘলদের ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যাই যথেষ্ট কিনা, এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। কারণ, গোলন্দাজ বাহিনীর ওপর মুঘল ফৌজের জয়পরাজয় নির্ভর করত না এবং যথার্থই দুর্ভেদ্য দুর্গের বিরুদ্ধে তারা কখনোই আগ্নেয়াস্ত্রকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারেনি। ঘোড়সওয়ার বাহিনীই ছিল তাদের প্রকৃত শক্তি। কি খোলা মাঠের লড়াই-এ, কি ক্ষিপ্রগতিতে মুঘল ঘোড়-সওয়ার বাহিনী ছিল অজেয়—যতদিন না মারাঠারা তাদের বিক্ষিপ্ত ও বিকেন্দ্রিত যুদ্ধ-কৌশলের মাধ্যমে এর উপযুক্ত জবাব দিতে পেরেছিল। ভালো জাতের ঘোড়া দিয়ে ঘোড়সওয়ার বাহিনী তৈরি রাখাই ছিল মনসবদারের প্রধান দায়িত্ব। তাই মুঘলদের সামরিক শক্তির সঙ্গে জাগীরদারী বা বরাত ব্যবস্থার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই ব্যবস্থার একটা বিরাট সুবিধা ছিল এই যে, মনসবদাররা বাদশাহের মর্জির ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে থাকত; ফলে যখন যেখানে দরকার তখনই বাদশাহী প্রশাসন মনসবদারদের জড়ো করে সসৈন্যে সেই জায়গায় পাঠিয়ে দিতে পারত। একবার কোন প্রাদেশিক রাজ্যের জমি দখলের প্রাথমিক সুবিধা পেয়ে গেলে, তারা আর কেউই মুঘল শক্তির কেন্দ্রীভূত চাপ বুঝতে পারত না। আকবর হয়তো সুর বংশের তৈরি রাজস্ব প্রশাসনকেই ভিত্তি করে তাঁর ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, কিন্তু তিনি তো তৈমুর বংশের রাজতান্ত্রিক স্বৈরাচারেরও উত্তরাধিকারী। উপজাতীয় পরিচালন-রীতি সম্পর্কে আফগান ধ্যানধারণার কোন বন্ধনও তাঁর ছিল না। বরাত ও মনসবদারী ব্যবস্থার মূল লক্ষণগুলো ধীরে ধীরে গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে আধা-দৈব রাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক ধারণাকে তিনি ব্যবহারিক রূপ দেন।[২] এর প্রতিবাদে আমীর-ওমরাহ্ ও মোল্লাতন্ত্র যুক্ত হয়ে বেশ বড় রকমের একটা লড়াই করেছিল—১৫৮০-র বিদ্রোহ[৩]—কিন্তু এই বিদ্রোহ করার পর মুঘল সাম্রাজ্যকে বাস্তবিকই আমলা বাহিনীর

১. যেমন, বার্তোল্ড, 'ইরান', অনু. জি.কে. নরিমান, 'পোস্টহিউমস ওঅর্ক্‌স্ অফ জি.কে. নরিমান', সম্পা. ধবধালা, পৃ. ১৪২-৩।

২. 'রাজপ্রকৃতি হলো আল্লার থেকে বিচ্ছুরিত আলো, বিশ্বভাসী সূর্যের রশ্মি' ইত্যাদি ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২)।

৩. বাংলা ও বিহারে বিদ্রোহের ইন্ধন যুগিয়েছিল দুটি কারণ। প্রথমত, ঘোড়ার গায়ে ছাপ মারার নিয়মকানুন চাপিয়ে দেওয়া; দ্বিতীয়ত খারাপ জাতের ঘোড়া হলেও নেওয়া যাবে—এই

তরফ থেকে আর কখনও কোন বড় রকমের বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে হয়নি। উত্তরাধিকারের লড়াই-এর ফলে বেশ কিছু ওলটপালট হয়েছিল, কিন্তু তার জন্য মুঘল শাসনের কোন বিপদ নেমে আসেনি। কি ১৬৫৮-৯, কি ১৭০৭-৯—কোন সময়েই তখ্‌তের দাবিদাররা সাম্রাজ্যকে ভাগাভাগি করার দিকে যায়নি—এই ঘটনা থেকেই নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় সাম্রাজ্যের মূল কাঠামো ছিল কত সংহত। মুঘল অভিজাততন্ত্র গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন জাতি ও কওম-এর লোক নিয়ে। তাদের মধ্যে বিদ্বেষ ও রেষারেষি তো ছিলই,[৪] তার ওপর ১৬৭৯-৮০ সালের রাজপুত বিদ্রোহে ইন্ধন জুগিয়েছিল আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় বিভেদ-নীতি। কিন্তু এমনকি এর প্রভাবও ছিল ক্ষণস্থায়ী। সাধারণভাবে রাজপুতরা আবার তাদের পুরনো আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল।[৫]

মহান্‌ মুঘলদের আমলে বরাত ব্যবস্থা যেভাবে প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর হয় তার জন্য এক বিশেষ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু থাকা দরকার। জমির স্বত্ব থেকে জাগীরগুলোকে যথাসম্ভব আলাদা করে রাখা হয়েছিল। এগুলো ছিল মূলত রাজস্বের

অনুমতি নিয়ে ঐ দু জায়গার কর্মচারীদের আগে যে-ছাড় মঞ্জুর করা হতো, সেটি কমিয়ে দেওয়া ('আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৪-৬,২৯১-৩ ; 'তবাকৎ-এ আকবরী', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৮-৫০ ; মনসেরাৎ, ৬৮-৬৯)।

৪. বলা হয় যে, ইরানী ও তুরানী অভিজাতদের বিশ্বস্ততার অভাব এবং আকবরের অধীনে যারা কাজ করত, সেই আফগান, রাজপুত ও শেখজাদাদের (ভারতীয় মুসলমান) ভীরুতা—মির্জা হাকিম ১৫৮২ সালে এই দুএর ওপর ভরসা করেছিলেন ('আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৬)। খোরাসানী (ইরানী) ও শেখজাদাদের নেকনজরে দেখে জাহাঙ্গীর চগাতাই (তুরানী) ও রাজপুত অভিজাতদের ওপর অবিচার করেছেন বলে খান-এ আজম তাঁকে তিরস্কার করেছেন ('আর্জদশ্‌ৎ-হা-এ মুজফ্‌ফর', পৃ. ১৯ ক-খ, আরও তুলনীয়: হকিন্স, 'আর্লি ট্রাভেলস', পৃ. ১০৬-৭)। শাহ্‌জাদা হিসেবে আওরঙ্গজেবের রাজপুত-বিদ্বেষ ('আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ৩৭খ-৩৮ক ; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', পৃ. ১১৪-১৫) শাহ্‌জাহান ঠিক ভালো চোখে দেখতেন না; কিন্তু সেই সঙ্গে আফগানদের সম্পর্কে তাঁরও সন্দেহ ছিল বলে মনে হয় ('আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ১৫৪ ক ; 'দিলকুশা', পৃ. ৮৪ ক)।

৫. আকবরের ধর্মনীতির আংশিক উদ্দেশ্য ছিল অভিজাতবর্গের বিভিন্ন উপাদানকে একত্রে রাখা, যাতে কোন উপদল বেশি শক্তিশালী না হয়ে উঠতে পারে—'দাবিস্তান-এ মজাহিব'-এর মতো পুরনো বইতেও (আনু. ১৬৫৫) এ কথা লক্ষ্য করা হয়েছে (পৃ. ৪৩১-২)। এস. আর. শর্মার 'রিলিজিয়স পলিসি অফ দা মুঘল এম্পারার্স' লেখাটির একটি গুণ এই যে, মনসবদার পদে অ-মুসলমানদের অবস্থানের কথা সর্বদাই উল্লেখ করা আছে। ১৬৭৯-৮০ সালের বিদ্রোহে সব, এমনকি বেশির ভাগ, রাজপুত অভিজাত পরিবারই যোগ দেয়নি। রাজপুত বাহিনী মুঘলদেরই সপক্ষে সগৌরবে কাজ করেছিল দখিনে। প্রায়ই ভুলে যাওয়া হয় যে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু ও প্রথম বাহাদুর শাহের সঙ্গে গোড়ার লড়াই-এর পর অনেক ক্ষেত্রেই রাজপুতদের পুরনো পদ আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে সৈয়দ ভাইদের নীতি বিশেষভাবে লক্ষণীয় (এঁরাই জিজিয়া বিলোপ করেন)। সতীশচন্দ্র, 'পার্টিস অ্যাণ্ড পলিটিক্‌স্‌...', পৃ. ১২৮-৯, ১৬৬ দ্রষ্টব্য।

বরাত। তার নির্ধারণ হতো নগদ টাকায়, লেখাও হতো সেইভাবে। যে সমাজে নগদ-সম্পর্ক বেশ ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, একমাত্র সেখানেই এরকম হওয়া সম্ভব। এর থেকেই বোঝা যায় যে, কৃষিভিত্তিক বাণিজ্যও পৌঁছে গিয়েছিল বিকাশের এক উচ্চ পর্যায়ে। আগের অধ্যায়গুলোতে আমরা দেখেছি যে মুঘল ভারতে এই দুটি শর্তই বর্তমান ছিল। সেই সঙ্গে বাণিজ্যিক কার্যকলাপের সবচেয়ে উন্নতি হতে পারে বাদশাহী ব্যবস্থার অধীনে, যার কর আদায় ও প্রশাসনের পদ্ধতি সর্বত্র একইরকম এবং বাণিজ্যপথের ওপর যার নিয়ন্ত্রণ আছে। বরাত ব্যবস্থা বাদশাহী ক্ষমতাকে যতটা জোরদার করেছিল, তার নিজের টি'কে থাকার অর্থনৈতিক বনিয়াদও করেছিল ততটাই মজবুত। পশ্চিম ইউরোপের সামন্ত প্রভুর মতো অর্থ ও বাণিজ্যের 'ক্ষয়কারক প্রভাব' নিয়ে মুঘল জাগীরদারের কোন ভয় করার দরকার পড়ত না।

২. কৃষক-নিপীড়ন

বাদশাহের অবাধ ক্ষমতার মধ্যেই মুঘল শাসকশ্রেণীর ঐক্য ও সংহতির বাস্তব প্রকাশ দেখা যায়। জাগীরদার ছিল শাসকশ্রেণীরই একজন। কিন্তু সে হিসেবে বাদশাহের কাছ থেকে পাওয়া অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ছাড়া আর কোন অধিকার সে ভোগ করতে পারত না। নিজের খুশিমতো জাগীর চালাবার অধিকার তার ছিল না, বাদশাহী নিয়মকানুন মেনে চলতে হতো। ভূমিরাজস্ব দাবির হার, তার নির্ধারণ ও আদায়ের পদ্ধতি—সবই ঠিক করে দিত বাদশাহী প্রশাসন।[১] অন্যান্য কোন্ কোন্ কর আদায় করতে হবে, তার জন্যও বাদশাহ্ আদেশ জারি করতেন।[২] কানুনগো, চৌধুরী, ফৌজদার, সংবাদ-লেখক প্রভৃতি কর্মচারীরা জাগীরদার ও তার গোমস্তাদের আচরণের ওপর নজর রাখত, খবরদারিও করত।[৩]

বাদশাহী রাজস্বনীতি নিঃসন্দেহে দুটি বিবেচনার ভিত্তিতেই তৈরি হয়েছিল। প্রথমত, জাগীরের রাজস্ব থেকেই যেহেতু মনসবদারের সামরিক বাহিনীর ভরণপোষণ করতে হতো, তাই তাদের ঝোঁক ছিল যথাসম্ভব চড়া হারে রাজস্ব দাবি করার দিকে, যাতে সাম্রাজ্যের পক্ষে সবচেয়ে বেশি সামরিক শক্তি অর্জন করা যায়। কিন্তু, দ্বিতীয়ত, একটি বিষয়ও নিশ্চয়ই তাদের কাছে স্পষ্ট ছিল—যদি রাজস্বের হার খুব বেশি হয় এবং তার ফলে চাষীদের জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অবশিষ্ট না থাকে, তা হলে মোট রাজস্ব আদায়ও চূড়ান্ত হিসেবে শীঘ্রই কমে যাবে। এই সূত্র ধরে বোঝা যায়, চাষীদের বেঁচে থাকার জন্য একেবারে ন্যূনতম যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকু বাদ দিয়ে উদ্‌বৃত্ত উৎপন্নের পরিমাণ আর বাদশাহী কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত রাজস্ব দাবি কেন মোটামুটি এক হতো।[৪]

১. সপ্তম অধ্যায়, দ্বিতীয় অংশ।
২. ষষ্ঠ অধ্যায়, সপ্তম অংশ।
৩. সপ্তম অধ্যায়, দ্বিতীয় অংশ।
৪. ষষ্ঠ অধ্যায়, প্রথম অংশ।
৫. পেলসার্ট, ৬০। তুলনীয় বার্নিয়ে, ২৩০: "দরবারে অজস্র লোক, তার জাঁকজমক বজায়

এই উদ্‌বৃত্ত উৎপাদন আত্মসাৎ করেই মুঘল শাসকশ্রেণীর বিশাল সম্পদ গড়ে উঠেছিল। "মাত্রাতিরিক্ত ধনীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের চূড়ান্ত অধীনতা ও দারিদ্র্যে"র যে বিরাট ফারাক মুঘল আমলে দেখা যায়, তেমন বোধহয় ভারতের ইতিহাসে খুব বেশি দেখা যায়নি।[৫]

তবে রাজস্ব দাবির পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়ে চলার একটা প্রবণতা বরাবরই ছিল বলে মনে হয়। যত দিন যাচ্ছিল ততই এই প্রবণতা কার্যত বেড়ে যাচ্ছিল। জাগীর-দারী প্রথার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থেকেই এই প্রবণতার সৃষ্টি। সাম্রাজ্য ও শাসকশ্রেণীর দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থের কথা চিন্তা করার মতো দূরদৃষ্টি বাদশাহী প্রশাসনের ছিল। বোধহয় সেইজন্যই রাজস্ব দাবির একটা সীমা বেঁধে দেওয়ার চেষ্টাও হতো। ১৭ শতকের কোন এক সময়ে প্রশাসন নাকি প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব-দাবি বাড়ানো অনুমোদন করেছিল। আগের একটি অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে সাক্ষ্যপ্রমাণের অতিসরলীকৃত ব্যাখ্যাই এই ধারণার ভিত্তি। এই সময়ের তথ্য থেকে এরকম আভাসও পাওয়া যায় যে দ্রব্যমূল্য ও নগদে রাজস্ব দাবির হার মোটামুটি একই অনুপাতে বাড়ে।[৬] কিন্তু বাদশাহী প্রশাসনের স্বার্থের সঙ্গে জাগীরদারদের স্বার্থের কিছু কিছু বিরোধও ছিল। কোন জাগীরদারের বরাত যে কোন সময়েই হাতবদল হতে পারত, এবং আর কখনোই কোন জাগীর তিন-চার বছরের বেশি কারও হাতে থাকত না। কোন জাগীরদারের পক্ষেই তাই চাষবাসের উন্নতির জন্য কখনও কোন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নীতি অনুসরণ করা সম্ভব হতো না।[৭] তাৎক্ষণিক লাভের জন্য যে কোন রকম অত্যাচার করাই ছিল তার স্বার্থ। তাতে যদি চাষীরা সর্বস্বান্তও হয়ে যায় আর তার ফলে সে এলাকায় রাজস্ব দেওয়ার ক্ষমতাও লোপ পায়—তাতেও কিছু এসে যেত না।

রাখতে প্রচণ্ড খরচ পড়ে। জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখার জন্য এক বিরাট সেনাবাহিনী পুষতে হয়, তাদের মাইনে দিতে হয়—এই দুএর যোগান দিতেই দেশ ধ্বংস হয়ে গেছে। জনসাধারণের দুঃখকষ্ট সম্বন্ধে ঠিকমতো ধারণা দেওয়া যাবে না। অন্যের লাভের জন্য অবিরাম খেটে চলতে তাদের বাধ্য করে ডাণ্ডা আর চাবুক"।

৬. ষষ্ঠ অধ্যায়, প্রথম অংশ।

৭. মীর ফৎহুউল্লা শিরাজী যেসব সুপারিশ করেছিলেন, নিঃসন্দেহে তার একটির উদ্দেশ্য ছিল জাগীরদারেরা যাতে তাদের জাগীরের অবস্থার উন্নতি করে তার জন্য কিছু নগদ উৎসাহ যোগানো। নিয়ম করা হয়েছিল যে, কোন জাগীরদার যদি তার 'ইক্তা'য় (জাগীরে) বসতি ('আবাদ') ও রাজস্ব বাড়াতে পারে, তাহলে তার পদোন্নতি হবে। ফলে বাড়তি বেতন পেয়ে সে তার উদ্যমের ফলভোগ করতে পারবে ('আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৯)। তেমনি আওরঙ্গজেবকে রাও করণের পদোন্নতির সুপারিশ করতে দেখা যায়। তার কারণ এই যে তিনি তাঁর আগের জাগীরের অবস্থা যথেষ্ট উন্নত করে তারপর ইস্তফা দিয়েছিলেন ('আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ৩৬খ-৩৭ক; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', পৃ. ১১২-১৩)। স্পষ্টই বোঝা যায় যে পদোন্নতি না হলে কোন জাগীরদার তার জাগীরের উন্নতির জন্য যা কিছু চেষ্টা করে তার থেকে তার নিজের কোন লাভ হয় না।

বার্নিয়ে তাঁর বই-এর এক সুপরিচিত অংশে জাগীরদারদের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করে গেছেন : "তিমারিয়ৎ" (জাগীরদার অর্থে বার্নিয়ে এই শব্দটিই লেখেন),[৮] প্রদেশকর্তা এবং ইজারাদারদের চিন্তাধারা ছিল এই রকম : "জমির এই অবহেলিত অবস্থার জন্য আমাদের অস্বস্তি কিসের? এখানে ভালো ফসলের জন্য কেনই বা আমরা সময় ও অর্থ ব্যয় করব? মুহূর্তের মধ্যে অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত হতে পারি, আমাদের উদ্যোগের ফলে নিজেদের বা আমাদের ছেলেমেয়েদের কোন লাভ হবে না। চাষীদের হয়তো অনাহারে থাকতে হবে বা তারা ফেরারী হতে পারে। জমির থেকে যতটা পারি টাকা উসুল করে নেওয়া যাক। ছেড়ে যাওয়ার আদেশ যখন আসবে, তখন শুকনো মরুভূমি রেখে চলে যাব।"[৯]

বার্নিয়ে এই বিষয়টি সবচেয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন ; কিন্তু তাঁরও আগে সেণ্ট জেভিয়ার, হকিন্স এবং মানরিক-এর মন্তব্যও এই একই ধরনের।[১০] ভারতীয় লেখকদের মধ্যে আমরা পাই ভীম সেনকে। তিনি বলেছেন যে, সর্বদাই হঠাৎ করে জাগীরের হাতবদল হতো বলে জাগীরদারের গোমস্তারা চাষীদের সাহায্য করা ('রাইয়ত-পরওয়ারী') বা স্থায়ী কোন ব্যবস্থা করা ('ইতিকৃলাল') ছেড়ে দিয়েছে।" এছাড়াও, জাগীরদারদের 'আমিল'রা নিজেদের চাকরির মেয়াদ সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল না। তারাও তাই "স্বেরাচারীর মতো" নিষ্ঠুরভাবে রাজস্ব আদায় করত।[১১] জাগীরদার যখন রাজস্ব আদায়ের জন্য নিজে কর্মচারী না রেখে জাগীর ইজারা দিয়ে দিত, তখন অবস্থা হতো আরও শোচনীয়। শাহ্‌জাহানের আমল সম্বন্ধে সাদিক খান বলেছেন যে, ঘুষ ও ইজারার দরুন জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায় আর তার ফলে চাষীদের ওপর লুঠতরাজ চলতে থাকে।[১২]

৮. বার্নিয়ে একটি তুর্কী শব্দ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তাতে কোন দোষ নেই। পৃ. ২২৪-এ 'জাহ্-গীর'কে তিনি স্পষ্টতই "তিমার"-এর সঙ্গে এক করে দেখেছেন।

৯. বার্নিয়ে, ২২৭।

১০. অনেক আগে—১৬০৯ সালে লিখতে বসে জেভিয়ার লক্ষ্য করেছিলেন যে বরাত দেওয়ার অধিকার যেহেতু রাজার মর্জির ওপরেই নির্ভর করে তাই "কোন জমির ওপর যে সময়টুকুর জন্য কারও অধিকার থাকে সে যতটা পারে নিংড়ে নেয়, আর গরীব শ্রমিকরা জমি ছেড়ে পালায়" ইত্যাদি (অনু. হুস্টেন, *JASB*, NS, খণ্ড ২৩, ১৯২৭, পৃ. ১২১ ; আরও দ্রষ্টব্য হকিন্স, 'আর্লি ট্রাভেলস', ১১৪ এবং মানরিক্, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭২)।

১১. 'দিলকুশা', পৃ. ১৩৯ ক।

১২. সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ১০ খ, Or. 1671, পৃ. ৬ খ। তাঁর সময়ে (১৭২০-র দশকে) আমিলদের অত্যাচারের ব্যাপারে খাফী খান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৭-৮ ও দ্রষ্টব্য। যেসব সাধারণ ডাকাত চারধারের গ্রাম লুঠপাট করত, জাগীরদারদের গোমস্তারাও কখনও কখনও তাদের চেয়ে ভালো কিছু ছিল না। তাই দেখা যায়, বৈসওয়ারার ফৌজদার অভিযোগ করছে যে, "আজিজ খানের জাগীরে তার গোমস্তা মাহ্‌মুদ এক ডাকাত দলের সর্দার", আইনকানুন বলে সেখানে কিছু নেই। ('ইনশা-এ রোশন কলম', পৃ. ২৪ খ ; আরও দ্রষ্টব্য পৃ. ১১ খ-১২ খ, ৪০ খ-৪১ খ)। আরও তুলনীয় 'আহ্‌কম-এ আলমগীরী', পৃ. ৯০ খ।

এইসব বিবরণ থেকে বোঝা যায়, ১৭ শতকে এরকম ধারণা একেবারে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে জাগীর-বদলের ব্যবস্থায় চাষীদের অবাধ শোষণ অনিবার্য। বাদশাহী প্রশাসন হয়ত সাময়িকভাবে এই পরিণতি রুখতে পারত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আটকাতে পারত না। বাদশাহী নিয়মকানুনই জাগীরদারকে নিজের ইচ্ছামতো চলবার জায়গা করে দিয়েছিল। চাষীরা যাতে দুর্বৎসর সামলে উঠতে পারে, সেজন্য কর মকুব, আগাম ঋণ বা অন্যান্য সাহায্যের ব্যবস্থাও তারা করতেও পারত, না-ও করতে পারত। আবার ফসল তোলার আগেই রাজস্ব আদায়ের জন্য চাপ দিতে পারত।[১৩] কিন্তু নিয়মকানুন একেবারেই মানা হয়নি বা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, এরকম ঘটনাও পাওয়া যায়। আওরঙ্গজেবের এক ফরমান অনুসারে, গুজরাটের জাগীরদারেরা যদি প্রকৃত উৎপন্নের পরিমাণকে আড়াইগুণ করে,[১৪] সেই হিসেবে রাজস্ব ধার্য করার সহজ পথে মোট উৎপন্নের চেয়ে বেশি রাজস্ব দাবি করতে পেরে থাকে, তাহলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাদশাহী নিয়মকানুন নিশ্চয়ই শুধু কাগজ-কলমেই মানা হতো। একইভাবে, একথাও স্বীকার করা হয়েছে যে, বিভিন্ন কর চাপানো নিষেধ করে জাগীরদারদের উদ্দেশে আওরঙ্গজেবের আদেশনামা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিল।[১৫]

এইরকম পরিস্থিতিতে অনিবার্যভাবেই কোন কোন অঞ্চলে চাষীদের ওপর চাপ এত গুরুভার হয়ে উঠত যে তাদের কোনক্রমে বেঁচে থাকার উপায়টুকুও থাকত না। "(রাজস্ব) দাখিল করার মতো কোন সম্বল বা সম্পত্তি" যেসব চাষীর ছিল না,[১৬] তাদের কাছ থেকে এই বিপুল পরিমাণ রাজস্ব কোন মার্জিত উপায়ে আদায় করা যেত না। মানরিক বলে গেছেন, "আরায়তোরা ('রাইয়ত' চাষীরা) যখন রাজস্ব দাখিল করতে পারত না, তখন তাদের মারধোর ও দুর্ব্যবহার করা হতো।"[১৭] এ ব্যাপারে শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই মানুচি বলেছেন যে, "'টাকা নেই' এই বলে ক্রমাগত রাজস্ব দাখিল না করাই হলো চাষীদের অভ্যাস। শাস্তি এবং [শাসনের] উপায়গুলোও প্রচণ্ড নির্মম। চাষীদের নিরম্বু অনাহারে রাখা হয়।……কখনও কখনও তারা মরার ভান করে (অবশ্য অনেক সময়ে এটা সত্যই ঘটে)…। কিন্তু এই চালাকি করে তারা কোন দয়া পায় না…।"[১৮]

অতএব, রাজস্ব দাবি মেটানোর জন্য চাষীরা তাদের বৌ-বাচ্চা ও গবাদি পশু বিক্রি করতে বাধ্য হতো।[১৯] কিন্তু এই দাসত্ব যে সাধারণত স্বেচ্ছায় বরণ করতে হতো এমন নয়। বলা হয়েছে, "ফসল না হওয়ার দরুন যে সব গ্রাম ইজারার পুরো টাকা দাখিল

১৩. ষষ্ঠ অধ্যায়, ষষ্ঠ অংশ।

১৪. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩।

১৫. খাফী খান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৮-৮৯।

১৬. মানরিক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭২।

১৭. মানরিক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭২।

১৮. মানুচি, ২য় খণ্ড, ৪৫০-৫১।

১৯. বদাউনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৯; মানুচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫১; 'মজহার-এ শাহজাহানী', ২১।

করতে পারছে না, প্রভু ও শাসকরা, বলতে গেলে, তাদের দৃষ্টান্ত হিসেবে খাড়া করে। বিদ্রোহের অভিযোগ আছে এই অজুহাতে বৌ-বাচ্চা বিক্রি করে দেওয়া হয়।"[২০] "ভারী লোহার শেকল পরিয়ে তাদের (চাষীদের) বিভিন্ন বাজার ও মেলায় নিয়ে যাওয়া হয় (বিক্রির জন্য)। বেচারা দুঃখী বৌ-রা ছেলেমেয়ে কোলে নিয়ে তাদের পেছন-পেছন যায়, আর দুর্দশার কথা ভেবে সবাই কান্নাকাটি করে।"[২১]

শুধু যে রাজস্ব দাখিল করতে দেরি হলেই চাষীদের ওপর এ ধরনের অত্যাচার হতো তা নয়। মুঘল সাম্রাজ্যের সাধারণ নিয়মই ছিল এই যে, কোন জাগীরদার বা ফৌজদারের বরাত বা চৌহদ্দীতে ডাকাতি হলে তাকে হয় দোষীদের খুঁজে বার করে লুটের মাল উদ্ধার করতে হবে, নয় নিজেব থেকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।[২২] হয়তো এতে কোনো আপত্তি উঠত না, কারণ এই অছিলায় পছন্দসই যে কোন গ্রাম লুঠপাট করা যেত। মাণ্ডি বলেছেন যে এই ধরনের ঘটনায় পুরুষদের মেরে ফেলা হতো, শিশুসহ অন্যান্যদের নিয়ে গিয়ে দাস হিসেবে বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হতো।[২৩] দরবারে এক আর্জি থেকে দেখা যায় যে একবার একটি গ্রামকে হিংসাত্মক ঘটনার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তারপর থেকেই ঐ গ্রামে ফৌজদাররা যখন-তখন লুঠপাট চালাত, গবাদি পশু ও চাষী দুই-ই ধরে নিয়ে যেত।[২৪] আবুল ফজল খোলাখুলিই বলেছেন যে যোদ্ধাদের বৌ ও বাচ্চাদের আটক ও বিক্রি বন্ধ করার জন্য আকবরকে একটি আদেশনামা জারি করতে হয়েছিল, কারণ, বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে যে "নিছকই ভিত্তিহীন সন্দেহে বা রাজদ্রোহিতার মিথ্যা অভিযোগে অথবা একেবারেই লোভের তাগিদে অনেক দুর্জন ও লোভী লোক গ্রামে ও 'মহাল'-এ ঢুকে লুঠতরাজ করে। কৈফিয়ৎ চাইলে তারা হাজার রকম অজুহাত দেখায় বা উত্তর দিতে দেরি করে অথবা ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।"[২৫]

২০. পেলসার্ট, ৪৭।

২১. মানরিক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭২। আরও তুলনীয় বার্নিয়ে ২০৫।

২২. দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম অংশ দ্রষ্টব্য।

২৩. মাণ্ডি, ৭৩-৪। তিনি বলেন যে চোরেরা গ্রামের ভেতর বসত গাড়লে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গ্রামগুলো তা রুখতে পারত না। তিনি আরও বলেছেন যে, ফৌজদারের শাস্তিমূলক অভিযানের ফলে "মাঝে মাঝে...নির্দোষ" লোকেরও ক্ষতি হতো। দোআব পার হয়ে যাওয়ার পথে এই মন্তব্যগুলো করা হয়েছে। 'ফ্যাক্টরিস ১৬৪৬-৫০', পৃ. ১২৭-এ গুজরাটে শায়েস্তা খানের নিন্দা করা হয়েছে ; কারণ "চোর ও বদমাসদের আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে এই অছিলায় সব শহর (গ্রাম) থেকে অতি গরীব লোকদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি এমন অত্যাচার করেছেন, যা আগে কখনও শোনা যায় নি (আর যারা সত্যিই ওই রকম [চোর-বদমাস], তারা দিনে দুপুরে ঘুরে বেড়ালেও কেউ তাদের গায়ে হাত দেয় না।)"

২৪. 'দুর-আল উলুম', পৃ. ৫৬ ক-খ। এ কথা ঠিক যে গ্রামটি লখী জঙ্গলের আশেপাশে উপক্রত এলাকার মধ্যে, আর চাষীরা ছিল 'একগুঁয়ে' দোগার জাতের লোক।

২৫. 'আকবরনামা', ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৯-৬০।

'সিয়াকনামা', ৮৮-তে এই ধরনের অভিযানের ফলে ক্রীতদাসী হয়ে যাওয়া এক মহিলা সম্পর্কে

আমাদের তথ্যসূত্রগুলোতে বহু জায়গায় এই ধরনের কথা পাওয়া যায় যে, দিন যত যাচ্ছে অত্যাচার ততই বাড়ছে, চাষ-আবাদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ফেরারী চাষীর সংখ্যাও বাড়ছে। সেণ্ট জে. জেভিয়ার বলেছেন যে গুজরাট ও কাশ্মীর—দু জায়গাতেই মুঘল বিজয়ের ফলে গ্রামবাসীদের দুর্দশা প্রচণ্ড পরিমাণে বেড়ে গেছে : " 'মোগোর'রা আগে যে সব জমি দখল করেছিল সেগুলোর হাল খুব খারাপ, কারণ অত্যাচার করে তারা সবকিছু ধ্বংস করে দেয়।"[২৬] সাম্রাজ্যের মধ্য অঞ্চলে 'করোড়ী পরীক্ষা'র ফলে নাকি এমনই অত্যাচার হয়েছিল যে চাষীরা বিভিন্ন 'দিকে ছড়িয়ে পড়তে' বাধ্য হয়। ফলে রাজস্বেরও ঘাটতি দেখা দেয়।[২৭]

জাহাঙ্গীরের আমলে চাষীদের ওপর "এত নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করা হতো" যে "জমিতে বীজ বোনা হয় না, সেগুলো জংলা হয়ে যায়।"[২৮] আরেকজন পর্যবেক্ষক বলেছেন, "গরীব মজুররা এগুলো ছেড়েছুড়ে পালিয়ে যায়। সেইজন্যই এখানে লোক এত কম।"[২৯] তবুও পরবর্তী বাদশাহের আমলে আরেকজন ঐতিহাসিক বলেছেন যে, "প্রাকৃতিক বিপর্যয়, জমিনদারদের বিদ্রোহ এবং হতভাগা কর্মচারীদের নিষ্ঠুরতার ফলেই" বিশাল এলাকা একেবারে জনশূন্য হয়ে গেছে। বাদশাহ এবং তার দক্ষ মন্ত্রীদের চেষ্টা সত্ত্বেও জান্নাত মাকানির (জাহাঙ্গীরের) আমলের চেয়েও দেশ আরও উৎসন্নে গেছে বলে মনে হয়।"[৩০] ১৬২৯ সালে একজন ওলন্দাজ পর্যবেক্ষক লিখে গেছেন যে গুজরাটে "চাষীদের ওপর আগের চেয়ে বেশি অত্যাচার করা হয় (আর) চাষীরা ভিটেমাটি ছেড়ে পালায়।" ফলে, রাজস্বও কমে গেছে।[৩১] ১৬৩৪

একটি কৌতূহলজনক দলিল আছে। একটি গ্রামে নাকি বিদ্রোহ চলছিল। সেখান থেকে ফৌজদার ঐ মহিলাকে অপহরণ করে। ফৌজদারের একজন চাকর বা সৈন্য তার মাইনের বিনিময়ে ঐ মহিলাকে নেয় এবং তারপর ৪০ টাকায় বিক্রি করে দেয়।

২৬. ১৬১৫ সালের গুজরাট সম্বন্ধে এ কথা বলা হয়েছে। (হস্টেন-এর অনূদিত চিঠি, *JASB*, N.S. খণ্ড ২৩, ১৯২৭, পৃ. ১২৫)। ১৫৯৭ সালে সেণ্ট জেভিয়ার যখন কাশ্মীরে যান, তখন তিনি লক্ষ্য করেন যে "এই রাজা (আকবর) যখন দেশটি দখল করেন ও তাঁর সিপাহসালারদের মাধ্যমে শাসন করেন তখন থেকেই এখানে চাষবাস হয় খুব কম, এমন কি জনশূন্য হয়ে যায়। সিপাহসালাররা এখানে অত্যাচার করে···আর জোরজুলুমী আদায় করে লোকের রক্ত নিংড়ে নেয়। এখানকার লোকে বলে যে এই রাজার আগে তাদের সবারই যথেষ্ট খাবারদাবার ছিল···। এখন সব কিছুরই অভাব, কারণ চাষীদের ওপর অত্যাচারের ফলে তাদের কেউ আর এখানে থাকে না" (ঐ, ১১৬)।

১৬৩৪-এ লিখতে বসে 'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী'র (পৃ. ৫২) লেখক মনে করেছিলেন যে মুঘলরা একের পর এক যেসব জাগীরদার নিয়োগ করেছিল তাদের চেয়ে তরখানদের আমলে থাট্টা (সিন্ধু) আরও সুখে ছিল।

২৭. বদাউনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৯।

২৮. পেলসার্ট ৪৭।

২৯. ১৬০৯-এ আগ্রা থেকে সেণ্ট জেভিয়ারের চিঠি, পূর্বোক্ত গ্রন্থ. পৃ. ১১১।

৩০. সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ১০ ক-খ, Or. 1671, পৃ. ৬ খ।

৩১. গেলেইনসেন, অনু. মোরল্যাণ্ড, *JIH*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৮।

সালে একজন ভারতীয় লেখক অতি দুঃখে বলে গেছেন যে, জাগীরদারদের অত্যাচারে সেহ্ওয়ান (সিন্ধু) আজ "হতভাগ্যদের দেশ—নিষ্ঠুর আর অসহায়ের দেশ।"[৩১ক] আওরঙ্গজেব দখিনে দ্বিতীয়বার সুবাদার হয়ে যাওয়ার ঠিক আগেই দেখা গিয়েছিল "প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অত্যাচার ও অবহেলা"র জন্যই চাষীরা "ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে" আর জায়গাটা প্রায় জনশূন্য হয়ে গেছে।[৩২]

মুঘল সাম্রাজ্যের গাফিলতি প্রসঙ্গে বার্নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আওরঙ্গজেবের আমলের প্রথম দিকের অবস্থা তার থেকে বোঝা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, "মজুরের অভাবে ভালো-ভালো জমির একটা বড় অংশ অনাবাদী পড়ে আছে।" এই মজুরদের অনেকেই "প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের দুর্ব্যবহারে শেষ হয়ে গেছে বা নিরুপায় হয়ে ভিটে মাটি ছেড়ে পালিয়েছে।"[৩৩]

পরিশেষে মুহম্মদ শাহের রাজত্বের প্রথম দিকে—অর্থাৎ মুঘল সাম্রাজ্যের গোধূলি-বেলায়—লিখতে বসে খাফী খান চাষীদের অবস্থা ও চাষবাসের অবনতির বিষয়ে এই ছবিটি তুলে ধরেছেন :

"দেশের বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ মানুষরা পরিষ্কার বুঝে নিয়েছেন, সুচিন্তিত ও সুষ্ঠু রাষ্ট্র পরিচালনা, কি কৃষককুলের সুরক্ষার ব্যবস্থা, বা দেশের সমৃদ্ধিতে উৎসাহ দেওয়া ও উৎপাদন বৃদ্ধি—এসব এ কালের হাওয়ায় বিদায় নিয়েছে। ইজারার রাজস্ব-আদায়কারীরা (এর অধিকার পাওয়ার জন্য) দরবারে গিয়ে যথেষ্ট খরচপত্র করে 'মহাল'-এ যায় ও রাজস্বপ্রদায়ী চাষীদের কাছে বিভীষিকা হয়ে দাঁড়ায়।...যেহেতু পরের বছর বা এমনকি চলতি বছরের পুরোটাই তাদের পদ বহাল থাকবে কিনা সেটুকু ভরসাও তাদের নেই, তারা তাই উৎপন্নের দুটি ভাগই (সরকারের ও সেই সঙ্গে চাষীদের ভাগ) দখল করে ও বিক্রি করে দেয়। অবশ্য যাদের পাপের ভয় আছে, তারা এর বেশি আর এগোয় না, আর (চাষীদের) মোষ, গরু, গাড়ি ইত্যাদি—অর্থাৎ যেগুলোর উপর তাদের চাষবাস নির্ভর করে সেগুলোও—বিক্রি করে দেয় না, অথবা দরবারের খরচা ও নিজের সৈন্যদের খরচপত্র এবং কবুলিয়তের ঘাটতি ইত্যাদি মেটানোর দরকার হলে জুলুম করে আদায়ে সন্তুষ্ট না হয়ে চাষীদের সর্বস্ব—ফলের গাছ থেকে শুরু করে একেবারে চাষীদের জমির উপর দখলী ও ওয়ারিশী স্বত্ব পর্যন্ত সবই—বেচে দেয় না...। আগে যেসব পরগনা ও শহর থেকে পুরো রাজস্ব পাওয়া যেত সেরকম অনেক জায়গা সরকারী কর্মচারীদের ('হুক্কাম') অত্যাচারে এমনভাবে ছারখার হয়ে গেছে যে এখন সেগুলো শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। আর গ্রামগুলো এমনই ধ্বংস ও পরিত্যক্ত হয়েছে যে যাতায়াতের পথে বসবাসের চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায় না। যদিও লোভের ফলে এবং এই দুঃসময়ের রীতি অনুযায়ী এই দেশ

৩১ক. 'মজহার-এ শাহ্জাহানী', ১৭৩-৪।

৩২. 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ২৬ খ, ৩০ খ-৩১ ক, ৩৪ ক; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', পৃ. ৬৯, ৭০, ৮৪, ৯১।

৩৩. বার্নিয়ে, ২০৫, এবং পৃ. ২২৬-২৭। মোরল্যাণ্ড তাঁর 'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম', পৃ. ১৪৭ টীকায় ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে মূলের laboureurs-এ জায়গায় এই তর্জমায় labourers (মজুর) কথাটি বসেছে। আরও সঠিক অনুবাদ হওয়া উচিত 'চাষী'।

প্রতিদিন উৎসন্নে যাচ্ছে এবং হতভাগা রাজস্ব-আদায়কারীদের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার দরুন চাষীরা পিষ্ট হচ্ছে, নিপীড়িত চাষীদের বৌ-বাচ্চাদের হাহাকারের আঘাত [খানিকটা আধ্যাত্মিক ধরনের!] যখন জাগীরদারদের সহ্য করতে হচ্ছে, তখন এইসব কর্মচারী, যারা আল্লার পরোয়া করে না, তাদের নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার ও অবিচার এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে কেউ যদি তার একশ ভাগের এক ভাগও বর্ণনা করতে যায় তাহলেও তা বর্ণনার অতীত"।[৩৪]

এইসব বিবরণ থেকে চাষবাসের অবনতির যতটা উল্লেখ পাওয়া যায়, এলাকা পরিসংখ্যানের সঙ্গে মিলিয়ে তা পরীক্ষা করা যায় না। এ কথা ঠিক যে, আওরঙ্গজেবের আমলে এলাকার অঙ্কগুলো সাধারণত 'আইন'-এ উল্লিখিত অঙ্কের তুলনায় যথেষ্ট বেশি। কিন্তু, প্রথম অধ্যায়ে যেরকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, এর অর্থ শুধু এই যে মধ্যবর্তী সময়ের আগে যেসব জমি জরিপ করা হয়নি, সেগুলোকেও জরিপের আওতায় আনা হয়েছিল। এ দিয়ে চাষ-আবাদের বিস্তৃতি বোঝায় না। আমাদের জানা আছে যে মুঘল আমলে কয়েকটি অঞ্চলে জমি পুনরুদ্ধারের কাজে বড় রকমের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। যেমন, বাংলাদেশের ব-দ্বীপময় পূর্বাঞ্চল, ও তরাই-এর কিছু অঞ্চলে।[৩৫] কিন্তু এগুলো পুরো সাম্রাজ্যের আবাদী জমির নগণ্য একটা অংশের বেশি কিছু ছিল বলে মনে হয় না। এছাড়াও, একটি ভূখণ্ডের উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হয়তো আরেকটি জনহীন হয়ে যেত।

গোটা ১৭ শতক জুড়ে 'জমাদামী' (ধার্য রাজস্ব)-র যথেষ্ট সংখ্যক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। তার থেকে দেখা যায় রাজস্বের অঙ্ক আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু এর সঙ্গে যে সারণিগুলো দেওয়া হয়েছে তার থেকে বোঝা যায় ঐ একই সময়ে জিনিসপত্রের দাম যে-পরিমাণে বেড়েছিল, তাতে 'জমাদামী' বৃদ্ধির পুরোটাই প্রায় অকেজো হয়ে যায়। আগের একটি অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে, উৎপন্নের হিসাবে ধরলে ভূমিরাজস্ব-ভারের কোন পরিবর্তন হয়নি। অতএব, এই ক্রমবর্ধমান মূল্যস্তরের পরিপ্রেক্ষিতে 'জমাদামী' যদি একই থাকে, তাহলে শুধু এ কথাই ধরে নেওয়া যায় যে চাষবাসের বিস্তৃতি একেবারেই হয়নি অথবা খুব সামান্যই হয়েছিল। কৃত্রিমভাবে

৩৪. খাফী খান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৭-৮। খাফী খান সম্ভবত এই অংশটি লিখেছিলেন ১৭২০-২১-এ বা তার আগে, যদিও তাঁর লেখা শেষ হয়েছিল ১৭৩১-এ (স্টোরি, 'পার্সিয়ান লিটরেচার—এ বায়ো-বিবলিওগ্রাফিকাল সার্ভে', ২য় ভাগ, ৩য় খণ্ডাংশ, পৃ. ৪৬৮ ও টীকা)।

এখানে উদ্ধৃত অংশটি যে-বই থেকে অনুবাদ করা হয়েছে তাতে কিছু ছাপার ভুল ও অস্পষ্টতা রয়েছে। যেমন, শেষ বাক্যের প্রথমে "এবং চাষীরা" শব্দদুটিকে "লোভ" এই শব্দটির পর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত, মূলটি ভুলভাবে পড়ার দরুন এমন ঘটেছে। কিন্তু এই অংশের ক্ষেত্রে অন্য কোন পাণ্ডুলিপি আমি দেখে উঠতে পারিনি, তাই বলতে পারছি না সঠিক পাঠ কী হবে।

৩৫. প্রথম অধ্যায়, প্রথম অংশ দ্রষ্টব্য। আরাকানদের বিরুদ্ধে শায়েস্তা খানের সফল অভিযানের পর পুনরুদ্ধারের কাজে হাত দেওয়া হয়েছিল। মুঘল আমলে তরাইতে যে ব্যাপক জমি হাসিল করা হয়, মনে হয় তা ঘটেছিল কান্ত এবং গোলা-র 'মহাল'-এ।

'জমাদামী' বাড়িয়ে দেওয়ার একটা প্রবণতা ছিল[৩৬]—এই অনুমানের যদি কোন ভিত্তি থাকে তাহলে আবাদী জমির পরিমাণও সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল বলে মনে হবে।

সারণি

১. দামবৃদ্ধি

('আইন'-এর দামের ভিত্তিতে)

বছর	টঙ্কিত সোনার মূল্য	টঙ্কিত তামার মূল্য	কৃষিজ উৎপন্নের মূল্য (স্বাভাবিক ফলন)	বায়ানা নীলের দাম
১৫৯৫-৬	১০০	১০০	১০০	১০০*
১৬০৯	১১১	১০০ গুজরাট	—	১৫০
১৬১৪	১১৯	৯৫ থেকে ১০৫ গুজরাট		
১৬১৫	—	—	৬৪ থেকে ৭০, বা ৭৮ থেকে ৮৬ চিনি : আগ্রা ও লাহোরের মধ্যে	
১৬২১	১১১		—	—
১৬২৬	১৫৬	১৩৩ আগ্রা	--	—
১৬২৭	—	—		২০০
১৬২৮	—	১৬১ গুজরাট		—
১৬৩৩	১৩৮	১৬০ গুজরাট	—	—
১৬৩৬	—	১৪৯ গুজরাট	—	—
১৬৩৭	—	১৩৩ আগ্রা	—	—
১৬৩৮	—	১৩৮ আগ্রা	-	—
১৬৩৯	—	—	১৬৪ চিনি : লাহোর	২৮১
১৬৪০	১৪৪		—	—
১৬৪১-২	১৫৬	—	—	—
১৬৪৪-৫	১৫৬	—	—	
১৬৪৬	—	—	১৪১ চিনি : আগ্রা	২৬৩
১৬৫১	—	—	১৪১ চিনি : আগ্রা	—
১৬৫৩	১৫৬	—	—	—
১৬৫৬	—	১৭৯ সিন্ধু	—	২০০
১৬৫৮	১৮৩	—	—	—
১৬৫৯	—	১৬৭	—	—
১৬৬১	১৬১ থেকে ১৬৩	২৬৭ দখিন	—	—
১৬৬২	১৬৭	২৫০ গুজরাট	—	—
		২৭৬ দখিন		
১৬৬৬	১৭৮	২৩৫ গুজরাট	—	—
১৬৬৭	—	২৫০ গুজরাট	—	৩২৫
১৬৭০	—	—	২৮৫ গম : আগ্রা	—
১৬৭১	—	২৬৭ (?) পাটনা		

৩৬. সপ্তম অধ্যায়, প্রথম অংশ দ্রষ্টব্য।

বছর	টঙ্কিত সোনার মূল্য	টঙ্কিত তামার মূল্য	কৃষিজ উৎপন্নের মূল্য (স্বাভাবিক ফলন)	বায়ানা নীলের দাম
১৬৭৬	১৬৭	—	—	—
	১৩৩ এবং ১২২			
১৬৭৭	১৫৩	—	—	—
১৬৮০	১৩৮ এবং ১৪৪	—	—	—
১৬৮৪	১৩৮	—	—	—
১৬৯০-৯৩	১৫৬	২০০ গুজরাট	—	—
১৬৯৫	১৪৭	২২২ গুজরাট (?)	—	—
১৬৯৭	১৪৬	—	—	—
১৭০২	—	—	২৮৫ গম : লাহোর	—

* 'আইন'-এর সর্বোচ্চ দাম ১৬ টাকাকে ভিত্তি ধরা হয়েছে।

টীকা : সারণিটি দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় অংশ ও পরিশিষ্ট 'গ'-এর ভিত্তিতে তৈরি।

সমসাময়িক বহু তথ্যসূত্রে যে মুখ্য বিষয়টির প্রমাণ পাওয়া যায় (একটু আগে আমরা যেমন দেখেছি) তা হলো চাষীরা তাদের জমি ছেড়ে পালাচ্ছে। এ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা এবং যত দিন যাচ্ছিল, ততই এই ঝোঁকটা যেন বেড়ে চলছিল। আমরা আগেই এই যুক্তি দিয়েছি যে অনেক অঞ্চলে বহু জমি অনাবাদী পড়ে থাকার জন্যই সম্ভবত চাষীদের জায়গা বদল ছিল আলোচ্য পর্বের কৃষি-জীবনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।[৩৭] সাধারণত দুর্ভিক্ষের দরুনও জনসাধারণ এইভাবে পাইকারী হারে ভিটে-মাটি ছেড়ে চলে যেত।[৩৮] কিন্তু, অন্য যে কোন ব্যাপারের চেয়ে চাষীদের গতিশীলতার মূলে ছিল মানুষের তৈরি রীতিনীতি। বকেয়া রাজস্ব দেওয়া অসম্ভব হলে পালানো ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।[৩৯] নতুন জায়গায় বসত গাড়তে গিয়ে অনাবাদী জমিকে চাষের আওতায় আনার দরুন চাষীরা হয়তো কিছু অতিরিক্ত সুবিধাও পেত।[৪০] এই ধরনের ঘটনা বন্ধ করার জন্যই বোধহয় সরকারী কয়েকটি দলিলে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া ছিল যে, চাষীরা অনাবাদী জমিতে খাজনার শর্তে বসত করতে চাইলে তারা যেন 'গৈর-জমাঈ' হয়, অর্থাৎ আগে অন্য কোথাও রাজস্ব দিচ্ছিল, এমন যেন না

৩৭. চতুর্থ অধ্যায়, প্রথম অংশ দ্রষ্টব্য।

৩৮. তৃতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় অংশ দ্রষ্টব্য।

৩৯. ১৬২৩ সালে নভসারি-র কাছে ইংরেজদের একটি জাহাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে গ্রামের লোকজন চুরি-চামারি করেছে বলে সন্দেহ করা হয়। ইংরেজরা দেখল যে নভসারি-র করোড়ী ঐ গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে-দোনামনা করছে। কারণ সে তাদের থেকে টাকা পায় এবং চাপ দিলে "হয়তো ওরা পালিয়ে যাবে" ('ফ্যাক্টরিস ১৬২২-২৩', পৃ. ২৫৩-৪)।

সরকারী আদেশগুলো থেকে সন্দেহাতীতভাবে বোঝা যায় যে বকেয়া রাজস্ব বা তকাবী ঋণ এড়ানোর জন্য ফেরারী চাষীদের সংখ্যা ছিল বিরাট (তুলনীয় 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ১২৩ খ; 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ১৯৪ খ-১৯৫ ক, Bodl. ১৪৫ ক-খ; 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯০-৯১)।

৪০. ষষ্ঠ অধ্যায়, অষ্টম অংশ দ্রষ্টব্য।

২. 'জমাদামী' বৃদ্ধি

('আইন'-এর অঙ্কের ভিত্তিতে)

বছর	সাম্রাজ্য (দখিন প্রদেশগুলো বাদে)	বাংলা	ওড়িশা	বিহার	অযোধ্যা	এলাহাবাদ	আগ্রা ও দিল্লী	মালব	গুজরাট	আজমীর	লাহোর	মুলতান ও থাট্টা	কাশ্মীর
১৫৯৫-৯৬	১০০*	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
১৬০৫	১১০	৭০		১১৪	১১৫	১৪৫	১২২	১০৭	১০৭	১০৭	১২০	৯৫	
প্রাক্-১৬২৭	১১৯	৮৩		১৩৬	১১৬	১৪৬	১২৯	১১৫	১১৫	১৪৫	১৫৫	১৪৮	
১৬২৮-৩৬	১২৩	৯২	১১৮	১৩২	১৩০	১৪৪	১২৪	১০৭	১০৭	১০৭	১২০	†	
১৬৩৩-৩৮	১৪২	১০০	১০০	১৬৮	১৩০	১৭২	১৪৬	৮২	১০৫	১৮৬	১৫৯	১২৬	১৯৩
১৬৪৬-৪৭	১৬২	১১৬	১১৮	১৭৪	১৫০	১৯১	১৬৫	১২১	১২০	২০৭	১৬৪	১৩৩	২৪২
আনু. ১৬৫৬	১৬৮	১০৭	৭৪	২৩৬	১৮২	২৫১	২৫৪	১৯৮	১৯৭	২২৪	১৯৮	১৫৮	১৮৪
১৬৬৭	১৪৫	১২২	১১৬	৩১৪	১৬০	২০৮	১৯৩	১০২	১০২	২২০	১৬৫	১১৯	৩৪৪
১৬৮৭-১৭০৯	১৬৯‡	১২২	৮৪	১৭৭	১৬১	২১৭	২০৫	১০৪	১০৪	২২৫	১৬৩	১০৬	৩৭১

* বিভিন্ন প্রদেশের (দখিন প্রদেশগুলো বাদে) 'জমাদামী'র মোট অঙ্কই দেওয়া হয়েছে, 'আইন'-এ সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে যে পরিমাণটি দেওয়া আছে তা নয়।

† পাণ্ডুলিপিতে সুস্পষ্ট লিপিকর-প্রমাদের জন্য এই অঙ্কটি ব্যবহার করা হয়নি।

‡ এই পর্বের চারটি পরিসংখ্যান-সারণির দুটিতে এই অঙ্কই দেওয়া আছে; অন্য দুটিতে (১৬৮৭-আনুমানিক ৯১ ও ১৬৮৭-আনুমানিক ৯৫), 'আইন'-এর সঙ্গে মিলিয়ে, অঙ্ক দুটি যথাক্রমে ১৮১ ও ১৬৭ হবে।

টীকা : সারণিটি পরিশিষ্ট 'খ'-এর ভিত্তিতে তৈরি।

হয়।[৪১] কিছু চাষী তো চাষবাস একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিল। যেমন, বার্নিয়ে বলেছেন যে, "শহরে বা ছাউনীতে মালবাহী কুলি, জলের ভারি বা ঘোড়সওয়ারদের চাকর হয়েও জীবনধারণের একটা সহনীয় উপায় খোঁজার জন্য" কিছু লোক "দেশ" ছেড়ে চলেই গিয়েছিল।[৪২] তুলনায় শহরের জনসংখ্যা মুঘল আমলে ছিল খুবই বেশি এবং যে অসংখ্য 'পিয়ন', অদক্ষ শ্রমিক ও দাসে শহর ভরে গিয়েছিল, নিশ্চয়ই তারা এসেছিল গ্রাম থেকে।[৪৩]

এসব সত্ত্বেও, দক্ষিণ ভারতের প্রসঙ্গে মানুচি যেমন বলেছেন, সর্বত্রই একই ধরনের অত্যাচার চলত এবং লক্ষ্যহীন ঘরছাড়া মানুষগুলোর ভাগ্য সুখের হতো না।[৪৪] শেষ পর্যন্ত তারা একটা সীমায় এসে পৌঁছত। অনাহার বা দাসত্ব এবং সশস্ত্র প্রতিরোধ—এই দুএর মধ্যে একটা বেছে নেওয়া ছাড়া চাষীদের আর কোন উপায় থাকত না।[৪৫]

৩. চাষীদের সশস্ত্র প্রতিরোধ

বলা বাহুল্য, প্রবণতার দিক দিয়ে জনসাধারণের বৃহত্তম অংশই লড়াকু ছিল না। মালব প্রদেশের বিশেষত্ব হিসেবে একটা ঘটনা লিখে রাখা হয়েছিল : এখানকার

৪১. 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ১০৩ খ-১০৪ ক, ১৮৭ ক-১৮৮ ক; Bodl. পৃ. ৭৯ ক-খ, ১৪৮ খ-১৪৯ ক।

৪২. বার্নিয়ে ২০৫।

৪৩. শহরগুলোর আয়তন প্রসঙ্গে দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় অংশ দ্রষ্টব্য।

৪৪. মানুচি, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৭, ৫১।

৪৫. অত্যাচার বাড়ার সঙ্গে গণবিদ্রোহের যোগাযোগ—এই বিষয়টি ১৮ শতকের লেখকদের মধ্যে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্-র মনে যথেষ্ট ছাপ ফেলেছিল বলে মনে হয়। তিনি ভেবেছিলেন যে নিষ্কর্মাদের এক বিশাল শ্রেণীকে ভরণপোষণের জন্য রাজকোষের ওপর যে-চাপ পড়ে—তাই হলো তাঁর সময়ে "গ্রামাঞ্চল (বা শহর) বিধ্বস্ত হওয়া"র প্রথম কারণ। তিনি বলেন, "চাষী, ব্যবসায়ী ও কারিগরদের ওপর প্রচণ্ড করের বোঝা ও তারপর তাদের নিপীড়ন হলো দ্বিতীয় কারণ। অনুগত লোকজনও এর ফলে পালিয়ে যায় ও ধ্বংস হয়ে যায় এবং ক্ষমতাশালী লোকরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এ কথা নিশ্চিত যে করের বোঝা যদি কমে, একমাত্র তবেই গ্রামাঞ্চলে (বা শহরে) শান্তি পাওয়া যেতে পারে।" ('হুজ্জতুল্লাহ্ ইল-বালিগা', আরবী মূলের পাশাপাশি আবু মুহম্মদ আবদুল হক হকানী-কৃত উর্দু অনুবাদ, করাচী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৪)। ঐ একই বই-এর অন্য জায়গায় তিনি পারস্য ও বাইজানটিয়াম-এর দরবারের বিলাসী জীবনযাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে তাঁর সময়েও "গ্রামাঞ্চলের শাসনকর্তাদের" মধ্যে ঐ একই ব্যাপার দেখা যেত। এই ধরনের বিলাস চালিয়ে যাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল বেপরোয়া অত্যাচার: "এত বেশি সম্পদ পেতে গেলে যা দরকার তা হলো চাষী, ব্যবসায়ী ও কারিগরদের ওপর আরও বেশি করে কর চাপানো ও তাদের সঙ্গে নির্দয় ব্যবহার করা। কর না দিলে ব্যাপক খুন-খারাবি চলে ও নানাভাবে তাদের ক্ষতি করা হয়। আর তারা যদি অনুগত হয়ে থাকে, তাহলে গাধা ও মোষের মতো তাদেরও জল তোলা লাঙল টানা ও ফসল কাটার কাজে লাগানো হয়।" (ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৫)।

চাষী ও কারিগররা হাতিয়ার নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।[১] পেলসার্ট (আনু. ১৬২৬) বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন যে এত দুঃখ-দুর্দশা ও অভাব থাকা সত্ত্বেও "লোকে ধৈর্য ধরে সব সহ্য করে, ও খোলাখুলি স্বীকার করে যে তারা এর চেয়ে ভালো কিছু পাওয়ার যোগ্য নয়"।[২]

তবু সহ্যেরও নিশ্চয়ই একটা সীমা ছিল। ভূমিরাজস্ব দিতে অস্বীকার করাই ছিল চাষীদের তরফে প্রতিবাদের চিরন্তন রূপ। অবশ্য তাদের ওপর কোন বিশেষ অত্যাচা র হলে সেটা তাদের বিদ্রোহের দিকেও ঠেলে দিতে পারত।[৩] কৃষকদের বিরুদ্ধে এমনও অভিযোগ করা হয়েছে যে তারা প্রায়ই ডাকাতির পথ বেছে নিত। কিন্তু অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে তারা রামের টাকা লুঠত শুধু শ্যামকে দেওয়ার জন্য।[৪]

যে সব গ্রাম বা অঞ্চল এইভাবে বিদ্রোহের পথে যেত, বা খাজনা দিতে রাজি

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন লক্ষ্য করার সময়ে, এমনকি শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্-র মতো একজন ধর্মতত্ত্ববিদ্ লেখকও অত্যাচার এবং বিদ্রোহের মধ্যে কার্যকারণ-পরম্পরার কথা ধরেই নিয়েছিলেন। এর থেকেই বোধহয় দেখা যায় এই ধারণা কত ব্যাপক ছিল। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ নিজে 'স্বচ্ছবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনৈতিক চিন্তাবিদ্' ছিলেন, তাঁর "লেখাপত্র প্রাচ্যে গণতন্ত্রের প্রতি আগ্রহকে আরও জোরদার করতে পারত" এবং তিনি "শ্রমিক, কারিগর ও চাষীদের সমর্থনে" উঁচু গলায় কথা বলেছিলেন—ওপরের কথাগুলো থেকে তাঁকে এই ধরনের মানুষ বলে ঘোষণা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই ('এ হিস্ট্রি অফ দা ফ্রিডম মুভমেন্ট' (পাকিস্তান)-এ কে. এ. নিজামী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১২-৪১)। এ ব্যাপারে তিনি যা বলেছেন সে কথা তাঁর প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ভীমসেন মারাঠীদের উত্থান প্রসঙ্গে তাঁর লেখায় আরও অনেক বেশি তথ্য দিয়ে বিস্তারিতভাবে লিখে গেছেন (এই অধ্যায়েরই পঞ্চম অংশে উদ্ধৃত)। তাছাড়া এ কথা ভুললে চলবে না যে শাহ্-ওয়ালীউল্লাহ্-র সহানুভূতি ছিল খুবই সীমিত। সাসানিদ ও বাইজান্টাইনরা তাদের চাষী ও শ্রমিকদের সঙ্গে যে-ব্যবহার করত তিনি তার অনুকরণ করতেই তৈরি ছিলেন, যদি সেই চাষী-শ্রমিকরা অ-মুসলমান হয়। তিনি ঘোষণা করেন যে আদর্শ ইসলামী ব্যবস্থায় ইমাম "ফসল কাটা, শস্য ঝাড়া এবং (বিভিন্ন) কারিগরী পেশায় নীচ কাফেরদের নিয়োগ করবেন। মাঠের কাজে বা মোট বওয়ার জন্য ব্যবহৃত জন্তুদের মতো তারা বাধ্য ও অনুগত হয়ে থাকবে" ('হুজ্জতুল্লাহ্ ইল-বালিগা', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৭)।

১. 'আইন', ১ম খণ্ড, ৪৫৫; 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ১৭২। 'আইন'-এ 'কারিগর'-এর বদলে আছে 'শস্য-ব্যবসায়ী'।

২. পেলসার্ট, ৬০।

৩. মানুচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫১।

৪. বৈসওয়ারা-র ফৌজদার রাদ-আন্দাজ খান অভিযোগ করেন যে একটি পরগনায় শান্তিপ্রিয় চাষীদের গ্রামগুলো "রাজদ্রোহী রাহাজানরা" নষ্ট করে দিয়েছে ও তাদের জমি চাষ করতে শুরু করেছে। যখনই তিনি তাদের তাড়িয়ে দেন, তখনই জাগীরদারদের গোমস্তাদের লোভের ফলে তারা আবার ফিরে আসতে পারে। স্পষ্টতই তারা থাকলে গোমস্তাদের লাভ হতো ('ইনশা-এ রোশন কলম', পৃ. ৩৮ ক-খ)।

হতো না ; 'রাইয়তী' নামের রাজস্ব-প্রদায়ী গ্রাম থেকে আলাদা করে তাদের বলা হতো "মওয়াস" ও "তলব"।[৫] সাধারণত, মুক্ত সমভূমিতে অবস্থিত গ্রামগুলোর চেয়ে যেসব গ্রাম গভীর গিরিখাত বা জঙ্গল বা পাহাড় দিয়ে সুরক্ষিত, তাদের পক্ষেই কর্তৃপক্ষকে অমান্য করার সুযোগ ছিল বেশি।[৬] "এই ধরনের গোলমাল [কর্তৃপক্ষ ও চাষীদের

'মওয়াস' শব্দটি অভিধানে পাওয়া যায় না, কিন্তু আমাদের তথ্যসূত্রে এর অর্থ খুবই স্পষ্ট। যেমন, জাগীরদারকে লেখা জনৈক রাজস্ব-আদায়কারীর একটি চিঠির নমুনায় দেখা যায়: "আমরা-পরগনায় গিয়ে পৌঁছলাম। রাইয়তী গ্রামগুলো থেকে কিছু 'চৌধুরী', কানুনগো এবং চাষী এল, কিন্তু 'মওয়াস'-এর সঙ্গে যারা যুক্ত (বা তারই ধারে কাছে) তারা (এ কাজে) কোন আগ্রহ দেখায় নি···। হুজুর! এই পরগনাটি বিদ্রোহী ('জোর-তলব'); একভাগ রাইয়তী, তিনভাগ 'মওয়াস'। চাষী ও বিদ্রোহীদের সামলানো (ও) পুরো রাজস্ব আদায়ের জন্য একটি সেনাদল দরকার, ইত্যাদি" (হাদিকী, পৃ. ১৫ ক-খ)। 'অখবারাৎ', ক ২৩৩-ও দ্রষ্টব্য। এখানে লেখা আছে যে কোন একটি পরগনা "খুবই 'মওয়াস' ও 'জোর-তলব'," তাই ওখানে মোতায়েন বাহিনী থেকে কয়েকটি সেনাদল সরানো বন্ধ রাখা হয়েছিল। এই দুটি অংশেই 'মওয়াস' ও 'জোর-তলব' দুটি শব্দই 'বিদ্রোহী এলাকা' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সেইজন্য 'তারিখ-এ তাহিরী', পৃ. ১২৮ খ-তে ক্লীবলিঙ্গে বহুবচন করা হয়েছে 'মওয়াস-হা' অর্থাৎ বিদ্রোহী অঞ্চলগুলো। কিন্তু 'মওয়াস' বলতে, মনে হয়, শুধু বিদ্রোহী লোকও বোঝাত। তাই আব্বাস খান বলেছেন (পৃ. ১০৭) সম্ভল 'সরকার'-এর চাষীরা "রাজদ্রোহী ও 'মওয়াস'।" একইভাবে বদাউনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৯-এ " 'মওবাসান' (মনুষ্য-বোধক লিঙ্গে 'মওয়াস'-এর বহুবচন) ও বিদ্রোহীদের" কথা বলেছেন, "যারা কখনও রাজস্ব দেয় না।" "একটি ছোট শহর···যারা 'মনাস্‌সে' বা বিদ্রোহী" তাদের ক্ষেত্রে মাণ্ডি-ও (পৃ. ৯০) এই শব্দটই ব্যবহার করেছেন। প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে তিনি 'মনাস্‌সে' বদলে 'মভাস্‌সে' লিখতে চেয়েছিলেন, হয়তো আসলে তাই লিখেও ছিলেন। (সম্পাদক এদের মোনা রাজপুত বলে সনাক্ত করেছেন, কিন্তু সে এক উদ্ভট অনুমান)।

'মওয়াস'-এর জন্য এই দীর্ঘ টীকার প্রয়োজন আছে, বিশেষত এই কারণে যে আমীর খুসরু এবং বারানীর পাঠকরা এ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। 'ওরিয়েণ্টাল কলেজ ম্যাগাজিন', খণ্ড ১২, ২য় সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬) পৃ. ৩৭-৩৮-এ অধ্যাপক শেরানী এই দুই লেখকের রচনা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে 'মওয়াস' একটি হিন্দী শব্দ, অর্থ: "আশ্রয় ও আত্মরক্ষার স্থান"। কথাটিকে তিনি দুর্গ বা 'গঢ়ী'-র সঙ্গে এক করে দিয়েছেন। এই সংজ্ঞার সপক্ষে তিনি কোন প্রামাণ্য সূত্র উল্লেখ করেননি! তাঁর উদ্ধৃত দুটি অংশের সঙ্গে ওপরে যে অর্থটি করা হলো তার বেশ সঙ্গতি আছে।

অনুগত বা রাজস্ব-প্রদায়ী—এই অর্থে 'রাইয়তী' শব্দটির জন্য হাদিকী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ এবং 'হিদায়াত-আল কওয়াইদ', আলীগড় পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৬৫ ক-খ দ্রষ্টব্য। 'জোর-তলব'-এর বিপরীত অর্থে সেখানে এই কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

"সমভূমির অনেক অংশে কাঁটা-জঙ্গল গজায়। প্রতিরোধের পক্ষে এগুলো ভালোই। পরগনার লোকরা এর আশ্রয়ে দুর্দান্ত বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং রাজস্ব ('মাল') দাখিল করে না" ('বাবুরনামা', অনু. শ্রীমতী বিভরিজ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৭ ; I.O. 3714, পৃ. ৩৭৮ খ)।

মধ্যে] যা ভারতের কোন-না-কোন অঞ্চলে লেগেই আছে," তার কথা বলতে গিয়ে মান্তি যোগ করেছেন যে "কিছুদিনের জন্য বুঝতে পারলেও 'গাওয়ার'দের ('গাঁওয়ার', গ্রামবাসী) অবস্থাই সাধারণত সবচেয়ে খারাপ হয়ে দাঁড়ায়।"[৭] পরাস্ত হলে গ্রামবাসীদের যে কী দুর্দৈব ঘটত তা অনুমান করা যায় : "সামনে যে পড়ে তাকেই খুন করা হয়, তাদের বৌ, ছেলেমেয়ে ও গবাদি পশু নিয়ে চলে যায়।"[৮]

বেশির ভাগ সময়েই চাষীদের এই ধরনের প্রতিবাদ নিশ্চয়ই বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়েই থাকত : এক-একটি গ্রামের ওপর রাজস্ব দাবির ভার যেমন-যেমন চাপানো হতো, সেই অনুযায়ী গ্রামে-গ্রামে দুর্দশার তীব্রতায় হেরফের দেখা দিত। ফলে, এমন সম্ভাবনাও থাকে যে এক গ্রামের চাষীরা যখন রুখে দাঁড়াচ্ছে ও জবাই হচ্ছে, তখন তাদেরই আশ-পাশের লোক সে ব্যাপারে উদাসীন। তবুও চাষীদের মধ্যে কাজ করত দুটি সামাজিক শক্তি, যা তাদের এই ধরনের কৃষক-অভ্যুত্থানের মাত্রাকে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করত।

প্রথমত ছিল একই জাতের লোকের বৃহত্তর সম্প্রদায়। জাতের বন্ধন যে চাষীদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে একযোগে বিদ্রোহ করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে—আধুনিক ভারতের কৃষক আন্দোলনের এক বিশিষ্ট নেতা এই ঘটনার ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন।[৯] স্বভাবতই তিনশ বছর আগে চাষীর জীবনে জাত-পাতের স্থান নিশ্চয়ই আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হাজারো রকম রক্তের সম্পর্ক ও আচার-অনুষ্ঠানের বন্ধনের মাধ্যমে এই জাতই দূরতম গ্রামের সমজাতীয় লোকদের সঙ্গে চাষীদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিত। তারা লড়াই-এ নামলে সে সরে দাঁড়াতে পারত না। মূলত একটি কৃষক বিদ্রোহ কীভাবে জাতের পথ ধরে এগোতে পারে, তার সবচেয়ে স্পষ্ট দৃষ্টান্ত বোধহয় জাঠ বিদ্রোহ। মেওয়াতী, ওয়াত্তু, দোগার ইত্যাদি বিদ্রোহী জাতগুলোর 'বেআইনী' কার্যকলাপের মধ্যেও ঐ একই প্রভাব দেখা যায়।

৭. মান্তি, ১৭২-৩।

৮. মানুচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫১। "যেসব চাষী অথবা খালিসা বা জাগীরদার-এর রাজস্ব আদায়কারী বিদ্রোহের ভাব দেখায়" তাদের বিরুদ্ধে আবুল ফজল ব্যবস্থা নিতে বলেছেন ফৌজদারদের। কিন্তু যোদ্ধা বা তাদের পরিবারের পরিণতি কী হবে সে বিষয়ে কিছু বলেননি। তিনি শুধু বলেছেন যে গ্রামে যা পাওয়া যাবে তার সবকিছুই লুঠের মাল বলে ধরতে হবে, ও তার একের-পাঁচ ভাগ খালিসার জন্য বরাদ্দ থাকবে। গ্রামটির রাজস্ব বকেয়া থাকলে লুঠের মাল থেকে প্রথমেই তা নিয়ে নিতে হবে ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৩)। প্রথাগতভাবে "বিদ্রোহী দলগুলোকে" যে-শাস্তি দেওয়া হতো, জুন, ১৬৭১-এ এক আদেশ জারি করে আওরঙ্গজেব স্পষ্টতই তার নির্মমতা কমাতে চেয়েছিলেন। যদি শত্রু তখনও না পালিয়ে থাকে তবে ধৃত ও আহত সব বিদ্রোহীকেই খতম করা হবে। কিন্তু বিদ্রোহী সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে বন্দীদের প্রাণে মারা হবে না। আর তারা যদি 'অনুতপ্ত' হয় তাহলে তাদের লুঠের মাল ফেরৎ দেওয়া হবে ('মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮০)। এই নির্দেশ কখনও মানা হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে অবশ্যই সন্দেহ করা যায়।

৯. ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ, 'দা ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন ইন কেরালা', বোম্বাই, ১৯৫২, পৃ. ১০২-৩।

কিন্তু আমাদের আলোচ্য পর্বে বহু চাষী সম্প্রদায়গত একটি নতুন ভিত খুঁজে পাচ্ছিল। সেটা জাতভেদের পরিপূরক নয়, বরং মূলত তার বিরোধী। ১৫ শতকের শেষদিকে যে বিরাট ধর্ম আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তারই অংশ হিসেবে গড়ে-ওঠা গোষ্ঠীগুলোই এই নতুন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করছিল। এইসব গোষ্ঠীর বেশির ভাগেরই প্রধান ধ্যানধারণা ছিল একই ধরনের: আপসহীন একেশ্বরবাদ, আচার-অনুষ্ঠানমূলক পূজা-অর্চনা বর্জন এবং সমস্ত রকম জাতের বাধা ও সম্প্রদায়-ভেদ অস্বীকার। এইসব ধ্যানধারণার সারকথার মতো তাদের প্রচারের কায়দাও ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সমস্ত প্রচারই চলত জনগণকে উদ্দেশ্য করে: আঞ্চলিক উপভাষাই তার মাধ্যম আর ধর্মগুরু, প্রচারক ও শিষ্যদের বেশির ভাগই ছিলেন নীচুশ্রেণীর লোক। বৈরাগীদের মহান্ গুরু কবীর (আনু. ১৫০০) ছিলেন জোলা,[১০] দাদূপন্থীদের শিক্ষক দাদূ (আকবরের সমসাময়িক) গ্রামে ধুনুরির কাজ করতেন;[১১] নিরঞ্জীদের গুরু হরিদাস (মৃত্যু: ১৬৪৫) ছিলেন জাঠ ক্রীতদাস[১২] এবং গুরু নানক ছিলেন শস্য-ব্যবসায়ী।[১৩] এই গুরুদের কেউই (কবীর ও নানক তো একেবারেই নয়) বিনয় ও বৈরাগ্য ছাড়া আর কোন আচরণবিধি প্রচার করেননি। জঙ্গীভাব বা লড়াইএর কোন কথাই তাঁরা কখনও প্রচার করেননি। বেশির ভাগ ভক্তসম্প্রদায় কোনদিনই হয়তো কোন সামাজিক আন্দোলনের রূপও নেয়নি। কিন্তু, যখন কিছু বৈপ্লবিক চিন্তাধারা, যেমন জাতের প্রতি ঘৃণা এবং নতুন ও গ্রহণযোগ্য কোন ধর্মবিশ্বাসের অধীনে একতার বোধ জনগণের হৃদয়-মনে শিকড় গেড়ে ফেলে, তখন ঐ গোষ্ঠীগুলো আর তাদের পুরনো মরমিয়া খোলসের মধ্যে আটকে থাকতে পারেনি। ঘটনাচক্রে মুঘলদের বিরুদ্ধে দুটি সবচেয়ে শক্তিশালী বিদ্রোহ—সৎনামী ও শিখ বিদ্রোহের প্রেরণা যুগিয়েছিল ঐ সব গোষ্ঠীই।

কিন্তু জাত বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বন্ধন যেমন একদিকে কৃষক অভ্যুত্থান ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে তেমনই এইসব অভ্যুত্থানের শ্রেণীগত প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট করে তোলার দিকেও নিয়ে যায়। তাহলেও, প্রকৃত রূপান্তর এসেছিল জমিনদার শ্রেণীর কিছু অংশের হস্তক্ষেপে। মুঘল শাসকশ্রেণীর বিরোধিতা করার ব্যাপারে তাদের নিজস্ব স্বার্থ ছিল। দুটি নিপীড়ক শ্রেণীর মধ্যে লড়াইএর সঙ্গে নিপীড়িতের অভ্যুত্থান মিশে যাওয়ার ঘটনাটি, মনে হয়, খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, হয় কৃষক-বিদ্রোহগুলো গড়ে ওঠার কোন এক পর্যায়ে জমিনদারদের হাতে নেতৃত্ব চলে এসেছিল (বা তাদের নিজেদের নেতারাই জমিনদারে পরিণত হয়েছিল) নয়তো, একেবারে প্রথম থেকেই, চাষীদের মরিয়া ভাব বিদ্রোহী জমিনদারদের যোগান দিয়েছিল অনেক রংরুট।

১০. 'দবিস্তান-এ মজাহিব', পৃ. ২৪৬।

১১. ঐ, ২৬৭-৮।

১২. ঐ, ২৬৭।

১৩. ঐ, ২৭৪।

৪. জমিনদারদের রাজনৈতিক ভূমিকা

পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে 'জমিনদার' শব্দটির অর্থ ছিল ব্যাপক। বড় কোন রাজ্যের শাসনকর্তা এবং গ্রামের কিছু অংশের ওপর যে-লোকের কয়েকটি মাত্র অধিকার আছে—দুজনের বেলাতেই ঐ একই শব্দ ব্যবহার করা যেত। এসব সত্ত্বেও, মোটামুটিভাবে কয়েকটি সাধারণ লক্ষণসম্পন্ন ক্ষমতাবানদের একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীকে জমিনদার বললে ঠিক বলা হবে। প্রথমত, তাদের অধিকারগুলো কখনোই বাদশাহী অনুদান ছিল না—যদিও এর কিছু ব্যতিক্রমও ছিল। দ্বিতীয়ত, নিজেদের অধীনে সশস্ত্র অনুচর রাখাটা ছিল সাধারণত তাদের স্বত্বের প্রয়োজনীয় অংশ, আর তাদের বেশির ভাগই হতো কোন-না-কোন জাতগোষ্ঠীর প্রধান। ভূমিরাজস্ব বা উদ্বৃত্ত উৎপাদনে জমিনদারের ভাগের বাঁটোয়ারাই ছিল বাদশাহী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের সংঘাতের প্রধান কারণ। বাদশাহী অঞ্চলে জমিনদারদের রাষ্ট্র বা তার বরাতীদের তরফে নেহাৎই কর-সংগ্রাহক বলেই গণ্য করা হতো। কাজের মূল্য হিসেবে রাজস্বের একটা ভাগ তাকে নিতে দেওয়া হতো। চাষীদের কাছ থেকে জুলুম করে বাড়তি কিছু আদায় করা যেত না—তার কারণ শুধু এই নয় যে কাজটা আইনবিরুদ্ধ। আসলে, রাজস্ব দাবি এত চড়া হারে ধরা হতো যে চাষীদের থেকে তা আদায় করে নেওয়ার পর আর কারও জন্য কিছু পড়ে থাকত না। এই ধরনের পরিস্থিতিতে নিজের স্বার্থের ক্ষতি না করে রাজস্ব আদায় করা ও কর্তৃপক্ষের কাছে তা দাখিল করা জমিনদারদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ত। স্বশাসিত অঞ্চলের প্রধানরাও এই একই সমস্যায় পড়ত। তাদের রাজস্ব বা নজরানা অথবা দুই-ই দিতে হতো। এছাড়াও, সর্বদাই তাদের রাজ্য সাম্রাজ্যের গর্ভে চলে যাওয়ার ভয় ছিল।[১] কিন্তু, জমিনদার, সে শুধু কর-সংগ্রাহকই হোক বা প্রধানই হোক, সাধারণত সশস্ত্র বাহিনী রাখতে পারত। প্রশাসন তাই ইচ্ছামতো সহজে তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পারত না। তারা তাই প্রশাসনের গায়ে সর্বদাই কাঁটার মতো বিঁধে থাকত।

এই কারণে, প্রায়শই সরকারী ঐতিহাসিকদের বিবৃতিতে জমিনদার শ্রেণীর প্রতিই একটা শত্রুতার মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। আবুল ফজল বলেন, "হিন্দুস্তানের অধিকাংশ জমিনদারদের ধারাই এই যে তারা স্থিরমনস্ক নয়, সর্বদিকেই তাদের নজর। তাদের চোখে যাকেই বেশি শক্তিশালী অথবা গোলমাল পাকাতে ওস্তাদ বলে মনে হয়, তার সঙ্গেই তারা যোগ দেয়।"[২] অন্যত্র তিনি মন্তব্য করেছেন যে রাজা তারামল তাঁর "জ্ঞান ও সৌভাগ্যবশে জমিনদারদের দল ছেড়ে দিয়ে দরবারে একজন গণ্যমান্য হতে চেয়েছিলেন," যেন এই দুটি পদে একই সঙ্গে থাকা অসঙ্গত হতো।[৩] আওরঙ্গজেবের দরবারী ঐতিহাসিক 'জমিনদারানা' শব্দটিকে সুবিধাবাদ বা অবিশ্বস্ত আচরণ অর্থে প্রয়োগ করে আবুল ফজলকেই অনুসরণ করেছেন।[৪]

১. যেমন, আওরঙ্গজেবের তখ্‌তে বসার চার বছরের মধ্যেই তিনটি বড় রাজ্য, কুচবিহার (১৬৬১), পালামৌ (১৬৬১) এবং নবনগর (১৬৬৩) দখল করা হয়েছিল।

২. 'আকবরনামা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩।

৩. ঐ, ১৫৩।

৪. বলা হয় যে, বিকানীরের রাজা করণ ভূর্তিয়া "বদ্‌.মহেলব ও জমিদারানার কথা ভেবে"

সরকারী দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা দলিলপত্রে ধরেই নেওয়া হয়েছে যে আইন-শৃঙ্খলার প্রধান বিপদ আসে জমিনদারদের থেকেই। তারা রাজস্ব জমা দিতে অস্বীকার করে, ফলে ফৌজদার বা জাগীরদার দিয়ে বলপ্রয়োগ করিয়ে তাদের দাবিয়ে রাখতে হয়, নাহলে একেবারে ধ্বংস করে ফেলতে হয়।[৫] কোন জমিনদার কেল্লা তৈরি করলেই কর্তৃপক্ষের মনে সঙ্গে সঙ্গেই সন্দেহ হতো এবং তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে সেটাই ছিল যথেষ্ট।[৬] বৈসওয়ারার ফৌজদার (?—১৭০২) রাদ-অন্দাজ খানের চিঠিপত্র এ বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করে। দেখা যায় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় এলাকার প্রায় কাছাকাছি সমভূমির একটি অঞ্চলে এই কর্মচারীটি সব সময় জমিনদারদের বিরুদ্ধে অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বা সৈন্য পাঠাচ্ছেন। এই সব জমিনদারের প্রধান অপরাধ ছিল রাজস্ব দিতে অস্বীকার করা, যদিও প্রায়শই তার সঙ্গে ডাকাতি বা লুঠপাটের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগটিও অনিবার্যভাবে জুড়ে দেওয়া হয়।[৭] দরবার থেকে ফরমান জারি করে জমিনদার নিয়োগের প্রথাটি আওরঙ্গজেবের আমল থেকেই বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। পুরনো জমিনদারদের ক্ষমতা যাতে পাল্লায় বেশি ভারি না হয়ে যায়—হয়তো সেই উদ্দেশ্যেই নতুন নতুন আঞ্চলিক স্বার্থ তৈরি করা হচ্ছিল।[৮]

মনে হয়, আমরা নিজেরাই এই সব সাক্ষ্য থেকে সামান্যীকরণ করে সিদ্ধান্ত করতে পারি যে বাদশাহী প্রশাসনের সঙ্গে জমিনদারদের সংগ্রাম (প্রায়ই যা সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ নিত) আমাদের আলোচ্য পর্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ ছাড়াও, আমরা এই ব্যাপারে ১৭০৩ অথবা তার কাছাকাছি সময়ে মানুচির লেখা থেকে সরাসরি একটি বিবৃতি পাই। তিনি লিখেছেন, "সাধারণত রাজপ্রতিনিধি ও প্রদেশকর্তাদের সঙ্গে হিন্দু রাজা ও জমিনদারদের বিবাদ লেগেই আছে। তাদের কয়েকজনের সঙ্গে বিবাদের কারণ তাদের জমি দখল করে নেওয়ার ইচ্ছা; এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে, যে-পরিমাণ রাজস্ব দাখিল করার রীতি চলে আসছে তার থেকে বেশি দেওয়ার জন্য জবরদস্তি।"[৯] অন্যত্রও তিনি বলেছেন যে "মুঘল রাজত্বে প্রায়শই রাজা ও জমিনদারদের কোন-না-কোন বিদ্রোহ লেগেই থাকে।"[১০]

আওরঙ্গজেবের দরবারের হাজির হননি ('আলমগীরনামা', পৃ. ৫৭১), আবুল ফজলের লেখায় এই শব্দটি ব্যবহারের জন্য 'আকবরনামা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩ দ্রষ্টব্য।

৫. 'হিদায়াত-আল কওয়াইদ', পৃ. ৭ ক-খ (ফৌজদারের কাজকর্ম); 'বয়াজ-এ ইজাদ বখ্‌শ্‌ "রসা"' (?), I.O. 4014, পৃ. ২ ক-খ (আল্লার উদ্দেশে খানিক রসিকতা করে লেখা এক আর্জিতে এক জাগীরদারের অত্যাচারের কথা)।

৬. 'আহ্‌কম-এ আলমগীরী', পৃ. ২০৫ ক-খ; 'ইন্‌শা-এ রোশন কলম', পৃ. ৬ খ। দুর্গকে হিন্দীতে বলা হতো 'গঢ়ী'। (এই শব্দের ব্যবহারের জন্য 'দুর-আল-উলুম', পৃ. ৭৩ খ তুলনীয়)।

৭. 'ইন্‌শা-এ রোশন কলম', পৃ. ২ ক-৪ ক, ৬ ক-খ।

৮. পঞ্চম অধ্যায়, তৃতীয় অংশ দ্রষ্টব্য।

৯. মানুচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩১-২।

১০. ঐ, ৪৬২।

সম্ভবত, অন্য যে কোন কারণের চেয়ে, বাদশাহী ক্ষমতার সঙ্গে এই সব অসম প্রতিযোগিতায় জমিনদারদের যে দুরবস্থা হতো, তার দরুনই চাষীদের প্রতি তারা একটা আপসমূলক মনোভাব নিতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ প্রতিরক্ষা বা ফেরারী হওয়া—যে কোন ক্ষেত্রেই চাষীদের সমর্থন অপরিহার্য। এ ছাড়াও, স্থানীয় লোক হিসেবে তারা চাষীদের অবস্থা ও প্রথাগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিল। ফলে, খালিসা-র বা বরাতীর কর্মচারীদের চেয়ে জমিনদাররা তাদের অধীন চাষীদের সঙ্গে সাধারণভাবে অনেক কম কড়াকড়ির বোঝাপড়ায় আসতে পারত। এই সব কর্মচারীরা স্থানীয় রীতিনীতি জানত না, তাৎক্ষণিক রাজস্ব-নির্ধারণ বৃদ্ধিই ছিল তাদের একমাত্র স্বার্থ।

অতএব, "রাজার এলাকায়" চাষীদের ওপর "অত্যাচার হতো কম ও তাদের অনেক বেশি মাত্রায় সুবিধা দেওয়া হতো"[১১]—বার্নিয়ে ছাড়াও আরও অনেকে এ কথা লিখে গেছেন। এমনকি, আওরঙ্গজেবের সরকারী ঐতিহাসিকও পরিষ্কারভাবে বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তাঁর ভাষায়, "হিন্দুস্তান অঞ্চলের জমিনদাররা তাদের জমিনদারির মহালে গিয়ে রাজস্ব আদায়ের সময় ভদ্র ব্যবহার করে এবং বাদশাহী এলাকায় যেসব নিয়মকানুন মানা হয়, সেগুলো প্রয়োগ করে না। এই ধরনের ব্যবহারের পিছনে জমিনদারদের মতলব ছিল চাষীদের হৃদয় জয় করা ও তাদের খুশি রাখা, যাতে তারা জমিনদারদের অ[illegible] হয় বা রাজস্ব দেওয়া বন্ধ না করে।"[১২]

সুতরাং সরাসরি বাদশাহী প্রশাসনের অধীন অঞ্চলগুলো থেকে যেসব চাষী পালাত, জমিনদাররা প্রায়ই তাদের নিজেদের জমিতে টেনে নিত। পেলসার্ট ও বার্নিয়ে সাধারণভাবে ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছেন,[১৩] কিন্তু ১৭১৪-য় লেখা একটি পুস্তিকায় এটি আরও সুস্পষ্ট। মনসবদাররা—বোধহয় জাগীরের অধিকারী—চাষীদের ওপর (তাদের জবরদস্তি আদায়ের) "বোঝা চাপিয়ে দেয়। চাষীরাও অসহায়। যখন তারা বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে, তখন রাইয়তী এলাকা ছেড়ে পালিয়ে বিদ্রোহী জমিনদারদের এলাকার দিকে যেতে শুরু করে ও সেখানেই বসত গাড়ে। এইভাবে বিদ্রোহী জমিনদারদের এলাকায় ভালো রকম জনবসতি হয়ে যায় আর বিদ্রোহীরা দিন দিন বাড়তে থাকে"।[১৪]

১১. বার্নিয়ে ২০৫।

১২. 'আলমগীরনামা', পৃ. ৭৮১। আরও তুলনীয় 'ফথিয়া-এ ইব্রিয়া', পৃ. ৪৭ খ-৪৮ ক।

১৩. পেলসার্ট ৪৭; বার্নিয়ে ২০৫।

১৪. 'হিদায়াত-আল কওয়াইদ'. আলীগড় পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৫৬ ক-খ। চাষীদের ওপর মনসবদারদের ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের কারণ হিসেবে লেখক বলেছেন যে ঐ মনসবদারদের দখলে বড় বড় মনসব ছিল না. তাই বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার মতো যথেষ্ট বড় সৈন্যবাহিনীও রাখতে পারত না। ফলে, তাদের টাকার দরকার পড়ত; ক্ষমতাবান জমিনদারদের থেকে কিছু নিতে পারত না বলে চাষীদের ওপরেই তারা প্রচণ্ড চাপ দিত।

এই অংশে 'রাইয়তী' শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে: সরাসরি বাদশাহী প্রশাসনের আওতায় চাষীদের অধিকৃত গ্রামাঞ্চল বা, শুধুমাত্র, রাজস্ব-প্রদায়ী গ্রামাঞ্চল।

'মজহার-এ শাহজাহানী'-তে (পৃ. ২০-২১) একই কথা বলা হয়েছে। যখন আরবাবদের

১৭ শতকের কয়েকটি নির্দিষ্ট ঘটনা থেকে এই সাধারণ বিবৃতিগুলোর দৃষ্টান্ত মেলে। যেমন, গুজরাটের সুবাদার আলম খানের আমলে (১৬৩২-৪২) চাষীদের ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার হয়েছিল। "তাদের বেশির ভাগই পালিয়ে দূর দূর জায়গার জমিনদারদের আশ্রয় নিয়েছিল।"[১৫] এই সব দেখে শুনে আজম খান নবনগর অভিযান করলেন। উদ্দেশ্য ছিল : যেসব চাষী সেখানে পালিয়েছে, নবনগরের জমিনদার যেন তাদের তাড়িয়ে দেয়, যাতে তারা তাদের পুরনো জায়গায় ফিরে আসতে পারে।[১৬] একইভাবে মালবে কানওয়ার-এর জমিনদার (অবশ্য, ঠিকমত বলতে গেলে, তার অভিভাবক)-এর বিরুদ্ধে একটি অভিযান হয়েছিল। তার কারণ শুধু এই নয় যে সে "ঠিকভাবে রাজস্ব দিচ্ছে না।" আরও কারণ এই যে, "সুবাদারের জাগীরের কিছু 'মহাল'-এর চাষীরা রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে কানওয়ার অঞ্চলে পালিয়ে গিয়েছিল এবং ঐ সব কাফের তাতে মদত দিচ্ছিল।"[১৭] আওরঙ্গজেবের আমলে টালকোকান-এর ফৌজদারের একটি অভিযোগ পাওয়া যায়। তার সার কথা এই যে : প্রথমত, বহু চাষী জমিনদারদের এলাকায় পালিয়ে গেছে ; এবং দ্বিতীয়ত, সে যখন তাদের জোর করে ফিরিয়ে এনে তাদের দিয়েই ৬০০ গ্রামের পত্তন করিয়েছে—তখন সালসেট-এর পর্তুগীজরা আবার তাদের লোভ দেখিয়ে নিয়ে গেছে।[১৮]

এইভাবে মুঘল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চাষী ও জমিনদাররা প্রায়শই একজোট হচ্ছিল। কুচবিহারের ঘটনাটি দৃষ্টান্তস্থানীয় না হলেও তাৎপর্যপূর্ণ। ১৬৬১ সালে যখন এই রাজ্যটি দখল করা হয় তখন "বাদশাহী এলাকাগুলোতে যেসব নিয়মকানুন মানা হতো মুঘল কর্মচারীরা সেই অনুযায়ী এই রাজ্যে রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহের পদ্ধতি চালু করে।" এর ফলে চাষীদের মনে বিজেতাদের বিরুদ্ধে একটি বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়। বলা হয়েছে যে সাধারণভাবে অন্যান্য জমিনদারদের মতো পদচ্যুত রাজা ভীমনারায়ণও চাষীদের সঙ্গে অনেক বেশি সদয় ব্যবহার করতেন। অতএব এখানে এক কৃষক-অভ্যুত্থান ঘটে এবং মুঘল সৈন্য ও কর্মচারীদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়।[১৯] একইভাবে, যেখানেই মুঘল কর্তৃপক্ষ জমিনদারদের এলাকা থেকে ফেরারী চাষীদের জোর করে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করত, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার ফলে চাষীরা এমন সব এলাকায় পালিয়ে যেতে লাগল, যেখানকার জমিনদাররা মুঘল কর্তৃপক্ষকে অমান্য

(সিন্ধু প্রদেশে 'চৌধুরী'র সমান পদের কর্মচারী, এদের বেশির ভাগই ছিল জমিনদার) ওপর চাপানো রাজস্ব দাবি প্রচণ্ড গুরুভার হয় তখন তারা বিদ্রোহ করে। এসব ক্ষেত্রে চাষীরা সর্বদাই তাদের অনুসরণ করত এবং জমি থেকে ফেরার হয়ে যেত। কারণ, জমিতে থাকলেই কর্তৃপক্ষের চাপানো চড়া রাজস্ব-দাবি তাদেরই মেটাতে হবে, আবার আরবাবরা ফিরে এসে তাদের খুন করবে। বইটিতে আরও বলা হয়েছে চাষীরা যে আরবাবদের অনুসরণ করত তার কারণ আরবাব ও চাষীরা ছিল একই জায়গার লোক।

১৫. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৬।

১৬. লাহোরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩২ ; 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৪।

১৭. লাহোরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭০।

১৮. 'কারনামা', পৃ. ২৪৩ খ-২৪৪ক।

১৯. 'আলমগীরনামা', পৃ. ৭৮১-২ ; 'ফথিয়া-এ ইব্রিয়া', পৃ. ৪৭ খ-৪৮ ক।

করতে পারে। অর্থাৎ, তারা যেত, পেলসার্ট-এর ভাষায়, "বিদ্রোহী রাজাদের" কাছে।[২০]

এই সব চাষী শুধু যে চাষবাসের কাজে লেগে জমিনদারদের সম্পদ বৃদ্ধিই করত তা নয়, জমিনদারদের সশস্ত্র বাহিনীতেও তারা রংরুট যোগান দিতে পারত। অবশ্য মুঘল বাহিনীর পেশাদার ঘোড়সওয়ার সেনার বিরুদ্ধে এরকম আনাড়ি সৈন্যদল বোধহয় এঁটে উঠতে পারত না। তবুও আঞ্চলিক প্রকৃতি ও যোদ্ধার সংখ্যার তো একটা গুরুত্ব ছিল। মারাঠারা তা চমকপ্রদভাবে দেখিয়ে দেয়। আওরঙ্গজেবের আমলে এক নতুন উপসর্গ দেখা গেল: মুঘলদের বিরুদ্ধে জমিনদারদের লড়াই আর শুধুমাত্র আত্মরক্ষা-মূলক রইল না। উপোসী ও ভিটেছাড়া চাষীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে, তারা নিজেরাই হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। ফলে, জমিনদারদের পক্ষেও এইসব চাষীদের বড় দলে, এমন কি নিয়মিত সৈন্যবাহিনীতে সংগঠিত করা সম্ভব হচ্ছিল। নিজেদের জমিনদারী বা আধিপত্যের এলাকা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে লুঠপাট ও লড়াই-এর কাজেও তাদের নিয়োগ করা যাচ্ছিল।

মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে বড় বড় বিদ্রোহে চাষীদের ভূমিকা কতখানি ছিল, তা আমরা পরের অংশে কিছুটা বিস্তারিতভাবে সমীক্ষা করব। দেখা যাবে যে, চাষীদের সব অভ্যুত্থানেই জমিনদারদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি; জমিনদারদের সব বিদ্রোহী কাজকর্মই যে চাষীদের সমর্থন পেয়েছিল এমন ভাবারও কোন কারণ নেই। তবুও এ কথা থেকেই যায় যে, সবচেয়ে সফল বিদ্রোহগুলোতে (যেমন, মারাঠা ও জাঠ বিদ্রোহ) যারা নেতৃত্ব দিয়েছিল, তারা হয় জমিনদার, নয় জমিনদার হওয়ার জন্য লালায়িত। এই সব বিদ্রোহের ঐতিহাসিক ফলাফল বিবেচনা করার সময় এই ঘটনাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে।

৫. মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহগুলোর কৃষিসংক্রান্ত বিভিন্ন দিক

যেসব বিদ্রোহ মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়েছিল সেগুলো বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই অংশে যে সমীক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাতে যে সবকিছুই আলোচিত হচ্ছে বা বিদ্রোহগুলোর সব কটি দিক ধরা পড়েছে, এমন দাবি করা চলে না। যেসব তত্ত্ব অনুযায়ী 'হিন্দু প্রতিক্রিয়া' নয় তো 'জাতীয় পুনর্জাগরণ'ই ছিল আওরঙ্গজেব-বিরোধিতার মূল অনুপ্রেরণা—তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি হাজির করাও এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু জোর দিয়ে বলা দরকার যে এই সব তত্ত্বের প্রবক্তারা সমসাময়িক নজিরের চেয়ে বর্তমান কালের মনোভাবের ওপর বেশি নির্ভর করে থাকেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে, নিজেদের লেখায় তাঁদের বক্তব্য যেভাবে হাজির করা হয়েছে, পাঠকই তার থেকে তাঁদের বক্তব্য বিচার করতে পারবেন। এখানে আমাদের প্রধান বিচার্য বিষয়: ১৭ শতক ও ১৮ শতকের গোড়ার দিকের প্রামাণ্য লেখকরা এ বিষয়ে কী বলতে চেয়েছেন। সেখানে দেখা যাবে যে, অভ্যুত্থানের পেছনের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কারণগুলোর ওপরেই তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি। ধর্মীয় প্রতিক্রিয়া বা জাতীয় সচেতনতার ব্যাপারে তাঁরা বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন না।

২০. পেলসার্ট, পৃ. ৪৭।

১. আগ্রা অঞ্চলের বিদ্রোহ ও জাঠকুল :

আগ্রা প্রদেশ প্রসঙ্গে আবুল ফজল মন্তব্য করেছেন, "এখানকার জলহাওয়ার বৈশিষ্ট্যের দরুন এই অঞ্চলের কৃষকসাধারণ ('উম্মু-এ রিআয়া') তাদের বিদ্রোহী মনোভাব, বীরত্ব ও সাহসের জন্য সারা ভারতে কুখ্যাত।"[১] যমুনার দুতীরেই বিদ্রোহী চাষীদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সামরিক অভিযান চলত বলে জানা যায়। আকবর নিজেই একবার একটি গ্রামের বিরুদ্ধে আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[২] আগ্রার কাছাকাছি একটি পরগনার এক রাজার কথা পাওয়া যায় যিনি ডাকাতি করতেন ও আক্রান্ত হলে গাঁওয়ার বা চাষীদের সাহায্যে আত্মরক্ষা করতেন।[৩] পরবর্তী আমলে দরবারে খবর যায় যে "গাঁওয়ার ও চাষীরা" যমুনার পূর্বতীরে মথুরার কাছে "রাহাজানি বন্ধ করেনি এবং ঘন জঙ্গল ও কেল্লার আশ্রয়ে বিদ্রোহী হয়েই রয়েছে। কাউকে তারা ভয় করে না, জাগীরদারদের কাছে রাজস্বও দেয় না।" এদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান করা হয়েছিল। ফলে "তাদের অনেকে মারা যায়, বৌ ও বাচ্চাদের বন্দী করা হয় এবং বিজয়ী সৈন্যরা বিস্তর লুঠপাট করে।"[৪] এ ঘটনা ঘটে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ১৮-তম বছরে। তবুও, তার চার বছর পরে (১৬৩৪), যমুনার তীরের যে "দুষ্কৃতিকারীরা" আগ্রা-দিল্লীর পথে ডাকাতি করত তাদের বিরুদ্ধে আবার অনেক বড় মাত্রায় সংগঠিত অভিযান করতে হয়। "দশ হাজার মনুষ্যরূপী পশু" জবাই করা হয়েছিল এবং "অসংখ্য" নারী, শিশু ও গবাদি পশু কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।[৫] মনে হয়, শাহ্‌জাহানের রাজত্বের ১৮-তম বছরেও মথুরার কাছে "বিদ্রোহীদের" আয়ত্তে আনা যায়নি।[৬] ১৬৫৩ সালে সাদুল্লাহ্ খানের মৃত্যুর পর "আগ্রার কাছে তাঁর [শাসনাধীন] বেশ কিছু শহরের [অর্থাৎ, তাঁর জাগীরের গ্রামগুলোতে] গাঁওয়াররা সশস্ত্র বিদ্রোহ করে। কিন্তু … তাঁর ফৌজদার আবদুল নবী-র আকস্মিক আক্রমণে তাদের শহরগুলো লুঠ হয়। যারা পালিয়ে বাঁচতে পারেনি তাদের খতম বা কয়েদ করা হয়"।[৭]

আওরঙ্গজেবের আমলে যে অঞ্চলটি জাঠ বিদ্রোহের জন্মভূমি হয়ে উঠেছিল তার অতীত ইতিহাস ছিল এইরকম। এও দেখা যাবে যে, আগের বিদ্রোহগুলোর বিবরণে বিদ্রোহী চাষীদের সঙ্গে জাঠদের এক করা হয়নি। তাদের জন্য প্রচলিত শব্দটি ছিল

১. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩১।

২. ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩। গ্রামটি ছিল সাকেতা পরগনায় (কনৌজ 'সরকার')। আক্রমণ করা হয়েছিল রাজত্বের সপ্তম বছরে। আরও তুলনীয় মানুচি, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩২-৪।

৩. বদাউনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫১-২। বোধহয় জলেসর-এর সঙ্গে ভুল করে পরগনাটির নাম দেওয়া আছে জলেসা।

৪. 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ৩৭৫-৬।

৫. কাজবিনী, Add. 20734, পৃ. ৬৭৯-৮০ ; Or. 173, পৃ. ২৩৭ খ, ২৩৯ ; লাহোরী, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ. ৭১-২, ৭৬। লাহোরী আরও বলেছেন যে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ১২,০০০ সৈন্য নিয়োগ করা হয়েছিল, যমুনার পূর্বকূলে ৭০০০ এবং পশ্চিমকূলে ৫০০০।

৬. লাহোরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৫।

৭. 'ফ্যাক্টরিস ১৬৫৫-৬০', পৃ. ৬৫।

'গাঁওয়ার' বা গ্রামবাসী এবং অন্তত দুয়েকটি ক্ষেত্রে তাদের নেতৃত্ব সম্ভবত ছিল রাজপুত জমিনদারদের হাতে।[৮] মানুচি এই সব বিদ্রোহ নিয়ে কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তিনিও আওরঙ্গজেবের আমলের জাঠ বিদ্রোহীদের চাষী বলেই জানতেন, এবং ধরেই নিয়েছিলেন আকবরের উৎপীড়নের ফলে যারা বিদ্রোহ করেছিল এই 'চাষী'রা সেই একই দাবির শরিক।[৯] জাঠরা পাক্কা "চাষীর জাত"[১০]; দিল্লী ও আগ্রার মাঝের গ্রামগুলোতে তাদের বাস।[১১] 'আইন'-এ দোআব-এর একাধিক 'মহাল'-এ ও যমুনার দু-পারের সমভূমিতে তাদের জমিনদার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আগের বহু সংঘর্ষে তারা যোগ দিয়েছিল।

সঠিকভাবে বলতে গেলে, মথুরার কাছে তালপতের জমিনদার গোকুলা জাঠ যখন "জাঠ ও অন্যান্য গ্রামবাসীদের একটি বিরাট বাহিনী জড়ো করে বিদ্রোহ গড়ে তোলেন"[১২] তখন থেকেই জাঠ বিদ্রোহের সূচনা। ১৬৬৯ সালে তিনি নিহত হন;[১৩] নেতৃত্ব আসে রাজারাম জাঠের হাতে। তারপর নেতা হন তাঁর ভাইপো চৌরামন জাঠ, তিনি নাকি এগারটি গ্রামের এক জমিনদারের ছেলে।[১৪] বিরাট অঞ্চল জুড়ে চাষীরা রাজস্ব দিতে অস্বীকার করে ও হাতিয়ার তুলে নেয়। মথুরার কাছে এক জমিনদারি মঞ্জুরিপত্র থেকে জানা যায় যে ঐ জমিনদারির অন্তর্গত পঁচিশটি গ্রামের সব কটিতেই 'বেআদব বিদ্রোহী'দের আস্তানা। জমিনদারীর প্রাপকের কাজই ছিল ঐ বিদ্রোহীদের তাড়িয়ে নতুন 'রাজস্ব-প্রদায়ী' চাষীদের বসত করানো।[১৫] আগ্রার কাছাকাছি এক

৮. যে-গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে আকবর নিজে একটি অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, মানুচি, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩২-এ তাই তাদের রাজপুত বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মানুচি খুব সম্ভবত আঞ্চলিক কিংবদন্তীর ওপর নির্ভর করেছিলেন। এদের রাজপুত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনাও আছে, কারণ, 'আইন', ১ম খণ্ড, ৪৪৬-এ চৌহানদের (সাকেতা) পরগনার জমিনদার বলে দেখানো হয়েছে। একইভাবে, জলেসরে—যেখানে এক রাজা বিদ্রোহ গড়ে তুলেছিলেন—গুহিলোট, সুরয (বংশী) এবং বাঙ্করাদেরও দেখানো হয়েছে জমিনদার হিসেবে (ঐ, ৪৪৩)।

৯. মানুচি, ১ম খণ্ড, ১৩৪: তিনি বলেন যে ১৬৯১ সালে (হবে ১৬৮৮) 'গ্রামবাসীরা' আকবরের সমাধি অপবিত্র করে প্রতিশোধ নিয়েছিল।

১০. 'তস্‌রিহ্‌-আল আকোয়াম', পৃ. ১৫৫ ক; ক্রুক, 'দা ট্রাইবস অ্যাণ্ড কাস্ট্‌স্‌ অফ নর্থ-ওয়েস্টার্ন প্রভিন্সেস অ্যাণ্ড আওধ', কলকাতা, ১৮৯৬, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০।

১১. "দিল্লী ও আকবরাবাদ-এর (আগ্রা) মধ্যবর্তী গ্রামগুলোর চাষীরা ছিল জাতে জাঠ" (শাহ্‌ ওয়ালীউল্লাহ্‌, 'সিয়াসি মক্‌তুবৎ', পৃ. ৪৮)।

১২. ঈশ্বরদাস, পৃ ৫৩ ক।

১৩. 'মআসির-এ আলমগীরী', পৃ. ৯৩-৯৪।

১৪. সৈঈদ গুলাম আলী খান, 'ইমাদুস সাদাত', নবল কিশোর সম্পা., ১৮৯৭, পৃ. ৫৪-৫৫।

১৫. 'নিগরনামা-এ মুন্‌শী', পৃ. ১৯৯ ক-২০০ ক, Bodl. পৃ. ১৫৭ খ-১৫৮ ক, Ed. পৃ. ১৫২। মথুরার ফৌজদার হাসান আলি খান গোকুলকে পরাজিত ও বন্দী করেছিলেন। এই অনুদান তাঁর সুপারিশেই দেওয়া হয়।

জেলার ফৌজদার ছিলেন মুলতাফৎ খান। সেই জেলার অন্তর্গত এক গ্রামের চাষীরা রাজস্ব দিতে রাজি হয়নি। ১৬৮১ সালে ঐ গ্রামের ওপর আক্রমণ চালাতে গিয়ে তিনি নিহত হন।[১৬] ঐ একই দশকে দেখা যায়, এক জাগীরদার অভিযোগ করছে যে "বিদ্রোহের দরুন" আগ্রার কাছে তার জাগীর থেকে তিন বছর ধরে তার কোন আয়ই হয়নি।[১৭]

মনে হয়, জাঠ বিদ্রোহের নেতৃত্ব অনেকটাই ছিল জমিনদারদের হাতে।[১৮] অন্যদের জমিনদারি দখল করাই ছিল এই বিদ্রোহের নেতাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জাঠদের ক্ষমতা ছিল সবচেয়ে বেশি। বলা হয়েছে যে "যেসব জমি জাঠদের দখলে ছিল, সেগুলো তাদের নিজের নয়, অন্যদের থেকে কেড়ে নেওয়া। ঐ সব গ্রামের (স্বত্বাধিকারী) মালিকদের ('মালিকান') এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।" কোন ন্যায়পরায়ণ রাজা পুরনো মালিকদের সাহায্য করলে জাঠদের বিরুদ্ধে লড়াইতেই ইন্ধন যোগানো হতো।[১৯] জাঠ বিদ্রোহের অন্যতম পরিণতি ছিল জাঠ জমিনদারির (বিশেষ করে মধ্য-দোআবে) বিরাট বিস্তৃতি। 'আইন'-এ যেসব অঞ্চলে জাঠদের জমিনদার 'কওম' বলে দেখানো হয়েছে তার সঙ্গে সিপাহী বিদ্রোহের আগে (১৮৪৪) জাঠ জমিনদারদের দখলে যে এলাকা ছিল তার তুলনা করলেই ব্যাপারটি বোঝা যায়।[২০]

জাঠ বিদ্রোহ ছিল এক বিরাট লুঠের আন্দোলন। চাষীদের মধ্যেকার সংকীর্ণ জাতের সীমানা ও তাদের জমিনদার-নেতাদের লুঠেরা প্রবৃত্তির ফলে এই রকম হওয়াই বোধহয় ছিল অনিবার্য। গোকুল যেখানে লুঠপাট চালিয়েছিলেন সেই বিধ্বস্ত অঞ্চলটি ছিল সাদাবাদের একটি পরগনা।[২১] আগ্রার কাছাকাছি পরগনাগুলো লুঠ করেছিলেন রাজা রাম।[২২] লুঠের এলাকা বাড়তে বাড়তে চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে

১৬. মানুচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৩-৪; 'মআসির-এ আলমগীরী', পৃ. ২০৯।

১৭. 'রিয়াজ-আল ওয়দাদ', পৃ. ১৬ খ। বিজাপুর ও হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে অভিযানের ঠিক পরেই চিঠিটি লেখা হয়েছিল বলে মনে হয়।

১৮. ওপরে যেমন বলা হয়েছে, গোকুল ছিলেন জমিনদার, আর চৌরামন ছিলেন জমিনদারের ছেলে। চৌরামনের নাতি সুরযমলের সময়ে জাঠদের ক্ষমতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে "যদিও তিনি ব্রজ উপভাষা বলতেন এবং জমিনদারের পোশাক পরতেন, তাহলেও তাঁর বুদ্ধির দরুন তিনি তাঁর লোকদের কাছে ঋষিতে পরিণত হয়েছিলেন।" ('ইমাদুস সাদাত', পৃ. ৫৫)।

১৯. শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ, 'সিয়াসি মকতুবৎ', ৫০-৫১।

২০. এলিয়ট 'মেমোয়ার্স, ইত্যাদি', ২য় ভাগ, পৃ. ২০৩-এ মানচিত্রগুলো দ্রষ্টব্য। এতে দেখা যাবে যে মধ্য-দোআবে এই বিস্তৃতি যতটা চোখে পড়ে, উচ্চ-দোআবে ততটা নয়। সেখানে বড়জোর জাঠদের জমিনদারীর এলাকা কমে গেছে। তার সুস্পষ্ট কারণ এই যে, জাঠবিদ্রোহ ছিল আসলে ব্রজ অঞ্চলের জাঠদের বিদ্রোহ, উচ্চ-দোআবে কখনোই তার প্রভাব পড়েনি।

২১. 'মআসির-এ আলমগীরী', ৯৩।

২২. ঈশরদাস, পৃ. ৯৮ খ, ১৩১ খ।

পৌঁছয় চৌরামনের সময়ে। "আগ্রা ও দিল্লীর সব পরগনাতেই লুঠতরাজ চলে, এবং ঐ লুঠেরার ঝামেলায় পথঘাট বন্ধ হয়ে যায়।"[২৩]

যতদূর জানা যায় কোন ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে জাঠ বিদ্রোহীদের (হরিদাস থাকা সত্ত্বেও) কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু সৎনামী ও শিখ বিদ্রোহে বিদ্রোহী যোদ্ধাদের ঐক্য গড়ে তোলায় জাতের জায়গা প্রায় পুরোপুরি নিয়েছিল ধর্ম।

২. সৎনামী :

সৎনামীরা ছিলেন বৈরাগীদের একটি গোষ্ঠী। প্রচলিত মত অনুযায়ী, ১৬৫৭ সালে নরনাউল-এর এক অধিবাসী এই গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে সাচ্চা একেশ্বরবাদকে কেন্দ্র করেই সৎনামী ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব। আচার-অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার—দুইই এঁদের কাছে সমান নিন্দনীয়। এঁদের উপদেশের ভেতরে একটি সুনির্দিষ্ট সামাজিক দিকও ছিল। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদ ও অন্যের দাক্ষিণ্যে বেঁচে থাকা নিষিদ্ধ। নীচের বিধানগুলো থেকে গরীবদের প্রতি সহানুভূতি এবং কর্তৃপক্ষ ও ধনদৌলত সম্পর্কে এক বিতৃষ্ণার মনোভাবও সুস্পষ্ট: "গরীবদের ওপর অত্যাচার কোরো না ··· অন্যায়পরায়ণ রাজা, বড়লোক ও অসৎ লোকদের সঙ্গ পরিহার কর; তাদের কাছ থেকে বা রাজার কাছ থেকে দান গ্রহণ কোরো না।"[২৪]

২৩. ঐ, পৃ. ১৩৫ খ। ১৬৯০-৯১ সালে (তুলনীয় ঐ. ১৩৬ ক-১৩৭ খ) একটি সুপরিকল্পিত অভিযানে চৌরামনের ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের বাকি সময়টুকুতে এই বিদ্রোহ আর বড় মাপে ছড়িয়ে পড়েনি, ধিকিধিকি করে জ্বলতেই থাকে। তাঁর মৃত্যুর পর চৌরামনের নেতৃত্বেই আবার আগুন জ্বলে ওঠে ও পরিণামে একটি জাঠ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তার রাজধানী ছিল ভরতপুরে, সুরযমলের আমলে (১৭৫৬-৬৩) এটি সবচেয়ে বেশি ছড়িয়ে পড়েছিল।

২৪. লণ্ডনে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে (Hind. 1) 'সৎনাম সহাই' ধর্মগ্রন্থের ("পোথী গিয়ান বাণী সাধ সৎনামী") যে-পাণ্ডুলিপিটি আছে, তার ভিত্তিতেই এই অংশটি পুরোপুরি লেখা হয়েছে। পুঁথিটি ব্রজভাষায় লেখা। মূল পাঠটি নাগরী এবং আরবী—দু হরফেই দেওয়া আছে। আরবী হরফের পাঠে পদ্যে-লেখা একটি ভূমিকা-অংশ যোগ করা হয়েছে (পৃ. ৩৪ খ অবধি)।

উদ্ধৃতিটি পৃ. ৪৪ খ থেকে (পৃ. ৩৮ ক-ও এর সঙ্গে তুলনীয়)।

ভূমিকা অংশের প্রথমে (পৃ. ১ ক) সৎনামীদের প্রতিষ্ঠাতাকে বলা হয়েছে নরনাউল দেশের বিঝাসর-এর অধিবাসী। নরনাউল পূর্ব পাঞ্জাবের মহেন্দ্রগড় জেলায় অবস্থিত। আরবী হরফের পাঠের শেষে ফার্সীতে এই গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার তারিখ (বৈশাখ, ১৭১৪ সম্বৎ) দেওয়া আছে। তারিখটি আমি অনায়াসেই মেনে নিয়েছি, কারণ, পৃ. ৩৯ খ-তে তামাক খাওয়া নিষেধ করা হয়েছে, ফলে আরও আগে ঐ ধর্মগ্রন্থটি রচিত হওয়ার সম্ভাবনা কার্যত বাতিল করা যায়। কিন্তু আধুনিক লেখাপত্রে (তারাচাঁদ, 'ইনফ্লুয়েন্স অফ ইসলাম অন ইণ্ডিয়ান কালচার', এলাহাবাদ, ১৯৫৪, পৃ. ১৯২; সরকার, 'হিস্ট্রি অফ আওরঙ্গজেব', ৩য় খণ্ড,

নীচের শ্রেণীর লোকদের কাছেই এই ধর্মের আবেদন হতো খুব বেশি। সমসাময়িক এক ঐতিহাসিকের লেখায় এই ধর্মের অনুগামীদের সম্পর্কে এই বর্ণনা পাওয়া যায়:

"সৎনামী বলে হিন্দু সন্ন্যাসীদের একটি দল আছে। এদের মুণ্ডিয়া-ও বলা হয়।[২৫] নরনাউল ও মেওয়াট পরগনার চার-পাঁচ হাজার গৃহস্থ নিয়ে এই দল তৈরি হয়েছে। মুণ্ডিয়ারা সন্ন্যাসীদের মতো কাপড় পরলেও সাধারণত এদের জীবিকা ও পেশা চাষবাস ও সামান্য পুঁজি নিয়ে শস্যের ব্যবসার মতো ব্যবসাপত্র।[২৬] এদের সম্প্রদায়ের নিজস্ব রীতি অনুযায়ী জীবনযাপন করে এরা সুনামের ('নেক-নাম') অধিকারী হওয়ার চেষ্টা করে। 'সৎনাম' কথাটির অর্থই এই। তবে কেউ যদি সাহস বা প্রভুত্ব দেখানোর জন্য এদের অত্যাচার বা নিপীড়ন করতে চায়, এরা তা সহ্য করবে না। এদের বেশির ভাগই সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র রাখে।"[২৭]

সমসাময়িক আরেকজন লেখক এদের সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করে লিখেছেন যে এই সম্প্রদায় "চূড়ান্ত অপরিচ্ছন্নতার দরুন দুর্গন্ধযুক্ত, নোংরা ও অশুদ্ধ।" তিনি বলেন, "এদের গোষ্ঠীর নিয়ম অনুযায়ী এরা মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে তফাৎ করে না এবং শুয়োরের মাংস ও অন্যান্য ঘৃণ্য জিনিসও খায়।"[২৮]

সম্ভবত এদের সমবেত বিদ্রোহের আগেও এরা কর্তৃপক্ষের খুব একটা অনুগত ছিল না। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথমদিকে একজন রাজস্ব কর্মচারী জানান যে ভাটনৈর পরগনার একটি গ্রামে কিছু "চাষী—স্ত্রী, পুত্র, সম্পত্তি ও গবাদি পশু নিয়ে বৈরাগী সেজে থাকলেও" তারা "রাজদ্রোহিতা ও ডাকাতির চিন্তা ছাড়েনি।"[২৯] আসলে একটা গ্রামের হাঙ্গামা হিসেবেই এদের বিদ্রোহ শুরু হয় (১৬৭২)। একজন সৎনামী "মাঠে কাজ করছিল। এক পেয়াদার সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয়। পেয়াদাটি শস্যের গাদা পাহারা দিচ্ছিল। লাঠির বাড়ি মেরে সে সৎনামীটির মাথা ফাটিয়ে দেয়। এরপরে ঐ গোষ্ঠীর একজন লোক পেয়াদার ওপর হামলা করে ও তাকে পিটিয়ে প্রায় লাশ করে দেয়।" শিকদার তখন একদল সৈন্য পাঠায় আর এইভাবেই লড়াই বেঁধে যায়।[৩০]

এই বিদ্রোহের গণমুখী প্রকৃতি বোধ হয় সবচেয়ে ভালো বোঝা যায় জনৈক ঐতিহাসিকের কথা থেকে, যেখানে তিনি তাঁর সমস্ত বিদ্বেষ উজাড় করে দিয়েছেন:

"অদৃষ্টের বিচিত্র লীলার যারা দর্শক, এই ঘটনা তাদের খুবই অবাক করে।

(১৯২৮), পৃ. ২৯৭) এর প্রতিষ্ঠাতার জন্মসাল দেওয়া আছে ১৫৪৩। কিন্তু আগের ঐ একই কারণে তা অসম্ভব, যদি না ধরে নেওয়া হয় যে ধর্মগ্রন্থটি তাঁর নিজের লেখা নয়।

২৫. তুলনীয় 'দবিস্তান-এ মজাহিব', পৃ. ২৫১: "বৈরাগীদের মুণ্ডিয়া-ও বলা হতো"।

২৬. 'বক্‌কালান-এ কম-মায়' (মামুরী)। 'শস্য-ব্যবসায়ী'-র বদলে খাফী খান পড়েছিলেন 'দোকানদার'।

২৭. মামুরী, পৃ. ১৪৮ ক-খ; খাফী খান, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫২।

২৮. ঈশ্বরদাস, পৃ. ৬১ খ।

২৯. বালকৃষণ ব্রাহ্মণ, পৃ. ৫৬ ক-খ।

৩০. মামুরী, পৃ. ১৪৮ খ; খাফী খান, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৩।

স্যাকরা[৩১] (চাষী ?), ছুতোর, ঝাড়ুদার, মুচি ও আরও সব হীন ও নীচ জাতের লোক দিয়ে এই বেআদব, খুনে ও হা-ঘরের দল তৈরি। এদের মাথায় কী ঢুকেছিল যে উদ্ধত মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন হয়ে গেল ? মগজে বেপরোয়া গর্ব থাকায় কাঁধের পক্ষে মাথাটা বেশি ভারি হয়ে যায়। এরা নিজেরাই ধ্বংসের ফাঁদে ধরা পড়ল। পরিষ্কার করে বলতে গেলে, মেওয়াট অঞ্চলের এই দুষ্কৃতিকারীরা দলে দলে ঘুণপোকার মতো মাটির থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল আর পঙ্গপালের মতো আকাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল…।"[৩২]

প্রাথমিক পর্যায়ের বিরাট সাফল্য, বারবার বাদশাহী সৈন্যদের পরাজয়, এবং নরনাউল ও বৈরাট দখল—এসব সত্ত্বেও দরবার থেকে পাঠানো এক বিরাট সৈন্য-বাহিনীর হাতে বিদ্রোহীরা শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হয়। কিন্তু সাহসের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে তবেই তারা মরে। যাঁর কথা ওপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে সেই একই ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেন যে, যুদ্ধের কোন উপকরণ না থাকা সত্ত্বেও তাঁরা 'মহাভারত' মহাযুদ্ধের দৃশ্যগুলোই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।[৩৩]

৩. শিখ :

ইসলামকে যেমন বলে 'শহুরে লোকদের ধর্ম',[৩৪] তেমনি শিখধর্মকে চাষীদের ধর্ম বললে ভুল হবে না। গুরু নানকের সব শ্লোকই "পাঞ্জাবের জাঠদের ভাষায় লেখা", আর পাঞ্জাবী উপভাষায় জাঠ শব্দের অর্থ গ্রামবাসী বা গেঁয়ো লোক।[৩৫] 'দবিস্তান-এ মজাহিব'-এর লেখক (আনু. ১৬৫৫)—শিখদের সম্পর্কে একটি অন্তরঙ্গ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে, "কোন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রী-র শিষ্য ('শিখ') হবে না—এদের মধ্যে এরকম কোন নিয়ম নেই, কারণ নানক ছিলেন ক্ষত্রী।… একইভাবে তারা ক্ষত্রীদের করেছে জাঠের অধীন, জাঠরা বৈস (বৈশ্য) জাতের সবচেয়ে নীচুতলার লোক। এইভাবে গুরুর বড় বড় 'মসন্দ' (মান্যগণ্য লোক, প্রতিনিধি)-দের বেশির ভাগই জাঠ।"[৩৬] সুগঠিত ও সুশৃঙ্খল সংগঠন তৈরির ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন

৩১. মুদ্রিত পাঠে আছে 'জরগার', Add. 19,495, পৃ. ৬৩ ক-তে তার সমর্থন মেলে। কিন্তু 'স্যাকরা' শব্দটি এখানে ঠিক খাপ খায় না। 'বর্জগার' অর্থাৎ চাষীকে ভুল করে 'জরগার' করা হয়েছে, এরকম ভাবতে লোভ হয়। ফার্সীতে টানা হাতে লিখলে এই শব্দ দুটির প্রায় কোন তফাৎই করা যায় না।

৩২. 'মআসির-এ আলমগীরী', পৃ. ১১৪-৫।

৩৩. ঐ, পৃ. ১১৫-৬।

৩৪. তুলনীয় এফ. লকেগার্ড, 'ইস্লামিক ট্যাক্সেশন ইন দা ক্লাসিক পিরিয়ড', কোপেনহাগেন, ১৯৫০, পৃ. ৩২ ; এম. হাবিব, 'এলিয়ট অ্যাণ্ড ডাওসন'স্ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', ভূমিকা, ২য় খণ্ড, আলীগড় পুনর্মুদ্রণ, ১৯৫২, পৃ. ২-৩।

৩৫. 'দবিস্তান-এ মজাহিব', পৃ. ২৮৫, তুলনীয় ইবেটসন, 'পাঞ্জাব কাস্ট্স্', পৃ. ১০৫। এখানে 'কৃষিজীবী' অর্থে 'জাঠ' শব্দটি ব্যবহার হয়েছে।

৩৬. 'দবিস্তান-এ মজাহিব', পৃ. ২৮৬ ; আরও পৃ. ২১৪। তেমনি খাফী খান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫১ : "ঐ ধ্বংসকামী গোষ্ঠীর বেশির ভাগই ছিল পাঞ্জাবের জাঠ ও ক্ষত্রী 'কওম'-এর লোক এবং কাফেরদের অন্যান্য নীচু জাতের লোক।"

গুরু অর্জুন মল (মৃত্যু : ১৬০৬)। প্রত্যেক গ্রামে তিনি নিজের লোক নিযুক্ত করেছিলেন। "বিধান দেওয়া হয়েছিল যে উদাসী, বা সাধু, প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসী নয়, তাই গুরুর কিছু শিখ (শিষ্য) চাষবাস করে, অন্যরা ব্যবসা বা চাকরি করে। প্রত্যেকে তার ক্ষমতা অনুযায়ী মসন্দকে প্রতি বছর একটা 'নজর' (দক্ষিণা) দেয়", গুরুর হয়ে তিনি এটি গ্রহণ করেন।[৩৭] গুরু হরগোবিন্দের (১৬০৬-৪৫) অধীনে শিখরা একটি সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়। তিনি নিজেই একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করেন ও তার ফলে মুঘল শক্তির সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হন।[৩৮] এইভাবে তিনি একটি পরম্পরা গড়ে তুলেছিলেন, শেষ গুরু (১৬৭৬-১৭০৮) পর্যন্ত তা বজায় রেখেছিলেন। বান্দা যখন লড়াই-এর ময়দানে "পিঁপড়ে ও পঙ্গপালের মতো অসংখ্য মানুষের এক সৈন্যবাহিনী" পরিচালনা করেন সেখানেই এই ঐতিহ্যের সমাপ্তি ঘটে। এই সৈন্যরা ছিল নীচু জাতের হিন্দু, বান্দার হুকুমে "মরবার জন্য তৈরি।"[৩৯] এমন কি ১৯ শতকের প্রথম দিকেও শিখদের "সবচেয়ে সম্মানিত সর্দারদের অধিকাংশই" ছিলেন "নীচ বংশজাত, যেমন, ছুতোর, মুচি ও জাঠ।"[৪০] এর থেকেই বোঝা যায়, নীচু শ্রেণীই ছিল এই বিদ্রোহের মেরুদণ্ড।

৪. উত্তর ভারতের অন্যান্য বিদ্রোহ :

এই তিনটি বিদ্রোহ দিয়ে উত্তর ভারতের কৃষক বিদ্রোহের তালিকা অবশ্য কখনোই সম্পূর্ণ হয় না। প্রামাণ্য নথিপত্রে এই ধরনের অনেক বিদ্রোহকে তুচ্ছ ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, ১৫৭৫-৭৬ সালে ভাক্কার-এর শাসনকর্তা বিঘা পিছু একই হারে রাজস্ব বেঁধে দেওয়ায় "চাষীদের ওপর অত্যাচার" হয়েছিল বলে জানা যায়। প্রতিবাদে মংচা উপজাতি বিদ্রোহ করে ও কর-সংগ্রাহকদের হত্যা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা হেরে যায় ও জমি থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হয়।[৪১] ১৬৬২ সালে এলাহাবাদ দিয়ে যাওয়ার সময় মানুচি সেখানকার সুবাদারের দেখা পাননি। "কিন্তু গ্রামবাসী অন্তত একবার লড়াই না করে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করেছিল। তিনি তখন তাদের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন।"[৪২] অন্য ধরনের গোলমালের

৩৭. 'দবিস্তান-এ মজাহিব', পৃ. ২৮৬-৮৭। আরও তুলনীয় খাফী খান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫১-৫২।

৩৮. 'দবিস্তান-এ মজাহিব', পৃ. ২৮৮।

৩৯. খাফী খান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭২।

৪০. সৈয়দ গুলাম আলী খান, 'ইমাদুস সআদাৎ', সম্পা. নবলকিশোর, লখনউ, পৃ ৭১। আরও দ্রষ্টব্য সতীশ চন্দ্র, 'পার্টিস অ্যাণ্ড পলিটিক্স অ্যাট দা মুঘল কোর্ট, ১৭০৭-৪০', পৃ. ৫০-৫১। ১৭ শতকের গোড়ার দিকের এক লেখক ওয়াৱিদ-এর থেকে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাতে দেখা যায় যে "নীচু শ্রেণীর ঝাড়ুদার বা মুচিকে শুধুমাত্র ঘর ছেড়ে গুরুর সঙ্গে যোগ দিতে হতো, তা হলেই অল্পদিনের মধ্যে নিয়োগের আদেশ হাতে নিয়ে (পদস্থ কর্মচারী হিসেবে) সে তার জন্মস্থানে ফিরে আসতে পারত।"

৪১. মাসুম, 'তারিখ-এ সিন্দ', পৃ. ২৪৫-৪৬।

৪২. মানুচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৩।

মধ্যে ছিল মেওয়াট-এর মেওয়াটীদের কার্যকলাপ। তারা সর্বদাই বিদ্রোহ করত; পাহাড়ের গভীরে তাদের গ্রামগুলো থেকে চলত লুঠতরাজ।[৪৩] ১৬৪৯-৫০-এ জয়সিংহ তাদের বিরুদ্ধে এক দুর্ধর্ষ অভিযান চালিয়েছিলেন,[৪৪] কিন্তু তারপরেও তারা টি'কে ছিল এবং ঝামেলা করত।[৪৫] লখী জঙ্গলের চাষীরাও "বিদ্রোহ ও দুষ্কৃতির জন্য কুখ্যাত" ছিল। তারা ছিল ওয়াত্তু, ভোগর ও গুজর 'কওম'-এর লোক। শতদ্রু-বিপাশা নদীর তৈরি বিভিন্ন খাত ও বন্যার ফলে গজিয়ে ওঠা জঙ্গল দিয়ে তারা এতই সুরক্ষিত ছিল যে তাদের বিরুদ্ধে বেশির ভাগ অভিযানই ব্যর্থ হয়।[৪৬] বলা হয় যে, আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দিকে একবার তারা পুরো দিপালপুর পরগনা জুড়ে লুঠপাট চালায়।[৪৭]

১৬৩৫ সালে শাহ্জাহান ওরছা দখল করার পর বুন্দিলা বিদ্রোহ শুরু হয় এবং আমাদের আলোচ্য পর্বের অবশিষ্ট সময় ধরে বিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। এটি ছিল মূলত রাজবংশের ব্যাপার, অর্থাৎ সিংহাসনের অধিকার নিয়ে লড়াই। কিন্তু, মুঘল সেনাপতি খান জাহান বারহা-র দুটি চিঠি থেকে জানা যায় যে এখানেও একটি সফল লড়াইয়ের পর বিদ্রোহীরা "রাইয়তী ও মওয়াস"—দু ধরনের এলাকা থেকেই "জমিনদার ও চাষীদের" নিজেদের পক্ষে আনতে পেরেছিল। তা ছাড়া, বিদ্রোহীরা সক্রিয় হয়ে উঠলেই চাষীরা সেই সুযোগে রাজস্ব দাখিল করার দায় এড়াতে চাইত।[৪৮]

৫. মারাঠা :

এখন মারাঠাদের সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। নিঃসন্দেহে, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য সবচেয়ে বড় একক শক্তি হিসেবে দায়ী এরাই। ১৭০০ সালে ভীমসেন তাঁর স্মৃতিকথা প্রসঙ্গে এই "দুষ্কৃতকারী ও মারাঠাদের" সাফল্যের কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। ভীমসেন নিজে ছিলেন বুরহানপুরের বাসিন্দা, দখিনে কয়েক দশক কাজের অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল। এ বিষয়ে তাই তাঁর মতামত খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি শুরু করেছেন একেবারেই সামরিক যুক্তি দিয়ে। সামরিক নিয়মকানুন অনুযায়ী সৈন্যবাহিনীর যে-মান রাখা উচিত মুঘল সেনাপতিরা সেই মান বজায় রাখে নি। ফলে, মুঘল ফৌজদারদের নিয়ে "দুষ্কৃতকারীদের" কোন ভয় ছিল না। তাই "মনসবদারদের যেসব অঞ্চল বেতন হিসেবে বরাত দেওয়া হয়েছে সেখানকার রাজস্ব

৪৩. পেলসার্ট ১৫ ; মান্নুচি ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৮।

৪৪. ওয়ারিস : ক : পৃ. ৪৩৩ ক-খ, ৪৩৫ খ ; খ : পৃ. ৬৪ ক-৬৭ ক ; সালেহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১০-১২।

৪৫. মান্নুচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৮।

৪৬. সুজান রায়, ৬৩ ; মান্নুচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৭-৫৮। আরও তুলনীয় 'অখবারাৎ' ৪৩/৫৩। 'ওয়াত্তু' হলো 'ভাট্টি' জনগোষ্ঠীর লোক (ইবেটসন, 'পাঞ্জাব কাস্টস্', পৃ. ১৪৫-৪৬)।

৪৭. 'আহ্কম-এ আলমগীরী', পৃ. ২১৫ ক।

৪৮. 'আর্জদাশ্‌ৎ-হা-এ মুজফ্‌ফর', পৃ. ৬ ক-৭ ক, ১১৫ খ। প্রথম চিঠিতে চম্পত ও রামসেন কর্তৃক ধামনি এবং চান্দেরী লুঠের বর্ণনা আছে।

দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের বাধ্য করা যায় না।" "ক্ষমতা পাওয়ার পর জমিনদাররাও মারাঠীদের সঙ্গে জোট বেঁধেছে।"

এর পর দ্বিতীয় কারণ হিসেবে তিনি মারাঠাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে বাদশাহী এলাকাগুলোতে চাষীদের ওপর অত্যাচারের একটা সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন :

"জাগীরদারেরা গোমস্তারা দরবারের কেরানীদের কৃপণ আচরণের ভয় করত। যে কোন ছুতোয় তারা বদলি করে দেয়। পরের বছর জাগীরদারকে যে একই জাগীরে বহাল ('ব-হালী') করা হবে, এমন কোন আশা নেই। সে কারণেই তারা চাষীদের রক্ষা করা ('রাইয়ত-পরওয়ারী') বা পাকা করার ('ইস্তিকলাল') রীতি ছেড়ে দিয়েছে। জাগীরদার নিজের প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য যে রাজস্ব-সংগ্রাহক ('আমিল') পাঠায়, তার থেকে আগাম সে কিছু নিয়ে নিত ('কব্‌জ্')। আর এই 'আমিল' জাগীরে পৌঁছে ভাবে তার পেছনে আরেকজন 'আমিল' আসছে, সে হয়তো আরও বেশি 'কব্‌জ্' দিয়েছে। ফলে সে নির্দয় অত্যাচার করে খাজনা আদায় ('তহ্‌সীল') করে। কিছু চাষী নির্ধারিত রাজস্ব ('মাল-এ ওয়াজিব') দিতে অবহেলা করে না, কিন্তু এই অসহ্য শোষণের কুফলে তারাও মরিয়া হয়ে ওঠে। (দরবারে) জানানো হয়েছে যে মারাঠারা বাদশাহী এলাকার চাষীদের সহযোগিতা পায়। সেই অনুসারে প্রত্যেক গ্রাম থেকে ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেওয়া হয়। বেশির ভাগ গ্রামে এইরকম ঘটার পর চাষীরা নিজেদের ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মারাঠাদের সঙ্গে যোগ দেয়।"

ভীমসেন আবার চাষীদের ওপর অত্যাচারের বিষয়টিতে ফিরে গেছেন ও বলেছেন—

"ফৌজদার, দেশমুখ ও জমিনদাররা পট্টিগুলোয় অত্যাচার চালায়। যে কোন ছুতোয় তারা চাষীদের থেকে টাকা আদায় করে। এছাড়াও, জমিনদারদের ওপর যে বাদশাহী প্রাপ্য ('পেশকশ-এ পাদশাহী') ধার্য হয় সেটিও চাষীদের কাছ থেকে আদায় করার জন্য লোক নিয়োগ করা হয়, রসদ জোগাড়ের জন্যও তাদের সর্বত্রই পাঠানো হয়। এই লোকগুলোর অত্যাচারের কোন সীমা নেই। জমিনদাররা নিজেদের গাঁট থেকে একটা 'দাম' বা 'দিরাম'ও খসায় না, চাষীদের কাছ থেকে আদায় করে তবে দেয়। আর যে জিজিয়া চাপানো হয়েছে এবং সংগ্রাহক ('উমনা') নিয়োগ করা হয়েছে তাদের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার কথা আর কী বলব? কারণ, কোন বর্ণনাই তো যথেষ্ট হবে না⋯।"

এর ওপর মারাঠাদের লুঠতরাজের ফলে চাষীদের দুরবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। কারণ, "গ্রামাঞ্চলকে যেমন খালিসা এবং জাগীরদারদের বেতন-বরাত—এইভাবে ভাগ করা হয়েছে, ঠিক সেইভাবে মারাঠারাও ঐ একই অঞ্চল নিজেদের 'কল্পিত-সর্দার'দের[৪৯] মধ্যে বিলি করে দিয়েছে। ফলে, ঐ একই জমিতে দুজন জাগীরদার এসে গেল। ছড়া : 'দুরকম মাপের মাপকাঠি দিয়ে ধ্বংস হচ্ছে গ্রাম, ইত্যাদি।' (মারাঠা) নেতাদের সৈন্যবাহিনী গ্রামাঞ্চলে শুধু লুঠপাট করতেই আসে ও ইচ্ছামতো প্রতিটি পরগনা ও সব জায়গা থেকেই টাকা আদায় করে। ফসলভর্তি মাঠে চরবার ও মাড়াবার জন্য তারা (তাদের ঘোড়া) ছেড়ে দেয়⋯। নিয়মশৃঙ্খলা

৪৯. 'না-সর্দারান'। মারাঠা সেনাপতি অর্থে মুঘল নথিপত্রে এটিই ছিল সরকারী পরিভাষা।

লোপ পেয়েছে…এখনকার অবস্থা তো সব সীমাই ছাড়িয়ে গেছে। ক্ষেতের ফসল আর গোলায় ওঠে না। তাদের (চাষীদের ?) সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

স্পষ্টতই, এই ঘটনা চাষীদের আরও বেশি করে মারাঠাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল : "শিব-এর[৫০] অনেকগুলো দুর্গ যখন জাহাঁপনার (আওরঙ্গজেবের) দখলে আসে তখন মারাঠাদের পক্ষে নিজেদের থাকা ও আশ্রিতদের রাখার জায়গা পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। (কিন্তু) বাদশাহী এলাকায় চাষীদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা আছে। তারা তাই নিজেদের পরিবারবর্গকে তাদের হেফাজতে বসতিপূর্ণ জায়গায় রেখে দেয়…।" অংশটি শেষ হয়েছে এই দিয়ে : "চাষীরা চাষবাস করা ছেড়ে দিয়েছে, জাগীরদারদের কাছে একটা 'দাম' বা 'দিরাম'ও পৌঁছয় না। শক্তির (অভাবে) হতাশ ও বিমূঢ় হয়ে এই দেশের[৫১] অনেক মনসবদার মারাঠাদের পক্ষে চলে গেছে।"[৫২]

মারাঠাদের সাফল্যের বিভিন্ন কারণের সমসাময়িক বিশ্লেষণ হিসেবে ভীমসেনের কথাগুলো অমূল্য। আমাদের কাছে যেসব তথ্য আছে সেগুলো তার যুক্তির প্রধান ধারাগুলোকে যথেষ্ট পরিমাণে সমর্থন করে। শিবাজীর নামডাক ছড়িয়ে পড়ার আগে, দখিনের রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে মুঘলদের স্থায়ী চাপের দরুন যুদ্ধের ফলে ঐ অঞ্চলের চাষীরা বহু দশক জুড়ে কষ্ট সহ্য করেছিল। বিশেষত, তাড়াতাড়ি দখল করার সম্ভাবনা না থাকলে আক্রমণকারী সৈন্যরা বিরাট এলাকা জুড়ে তাণ্ডব চালাত : শস্য কেড়ে নেওয়া হতো, মানুষ খুন হতো বা দাসে পরিণত হতো।[৫৩] মুঘল দখিনে বিশাল সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল এবং প্রধানত ঐ প্রদেশগুলোর বরাত থেকেই তাদের ভরণপোষণ চলত। ফলে, শান্তির সময়েও চাষীদের পঙ্গু করার মতো বোঝা চাপানো থাকত।[৫৪] আর তাই, আমরা আগেই যেমন দেখেছি, আওরঙ্গজেব যখন দ্বিতীয়বার সুবাদার হিসেবে দখিনে এসেছিলেন, দেশ তখন জনশূন্য, চাষীরা ফেরারী।

৫০. তিনি অবশ্যই শিবাজীর উত্তরাধিকারীদের বা শুধু মারাঠাদের কথাই বুঝিয়েছেন।

৫১. দখিনে যাদের জাগীর ছিল সেইসব মনসবদার, বা যারা আগে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা সরকারের অধীনে কাজ করত, সেই দখিনী অভিজাতদের কথাই বোধহয় ভীমসেনের মাথায় ছিল।

৫২. 'দিলকুশা', পৃ. ১৩৮ খ-১৪০ ক।

৫৩. যথাক্রমে আহ্‌মদনগর এবং বিজাপুরের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলোতে এই ধরনের ব্যবস্থার জন্য তুলনীয় লাহোরী, ১ম খণ্ড, ৩১৬-১৭, ৪১৬-১৭। মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযানে ঐ একই ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ক্রায়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১০ দ্রষ্টব্য।

৫৪. দখিনের সুবাদার হিসেবে আওরঙ্গজেব যে চিঠিগুলো লিখেছিলেন তার থেকে এ কথা সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে আসে। 'জমা' যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তা আসল রাজস্বের চারগুণের বেশি হয় ('আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ৪০ খ; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', পৃ. ১২১-২২)। আর, মনসবদারদের পক্ষে বরাতের আয় থেকে সেনাবাহিনী রাখা সবচেয়ে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল ('আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ৩৮ ক-খ, ১১৭ খ-১১৮ ক; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', পৃ. ১১৬-১৭ এবং অন্যত্র)।

এমন কি অত গোড়ার দিকেও চাষীরা তাই শিবাজীকে মদৎ দিতে শুরু করেছিল। "বাদশাহী এলাকার পরগনাগুলোর যেসব চাষী, দেশমুখ ও পাটেল শত্রুপক্ষে (অর্থাৎ, শিবাজী ও তাঁর সহকারীদের সঙ্গে) যোগ দিয়েছে ও ঐ হতভাগ্যদের পরিচালনায় ও উৎসাহ দেওয়ার কাজে সাহায্য করছে"—তখ্‌ৎ জয় শুরু করার আগেই আওরঙ্গজেব এদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য তাঁর কর্মচারীদের নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন।[৫৫]

তবে সব থেকে বড় ভুল হবে যদি শিবাজী এবং মারাঠা সর্দারদের কৃষক অভ্যুত্থানের সচেতন নেতা বলে ধরা হয়। শিবাজী নিজে ছিলেন এক বিরাট নিজামশাহী (এবং পরে আদিলশাহী) অভিজাতের ছেলে। তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল কোঙ্কনে সর্দার হিসেবে। মারাঠাদের আর্থিক ও রাজনৈতিক রীতিনীতির মধ্যেই সেগুলোর জমিনদারী উৎসের গভীরতম ছাপ রয়েছে। মারাঠা লুঠেরাদের প্রথাগত দাবি 'চৌথ' এসেছিল জমির, এবং তার থেকে রাজস্বের, এক-চতুর্থাংশের ওপর জমিনদারদের চিরায়ত দাবি থেকে। গুজরাটে এই ধাঁচের 'চৌথ' চালু ছিল বলে জানা যায়।[৫৬] আওরঙ্গজেবের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়ার সময় তাঁরা চেয়েছিলেন "দখিনের গ্রামাঞ্চলের দেশমুখী"—এই ছিল যে-কোন জমিনদারের সর্বোচ্চ আশা।[৫৭] এই ঘটনাটি বোধ হয় প্রতিনিধিস্থানীয়। ১৮ শতকের মাঝামাঝি মারাঠারা যখন নিজেরাই প্রায় একটি সাম্রাজ্য জয় করে ফেলেছিল, তখন তাদের নেতাদের পক্ষে সর্বত্র জমিনদারি রাজস্ব দখল করা ছাড়া ক্ষমতার আর কোন সদ্‌ব্যবহার জানা ছিল না। ঐ সময়কার একজন লেখক বলেছেন, "সাধারণভাবে মারাঠাদের, কিন্তু বিশেষভাবে দখিনের ব্রাহ্মণদের একটা অদ্ভুত বাসনা আছে। জীবনধারণের উপায় থেকে সব লোককে বঞ্চিত করে তারা নিজেরা সেগুলো আত্মসাৎ করতে চায়। রাজাদের জমিনদারিও তারা ছাড়ে না, এমন কি মোড়ল বা গ্রামের খাজাঞ্চীর মতো ছোটখাট লোকের জমিনদারিও পার পায় না। পুরনো বংশের ওয়ারিশদের উচ্ছেদ করে তারা নিজেদের দখল কায়েম করে। তারা চায় কোঙ্কনের ব্রাহ্মণরাই যেন সারা দুনিয়ার মালিক হয়।"[৫৮]

৫৫. 'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ১৭৫ ক-খ।

৫৬. পঞ্চম অধ্যায়, প্রথম অংশ দ্রষ্টব্য।

৫৭. 'অখবারাৎ' ৪৭·৭৩; খাফী খান, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৭। তারাবাঈ যে অধিকার দাবি করেছিলেন পরবর্তী রচনায় তাকে 'সরদেশমুখী' (বা শুধু 'দেশমুখী') বলা হয়েছে। এই অধিকারের অর্থ রাজস্বের শতকরা ৯ (বা ১০) ভাগ।

ইংরেজি নথিপত্রে, ১৬৭৫ সালে "মুঘল ও শিবাজীর মধ্যে শান্তি চুক্তির যে খুব বড় খবর" পাওয়া যায় তা বেশ আগ্রহজনক। এই চুক্তি অনুযায়ী শিবাজীকে "মুঘলের থেকে নেওয়া সব দুর্গ এবং জমি ফেরৎ দিতে হবে" ও তার বদলে "দখিনে সব জমিতে তিনি রাজার দেসাই হবেন" ('ইংলিশ রেকর্ডস অন শিবাজী', শিব চরিত্র কার্যালয়, পুণা থেকে প্রকাশিত, ১৯৩১, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭)। দেশমুখ ও দেসাই-এর দপ্তর একই।

৫৮. আজাদ বিলগ্রামী, 'খিজানা-এ আমিরা', কানপুর, ১৮৭১, পৃ. ৪৭। বইটি ১৭৬২-৬৩-তে লেখা। পেশোয়াদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে দখিনী ও কোঙ্কনী জাতের ব্রাহ্মণদের মধ্যে

তবে মারাঠা রাজ্যে চাষীদের ওপর অত্যাচার হতো না এ রকম বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। শিবাজী তাঁর এলাকার চাষীদের সঙ্গে কী রকম আচরণ করতেন, ফ্রায়ার তার বর্ণনা দিয়েছেন। ১৬৭৫-৭৬ সালে তিনি ঐ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরেছিলেন। শিবাজী আগের আমলের চেয়ে দ্বিগুণ হারে রাজস্ব দাবি করতেন[৫৯] এবং চাষীদের প্রায় কোনক্রমে বেঁচে থাকার উপায়ও রাখতেন না।[৬০] "শিবাজীর অত্যাচারের ফলে জমির তিনের-চার ভাগে সার পড়ে না (অর্থাৎ চাষ হয় না)।"[৬১]

সম্পূর্ণ অন্য একটি ক্ষেত্রে চাষীরা শিবাজীর কাজে লাগত। তারাই ছিল সেই "নাঙ্গা ভুখা বদমাস", যাদের নিয়ে তাঁর সৈন্যবাহিনী গড়ে উঠেছিল।[৬২] খালি বল্লম আর দু ইঞ্চি চওড়া তলোয়ার[৬৩] নিয়ে তারা "আচমকা আক্রমণ বা লুঠপাট ভালোই করতে পারত", কিন্তু "খোলা মাঠের লড়াইএর পক্ষে" উপযুক্ত ছিল না।[৬৪] শুধু লুঠতরাজ করেই তাদের বাঁচতে হতো, কারণ শিবাজীর নীতি ছিল "লুঠপাট নেই তো মাইনেও নেই'।[৬৫] শিবাজী ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা দখিনের সর্বস্বান্ত চাষীদের যে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন, তার স্বরূপ ছিল এই। ভীমসেনের বিবরণে যেমন দেখা যায়, মারাঠাদেব সামরিক অভিযানে আবাদী চাষীদের কোন সুরাহা হয়নি। বরং তাদের লুঠতরাজের ফলে চাষীদের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিল। "ডাকাত রাষ্ট্রের"[৬৬] অভিযান যত ছড়িয়ে পড়ছিল ততই বাড়ছিল তার শিকারের সংখ্যা। কিন্তু এর ফলে শুধু আরও অনেক বেশি সংখ্যায় "নাঙ্গা ভুখা বদমাস" তৈরি হয়েছিল বলে মনে হয়। নিজেদের ওপর লুঠপাট হওয়ার ফলে লুঠেরাদের সঙ্গে যোগ দেওয়া ছাড়া তাদের আর কোন উপায়ই ছিল না।[৬৭] অন্তহীন চক্রটি এইভাবে ঘুরতেই থাকে।

মারাঠাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আধিপত্য করার মতো জায়গা দখলের একটা ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। তার ফলেই বোধহয় বইটিতে ঐ জাতের ব্রাহ্মণদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৫৯. ফ্রায়ার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫।

৬০. ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১১-১২ : ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬।

৬১. ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৬।

৬২. ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭।

৬৩. মানুচি, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫০৫।

৬৪. ফ্রায়ার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭, ৬৮ : মানুচি, পুর্বোক্ত গ্রন্থ

৬৫. ফ্রায়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪১।

৬৬. ভি. এ. স্মিথ থেকে এই পরিভাষাটি নেওয়া হয়েছে।

৬৭. মারাঠা সৈন্যবাহিনী যখন এমন কি ভারতের বৃহত্তম অংশ জয় করেছিল, তখনও তাদের এই ধরনের নীচু শ্রেণী-ভিত্তিক গড়ন বজায় ছিল। ১৭৬২-৬৩ সালে লিখতে বসে আজাদ বিলগ্রামী জানিয়েছেন যে "মোটামুটিভাবে চাষী, রাখাল, ছুতোর এবং মুচি- এইসব নীচু ঘরের লোকরাই শত্রুপক্ষের (মারাঠী) সৈন্যবাহিনীতে আছে আর মুসলিম সৈন্যদের বেশির ভাগই খানদানী ও ভদ্রলোক। শত্রুপক্ষের সাফল্যের কারণ এই যে তাদের সৈন্যরা প্রচণ্ড কষ্ট সহ্য করতে পারে বলে গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ ('জং-এ কজ্জাকী') চালায় এবং যুদ্ধের সময় প্রতিপক্ষের শস্য ও পশুখাদ্যের যোগান বন্ধ করে তাকে অক্ষম করে তোলে…(যদিও) খানদানী

আওরঙ্গজেব তাঁর জীবনের শেষদিকে স্বীকার করেছিলেন যে "এমন একটাও প্রদেশ বা জেলা নেই, কাফেররা যেখানে গোলমাল করেনি এবং শাস্তি না পাওয়ার ফলে সর্বত্রই তারা নিজেদের কায়েম করেছে। গ্রামাঞ্চলের বেশির ভাগই জনহীন হয়ে গেছে। কোন জায়গায় যদি বসতি থাকে তা হলে হয়তো সেখানকার চাষীরা ডাকাতদের ('আশকিয়া', মারাঠাদের মুঘল সরকারী নাম) সঙ্গে সমঝোতায় এসেছে।"[৬৮]

এইভাবেই ধ্বংস হয়েছিল মুঘল সাম্রাজ্য। এর বিরুদ্ধে যেসব শক্তি একত্রিত হয়েছিল তারা নতুন কোন ব্যবস্থার সৃষ্টি করে নি বা করতে পারে নি।[৬৯] এর পরের

পরে যারা জন্মায় তাদের স্বভাবে যে সাহস ও সম্মানবোধ আছে নীচু কুলের মানুষেরও তা থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না" ('খিজানা-এ আমিরা', পৃ. ৪৯)।

মারাঠাদের লুঠপাটের ফলে যেভাবে তাদের সৈন্যবাহিনীতে আরও বেশি করে রংরুট পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছিল পিণ্ডারীদের দৃষ্টান্ত দিয়েই সে কথা বোঝা যেতে পারে। "তারা যে দুর্দশার সৃষ্টি করত, তার ওপর নির্ভর করেই পিণ্ডারীরা বেঁচে থাকত ও বেড়ে উঠত। কারণ, তাদের লুঠেরা আক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তির কোন নিরাপত্তা রইল না। লুঠপাটের ফলে যাদের সর্বনাশ হতো তাদের পক্ষে টিঁকে থাকার একমাত্র উপায় হিসেবে পরে মারপিঠ করার জীবন বেছে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকত না। যে প্রবাহ তারা রোধ করতে পারত না সেই প্রবাহেই তারা যোগ দিত এবং অন্যদের ওপর লুঠতরাজ করে নিজেদের ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করত" (জে. ম্যালকম, 'এ মেমোয়ার অফ সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া ইনক্লুডিং মালব', ইত্যাদি, ১ম খণ্ড, লণ্ডন, ১৮৩২ (৩য় সংস্করণ), পৃ. ৪২৯)। পেশোয়াদের আমলের শেষে পিণ্ডারীরা মারাঠা সর্দারদের বাহিনীতে মিত্রবাহিনী হিসেবে কাজ করত। পিণ্ডারীরাই ছিল মারাঠা ব্যবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি এবং প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যবস্থারই প্রতীক-স্বরূপ।

৬৮. 'আহকাম-এ আলমগীরী', পৃ. ৬১ খ।

৬৯. ভারতে ১৭ শতকের অভ্যুত্থানগুলো তাদের প্রতিপক্ষের কাজকর্মের চেয়ে ভালো কিছু করার কথা বলেও নি, কিছু করতেও পারেনি। আমরা যেমন দেখেছি, তখনকার ঐতিহাসিক পরিবেশ ও বিভিন্ন শ্রেণীশক্তির বিশিষ্ট পারস্পরিক সম্পর্কই এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী। এ ক্ষেত্রে চীনের ইতিহাস উল্লেখ করলে বোধহয় বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে। আয়তন এবং অতীত ইতিহাস বাবদে একমাত্র চীনের সঙ্গেই ভারতের তুলনা সম্ভব। একেবারে তাইপিং পর্যন্ত অনেক কটি কৃষক বিদ্রোহের বর্ণনা করে মাও-জে-দং সঠিকভাবেই লক্ষ্য করেছেন যে, "যতটা বড় মাপে চীনের ইতিহাসে এই ধরনের কৃষক অভ্যুত্থান ও যুদ্ধ হয়েছিল, বিশ্বে তা অতুলনীয়।" কিন্তু এর সঙ্গে তিনি আরও বলেছেন যে, "যেহেতু ঐ দিনগুলোতে (প্রাচীন ও মধ্যযুগে) নতুন উৎপাদক-শক্তি বা নতুন উৎপাদন-সম্পর্ক বা একটি নতুন শ্রেণীশক্তি অথবা কোন অগ্রণী রাজনৈতিক দল কিছুই ছিল না।... কৃষি বিপ্লবগুলো সর্বদাই ব্যর্থ হয়, এবং প্রত্যেকটি বিপ্লবের পর জমিদার ও অভিজাত সম্প্রদায় রাজবংশ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে চাষীদের কাজে লাগায়" (মাও জে-দং, 'সিলেক্টেড ওঅর্ক্স্', ইংরেজি সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, লণ্ডন, ১৯৫৪, পৃ. ৭৫-৭৬)।

পর্বটি যে-দৃশ্য উপস্থাপিত করে তার থেকে শেখার কিছুই নেই। লাগামহীন লুঠতরাজ, বিশৃঙ্খলা আর বিদেশী আক্রমণের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল। তবে মুঘল সাম্রাজ্য নিজের কবর খুঁড়ছিল নিজেই। অন্য একটি বিরাট সাম্রাজ্য সম্বন্ধে সাদী যা বলেছিলেন, মুঘল সাম্রাজ্যের মরণগাথা হিসেবেও তা সমান প্রযোজ্য :

তাঁরা ছিলেন বিরাট রাজা, রাজ্যটা পারস্য,
তাঁদের অত্যাচারে নীচুতলার মানুষ হলো নিঃস্ব :
কোথায় তাঁদের রাজ্যপাট আজ, কোথায় সেই গর্ব ;
চাষীর ওপর চোখরাঙানি, তাও হলো অদৃশ্য।[৭০]

৭০. "খুসরাওয়ান-এ আজম"..."খবরদারী" ইত্যাদি, 'বোস্তান'।

পরিশিষ্ট ক

জমির পরিমাপ

১. গজ-এ সিকন্দারী

আগের আমল থেকে আকবরের প্রশাসন জমি পরিমাপের যে প্রমাণ সরকারী একক পেয়েছিল তা হলো 'গজ-এ সিকন্দারী' (বা 'ইসকন্দারী')। 'আইন'-এর কথা অনুযায়ী, এটি চালু করেন সিকন্দার লোদী এবং এটি ছিল তাঁর ৪১½ 'সিকন্দারী' মুদ্রার (ব্যাসের) সমান। হুমায়ুন পরে এই দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে ৪২ করেন। শেরশাহ্ এবং ইসলাম শাহের আমলেও এই গজের ব্যবহারই চলতে থাকে। বলা হয় যে গোটা হিন্দুস্থানকে 'জব্‌ৎ'-এর আওতায় আনার সময় তাঁরা "এই 'গজ' দিয়েই পরিমাপ করেছিলেন।"[১] আকবরের আমলের ৩১-তম বা ৩৩-তম বছর অবধি এটিই ছিল সরকারী মাপ, শেষ পর্যন্ত এর জায়গায় 'গজ-এ ইলাহী' চালু করা হয়।[২]

টমাস খুব যত্ন করে মেপে দেখেছিলেন যে, একটা সারিতে পরপর সিকন্দারী মুদ্রা রাখলে "আমাদের মাপের ৩০ ইঞ্চি পড়বে ৪২-তম মুদ্রাটির কেন্দ্রের ঠিক উল্টো দিকে।" এর থেকে ব্যাপারটা দাঁড়ায় ৪২ 'সিকন্দারী'=৩০.৩৬ ইঞ্চি। কিন্তু মুদ্রাগুলো মোটামুটি গোল হলেও, কখনোই পুরোপুরি গোল ছিল না, তাই এগুলো নিয়ে পরীক্ষা চালানোয় ভুলের মাত্রা স্পষ্টতই খুব বেশি হয়েছিল। তা ছাড়া, টমাস নিজেই স্বীকার করেছেন যে, চারশ বছর ধরে মুদ্রাগুলোর যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে সেটাও হিসেবে ধরলে, 'গজে'র দৈর্ঘ্য বাস্তবিকই আরও বেশি হওয়া সম্ভব।[৩]

১. 'আইন', ১ম খণ্ড, ২৯৬। শেরশাহের আমলের 'মদদ-এ মআশ' অনুদান সংক্রান্ত তিনটি নথিতে চুক্তি করা হয়েছে যে, অনুদানের এলাকা জরিপ করা হবে 'গজ-এ শেরশাহী'তে (Allahabad 318, অন্য ২টি নথির বিষয়বস্তু, আলোকচিত্র-প্রতিলিপি সমেত, ছাপা হয়েছে 'ওরিয়েণ্টাল কলেজ ম্যাগাজিন', ৯ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা (মে, ১৯৩৩), পৃ. ১২১-২২, ১২৫-২৮-এ) শের শাহ্ সম্ভবত 'গজ' দৈর্ঘ্যে সামান্য কিছু পরিবর্তন করেছিলেন, তাই তাঁর নিজের নামে 'গজ-এ সিকন্দারী'র নাম দিতে পেরেছিলেন 'গজ-এ শেরশাহী'।

২. 'আইন', ১ম খণ্ড, ২৯৬। 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, ৫২৯-এ বলা হয়েছে যে, 'গজ-এ ইলাহী' চালু করা হয়েছিল ৩৩-তম বছরে, 'আইন'-এর কথা অনুযায়ী ৩১-তম বছরে নয়।

৩. প্রিন্সেপ, 'ইউস্‌ফুল টেবল্‌স্', সম্পা. টমাস, পৃ. ১২৩-২৪ টীকা। সিকন্দার লোদীর আমলের যেসব মুদ্রার কথা জানা আছে তার তালিকা তৈরি করেছেন এইচ. এন. রাইট তাঁর 'কয়েনেজ অ্যাণ্ড মেট্রোলজি অফ দা সুলতানস্ অফ দিল্লী', পৃ. ২৫০-৫৪-য়। আবুল ফজল বলেছেন যে 'সিকন্দারী' ছিল "রূপো মেশান তামার মুদ্রা"। অবশ্য, সিকন্দারের মুদ্রার বেশির ভাগই ছিল আরও ভারী ধরনের। সেগুলোর কথাই এখানে বলা হয়েছে। রাইট-এর তালিকায় আলাদা আলাদা মুদ্রার মাপ দেওয়া আছে ইঞ্চিতে, দশমিকের প্রথম ঘর পর্যন্ত

আবুল ফজলও বলেছেন যে হুমায়ুনের 'গজ-এ সিকন্দারী' ছিল ৩১ 'অঙ্গুশ্‌ৎ' (তর্জনী)-র[৪] সমান। 'গজ-এ ইলাহী'র দৈর্ঘ্য ছিল ৪১ আঙুল, তাই এর থেকে মনে হবে প্রথমটি ছিল দ্বিতীয়টির ⅘ ভাগের চেয়ে সামান্য ছোট। যদিও কোন কোন আধুনিক পণ্ডিত[৫] এ কথা মেনে নিয়েছেন, তবু প্রায় নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, ৩২ সংখ্যাটি ভুল করে লেখা হয়েছে। তার কারণ: এটি যে অনুপাত নির্দেশ করে ('গজ-এ সিকন্দারী'র বিঘা এবং 'গজ-এ ইলাহীর' বিঘার পার্থক্য নির্দেশ প্রসঙ্গে), আবুল ফজল নিজে একেবারেই তার উল্টো কথা বলেছেন।

প্রথমে তিনি বলেছেন যে, ১৯-তম বছরে বাঁশের মাপনী চালু হওয়ার আগে, বিঘা-র মাপ তার সঠিক দৈর্ঘ্যের চেয়ে শতকরা ১৩ ভাগ কম হতো, কারণ শণের দড়ি কুঁচকে ছোট হয়ে গিয়ে ৬০ গজ থেকে ৫৬ গজ হয়ে যেত।[৬] দ্বিতীয় পরিবর্তন আসে 'গজ-এ ইলাহী' চালু হলে। যদি ধরে নিই নতুন এবং বাতিল বিঘার পার্থক্য প্রসঙ্গে

নিকটতম অঙ্কে, কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে, দ্বিতীয় ঘরে ৫ পর্যন্ত। সুতরাং, টমাস-এর মাপের সঙ্গে এগুলো মোটামুটিভাবে পরখ করা যায়। টমাস-এর মাপা মুদ্রাগুলির ব্যাসের গড় দৈর্ঘ্য নিশ্চয়ই ছিল ·৭২৩ ইঞ্চি। এখন, সিকন্দারের গোড়ার দিকের কয়েকটি মুদ্রার ব্যাস যদিও ·৬৫ ইঞ্চি, এবং একটি এমন কি ·৬ ইঞ্চি, হিজরী ৯০০ থেকে তার পরবর্তী সময়ে রাইট-এর তালিকায় দেওয়া মুদ্রাগুলির ব্যাস সর্বত্রই ·৭ ইঞ্চি। মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায়—তখন তার ব্যাস ·৭৫। তাই, মনে হয়, টমাস-এর 'সিকন্দারী'গুলো প্রমাণ আকারের খুবই কাছাকাছি ছিল।

৪. 'আইন', ১ম খণ্ড, ২৯৬।

৫. যেমন, প্রিন্সেপ, 'ইউসফুল টেবল্‌স্‌', সম্পা. টমাস, পৃ. ১২৩, কিন্তু তুলনীয় টমাস-এর টীকা, পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ ১২৪।

৬. প্রথমবার দেখে মনে হয় বিবৃতিটি অযৌক্তিক ও মনগড়া! প্রত্যেক দড়িই নিশ্চয়ই সমহারে ৬০ গজে ৪ গজ করে কমে যেত না। একটু আগেই আবুল ফজলের নিজেরই মন্তব্য, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৬ তুলনীয়। এর ব্যাখ্যা অবশ্য পাওয়া যায় ১৭৫৭ খৃস্টাব্দের একটি পরওয়ানা থেকে। এখানে বতালা পরগনার একটি 'মদদ-এ মআশ' অনুদান বহাল করা হয়েছে। অনুদানটি আসলে দেওয়া হয়েছিল ১৫৬৯ খৃস্টাব্দে। মূল নথির (I.O. 4438 : (55)) পৃষ্ঠলেখটিও এতে দেওয়া আছে। পৃষ্ঠলেখ থেকে দেখা যায়, প্রথমে মঞ্জুর হয়েছিল ৩০০ বিঘা। কিন্তু পরপর তিনবার এই এলাকা কমানো হয়। প্রথমবার কমানোর সময় বলা হয়েছিল, "জরিপের দণ্ড ছোট হয়ে যাওয়ার দরুন কমানো" ('কুসুর-এ তনাব')। এর পরিমাপ দাঁড়িয়েছিল ৩৯ 'বিঘা' দুই 'বিশ্বা' অর্থাৎ, মূল অনুদানের ঠিক ১৩·০৩%। তাই মনে হয়, নতুন 'তনাব' চালু করার আগেই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে জরিপ করলে আসল 'বিঘা'র পরিমাণ বেড়ে যাবে। প্রাপকরা যাতে সুবিধা নিতে না পারে, তাই এই বৃদ্ধি সামাল দেওয়ার জন্য, বা তারও বেশি কিছু করার জন্য তাদের (প্রাপকদের) অনুদানের মোট এলাকা কমানোর ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট মাপ ধার্য করা হয়। এই হারটি আবুল ফজল এখান থেকেই ধার নিয়েছেন। এর থেকে তিনি শুধু বাদ দিয়েছেন একটা নগণ্য ভগ্নাংশ, যা দিয়ে আসলে কেবলমাত্র ঐ বিশেষ অঞ্চলের ক্ষেত্রে কোন সূক্ষ্ম পরিবর্তন বোঝাতে পারে।

আবুল ফজল প্রথমটির হিসেবে দিয়েছেন, তা হলে দ্বিতীয় এককের ১০০ বিঘা 'গজ-এ ইলাহী'র ৯০.৮২৬ বিঘার সমান হবে।[৭] তার মানে, রৈখিক দূরত্বের ১০০ 'গজ-এ সিকন্দারী ছিল ৯৫.৩ 'গজ-ইলাহী'র সমান।

'গজ-এ ইলাহী' চালু করার ফলে বিঘার মাপে যে রদবদল হয় সে সম্বন্ধে আবুল ফজলের বিবৃতির নিশ্চিত সমর্থন পাওয়া যায় অসংখ্য 'মদদ-এ মআশ' নথির পৃষ্ঠলেখ থেকে। সেখানে দেখা যায় যে বিশেষ করে নতুন মাপ চালু হওয়ার ফলে অনুদানের এলাকা কমে গেছে। আবুল ফজল লিখেছিলেন এলাকা কমেছে শতকরা ১০.১ ভাগ, কিন্তু আসলে কমে যায় মূল এলাকার শতকরা ১০.৫ থেকে ১০.৬ ভাগ।[৮] এই সব হেরফেরের কারণ বোধ হয় এই যে, বিভিন্ন এলাকার অনুদান কমানোর ক্ষেত্রে যেসব হার অনুমোদিত হয়েছিল সেগুলো হতো প্রামাণ্য হারের চেয়ে সামান্য কম। তা ছাড়া দু-এর তফাৎ খুবই কম। অনুদানগুলোর এলাকা যেটুকু কমেছিল, তার থেকে হিসেব করলে 'গজ-এ সিকন্দারী'র অঙ্কে 'গজ-এ ইলাহী'র যে-রৈখিক দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়, আবুল ফজলের অঙ্কগুলোর ভিত্তিতে হিসেব করলে সেই দৈর্ঘ্য আগেরটির তুলনায় অতি সামান্যই কম হবে।[৯]

৭. 'আইন', ১ম খণ্ড, ২৯৭। পুরো অংশটির পাঠ এই রকম: "শণের দড়ি ('তনাব-এ শণ') দিয়ে মাপা এক 'বিঘা', বাঁশের দণ্ড (তনাব) দিয়ে মাপা এক বিঘার চেয়ে দুই 'বিশ্বা এবং বারো 'বিশবান্‌সা' কম হতো। আর প্রতি একশ 'বিঘা'য় এই ফারাক দাঁড়ায় ১৩ 'বিঘা'। যদিও শণের দড়ি আসলে ছিল ষাট গজ লম্বা, তবুও পাকানো হলে কমে দাঁড়াত (মাত্র) ছাপান্ন গজ। আর 'গজ-এ ইলাহী' (-র বিঘা) ছিল 'গজ-এ সিকন্দারী'র (চেয়ে) এক 'বিশ্বা' ষোল 'বিশবান্‌সা', তের 'তাসওয়ানসা', আট 'তাপওয়ানসা' ও চার 'আন্‌স্‌-ওয়ানসা' বড়। দুবার কমানোর ফলে এক বিঘা থেকে তফাৎ দাঁড়ায় চোদ্দ (তাই আছে! চার) 'বিশ্বা', কুড়ি (তাই আছে! আট। ফার্সী লেখায় প্রায়ই হস্‌ৎ (৮) এবং 'বিস্‌ৎ' (২০) গুলিয়ে যায়) 'বিশ্‌বানসা', তের 'তাসওয়ানসা', আট 'তাপওয়ানসা', চার 'অন্‌স্‌ওয়ান্‌সা'।"

৮. ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত, I.O. 4438: No. 7, 25 এবং 55. বতালা সিরিজের এই নথিগুলোর পৃষ্ঠলেখ থেকে দেখা যায় দু-এর তফাৎ দাঁড়িয়েছিল শতকরা ১০·৫ ভাগ ('কুস্‌র-এ তফাওয়াৎ-এ গজ-এ ইলাহী')। Allahabad 1177-এর পৃষ্ঠলেখ এবং Allahabad 789-এর মূলপাঠে দেখা যায় "তফাওয়াৎ-এ গজ এ ইলাহী'র বাদদে কমেছে শতকরা ১০·৬ ভাগ। এই দুটি নথিই বাহ্‌রাইচ পরগনা সংক্রান্ত। Allahabad 1177-এর আরেকটি পৃষ্ঠলেখে তফাতের পরিমাণ দেওয়া হয়েছে শতকরা ১১·৫। কিন্তু এটি যে ব্যতিক্রমের ঘটনা তা দেখা যায় এই মন্তব্য থেকেই: "মুজফ্‌ফর খানের 'পরওয়ানচা' (আদেশ) অনুযায়ী" এটি কমানো হয়েছিল। লখনউ 'সরকার'-এর উনাম্‌ (উনাও) পরগনা সংক্রান্ত নথি Allahabad 154-য় বলা আছে যে শণের দড়ি ('তনাব-এ শণ') দিয়ে জরিপ-করা 'বিঘা'র চেয়ে 'গজ-এ ইলাহী'তে জরিপ করা 'বিঘা'র পরিমাণ সব মিলিয়ে কমে গিয়েছিল শতকরা ২৩·০০ ভাগ।

৯. 'বিঘা'র আয়তন শতকরা ১০·৫ ভাগ কমে যাওয়ার অর্থ এই যে, ১০০ 'গজ-এ সিকন্দারী' ছিল ৯৪·৬০৫ 'গজ-এ ইলাহী'র সমান। কিন্তু আবুল ফজলের কথা অনুযায়ী শেষের অঙ্কটি হবে ৯·৫৩।

এইভাবে প্রতিষ্ঠিত দুটি দৈর্ঘ্যের পরিমাপের অনুপাত দাঁড়ায় প্রায় ঠিক ৪১:৩৯।[১০] 'গজ-এ ইলাহী'র দৈর্ঘ্য ৪১ আঙুলের সমান হলে, 'গজ-এ সিকন্দারী'র দৈর্ঘ্য হবে ৩৯ আঙুল। তা হলে এই পরিমাপের ক্ষেত্রে আবুল ফজল আসলে ৩৯ আঙুলের জায়গায় ভুল করে ৩২ লিখেছিলেন।

দুটি পরিমাপের মধ্যে এই অনুপাতের ভিত্তিতে হিসেব করলে, টমাস যে 'গজ-এ সিকন্দারী'র দৈর্ঘ্য বার করেছিলেন তার থেকেই 'গজ-এ ইলাহী'র দৈর্ঘ্যও পাওয়া যাবে। দৈর্ঘ্য হবে ৩১.৯২ ইঞ্চি ('গজ-এ ইলাহী'র ক্ষেত্রে)। কিন্তু টমাস তাঁর মুদ্রাগুলোর ক্ষয়-ক্ষতিকে হিসেবে ধরেন নি। আমরা, তাই অনুমান করতে পারি যে গজের দৈর্ঘ্য আসলে এর চেয়ে সামান্য কিছু বেশি হতো।[১১] অন্যান্য সাক্ষ্য থেকে এই দৈর্ঘ্যের নিশ্চিত সমর্থন পাওয়া যায় কিনা—পরের অংশে আমরা তা দেখার চেষ্টা করব।

২. গজ-এ ইলাহী

'গজ-এ ইলাহী'র সঠিক দৈর্ঘ্য নিয়ে বিতর্কের ইতিহাস প্রায় ১৪০ বছরের। গত শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকের গোড়ার দিকে বৃটিশ সরকারের কাজে বিভিন্ন ধরনের লাখেরাজ জমির এলাকা স্থির করার জন্য এই দৈর্ঘ্য খুঁজে বের করার বিষয়টি কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বর্তমান উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল জরিপ করার সময়ে এসব জমির সন্ধান পাওয়া যায়। অবশেষে ১৮২৫-২৬ সালে সরকার থেকে ঘোষণা করা হয় যে 'গজ-এ ইলাহী'কে ৩৩ ইঞ্চির সমান ধরা হবে। এই সিদ্ধান্ত অনেকটাই খেয়ালখুশি মতো নেওয়া হয়। তার অন্তত আংশিক কারণ এই যে, এই দৈর্ঘ্যের এক 'গজে'র ভিত্তিতে যে 'বিঘা', তাকে একরের হিসেবে নিয়ে আসতে সুবিধা হয়।[১] প্রশাসনিক দিক থেকে তাৎপর্য চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলতি ঘটনা হিসেবে বিষয়টি সম্পর্কে আগ্রহও হারিয়ে যায়। সেই থেকে শুধু মাঝে মধ্যে কিছু প্রবন্ধ বা প্রস্তাবে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই সংক্রান্ত সমসাময়িক নজিরগুলো ঠিকমতো বিচার করা হয়েছে বলে মনে হয় না। কিছু আধুনিক পণ্ডিতও তাই 'গজ-এ ইলাহী' ও তার পাশাপাশি অন্যান্য কয়েকটি পরিমাপের এককের মধ্যে ঠিকমতো তফাৎ করেননি বলেই মনে হয়। পরের পাতাগুলো লেখার সপক্ষে একটা যুক্তি হিসেবে হয়তো এ কথা গ্রাহ্য হতে পারে, না হলে পুরোটাই চর্বিতচর্বণ মনে হবে।

১০. ৪১ : ৩৯ অনুপাতের মানে দাঁড়াবে এই যে ৯৫.১২২ 'গজ-এ ইলাহী' (তুলনীয় : আবুল ফজল এবং 'মদদ-এ মআশ' নথিপত্র অনুযায়ী ৯৫.৩ এবং ৯৪.৬) ছিল ১০০ 'গজ-এ "সিকন্দারী'র সমান।

১১. উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মার্শাল (পৃ. ৪২০)-ই একমাত্র ইউরোপীয় পর্যটক যিনি সরাসরি 'গজ-এ সিকন্দারী'র উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, সিকন্দারীর গজ, যাকে 'কার্পেট গজ' বলা হতো" এবং এর দৈর্ঘ্য দিয়েছেন ২৭ ৭/৮ ইঞ্চি, আর তাঁর দেওয়া 'গজ-এ ইলাহী'র দৈর্ঘ্য ৩১ ১/৮ ইঞ্চি। কিন্তু মার্শাল এ কথা লিখেছিলেন আওরঙ্গজেবের আমলে, তাই দুটি মাপের নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য-বিষয়ে তাঁর সাক্ষ্যের খুব একটা মূল্য নেই।

১. তুলনীয় প্রিন্সেপ, 'ইউস্‌ফুল টেবল্‌স্‌', সম্পা. টমাস, পৃ. ১২৫।

'গজ-এ ইলাহী'র দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে আবুল ফজল শুধু এইটুকু আভাস দিয়েছেন যে এটি ছিল ৪১ 'অঙ্গুশ্‌ৎ' বা আঙুলের প্রস্থের সমান।[২] দুর্ভাগ্যবশত ভারতে আঙুলের কোন ধরাবাঁধা দৈর্ঘ্য নেই।[৩] আসল আঙুলের মাপ নিয়ে তার গড় করলে সেটা বড় জোর মুঘল প্রশাসন বা 'আইন'-এর একটা মোটামুটি নির্দেশ দিতে পারে।[৪]

অবশ্য ১৭ শতকের গোড়ার দিকের দুটি অস্পষ্ট বিবৃতি পাওয়া যায়, যাতে ইউরোপীয় পরিমাপের এককে (যার মান ঐ পর্ব জুড়ে একই ছিল) 'গজ-এ ইলাহী'র দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে। ১৬২০-২১ সালে পাটনা থেকে লেখার সময় রবার্ট হিউজেস বলেছিলেন যে, "আগ্রার ইলাহী" "জাহাঙ্গীর কোভেদ"-এর ৪/৫ ভাগ। "জাহাঙ্গীর কোভেদ"-এর দৈর্ঘ্য এক জায়গায় বলা হয়েছে ৪০.৫ ইঞ্চি, আরেক জায়গায় ৪০ ইঞ্চি।[৫] তা হলে 'গজ-এ ইলাহী'র দৈর্ঘ্য হয় ৩২ ইঞ্চি, নয়তো ৩২.৪ ইঞ্চি। কিন্তু হিউজেস নিজেই একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন যে আসলে এটি ছিল ৩২১/৮ বা ৩২.১২৫ ইঞ্চি।[৬]

২. 'আইন', ১ম খণ্ড, ২৯৬।

৩. ইংরেজি পদ্ধতির গুনতিতে ৪১ আঙুল ৩০.৭৫ ইঞ্চির সমান। প্রিন্সেপ যদিও সাময়িক-ভাবে এটি মেনে নিয়েছেন (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১২৪) এবং তাঁকে অনুসরণ করেছেন মোরল্যাণ্ড ('জার্নাল অফ দি ইউ. পি. হিস্টরিক্যাল সোসাইটি', ২য় খণ্ড (১৯১৯), ১ম ভাগ, পৃ. ১৭), তা হলেও ঐ পদ্ধতি এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

৪. ভারতের তৎকালীন মহা-পরিমাপক (সার্ভেয়ার-জেনারেল) কর্নেল এ. হজসন 'গজ-এ ইলাহী'র দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করার চেষ্টা করেন। "ফতেগড়ে তিনি ছিয়াত্তর জন বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের ডান হাতের চারটি আঙুলের প্রস্থ মেপেছিলেন।" এর গড় ফল দাঁড়িয়েছিল: মাঝখানের গাঁট বরাবর মাপলে ৪১ আঙুলের প্রস্থ হবে ৩১.৫৪৯ ইঞ্চির সমান, আর আঙুলের গোড়ার গাঁট বরাবর মাপলে ৩৩.০১৮ ইঞ্চি (হজসন, 'মেমোয়ার অন দা লেংথ অফ দা ইলাহী গজ', *JRAS*, ১৮৪৩, পৃ. ৪৫-৪৯)। "ছটি বার্লি-দানাও সাধারণত এক আঙুলের সমান বলে মনে করা হতো।" মুরাদাবাদে হ্যালহেডও এগুলো নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন এবং গড় পেয়েছিলেন ৪১ আঙুলে ৩১.৮৪৩ ইঞ্চি (ঐ, পৃ. ৪৯-৫০)। 'আইন'-এ বলা হয়েছে যে "কেউ কেউ" মনে করতেন "ছটি মাঝারি আকারের বার্লি দানা প্রস্থ বরাবর রাখলে" এক 'অঙ্গুশ্‌ৎ'-র সমান হবে (১ম খণ্ড, ২৯৫, ৫৯৭)। আর হিন্দ্‌-এর জ্ঞানীদের মতে "খোসা ছাড়ানো আটটি বার্লি-দানা প্রস্থ বরাবর রাখলে" দৈর্ঘ্য হবে ১ আঙুল (১ম খণ্ড, ৫৯৮)।

পরিমাপের জন্য হ্যালহেড আরেকটি উপায় ব্যবহার করেছিলেন। "৪২টি মুদ্রদানায় একগজ বলে ধরা হয়: তার থেকে হিসেব দাঁড়ায় ৩২.০২৫ ইঞ্চি (*JRAS*, ১৮৪৩, পৃ. ৫০)। আবুল ফজলের বিবৃতিগুলোকে ভুল বুঝে বোধহয় কাজটি করা হয়েছিল। 'আইন'-এ ৪২ 'সিকন্দারী' মুদ্রার দৈর্ঘ্য দেওয়া হয়েছে হুমায়ুনের আমলে পরিবর্তিত 'গজ-এ সিকন্দারী'তে, 'গজ-এ ইলাহী'তে নয়। সুতরাং, পরীক্ষার জন্য যেসব মুদ্রা ব্যবহার হয়েছিল সেগুলোও ঠিক মুদ্রা নয়।

৫. 'ফ্যাক্টরিস্‌, ১৬১৮-২১', পৃ. ১৯২, ১৯৭, ২৩৬।

৬. ঐ, পৃ. ২৩৬। সুরাটের কুঠিয়ালদের চিঠির উত্তরে হিউজেস দেখিয়েছিলেন যে এখানকার "জাহাঙ্গীরী কোভেদ" ছিল ৪০ ইঞ্চি, ৩২১/২ ইঞ্চি (তাদের চিঠিতে যেমন বলা হয়েছে) নয়।

এর ছ বছরের মধ্যেই পেলসার্ট লেখেন যে "১০০ আকবরী গজ আমাদের (অর্থাৎ ওলন্দাজদের) ১২০ 'এল'-এর সমান।"[৭] তার মানে এর দৈর্ঘ্য ছিল ৩২.১২৬ ইঞ্চি। তা হলে দুটি সূত্রের মধ্যেই খুব মিল আছে। ব্যাপারটার তাৎপর্য আরও বেশি, কারণ গোড়ার দিকেই ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে এ'রাই স্পষ্ট করে গজ-এর উল্লেখ করেছেন।[৮] সে সময়ে প্রচলিত অনামা 'কোভেদ' বা 'এল' সম্বন্ধে অন্যান্য যেসব উল্লেখ আছে, সেগুলোতে কোন মতেই 'গজ-এ-ইলাহী'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে স্বীকার করা যায় না।

বলা হয়েছে, ১৬১৪ সালে মুঘল-অধিকৃত অঞ্চলে কাপড়ের ব্যবসায় সাধারণভাবে দুটি 'কোভেদা' বা পরিমাপ চালু ছিল। একটি ৩৩ ইঞ্চির, অন্যটি ২৭ ইঞ্চির। ১৬১৬ সালে আগ্রা এবং আজমীর থেকে লেখার সময়ে সলব্যাঙ্ক ও ফেটিপ্লেস এক-এক 'কোভাদো'র কথা বলেছেন, যা দিয়ে দরবারে এবং সাধারণ বাজারে তাঁর কাপড় বেচা হতো। তার দৈর্ঘ্য ছিল ইংরেজি গজের $\frac{7}{8}$ ভাগ বা ৩১.৫ ইঞ্চি।[৯] জাহাঙ্গীরের স্মৃতিকথার একটি বিবৃতির সঙ্গে মিলিয়ে এটি পড়া উচিত। যেখানে ১৩-তম বছরে 'গজ-এ ইলাহী'কে ৪০ 'অঙ্গুশ্‌ৎ'র[১০] সমান বলা হয়েছে। 'আইন' লেখার সময় থেকে 'গজ-এ ইলাহী'র দৈর্ঘ্য এক আঙুল কমে যাওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। তা হলেও মনে হয় জাহাঙ্গীর সম্ভবত খুব ভেবেচিন্তে এই দৈর্ঘ্যের কথা বলেন নি। আসলে এটি ছিল আলাদা, যদিও প্রায় সমান, অন্য কোন একক। শাহ্‌জাহানের আমলের দশম বছরে লেখার সময়, আগ্রার কয়েকটি বিশেষ বাড়ির মাপ দিতে গিয়ে লাহোরী এই ৪০ আঙুল দূরত্বকে 'গজ-এ ইলাহী' বলেননি, তিনি একে বলেছেন 'জিরা-এ পাদশাহী' বা বাদশাহী গজ।[১১] সম্ভবত এই 'জিরা'র সঙ্গে সলব্যাঙ্ক এবং ফেটিপ্লেস-এর অনামা 'কোভাদো'-র কে এক করে দেখা উচিত। এ কথা ঠিক

ঐ কুঠিয়ালদের কাজে লাগবে বলে হিউজেসকে এর আগেও একবার 'গজ-এ ইলাহী' ও 'জাহাঙ্গীরী'র তফাৎ করতে হয়েছিল (পৃ. ১৯২)। হয়তো একক দুটি আবার গুলিয়ে গিয়েছিল।

৭. পেলসার্ট, পৃ. ২৯। ডাচ 'এল'-এর দৈর্ঘ্যের জন্য দ্রষ্টব্য মোরল্যাণ্ড, 'রিলেশনস্ অফ গোলকুণ্ডা', পৃ. ৮৮।

৮. গোটা ১৭ শতকে আর একজনমাত্র পর্যটক স্পষ্ট করে এই 'গজ'টির মান লিখে গেছেন: তিনি হলেন মার্শাল। তিনি বলেছেন "৩১$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি আকবর গজ, যাকে 'টেলার্স (দরজীর) গজ' বলা হতো" তার কথা (পৃ. ৪২০)। মূল এককের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে তাঁর এই মন্তব্য অনেক পরেকার, তাই একে ঠিক প্রামাণিক উৎস বলে ধরা যায় না। খুব সম্ভব তিনি যা দেখেছিলেন তা ঠিক আসল 'গজ-এ ইলাহী' নয়, এটি কমিয়ে বা অদলবদল করে কোন বিশেষ ব্যবসার উপযোগী 'গজ'।

৯. 'লেটার্স রিসিভ্‌ড্', ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩১ এবং ২৩৮।

১০. 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ২৩৪।

১১. লাহোরী, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, ২৩৭। 'জিরা', 'দিরা' এবং 'গজ'—এই তিনটি শব্দই পরস্পর পরিবর্তনযোগ্য।

যে 'কোভাদো' এবং হিউজেস ও পেলসার্ট-এর দেওয়া 'গজ-এ ইলাহী'র দৈর্ঘ্যের মধ্যে $\frac{1}{81}$ ভাগের চেয়ে সামান্য কম তফাৎ আছে ; কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, ইউরোপীয় মাপের সমতুল্য মাপগুলো একেবারে সঠিকভাবে না দিয়ে বরং মোটামুটি-ভাবে দেওয়া হয়েছে এবং এই সামান্য ভগ্নাংশের তফাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

লাহোরী বিস্তারিতভাবে তাজমহলের পরিমাপ দিয়েছেন। তার থেকে বোধহয় আরও সুনির্দিষ্ট উপায়ে 'জিরা-এ পাদশাহী'র দৈর্ঘ্য বার করা যায় (এবং তার থেকে অবশ্যই 'গজ-এ ইলাহী'র দৈর্ঘ্যও বার করা যাবে)। তিনি এগুলো লিখে গেছেন তাঁর পৃষ্ঠপোষকের রাজত্বের ১৫-তম বছরে, যে বছর তাজমহল তৈরী শেষ হয়, যদিও এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল তাঁর রাজত্বের পঞ্চম বছরের গোড়ার দিকে।[১২] মাপগুলো দেওয়া আছে শুধুমাত্র 'জিরা'য়, তার পরিমাপ ঠিক নির্দিষ্ট করে বলা নেই। কিন্তু মনে হয় এটি ৪০ আঙুলের সেই একক, যেটি শাহ্‌জাহানের রাজত্বের দশম বছরে আগ্রার অন্যান্য বাড়ির পরিমাপ বর্ণনা করতে গিয়ে লাহোরী ব্যবহার করেছিলেন। যদিও ১৫-তম বছরে এই মাপগুলো দেওয়া হয়েছে, তা হলে এগুলো নিশ্চয়ই দশ বছর আগে করা মূল নকশার অনুযায়ী মাপ। মার্বেলের উঁচু চাতালটির যে-আয়তন দেওয়া আছে (১২০ × ১২০ 'জিরা', বা পুরো চার বিঘা) তার থেকেই বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যায়। যাঁরা নকশা করেছিলেন তাঁদের মাথায় অবশ্যই এই আয়তনটি ছিল, কিন্তু মূল নকশার অঙ্কগুলোকে অন্য কোন এককে এনে হিসেব করলে ঠিক এই আয়তন পাওয়া শক্ত হতো।

১৮২৫ সালে কর্নেল এ. হজসন ও তাঁর সহকারীরা তাজমহলের তুলনামূলক পরিমাপ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে মার্বেলের উঁচু চাতালটির পরিমাপের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক, আর তুলনা করার পক্ষেও সবচেয়ে সহজ : এই পরিমাপের ফলে 'জিরা'র গড় দৈর্ঘ্য পাওয়া যায় ৩১.৪৫৬ ইঞ্চি, আর নীচের লাল পাথরের চাতালটির ক্ষেত্রে গড় দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ৩১.৪৬৪ ইঞ্চি।[১৩] যদি ধরে নেওয়া

১২. লাহোরী, ২য় খণ্ড, ৩২২-২৯।

১৩. হজসন-এর যাবতীয় পরিমাপ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে তাঁরই লেখা "মেমোয়ার অন দা লেংথ অফ দি ইলাহী গজ অর ইম্পিরিয়াল ল্যাণ্ড মেজার অফ হিন্দুস্তান", *JRAS*, ১৮৪৩, পৃ. ৪৫-৫৩-য়। তিনি মনে করতেন, তাজে ব্যবহৃত 'জিরা', ছিল 'গজ-এ ইলাহী'র 'জিরা', কারণ ৪০ আঙুলের 'জিরা'র কথা তাঁর বোধহয় জানা ছিল না। তিনি অবশ্য লাহোরীর (২য় খণ্ড, ৫৩৯, ৭০৯) উল্লিখিত ১৯-তম এবং ২০-তম বছরের ৪২ আঙুলের এককের কথা জানতেন। কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল এই যে, 'অঙ্গুশ্‌ৎ'-এর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চূড়ান্ত দৈর্ঘ্যের কোন পরিবর্তন হয় নি, শুধু প্রত্যেক 'অঙ্গুশ্‌ৎ'-এর দৈর্ঘ্য আনুপাতিক হারে কিছুটা কমে যায়। তাঁর পরিমাপের যে ফলগুলো আগে প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলো বোধহয় আরও বড় দৈর্ঘ্যের কোন 'জিরা'র নির্দেশক (তুলনীয় প্রিন্সেপ, 'ইউস্‌ফুল টেবল্‌স্‌', সম্পা. টমাস, পৃ. ১২৫)। এর উত্তরে ডব্ল্যু. ক্র্যাক্রফ্‌ট্‌ একটি লেখা পাঠান ("অন দা মেজারমেণ্ট অফ দি ইলাহী গজ অফ দি এম্পারার আকবর", *JASB*, ১৮৪৩, পৃ. ৩৬০-৬১)। তিনি জানান যে, তাজের 'কুরসী' বা উঁচু চাতালটির মার্বেলের টালিগুলো মাপজোক করে তাঁর

যায় যে এই অঙ্কগুলো ৪০ আঙুল 'জিরা-এ পাদশাহী'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা হলে 'গজ-এ ইলাহী'র দৈর্ঘ্য ৪১ আঙুল হলে এর দৈর্ঘ্য ধরতে হবে ৩২.২৪২ ইঞ্চি।

১৭৪৭-৪৮ সালে ইংরেজ কুঠিয়ালদের চিঠি থেকে দুটি বিবৃতি পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে যে, ১৬৪৭ সালে শাহ্‌জাহান "আগ্রা কোভেট"-এর দৈর্ঘ্য "অন্ততপক্ষে" শতকরা ২½ ভাগ কমিয়ে দেন, যার ফলে এটি "লাহোর কোভেট"[১৪]-এর সমান হয়ে যায়। এখন এর দৈর্ঘ্য "এক গজ-এর ঠিক ⅞ ভাগ বা ৩২ ইঞ্চি।"[১৫] দশম বছরে যে-পরিবর্তনের কথা লাহোরী উল্লেখ করেছেন, মোরল্যাণ্ড তার সঙ্গে এর যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর মতে, শাহ্‌জাহান এক নতুন একক চালু করেন। 'গজ-এ ইলাহী'র চেয়ে এটি ছিল এক আঙুল ছোট। শেষ পর্যন্ত ১৬৪৭ সালে আগ্রার বাজারে এই এককই চালু করা হয়। সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্ত: "আগ্রা কোভেট"-এর বদলেই যখন তার সঙ্গে অভিন্ন 'গজ-এ ইলাহী' এল, তাই এরও দৈর্ঘ্য ছিল ৩২.৮ ইঞ্চি।[১৬] অবশ্য, আমরা আগেই দেখেছি যে ৪০ আঙুলের 'জিরা' শাহ্‌জাহানের আবিষ্কার নয়। উপরন্তু, যে-সময়ে আগ্রাতে ঐ পরিবর্তন হয়েছিল বলা হয়, ততদিনে 'জিরা-এ পাদশাহী'ও সম্ভবত বেড়ে হয়ে গিয়েছিল ৪২ আঙুল।[১৭] এ কথা ঠিক যে এই নতুন দৈর্ঘ্যের উল্লেখ আছে শুধুমাত্র পথের দূরত্ব প্রসঙ্গে, কিন্তু পুরনো ৪০ আঙুলের একক ও এই নতুন এককের নাম ছিল একই, তাই খুব সম্ভবত যেসব ক্ষেত্রে পুরনো এককটি ব্যবহার করা হতো, নতুনটিরও ব্যবহার ছিল সেই সেই ক্ষেত্রে। তাই যদি হয়, তা হলে এটি নিশ্চয়ই ১৬৪৭ সাল নাগাদ আগ্রাতেও চালু ছিল এবং ঐ বছরের পরিবর্তনের সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা একমাত্র এই হতে পারে যে বাজারের (প্রশাসনিক নয়) এককের মাপ শতকরা ২½ ভাগ, বা ৪২ আঙুল থেকে ৪১ আঙুল (অর্থাৎ, ঠিক 'গজ-এ ইলাহী'র দৈর্ঘ্য) কমানো হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে, মোরল্যাণ্ড যে মত দিয়েছেন, ঠিক তার উল্টোটাই ঘটেছিল বলে মনে হয়, এবং কুঠিয়ালদের কথা অনুযায়ী হিসেব করলে 'গজ-এ ইলাহী'র দৈর্ঘ্য হয় ৩২ ইঞ্চি, ৩২.৮ ইঞ্চি নয়।[১৮]

দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে 'গজ'-একক বা তার কোন গুণিতকের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্যই সেগুলো ঐ মাপে কাটা হয়। আর এইভাবে 'গজ'-দৈর্ঘ্যের যে গড় তিনি পেয়েছিলেন সেটি ৩২ ইঞ্চির চেয়ে সামান্য এক ভগ্নাংশ মাত্র কম।

১৪. 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬৪৬-৫০', পৃ. ১২২।

১৫. ঐ, পৃ. ১৯০।

১৬. ডব্লু. এইচ. মোরল্যাণ্ড, "দা মুঘল ইউনিট অফ মেজারমেন্ট", *JRAS, N.S.* ১৯২৭ পৃ. ১২০ ১২১।

১৭. লাহোরী, ২য় খণ্ড, ৫৩৪, ৭০৯ (১৯-তম ও ২০-তম বছরে)।

১৮. আনুমানিক ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে লেখার সময় ভান ট্যুইস্ট বলেছিলেন যে, গুজরাটে "দুটি আলাদা 'এল' ব্যবহার করা হয়: বড়টি হলো ১৯, যা পুরোপুরি ২৩½ ওলন্দাজ 'এল'-এর সমান, ছোটটির সঙ্গে আমাদের 'এল'-এর তফাৎ মাত্র এক বুড়ো আঙুল প্রস্থ" (মোরল্যাণ্ড, অনু. *JIH*, খণ্ড ১৬, পৃ. ৭২)। ওলন্দাজ 'এল' ছিল ২৬·৭৭ ইঞ্চি, তা হলে বড় 'এল'টির দৈর্ঘ্য ছিল নিশ্চয়ই ৩৩·১১ ইঞ্চি। মোরল্যাণ্ড এটিকে 'গজ-এ ইলাহী'র সঙ্গে এক করে দেখতে চেয়েছেন

'গজ-এ ইলাহী'র দৈর্ঘ্য বার করার জন্য এলিয়ট অন্য একটি পদ্ধতির প্রস্তাব দিয়েছেন। দিল্লীর কাছে বাদশাহী সড়কে প্রতি 'কুরোহ্' চিহ্নিত করার জন্য যে পুরনো মুঘল মিনারগুলো ছিল, সেগুলোর মধ্যেকার দূরত্ব তিনি মেপে দেখেছিলেন। ৫,000 গজ-এ এক 'কুরোহ্'—এই ভিত্তিতে হিসেব করে তিনি দেখেন যে, উত্তর দিল্লীর 'মিনার'গুলোর দূরত্ব গড়ে এক 'গজ' বা ৩২.৮১৮ ইঞ্চির সমান।[১৯] কিন্তু এই সব 'মিনার'গুলোর 'কুরোহ্' যে 'গজ-এ ইলাহী' অনুযায়ীই মাপা হতো—এ ধারণাটি কিন্তু তিনি বড় দ্রুত করে ফেলেছেন মনে হয়। 'আইন'-এ অবশ্য বলা আছে যে, আকবরের 'কুরোহ্' মানে ছিল ৫,000 'গজ-এ ইলাহী',[২০] কিন্তু এটি হয় কলম ফস্‌কে বেরিয়ে গেছে নয়তো 'আইন' সঙ্কলন শেষ হওয়ার পর আবার 'কুরোহ্' মাপার জন্য একটা নতুন গজ চালু করেন। কারণ, তাঁর রাজত্বের ১৫-তম বছরে জাহাঙ্গীর বলেছেন যে. তাঁর আমলে 'কুরোহ্' মাপা হতো তাঁর বাবার আমলের বিধি অনুযায়ী। এক 'কুরোহ্' ছিল ৫,000 'দিরা'র সমান আর 'দিরা'র একের-চারভাগ 'দিরা-এ শরী' বা ২৪ আঙুলের সমান।[২১] তার মানে এই যে, 'কুরোহ্'র ক্ষেত্রে 'দিরা' ছিল প্রায় ৩৮ আঙুল। মুতমদ খানও আকবরের সাম্রাজ্যের বিস্তার (১৬০৫ সালে যেমন ছিল) প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে 'কুরোহ্'তে ব্যবহৃত প্রতি 'গজ' মানে ৩৮ আঙুল।[২২] ১৬৩১ সালে লেখার সময় মাণ্ডি খুব সতর্কভাবে "রাজা এবং

(ঐ, পৃ. ৭৩ টীকা)। এটি বর্ধিত 'জিরা এ পাদশাহী' হতেও পারে, কিন্তু যা আরও সম্ভব বলে মনে হয় তা এই যে, অঙ্কগুলো লিখতে ভুল হয়েছে; গুজরাটের বৃহত্তর 'গজ'কেই বোঝাতে চাওয়া হয়েছিল। (যেটি আসলে ছিল ৩৫'৫ ইঞ্চি, কিন্তু একবার ৩৪ ইঞ্চিও লেখা হয়েছে)। শেষের এককটির জন্য দ্রষ্টব্য 'লেটার্স রিসিভড্', ১ম খণ্ড, ৩৪, ২৪১; ২য় খণ্ড, ২১৪ (আহ্মেদাবাদে ৩৪ ইঞ্চির 'কোভেদ'-এর উল্লেখ আছে), ৩য় খণ্ড, ১১; ফস্টার, 'সাপ্লিমেণ্টারী ক্যালেণ্ডার', ৪৭, এবং ফ্রায়ার, ২য় খণ্ড, ১২৭)।

১৯. এইচ. এম. এলিয়ট, 'মেমোয়ার্স' ইত্যাদি, ২য় খণ্ড, ১৯৪। স্বাভাবিকভাবেই যা তুলনা করতে হবে তা হলো 'পথ-দূরত্ব', দুটি 'মিনার'-এর মধ্যেকার সরাসরি দূরত্ব নয়। এলিয়ট তাই 'পথ-দূরত্ব' ধরেই হিসেব করেছেন। মথুরা প্রদেশের জন্য তিনি যে দূরত্ব দিয়েছেন সেটি, মনে হয়, আরও ছোট মাপের 'গজ' নির্দেশ করে: গড়ে ৩২'৪৭২ ইঞ্চি, কিন্তু উল্লিখিত ১২টি পথ-দূরত্বের মধ্যে ৮টির দূরত্বই সর্বক্ষেত্রে মাত্র ৩২'৩৭১ ইঞ্চির সূচক।

'কুরোহ্' হলো সংস্কৃত 'ক্রোশ'-এর ফার্সী প্রতিশব্দ। 'ক্রোশ' থেকেই হিন্দী 'কোস' শব্দটি এসেছে।

২০. 'আইন', ১ম খণ্ড, ৫৯৭।

২১. 'তুজুক্-এ জাহাঙ্গীরী', ২৯৮। বিভারিজ (অনু. ২য় খণ্ড, ১৪১ টীকা) যেমন লক্ষ্য করেছেন, মুদ্রিত পাঠে 'কুরোহ্'র এক 'দিরা' ২ 'দিরা-এ শরী'র সমান হয়, কিন্তু পাণ্ডুলিপির সঙ্গে তা মেলে না। সেখানে 'কুরোহ্'র এক 'দিরা'র জায়গায় আছে সোয়া-এক।

২২. 'ইকবাল-নামা', ২য় খণ্ড, Or. 1834, পৃ. ২৩১ খ। তিনি অবশ্য এ কথা বলে খুব গুরুতর ভুল করেছেন যে, ২০০ 'জরীবে' হতো এক 'কুরোহ্' আর ৬০ গজে এক 'জরীব'। এর ফলে, এক 'কুরোহ্' ১২,০০০ 'গজ'-এর সমান হয়ে দাঁড়ায়।

অভিজাতদের ব্যবহৃত" "প্রাচীন পথে"র বর্ণনা দিয়ে বলেছেন যে এটি ছিল ৫,০০০ "কোর্ড" লম্বা, আর এক কোর্ড মানে ৳ গজ বা ২৮.৮ ইঞ্চি।[২৩] মাণ্ডি নিশ্চয়ই 'গজ'-এর একটা সুবিধাজনক মাপ, সুতরাং সঠিক মাপেরই কাছাকাছি একটা হিসেব দিয়েছেন। কিন্তু, তাঁর বিবৃতি থেকেও এ সম্বন্ধে প্রায় নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, তাঁর সময়েও 'গজ' ছিল ৩৮ আঙুল, বা অন্তত পক্ষে, 'কুরোহ্' মাপার জন্য যে 'গজ-এ ইলাহী' ব্যবহার করা হতো তার চেয়ে যথেষ্ট ছোট আরেকটি গজ। আরও বড় একটি এককে পরিবর্তনের ব্যাপারটি প্রথম লক্ষ্য করা যায় শাহ্‌জাহানের রাজত্বের ১৯-তম ও ২০-তম বছরে লাহোরীর লেখায়। তিনি বলেন যে তাঁর দেওয়া সব দৈর্ঘ্যই 'কুরোহ্'-র মাপে: এক 'কুরোহ্' হলো ৫০০ 'জিরা-এ পাদশাহী'র সমান এবং এক 'জিরা' মানে ৪২ 'অঙ্গুশ্‌ৎ'।[২৪] মনে হয়, এই বর্ধিত এককটি আওরঙ্গজেবের আমলেও ব্যবহার করা হতো, কারণ তাঁর রাজত্বের দশম বছরের পরে লেখা 'মিরাৎ-আল আলম' এবং তিনি মারা যাবার অল্প পরেই লেখা 'মলুমাৎ-আল আফাক'-এ 'জিরা'-র (যে 'জিরা'য় 'কুরোহ্-এ পাদশাহী' হয়) একই মান দেওয়া আছে।[২৫] এর থেকে মনে হবে যে গোটা ১৭ শতক জুড়ে 'কুরোহ্' মাপার জন্য মাত্র দুটি 'জিরা' ব্যবহার করা হতো: গোড়ার দশকগুলোতে ছিল ৩৮ আঙুলের 'জিরা' আর বাকি পর্ব জুড়ে ৪২ আঙুল। খুব অল্প সময়ের জন্য, অর্থাৎ, আকবরের রাজত্বের ৩৩-তম বছর থেকে শেষ বছরের মধ্যে কোন এক সময়ে এই উদ্দেশ্যে 'গজ-এ ইলাহী' ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে (যদি আদৌ হয়ে থাকে)। এটা তাই খুবই অসম্ভব বলে মনে হয় যে তদানীন্তন 'কোশ'-মিনারগুলো 'গজ-এ ইলাহী'র 'কুরো' অনুযায়ী বসানো হয়েছিল। অন্যদিকে, এমন হওয়া খুবই সম্ভব যে এ হলো শেষের সেই 'জিরা' যা ঐ আমলের অধিকাংশ সময় জুড়ে ব্যবহার করা হয়েছিল, অর্থাৎ ৪২ আঙুলের 'জিরা'-এ পাদশাহী'। তা হলে এই দাঁড়ায় যে এলিয়টের ৩২.৮১৮ আসলে পরবর্তী এককটির দৈর্ঘ্য, আর সে ক্ষেত্রে এর অনুপাতে 'গজ-এ ইলাহী'র দূরত্ব বার করলে তা মোটামুটি ৩২.০৩৭ ইঞ্চির কাছাকাছি হওয়া উচিত।

এখানে মনে পড়তে পারে যে, টমাসের 'গজ-এ সিকান্দারী' পরিমাপের ভিত্তিতে

২৩. মাণ্ডি, ৬৬-৬৭।

২৪. লাহোরী, ২য় খণ্ড, ৫৩৪ ও ৭০৯।

২৫. 'মিরাৎ-আল আলম', Aligarh MS. পৃ. ২১৪ ক; 'মলুমাৎ-আল আফাক্', Or. 1741, পৃ. ৮৩ ক। মার্শাল, ৪২০-২১, দুটি আলাদা 'কোর্স'-এর কথা বলেছেন, দুটিই ৮,০০০ 'কোভেট'-এর সমান। সম্ভবত, ৫,০০০-এর জায়গায় ভুল করে ৮,০০০ লেখা হয়েছে। তাঁর দেওয়া 'কোর্স'গুলোর দৈর্ঘ্য থেকে দুটি 'কোভেট'-এর যে-দৈর্ঘ্য পাওয়া গেছে তা যথাক্রমে ৩১·৭ এবং ২৯·৭ ইঞ্চি। মাণ্ডির মতো, তাঁর দেওয়া দৈর্ঘ্যগুলোও সঠিক না হতে পারে, তবুও মনে হয় তিনি এখানে 'কুরোহ্' মাপার নতুন ও বাতিল 'গজ-দৈর্ঘ্যে'র কথা বলেছেন। একইভাবে মানুচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪২ (এবং অনুবাদকের টীকা) ১০ ইউরোপীয় 'লীগ'কে ভারতের ১২ 'কুরোহ্'র সমান ধরেছেন, আর তাই প্রস্তাব দিয়েছেন যে 'গজ'-এর দৈর্ঘ্য ছিল ৩১·৭ ইঞ্চি। তাঁর মাথাতেও এই নতুন দূরত্বের মাপটিই ছিল বলে মনে হয়।

হিসেব করে আমরা যে 'গজ-এ ইলাহী' পেয়েছিলাম তা হয়েছিল ৩১.৯২ ইঞ্চির সামান্য বেশি। এই অংশে যেসব নজির জড়ো করা হলো তার থেকে মনে হবে যে এই দৈর্ঘ্য ৩২.০০ থেকে ৩২.২৫ ইঞ্চির মাঝামাঝি কিছু একটা ছিল। এর চেয়ে সুক্ষ্মভাবে বার করার চেষ্টা বোধহয় নিরাপদ হবে না, কেননা তা করতে গেলে নেহাৎই খেয়ালখুশিমতো একটি প্রামাণ্য সূত্রকে অন্যটির চেয়ে বেশি পছন্দ করতে হয়। ওপরে নির্ধারিত সীমার মধ্যে যে 'গজ-এ ইলাহী', তার দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে বিঘা বা ৬০ 'গজ' বর্গক্ষেত্রের এলাকা এক একরের ০.৫৮৭৭ ভাগ কম বা ০.৫৯৬৯ ভাগের বেশি হতেই পারে না। লক্ষণীয় এই যে, এখানেও দুটি সীমার মধ্যে তফাৎ নগণ্য। যদি হিসেবের সুবিধার জন্য ধরে নিই যে, 'গজ-এ ইলাহী'র এক বিঘার আয়তন এক একরের ০.৫৯ ভাগের সমান, তা হলে খুব একটা ভুল হবে না। শুধু মনে রাখতে হবে যে হয়তো বা এটি ছিল সামান্য বড়, খুব সম্ভব ০.৬০ একর, অর্থাৎ এক একরের ঠিক ⅗ ভাগ।

৩. বিঘা-এ দফ্‌তরী

আকবরের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে এই ছিল যে, প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে একমাত্র প্রামাণ্য সরকারী একক হবে 'গজ-এ ইলাহী'।[১] জমি, ঘরবাড়ি, কাপড়—সব রকম পরিমাপের ক্ষেত্রেই যে আগের সরকারী এককটির জায়গায় এটি চালু করা হয় সে কথা স্পষ্টভাবে নথিবদ্ধ আছে।[২] আর নতুন একটি চালু হবার আগে যে সমস্ত 'মদদ-এ মআশ' অনুদান, তাদের এলাকাগুলোও এই নতুন এককের হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছিল—ঐ আমলের নথিপত্রে তারও সমর্থন মেলে।[৩] সুতরাং, এও নিশ্চিত যে 'আইন'-এর 'দপ্তর'গুলো (অর্থাৎ ভূমিরাজস্বের চূড়ান্ত হার) এবং 'আরাজী' (এলাকা) পরিসংখ্যান—দুই-ই এই 'গজ'-এর 'বিঘা'র অঙ্কে।

মনে হয়, তারপরে জমি জরিপের সরকারী এককের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয় শাহ্‌জাহানের আমলে। এ সম্বন্ধে জানা যায় শুধু সাদিক খানের লেখা সে আমলের সমসাময়িক ইতিহাসের একটিমাত্র অংশ থেকে। এতে বলা হয়েছে যে, 'মদদ-এ মআশ' অনুদানের ক্ষেত্রে 'বিঘা-এ ইলাহী'ই ব্যবহার করা চলছিল, কিন্তু জমি সংক্রান্ত নথিপত্রে যে প্রামাণ্য সরকারী এককটি সাধারণত ব্যবহার করা হতো তা হলো 'দিরা-এ শাহ্‌জাহানী'। এই নতুন একক-ভিত্তিক 'বিঘা'র নাম ছিল 'বিঘা-এ দফ্‌তরী' বা দপ্তরের বিঘা। এটি ছিল 'বিঘা-এ ইলাহী'র ঠিক দু-এর তিনভাগ বা তার কাছাকাছি,

১. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, ৫২৯।

২. 'আইন', ১ম খণ্ড, ২৯৬। আমরা আগেই দেখেছি, একটিমাত্র সম্ভাব্য ব্যতিক্রম হলো রাস্তার পরিমাপ, যদিও 'আইন'-এ (১ম খণ্ড, ৫৯৭) বলা হয়েছে যে, এ ক্ষেত্রেও 'গজ-এ ইলাহী' ব্যবহার করা হতো।

৩. এই নথিগুলোর উল্লেখের জন্য এই পরিশিষ্টটির প্রথম অংশের ৮নং টীকা দ্রষ্টব্য। 'মদদ-এ মআশ' অনুদানগুলোর এলাকা নির্দেশ করার সময়ে 'গজ-এ ইলাহী' ব্যবহারের জন্য অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

আর দিল্লী ও আগ্রার আশপাশের এলাকার চাষীরা যে ছোট 'বিঘা' ব্যবহার করত, তার চেয়ে এটি ছিল তিনগুণ বড়। সাদিক খান ঘোষণা করেছেন যে, "শাহ্‌জাহানাবাদের অধীনস্থ অঞ্চল এবং প্রদেশের জমির চাষবাস (মূলে তাই আছে!) ও 'হিসাব' করা হতো পুরোপুরি 'বিঘা-এ দফ্‌তরী'র ভিত্তিতে।" দখিনের প্রদেশগুলোতেও প্রথমে যে এককের কথা নথিভুক্ত আছে তা হলো স্থানীয় 'আঙ্গুত', কিন্তু 'শেষ পর্যন্ত' এটি 'বিঘা'য় অর্থাৎ সম্ভবত 'বিঘা-এ দফ্‌তরী'তে বদল করে দেওয়া হয়।[৪] 'বিঘা-এ দফ্‌তরী' এবং 'বিঘা-এ ইলাহী'র[৫] মাপের অনুপাতে 'দিরা-এ শাহ্‌জাহানী'র রৈখিক দূরত্ব ছিল ৬০ থেকে ৭৩.৪৮৫, অথবা, অন্য কথায়, ৩৩.৫ আঙুলের সমান।

সাদিক খানের বক্তব্য যথেষ্ট স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট। তা ছাড়া, তিনি ছিলেন শাহ্‌জাহানের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। যে-ব্যাপারটি সে সময়ে সকলেরই জানা ছিল, সেটা কিছুতেই তাঁর অজানা থাকতে পারে না। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে অন্য কোন প্রমাণ্য সূত্র থেকে তাঁর বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর সাক্ষ্য একেবারে অসমর্থিতও নয়। পেলসার্ট এমন আভাস দিয়েছেন যে আগ্রার চারপাশের চাষীরা একটি 'বিঘা' ব্যবহার করত যার আয়তন ছিল 'বিঘা-এ দফ্‌তরী'র প্রায় সমান, সুতরাং এটিই সম্ভবত 'বিঘা-এ দফ্‌তরী'র জনক।[৬] ১৬৮০ সালে মালদায় (বাংলা) ইংরেজ কুঠিয়ালরা যে জমি পায়, তা মাপা হয়েছিল সরকারী উদ্যোগে। এই 'বিঘা' আয়তনের দিক দিয়ে 'বিঘা-এ দফতরী'র সঙ্গে প্রায় পুরোপুরি মিলে যায়।[৭] আবার, খাফী খানের লেখায় দেখা যায় যে তাঁর আমলে অর্থাৎ ১৮ শতকের

৪. সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ১৮৬ খ; Or. 1671, পৃ. ৯১ ক, খাফী খান তাঁর বই-এর আগের পাঠগুলোতে পুরো অংশটি হুবহু নকল করে দিয়েছেন। বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা সং, ১ম খণ্ড, ৭৩৪-৩৫-এর একটি পাদটীকায় এই অংশটি ছাপা হয়েছে; আরও তুলনীয় Add. 6573, পৃ. ২৬১ খ।

৫. বলা হয়েছে যে, 'বিঘা-এ দফ্‌তরী' ছিল ৩,৬০০ বর্গ 'দিরা-এ শাহ্‌জাহানী', আর 'বিঘা-এ ইলাহী', ৫,৪০০-র "এক ভগ্নাংশ মাত্র বেশি।" ঠিক ৩,৬০০ বর্গ 'গজ-এ ইলাহী'তে এক 'বিঘা এ ইলাহী' হতো, এমন অনুমান করাই স্বাভাবিক। তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় বতালা সিরিজের একটি 'চকনামা' বা সীমানা-নির্ধারক নথি থেকে (I.O. 4438 : No. 59)। নথিটি লেখা হয়েছিল আওরঙ্গজেবের আমলের ৪৯-তম বছরে, কিন্তু এর বিষয় হলো শাহ্‌জাহানের আমলের সপ্তম বছরের একটি অনুদান। এখানে পরিষ্কারভাবে ষাট-'গজ' 'জরীব' দিয়ে পরিমাপের কথা বলা হয়েছে।

৬. পেলসার্ট, পৃ. ১০, বলেছেন যে নীল বোনা হতো "প্রতি 'বিঘা' বা ৬০ হল্যাণ্ড 'এল'-এ ১৪ বা ১৫ পাউণ্ড বীজ—এই হারে"; তা হলে যে-'গজ' দিয়ে 'বিঘা' মাপা হতো তা হবে ওলন্দাজ 'এল'-এর ঠিক সমান। এখন, পেলসার্ট অন্যত্র যেমন বলেছেন (পৃ. ২৯), 'এল' ছিল ১০০/১২০ 'গজ-এ ইলাহী'। তা হলে এ দু-এর অনুপাতটি হবে ৬০ : ৭২—'দিরা-এ শাহ্‌জাহানী' এবং 'গজ-এ ইলাহী'র অনুপাতের প্রায় সমান।

৭. "মালদা ডায়েরী অ্যাণ্ড কনসালটেশন্‌স্", *JASB*, N.S., খণ্ড ১৪, ১৯১৮, পৃ. ৮১-৮২, ১২২-২৩। 'বিঘা'র আকার বলা হয়েছে এইভাবে (পৃ. ৮২): "প্রতি বিঘায় আশি বড়

গোড়ার দিকে 'বিঘা' জরিপ করা হতো 'দিরা-এ শাহ্‌জাহানী'তে। তিনি বলেছেন, রাজা তোডর মলের সময়ে যে এককটি ব্যবহার করা হতো তার থেকে এটি আলাদা।[৮] আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের জরিপ-করা এলাকার পরিসংখ্যানে কোন্ 'বিঘা' ব্যবহার করা হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলা নেই: [৯] কিন্তু 'বিঘা-এ ইলাহী'তে লিখলে যে অঙ্ক পাওয়া যায় তা অসম্ভব, বরং 'বিঘা-এ দফতরী'তে লিখলে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য।

সমর্থনের জন্য এসবই বেশ ভালো সাক্ষ্য। কিন্তু এগুলোকেও যদি চূড়ান্ত বলে ধরা না হয়, তা হলেও, বিরুদ্ধে যাওয়ার মতো নজির অল্পই আছে। যেমন, হিসাবপত্র ও প্রশাসন সংক্রান্ত পুস্তিকাগুলোর থেকে আমরা তো কিছু নির্দিষ্ট তথ্য আশা করতে পারি। কিন্তু তার বদলে দেখি জমি জরিপের জন্য ব্যবহৃত 'দিরা'র নাম এবং দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে চূড়ান্ত বিভ্রান্তি। শাহ্‌জাহানের আমলের একটি পুস্তিকায় বলা হয়েছে যে, 'বিঘা' মাপা উচিত 'দিরা-এ ইলাহী' এককে।[১০] আওরঙ্গজেবের তখ্‌তে বসার সময়ে লেখা আরেকটি পুস্তিকায় 'গজ' বা 'দিরা'র কোন নামগন্ধ নেই, হিসেব দেওয়া আছে 'দস্‌ৎ'-এ (হাত-এর এককে)। এক 'দস্‌ৎ' ২৪ আঙুলের সমান, আর এক 'বিঘা' হলো ১০০ বর্গ হাত।[১১] আওরঙ্গজেবের আমলের মাঝামাঝি থেকে শেষের বছরগুলোর মধ্যে কোন এক সময়ে লেখা আরও দুটি পুস্তিকার একটিতে 'দিরা'র (নামহীন) দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে ৪৮ আঙুল,[১২] অন্যটিতে বলা হয়েছে "আবাদী এলাকা পরিমাপের" ক্ষেত্রে 'দিরা-এ ইলাহী' একক ব্যবহার করা হতো, কিন্তু তার মান দেওয়া আছে ৩৬ আঙুল।[১৩]

'কোভেদ' বা ইংরেজি গজের নয় 'নেল' থাকে।" সুতরাং, এটি ছিল ২.০২৫ বর্গ গজ বা এক একরের ০·৪১৮ ভাগের সমান। 'বিঘা-এ ইলাহী'র ৩/৪ ভাগ হওয়ায় 'বিঘা-এ দফ্‌তরী' সম্ভবত ছিল ০·৪০০ একরের সমান।

৮. খাফী খান, ১ম খণ্ড, ১৫৬, Add. 6573, পৃ. ৬৯ খ। তাঁর মতে, 'বিঘা' এককটি প্রথম ব্যবহারের কৃতিত্ব তোডর মলের। বলা বাহুল্য, এ কথা একেবারেই ভিত্তিহীন। লক্ষণীয় যে, বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা সংস্করণে দুটি গুরুতর ছাপার ভুল বা ভুল পাঠ আছে: একটিতে 'বিঘা'র জায়গায় আছে 'টঙ্কা' আর অন্যটিতে 'পইমাইশ'-এর জায়গায় আছে 'ওয়াসিল'।

৯. ওড়িশার ক্ষেত্রে সম মানের এলাকা-অঙ্কগুলোও দেওয়া হয়েছে আগের অনেক ছোট দুটি এককে (Fraser 86, পৃ. ৬০ খ; 'ইন্‌তিখাব-এ দস্তুর-আল আমল-এ পাদশাহী', Edinburgh 224, পৃ. ১১ ক)।

১০. 'দস্তুর-আল আমল-এ নভিসিন্দগী', পৃ. ১৭১ ক।

১১. 'দস্তুর-আল আমল-এ আলমগীরী', পৃ. ২ ক-খ।

১২. 'খুলাসতুস সিয়াক', পৃ. ৭৫ ক; Or. 2026, পৃ ২৪ খ।

১৩. 'ফরহঙ্গ-এ করদানী', পৃ. ১২ ক-১৩ ক; Edinburgh 83, পৃ. ৭ ক। বইটিতে 'দিরা-এ শাহ্‌জাহানী'রও উল্লেখ আছে। ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, এই এককটি ব্যবহার হতো কাপড়, পাথর, কাঠ এবং বাড়িঘর পরিমাপের ক্ষেত্রে। এর দৈর্ঘ্য দেখানো হয়েছে ৪১ আঙুল— 'গজ-এ ইলাহী'র ঠিক সমান! শাহ্‌জাহান যে কাপড়ের জন্য আরও বড় একক চালু

অন্যদিকে, ১৮ শতকের শেষভাগে একমাত্র সরকারী পরিমাপ হিসেবে উত্তর ভারতে 'বিঘা-এ ইলাহী'র ব্যবহার বেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে মনে হয়।[১৪] তার পরের শতকের গোড়ার দিকে বৃটিশ সরকারের জরিপ বিভাগের যেসব কর্মচারী রাজস্ব 'বন্দোবস্ত'-এর ব্যবস্থা করেন, তাঁরাও দেখেন 'গজ-এ ইলাহী'ই জমি জরিপের একমাত্র সাধারণ একক (অর্থাৎ স্থান-বিশেষের একক নয়), তদানীন্তন 'উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলো'র বিভিন্ন জেলায় এর ব্যবহার চলত।

পুস্তিকাগুলোর বক্তব্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য বা একমাত্র 'গজ-এ ইলাহী'রই টি'কে থাকা—সাদিক খানের বক্তব্য মেনে নেওয়ার পথে এ দু-এর কোনটিকেই বাধা বলে ধরে নেওয়ার দরকার পড়ে না। এককটির নাম থেকেই আভাস পাওয়া যায় যে, তার 'বিঘা-এ দফ্‌তরী' ব্যবহারের গোড়ার কারণ নথিপত্রের মধ্যে সমতা আনা। আর এমন অনুমানও যুক্তিযুক্ত যে আসল জরিপের কাজ সাধারণত স্থানীয় সব এককের ভিত্তিতেই করা হতো ; সেগুলো নথিভুক্ত করতে গিয়ে পরে কোন এক স্তরে এই একককে নিয়ে আসা হতো। সাম্রাজ্যের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ায় 'বিঘা-এ দফ্‌তরী' রাখার উদ্দেশ্যও বিলুপ্ত হয়ে যায়, স্থানীয় প্রশাসনও আস্তে আস্তে এটিকে আবার তাদের নথিপত্র থেকে বাদ দিতে থাকে। অন্য দিকে 'মদদ-এ মআশ' জমির সীমানা ঠিক করার জন্য বাস্তবিকই 'বিঘা-এ ইলাহী'র ব্যবহার চালু ছিল, সর্বত্রই তাই এই এককটি চলত, সমসাময়িক অন্য কোন এককের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। 'বিঘা-এ ইলাহী'কে টি'কিয়ে রাখার জন্য শ্রেণী হিসেবেই এই অনুদানের অধিকারীদের একটা স্থায়ী স্বার্থ ছিল যাতে তারা তাদের জমির আদত সীমানা বজায় রাখতে পারে। আর তাই এমন ঘটেছে যে উত্তর প্রদেশের বর্তমান 'পাক্কা বিঘা' আসলে আয়তনে 'বিঘা-এ ইলাহী'রই যৎসামান্য পরিবর্তিত রূপ।

করেছিলেন মার্শালের কথা থেকে তা বোঝা যায়। তিনি বলেছেন, "শাহ্জাহানের গজ, যাকে 'মলমল গজ' বলা হতো, সেটি ছিল ৪১$\frac{১}{৪}$ ইংরেজি ইঞ্চির সমান।"

১৪. পাঞ্জাব, শাহ্জাহানাবাদ, অযোধ্যা এবং এলাহাবাদ প্রদেশগুলিতে ব্যবহৃত স্থানীয় এবং সরকারী 'বিঘা' সম্বন্ধে ফার্সীতে লেখা একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য। ১৭৮৮-এর কিছু আগে বাংলার বৃটিশ প্রশাসকদের সুবিধার জন্য এটি তৈরি করা হয়েছিল (Add. 6586, পৃ. ১৬৪ ক-খ)। আরও তুলনীয় Add. 6603, পৃ. ৫১ খ, যাতে 'দিরা-এ ইলাহী'কে ৪০ আঙুলের সমান বলা হয়েছে।

পরিশিষ্ট খ

ওজন

১. প্রামাণ্য ওজনের মণ

বড় ধরনের ওজনের জন্য প্রথাগত ভারতীয় মাপ ছিল ৪০ সের = ১ মণ।[১] পুরো মুঘল সাম্রাজ্য জুড়ে একমাত্র এই মাপই চলত। কিন্তু পূর্বে, উত্তর-পশ্চিমে এবং দখিনের কয়েকটি অঞ্চল ছিল এর ব্যতিক্রম। এসব অঞ্চলে ওজনের এই মাপটি অন্য মাপের পদ্ধতির সঙ্গে, বা অন্তত দুটি ক্ষেত্রে, অন্যান্য আয়তন মাপার পদ্ধতির সঙ্গে, মিশে গিয়েছিল অথবা পাশাপাশি চালু ছিল।

আবুল ফজল বলেন যে হিন্দুস্তানের 'সের' আগে ১৮ বা ২২ 'দাম' ওজনের সমান ছিল। আকবরের আমলের গোড়া থেকে চালু প্রামাণ্য সেরের ওজন ছিল ২৮ 'দাম'; কিন্তু যে সময়ে 'আইন' লেখা হয় তার কিছু আগে বাদশাহ্ এই ওজন বাড়িয়ে ৩০ 'দাম' করেছিলেন।[২] ঐ বই-এরই অন্যত্র তোলার হিসেবে 'দাম'-এর ওজন দেওয়া আছে।[৩] মুদ্রা ও অন্যান্য সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এই তোলার ওজন বেশ সঠিকভাবে বার করা হয়েছে।[৪] সেই হিসেবে 'দাম'-এর ওজন হওয়া উচিত ৩২২.৭ গ্রেন। ফলে ২৮

১. বহু আগে, ১৭ শতকেই মণের উৎকট ইংরেজি বানান maund তৈরি হয়েছিল। স্পষ্টতই ঐ সময়ের মণের বিকৃত পর্তুগীজ রূপ 'মা-ও' ('হবসন-জবসন', সম্পা. ক্রুক, ৫৬৩-৬৪)-এর সঙ্গে ভারতীয় নামটি মিশে শব্দটির জন্ম এবং সম্ভবত এটি থেকে যাবে। বর্তমান [১৯৬২] প্রামাণ্য একক, (সরকারীভাবে যেটি এই নামেই পরিচিত) শুধুমাত্র তার জন্যই এই বইতে 'মণ' কথাটি প্রয়োগ করা হয়েছে। ভারতের সরকারী 'মণ' (=৮২$\frac{২}{৭}$ আ. দু. পাউণ্ড) যে আমাদের আলোচ্য পর্বে ব্যবহৃত এককগুলোর ক্ষেত্রে কোন রকম সাহায্য করবে না, সেই বিষয়ের ওপর জোর দেওয়ার জন্যও উপরে উল্লিখিত প্রভেদটি কাজে লাগাতে পারে।

২. 'আইন', ২য় খণ্ড, ৬০; আরও দ্রষ্টব্য. ঐ, ১ম খণ্ড, ২৮৪।

৩. ঐ, ১ম খণ্ড, ২৬: ১ 'দাম' = ১ তোলচা, ৮ 'মাষা', ৭ 'সুর্খ্'; বা ১$\frac{৭}{৮}$$\frac{১}{৬}$ 'তোলা'।

৪. অধ্যাপক এস. এইচ. হোদিবালা, 'হিস্টরিক্যাল স্টাডিজ ইন মুঘল নুমিসম্যাটিক্স্', পৃ. ২২৪-৩৪। এই বিষয়ের সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত যত সাক্ষ্য আছে তার প্রায় সবকিছু জড়ো করে তিনি 'তোলা'র ওজন মোটামুটি ১৮৫.৫ 'গ্রেন' স্থির করেছেন। কিন্তু ইউরোপীয় সূত্রগুলোতে মণের যে ওজন পাওয়া যায় সেখান থেকে পেছিয়ে হিসেব করে 'তোলা'র মান বার করার কোন প্রচেষ্টা তিনি করেন নি। এর সমর্থনে যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ পরে হাজির করা হবে তারই একটা অংশের ভিত্তিতে প্রাথমিক ধারণা করা হয়েছিল—মূল রচনার যুক্তিকতা সম্পর্কে যাতে এ ধরনের কোন সন্দেহ না হয় শুধুমাত্র তার জন্যই আগে থেকে ব্যাপারটি বলে রাখা হলো। 'মণ-এ আকবরী'র ওজন স্থির করার চেষ্টা করতে গিয়ে প্রিন্সেপ জহুরী ও ব্যাঙ্কারদের ওজনের মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছিলেন, ফলে তাঁর নির্ণীত মান অসম্ভব কম হয়েছে ('ইউসফুল টেবল্স্',

'দাম'-এ এক সের, এর ভিত্তিতে মণের ওজন ছিল প্রায় ৫১.৬০ আভোয়াদু পোয়াজ পাউণ্ড-এর সমান, আর, 'আকবর-শাহী' বা 'আকবরী' নামে পরিচিত ৩০-'দাম' -এর যে সের, তার হিসেবে মণের ওজন হবে মোটামুটি ৫৫.৩২ পাউণ্ড। প্রামাণ্য ইউরোপীয় লেখাপত্রে এই পরবর্তী মণের যে-মান পাওয়া যায় তা ওপরের সংখ্যার কাছাকাছি বলেই মনে হয়।[৫]

তখ্‌তে বসার পর জাহাঙ্গীর ৩৬ 'দাম'-এ এক সের—এই ভিত্তিতে একটি নতুন মণ ('মণ-এ জাহাঙ্গীরী') চালু করেন। তাঁর রাজত্বের ১৪-তম বছরে বা তার কিছু আগে তিনি এটি তুলে নেন, কিন্তু ঐ বছরেই আবার পাকাপাকিভাবে ফিরিয়ে আনেন।[৬]

সম্প'. টমাস, ১১১)। টমাস এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত, কিন্তু মুঘল 'তোলা'র (১৮৬'০ গ্রেন) ক্ষেত্রে তিনি প্রিন্সেপ-এর মানই ব্যবহার করেছেন। মূল রচনাটি গ্ল্যাডউইন ঠিকমতো পড়তে পারেন নি, তাঁর ভুলের ভিত্তিতেই এই মান পাওয়া গিয়েছিল। টমাস নিজেই সে কথা উল্লেখ করেছেন (ঐ, ১৯-২০ এবং ২০ টীকা; 'ক্রনিকল্‌স্ অফ দা পাঠান কিংস', ৪২১, ৪২৫, ৪২৯-৩০)। কিন্তু 'তোলা'র মানের ক্ষেত্রে হোদিবালা ও প্রিন্সেপ-এর মধ্যে তফাৎ খুবই কম। তাই, প্রিন্সেপ-এর মানকে ভিত্তি করে মোরল্যাণ্ড বিভিন্ন মণের যে ওজন বার করেছেন সেগুলোতে খুব বেশি ভুল হয় নি ('ইণ্ডিয়া…অফ আকবর', পৃ. ৫৩; 'আকবর টু আওরঙ্গজেব', ৩৩৪)।

৫. উফ্‌লিট ১৬১৪ সালে লিখেছিলেন, "৩০ 'পাইস'-এর সমান আকাবী (আকবরী) সের।" এই সেরে মণের ওজন ছিল ৫৬ পাউণ্ড (আ. দু.), (ফস্টার, 'সাপ্লিমেণ্টারী ক্যালেণ্ডার', ৪৮)। পেলসার্ট, ২৯, বলেছেন, 'এক আকবরী সেরের ওজন ৩০ 'পাইস' বা ১$\frac{7}{8}$ পাউণ্ড', অর্থাৎ ১ 'মণ-এ আকবরী' = ৫০ হল্যাণ্ড পাউণ্ড বা ৫৪'৫ আ. দু. পাউণ্ড। হকিন্স ('আর্লি ট্রাভেল্‌স্', ১০৫) যখন বলেন, 'প্রতি মণের ওজন ৫৫ পাউণ্ড', তিনি বোধ হয় ঐ একই মণের উল্লেখ করছেন। তুলনীয় মোরল্যাণ্ড, 'ইণ্ডিয়া অফ…আকবর', পৃ. ৫৩-৬২, 'আকবর টু আওরঙ্গজেব', ৩৩৪, ৩৪২। ইংরেজদের নথিপত্রের কিছু উল্লেখে এ বিষয়ে অন্য ধরনের কথা পাওয়া যায়। সেখানে মণকে ৫০ আ. দু. পাউণ্ড-এর সমান ধরা হয়েছে ('লেটার্স রিসিভ্‌ড্', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬০, ৮৭; 'ফ্যাক্টরিস্ ১৬৩০-৩৩', পৃ. ৩২৮)। এই নথিপত্রের প্রথম ও তৃতীয়টি পুরোপুরিভাবে নীলের ব্যবসা-সংক্রান্ত। নীল শুকিয়ে যাওয়ার দরুন সম্ভবত এগুলোতে ৯ শতাংশ ছাড় ধরা আছে। ঐ নথিগুলোরই অন্যত্র এই অনুপাতটি হিসেব করা আছে ('লেটার্স রিসিভ্‌ড্', ৬ষ্ঠ, ২৩৬)।

'তুজুক্-এ জাহাঙ্গীরী', ৯৬, ২৮১। মনে হয় জাহাঙ্গীরের বিবৃতিগুলো ভুল বোঝা হয়েছে। যেমন, মোরল্যাণ্ড বলেন যে ১৬১৯ সালে সাধু যদ্রূপ-এর পরামর্শে জাহাঙ্গীর 'তৎক্ষণাৎ' সেরের ওজন ৩৬ 'দাম' করার আদেশ দিয়েছিলেন ('আকবর টু আওরঙ্গজেব', ৩৩৫) ১৪-তম বছরের প্রসঙ্গে জাহাঙ্গীর নতুন মান চালু করার কথা বলেন নি, বেশ পরিষ্কারভাবেই তাঁর পুরনো মান ফিরিয়ে আনার কথাই বলেছেন। তখ্‌তে বসার সময়ে যে হার বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, ৬ষ্ঠ বছরের প্রসঙ্গে সে বিষয়ে হঠাৎ, কিন্তু সুনির্দিষ্ট একটি উল্লেখ পাওয়া যায় ('তুজুক্-এ জাহাঙ্গীরী', ৯৬)। ১৬১৪ ও ১৬১৫ সালে ইংরেজদের নথিপত্রে "শসালেম-এর

আভোয়াদু পোয়াজ ওজনের হিসেবে এই নতুন ওজন নিশ্চয়ই মোটামুটিভাবে ৬৬.৩৮ পাউণ্ড-এর সমান ছিল।[৭]

শাহ্জাহানের পালা এলে তিনিও এক নতুন মণ চালু করেন। এই মণের ওজন বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে সেরের ওজন হয়েছিল ৪০ 'দাম'।[৮] কবে এই মণ চালু হয়েছিল সে বিষয়ে আমাদের প্রামাণ্য সূত্রগুলোতে কোন কথা নেই, কিন্তু ১৬৩৪[৯] ও ১৬৩৫[১০] সালের ওলন্দাজ ও ইংরেজ বাণিজ্যিক লেখাপত্রে প্রথম এর উল্লেখ পাওয়া যায়। 'মণ-এ আকবরী'র সঙ্গে এই মণের আসল অনুপাত 'দাম'-ওজনেই সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে—এ কথা ধরে নিলে—সমসাময়িক এক পুস্তিকার একটি নিশ্চিত সাক্ষ্য থেকে এই ধারণা আরও জোরদার হয়[১১]—'মণ-এ শাহ্জাহানী'র ওজন মোটামুটিভাবে ৭৩.৭৬ আ. দু. পাউণ্ড-এর সমান হওয়া উচিত।[১২]

মণ. সেরে ৩৬ 'পাইস' " এ ধরনের সুনির্দিষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় (ফস্টার, 'সাপ্লিমেণ্টারি ক্যালেণ্ডার', ৪৩, ৪৭, ৪৮; লেটার্স রিসিভ্ড, ৩য় খণ্ড পৃ. ১১)।

৭. উফ্লিট-এর হিসেবে এর মান ৬৫ আ. দু. পাউণ্ড (ফস্টার, 'সাপ্লিমেণ্টারি ক্যালেণ্ডার', ৪৮') এবং পেলসার্ট, ১১-র হিসেবে ৬০ হল্যাণ্ড পাউণ্ড বা ৬৫-৪ আ. দু. পাউণ্ড। তুলনীয় মোরল্যাণ্ড, 'আকবর টু আওরঙ্গজেব', ৩৩৫, ৩৪২ ও যেসব প্রামাণ্য সূত্র সেখানে উদ্ধৃত হয়েছে। মাণ্ডি, ২৩৭, "১৬ মণ জাহাঙ্গীরী"কে ইংরেজদের ওজনের প্রায় ১,০০০ পাউণ্ড সমান বলে ধরেছেন; ফলে তাঁর হিসেবে ১ মণের ৬২½ আ. দু. পাউণ্ড হয়। তিনি নিজেই অন্যত্র 'পাইস' বা 'দাম'-এর (পৃ. ১৫৬) যে-ওজন দিয়েছেন (২২ পয়সা=১ পাউণ্ড) তার সঙ্গে এই মণের ওজন মেলে না; কারণ 'মণ-এ জাহাঙ্গীরী'-র ওজন থেকে তা হলে ৬৫·৩৬ পাউণ্ড কমে যাবে।

৮. 'দস্তুর-আল আমল-এ নভিসিন্দগী', পৃ. ১৭৯ খ; 'দস্তুর আল আমল-এ আলমগীরী', পৃ. ২ খ; 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৩৪-৩৬', পৃ. ১৫৬।

৯. 'দাগ রেজিস্টার', ২২ অক্টোবর, ১৬৩৪, মোরল্যাণ্ড এ উদ্ধৃত, 'আকবর টু আওরঙ্গজেব', পৃ. ৩৪২।

১০. 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৩৪-৩৬', পৃ. ১২৯, ১৩৩।

১১. 'দস্তুর আল আমল-এ নভিসিন্দগী', পৃ. ১৭৯ খ-তে 'মণ-এ শাহ্জাহানী'কে 'মণ-এ আকবরী'তে (বা দ্বিতীয়টিকে প্রথমটিতে) নিয়ে আসার গাণিতিক সূত্র দেওয়া হয়েছে এবং ধরা হয়েছে যে প্রথমটি ছিল দ্বিতীয়টির ১⅙ গুণের সমান। ১৭ শতকের শেষ দিকের পুস্তিকা 'জওয়াবিৎ-এ আলমগীরী'তেও (Ethe 415, পৃ. ১৭০ খ; Or. 1641, পৃ. ৫০ ক; Add. 6598, পৃ. ১৫৩ ক) 'শাহ্জাহানী'র অঙ্কে 'মণ-এ আকবরী'র ওজন দেওয়া আছে ৩০ সের।

১২. একটি ওলন্দাজ নথিতে (স্পষ্টতই ওপরে উল্লিখিত 'দাগ রেজিস্টার'-এর সেই একই নথি) এই মণের ওজন ধরা হয়েছে ৬৭ ওলন্দাজ পাউণ্ড (অর্থাৎ, ৭৩·০৩ আ. দু. পাউণ্ড) (মোরল্যাণ্ড, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৩৩৫)। ১৬৩৯ সালে সুরাটের এক আলোচনা সভায় এটিকে ৭৪ পাউণ্ড-এর সমান ধরা হয়েছিল ('ফ্যাক্টরিস, ১৬৩৭-৪১, পৃ. ১৯২), কিন্তু পরের বছর এটি দাঁড়ায় ৭৩½ বা ৭৩⅙ পাউণ্ড (ঐ, ২৭৪)। তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, ৩২ এবং তেভেনো, ২৫-এ যদি ঐ একই মণের কথা বলা হয়ে থাকে, তা হলে এর ওজন বাড়িয়ে লেখা হয়েছে মনে হয়। এমন কি

নতুন মণ দিয়ে মণের চূড়ান্ত ওজনের পরিবর্তন বোঝাতে পারে—এভাবে দেখলে, আওরঙ্গজেব নিজের মতো করে কোন নতুন মণ চালু করেন নি—এ কথা বিশ্বাস করার ভালোই কারণ আছে বলে মনে হয়।[১৩] কিন্তু আওরঙ্গজেবের রাজত্বের একেবারে প্রথম দশকেই পুরনো ওজনের 'দাম' বন্ধ করে দিয়ে তার জায়গায় আগের চেয়ে একের-তিন-ভাগ হাল্কা 'দাম' চালু করার ফলে নিশ্চয়ই নতুন অসুবিধা দেখা দিয়েছিল।[১৪] যদি 'দাম'-এর আগের অনুপাতগুলোর হিসেবে ওজন ঠিক করার ব্যবস্থা চলতে থাকে তা হলে ব্যবহারের জন্য এখন শুধুমাত্র পুরনো মুদ্রাই পাওয়া যাবে এবং দিনে দিনে সেগুলোও ক্ষয়ে যাবে। স্পষ্টতই সেরের ওজনকে আবার নতুন মুদ্রার অঙ্কে বেঁধে দেওয়া হয় নি।[১৫] কিন্তু পুরনো মুদ্রার অঙ্কে 'সের-এ শাহ্জাহানী'র কর বাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত ৪০ করা হয়েছিল। কালক্রমে বোধ হয় এই দরও বাতিল হয়ে যায়। ফলে ৪৩ ও আরও পরে ৪৪ 'দাম' দর বেঁধে দেওয়া হয় এবং ওজনের এককগুলোর নতুন নাম দেওয়া হয় 'আলমগীরী', যদিও প্রকৃত ওজন পাল্টানোর কোন উদ্দেশ্য ছিল না বলেই মনে হয়।[১৬]

ঐ সময়ের ফরাসী লিভ্র্-এর ক্ষেত্রে বল্-এর মান না মেনে আমরা যদি মোরল্যাণ্ডের মানও মেনে নিই, তা হলেও এটি বেশি হয়। (মোরল্যাণ্ড, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৩৩৩, বল্-এর পরিশিষ্ট, তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, ৩৩১; এর সঙ্গেই তুলনীয় (হোদিবালা, 'মুঘল নুমিসম্যাটিক্স্', ২৩১)। এই দুজন পর্যটক মণের যে মান ধরেছিলেন তা হলো যথাক্রমে ৬৯ ও ৭০ লিভ্র্। এখন যদি আমরা মোরল্যাণ্ডকে অনুসরণ করি তা হলে এই দুটি মান ৭৫.২১ ও ৭৬.৩০ আ. দু. পাউণ্ড-এর চেয়ে খুব একটা কম হতে পারে না। এও লক্ষণীয় যে মোরল্যাণ্ডের হার অনুযায়ী 'মণ-এ আকবরী'কে আ. দু. পাউণ্ড-এর এককে নিয়ে এলে তাভার্নিয়ে-র মানও, অর্থাৎ ৫৩ লিভ্র্ (১ম খণ্ড, পৃ. ১৩২; ২য় খণ্ড, পৃ ৭), স্পষ্টতই আসল ওজনের চেয়ে বেশি হয়ে যায়।

১৩. 'জওয়াবিৎ-এ আলমগীরী'তে (পূর্বোক্ত সংস্করণ) দেখানো হয়েছে যে ওজনের দিক দিয়ে 'মণ-এ আলমগীরী' ও 'মণ-এ শাহ্জাহানী' একই ছিল। ১৬৭৬ সালে ফ্রেয়ার বলেছেন, "আগ্রার পাকা মণ" সুরাট মণের "দ্বিগুণ" এবং পরের মণটির ভিত্তি ২০ "পাইস"-এর সের। আগ্রায় আর একটিমাত্র মণের কথা তাঁর জানা ছিল, সেটি "আকবরী মণ" (২য় খণ্ড, পৃ. ১২৬-২৭)।

১৪. তুলনীয়, এস. এইচ. হোদিবালা, 'দা ওয়েট্স্ অফ আওরঙ্গজেবস্ দামস্', *JASB*, N.S., খণ্ড ১৩, ১৯১৭, পৃ. ৬২-৬৭। পরিশিষ্ট ৩-ও দ্রষ্টব্য।

১৫. এ বিষয়ে সমসাময়িক মতামতের জন্য মার্শাল, ৪১৬ দ্রষ্টব্য।

১৬. 'জওয়াবিৎ-এ আলমগীরী'তে (পূর্বোক্ত সংস্করণ) সরকারী ওজনের যেসব সারণি দেওয়া আছে; এই অংশের প্রতিপাদ্য বিষয়টি অনেকাংশে তার ওপর নির্ভরশীল। বইটির একদিকে পুরনো 'দাম'-এর ('ফুলুস-একাদীম') অঙ্কে, অন্যদিকে 'মণ-এ শাহ্জাহানী'র অঙ্কে সরকারী ওজনের মান দেওয়া আছে। প্রথম সারণিতে 'সের-এ আকবরী'র ক্ষেত্রে ৩০ 'দাম', 'জাহাঙ্গীরী'র ক্ষেত্রে ৩৬, কিন্তু 'শাহ্জাহানী' ও 'আলমগীরী'র ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪২ ও ৪৩ 'দাম' দেখানো হয়েছে; আর একটু আগেই যেমন দেখেছি, 'মণ-এ আকবরী' এবং 'মণ-এ জাহাঙ্গীরী'কে যথাক্রমে ৩০ ও ৩৬ (পুঁথির পাঠান্তর: ৩১) 'সের-এ শাহ্জাহানী'র সমান ধরা হয়েছে এবং 'মণ-এ আলমগীরী' ও 'মণ-এ শাহ্জাহানী'-কে একই ওজন বলা হয়েছে।

২. বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত মণ ও অন্যান্য ওজন

আমাদের কাছে যা সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে তার বেশিরভাগই বিচ্ছিন্ন উল্লেখ। ফলে, যেসব ব্যবহারে এবং যে ধরনের বাণিজ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রামাণ্য ও আঞ্চলিক ওজনগুলো ব্যবহার হতো, সে সম্বন্ধে কোন পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়ার উপায় নেই। যা কিছু তথ্য আছে তার থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, একের পর এক যেসব সরকারী ওজন বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো ব্যাপকভাবে কার্যকরী করা হতো। তবে কোন নতুন একক চালু করার সঙ্গে সঙ্গেই তা কার্যকর হতো না. বরঞ্চ বিভিন্ন বাজারে বা বিশেষ ধরণের কোন বাণিজ্যে ক্রমে ক্রমে তার প্রয়োগ করা হতো। আর এ রকম আভাসও মেলে যে অনেক অঞ্চলে আঞ্চলিক ওজন ও আয়তনের পরিমাপই চালু থাকত—কখনও সরকারী স্বীকৃতি পেয়ে বা পরিবর্তিত আকারে চলত। কখনও কখনও তার পাশাপাশি অন্য কোন একক চলত না, কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই সরকারীভাবে (নির্ধারিত) মাপও থাকত। এই সবকিছুর সঙ্গে আরও একটি বিষয় যোগ করতে হবে, অর্থাৎ বিভিন্ন বাজারে এবং বাণিজ্যে নানারকম প্রথা, যার ফলে ওজনের একক ও মাত্রায় অনেক আপাত পার্থক্য দেখা যায়। এগুলো দিয়ে আসলে যেকোন পক্ষকে দেওয়া বাণিজ্যিক ছাড় বা কমিশন বোঝায়।[১]

১৬৬৮-৭২ সালে বাংলা ও বিহারে তাঁর পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে 'মার্শাল, ৪২১, বলেন, "১৯¾ 'মাস'-এ (মাষা) এক শাহ্‌জাহান 'পাইস' হয়। এই পয়সাগুলো তামার, এই রকম ৪২টি পয়সা দিয়ে বাজারে এক সেরের ওজন হয়।" "আমাদের অন্যান্য তথ্যসূত্রে 'দাম'-এর যে প্রামাণ্য ওজন দেওয়া আছে এই ওজন তার চেয়ে স্পষ্টতই কম ('আইন'-এ ২০⅝ 'মাষা', এবং সম্ভবত কিছু কম নির্দিষ্টভাবে 'মিরাৎ-এ আহ্‌মদী', ১ম খণ্ড, ২৬৭, ৩৮৫-তে ২১ 'মাষা', 'জওয়াবিৎ-এ আলমগীরী', Ethe 415, পৃ. ১৭০ খ, Or. 1641, পৃ. ৪৯ খ, Add. 6598, পৃ. ৪৮ খ)। পুরনো 'দাম' শেষবার তৈরি হওয়ার পর তার যে ক্ষয় হয়েছিল, মার্শালের ওজনে তার জন্য ছাড় দেওয়া হয়েছে ধরে নিলে, এক সেরের জন্য 'দাম'-এর সংখ্যা নিশ্চয়ই ৪০ থেকে বাড়িয়ে ৪২ করার দরকার পড়েছিল (তিনি নিজে আসলে এখানে সেই হারই দিয়েছেন), না হলে ক্রমেই সেরের ওজন কমে যাওয়ার ব্যাপারটি বন্ধ করা যেত না। 'ফরহঙ্গ-এ করদানী', 'Edinburgh ,83, পৃ. ৫ খ-তে 'সের-এ আকবরী', ও 'জাহাঙ্গীরী'-র ক্ষেত্রে প্রচলিত ওজনগুলো দেওয়ার পর 'সের-এ শাহ্‌জাহানী'র ক্ষেত্রে ৪০ ও ৪২ 'দাম' এই দুটি হারই দেওয়া আছে। 'সের-এ আওরঙ্গশাহী'র হিসেবে ৪৪ ও ৪৮ 'দাম'-এর সের-এর মান পাওয়া যায়। প্রথম সংখ্যাটি দিয়ে সম্ভবত পুরনো 'দাম'-এর ওজনে আরও অপচয়ের পরিণাম বোঝায়, কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যাটির কোন ব্যাখ্যা দেওয়া মুশকিল। ঐ একই পুস্তিকায় (পৃ. ৬ ক) দেখানো হয়েছে বাংলায় (যেখানে এই বইটি লেখা হয়েছে) আওরঙ্গজেবের টাঁকশালে তৈরি 'দাম'-এর ওজন ছিল ১৮ 'মাষা'। এও হতে পারে যে দ্বিতীয় সংখ্যাটি দিয়ে এই 'দাম'কেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু, সেক্ষেত্রে ৪৮-এর চেয়ে ৪৭ আরও বেশি নির্ভুল হতো।

১. আহ্‌মেদাবাদের নীল ব্যবসা থেকে দুটি উদাহরণ নেওয়া যায়। ডিসেম্বর, ১৬১৪-য় ইংরেজ কুঠিয়ালরা জানায়: "আমরা এখানে ১১ টাকা মণ দরে ভাল 'সরকেস' (সরখেজ) নীল

মনে হয় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের বাজারগুলোতে ওজনের একমাত্র এবং সার্বজনীন-ভাবে ব্যবহৃত একক হিসেবে গণ্য হওয়ার খুব কাছাকাছি এসেছিল 'মন-এ আকবরী'। অবশ্যই এই মতের সমর্থনে কোন সুনির্দিষ্ট বিবৃতি হাজির করা যাবে না। কিন্তু আমাদের প্রামাণ্য সূত্রগুলোতে অন্য কোন একক সম্বন্ধে নীরবতাই এই মতের ভিত্তি। যেমন, বিভিন্ন পণ্যের দাম লেখার সময়ে আবুল ফজল অন্য কোন ওজনের কথাও বলতে পারতেন যদি কোন একটি বা কয়েকটি পণ্যের ক্ষেত্রে ঐ রকম কোন ওজনের ব্যবহার চালু থাকত। একইভাবে, ১৭ শতকের গোড়ার বছরগুলোর ইংরেজদের নথি-পত্রে আগ্রা বা আজমীরের বাজারের ক্ষেত্রে এমন কোন এককের উল্লেখ আদৌ পাওয়া যায় না যার থেকে অনুমান করা যায় যে আকবরের মণের আগেই ঐ এককের সৃষ্টি হয়েছিল। 'মণ-এ জাহাঙ্গীরী' চালু করার পর এই মণের একচেটিয়া ব্যবহার চলে যায়, যদিও কখনই এটি পুরোপুরি উঠে যায় নি। এর পরে বেশ কয়েক বছর ধরে আগ্রা বাজারে ব্যবহৃত সাধারণ একক হিসেবে এর কথাই পাওয়া যায়।[২] আমাদের আলোচ্য পর্বের পুরো সময় জুড়ে, নিদেনপক্ষে ঐ শতকের অষ্টম দশক অবধি আগ্রা অঞ্চলের নীল ব্যবসায় এই এককটিই চালু ছিল।[৩] একইভাবে রেশম ও অন্যান্য 'উঁচু-জাতের জিনিস',[৪] বিশেষ করে পারা, সিঁদুর ও কস্তুরীর[৫] ব্যবসায় 'মণ-এ আকবরী'ই বহাল থাকে।[৬]

ঠিক কী ধরনের বাণিজ্যে 'মণ-এ জাহাঙ্গীরী' ব্যবহার হতো তা স্পষ্ট নয়। আগ্রার বাজারে এর ব্যবহার সম্বন্ধে যেসব বিবরণ পাওয়া যায় তার বেশিরভাগই অনির্দিষ্ট ধরণের। আমাদের কাছে যে একটিমাত্র নির্দিষ্ট উল্লেখ আছে সেখানে দেখা যায় যে, মোটামুটিভাবে ১৬৫২ সাল অবধি লাক্ষার বাণিজ্যে এর ব্যবহার চলত। অবশেষে তার জায়গা দখল করে 'মণ-এ শাহ্জাহানী।'[৭]

শেষ পর্যন্ত ঐ বাণিজ্যে ব্যবহৃত হওয়া ছাড়াও, মনে হয়, প্রধানত খাদ্যদ্রব্য ও কৃষিজ

কিনি। নতুন (অর্থাৎ, কম শুকনো) নীলের জন্য এরা মণে ৪২ সের ও পুরানোর জন্য ৪১ সের হিসেবে ছাড় দেয়..." ('লেটার্স রিসিভ্‌ড' ২য় খণ্ড, ২৫০)। ১৬৪৭ সালে, তিরিশ বছরেরও পরে, ঐ একই জায়গা থেকে" বাদশাহের (আওরঙ্গজেব) প্রচলিত ৪০ সেরের হিসেবে (নীল) ওজনের ক্ষতিকর প্রথা" সম্বন্ধে অভিযোগ করা হয়েছে ('ফ্যাক্টরিস্, ১৬৪৬-৫০', পৃ. ১৪৩)।

২. হকিন্স, 'আর্লি ট্রাভেলস্', ১০৫; 'লেটার্স রিসিভ্‌ড', ৩য় খণ্ড, ৮৭ (যখন দরবার আজমীরে ছিল সে প্রসঙ্গে); এবং নীচের টীকাগুলোতে অন্যান্য সূত্র দ্রষ্টব্য।

৩. 'লেটার্স রিসিভ্‌ড', ৩য় খণ্ড, ৬৯; পেলসার্ট, ১৬-১৭; 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬২২-২৩', ২৮৪-৮৫; '১৬৩০-৩৩', ৩২৮, '১৬৪২-৪৫', ৮৪; ১৬৪৬-৫০', ২০২; তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, ৩২, ২য় খণ্ড, ৭; ফ্রায়ার, ২য় খণ্ড, ১২৭।

৪. যেমন, ফ্রায়ার, ২য় খণ্ড, ১২৭। আরও দ্রষ্টব্য, 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬১৮-২১', ১৯৪, ২১৩।

৫. 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬৩০-৩৩', ২১৩।

৬. 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬১৮-২১', ৪৭।

৭. 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬৫৫-৬০', ১৮।

উৎপন্নের (নীল বাদে) বাণিজ্যে 'মণ-এ শাহ্‌জাহানী' চালু করা হয়েছিল। ১৬৩৯ ও ১৬৪৬ সালে আগ্রায় চিনি ও লাক্ষাজাত আঠার[৮] ব্যাপারে এর ব্যবহারের কথা জানা যায়। ১৬৫০-এর পরে বাজারের "সাধারণ" মণ হিসেবে এর কথা বলা হতে থাকে।[৯]

পূর্ব ভারতের দিকে তাকালে দেখা যায় প্রামাণ্য সরকারী ওজনগুলোর রদবদলে পাটনার বাজার ঠিক তাল দিয়ে চলছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজস্ব কিছু হেরফেরও করে নিয়েছিল। ১৬২০ সালে পাটনায় যে ইংরেজ কুঠিয়ালদের পাঠানো হয় তারা জানায় যে ঐ জায়গার রেশম ব্যবসায়ে ব্যবহৃত একক 'মণ-এ আকবরী' নয়, বরং ৩৪½ সেরের ভিত্তিতে অন্য এক মণ,[১০] অথবা তারা নিজেরাই অন্যত্র যেমন বলেছে, ঐ মণের ভিত্তি ছিল ৩৩½ 'পাইস' বা 'দাম'।[১১] কিন্তু তারা স্পষ্টতই 'মণ-এ জাহাঙ্গীরী'র কথাই বলতে চাইছিল।[১২] 'দাম'-এর হিসেবে মণের এই কম মান ঐ সময়ে ঐ বিশেষ ব্যবসায়ে বিক্রেতার ছাড় বোঝাতে পারে। অন্য দিকে, মাণ্ডি, ১৬৩২ সালে যিনি পাটনায় গিয়েছিলেন, বলেন যে আপাতদৃষ্টিতে সেখানে সব রকম পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মণের ভিত্তি ছিল ৩৭ 'দাম'-এর সের।[১৩] এর থেকে ক্রেতার জন্য ছাড়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[১৪] 'মণ-এ জাহাঙ্গীরী'র সরকারী উত্তরাধিকারী শেষ পর্যন্ত তাকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছিল, কারণ মার্শাল (১৬৬৮-৭২) বলেন যে তাঁর সময়ে সেখানে মণের ভিত্তি ছিল ৪২ 'দাম' ওজনের সের। ঐ মণের ওজন ছিল ৭৮ আ.দু. পাউণ্ড : "কিন্তু মণ পিছু ২ সের ছাড় দেওয়া ঐ জায়গার প্রথা।"[১৫]

৮. 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬৩৭-৪১', ১৯২ : '১৬৪৬ ৫০', ৬২।

৯. তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, ৩২ ; তেভেনো, ২৫।

১০. 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬১৮-২১', ১৯৩-৯৪।

১১. ঐ, ২০৫, ২১৩।

১২. পাটনা থেকে কেনা জিনিসপত্র পাঠানোর পরিবহণের খরচের হার-কে তারা 'জাহাঙ্গীরী মণ'-এর অঙ্কেই হিসেব করেছে। মোরল্যাণ্ড, 'আকবর টু আওরঙ্গজেব', ৩৩৫, মনে হয়, তাদের বিবৃতিগুলো ভুল বুঝেছেন, কারণ তিনি হিউজেস নামে তাদের একজনের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যার কথা অনুযায়ী পাটনায় 'মণ-এ আকবরী'ও চালু ছিল।

১৩. মাণ্ডি, ১৫৬।

১৪. তুলনীয়, মোরল্যাণ্ড, পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

১৫. মার্শাল, ৪১৯। তাঁর বিবৃতিগুলোর মধ্যে সঙ্গতি নেই। যদি প্রতি মণে ২ সের ছাড় দেওয়া হতো, তার ফলে মনের ওজন প্রায় ৮২ আ. দু. পাউণ্ড হওয়ার কথা, কিন্তু অন্যত্র (১২৭, ১৪৯, ৪১৩) তিনি মণের ওজন বলেছেন মাত্র ৮০ পাউণ্ড। যাই হোক, 'মণ-এ শাহ্‌জাহানী'-র ক্ষেত্রে তিনি খুবই উচু মান দিয়েছেন। ভাবতে লোভ হয় যে, সের প্রতি ৪২ 'দাম' ওজন দিয়ে আসলে 'মণ-এ শাহ্‌জাহানী'র ওজন বৃদ্ধি বোঝাচ্ছে, যেটা প্রথমে ৪০ দাম'-এর সেরের হিসেবে হয়েছিল। কিন্তু মার্শাল নিজেই 'দাম'-মুদ্রার যে-ওজন দিয়েছেন (পৃ. ৪২১) তার থেকেই এই ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয় ; আগেই দেখা গেছে, ঐ ওজন দিয়ে পরিষ্কারভাবে ধাতুক্ষয়ের দরুন ওজন কমে যাওয়ার ব্যাপারটি বেরিয়ে আসে।

বাংলায় 'মণ-এ আকবরী'র প্রকৃত ব্যবহার সম্পর্কে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, কিন্তু 'মণ-এ জাহাঙ্গীরী'র কথা প্রায়ই দেখা যায়। ১৬৩৪ সালে ইংরেজরা সীসা বিক্রী করেছিল এই ওজনে।[১৬] ১৬৪২ সালে দেখা যায় যে, বালাশোর থেকে পাঠানো কাপড় ও চিনির ওপর তারা চালানের খরচ ধরেছে যথাক্রমে ৬৪ ও ১২৮ আ. দু. পাউণ্ড-এর মণ দরে।[১৭] ওজন দুটি নিঃসন্দেহে 'মণ-এ জাহাঙ্গীরী' ও তার দ্বিগুণ। ১৬৫৭ সালে আনুষ্ঠানিক সাক্ষ্যদানের সময়ে একজন পর্তুগীজ ব্যবসায়ী 'বেঙ্গলা-র মাও'কে ৬৪ 'আরেট' বা ৬৪.৬৪ আ.দু. পাউণ্ড-এর সমান ধরেছে,[১৮] অর্থাৎ ঐ সময় অবধি ঐ প্রদেশে 'মণ-এ জাহাঙ্গীরী' বহাল ছিল। কিন্তু ১৬৫৯ সালে বালাশোরে তুলো থেকে পাকানো সুতোর ব্যবসায়ে 'মণ-এ শাহ্জাহানী'র ('৭৫ পাউণ্ড-এর মণ') ব্যবহার দেখা যায়,[১৯] যদিও আওরঙ্গজেবের আমলের শেষদিকের একটি পুস্তিকার মতে বাংলা ও ওড়িশার (মনে হয় পুস্তিকাটি লেখার সময়ে) প্রধানত ঐ পণ্যেরই ব্যবসায় 'মণ-এ জাহাঙ্গীরী' ব্যবহার হতো।[২০] ঐ সময়ের পর থেকে ইংরেজদের বাণিজ্যিক নথিপত্রে ঐ প্রদেশের বিভিন্ন বাজারের জন্য যেসব মণের কথা পাওয়া যায়, মনে হয়, সেগুলি 'মণ-এ শাহ্জাহানী'রই সমান বা তার থেকে সামান্য আলাদা।[২১] কিন্তু সবচেয়ে বড় হেরফের হয়েছিল শস্য ব্যবসায়, যেখানে মণের ভিত্তি ছিল ৪০ 'দাম'-এর সের।

১৬. 'ফ্যাক্টরিস্', ১৬৩৪-৩৬', ৪৯।

১৭. 'ফ্যাক্টরিস্', ১৬৪২-৪৫', ৭২। মোরল্যাণ্ড বলেন, 'ওলন্দাজ নথিপত্রে ১৬৩৬ সালে হুগলীতে এবং ১৬৪২ সালে বালাশোরে মোটামুটি ৬৬ পাউণ্ড (আ. দু) ওজনের এক মণের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু ১৬৪৫ সালে পিপলী বন্দরে শাহ্জাহানী মণের ব্যবহার ছিল ('আকবর টু আওরঙ্গজেব', ৩৩৫)। এই টীকার শুরুতেই 'ফ্যাক্টরিস্'-এর যে পৃষ্ঠার কথা দেওয়া আছে শেষ বিবৃতিটি প্রসঙ্গে তিনি সেই পৃষ্ঠারই উল্লেখ করেছেন। মনে হয়, তিনি ওলন্দাজ ও ইংরেজি সূত্রগুলো গুলিয়ে ফেলেছেন।

১৮. মাস্টার, ২য় খণ্ড, ৬২।

১৯. 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬৫৫ ৬০', ২৯৭।

২০. 'ফরহঙ্গ-এ কারদানী', Edinburgh 83, পৃ. ৬ খ-৭ ক। ব্যবহৃত শব্দটি হলো 'সুত'।

২১. 'মার্শাল, ৪১৯, বলেছেন যে হুগলীতে মণের ওজন ছিল ৭৩ আ. দু. পাউণ্ড, কিন্তু বাউরে, ২১৭, বলেছেন ৭০ পাউণ্ড। দ্বিতীয় জন বালাশোরের মণের মান দিয়েছেন ৭৫ আ. দু. পাউণ্ড এবং কাশিমবাজারে ৬৮ পাউণ্ড। তার মানে, ঐ মণ ছিল খাবারদাবার ওজনের জন্য ব্যবহৃত মণের সমান। এই দুটি এককের ক্ষেত্রে মার্শাল একটি আকর্ষণীয় পার্থক্য করেছেন : প্রথমটির সের ছিল ৪২ 'শাহ্জাহান' পয়সার ওজনেও সমান, এবং প্রত্যেক পয়সার ওজন ১৯¼ মাষা, যার নাম ছিল 'বাজার ওজন'। অন্যটির সের ছিল ৪০ 'মদুসে' [মধুশাহী] পয়সা, হুগলীর 'কুঠি-ওজনে' যার ওজন ১৮½ মাষা (পৃ. ৪২১)। ঐ বিশেষ পয়সার ওজন অনুযায়ী দ্বিতীয় মণটির ওজন হবে প্রায় ৬২·৩ আ. দু. পাউণ্ড। কিন্তু, 'ফরহঙ্গ-এ কারদানী', Edinburgh 83, পৃ. ৬ ক-তে মধুশাহী পয়সার ওজন ১৬ মাষা বলা হয়েছে। সম্ভবত মার্শাল এখানে আওরঙ্গশাহী পয়সার (আঞ্চলিক টাঁকশালে তৈরি ?) কথা বলতে চেয়েছিলেন, ঐ একই পুস্তিকায় যার ওজন দেওয়া আছে ১৮ 'মাষা'।

ব্যবসায় এই মণই বহাল ছিল, তার ফলে পুরনো 'দাম' ক্ষয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চূড়ান্ত ওজনের অঙ্কে এবং অন্যান্য জায়গার মণের-ওজনের তুলনায় ঐ মণ কমে যায়।[২২] কিন্তু ধারণক্ষমতা মাপার জন্য প্রচলিত আঞ্চলিক পদ্ধতির বিষয়টিও বাদ দেওয়া উচিত হবে না। এই মাপের ভিত্তি ছিল 'গউনি' বা ঝুড়ি; বলা হয়েছে যে বাংলা ও ওড়িশায় খাদ্যশস্যের ব্যবসায় এটিই চালু ছিল।[২৩]

লাহোরের বাজারে ব্যবহৃত এককগুলো সম্বন্ধে আমাদের খুব একটা তথ্য নেই। ১৬৩৯ সালে চিনি ও নীলের যে দাম সেখানে চালু ছিল, তাকে 'পাকা-মণ' এবং 'বড়-মণ'[২৪]-এর উল্লেখ করা হয়েছে। সে সময়ে ঐ দুটি নাম দিয়েই 'মণ-এ শাহ্‌জাহানী' বোঝানো উচিত। মুলতানে ঐ দুটি পণ্যের দাম প্রসঙ্গে 'বড়-মণ' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে।[২৫] স্বীকৃত ওজনের তালিকার মধ্যে 'জওয়াবিৎ-এ আলমগীরী'-তে "'মানী' অর্থাৎ (মূলে তাই আছে!) 'তোপা', এক ধরনের কাঠের পরিমাপে"র উল্লেখ আছে; এর ওজন দেওয়া হয়েছে লাহোরে ৬ ও মুলতানে ১২ মণ (-এ শাহ্‌জাহানী)।[২৬] সামান্য অদলবদল করে আয়তন মাপার এই পদ্ধতি এখনও পর্যন্ত পাঞ্জাবে টি'কে আছে; বিশেষ করে প্রাচীন ব্যবসায়ে এর ব্যবহার হয়।[২৭]

১৬৩৫ সালে যে ইংরেজ কুঠিয়ালরা সিন্ধুপ্রদেশে গিয়েছিলেন, তাঁরা দেখেছিলেন যে সেহ্‌ওয়ানে নীলের ব্যবসায় তখনও পর্যন্ত 'মণ-এ জাহাঙ্গীরী'ই চালু ছিল, থাট্টার

২২. 'ফরহঙ্গ-এ কারদানী', Edinburgh 83, পৃ. ৫ খ-৬ ক: "'মুরাদী' (বা 'দাম') 'শাহ্‌-জাহানী'র অঙ্কে 'বঙ্গালী'-তে (শস্য ব্যবসা) প্রতিষ্ঠিত ওজন চল্লিশ (সেরের) ওজন।" তুলনীয়, বাউরে, ২১৭: "গোটা হুগলীনদী জুড়ে শস্য, ঘি, তেল বা যে-কোন তরল জিনিসের ক্ষেত্রে মণে মাত্র ৬৮ পাউণ্ড পাওয়া যায়।"

২৩. Or. 1840, পৃ. ১৮৭ক; 'ফরহঙ্গ-এ কারদানী', Edinburgh 83, পৃ. ৬ খ-৭ ক। দুটি সূত্রেই 'গউনি'কে লেখা হয়েছে 'গউদি'। এই মাপের জন্য দ্রষ্টব্য উইলসন-এর 'গ্লসারি', ১৭০, 'কটক ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার', ১৯০৬, পৃ. ১৪৪-এ বলা হয়েছে যে বর্তমান মান অনুযায়ী 'গউনি'র ওজন ১½ থেকে ৭ সেরের মধ্যে ওঠানামা করে। এখন শুধুমাত্র ওড়িশায় এই মান দেখা যায়।

২৪. 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৩৭-৪১', পৃ. ১৩৫.

২৫. ঐ, ১৩৬।

২৬. 'জওয়াবিৎ এ আলমগীরী', 'Ethe 415, পৃ. ১৭১ ক; Or. 1641, পৃ. ৫০ ক; Add. 6598, পৃ. ১৫৩ ক।

২৭. জেলা গেজেটিয়ারগুলোতে বিভিন্ন আঞ্চলিক মাপের যে-বিবরণ আছে তার থেকে দেখা যায়, 'তোপা'-র আয়তন যাই হোক না কেন, এর সঙ্গে পরের উচ্চতর একক 'পাই'-এর অনুপাত সর্বত্রই সমান, অর্থাৎ ৪ 'তোপা'য় এক 'পাই', মুলতানে এবং লাহোর জেলার, মণ্টগোমরি ও রেচনা ভূখণ্ডে যথাক্রমে ৮০ ও ৫০ পয়সায় এক 'মণি' বা মহ্‌নি' হয় ('লাহোর ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার', ১৮৯৩-৯৪, পৃ. ১৯৪-৫; 'মণ্টগোমরি ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার', ১৮৯৮-৯৯, পৃ. ১৮২-৮৩; 'মুলতান ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার', ১৯০১-০২, পৃ. ২৫৮)।

বাজারে চলত 'মণ-এ শাহ্‌জাহানী'।[২৮] এর পর থেকে সিন্ধুপ্রদেশে, অন্তত নীলের ব্যবসায়, শুধুমাত্র দ্বিতীয় এককটিরই উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৯] এই প্রদেশেই প্রথম উত্তর-পশ্চিম ভারতে মণের বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বী, 'খরওয়ার' বা 'গাধা-বোঝাই'-এর দেখা মেলে।[৩০] ১৬৩৪ সালে সেহ্‌ওয়ানে সব রকম খাদ্যশস্যের পরিমাণ জানানোর জন্য এর ব্যবহার দেখা যায়। এটিকে তখন ৯ বা ১০ 'মণ-এ জাহাঙ্গীরী'র সমান ধরা হয়েছিল, অর্থাৎ ৫৯৭.৩ বা ৬৬৩.৮ আ. দু. পাউণ্ড।[৩১] ১৬৩৫ সালে ইংরেজ কুঠিয়ালরা থাট্টার 'কোরওয়াউর'কে ৮ 'মণ-এ শাহ্‌জাহানী' বা মোটামুটি ৫৯০ আ. দু. পাউণ্ড-এর সমান বলে ধরেছিলেন।[৩২]

সিন্ধুপ্রদেশে 'খরওয়ার' ও মণ পাশাপাশি চালু থাকলেও, কাশ্মীরে ছিল 'খরওয়ার'-এর একমাত্র আধিপত্য।[৩৩] কাশ্মীরের এক 'খরওয়ার'-কে আবুল ফজল ৩ মণ ৮ সের 'আকবরশাহী' ওজন,[৩৪] অর্থাৎ ১৭৭.০২ আ. দু. পাউণ্ড-এর সমান বলে ধরেছেন। এটি জনৈক আধুনিক লেখকের নির্ণীত ওজন, ১৭৭.৭৪ পাউণ্ড-এর প্রায় সমান।[৩৫]

২৮. 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬৩৪-৩৬', পৃ. ১৩১। সেহ্‌ওয়ানে ১৬৩৪ সালে লেখা 'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী'-তে 'মণ-এ শাহ্‌জাহানী'র আদৌ কোন উল্লেখ নেই, কিন্তু 'মণ-এ জাহাঙ্গীরী'র উল্লেখ আছে দুবার (পৃ. ১৪৬, ১৮২)।

২৯. 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬৩৭-৪১', পৃ, ২৭৪, ২৭৬।

৩০. 'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী', ১৮২-৮৫। এক 'খারওয়ার' হতো ৬০ 'কাসা'য় এবং ৪ 'তোয়া'য় এক 'কাসা' (পৃ. ১৮২ ; আরও দ্রষ্টব্য পৃ. ১৪৬ ও ১৭২)।

৩১. 'মজহার-এ শাহ্‌জাহানী'র এক জায়গায় ৫ 'কাসা'কে ৩০ 'সের-এ জাহাঙ্গীরী'-র সমান ধরা হয়েছে (পৃ. ১৪৬), কিন্তু অন্যত্র বলা হয়েছে যে "পাথরের ওজনে" এক 'কাসা' ৬$\frac{১}{৮}$ 'সের-এ জাহাঙ্গীরী' ও ১$\frac{১}{২}$ 'দাম'-ওজনের সমান (পৃ. ১৮২)।

৩২. 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৩৪-৩৬', পৃ. ১৩৩।

৩৩. 'আইন', ১ম খণ্ড, ৫৭০ এ কাশ্মীরে চালু ওজনগুলোর এই মানভেদ দেওয়া হয়েছে : ২ 'দাম' ওজন = ১ 'পল', ৭$\frac{১}{২}$ 'পল' = ১ 'সের' ; ৪ সের = ১ মণ ; ৪ মণ = ১ 'ত্রক', ১৬ 'ত্রক' = ১ 'খরওয়ার'। ব্লখমান-এর পাঠে এই হিসেবগুলো দেওয়ার সময় একটা মান বাদ পড়ে গেছে, যার ফলে ৪ সের সমান ১ 'ত্রক' হয়ে যায় (জ্যারেট-এর অনুবাদ, ২য় খণ্ড, যদুনাথ সরকার সম্পা. ৩৬৬-তে ভুলটি শোধরানো হয় নি)। Add. 7652 এবং Add. 6552-এর পাঠ যথেষ্ট পরিষ্কার এবং 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ৩১৫ থেকেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। আজও ঐ একই মান চলে, কারণ ৩০ 'পল'-কে এক 'মণওয়াতা'-র সমান ধরা হয় (ডব্লু. আর. লরেন্স, 'দা ভ্যালি অফ কাশ্মীর', লণ্ডন, ১৮৯৫, পৃ. ২৪২)।

৩৪. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, ৫৪৮ ; 'আইন', ১ম খণ্ড, ৫৭০।

৩৫. ডব্লু. আর লরেন্স, পূর্বোক্ত গ্রন্থ। মণ-এর অঙ্কে কাশ্মীরী এককগুলো কত হয় তা লেখার সময় জাহাঙ্গীর ('তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ২৯৭, ৩১৫) আবুল ফজল থেকে সরাসরি নকল করেছেন, যদিও তিনি (জাহাঙ্গীর) নিজেই প্রামাণ্য সরকারী ওজনের রদবদল করেছিলেন।

১৬২২ সালে মুঘল দখিনের বুরহানপুরে নিশ্চয়ই 'মণ-এ জাহাঙ্গীরী'র ব্যবহার চালু ছিল। ইংরেজরা তখন এই ওজনেই তাদের সীসা বিক্রি করেছিলেন।[৩৬] কিন্তু, মনে হয়, 'মণ-এ আকবরী' সেখানেও অনেকদিন টিঁকে ছিল, কারণ শাহ্‌জাহানের রাজত্বের দশম বছরে দৌলতাবাদ দুর্গের বাদশাহী ভাণ্ডারের এক সরকারী তালিকা 'খাসা-এ শরিফা'য় বেশ কিছু জিনিস, কামানের গোলা, গন্ধক ইত্যাদির ওজন পরিষ্কারভাবে 'মণ-এ আকবরী'র অঙ্কেই দেওয়া হয়েছে।[৩৭] তালিকাটির শেষে আছে কিছু খাওয়ার জিনিস (যেমন, সুপুরি, পোস্তর বীজ, ভাঙ, এবং বজরীর দানা) ও একটা কড়াই।[৩৮] তাদের পরিমাণের ক্ষেত্রেও 'মণ-এ শাহ্‌জাহানী' ব্যবহার করা হয়েছে। আনুমানিক ১৬৩৮ সালের এক দলিলে গন্ধক, কাঠকয়লা ও সোরার ওজনের জন্যও 'মণ-এ শাহ্‌জাহানী'র ব্যবহার দেখা যায়।[৩৯] আর ভীমসেন তাঁর স্মৃতিকথায় আওরঙ্গজেবের রাজত্বের গোড়ার দিকে দখিন প্রদেশগুলোতে চলতি দামের প্রসঙ্গে 'মণ-এ শাহ্‌জাহানী' ব্যবহার করেছেন।[৪০]

সম্ভবত গুজরাটে প্রচলিত মণ সেই অঞ্চলেরই সৃষ্টি, কিন্তু প্রশাসনিক ব্যবস্থা মারফৎ, অন্তত আংশিকভাবে, এর ওজন ঐ সময়ের বাদশাহী প্রামাণ্য ওজনের ঠিক অর্ধেক রাখা হয়েছিল। ১৬১১ সালে সুরাটে ২৭ বা ২৭.৫ পাউণ্ড—অর্থাৎ, 'মণ-এ আকবরী'র অর্ধেক—ওজনের একটি 'ছোট' মণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৬১৪ সালে আবার বলা হয়েছে যে "হাতীর দাঁত, সোনা ও রুপোর ক্ষেত্রে" এই মণ ব্যবহার করা হয়।[৪১] কিন্তু তারপরে আর এর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। নিশ্চয়ই এর ব্যবহার পুরোপুরি উঠে গিয়েছিল। এরপর থেকে শুধুই 'বড়' মণেরই দেখা পাওয়া যায়: এর ভিত্তি ছিল ১৮ 'দাম'-ওজনের সের, সুতরাং এটি 'মণ-এ জাহাঙ্গীরী'র অর্ধেক। সে হিসেবে নিশ্চয়ই এর ওজন ছিল ৩৩.১৯ আ.দু. পাউণ্ড এবং ইংরেজ ও ওলন্দাজ

৩৬. 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬২২-৩', ৩০ ; 'সেরে ৩৬ পয়সার মণ এবং ৪২ সেরে মণ', তার মানে, বোঝাই যায় ব্যবসার ক্ষেত্রে শতকরা ৫ ভাগ ছাড় দেওয়া হতো।

৩৭. 'সিলেক্টেড ডকুমেন্টস্ অফ শাহ্‌জাহানস্ রেন', ৯২-৯৮। আরও তুলনীয়, ঐ সূত্রে, পৃ. ২১৯-২২০-তে একটি তারিখ-বিহীন নথি।

৩৮. 'সিলেক্টেড ডকুমেন্টস্ অফ শাহ্‌জাহানস রেন', পৃ. ৯৮। 'মণ-এ শাহ্‌জাহানী'-কে বলা হয়েছে 'মণ বা ওয়জ্‌ন্-এ চিহাল-দামী' (চল্লিশ 'দাম'-ওজন-এর মণ)।

৩৯. ঐ, ২২৩। এখানে 'মণ বা-ওয়জ্‌ন্-এ শাহ্‌জাহানী' শব্দটি ব্যবহারও করা হয়েছে। দলিলটিতে কোন তারিখ নেই, কিন্তু বগলানার বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতির উল্লেখ থেকে আনুমানিক সময় স্থির করা যায়।

৪০. 'দিলকুশা', পৃ. ২০ খ। 'জওয়াবিৎ-এ আলমগীরী', Ethe 415, পৃ. ৭১ ক, Or. 1641, পৃ. ৫০ ক, Add. 6598, পৃ. ১৫৩ ক, থেকে মনে হয় দক্ষিণী একক 'খণ্ডী'কে—ইউরোপীয় বাণিজ্যিক লেখাপত্রে 'কাণ্ডি' (Candy)—তার প্রচলিত মান ২০ মণের হিসেবেই দখিন প্রদেশের সরকারী মানক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে এই মানটিকে 'মণ-এ শাহ্‌জাহানী' বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

৪১. 'লেটার্স রিসিভড্', ১ম খণ্ড, ৩৪ ; ফস্টার, 'সাপ্লিমেণ্টারি ক্যালেণ্ডার', ৪৭।

নথিপত্র থেকে সাধারণত এই মানটিই সমর্থিত হয়।[৪২] সবরকম জিনিসের জন্যই এই মণের ব্যবহার হতো—বা, একটি সূত্র যেমন বলেছে—এটি ছিল "মাখন, চিনি, নীল, সোরা, কাঠ, নুন ইত্যাদি এবং যা কিছু ওজন করার যোগ্য"[৪৩] তারই ক্ষেত্রে ব্যবহার্য। শুধুমাত্র সুরাট ও আহ্‌মেদাবাদ নয়, "প্রকৃতপক্ষে সারা গুজরাট জুড়েই"[৪৪] এই মণের প্রচলন ছিল। ১৬৩৪-এ বা তার আগে 'মণ-এ শাহ্‌জাহানী' চালু করার ফলে সেই অনুযায়ী গুজরাট মণেরও রদবদল হয়েছিল। এটিকে তখন সের প্রতি ২০ 'দাম'-এ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৬৩৫-এ ও ১৬৩৬-এর গোড়ার দিকে যথাক্রমে সুরাট ও আহ্‌মেদাবাদে এক বাদশাহী ফরমান জারি করে এই নতুন ওজন চালু করে দেওয়া হয়।[৪৫] এই নতুন মণের ওজন ৩৬.৩৮ পাউণ্ড হওয়ার কথা। একটি ইউরোপীয় সাক্ষ্য থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।[৪৬] এই পরিবর্তনের পর পুরনো মণের আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, নতুন মণই তার পুরো জায়গা দখল করে নেয়। যেসব জিনিসে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের আগ্রহ ছিল শুধু যে সেগুলোই

৪২. ইংরেজদের ওজনের হিসাব ৩২ থেকে ৩৩ আ. দু. পাউণ্ড-এর মধ্যে ছিল ('লেটার্স রিসিভ্‌ড্', ১ম খণ্ড, ৩৪, ২৪১; ২য় খণ্ড, ২১৪, ২৩৮; ৩য় খণ্ড ১১; ফস্টার, 'সাপ্লিমেণ্টারি ক্যালেণ্ডার', ৪৭; 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬১৮-২১', ৬০, ৭৬; ক্রায়ার, ২য় খণ্ড, ১২৬), একটি হিসেবে ('লেটার্স রিসিভ্‌ড্', ৩য় খণ্ড, ৬৯) এটির খুব কম মান, ৩০ আ. দু. পাউণ্ড দেখা যায়। পেলসার্ট, পৃ. ৪২, বলেন যে এটির ওজন ছিল ৩০ ডাচ পাউণ্ড, বা ৩২.৭ আ. দু. পাউণ্ড. কিন্তু ব্রোয়েকে (*JIH*, ভাগ ১১, ১০) এবং ভান ট্যুইস্ট (*JIH*, ভাগ ১৬, ৭২)-এ এটির মান আছে ৩০½ ডাচ পাউণ্ড বা ৩৩.২ আ. দু. পাউণ্ড।

৪৩. ভান ট্যুইস্ট, *JIH*, ভাগ ১৬, ৭২।

৪৪. পেলসার্ট, ৪২। বরোচ বা বরোদায় ব্যবসারত কুঠিয়ালরা আলাদা কোন মণের কথা বলেননি—এই ঘটনা থেকেও এ সিদ্ধান্তে আসা যায়। বলা হয়েছে যে, খামবায়াৎ-এ (কাম্বে) আফিম বিক্রি হতো '১৭ পয়সা সেরের হিসেবে ৪৫ সেরে এক মণের ভিত্তিতে'; মনে হয় বিশেষ কিছু কিছু বাণিজ্যিক ছাড়ের ফলেই এরকম ঘটেছিল ('লেটার্স রিসিভ্‌ড্', ৩য় খণ্ড, ৪১)।

৪৫. 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৩৪-৬', ১৪৩, ১৪৬।

৪৬. 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬৪৬-৫০', ২০৬ এবং ক্রায়ার, ২য় খণ্ড, ১২৬-এ আছে ৩৭ আ. দু. পাউণ্ড; 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬৬১-৫', ১১৩-এ আছে ৩৬½ পাউণ্ড। মোরল্যাণ্ড বলেন, 'ওলন্দাজরা একে ৩৪½ (হল্যাণ্ড পাউণ্ড) বলে ধরত' ('আকবর টু আওরঙ্গজেব', ৩৩৬), যার মানে ৩৭.৬ আ. দু. পাউণ্ড। তাভার্নিয়ে (২য় খণ্ড, ৭, ১৪) এর মান ধরেছেন ৩৪½ বা ৩৪ ফরাসী লিভ্‌র্ (বা দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে, মোরল্যাণ্ডের হার অনুযায়ী, যথাক্রমে ৩৭.৬ বা ৩৭.০৬ আ. দু. পাউণ্ড-এর সামান্য কম)। তেভেনো, ২৫, বলেছেন সুরাটের সের ছিল ১৪ ফরাসী আউন্স-এর সমান। তাহলে মণের ওজন ৩৫ ফরাসী পাউণ্ড বা ৩৮.১৫ আ. দু. পাউণ্ড হওয়া উচিত। কিন্তু ওজন তাহলে খুব বেশি হয়ে যায়। অন্যদিকে, ওভিংটন, ১৩৩, যখন বলেন এক সের = ১৩½ আ. দু. আউন্স, তাহলে মণ = ৩৩.৩ পাউণ্ড, তিনি নিঃসন্দেহে এই ওজন কমিয়ে ধরেছেন।

এই নতুন মণে বিক্রি হতো তা নয়, এছাড়াও "সব ধরনের শস্য ও অন্যান্য ওজনের জিনিস"ও এতেই বেচাকেনা চলত।[৪৭] আমাদের আলোচ্য পর্বের বাকি অংশের ক্ষেত্রে এটি আর পাল্টায়নি বলেই মনে হয়।[৪৮]

৩. ইউরোপীয় সূত্রগুলোতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ওজন

যেহেতু আমাদের প্রামাণ্য ইউরোপীয় সূত্রগুলোতে প্রায়ই ইউরোপীয় ওজন ব্যবহার করা হয়েছে, তাদের মানগুলিও তাই মনে রাখতে হবে। ইংরেজ কুঠিয়ালরা সর্বদাই আভোয়াদুপোয়াজ ('ইংলিশ' বা 'হ্যাবেরদেপোয়াজ' ইত্যাদি) ওজন ব্যবহার করত আর ওলন্দাজদের ব্যবহৃত একক ছিল অ্যামস্টারডাম পাউণ্ড, যেটি ০.৪৯৪ কিলোগ্রাম বা ১.০৯ পাউণ্ড (আ.দু. পাউণ্ড)-এর প্রায় সমান।[১] মোরল্যাণ্ড বলেন যে, "এই পর্বের ফরাসী লিভ্‌র্‌ ওলন্দাজ পাউণ্ড-এর চেয়ে ওজনে অল্প কম ছিল,"[২] যার থেকে মনে হয় এর মান ছিল বল-এর নির্ণীত মানের চেয়ে অনেক কম।[৩] কিন্তু তাভার্নিয়ে এবং তেভেনো-র দেওয়া 'মণ-এ শাহজাহানী'র মানের ব্যাপারে একটি পাদটীকায় যেরকম আলোচনা করা হয়েছে তার থেকে মনে হয় যে, ঐ দুজন ফরাসী পর্যটক যে-লিভ্‌র্‌ ব্যবহার করছিলেন তার ক্ষেত্রে এমনকি মোরল্যাণ্ড-এর দেওয়া হারও খুব বেশি হয়ে যায়। পর্তুগীজরা মোটামুটি ১৩০ আ.দু. পাউণ্ড[৪] ওজনের 'কুইন্টাল' বা 'কিণ্টাল' ও ১.০১ পাউণ্ড-এর 'আরাতেল' ব্যবহার করত।[৫]

নীল ও চিনির ব্যাপারে ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ও কুঠিয়ালরা আরেক গুচ্ছ শব্দ ব্যবহার করেছেন—যেমন, 'চার্জ', 'বেল', 'ফার্ডল্‌'। সবগুলো দিয়েই বোঝায়: অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য ভারবাহী জন্তুর পিঠে চাপিয়ে পাঠানোর পক্ষে সুবিধাজনক ওজন ও আয়তনের গাঁঠরি। তাহলে মোটের ওপর এগুলো হলো ষাঁড় বা মোষ

৪৭. ফ্রায়ার, ২য় খণ্ড, ১২৬।

৪৮. তুলনীয়, ঐ। ওভিংটন (১৬৯০-৯৩ খৃস্টাব্দ) এর জন্য যে-মান দিয়েছেন, ৩৩.৩ আ. দু. পাউণ্ড, সেটা কি পুরনো 'দাম' ক্ষয়ে যাওয়ার দরুন ওজন কমে যাওয়ার সূচক?

১. 'আকবর টু আওরঙ্গজেব', ৩৩৩।

২. ঐ।

৩. তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, ৩৩১।

৪. 'আকবর টু আওরঙ্গজেব', ৩৩৪।

৫. 'রিলেশনস্‌', পৃ. ৯০। বলা হয়েছে, ১৬ আউন্স-এর "নতুন" 'আরাতেল'-এর মান নাকি এ-ই ছিল। ১৪-আউন্স-এর পুরনো 'আরাতেল' "ভারতে ১৬ শতকের শেষের আগে এক মরিচের ব্যবসায় ছাড়া আর কোথাও চলত না।"

বা উট-বোঝাই ভার বা তার অর্ধেক।[৬] শব্দগুলো থেকে কোন নির্দিষ্ট ওজন পাওয়া যায় না বটে কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জিনিসের প্রথাগত ওজনের ক্ষেত্রে এগুলোর ব্যবহার ছিল, আর সে ওজন হয়তো জন্তুর মালিক ও গাড়োয়ানের পক্ষেও গ্রহণযোগ্য হতো। ইংরেজ ও ওলন্দাজরাও নিজেদের সুবিধার জন্য এসব ওজনের একটা প্রামাণ্য রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। যেমন, আগ্রায় নীলের যে গাঁঠরি ধরা হতো তার ওজন ছিল ৪ 'মণ-এ আকবরী'র একটু ওপরে।[৭] ১৬৮৩ সালে বাংলার কাশিমবাজারে চিনির গাঁঠের ওজন বলা হয়েছে '২ মণ ৬½ সের, কুঠি ওজন'।[৮] বাউরি-র দেওয়া কাশিমবাজার মণের মান অনুযায়ী[৯] এটি প্রায় ২ 'মণ-এ শাহ্‌জাহানী' হওয়ার কথা।[১০] ১৬১৯ সালে গুজরাটের আহ্‌মেদাবাদে ইংরেজরা নীলের গাঁঠের ওজন ঠিক করেছিল সর্বাধিক ৪ সুরাট মণ[১১] (সের পিছু ১৮ 'দাম'-এ), কিন্তু পরে

৬. তুলনীয়, 'আকবর টু আওরঙ্গজেব', ৩৪০-৪১। মাণ্ডি, ৯৫, বলেন যে আগ্রা থেকে পাটনা যাওয়ার সময় তিনি দেখেছিলেন বলদ '৪ বড় মণ' ওজনের বোঝা বইছে। যদি 'মণ-এ জাহাঙ্গীরী'র কথা বলা হয়ে থাকে তবে প্রতিটি বোঝার ওজন হবে ২৬৫.৫ আ. দু. পাউণ্ড। বলদ বোঝাই-এর ওজনকে ধরা হয়েছে ২½ হাণ্ড্রেডওয়েট বা ২৮০ আ. দু. পাউণ্ড (পৃ. ৯৮)। তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, ৩২, বলেন যে বলদ বইতে পারত ৩০০ বা ৩৫০ 'লিভ্র্' অর্থাৎ ৩২৭.০ বা ৩৮১.৫ আ. দু. পাউণ্ড।

৭. ১৬১৫ সালে সুরাটে কুঠিয়ালরা জানান যে আগ্রা থেকে আনানো নীচের প্রতি 'ফার্ডল্' 'মোটামুটি হিসেবে' ৬½ মণের সমান। এই মণ সম্ভবত সুরাট মণ। তাহলে প্রতি 'ফার্ডল্' সমান ৪ 'মণ-এ আকবরী'র অল্প কিছু কম ('লেটার্স রিসিভ্ড্', ২য় খণ্ড, ১৯৪)। ১৬১৭ সালে আগ্রায় গাঁট-বাঁধা অবস্থায় নীলের 'ফার্ডল্' ওজনের হিসেব দিয়েছেন হিউজেস। ঐ হিসেব থেকে বোঝায় যে এক 'ফার্ডল্'-এ 'নীট' ৪.১ 'মণ-এ আকবরী' ধরত, অর্থাৎ যা দিয়ে গাঁট বাঁধা হয়েছে স্পষ্টতই তাকে হিসেবে আনা হয়নি (ঐ, ৪র্থ খণ্ড, ২৩৬)। ১৬২১ সালে মুঘল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এক অভিযোগপত্রে এক 'চার্ল' আগ্রা নীলের ওজন দেওয়া হয়েছে ৪½ 'মণ-এ আকবরী', কিন্তু ঘটনাটি এমনই যে স্বাভাবিকভাবেই বাড়িয়ে বলার ঝোঁক চাপে ('ফ্যাক্টরিস্, ১৬২২-৩', ২৮৪-৫)। ১৬৩৩-৩৪ ও ১৬৪৩ সালে এক 'বেল' বায়ানা নীলের ওজন দেওয়া হয়েছে ঠিক ৪ মণ (ঐ, '১৬৩৪-৬', পৃ. ১; '১৬৪২-৫', পৃ. ৪৮)। পেলসার্ট-ও (পৃ. ১৬-১৭) এক 'বেল' আগ্রা নীলের ওজন নীট ৪ মণের সমান ধরে হিসেব করেছেন। মোরল্যাণ্ড ('আকবর টু আওরঙ্গজেব', ৩৪০-৪১) বলেছেন যে, ওলন্দাজ নথিপত্রে এর ওজন দেওয়া হয়েছে ২৩০-২৪০ আ. দু. পাউণ্ড, অর্থাৎ নীলের ব্যবসায়ে ব্যবহৃত একক 'মণ-এ আকবরী'র হিসেবে ৪.২৫ থেকে ৪.৫ মণের মধ্যে। কিন্তু এই ওজনের মধ্যে যা দিয়ে বাঁধা হয়েছে তার ওজনও থাকতে পারে।

৮. হেজেস, ১ম খণ্ড, ৭৫।

৯. বাউরি, ২১৭।

১০. 'ওলন্দাজ নথিপত্রে' মোরল্যাণ্ড (পূর্বোক্ত গ্রন্থ) বাংলার রেশমের যে ওজন পেয়েছিলেন (১৪৩ আ. দু. পাউণ্ড) এটি তার খুবই কাছাকাছি।

১১. 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬১৮-২১', পৃ. ৭৬।

এর চেয়ে সামান্য বেশি ওজনের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১২] ওলন্দাজ নথিপত্রে গুজরাট চিনির এক গাঁঠকে ২০ 'দাম'-এ এক সেরের হিসেবে ৮ মণের সমান ধরা হয়েছে।[১৩]

১২. ১৬২৯-এ '৪ মণ, ৭ সের' ('ফ্যাক্টরিস্, ১৬২৪-২৯', পৃ. ২৩০)। ওলন্দাজ নথিপত্রে মান দেওয়া আছে গাঁট-পিছু ১৪৫·১৫৫ আ. দু. পাউণ্ড। মোরল্যাণ্ড সেটি উদ্ধৃত করেছেন ('আকবর টু আওরঙ্গজেব', ৩৪০, ৩৪২)। ১৬৫৬-র 'ওল্ড করেসপণ্ডেস'-এর একটি চালানের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। সেখানে এক গাঁট গুজরাট নীলের ওজন ধরা হয়েছে নীট ১৪৮ পাউণ্ড, বা স্পষ্টতই, ২০ 'দাম'-এর সেরে ৪ মণ।

১৩. 'দাগ রেজিস্টার', মে ২১, ১৬৪১, 'আকবর টু আওরঙ্গজেব', ৩৪০-এ মোরল্যাণ্ড-এর উদ্ধৃতি।

পরিশিষ্ট গ

মুদ্রাব্যবস্থা এবং সোনা ও তামার অঙ্কে টাকার মূল্য

১. মুদ্রাব্যবস্থা

মুঘলরা যে তাদের বিশাল সাম্রাজ্য জুড়ে অত্যন্ত উচ্চ ধাতব মানসম্পন্ন ও সমরূপ মুদ্রাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল তা ঐ সময়ের পক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বলে ধরতে হবে। তারা তৈরি করেছিল সোনা, রূপো ও তামার মুদ্রা: সোনার মুদ্রাগুলো ছিল প্রায় একশ ভাগ বিশুদ্ধ আর রূপোর মুদ্রায় অন্য ধাতু মিশ্রণের অনুপাত কখনোই ৪ শতাংশের বেশি হয়নি।[১] এছাড়াও, তাদের মুদ্রাব্যবস্থায় 'স্বাধীনভাবে' মুদ্রা তৈরি হতো, অর্থাৎ যে কেউ টাঁকশালে সোনারূপোর বাঁট নিয়ে গিয়ে তার থেকে মুদ্রা তৈরি করিয়ে নিতে পারত।[২] এর ফলে যে-যে ধাতু দিয়ে মুদ্রাগুলো তৈরি, সেই-সেই ধাতুতে তাদের ওজন অনুযায়ী যা মূল্য হয়, কার্যত সেই মূল্যেই মুদ্রাগুলো চালু ছিল। আর, বিভিন্ন ধাতুর মুদ্রাগুলোর একই এককের মধ্যে বিনিময়ের অনুপাত নির্ধারিত হতো বাজারে, প্রশাসন মারফৎ নয়।

প্রশাসন এবং ব্যবসায়-জগতের ক্ষেত্রে সমস্ত রকম নগদ লেনদেনের মূল একক ছিল রুপোর মুদ্রা, 'রূপীয়া' বা তার ইংরেজি চেহারা 'রূপী'। মনে হয় রূপোর তৈরি ভাগাংশিক একক 'আনা' বা 'আন্না' (টাকার $\frac{1}{16}$ অংশের সমান) দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য চালু হয়েছিল ১৭ শতকে।[৩] 'আশরফী' নামেও যা পরিচিত ছিল, সেই সোনার 'মোহর'-এর

১. এ বিষয়ে সবচেয়ে ভালো আলোচনার জন্য এস. এইচ. হোদিবালা, 'হিস্টরিক্যাল স্টাডিজ ইন মুঘল নুমিস্ম্যাটিক্স', পৃ. ২৩৫-৪৪ দ্রষ্টব্য।

২. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬, ৩১-৩৩ (তুলনীয় হোদিবালা), এবং ইংরেজি নথিপত্রে (যথা, 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬৩৪-৬', পৃ. ৬৮-৯; '১৬৪৬-৫০', পৃ. ১৮৫) ছড়িয়ে-থাকা অসংখ্য দৃষ্টান্ত থেকে এই কথাই বেরিয়ে আসে। এর সঙ্গে তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭-৮, ২০ দ্রষ্টব্য। সচরাচর মুঘল মুদ্রা-প্রস্তুত প্রণালী ছিল খুবই দক্ষ, কিন্তু তারও ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য মোরল্যাণ্ড, 'আকবর টু আওরঙ্গজেব', পৃ. ২৭৭ দ্রষ্টব্য। তিনি ওলন্দাজ নথিপত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এর সঙ্গে 'ফ্যাক্টরিস্', নিউ সিরিজ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯১-এ (দুটিই বাংলা সংক্রান্ত) আওরঙ্গজেবের এক আদেশনামা ('আহ্‌কম-এ আলমগীরী', পৃ. ২৮২ ক-খ) দ্রষ্টব্য, যেখানে বুরহানপুর টাঁকশালের দুর্ব্যবস্থার নিন্দা করা হয়েছে।

৩. 'আইন', ১ম খণ্ড, ২৬-এ টাকার যে-দুটি নিম্নতম ভগ্নাংশিক একক পাওয়া যায় তা হলো 'সুকী' ($\frac{1}{20}$-তম) এবং 'কলা' ($\frac{1}{16}$-তম)। এই 'কলা' কখন 'আনা' নামে প্রাথমিক ভাগাংশিক একক হিসেবে চালু হয়েছিল তা ঠিক জানা যায় না, কিন্তু ১৬০০ সাল নাগাদই বাংলায় 'আনা'র ব্যবহার ছিল ('হকৎ ইক্‌লিম্', ৯৪-৯৫)। ১৬২০ সালেই পাটনায় এর ব্যবসায়িক ব্যবহার দেখা যায় ('ফ্যাক্টরিস্, ১৬১৮-২১', পৃ. ১৪, ২০৪)। নিঃসন্দেহে

সাধারণ ব্যবসায়িক ব্যবহার ছিল না। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিশেষ করে অভিজাতেরা সেগুলো লাগাত মজুত করার কাজে।[৪] প্রধান তামার মুদ্রা ছিল 'দাম'। আকবরের আমলে এটি আস্তে আস্তে তামার 'তঙ্কা'-কে সরিয়ে দিয়েছিল। 'দাম'-এর মূল্যকে ধরা হতো 'তঙ্কা'র অর্ধেক।[৫] 'দাম'-এর আরেক নাম ছিল 'পয়সা' (পেসা); আধ-'দাম'-কে বলা হতো 'আধেলা'।[৬] ১৭ শতকে পুরোনো 'তঙ্কা' উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণভাবে সরকারি 'দাম'-এর জন্য ঐ নামটি এবং পুরোনো 'আধেলা'র জন্য 'পয়সা' শব্দটির ব্যবহার চালু হয়, ফলে গোলমাল দেখা দেয়।[৭] এ ছাড়াও, ৪০ 'দাম'-এ এক টাকা—এই নির্দিষ্ট হার আকবরের আমলে বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু রুপোর হিসেবে তামার দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে কার্যত লেনদেনের সময় ঐ হারটি আর বজায় রাখা যাচ্ছিল না। যেহেতু হিসাবপত্রে—বিশেষ করে 'জমা'-র সংখ্যাগুলোতে ও মাইনের হিসাব করার সময়—পুরানো হারই চলতে থাকে, তাই ঐসব হিসাবের 'দাম' হয়ে দাঁড়ায় এক কাল্পনিক মুদ্রা, নেহাৎই খাতায়-কলমে টাকার এক ভগ্নাংশ।[৮]

শাহ্জাহানের আমলে সরকারী দলিলপত্রে এই 'আনা' কাজে লাগানো হয় ('সিলেকটেড ডকুমেণ্টস্ অফ শাহ্জাহানস্ রেন', পৃ. ৯৩, ৯৭, ৯৮, ১৮০, ১৯৪-৫, ২১৬-১৮, ২২০)।

৪. পেলসার্ট ২৯; তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫, ১৬।

৫. তামার 'তঙ্কা'-কে মাঝে মাঝে 'তঙ্কা-এ দিহ্লী', 'তঙ্কা-এ মুরাদী' এবং 'তঙ্কা-এ সিয়াহ্'ও বলা হতো। হোদিবালা, *JASB*, N. S., খণ্ড ২৮, পৃ. ৮০-৯৬ দ্রষ্টব্য। সেখানে যেসব প্রামাণ্য সূত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার সঙ্গে আমরা 'আরিফ কান্দাহারী', ১৭৯ এবং মুতামদ খান, 'ইক্‌বালনামা', Or. 1834, পৃ. ২৩২ খ যোগ করতে পারি।

৬. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭। লক্ষণীয় এই যে, আকবর 'দাম' চালু করেছিলেন 'তঙ্কা'র অর্ধেক হিসেবে, তার ফলে তামার টাকার চিরাচরিত ভারতীয় মুদ্রামানে বিপর্যয় ঘটে যায়। মুদ্রামানটি নীচে দেওয়া হলো :

৩ 'দাম' = ১ 'দামরী', ৪ 'দামরী' = ১ 'আধেলা', ২ 'আধেলা = ১ 'পয়সা', ২ 'পয়সা' = ১ 'তঙ্কা'; কিন্তু ১ 'পয়সা' = ২৫ 'দাম' এবং ১ 'তঙ্কা' = ৫০ 'দাম' ('দস্তুর-আল-আমল-এ আলমগীরী', পৃ. ৩ ক, ১৭ খ, ১৯ ক; মার্শাল, ৪১৬; Or. 1840, পৃ. ১৩৪ ক; 'ফরহঙ্গ-এ করদানী', Edinburgh 83, পৃ. ৬ ক; এলিয়ট, 'মেমোয়ার্স', ২য় ভাগ, পৃ. ২৯৬)।

ইউরোপীয় নথিপত্রে 'দাম'-ওজনের প্রসঙ্গে (হিসাবের একক হিসেবে 'দাম'-এর ক্ষেত্রে নয়) সর্বদাই 'দাম'কে 'পাইস' (অথবা 'পয়সা' শব্দটির আরও অসংখ্য বিকৃত রূপ) বলা হয়েছে। পরের টীকা দ্রষ্টব্য।

৭. পেলসার্ট, ২৯, ৬০; এবং ভান ট্রাইস্ট. *JIH*, খণ্ড ১৬, পৃ. ৭২, ৭৩, ৭৪ টীকা, এইরকমই বলেছেন। ইংরেজদের লেখায় ঐ উল্লেখগুলোর অনুরূপ ব্যাখ্যার জন্য হোদিবালা, 'মুঘল নুমিসম্যাটিকস্', পৃ. ১৪০ টীকা, এবং মোরল্যাণ্ড, 'আকবর টু আওরঙ্গজেব', পৃ. ৩৩১ দ্রষ্টব্য। পরের দিকের কয়েকজন প্রামাণ্য লেখক, যথা, 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, ২৬৭ এবং মার্শাল, পৃ. ৪১৬, কিন্তু আগেকার, সম্ভবত সরকারী, পরিভাষাই ব্যবহার করে গেছেন।

৮. এই 'দাম', 'দাম-এ তন্‌খ্‌ওয়াহী', "বেতনের দাম" নামে পরিচিত হয়েছিল ('দস্তুর-আল আমল-এ আলমগীরী', পৃ. ৩ ক)। তুলনীয় মানুচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৪-৫।

আমাদের আলোচ্য পর্ব জুড়ে টাকা ও মোহরের ওজন কার্যত পাল্টায়নি। শুধুমাত্র তখ্‌তে বসার পর আওরঙ্গজেব এদের ওজন সামান্য বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু তার দরুন তাদের আপেক্ষিক ওজনের কোন পরিবর্তন হয়নি।[৯] জাহাঙ্গীর দুটি আরও বেশি ভারী ধরনের টাকা ও 'মোহর' চালু করেছিলেন, কিন্তু এই নতুন মুদ্রা বেশি দিন চলেনি। এদের বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছিল, ফলে সমসাময়িক উল্লেখে সাধারণত এদের সঙ্গে সাধারণ মুদ্রাগুলোকে গুলিয়ে ফেলার ভয় ছিল না।[১০] 'দাম'-এর ওজনও একই মানে রাখা হয়েছিল, যতদিন-না তামার ক্রমবর্ধমান অভাবের দরুন আওরঙ্গজেব আগের চাইতে ⅓ গুণ হাল্কা নতুন 'দাম' চালু করতে বাধ্য হন। ষাটের দশকে কয়েকটি টাঁকশাল থেকে এই নতুন 'দাম' চালু হতে আরম্ভ করে, কিন্তু মনে হয় আস্তে আস্তে এটি পুরোনো 'দাম'-এর জায়গা দখল করে নিয়েছিল।[১১]

ধাতু হিসাবে মুদ্রাগুলোর ওজনের সঙ্গে তার মূল্যের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য ছিল। ধার কেটে ফেলা বা ক্ষয়ে যাওয়ার দরুন কোন মুদ্রার ওজন কমে গেলে তার মূল্যও তাই কমে যেত। মুঘল মুদ্রাব্যবস্থার একটি বিশেষত্ব ছিল এই যে শুধুমাত্র পুরনো হয়ে যাওয়ার জন্যই মুদ্রার মূল্য কমে যেত। মুদ্রার উপর টাঁকশালের নাম ও ক্ষমতাসীন বাদশাহের উপাধির সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হওয়ার সালটিও খোদাই করা থাকত। নতুন টাকাগুলো 'সিক্কা' বা 'হুন্দবী' নামে পরিচিত ছিল। একই বাদশাহের আমলে আগের বছরগুলোতে তৈরি-হওয়া টাকা, যেগুলোকে 'চালানী' বা 'পেথ' বলা হতো, তাদের চেয়ে ঐ নতুনদেরই কদর ছিল বেশি। আবার আগের আমল থেকে চালু-থাকা টাকা, যেগুলো 'খাজনা' নামে পরিচিত ছিল, তাদের চেয়ে এই 'চালানী' বা 'পেথ'-এর মূল্য

৯. বৃটিশ মিউজিয়াম ও ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম—দু জায়গার সংগ্রহেই আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহ্‌জাহানের সবচেয়ে ভারী টাকা ও মোহরের ওজন যথাক্রমে ১৭৮ ট্রয় গ্রেন ও ১৬৯ গ্রেন। আওরঙ্গজেবের ক্ষেত্রে ঐ মুদ্রার ওজন যথাক্রমে ১৮০ এবং ১৭১ গ্রেন (এস. লেন-পুল, 'দা কয়েন্‌স্ অফ দা মুঘল এম্পারারস্ অফ হিন্দুস্তান ইন্ দা বৃটিশ মিউজিয়াম' এবং এইচ. এন. রাইট, 'ক্যাটালগ অফ দা কয়েন্‌স্ ইন দি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম', কলকাতা, ৩য় খণ্ড, 'মুঘল এম্পারারস্' দ্রষ্টব্য)। সেপ্টেম্বর, ১৬৫৯ সালে আহ্‌মেদাবাদে ও কম্পানি-কে লেখা সুরাট কুঠিয়ালদের চিঠিপত্র থেকে টাকার ওজনে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় ('ফ্যাক্টরিস্ ১৬৫৫-৬০', পৃ. ২১১-২১২, এবং ২১১ টীকা)।

১০. এই বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে ভালো আলোচনা আছে হোদিবালা, 'মুঘল নুমিসম্যাটিকস্', পৃ. ১৩২-১৪৬-এ। সেখানে যেসব প্রামাণ্য সূত্র দেখান হয়েছে তার সঙ্গে পেলসার্ট, পৃ. ২৯ যোগ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য খুবই স্পষ্ট।

১১. ১৬৬৩-৪ সালে প্রধান শহরগুলো থেকে প্রথম হাল্কা 'দাম' চালু করা হয়। গুজরাটে ১৬৬৫-৬ সালে এটি চালু হতে শুরু করে, বিহারে ১৬৭১ সালে এর ব্যবহার সবে ছড়াতে শুরু করেছিল। আওরঙ্গজেবের চালু-করা তামার মুদ্রাগুলোর বেশির ভাগই ছিল এই ধরনের। 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৫, ২৬৭; মার্শাল, ৪১৬-১৭; 'জওয়াবিৎ-এ আলমগীরী', Ethe 415, পৃ. ১৭০ খ, Or. 1641, পৃ. ৪৯ খ, এবং Add. 6598, পৃ. ১৫২ খ; 'ফররুহ্-এ করদানী', Edinburgh No. 83, পৃ. ৬ ক। তুলনীয়, হোদিবালা, *JASB*, N.S., খণ্ড ২৮, পৃ. ৬২-৬৭।

ছিল বেশি। পুরোনো হওয়ার মূল্য কমে গেছে বলে যে-ছাড় দেওয়া হতো, সাধারণত তা ছিল খুবই অল্প।[১২] জিনিসপত্রের দাম বিবেচনা করার সময় এই ছাড়ের পরিমাণ সাধারণভাবে অগ্রাহ্য করা যায়। নতুন না পুরানো—কোন্ টাকা তা নির্দিষ্ট করে না বলেই আমাদের সূত্রগুলিতে জিনিসপত্রের দাম উল্লেখ করা হয়েছে। ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে আকবরের আমলে জারি-করা নিয়মকানুন থেকে বোঝা যায় যে রাজস্ব-দাবি নির্ধারিত হতো 'চালানী' টাকায়, কারণ সেগুলোর বয়স যাই হোক না কেন, "সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও পুরো ওজনে"র মুদ্রা হলে বাদশাহী মুদ্রার ওপর কোনরকম ছাড় নিষিদ্ধ ছিল।[১৩]

যেসব অঞ্চল মুঘলদের দখলে এসেছিল তার সব জায়গাতেই তারা নিজেদের মান অনুযায়ী মুদ্রাব্যবস্থা চালু করেছিল; আর এই কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে বাণিজ্যের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।[১৪] তবুও কিছু কিছু এলাকায় পুরনো আমল থেকে চলে-আসা

১২. ১৬৬১ সালে আওরঙ্গাবাদে তামার মুদ্রায় বিভিন্ন ধরনের টাকার ক্ষেত্রে যেসব হার দেওয়া হয়েছে, দৃষ্টান্ত হিসেবে সেগুলোকে নিলে অনুমান করা যায় যে ছাড়ের পরিমাণ বেশি ছিল না। 'সিক্কা' ('আলমগীরী') টাকার বাজার দর ছিল ১৫ 'দাম'—১৪ ৭/৮ 'দাম', 'চালানী'র ক্ষেত্রে ১৪ ৬৭/১০০-১৪ ৭/১৬ এবং 'খাজনা'র ক্ষেত্রে ১৪ ৭/১৬-১৪ ৫/৬ 'দাম' ('ওয়কাই দখিন', ৩২-৩৩; তামার মুদ্রায় হারগুলোর ব্যাখ্যার জন্য এই পরিশিষ্টের তৃতীয় অংশের ২৪ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য)।

মুঘল মুদ্রাব্যবস্থা বিষয়ে সাধারণ আলোচনার জন্য 'মেডিয়েভাল ইণ্ডিয়া কোয়ার্টার্লি', আলীগড়, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১-২১-এ বর্তমান লেখকের একটি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৩. ২৭-তম বছরে তোডর মলের 'নিয়মাবলী'তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে টাঁকশালগুলো পুরনো মুদ্রার বদলে নতুন মুদ্রা দেবে যাতে " 'করোড়ী', 'ফোতাদার' এবং 'সরাফ'রা (ব্যাঙ্ক মালিক) নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী নতুন ও পুরনো মুদ্রা বদল করতে পারে।" তারপর ছাড়ের যে-হার দেওয়া আছে, তাতে শুধুমাত্র ওজন কমের দরুনই ছাড়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে; এবং "জাগীরদার, 'করোড়ী' ও 'ফেতাদার'দের" আবার বলা হয়েছে তারা যেন এই নিয়মগুলো কঠোরভাবে মেনে চলে ('আকবরনামা'-য় 'নিয়মাবলী'র মূল পাঠ, Add. 27,247, পৃ. ৩৩২ খ)। আবুল ফজল তাঁর চূড়ান্ত খসড়ায় তোডর মলের 'নিয়মাবলী'র যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন ('আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৩) সেখানে সোজাসুজি বলা হয়েছে যে "রাজস্ব-সংগ্রাহক ও 'সরাফ'রা" পুরনো ও নতুন মুদ্রার মধ্যে তফাৎ করে যেন ছাড় আদায় না করে (বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা সংস্করণের পাঠে এই না-সূচক শব্দটি বাদ পড়ে গেছে, কিন্তু Add. 26,207, পৃ. ১৬২ ক-তে 'না'-ই পাওয়া যায়)। কিন্তু, আবুল ফজল নিজেই অন্যত্র বলেছেন যে মুদ্রা-বিনিময়কারীরা ('সিক্কা-এ খালিস-এ সইরাফী') বিশুদ্ধ মুদ্রার যে-সংজ্ঞা দেয় খালিসা-র রাজস্ব-সংগ্রাহক ও জাগীরদার ৩৯-তম বছর পর্যন্ত সেইরকম মুদ্রা দাবি করত এবং অন্যান্য "সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও পুরো ওজনের মুদ্রা" থেকে 'সর্ফ' বা ছাড় কেটে নিত। ব্যাপারটি এখন নিষিদ্ধ করা হলো ('আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৫১; মুদ্রিত পাঠে 'সর্ফ' এই আসল শব্দটি বাদ পড়েছে, যদিও Add. 26,207, পৃ. ২৭৫ খ এবং স্বয়ং সম্পাদকের নিজের দেখা বেশির ভাগ পাণ্ডুলিপিতেই শব্দটি আছে)।

১৪. বর্তমানে যেসব মুদ্রা-সংগ্রহ আছে সেগুলো থেকে এই সাক্ষ্যই পাওয়া যায় যে মুঘলরা বিজিত

আঞ্চলিক মুদ্রাও চালু ছিল, যদিও সেগুলো আর বাদশাহী টাঁকশালে তৈরি হতো না। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো গুজরাট ও পশ্চিম ভারতে চালু প্রায় একই মূল্যের বেশ ভারী খাদ-মেশানো রূপোর মুদ্রা। মালবে ছিল 'মুজফ্ফরী', প্রতিটির মূল্য প্রায় আধ-টাকা[১৫]; বেরার-এ ছিল ১৬ 'দাম' বা ২/৫ টাকা মূল্যের রূপোর 'টঙ্কা'।[১৬] খান্দেশ-এ সম্ভবত হিসাবের একমাত্র একক ছিল 'টঙ্কা', কারণ আকবর তাঁর মর্জিমাফিক এর মূল্য ২/৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩/৫ টাকা করে দিয়েছিলেন।[১৭] গুজরাটে, সুরাটের বিরাট বন্দরে 'মাহ্মুদী'-র ব্যবহারই চলতে থাকে। ১৭ শতকের গোড়ায় এর মূল্য ছিল প্রায় ২/৫ টাকা, কিন্তু বোধহয় এগুলোর তৈরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে এই মূল্য ৪/৯ টাকা হতে দেখা যায়।[১৮]

প্রদেশগুলোর পুরনো মুদ্রা আর (নতুন করে) তৈরি করত না। এ ছাড়াও, লাহোরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬২-৩-র উল্লেখ করা যায়। ১৬৪৬-৭ সালে সাময়িকভাবে বল্খ্ ও বদখ্শান দখলের সময়ে এ ব্যাপারে যে ব্যতিক্রম করা হয়, লাহোরী তাকে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য এক বিরাট রেয়াত বলে ঘোষণা করেছেন।

১৫. ফিরিশ্তা-র লেখার একটি অংশ (লখনউ লিথো, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৭) থেকে এ কথা অনুমান করা হয়েছে (হোদিবালা, 'মুঘল নুমিসম্যাটিকস্', ৩৫০ টীকা, ৩৫১-য় উদ্ধৃত)।

১৬. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৮; 'জওয়াবিৎ-এ আলমগীরী', Ethe 415, পৃ. ১৭১ ক, Or. 1641, পৃ. ৫০ ক, Ad. 6598, পৃ. ১৫৩ ক।

১৭. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৪। 'জওয়াবিৎ-এ আলমগীরী'-ও (পূর্বোক্ত সূত্র) এটিকে ১২ 'টঙ্কা' বা ২৪ 'দাম'-এর সমান ধরেছে।

১৮. ১৬৩৮ এবং ১৬৪০ সাল অবধি যথাক্রমে বগলানা ও নবনগরের প্রধানরা 'মামুদী' তৈরি করতেন (তুলনীয় হোদিবালা, পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ১১৫-৩০)।

আবু তুরাব ওয়ালী 'মামুদী'কে ৫/১২ টাকার সমান ধরেছেন ('তারিখ-এ গুজরাট' (আনু: ১৫৮৪ খৃ.) বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা সংস্করণ, পৃ. ২৭, হোদিবালা, পূর্বোক্ত সূত্র পৃ. ১২৫-৬-এ উদ্ধৃত)। প্রথমদিকের ইংরেজ কুঠিয়ালরা মামুদীকে ২/৫ টাকার সমান মনে করতেন (যেমন, 'লেটার্স রিসিভ্ড' ইত্যাদি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৬)। ইংরেজদের হিসেবপত্রে এই হারই মেনে নেওয়া হয়েছিল ('ফ্যাক্টরিস্, ১৬৩৩-৪', পৃ. ২০৯); কিন্তু ওলন্দাজদের হার, মনে হয়, আবু তুরাব ওয়ালী র গৃহীত হারের সঙ্গেই মিলত (তুলনীয় পেলসার্ট, পৃ. ৪২)।

'মামুদী' ৪/৯ টাকার সমান—এই নতুন মূল্যমানটি প্রথম লক্ষ্য করা যায় ১৬৩৬ সালে, যখন বলা হয় যে 'সাম্প্রতিক বছরগুলো'য় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ('ফ্যাক্টরিস, ১৬৩৪-৬', পৃ. ২২৪)। ১৬৩৮ সালে একটি বিবৃতিতে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ইংরেজদের হিসেবের খাতায় ২½ 'মামুদী' সমান এক টাকা বলে যে-হার দেওয়া আছে তা ভুল ধারণা দেয়, কারণ আসল হার ২¼ (ঐ, '১৬৩৭-৪১', পৃ. ৯১)। কিন্তু বাজারের হার ও ইংরেজদের হিসেব-খাতার হার—কোনটিই ঐ আলোচ্য পর্বের বাকি অংশে আর পাল্টায়নি বলেই মনে হয় (ঐ, '১৬৫১-৪', পৃ. ৫৮; ক্রায়ার, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫-৬)।

২. সোনার মূল্যে টাকা

তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় অংশে, যেখানে আমরা আলোচ্য পর্বের কৃষি-মূল্যের প্রধান ধারাগুলো অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি, সেখানে দামী ধাতুর অঙ্কে টাকার মূল্যের একটি সমীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছিল। এই ধরনের সমীক্ষা থেকে যে-তথ্য পাওয়া যাবে তা দিয়ে টাকার সাধারণ ক্রয়ক্ষমতার প্রধান পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা যায়। এ ব্যাপারে আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে এই জন্য যে মুঘল অর্থ-ব্যবস্থা ছিল উচ্চমানের ধাতব বিশুদ্ধতাসম্পন্ন এক অবাধ মুদ্রা-ব্যবস্থা, ফলে যে-হারে টাকা এবং মোহর ও 'দাম'-এর বিনিময় হতো, সেই হারের সঙ্গে ঐ তিনটি ধাতুর বাজার-দরের নিশ্চয়ই খুব মিল ছিল।[১] 'মোহর'-টাকা সংক্রান্ত সমসাময়িক বিভিন্ন হার বিবেচনা করার সময় আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে একই সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে হারের ফারাক থাকতে পারে; কিন্তু যতদিন পর্যন্ত বাণিজ্যপথগুলো খোলা ছিল ততদিন সোনারূপোর চালানের খরচ আপেক্ষিকভাবে কম থাকায় সম্ভবত ঐ ফারাক সবচেয়ে কমের দিকেই থাকত।

'আইন'-এর সময় 'মোহর'কে ধরা হতো ঠিক ৯ টাকার সমান,[২] আর স্পষ্টতই এই মূল্য এক দশকের বেশি সময় ধরে অপরিবর্তিত ছিল।[৩] হকিন্স (১৬০৮-১২) আকবরের 'আশরফী'কে ১০ টাকার সমান ধরেছিলেন[৪] এবং ১৬১৪ সালে 'আশরফী'র এই একই হার উল্লেখ করা হয়েছে।[৫] জাহাঙ্গীরের বিবৃতি থেকে মনে হয় যে তাঁর রাজত্বের দশম বছরে 'আশরফী' ও 'মোহর'-এর অনুপাত ১০.৭ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছিল।[৬] কিন্তু ১৬২১ সালে এই অনুপাত আবার ১০-এ ফিরে আসে।[৭]

১. লক্ষণীয় এই যে, টাকা ও 'মোহর' দুএরই মূল্য বাঁট হিসেবে তাদের ওজনের চেয়ে একটু বেশি ছিল। টাঁকশালে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যায় মুদ্রা তৈরি করতে গেলে কতকগুলো বাঁট জমা দিতে হতো, 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১-২এ তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। সেখান থেকেই বের করা যায় তার ওপর বাদশাহের শতকরা প্রাপ্যের পরিমাণ কী ছিল।

২. 'আইন', ১ম খণ্ড, ২৫, ১৯৬।

৩. ২৭-তম বছরে তৈরি তোডর মলের 'নিয়মাবলী' অনুযায়ী 'লাল-এ জলালী' (ওজনে ১$\frac{১}{৯}$ 'মোহর'-এর সমান) নামে সোনার মুদ্রার হার ঠিক করা হয়েছিল ৪০০ 'দাম'। চৌকো ও গোল টাকার মূল্য ধরা হয়েছিল ৪০ ও ৩৯ 'দাম' ('আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, ৩৮৩; মূলপাঠ: Add. 27,247, পৃ. ৩৩২ খ)।

৪. 'আর্লি ট্রাভেল্‌স্‌', ১০১।

৫. ফস্টার, 'সাপ্লিমেণ্টারি ক্যালেণ্ডার', পৃ. ৪৮।

৬. অধ্যাপক হোদিবালা বাদশাহের ঐ বছরের দুটি বিবৃতি পরীক্ষা করে দেখেছেন। তার অর্থ দাঁড়ায় ৫০০ 'তোলচা' ওজনের একটি বিশেষ 'নূরজাহানী মোহর'-এর মূল্য ছিল ৬৪০০ টাকা। সোনার মুদ্রার ক্ষেত্রে জাহাঙ্গীরের আমলের ওজনে সাধারণ 'মোহর'-এর ওজন ছিল ১০ 'মাষা'। অতএব, যে সঠিক সমীকরণটি বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে তা হলো: ৬০০ 'মোহর' = ৬,৪০০ টাকা বা ১ মোহর = ১০$\frac{২}{৩}$ টাকা। যে-ওজন দেওয়া হয়েছে অধ্যাপক হোদিবালা

পরবর্তী পাঁচ বছরে রূপোর অঙ্কে সোনার দাম নিশ্চয়ই খুব বেড়ে যায়, কারণ বলা হয়েছে যে ১৬২৬ সালে এক 'মোহর'-এর বদলে ১৪ টাকা পাওয়া যেত।[৮] ঐ একই বছরে বিদেশী সোনার মুদ্রা থেকে সুরাটে যে-দাম পাওয়া গিয়েছিল তার থেকে এই ব্যাপারটির সমর্থন মেলে।[৯] ১৬২৮ সালে আহ্‌মেদাবাদে যখন 'সুন্নেয়া' বা 'মোহর'কে ১৩ টাকার বেশি দামে বিক্রি করা যায়নি ও তারপরে 'মোহর'-এর দাম যখন মাত্র ১২¾ টাকায় এসে দাঁড়ায়, তখন অবশ্যই ভাবা হয়েছিল যে সোনা "আশাতীতভাবে শস্তা" হয়ে গেছে।[১০] মনে হয় এই বছরের পর থেকে সোনা মোটামুটি এই দামগুলোতে এসে স্থির হয় : ১৬৩৩ সালে জালোর-এ 'মোহর' বিক্রি হয়েছিল ১২½ টাকা করে,[১১] আর বলা হয়েছে ১৬৪০ সালে বাংলায় 'মোহর'-এর দাম ছিল ১৩ টাকার মতন।[১২]

১৬৪১-৪২ সালে 'মোহর'-এর দাম ১৪ টাকায় ফিরে আসে ;[১৩] ১৬৪৪-৫[১৪] ও ১৬৫০[১৫] সালে এই দরই দেখানো হয়েছে। মনে হয় পঞ্চাশের গোড়ার দিকে

তাকে আকবরের আমলের ওজনের অঙ্কেই ধরেছেন। কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন যে এর থেকে যে-ফলটি পাওয়া যায়, অর্থাৎ ১ মোহর=১১ টাকা ১২ আনা, তা একটু বেমানান ('মুঘল ন্যুমিসম্যাটিকস্', ২৪৯)।

৭. 'তুজুক-এ জাহাঙ্গীরী', ২৮৬। এ বছরে বুরহানপুরে আধ-'মোহর'-এর মূল্য ছিল ৫ টাকা ('ফ্যাক্টরিস্, ১৬১৮-২১', ৩২০)।

৮. পেলসার্ট, ২৯। এ কথা ঠিক যে তাঁর বিবৃতিগুলো সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। তিনি বলেছেন 'মোহর-এর ওজন "এক তোলা বা ১২ 'মাষা'", যার থেকে মনে হয় এটি ছিল 'মোহর-এ নূরজাহানী'। কিন্তু প্রায় ১৫ বছর আগে এই মুদ্রা তৈরিই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এছাড়াও তিনি ৭ টাকা মূল্যের "একটি" 'মোহর'-এর কথা বলেছেন (পৃ. ৭, ২৯)। এটি সাধারণ 'মোহর'-এর অর্ধেক মাত্র হতে পারত।

৯. এগুলোর মধ্যে যার দাম ছিল সবচেয়ে বেশি সেই "হাঙ্গেরি ডুকেট", তোলা পিছু ১৩¼ 'মামুদী' (বা, ১২½ ও ১৩ টাকার মধ্যে) দরে বিক্রি হতো ('ফ্যাক্টরিস, ১৬২৫-৯', পৃ. ১৫৫-৬)। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এমনকি এই মুদ্রাও (যা অন্যান্য মুদ্রার মতো, বাঁটের জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল) 'মোহর' এর চেয়ে অনেক কম বিশুদ্ধ ছিল। ১৬২৮ সালে যখন 'মোহর'-এর দাম ১৩ টাকা, তখন আহ্‌মেদাবাদে হাঙ্গেরীয় ডুকাট বিক্রি হতো তোলাপিছু ঠিক ১৩ টাকা দরে (ঐ, ২৩৫)।

১০. ঐ, ২৩৫, ২৭০।

১১. মাণ্ডি, ২৯০। অন্যত্র (পৃ. ৩১০-১১) তিনি কিন্তু এগুলোর হার দিয়েছেন ইংরেজদের মুদ্রায়, যার থেকে ১ 'মোহর'=১৪ টাকা এই সমীকরণটি বার করা যায় (তুলনীয় হোদিবালা, পৃ. ২৫২)।

১২. মান্‌রিক, ২য় খণ্ড, ১২৯।

১৩. লাহোরী, ২য় খণ্ড, ২৫৯, হোদিবালা-য় উদ্ধৃত, পুর্বোক্ত সূত্র, ২৫০।

১৪. লাহোরী, ২য় খণ্ড, ৩৯৬, হোদিবালা-য় উদ্ধৃত, পুর্বোক্ত সূত্র, ২৫০ টাকা।

১৫. তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, ২৪৬; আরও দ্রষ্টব্য ১৫-১৬।

আরেকবার দাম চড়তে শুরু করে।[১৬] একজন লেখকের মনে পড়ে যে ১৬৫৮ সালে আওরঙ্গাবাদে এই দাম ১৬$\frac{১}{৪}$ টাকায় পৌছেছিল।[১৭] মে, ১৬৬১-তে সরকারীভাবে 'আশরফী'র বাজার দর ১৪ টাকা ১০ আনা ও আওরঙ্গবাদে ১৪ টাকা ৯ আনা বলে জানানো হয়েছে।[১৮] কিন্তু ফেব্রুয়ারি, ১৬৬২-তে বিদর প্রদেশের রামগীর থেকে ১৫ টাকা ৮ আনা—১৫ টাকা ০ আনা দরও জানা গেছে।[১৯] ১৬৬৬ সালে সাধারণ-ভাবে দর ছিল সম্ভবত ১৬ টাকা[২০] আর সুরাটের ইংরেজ কুঠিয়ালদের যে সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে, সেখানে বলা হয়েছে ১৬৭৬ সালের কিছু আগে 'মোহর'-এর দর ছিল সাধারণত ১৫ টাকা[২১] এবং বাংলায় নিশ্চয়ই এই দরও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।[২১ক]

১৬৭৬ সালে "সারা ভারত জুড়ে" সোনার বাজারে হঠাৎ ধস নামে ও 'মোহর'-এর দাম কমে ১২ ও ১১ টাকায় এসে দাঁড়ায়—বাজারী গালগপ্প অনুযায়ী আওরঙ্গজেব তাঁর পৈতৃক সম্পদ উজাড় করে দিয়েছিলেন বলেই অমন ঘটেছিল।[২২] কিন্তু এর ঠিক পরেই অবস্থা খানিকটা সামলে ওঠে, কারণ পরের বছর সুরাটে মোহর প্রতি ১৩$\frac{৩}{৪}$ টাকা দর দেখানো হয়েছে।[২৩] বাংলায়, কাশিমবাজারে ১৬৭৮ ও ১৬৭৯ সালে যথাক্রমে ১৩ ও ১২$\frac{১৪}{১৬}$ টাকা দরে 'মোহর' বিক্রি হয়েছিল।[২৪] ১৬৭৯ সুরাটে

১৬. ডিসেম্বর, ১৬৫২-য় সুরাটের কুঠিয়ালরা আগেই বলে রেখেছিল যে সোনার দাম "নামার চেয়ে ওঠার সম্ভাবনাই বেশি" ('ফাক্টরিস, ১৬৫১-৪', পৃ. ১৪১)।

১৭. 'দিলকুশা', পৃ. ১৫ খ।

১৮. 'ওয়কাই দখিন', পৃ. ৩২। চারটি জোড়ে 'আশরফী'র দাম দেওয়া আছে (প্রত্যেক জোড়ে সবচেয়ে বেশি ও সবচেয়ে কম দাম)। আওরঙ্গজেব ও শাহ্‌জাহানের 'আশরফী'-র ক্ষেত্রে 'আলমগীরী' ও 'শাহ্‌জাহানী'—দুরকম টাকাতেই দাম দেওয়া হয়েছে। চার জোড়া হারের মধ্যে তফাৎ খুবই কম। আমি হারগুলো দিয়েছি 'আলমগীরী' টাকার অঙ্কে।

১৯. 'দফতর-এ দিওয়ানী ও মাল ও মুল্‌কী', ইত্যাদি, পৃ. ১৭৩; 'ওয়কাই দখিন', ৭৫।

২০. মামুরি, পৃ. ১৩৪ খ; খাফী খান, ২য় খণ্ড, ১৯০; হোদিবালা, পৃ. ২৫০-৫১-য় উদ্ধৃত। খাফী খান এর একটু আগে (২য় খণ্ড, ১৮৯) বলেছেন যে 'মোহর' তখন ছিল ১৭ টাকার সমান। কিন্তু মামুরি-র লেখায় তার সমর্থন পাওয়া যায় না। অন্যদিকে, ১৬৬৬-৭ সালে তেভেনো ফরাসী লিভ্‌র্-এর অঙ্কে 'মোহর' ও টাকার যে-মূল্য দিয়েছেন তার থেকে মনে হবে ১ মোহর = ১৪ টাকা ছিল।

২১. *JRAS*, ১৯২৫, পৃ. ৩১৫।

২১ক. বাউরি (১৬৬৯-৭৯) বাংলা ও ওড়িশার প্রসঙ্গে বলেছেন যে 'মোহর'-এর দর "এখন ১৫$\frac{১}{৪}$ ও ১৫$\frac{১}{২}$ টাকা যাচ্ছে" (পৃ. ২১৭)।

২২. *JRAS*, ১৯২৫, পৃ. ৩১৪-১৬ (ডব্লু. ফস্টার-এর চিঠিপত্র); 'ফ্যাক্টরিস্‌, নিউ সিরিজ', ১ম খণ্ড, ২৬৭-৮।

২৩. 'ফ্যাক্টরিস্‌, নিউ সিরিজ', ১ম খণ্ড, ২৬৭ টীকা।

২৪. মাস্টার, ২য় খণ্ড, ৩০৪। মূলে গৃহীত একটি পাঠ অনুযায়ী পরের সংখ্যাটি মাত্র ১২ টাকা হবে।

সোনার দাম আবার খুব নেমে যায়,[২৫] আর বাংলা থেকে জানানো হয় যে 'মোহর'-এর দাম ২ টাকা ৫ আনা কমে গেছে।[২৬] ১৬৮০ সালে আজমীর প্রদেশে বাজার দর ১৩ টাকা বলে জানানো হয়েছে[২৭], আর কাশিমবাজারে এই দর ছিল ১৩ টাকার নীচে, ও এমনকি ১২½ টাকায় নেমে যায়।[২৮] ১৬৮১ সালেও সুরাটে সোনার দর কম ছিল।[২৯] ১৬৮৪ সালে বাংলায় এক 'মোহর' দিয়ে ১২½ টাকা পাওয়া যেত এবং তার চেয়েও কম দর দেওয়া হচ্ছিল।[৩০]

সম্ভবত, পরের দশকে সোনার দাম খানিকটা বাড়ে। নব্বই-এর গোড়ার দিকে সুরাটে 'মোহর' প্রতি ১৪ টাকা দাম পাওয়া যেত বলে জানা যায়।[৩১] ১৬৯৫ সালে এক 'মোহর' দিয়ে সাধারণত ১৩¼ টাকা পাওয়া যেত বলা হয়েছে।[৩২] ১৬৯৭ সালে সুরাটে ইংরেজরা তাদের নথিপত্রে 'মোহর'-এর দাম ১৩ টাকা ২ আনা ধরে হিসাব করেছিল।[৩৩]

৩. তামার মূল্যে টাকা

টাকা যতটা রুপোর মূল্য-সূচক ছিল, 'দাম' ছিল ততটাই তামার সূচক। 'আইন'-এর সময়ে এক 'দাম' দিয়ে তার ১.১৫ গুণ ওজনের তামা কেনা যেত।[১] আমরা ধরে নিতে পারি যে, আলোচ্য পর্বের বাকি সময় ধরে মোটামুটি একই অনুপাত বজায় ছিল। কিন্তু, মনে রাখতে হবে যে, দামের আঞ্চলিক তারতম্য সোনারুপোর চেয়ে এই শস্তা ধাতুর বেলায় অনেক বেশি গুরুত্ব পেত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রপথে তামার আমদানি গুরুত্ব পায়।[২] কিন্তু মূল যোগান আসত, মনে হয়, দেশের ভেতরের খনি, বিশেষ করে আরাবল্লী পর্বতমালার উত্তর-পূর্ব ঢালে অবস্থিত খনিগুলো থেকে।[৩] বিভিন্ন

২৫. 'ফ্যাক্টরিস্, নিউ সিরিজ', ৩য় খণ্ড, ২৪০।

২৬. ঐ, ৪র্থ খণ্ড, ২১৯। এটি, সম্ভবত, অত্যুক্তি। বা এর অর্থ কি শতকরা ২$\frac{৫}{১৬}$?

২৭. 'ওয়কাই-এ আজমীর', ৬৭৮-৯।

২৮. 'ফ্যাক্টরিস্, নিউ সিরিজ', ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৩।

২৯. ঐ, ৩য় খণ্ড, ২৭০।

৩০. ঐ, ৪র্থ খণ্ড, ৩৪২, ৩৫৩-৪।

৩১. ওভিংটন, ১৩১-২।

৩২. কারেরি, ২৫৩।

৩৩. সুরাট পার্সিয়ান লেটার্স, I.O. 150, পৃ. ৬৩ খ।

১. 'আইন', ৫ম খণ্ড, ৩৩।

২. তুলনীয় মোরল্যাণ্ড, 'আকবর টু আওরঙ্গজেব', পৃ. ১৮৩-৫।

৩. আগ্রা প্রদেশের নরনাউল 'সরকার'-এ বেশ কয়েকটি খনি ছিল, সবকটিই আরাবল্লী পর্বতমালার মধ্যভাগে বা তার একেবারে উত্তরপ্রান্তে ঢালের নীচে অবস্থিত ('আইন', ১ম খণ্ড, ৪৫৪)। ওয়ারিশ, ক : পৃ. ৪৮৮ ক, খ : পৃ. ১২৯ ক-এ দেখা যায় যে আলওয়ার (আগ্রা প্রদেশ) 'সরকার'-এর অন্তর্গত বিরাট-এও কয়েকটি খনি ছিল। আজমীর প্রদেশের চিনাপুর ও মণ্ডল 'মহাল'-এর নানান জায়গায় (চিতোর 'সরকার') তামার খনি ছিল ('আইন', ১ম খণ্ড, 'ওয়কাই-এ আজমীর', ১৩)।

বাজারের মধ্যে দামের যে তফাৎ, তার পরিমাণ স্থির করার ক্ষেত্রে এই খনিগুলোর কাছাকাছি থাকাটা বেশ বড় ভূমিকা নিতে পারত।[৪] আকবরের রাজত্বের গোড়ার দিকে তামার দাম, মনে হয়, কমে যাচ্ছিল। প্রথমে টাকায় ৩৫ 'দাম',[৫] পরে ৩৮।[৬] ২৭-তম ইলাহী বছরে গোল বা সাধারণ টাকা ও চৌকো টাকাকে যথাক্রমে ৩৯ ও ৪০ 'দাম'-এর সমান বলে ধরা হতো।[৭] কিন্তু দু বছরে পরে সাধারণ টাকার মূল্যও ৪০ 'দাম' বলে ঘোষণা করা হয়[৮] এবং যখন 'আইন' লেখা হয়েছিল, তখনও আসল বাজার দর এই অঙ্কের ধারে-কাছেই ওঠানামা করত।[৯] অন্তত জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম দশকের শেষ অবধি তামার দর বেশ স্থির ছিল। যেসব ইংরেজি ব্যবসায়িক লেখাপত্র টি'কে আছে সেগুলোর হার থেকে আভাস পাওয়া যায় যে কেন্দ্রীয় অঞ্চল-গুলোতে বা গুজরাটে 'দাম'-এর ক্ষেত্রে সরকারীভাবে নির্দিষ্ট হারের সঙ্গে বাজার হারের খুব একটা তফাৎ হয়নি (যদি আদৌ কিছু হয়ে থাকে)।[১০]

৪. তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, ২৩। ১৬৭১ সালে রাজমহল থেকে পাটনা যাওয়ার পথে স্পষ্টতই মার্শাল দেখেছিলেন যে তিনি যত পশ্চিমদিকে এগোচ্ছেন, তামার দাম লক্ষণীয়ভাবে পড়ে যাচ্ছে (মার্শাল, ১১৮, ১২১, ১২২, ১২৫-৬)।

৫. 'আইন', ১ম খণ্ড, ১৭৬।

৬. ঐ, ১৯৬। মূল পাঠে '৪৮' ভুল, সম্পাদকের মতে এটি হবে '৩৮'। এখানেও তা-ই অনুসরণ করা হয়েছে।

৭. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, ৩৮৩; 'আইন', ১ম খণ্ড, ২৮।

৮. 'আইন', ১ম খণ্ড, ২৮। আকবরের রাজত্বে টাকায় 'দাম'-এর পরপর চারটি হার চালু ছিল বলে জানা যায়, কিন্তু টমাস ('ক্রনিকল্‌স্', ৪১০) ও রাইট ('কয়েনেজ…অফ দা সুলতান্‌স্ অফ দিল্লী', ৩৮৪) ধরেই নিয়েছিলেন যে 'আইন'-এর সময়ে তামা-রূপোর যে-অনুপাত চালু ছিল শের শাহের আমলেও সেই একই অনুপাত চলত। এর ভিত্তিতে তাঁরা অনেক তত্ত্বও খাড়া করেছেন। ওপরের তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যেতে পারে এ ব্যাপারে তাঁরা কতটা অতি-নিশ্চিত ছিলেন।

৯. 'আইন', ১ম খণ্ড, ২৬।

১০. ইংরেজ কুঠিয়ালরা যখন ওজনের কথা না বলে মুদ্রার কথা বলেন তখন তাঁরা পয়সা বা 'পাইস' ইত্যাদি বলতে আধ-'দাম'-এর কথাই বলতে চান। ১৬০৯ সালে সুরাটে 'মাহ্‌মুদী'র দর বলা হয়েছে "৩২ বা ৩১ পয়সা", "তামার (দর) ওঠানামার সঙ্গে পাল্‌টায়" ('লেটার্স রিসিভ্‌ড', ১ম খণ্ড, ৩৪); ১৬১১ সালে এই দাম ছিল ৩২ (ঐ, ১ম খণ্ড, ১৪১)। টাকাকে ২$\frac{১}{২}$ 'মাহ্‌মুদী'র সমান ধরলে, 'মাহ্‌মুদী' যখন ৩২ পয়সা ছিল তখন টাকার দর ঠিক ৮০ পয়সা (৪০ 'দাম') হওয়া উচিত। কিন্তু যখন টাকার দর ছিল মাত্র ২$\frac{১}{৪}$ 'মাহ্‌মুদী' (সম্ভবত বাজারের ক্ষেত্রে প্রায়ই এই দর যেত) তখন তার বদলে মাত্র ৩৮$\frac{১}{৪}$ 'দাম' পাওয়া যেত। ১৬১৪ সালে আহ্‌মেদাবাদে টাকার দর ধরা হয়েছিল ৩৮·৫ বা ৩৯·৭ 'দাম', কিন্তু এই খবর পাঠানোর দশদিনের মধ্যে ঐ দর ৪২ হয়েছিল বলে জানা যায় ('লেটার্স রিসিভ্‌ড্', ২য় খণ্ড, ২১৪, ২৪৯-৫০)। ঐ একই বছর উফ্‌লিট আগ্রায় টাকার ক্ষেত্রে (যেটিকে তিনি 'সওয়াই' ও

১৬১৯ সালে কিন্তু গুজরাটে তামার দাম অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল বলে লক্ষ্য করা যায়, যদিও কতটা বেড়েছিল তা জানা যায় না।[১১] এরপরে নিশ্চয়ই তামার দাম আরও তাড়াতাড়ি ও ভালো রকম চড়ে যায়—১৬১৯-এর বৃদ্ধি ছিল তারই সূচনা, কারণ ১৬২৬ নাগাদ আগ্রায় 'দাম'-এর অঙ্কে টাকার মূল্য ২৯ বা ৩০-এ নেমে আসে।[১২] ১৬২৮ ও ১৬৩৩ সালে গুজরাট থেকে যেসব হার পাওয়া যায় সেখানে এই ব্যাপারটি সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে। এগুলো থেকে দেখা যায় যে টাকা ২৫ 'দাম'-এ নেমে এসেছে, যদি না আরও নেমে গিয়ে থাকে।[১৩] ১৬৩৪ সালে সেহ্ওয়ানে (সিন্ধু) টাকার বদলে মাত্র ২৪ 'দাম' পাওয়া গিয়েছিল।[১৪]

১৬৩৬ সাল নাগাদ গুজরাটে রুপোর দর কিছুটা উঠেছিল বলে মনে হয়। সেখানে

'জাহাঙ্গীরী' থেকে আলাদা করেছেন) '৯৬ থেকে ১০২ পয়সা' অবধি যে-মূল্য ধরেছেন তা নিশ্চয়ই ভুল (ফস্টার, 'সাপ্লিমেণ্টারি ক্যালেণ্ডার', ৪৮)। তিনি 'মাহ্মুদী'র যে মূল্য ধরেছিলেন ৩২ থেকে ৩৪ 'পয়সা' (ঐ. পৃ. ৪১)। তার পরের বছরের গোড়ার দিকে সুরাটে 'মাহ্মুদী'কে ৩৪ 'পাইস' বা ১৭ 'দাম'-এর সমান বলে ধরা হয়েছিল ('লেটার্স রিসিভ্‌ড্‌', ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১), এবং খামবায়াত-এ টাকার মূল্য ছিল ৩৮ 'দাম' (ঐ, ৪১)। ঐ একই সময়ে আহ্মেদাবাদে সিক্কা টাকার মূল্য ৪৩ 'দাম' বলে জানানো হয়েছে (ঐ, ৮৭)। ইংরেজ কুঠিয়ালরা তাদের হিসাবপত্রের জন্য নীচের সমীকরণটি পাকাপাকিভাবে ধরে নিয়েছিল: ১ 'মাহ্মুদী'=৩২ 'পাইস'; ১ টাকা=৮০ 'পাইস'; তাহলে দ্বিতীয় সমীকরণটির সঙ্গে 'দাম'-এর সরকারী মূল্য মেলে ('লেটার্স রিসিভ্‌ড্‌', ৩য় খণ্ড, ৮৭; 'ফ্যাক্টরিস ১৬৩৩-৪', ২০৯; ফ্রায়ার, ২য় খণ্ড, ১২৬)।

১৬১৫ সালে আজমীর থেকে লেখার সময় মিটফোর্ড বলেন যে আগ্রায় 'চালানী' টাকা ৮৩ 'পিসা' বা ৪১½ 'দাম'-এ পাওয়া যেত এবং 'খাজানা' ছিল ঠিক ৮০ 'পিসা' বা ৪০ 'দাম' ('লেটার্স রিসিভ্‌ড্‌', ৩য় খণ্ড, ৮৭)।

১১. এই বছরে সুরাটের কুঠিয়ালরা পারস্যে পাঠানোর জন্য তামার খোঁজ করছিল এবং তামার দর প্রচণ্ড চড়া দেখে 'দশ মণ পয়সা' গলিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এক সরকারী নিষেধাজ্ঞায় এই কাজে বাধা পড়ে এবং মুদ্রাগুলো না গলিয়েই পাঠাতে হয়েছিল ('ফ্যাক্টরিস, ১৬১৮-২১', ১৪২, ১৪৪)।

১২. পেলসার্ট, ২৯, ৬০। প্রথমে তিনি বলেন যে ১ টাকা=৫৮ পয়সা বা তারও বেশি; দ্বিতীয়ত তিনি বলেন যে ৫ বা ৬ টাকা ছিল ৪ বা ৫ ষ্টিভার-এর সমান, আর এক টাকা সমান ছিল ২৪ ষ্টিভার।

১৩. ১৬২৮ সালে আহ্মেদাবাদে টাকার বিনিময়ে মাত্র ৫১ পয়সা বা ২৫½ 'দাম' পাওয়া যাচ্ছিল ('ফ্যাক্টরিস ১৬২৪-২৯', পৃ. ২৩৫); ১৬৩৩-এ সুরাটে দর যাচ্ছিল "২০ পয়সার এক 'মাহ্মুদী', কখনও বেশি, কখনও কম" (মাণ্ডি, ৩১১)। ১৬৩৬ সালে সুরাট কুঠিয়ালদের এক চিঠির বিবরণ থেকে তার সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে যে দুর্ভিক্ষের আগে গুজরাটে 'মাহ্মুদী' '২০, ২১ এবং ২২ পয়সার বেশি' ছিল না ('ফ্যাক্টরিস ১৬৩৪-৬', ২০৬)।

১৪. 'মজহার-এ শাহ্জাহানী', ১৮৪; এখানে 'দাম'কে 'তঙ্কা-এ মুরাদী' বলা হয়েছে।

তখন টাকার দাম ২৬ বা ২৭ 'দাম' দেখানো হয়েছে।[১৫] আগ্রায় ওলন্দাজ হিসাবপত্রে টাকার 'দাম'-দর জানুয়ারি ১৬৩৭-এ ২৫ 'দাম' থেকে একটানা বেড়ে অক্টোবর, ১৬৩৮-এ ২৯ 'দাম'-এ দাঁড়িয়েছিল।[১৬] ১৬৪০-এ রাজমহলে, মনে হয়, টাকার বদলে ২৮ 'দাম' পাওয়া যেত, যদিও আগ্রার চেয়ে সেখানে তামার দর নিশ্চয়ই বেশি ছিল।[১৭]

পরের দশক সম্বন্ধে তথ্যের অভাব আছে,[১৮] কিন্তু পঞ্চাশের দশক থেকে আবার নজির পাওয়া যায়। তার তথ্য সর্বতোভাবে তামার দামের চমকপ্রদ বৃদ্ধির প্রমাণ দেয়। আরাবল্লীতে কয়েকটি তামার খনির ব্যর্থতাই নিশ্চিতভাবে এই বৃদ্ধির অন্তত আংশিক কারণ বলে মনে হয়। দরবারী ঐতিহাসিক আমাদের জানিয়েছেন যে বিরাট ও সিংঘানা-র খনিগুলোর উৎপাদন এতই কমে গিয়েছিল যে ১৬৫৫ সালে তাদের পরিচালন-ব্যবস্থা বদলানোর দরকার হয়ে পড়ে।[১৯] পরের বছরে সিন্ধুপ্রদেশে টাকার যে-দর দেখানো হয়েছে তা খুবই কম—৪৫ পয়সা বা ২২½ 'দাম'-এরও নীচে।[২০] আনুমানিক ১৬৫৯ সালের এক পুস্তিকায় দেখা যায় টাকার দর ছিল ২৪ 'দাম'।[২১] ১৬৬০ সালে সুরাটের কুঠিয়ালরা জানায় যে তামা "প্রচণ্ড আক্রা"। তার পরের বছরে সুরাট থেকে ওলন্দাজদের এক চিঠিতে তামার অভাবের জন্য দেশের ভেতরের খনিগুলোর অব্যবস্থা ও বিদেশ থেকে কম যোগান আসাকে দায়ী করা হয়েছে।[২৩] ১৬৬১ সালে আওরঙ্গাবাদ ও দৌলতাবাদ থেকে নতুন তৈরি 'আলমগীরী' টাকার দর যথাক্রমে

১৫. ভান টুইস্ট, *JIH*, খণ্ড ১৬, ৭২-৩। তিনি বলেন, ১ 'মাহ্‌মুদী'=২৪ বা ২৫ 'পাইস'= ১২ বা ১৩ 'তঙ্কা' (তার অর্থে, 'দাম'); এবং ১ টাকা=৫৩ বা ৫৪ 'পাইস'=২৬ বা ২৭ 'তঙ্কা'। *সুরাট কুঠিয়ালদের মতে ১৬৩৬ সালের মধ্যে 'মাহ্‌মুদী' বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ২৫ থেকে* ২৫½ 'পাইস'। (ফ্যাক্টরিস, ১৬৩৪-৬', পৃ. ২০৬)।

১৬. 'আকবর টু আওরঙ্গজেব', পৃ. ১৪৮ টীকা-য় মোরল্যাণ্ড-এর উদ্ধৃতি। মূল পাঠে সংখ্যাগুলো যথারীতি 'পাইস'-এর অঙ্কে।

১৭. মানরিকের সমীকরণ থেকে এটি পাওয়া যায় (২য় খণ্ড, ১০২, ১৩৬, ১৭৪)।

১৮. ১৬৪৬ ও ১৬৪৭ সালের ক্ষেত্রে তোলা পিছু পয়সার অঙ্কে রূপোর বাঁটের যে দাম দেওয়া আছে তার থেকে সিদ্ধান্ত টানার লোভ হতে পারে ('ফ্যাক্টরিস, ১৬৪৬-৫০', পৃ. ১৮৭)। কিন্তু স্পষ্টতই এই পয়সা হলো হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত আধ-'দাম'। ইংরেজদের কুঠির খাতাপত্রে টাকার দর ধরা হয়েছিল ৮০ আধ-'দাম'। অতএব, যে-দাম দেওয়া হয়েছে তা হলো রূপোর বাঁটের দাম।

১৯. ওয়ারিস: ক: পৃ. ৪৮৮ ক; খ: পৃ. ১২৯ ক। 'সরকার' নরনাউলের একটি 'মহাল' ছিল সিংঘানা।

২০. 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৫৫-৬০', পৃ. ৭৮।

২১. 'দস্তুর-আল আমল-এ আলমগীরী', পৃ. ১৯ ক। এখানে স্পষ্টভাবেই 'তঙ্কা' শব্দটি 'দাম'-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে।

২২. 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৫৫-৬০', পৃ. ৩০৬।

২৩. 'আকবর টু আওরঙ্গজেব', পৃ. ১৮৪-তে মোরল্যাণ্ড-এর উদ্ধৃতি।

১৫—১৪$\frac{৭}{৮}$ ও ১৬$\frac{৭}{১০}$—১৬$\frac{৯}{৫০}$ 'দাম' বলে জানানো হয়।[২৪] পরের বছরের গোড়ার দিকে বিদর প্রদেশের রামগীরে এই দর ছিল ১৪$\frac{১}{২}$—১৪$\frac{১}{৪}$ 'দাম'।[২৫] ঐ একই বছরের শেষদিকে সুরাটে দর ছিল ১৬ 'দাম'-এর অল্প কিছু ওপরে।[২৬] ১৬৬৩ সালে 'মামুদী'—আগে যার মূল্য ১০ 'দাম' বলা হয়েছে—তার দর দাঁড়িয়েছিল ৭ 'দাম' বা আরও কম।[২৭] ১৬৬৫-৬ সালে "তামার এত অভাব দেখা যায় যে আহ্‌মেদাবাদ শহরের 'সরফ'-রা লোহার পয়সা চালু করে এবং সেটি চড়া দরে বিক্রি করে"; আওরঙ্গজেবের আমলের হালকা 'দাম'-এর মুদ্রা চালু করে এই পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করা হয়েছিল।[২৮] তেভেনো বলেন যে, জানুয়ারি, ১৬৬৬-তে তিনি যখন সুরাটে নেমেছিলেন, তখন টাকার দর ছিল ৩০$\frac{১}{২}$ 'পেচা' এবং ফেব্রুয়ারি, ১৬৬৭-তে যখন তিনি ফিরে যান, তখন দর হয়েছিল ৩২$\frac{১}{২}$ 'পেচা'; অর্থাৎ টাকার মূল্য ১৭ 'দাম' থেকে কিছু কমে ১৬ 'দাম'-এর কিছু বেশি হয়েছিল।[২৯] তামার দামের হারগুলো থেকে একইভাবে এই ধাতুর প্রচণ্ড অভাব ধরা পড়ে। ১৬৩৫ সালে ইংরেজরা তখনকার প্রচলিত মণ পিছু ২০ 'মাহ্‌মুদী' দরে তামা কিনেছিল, অর্থাৎ পরের দিকের মণ চালু থাকলে দর হতো ২২.২ 'মাহ্‌মুদী'।[৩০] কিন্তু ১৬৬০ সালে সুরাটে যে দাম দেখানো হয় তা মণ পিছু ৪৫ 'মাহ্‌মুদী'র কম ছিল না।[৩১] ১৬৬২ সালে এই দাম বেড়ে হয় ২২$\frac{১}{৪}$ টাকা,[৩২] কিন্তু ১৬৬৪-তে এটি ছিল ২০ থেকে ২২ টাকা,[৩৩] এবং

২৪. 'ওয়কাই দখিন', ৩২-৩৩, ৫৯। সম্পাদক তামার মূল্যকে 'তঙ্কা' ও 'দাম'-এর হিসেবে ধরেছেন। আমরা যাকে ১৪$\frac{৭}{৮}$ 'দাম' বলেছি, সম্পাদিত পাঠে তাকে "১৪ 'তঙ্কা' ৪৩$\frac{৩}{৪}$ 'দাম'" বলে দেওয়া আছে। মনে করা যেতে পারে যে (এই পরিশিষ্টের প্রথম অংশের টীকা ৬ দ্রষ্টব্য) তামার মুদ্রার ক্ষেত্রে প্রথাগত মুদ্রামানে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে ছোট একক ছিল যথাক্রমে 'তঙ্কা' ও 'দাম'; আর ৫০ 'দাম'-এ হতো এক 'তঙ্কা'। মনে হয়, 'তঙ্কা' এই নামটি এখানে 'দাম'-মুদ্রার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ছাড়াও 'দাম' শব্দটিকে তার পুরনো অবস্থায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২৫. 'দফ্‌তর-এ দিওয়ানী ও মাল ও মুলকী', ইত্যাদি, ১৭৩; 'ওয়কাই দখিন', ৭৫। সম্ভবত, পুরনো 'দাম'-এর অঙ্কেই এই মূল্যটি দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় এক ধরনের হার, অর্থাৎ, ১৯$\frac{১}{৪}$ ও ১৯ 'দাম'-ও দেওয়া আছে। এগুলো বোধহয় আওরঙ্গজেবের তৈরি নতুন হালকা 'দাম'।

২৬. 'ফ্যাক্টরিস, ১৬৬১-৬৪', পৃ. ১১২।

২৭. ঐ, ১২১।

২৮. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৫।

২৯. তেভেনো, ২৫-২৬। তাভার্নিয়ে, ১ম খণ্ড, ২২-৩, বলেন যে "শেষবার যাওয়ার সময়ে (১৬৬৫-৭) সুরাটে টাকার দর ছিল ৪৯ পয়সা, কিন্তু কখনও কখনও এই দর ৪৬-এ নেমে আসে।" তিনি বোধহয় ভুল করেছেন এবং আগের কোন ভ্রমণের কথা বলতে চেয়েছেন, কারণ এইসব অঞ্চলে তিনি ঘুরছিলেন ১৬৪০ সাল থেকে।

৩০. 'ফ্যাক্টরিস্‌, ১৬৩৪-৬', পৃ. ১৪৮।

৩১. 'ফ্যাক্টরিস্‌, ১৬৫৫-৬০', পৃ. ৩০৬।

৩২. 'ফ্যাক্টরিস্‌, ১৬৬১-৪', ১১৩।

৩৩. ঐ, ২১০।

১৬৬৫-তে ২০ টাকা বা আরও কম।[৩৪] ১৬৬৮-তে আবার দাম দাঁড়ায় মণ পিছু ২১½ টাকা, যখন আশা করা যাচ্ছিল যে তামার চাহিদা আরও বাড়বে।[৩৫] বাংলাতেও উল্লেখযোগ্যভাবে দাম বেড়েছিল। সেখান থেকে ১৬৬৯ সালে বালাসোরের কুঠিয়ালরা জানায় যে "সাধারণত প্রতি মণ [এই মণ সুরাট মণের প্রায় দ্বিগুণ] তামার দাম ৩৬ থেকে ৪২ টাকা, কিন্তু এখন দাম যাচ্ছে ৫০ টাকা।"[৩৬]

১৬৭১ সালে মার্শাল রাজমহল ও পাটনার মধ্যবর্তী বিভিন্ন জায়গায় টাকার হিসেবে পয়সার ('পাইস') হার উল্লেখ করেছেন। এই হার ছিল যথাক্রমে ২৮, ২৬, ২৮, ৩৩½ ও ৩৩; অর্থাৎ সাধারণভাবে তিনি যত পশ্চিমের দিকে যাচ্ছিলেন, দাম তত বাড়ছিল।[৩৭] পাটনায় টাকার হার, তিনি বলেছেন, ৩০ পয়সা।[৩৮] তাঁর কথা থেকে মনে হয়, যে-'পয়সা'র কথা তাঁর মাথায় ছিল, সেই 'পয়সা' আর পুরোনো আমলের পুরো 'দাম' একই জিনিস।[৩৯] কিন্তু আমরা সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তুলতে পারি এ কথা ঠিক কিনা, কারণ এর মানে দাঁড়াবে এক বছরের মধ্যেই তামার অঙ্কে টাকার দাম দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি যদি আসলে আধ-'দাম'-এর কথা বলে থাকেন তাহলে মনে হয় যে তামার দাম তখনও বেড়ে চলছিল। যাই হোক, তাঁর ঠিক পরের কোন লেখকের কাছ থেকে এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার মতো কিছু পাওয়া যায় না। নতুন 'আলমগীরী' টাকা চালু করার ফলে উত্তরণ পর্বে এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়; মনে হয় তার জন্যই ফ্রায়ার পুরোপুরি খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন।[৪০] এই শতকের শেষ দশকের আগে অবধি এ বিষয়ে আর কোন তথ্য পাওয়া যায় না। শেষ দশকে টাকার যে হারগুলো পাওয়া যায় সেগুলি সম্ভবত আওরঙ্গজেবের হালকা 'দাম'-এর হিসেবে। পশ্চিম উপকূলে ১৬৯১-২-তে ঐ হার ছিল ২১.৩,[৪১] সুরাটে ১৬৯০-৯৩তে ৩০ (±১.৫)[৪২] এবং ১৬৯৫ সালে ২৭ 'দাম'।[৪৩] অর্থাৎ পুরোনো 'দাম'-এর

৩৪. 'ফ্যাক্টরিস্, ১৬৬৫-৭', পৃ. ৩১, ৭৭।

৩৫. 'ফাক্টরিস্, ১৬৬৮-৯', পৃ. ২৪।

৩৬. ঐ, ৩১১। তুলনীয় বাউরি, ২৩২-৩।

৩৭. মার্শাল, ১১৮, ১২১, ১২২, ১২৫, ১২৬।

৩৮. ঐ, ৪১৬।

৩৯. ঐ, ৪১৬-১৭।

৪০. "গরীব গোছের লোকদের মধ্যে 'পাইস' নামে এক ধরনের তামার মুদ্রা চালু আছে; কখনও কখনও ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৯ থেকে ২৪ 'পাইস'-এ এক 'মাহ্মুদী' হয় বা এক 'মাহ্মুদী'র সমান ধরা হয়" (ফ্রায়ার, ২য় খণ্ড, ১২৬)।

৪১. হিজ্‌রী ১১০৩-এ সাদিক খানের (মামুরি, পৃ. ১৮৩ খ-১৮৪ ক; খাফী খান, ২য় খণ্ড, ৪০১-২) পরবর্তী লেখক লিখেছেন যে পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজ-অধিকৃত অঞ্চলে ৯ আনার "আশরফী" ও ⅛ 'ফুলুস' ('দাম') মূল্যের 'বাজুর্ক' চালু ছিল। ৪৮ 'বাজুর্ক'-এ (বা ২৪ পয়সায়) এক "জেরাফিন" (ফ্রায়ার, ২য় খণ্ড, ১৩১), তাহলে এই দুই সমীকরণ থেকে ৯/১৬ টাকা = ১২ 'ফুলুস'—এই হার বার করা যায়।

৪২. ওভিংটন, ১৩২।—যাট "পাইস…কখনও কখনও দুই বা তিন বেশি বা কম।"

৪৩. কারেরি, ২৫৩।—"খুচরো, যার নাম 'পেসি' [পয়সা], ৫৪ 'পেসি'তে এক 'রুপী [টাকা] হয়।"

হিসেবে যথাক্রমে ১৪.২, ২০ (±১) ও ১৮। এই হারগুলো থেকে নিশ্চিতভাবেই আভাস পাওয়া যায় যে ষাটের দশক থেকে আর কোন পরিবর্তন হয়নি। এবং বোধহয় এই অনুমানও সঙ্গত যে 'আইন'-এর সময় তামায় টাকার যা দাম ছিল, এই শতকের শেষে তা দাঁড়িয়েছিল তার প্রায় অর্ধেক বা আরেকটু কম।

৪. ভারতে 'দামের বিপ্লব'

একদিকে টাকার মূল্য আর অন্যদিকে সোনা ও রূপোর মুদ্রার মূল্য—এই দুই মূল্যের অনুপাতের পরিবর্তনগুলো আগের অংশে যেভাবে দেখানো হলো, তার থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে অন্য দুই ধাতুর তুলনায় ১৭ শতকে রূপোর মূল্য অনেক কমে গিয়েছিল। আমরা দেখতে পাই রূপোর মূল্য দুবার প্রচণ্ডভাবে কমে যায়। প্রথমটি হয়েছিল বিশের দশকে, যখন ('আইন'-এ সোনা ও রূপোর টাকায় যে মূল্য দেওয়া আছে তাকে ভিত্তি অর্থাৎ ১০০ ধরে) সোনা ও তামার মূল্য বেড়ে হয়েছিল যথাক্রমে ১৫৬ (১৬২৬ সালে) ও ১৬১ (১৬২৮ সালে)। অল্প একটু সামলে ওঠার পর, চল্লিকের দশকে দ্বিতীয়বার মূল্য কমতে শুরু করে ও ষাটের দশক অবধি তা চলেছিল। ঐ সময়ে সোনার মূল্য এসে দাঁড়িয়েছিল ১৭৮-এ (১৬৬৬ সালে) এবং তামা গিয়ে পৌঁছয় ২৭৬-এ (১৬৬২ সালে)। সত্তরের শেষ থেকে অন্তত সোনার হিসেবে রূপোকে তাড়াতাড়ি সামলে উঠতে দেখা যায়। কিন্তু ঐ শতকের শেষে সোনা আবার ১৫০-এর কাছাকাছি ওঠে ও তামা ২০০-র ওপরে গিয়ে দাঁড়ায়।

রূপোর মূল্য কেন এত কমে গিয়েছিল এ বিষয়ে আমাদের সমসাময়িক সূত্রগুলোতে কোন আলোচনা পাওয়া যায় না। আমরা দেখেছি, পঞ্চাশের শেষে ও ষাটের গোড়ায় তামার মূল্যবৃদ্ধির জন্য দেশের ভেতরের খনিগুলোর ব্যর্থতাকে দায়ী করা হয়েছিল। একইভাবে বলা হয়েছিল যে, আওরঙ্গজেব তাঁর পূর্বপুরুষদের মজুত সোনা উজাড় করে দেওয়ার ফলেই ১৬৭৬ সালে সোনার তুলনায় রূপোর অবস্থার উন্নতি ঘটে। কিন্তু এই দুটি ধাতুর যে-কোন একটির মূল্যে সাময়িক ওঠানামার জন্যই ঐ ধরনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল এবং একমাত্র সেইভাবেই এগুলো স্বীকার করা যায়। কিন্তু ধাতু দুটির মূল্যবৃদ্ধির যে সাধারণ ঝোঁক দেখা যায় তার আসল কারণ ছিল রূপোর মূল্যহ্রাস। এর ফলে সোনা ও তামা দু-এরই লাভ হয়েছিল। একটি ঘটনা থেকে ব্যাপারটি সবচেয়ে ভালো বোঝা যায়: বিশের দশকে এবং ঐ শতকের মাঝামাঝি প্রায় একই সময়ে দুটি ধাতুরই মূল্যবৃদ্ধি হয়েছিল, যদিও এ কথা ঠিক যে সোনার তুলনায় তামার দাম বেড়েছিল আরও বেশি।

'নতুন পৃথিবী' [আমেরিকা মহাদেশ] থেকে সোনা রূপোর আমদানি ছিল ১৬ ও ১৭ শতকে ইউরোপে 'দাম-বিপ্লবে'র কারণ। এই আমদানির ধাক্কা যে, আজ হোক কাল হোক, ভারতেও আসতে বাধ্য—আধুনিক লেখকরা স্পষ্টতই তা বুঝতে পারেননি।[১]

১. মোরল্যাণ্ড যেমন এই দিকটি পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি তামার মূল্যবৃদ্ধি লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু জোর দিয়ে বলেছেন যে এর কারণ "তামার সঙ্গে জড়িত, রূপোর সঙ্গে নয়।"

১৬ শতকের প্রথমদিকে স্পেনীয়রা আজটেক ও ইন্‌কাদের সম্পদ লুঠপাট করতে থাকে। তখন থেকেই আমেরিকান সোনারুপোর আমদানি শুরু হয়। কিন্তু ১৫৫০ সাল নাগাদ বলিভিয়া ও মেক্সিকোতে 'প্রচুর উৎপাদনশীল' রুপোর খনি আবিষ্কার হয়। সেগুলোতে কাজ শুরু হওয়ার ফলেই প্রকৃত 'ইউরোপীয় দাম-বিপ্লবে'র সূচনা হয়।[২] ১৬৩০ সাল অবধি আমেরিকান রুপোর উৎপাদন বাড়তে থাকে এবং তারপরে ভাঁটা পড়ে।[৩] ইউরোপে আমেরিকান সোনার যোগান ছিল রুপোর তুলনায় নামমাত্র,[৪] যার ফলে এই পর্বে রুপোর হিসেবে সোনার দাম বেড়ে যায়।[৫]

১৭ শতক জুড়ে আমেরিকান সোনারুপোর প্রবাহকে ইউরোপে প্রাচ্যে পৌঁছে দিয়েছিল। এইভাবে প্রাচ্যের দিকে সোনারুপোর চালান নিয়ে পশ্চিম ইউরোপে এক বিরাট বিতর্ক শুরু হয় এবং হিসেব করা হয় যে ঐ শতকের শেষে মোট চালানের মূল্য ছিল ১০০,০০০,০০০ পাউণ্ড।[৬] এই সম্পদের বেশির ভাগই পেয়েছিল ভারত। ১৬১৩ সালে হকিন্স লিখেছিলেন, "রুপোয় ভারত সমৃদ্ধ ; কারণ প্রত্যেক জাতি এখানে মুদ্রা নিয়ে আসে ও তার বদলে নানারকম পণ্য নিয়ে যায়।"[৭] যে ধরনের বাণিজ্যের ফলে এই সমৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল, আওরঙ্গজেবের রাজত্বের গোড়ার দিকে বার্নিয়ে তা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন।[৮] অনেক পরে, ১৭৬২-৩ সালে একজন ভারতীয় পর্যবেক্ষক লক্ষ্য করেছেন যে, বিদেশ থেকে জাহাজগুলো ভারতে নিয়ে আসে মূল্যবান ধাতু, কিন্তু ফিরে যায় শুধুমাত্র পণ্য নিয়ে, সোনারুপো নয়।[৯]

সোনারুপোর এই আমদানির ফলে তাদের মূল্য কমে যাওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী। ভারতে রুপোর মূল্য ১৬৭০-এর দশকে এসে স্থিত হয়েছিল। এই ব্যাপারটি কৌতূহলজনক, কারণ ১৬৩০-এর পর থেকে আমেরিকান রুপো উৎপাদনে যে-ভাঁটা

ফলে সাধারণভাবে রূপোর দাম পড়ে যাওয়ার ব্যাপারটাই তিনি অস্বীকার করেছেন ('আকবর টু আওরঙ্গজেব', ১৮৫)। তার আংশিক কারণ বোধহয় এই যে সোনা-রূপোর অনুপাতের পরিবর্তনগুলো তিনি পরীক্ষা করেছিলেন খুবই ওপর-ওপর (ঐ, ১৮২)।

দাম-বিপ্লব ইউরোপীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটি সুবিদিত ঘটনা। ১৬ শতকের মধ্যেই স্পেনে দাম (রূপোর অঙ্কে) বেড়েছিল শতকরা ৪০০ ভাগ এবং ১৫৫০ থেকে ১৬৫০-এর মধ্যে বৃটেনে বেড়েছিল শতকরা ৩০০ ভাগ (ডব, 'স্টাডিজ ইন দা ডেভেলপমেণ্ট অফ ক্যাপিটালিজম্‌', লণ্ডন, ১৯৪৭, পৃ. ২৩৬ টীকা।)

২. জে. এইচ. প্যারী, 'দা নিউ কেমব্রিজ মডার্ন হিস্ট্রি', কেমব্রিজ, ১৯৫৮, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮২।

৩. এইচ. হিটন, 'ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইউরোপ', নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৮, পৃ. ২৪৮।

৪. ১৫২১ থেকে ১৬৬০-এর মধ্যে সরকারী সূত্রেই প্রায় ১৮,০০০ টন রূপো আমেরিকা থেকে স্পেনে এসেছিল, কিন্তু সোনা এসেছিল মাত্র ২০০ টন (ঐ, ২৪৯)।

৫. ই. লিপসন, 'দি ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইংল্যাণ্ড', লণ্ডন, ১৯৪৭, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৫ দ্রষ্টব্য।

৬. এই আনুমানিক হিসাব ও বিতর্কের জন্য দ্রষ্টব্য ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৭-৮২।

৭. হকিন্স, 'আর্লি ট্রাভেল্‌স্‌', ১১২।

৮. বার্নিয়ে, ২০২-৪। তুলনীয় ফ্রায়ার, ১ম খণ্ড, ২৮২-৩।

৯. আজাদ বিলগ্রামী, 'খিজানা-এ আমীরা', পৃ. ১১১।

পড়ে, তার জন্য সম্ভবত এই ধরনের বিলম্বিত পরিণতিই আশা করা যায়। একইভাবে রূপোর হিসেবে সোনার দাম বেড়ে যায় এবং এই সময়ের কিছু আগে ইউরোপে যে-অনুপাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সোনা সেই অনুপাতে এসে পৌঁছয়। অতএব, 'আইন'-এর সময়ে সোনা-রূপোর অনুপাত (১ : ৯.৫) এলিজাবেথীয় ইংল্যাণ্ডের বিধিবদ্ধ অনুপাতের (১ : ১২) চেয়ে পিছিয়ে ছিল এবং ১৭ শতকের শেষেও ভারতের অনুপাত (১ : ১৩.৮) ছিল ১৬৬০ সালের পরে ইংল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত অনুপাতের (১ : ১৪.৫) কম।[১০] সেই সঙ্গে ইউরোপ থেকে সোনা আমদানির[১১] ফলে সোনার সাধারণ মূল্য নিশ্চয়ই কমে যায়, যদিও অবশ্যই রূপোর চেয়ে অনেক কম পরিমাণে।

অতএব, দেখা যায় যে তিনটি মূল্যবান ধাতুর মধ্যে তামার মূল্যই ছিল সবচেয়ে বেশি স্থিত। বিশাল পরিমাণে তামা কখনোই আমদানি করা যেত না এবং ১৭ শতকের গোড়ায় ইংরেজরা পারস্যে ভারতীয় তামা রপ্তানিও করেছিল।[১২] ১৭ শতক জুড়ে সামগ্রিকভাবে মূল্যস্তরের ধারাটিকে অনুসরণ করার ব্যাপারে তামার মূল্যের স্থিতি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ঐ স্থিতির অর্থ হলো : সোনার মূল্য নয়, তামার মূল্যই ছিল টাকার ক্রয়ক্ষমতা পরিবর্তনের অনেক বেশি নির্ভুল সূচক।

১০. এই পরিশিষ্টে টাকা-'মোহর' মূল্যের যেসব অনুপাত বার করা হয়েছে এই তুলনার ক্ষেত্রে সেগুলোই ব্যবহার করা হলো ; কিন্তু সোনা-রূপোর বাঁটের ক্ষেত্রে ঐ সব অনুপাত প্রয়োগ করার সময়ে দুটি মুদ্রার ওজনের তফাতের জন্য কিছুটা অদল-বদল করে নিতে হয়েছে। ইংল্যাণ্ডে বিধিবদ্ধ অনুপাতগুলোর জন্য লিপসন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৫ দ্রষ্টব্য।

১১. ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি ভারতে যে সোনা রপ্তানি করেছিল তার জন্য লিপসন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৮ দ্রষ্টব্য। দেশের ভেতরের যোগানের জন্য সোনার দামের কোন হেরফের হয়নি। হয়তো তার একমাত্র কারণ এই যে, ভারতে সোনার উৎপাদন ছিল নগণ্য ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২ দ্রষ্টব্য ; বার্নিয়ে, ২০৫ ; ফ্রায়ার, ১ম খণ্ড, ২৮৩)।

১২. 'ফ্যাক্টরিস, ১৬১৮-২১', পৃ. ১১৪, ১৪২, ১৪৪ ; জাপান থেকে ভারতে তামা আমদানির প্রথম সূচীবদ্ধ উল্লেখ পাওয়া যায় 'ফ্যাক্টরিস, ১৬২২-২৩', পৃ. ২৬০-এ। এই সঙ্গে 'আকবর টু আওরঙ্গজেব', ১৮৪-ও দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট ঘ

'জমা' ও 'ওয়াসিল' পরিসংখ্যান

১. 'জমা'

বিশদ বর্ণনার ব্যাপারে 'আইন'-এর সঙ্গে তুলনীয় আর কোন পরিসংখ্যান নেই, কিন্তু ১৭ শতকের বহু লেখাপত্রে এমন প্রচুর সারণি পাওয়া যায় যাতে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের 'জমা-দামী'র অঙ্ক দেওয়া আছে। সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত জায়গায় এগুলো দেখা যায়—প্রশাসনিক পুস্তিকা, ঐতিহাসিক রচনা, পর্যটকের ভ্রমণবৃত্তান্ত, এমন কি গৃহস্থালী-পরিচালনা বিষয়ক একটি রচনায়।

প্রথম এইসব পরিসংখ্যান পরীক্ষা করার চেষ্টা করেন টমাস,[১] আর তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন যদুনাথ সরকার[২] ও মোরল্যাণ্ড[৩]। তাঁরা যে-তথ্য জোগাড় করেছিলেন তা মোটেই নগণ্য নয়, কিন্তু তাঁরা ব্যবহার করেননি এমন কয়েকটি উৎস থেকে তার সঙ্গে আরও কিছু নতুন তথ্য যোগ করা যায়। তাছাড়া এসব পরিসংখ্যান সারণির সময়-পরম্পরাও, মনে হয়, পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। কয়েকটি ক্ষেত্রে উৎসগুলোর মধ্যেই কিছু কিছু বিবৃতিতে মোটামুটি নির্দিষ্ট সন-তারিখ দেওয়া আছে,[৪] কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সারণিগুলোতে কোন বিশেষ তারিখের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকে না। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ 'জমা'র অঙ্কগুলো প্রমাণ নির্ধারণের সূচক, কোন বিশেষ বছরের আদায়ের অঙ্ক নয়। বইগুলো যে-সময়ে সঙ্কলিত হয়েছিল, বইএর অন্তর্ভুক্ত তারিখহীন পরিসংখ্যানগুলোকে টমাস ও মোরল্যাণ্ড সাধারণত সেই সময়েরই তথ্য বলে সনাক্ত করেছেন। এর বিরুদ্ধে অবশ্য আপত্তি তোলা যায়: সারণিগুলো যখন আমাদের উৎসে কপি করা হয় তখন সেগুলোর মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছিল। প্রশ্ন ওঠে: এই সব গ্রন্থের লেখকরা কোথা থেকে তথ্য নিয়েছিলেন—আধা-সরকারী কাগজপত্র থেকে, নাকি তাঁদের নিজেদের রচনার চেয়ে পুরনো রচনা থেকে? সুতরাং

১. এডওয়ার্ড টমাস, 'দা ক্রনিকল্‌স্ অফ দা পাঠান কিংস অফ দিল্লী', লণ্ডন, ১৮৭১, পৃ. ৪৩১-৫০। এবং 'দা রেভিনিউ রিসোর্সেস্ অফ দা মুঘল এম্পায়ার ইন ইণ্ডিয়া', লণ্ডন, ১৮৭১।

২. 'দি ইণ্ডিয়া অফ আওরঙ্গজেব', পৃ. ২৯ [ভূমিকা অংশ] ইত্যাদি।

৩. 'আকবর টু আওরঙ্গজেব', পৃ. ৩২২-২৮।

৪. 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৬ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, 'বারোটি প্রদেশের বিবরণ' শীর্ষক পরিসংখ্যানগুলো ৪০-তম ইলাহী বছর সংক্রান্ত। 'ইকবালনামা', ২য় খণ্ড, Or. 1834, পৃ. ২৩১ খ-য় বলা হয়েছে যে, এতে যেসব পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে, সেগুলো ১৬০৫ সালে জাহাঙ্গীর তখ্‌তে বসার পর তাঁর কাছে পেশ করা হয়। জগজীবনদাসও (Add. 26,253, পৃ. ৫১ ক) বলেছেন যে, তিনি যেসব রাজস্ব পরিসংখ্যান দিয়েছেন, বাহাদুর শাহের কাছে সেগুলো পেশ করা হয় উত্তরাধিকারের লড়াই-এর পরে, অর্থাৎ ১৭০৯-এ বা তার কাছাকাছি সময়ে।

মূল গ্রন্থের সন-তারিখের একমাত্র মূল্য এই যে সেগুলো থেকে তাদের অন্তর্ভুক্ত সারণিগুলোর সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য নিম্নতম সীমাটি পাওয়া যায়।

সুতরাং, পরিসংখ্যানগুলোর অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যই একমাত্র নির্ভরযোগ্য। যেমন, বিশেষ কয়েকটি প্রদেশকে সারণিতে রাখা বা না-রাখা থেকে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ সূত্র পাওয়া যায়। এইভাবে কোন তালিকায় যদি তেলেঙ্গানা প্রদেশের অঙ্ক থাকে, তাহলে সেটি সঙ্কলিত হয়ে থাকতে পারে কেবল ১৬৫৬-র আগে (এবং সম্ভবত, ১৬৩৩-এর আগে নয়) কেননা নবগঠিত জফরাবাদ বিদর প্রদেশের মধ্যে তেলেঙ্গানাকে ঢোকানো হয়েছিল ১৬৫৬ সালে।[৫] একইভাবে, বগলানা আসতে পারে একমাত্র সেইসব সারণিতে যেগুলো ১৬৩৮ এবং ১৬৫৮-এর মধ্যে তৈরি, কেননা এই দু-দশকেই বগলানা একটি আলাদা প্রদেশ ছিল।[৬] বল্‌খ্‌ এবং বদখ্‌শান ১৬৪৬-৭ সালে সাময়িকভাবে অধিকৃত হয়েছিল। তালিকায় তার নাম থাকলে আরও নির্দিষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু কান্দাহারের ক্ষেত্রে তার তাৎপর্য আরও কম হতে পারে, কারণ ১৬৫৩ সালে শেষ অবরোধের পরে সম্ভবত সাম্রাজ্যের তরফ থেকে এটি দাবি করা হতে থাকে। সবশেষে, বিজাপুর এবং হায়দ্রাবাদ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ হয়েছিল যথাক্রমে ১৬৮৬ এবং ১৬৮৭ সালে। এর থেকেও পরিসংখ্যানের সন-তারিখ ঠিক করার একটা গুরুত্বপূর্ণ হদিশ পাওয়া যায়। সারণিগুলোতে প্রতি প্রদেশের ক্ষেত্রে বরাদ্দ করা 'সরকার' এবং 'মহাল'-এর সংখ্যা পরীক্ষা করেও কিছু সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। ১৬৩২ অবধি খান্দেশে ছিল একটি-মাত্র 'সরকার'। সেই বছর একটি আলাদা 'সরকার' হিসেবে গলনা-কে এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়।[৭] তারপর ১৬৩৩-এর শেষ দিকে মালব থেকে দুটি পুরো 'সরকার' আর তৃতীয় একটি 'সরকার'-এর বিরাট অংশ নিয়ে এসে এখানে আরও কিছু অঞ্চল যোগ করা হয়।[৮] সুতরাং খান্দেশের আওতায় তিন বা ততোধিক 'সরকার' দেখানো হয়েছে এমন কোন সারণিকেই ১৬৩৩-এর আগে ফেলা যায় না। তেমনি আমরা জানি যে ১৬৫৯-এর কিছু আগে আগ্রা প্রদেশ থেকে দিল্লীতে দুটি 'সরকার' স্থানান্তর করার ফলে আগ্রা প্রদেশের 'সরকার'-এর সংখ্যা ১৪ থেকে কমে ১২ হয়ে গিয়েছিল।[৯] তাই কোন

৫. 'দস্তুর-আল আমল-এ শাহানশাহী', পৃ. ৭৯ ক-৮৯ ক। 'আইন'-এ তেলেঙ্গানাকে বেরার-প্রদেশের একটি 'সরকার' হিসেবে দেখানো হয়েছে। শাহজাহানের আমলেই প্রথম একে আলাদা প্রদেশ হিসেবে দেখা যায় (তুলনীয় লাহোরী, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ. ৬২-৩, ২০৫; ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১২)।

৬. তুলনীয় সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ৬০ খ-৬১ ক, ৮৭ খ-৮৮ ক; Or. 1671, পৃ. ৩৪ ক, ৪৮ ক।

৭. সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ৬০ ক-খ, Or. 1671, পৃ. ৩৩ খ-৩৪ ক; আরও দ্রষ্টব্য 'দস্তুর-আল আমল-এ শাহানশাহী', পৃ. ২৮ ক।

৮. লাহোরী, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ. ৬২-৩; আরও দ্রষ্টব্য সাদিক খান, পূর্বোক্ত সূত্র।

৯. যে-দুটি 'সরকার' স্থানান্তর করা হয়েছিল সে-দুটি হলো তিজারা আর নরনাউল। 'আইন' এবং 'ইকবালনামা'-য় এই দুটি 'সরকার'-কে আগ্রার আওতায় দেখান আছে, কিন্তু 'দস্তুর-আল আমল-এ আলমগীরী', পৃ. ১০৯ খ তে আছে দিল্লীর অধীনে। দ্বিতীয় বইটি সঙ্কলিত

সারণিতে আগ্রার অধীনে ১৪টি 'সরকার' দেখানো থাকলে তা নিশ্চয়ই আওরঙ্গজেবের আমলের আগেকার হবে। নামের পরিবর্তনও সন-তারিখ নির্দেশের কাজে লাগতে পারে। আগ্রার নাম পাল্টে আকবরাবাদ করা হয় ১৬২৯-এ,[১০] আর ১৬৪৮-এ দিল্লী হয়ে যায় শাহ্জাহানাবাদ।[১১] ১৬৩৬-এ পুরনো আহ্মদনগর প্রদেশটির নতুন নামকরণ হয় দৌলতাবাদ;[১২] পরে আবার এই নাম পাল্টে রাখা হয় আওরঙ্গাবাদ। এ কথা ঠিক যে, কোন করণিক বা নকলনবীশ আগের তালিকায় পরের নাম বসিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু পরবর্তী আমলের কোন তালিকায় আগেকার নাম কখনোই থাকতে পারে না।

আমাদের হাতে যত 'জমা'র সারণি এসে পৌঁছেছে স্থানাভাবে তার প্রত্যেকটির তারিখ নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু আগে যা বলা হলো সেই পথে এগিয়ে বেশির ভাগ সারণিকেই যথেষ্ট সঙ্কীর্ণ সময়সীমার মধ্যে ফেলা গেছে। নীচের তালিকায় এগুলো দেখানো হলো। পরিসংখ্যানগুলো কালানুক্রমিকভাবে পর পর সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সংখ্যা	বছর	উৎস
১.	১৫৯৫-৬	'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৬ ইত্যাদি
২.	১৬০৫	'ইকবালনামা-এ জাহাঙ্গীরী', ২য় খণ্ড, Or. 1834, পৃ. ২৩১খ-২৩২খ।
৩.	প্রাক্-১৬২৭	'মজালিসুস সালাতিন', Or. 1903, পৃ. ১১৪ক-১১৫খ।
৪.	১৬২৮-১৬৩৬	'বয়াজ-এ খুশবুই', I.O. 828, পৃ. ১৮০ক-১৮১ক।
৫.	১৬৩৩-৩৮	'ফরহঙ্গ-এ করদানী', Aligarh Ms. আবদুস সালাম, Farsiya 85/315, পৃ. ১৯ক-২০খ।
৬.	১৬৪৬-৪৭	Add. 16,863, পৃ. ১২০ক-১২১ক।
৭.	"	লাহোরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০৯-১২।
৮.	"	সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ১৫১ক-খ, Or. 1671, পৃ. ৭৭ক-খ
৯.	১৬৩৮-৫৬	বার্নিয়ে, ৪৫৫-৮।
১০.	"	তেভেনো, বই-এর সর্বত্রই।

হয়েছিল ১৬৫৯-এ, কিন্তু এর মধ্যে যেসব পরিসংখ্যান আছে সেখানে তেলেঙ্গানাকে আলাদা প্রদেশ হিসেবেই দেখানো হয়েছে। সুতরাং পরিসংখ্যানগুলো নিশ্চয়ই তৈরি হয়েছিল ১৬৫৬-য় বা তার কিছু আগে। 'চাহার গুলশন', পৃ. ৩৫ খ, যদুনাথ সরকার, ১২৫ ৬এ এই দুটি 'সরকার'কে দিল্লীর অধীনস্থ 'সরকার'গুলোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় যে পাকাপাকিভাবেই প্রদেশ বদল করা হয়েছিল।

১০. সাদিক খান, Or. 174, পৃ. ৯ ক, Or. 1671, পৃ. ৫ খ।

১১. ঐ, Or. 174, পৃ. ১৫৫ ক, ১৫৬ খ-১৫৭ ক, Or. 1671, পৃ. ৭৯ ক-৮০ ক।

১২. লাহোরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১২। মনে হয় সরকারীভাবে এটি শুধু 'দখিন' প্রদেশ বলেই পরিচিত ছিল (তুলনীয় 'সিলেকটেড্ ডকুমেন্টস্', পৃ. ১৫৮—১৬৪৫ খৃস্টাব্দ)।

সংখ্যা	বছর	উৎস
১১.	১৬৩৮-৫৬	Or. 1840, পৃ. ১৩৮ক-১৪০ক।
১২.	"	'দস্তুর-আল আমল-এ ইল্ম্-এ নভিসিন্দগী', পৃ. ১৪০ক-১৪৪খ।
১৩.	"	Bodl. O. 390, পৃ. ৯ক-৩০ক।
১৪.	"	সুজান রায়, বই-এর সর্বত্রই।
১৫.	"	মানুচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৩-১৫
১৬.	"	'ফরহঙ্গ-এ করদানী ও কার-আমোজী', Edinburgh 83, পৃ. ১৫খ-১৭ক।
১৭.	"	'সিয়াকনামা', পৃ. ১০২-১০৪।
১৮.	১৬৪৬-৫৬	'দস্তুর আল আমল-এ নভিসিন্দগী', পৃ. ১৬৬খ-১৬৭খ।
১৯.	আনু ১৬৫৬	'দস্তুর আল আমল-এ আলমগীরী', পৃ. ১০৯ক-১১০খ।
২০.	আনু. ১৬৬৭	'মিরাৎ-আল আলম', Add. 7657, পৃ. ৪৪৫খ-৪৪৬ক ; Aligarh Ms. পৃ. ২১৪খ-২১৫খ।
২১.	১৬৮৭-আনু. ১৬৯১	'জাওয়াবিৎ-এ আলমগীরী', Add. 6598, পৃ. ১৩০খ-১৩২ক, Or. 164i, ৪ক-৬খ।
২২.	১৬৮৭-আনু. ১৬৯৫	Fraser 86, পৃ. ৫৭খ-৬১খ।
২৩.	১৬৮৭- ?	'ইন্‌তিখাব-এ দস্তুর-আল আমল-এ পাদশাহী', Edinburgh No. 224, ১খ-৩খ, ৩ক-১১খ।
২৪.	আনু. ১৭০৯	জগজীবন দাস, 'মুন্তাখাবুৎ তওয়ারীখ', Add., 26, 253, পৃ. ৫১ক-৫৪ক।

এই তালিকার কয়েকটি অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে বিশেষ মন্তব্য করা প্রয়োজন। ২নং এবং ৩নং-এর অঙ্কগুলিকে 'ওয়াসিল' বা 'হাল-এ ওয়াসিল' বলা হয়েছে। কিন্তু সেগুলি দেওয়া হয়েছে 'দাম'-এ, টাকায় নয়। সুতরাং এমনও হওয়া সম্ভব যে সেগুলো আসলে 'জমা'র সূচক, 'ওয়াসিল' শব্দটি নেহাৎই আলগাভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ৬নং-টির ক্ষেত্রে অবশ্যই তা-ই ঘটেছে। সেখানে 'দাম'-এ 'জমা'র অঙ্কর ঠিক পরেই আছে টাকায় "ওয়াসিল"-এর অঙ্ক, যদিও দুটি অঙ্কই সমান।

৯, ১০ এবং ১৫নং পাওয়া গেছে বিদেশী পর্যটকদের লেখায়। যদিও তেমন কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই, তবুও এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত ঐগুলি কোন 'জমাদামী' সারণি থেকেই নেওয়া। ৯ এবং ১৫নং-এর ক্ষেত্রে অঙ্কগুলি দেওয়া আছে টাকায় এবং ১০নং-এর ক্ষেত্রে 'লিভ্‌র্‌'-এ। তুলনা করার সুবিধার জন্য সবক্ষেত্রেই এগুলিকে 'দাম'-এ নিয়ে আসা হয়েছে।[১৩]

১৩. 'লিভ্‌র্‌'-কে 'দাম'-এ পরিণত করার সময়ে তেভেনো-র নিজস্ব সমীকরণ ১ টাকা = ১.৫ 'লিভ্‌র্‌'-ই (পৃ. ২৫-২৬) গ্রহণ করা হয়েছে।

মানুচির অঙ্কগুলো (১৫ নং), মনে হয়, প্রধানত শাহ্‌জাহানের আমলের একটি তালিকা

এর পরের কয়েক পাতায় ওপরের তালিকার পরিসংখ্যান সারণি থেকে সাম্রাজ্যের এবং বিভিন্ন প্রদেশের 'জমা'-অঙ্ক দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য সূত্রে প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত তথ্যও তার সঙ্গে ধরা হয়েছে।[১৪] সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে যে-অঙ্ক দেওয়া আছে, উৎসগ্রন্থে দেওয়া প্রদেশের অঙ্কগুলোর যোগফলের সঙ্গে সেটি মেলে কিনা—তা মিলিয়ে দেখার কোন চেষ্টাই করা হয়নি (একমাত্র 'আইন' ছাড়া)। কাবুল, কান্দাহার, বল্‌খ্‌ এবং বদখশান-এর পরিসংখ্যান বাদ দেওয়া হয়েছে।

ওপরের তালিকার অন্তর্ভুক্ত প্রমাণসূত্রগুলো ক্রমিকসংখ্যা অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে।

সাম্রাজ্যের 'জমা'

উৎস	বছর	পরিমাণ ('দাম'-এ)
'আইন-এ আকবরী', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৬	১৫৮০	৩,৬২,৯৭,৫৫,২৪৬[১৫]
'তবাকৎ-এ আকবরী', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৬	১৫৯৩-৪	৪,৪০,০৬,০০,০০০[১৬]
১.	১৫৯৫-৬	৫,১৬,২৫,১২,৪৯১½[১৭]
২.	১৬০৫	৫,৮৩,৪৬,৯০,৩৪৪
৩.	প্রাক্-১৬২৭	৬,৩০,০০,০০,০০০

থেকে নেওয়া। কারণ, বগলানাকে আলাদা করে দেখানো হয়েছে, আর আগ্রার আওতায় রয়েছে ১৪টি 'সরকার'। শেষে কিন্তু বিজাপুর আর হায়দ্রাবাদের অঙ্কগুলোও দেওয়া হয়েছে। সেগুলো নিশ্চয়ই পরবর্তী কোন সূত্র থেকে নেওয়া।

১৪. জাহাঙ্গীর তাঁর স্মৃতিকথার বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি প্রদেশের 'জমা'র উল্লেখ করেছেন। আমরা আশা করতে পারি যে, এগুলোই নিশ্চয়ই সবচেয়ে প্রামাণ্য তথ্য হবে, যাতে, যে-বছর তিনি লিখছিলেন, সে-বছরের 'জমা' দেওয়া থাকবে। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই তিনি, মনে হয়, 'আইন'-এর অঙ্কগুলোই ধার করেছেন। তফাতের মধ্যে তিনি শুধু 'আইন'-এর অঙ্কগুলোকে পূর্ণসংখ্যায় পরিণত করে নিয়েছিলেন। দ্রষ্টব্য, 'তুজুক্-এ জাহাঙ্গীরী', ১০১ (বাংলা ও ওড়িশা), ১৭২ (মালব), ২৯৯ (কাশ্মীর)। তাই এই পরিশিষ্টে উদ্ধৃত 'জমা' পরিসংখ্যানে তাঁর অঙ্কগুলো বাদ দেওয়া হলো।

১৫. 'আইন'-এ যেসব অঙ্ক দেওয়া আছে সেগুলো হলো 'জমা এ দহ্‌সালা'-র যোগফল, 'আইন', শেষ হওয়ার সময়ে সাম্রাজ্যে মোট 'জমা' যা ছিল তা নয়। 'জমা-এ দহ্‌সালা' চালু হয় ১৫৮০ সালে।

১৬. এই অঙ্কটি খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। একেই খুব গোলমেলে ভাবে লেখা, তার ওপর এর নাম দেওয়া আছে 'তঙ্কা-এ মুরাদী' বা দু 'দাম'-এর অঙ্কে। এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, ভুল করে 'দাম'-এর জায়গায় দু-'দাম' লেখা হয়েছিল।

১৭. এই অঙ্কটি হলো বিভিন্ন প্রদেশের ক্ষেত্রে 'আইন' এর অঙ্কগুলোর যোগফলের (এই পরিশিষ্টে যেমন দেওয়া হয়েছে) সঙ্গে কাবুল 'সরকার'-এর অঙ্কটির যোগফল। কাবুলের ক্ষেত্রে, 'সরকার'টির পরিসংখ্যান সারণিতে ৮,০৫,০৭,৪৬৫-এর যে অঙ্কটি দেওয়া আছে, সেটিকেই

উৎস	বছর	পরিমাণ ('দাম-এ)
লাহোরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১১	১৬২৮	৭,০০,০০,০০,০০০
৪.	১৬২৮-৩৬	৬,৫৭,৭৩,৫৭,৬২৫
৬.	১৬৪৬-৪৭	৯,১৫,০৯,৯০,৭৭৬
৭.	"	৮,৮০,০০,০০,০০০
৮.	"	৭,৬৫,২৫,২০,০০০[১৮]
৯.	১৬৩৮-৫৬	৯,০৩,৭৪,২০,০০০
১১.	"	৭,৮২,৩০,৪৯,৬৬২
১২.	"	৯,৭০,৭১,৮১,০০০
১৩.	"	৭,৮৪,৯৯,৪৭,৬৪০
১৪.	"	৮,৬৮,২৬,৮০,৫৭৩
১৫.	"	৮,৬৮,৭৭,৬০,০০০[১৯]
১৬.	"	৭,৮২,০০,৪৯,৬৬২
১৮.	১৬৪৬-৫৬	৮,৯০,০০,০০,০০০
১৯.	আনু. ১৬৫৬	৯,১২,২৪,৪৫,৮৪৬
২০.	আনু. ১৬৬৭	৯,২৪,১৭,১৬,০৮২
২১.	১৬৮৭-আনু. ১৬৯১	১৩,৮০,২৩,৫৬,০০০
২২.	১৬৮৭-আনু. ১৬৯৫	১২,০৭,১৮,৭৬,৮৪১
২৩.	১৬৮৭- ?	১৩,২১,৯৮,৫৩,৯৮১[২০]
২৪.	আনু. ১৭০৯	১৩,৩৩,৯৯,৯১,৮৪১

নেওয়া হয়েছে; সারণির আগে মূল পাঠে যা আছে (৬,৭৩,০৬,২৮৩ 'দাম') সেটিকে নয় ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৪)। কান্দাহারে রাজস্ব নেওয়া হতো নানান অর্থের এককে ও বহু ধরনের সামগ্রীতে ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮৮), তাই সাম্রাজ্যের 'জমা'-র অঙ্ক থেকে কান্দাহারের 'জমা' বাদ দেওয়া হলো।

১৮. টাকায় নেওয়া একটি অঙ্ক থেকে এটিকে 'দাম'-এ পরিণত করে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এও বলা হয়েছে যে এটি 'তহ্‌সীল' বা প্রকৃত আদায়ের সূচক। কিন্তু সাদিক খানের সব প্রাদেশিক পরিসংখ্যানই পরিষ্কারভাবে 'জমা'র অঙ্কে; অঙ্কগুলো 'দাম' ও টাকার সমমানে দেওয়া আছে। তাই, 'তহ্‌সীল' শব্দটি বোধহয় খুব বেশি আক্ষরিক অর্থে নেওয়া উচিত হবে না।

১৯. গোটা সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে মাসুচির দেওয়া অঙ্কটি আসলে ৩২,৭১,৯৪,০০০ টাকা, কিন্তু এর থেকে বিজাপুর এবং হায়দ্রাবাদের অঙ্কগুলো (পরবর্তী সংযোজন বলে) বাদ দেওয়া উচিত।

২০. এই বইতে সাম্রাজ্যের যে-'জমা' দেওয়া আছে বিজাপুর ও হায়দ্রাবাদ তার মধ্যে পড়েনি। আমাদের সারণির অঙ্কটি পাওয়ার জন্য এই দুটি জায়গার অঙ্কও তার সঙ্গে যোগ করা হয়েছে।

বাংলা এবং ওড়িশা (অবিভক্ত)

উৎস	বছর	পরিমাণ ('দাম'-এ)
১.	১৫৯৫-৬	৫৯,৮৪,৫৯,৩১৯
২.	১৬০৫	৪১,৯১,০৭,৮৭০
৩.	প্রাক্-১৬২৭	৫০,০০,০০,০০০

উৎস	বছর	বাংলা 'দাম'	ওড়িশা 'দাম'
১.	১৫৯৫-৬	৪২,৭৭,২৬,৬৮১[২১]	১৭,০৭,০২,৬৩৮[২২]
মানরিক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৫	১৬০২	৩৬,০০,০০,০০০	
৪.	১৬২৮-৩৬	৪০,২৫,২০,০০০	২০,০৫,৪৫,০০০
৫.	১৬৩৩-৩৮	৪২,৭১,৯১,০০০	১৭,০২,০৪,০০০[২৩]
৬.	১৬৪৬-৪৭	৪৪,৭০,৯০,০০০	২৮,০২,৪০,০০০
৭.	„	৫০,০০,০০,০০০	২০,০০,০০,০০০
৮.	„	৫০,০০,০০,০০০	৩০,০০,০০,০০০
১১.	১৬৩৮-৫৬	৪২,৭১,৯১,০০০	১৮,০২,৪০,০০০
১২.	„	৭২,৭১,৯১,০০০(!)	১৯,১০,০০,০০০
১৩.	„	৪২,৭১, ৯১,০০০	১৮,০২,৪০,০০০
১৪.	„	৪৬,২৯,০০,০০০	৪০,৪১,০৫,০০০(!)
১৫.	„	৪০,২০,০০,০০০	২৩,১৩,০০,০০০
১৬.	„	৪২,৭১,০০,০০০	১৮,০২,০০,০০০
১৭.	„	৪৪,০০,০০,০০০	৩৯,১০,০০,০০০
১৮.	১৬৪৬-৫৬		১৯,১০,০০,০০০
১৯.	আনু. ১৬৫৬	৪৫,৭৮,৫৮,০০০	১২,৫৫,৮০,০০০
২০.	আনু. ১৬৬৭	৫২,৩৭,৩৯,১১০	১৯,৭১,০০,০০০
২১.	১৬৮৭-আনু. ১৬৯১	৫২,৪৬,৩৬,২৪০	১৪,২৮,২১,০০০
২২.	১৬৮৭-আনু. ১৬৯৫	৫২,৪৬,৩৬,২৪০	১৪,২৮,২১,০০০
২৩.	১৬৮৭- ?	৫২,৪৬,৩৬,২৪০	১৪,২৮,২১,০০০
২৪.	আনু. ১৭০৯	৫২,৪৬,৩৩,২৪০	১৪,২৮,১১,০০০
Add. 6586, পৃ. ৩৬খ-৩৭ক	১৭২০	৫৬,৭৬,১৪,৭৬০	

২১. পাশের সারিতে দেখানো ওড়িশায় অঙ্ক বাদ দিয়ে এটি হলো বাংলা-ওড়িশার (অবিভক্ত) 'জমা'-অঙ্ক।

২২. ওড়িশার 'সরকার'গুলোর ক্ষেত্রে আলাদা করে যে অঙ্কগুলো দেওয়া আছে তার থেকেই এটি তৈরি করা হয়েছে।

২৩. টাকায় দেওয়া অঙ্কটি হলো ১৮,০২,০৪,০০০ 'দাম'-এর সমান।

উৎস	বছর	বিহার 'দাম'	এলাহাবাদ 'দাম'
১.	১৫৯৫-৬	২২,১৯,১৯,৪০৪½[২৪]	২১,২৪,২৭,৮১৯[২৫]
২.	১৬০৫	২৬,২৭,৭৪,১৬৭	৩০,৪৩,৫৫,৭৪৬
৩.	প্রাক্-১৬২৭	৩১,২৭,০০,০০০	৩০,৭০,০০,০০০
৪.	১৬২৮-৩৬	৩০,৩৩,৫৫,৭৪৪	৩০,৩৩,৫৫,৭৪৪
৫.	১৬৩৩-৩৮	৩৬,৮৮,৩০,০০০[২৬]	৩৬,১৩,৯০,০০০
৬.	১৬৪৬-৪৭	৩৭,৫৬,৯২,২৯৯	৩৭,৩৬,০৪,৩৫৮
৭.	„	৪০,০০,০০,০০০	৪০,০০,০০,০০০
৮.	„	৪০,০০,০০,০০০	৪০,০০,০০,০০০
৯.	১৬৩৮-৫৬	৩৮,৩২,০০,০০০	৩৭,৮৮,০০,০০০
১০.	„	৭২,০৯,০০,০০০[২৭]	৩৭,৩৮,০০,০০০
১১.	„	৩৬,৮৮,৩০,০০০	৩৬,১৩,৯০,০০০
১২.	„	৩৮,৩২,০০,০০০	৩৭,৮৮,০০,০০০
১৩.	„	৩৬,৮৮,৩০,০০০	৪৬,৯০,০০,০০০
১৪.	„	৩৮,০৭,৩০,০০০	৩৭,৬০,৬১,০০০
১৫.	„	৪৮,৬০,০০,০০০	৩০,৯৫,২০,০০০
১৬.	„	৩৬,৮৮,৩০,০০০	
১৭.	„	৩৮,২২,০০,০০০	৩৭,৮৮,০০,০০০
১৮.	১৬৪৬-৫৬	৩৮,৩২,০০,০০০	৩৭,৮৮,০০,০০০
১৯.	আনু. ১৬৫৬	৫৪,৫৩,০০,৩০৫	৫২,৭৮,৮১,১৯৬
২০.	আনু. ১৬৬৭	৭২,১৭,৯৭,০১৯(!)[২৮]	৪৩,৬৬,৮৮,০৭২
২১.	১৬৮৭-আনু. ১৬৯১	৪০,৭১,৮১,০০০	৪৫,৬৫,৪৩,২৭৮
২২.	১৬৮৭-আনু. ১৬৯৫	৪০,৭১,৮১,০০০	৪৫,৬৫,৪৩,২৪৮
২৩.	১৬৮৭-?	৪০,৭১,৮১,০০০	৪৫,৬৫,৪৩,২৪৮
২৪.	আনু. ১৭০৯	৪০,৭১,৮১,০০০	৪৫,৬৫,৪৩,২৪৮

২৪. সমগ্র প্রদেশের ক্ষেত্রে 'আইন'-এ এই 'জমা'-ই দেওয়া আছে। প্রদেশটির বিভিন্ন 'সরকার'-এর অঙ্ক যোগ করলে অবশ্য হয় ৩০,১৮,৪৮,০৯৬ 'দাম'।

২৫. 'আইন' থেকে শুরু করে তার পরের প্রায় সব পরিসংখ্যান সারণিতেই এলাহাবাদের 'জমা' বাবদে নগদ টাকা ছাড়াও ১২,০০,০০০ পান পাতা বরাদ্দ করা হয়েছে।

২৬. টাকায় দেওয়া অঙ্ককে 'দাম'-এ পরিণত করা হয়েছে। 'দাম'-এর অঙ্কটি মাত্র ১৬,৮৮,৩০,০০০। স্পষ্টতই এটা ভুল।

২৭. তেজেনো সম্ভবত বিহার আর বেরারের মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছিলেন।

২৮. আলীগড় পাণ্ডুলিপি-র পাঠভেদ : ৭০,১৭,৯৭,১১০।

উৎস	বছর	অযোধ্যা 'দাম'	আগ্রা 'দাম'
১.	১৫৯৫-৬	২০,১৭,৫৮,১৭২	৫৪,৬২,৫০,৩০৪
২.	১৬০৫	২২,৯৮,৬৫,০১৪	৭৭,০৪,৮৯,০৫৫
৩.	প্রাক্-১৬২৭	২৩,২২,০০,০০০	৮২,২৫,০০,০০০
৪.	১৬২৮-৩৬	২৫,৯৭,৫৮,১৪০	৭৭,০৪,৮৯,০৫৫
৫.	১৬৩৩-৩৮	২৫,৮২,১০,০০০	৯৪,১১,৬০,০০০
৬.	১৬৪৬-৪৭	২৬,৩৫,০০,৫৬৫	৯৬,৯৯,২৭,৭০৫
৭.	"	৩০,০০,০০,০০০	৯০,০০,০০,০০০
৮.	"	১০০,০০,০০,০০০(!)	৯০,০০,০০,০০০
৯.	১৬৩৮-৫৬	২৭,৩২,০০,০০০	১,০০,৯০,০০,০০০
১০.	"	২৬,৭০,০০,০০০	৯৮,৭৯,০০,০০০
১১.	"	২৫,৮২,১০,০০০	৯৪,১১,০০,০০০
১২.	"	২৫,৮২,১০,০০০	১,০০,৯০,০০,০০০
১৩.	"	২৫,৮২,১০,০০০	৯৪,১১,৬০,০০০
১৪.	"	২৬,৪৫,৪০,০০০	৯৮,১৮,৬৫,৫০০
১৫.	"	২৮,৮০,০০,০০০[২৯]	৮৮,৮১,৫০,০০০
১৬.	"	২৫,৮২,১০,০০০	৯৪,১১,৬০,০০০
১৭.	"	২৭,৩২,০০,০০০	১,৯০,৮০,০০,০০০[৩০]
১৮.	১৬৪৬-৫৬	২৭,৩২,০০,০০০	১,০০,৯০,০০,০০০
১৯.	আনু. ১৬৫৬	৩৬,৩৯,৮২,৮৫৯	১,৩৬,৪৬,০২,১১৭
২০.	আনু. ১৬৬৭	৩২,০০,৭২,১৯৩	১,০৫,১৭,০৯,২৮৩
২১.	১৬৮৭-আনু. ১৬৯১	৩২,১৩,১৭,১১৯	১,১৪,১৭,০০,১৫৭
২২.	১৬৮৭-আনু. ১৬৯৫	৩২,১৩,১৭,৮১৯	১,১৪,১৭,৬০,১৫৭
২৩.	১৬৮৭-?	৩২,১৩,১৭,৭১৯	১,১৪,১৭,০০,১৫৭
২৪.	আনু. ১৭০৯	৩২,১৩,১৭,১১৯	১,১৪,১৭,৬০,০৫৭

২৯. আমি ধরে নিয়েছি যে, মানুচি যার নামের পাশে এই অঙ্কটি বসিয়েছেন, সেই 'নাম্দে' হলো 'আভাদে' জাতীয় কিছুর জায়গায় ভুল করে লেখা, 'নান্দের' নয় (আর্ভিন যা প্রস্তাব করেছেন)।

৩০. সম্ভবত, ১,০১,৯০,৮০,০০০-র জায়গায় ভুল করে লেখা।

উৎস	বছর	দিল্লী 'দাম'	লাহোর 'দাম'
১.	১৫৯৫-৬	৬০,১৬,১৫,৫৫৫	৫৫,৯৪,৫৮,৪২৩
২.	১৬০৫	৬২,৬২,৩৩,৯৫৬	৬৪,৬৭,৩০,৩১১
৩.	প্রাক্-১৬২৭	৬৫,৬১,০০,০০০	৮২,৫০,০০,০০০
৪.	১৬২৮-৩৬	৬২,৬২,৩৩,৭৫৩	৬৪,৭৩,৩০,৬১১
৫.	১৬৩৩-৩৮	৭৩,৯৩,১০,০০০	৮৪,৪২,৯০,০০০
৬.	১৬৪৬-৪৭	৩৩,৯৪,২৪,৪৮১(!)	৮৯,২২,১৮,৩৯৯
৭.	„	১,০০,০০,০০,০০০	৯০,০০,০০,০০০
৮.	„	১,০০,০০,০০,০০০	৯০,০০,০০,০০০
৯.	১৬৩৮-৫৬	৭৮,১০,০০,০০০	৯৮,৭৮,০০,০০০
১০.	„	১,০০,১২,৫০,০০০	৯৮,৭১,০০,০০০
১১.	„	৭৮,৯৩,০০,০০০	৮৪,৪২,৯০,০০০
১২.	„	৭৮,২০,০০,০০০	৯৩,৪৮,০০,০০০
১৩.	„	৭৩,৯৩,০০,০০০[৩১]	৮৭,৭১,৯০,০০০
১৪.	„	৭৪,৬৩,৩৫,০০০	৮৯,৩৩,৭০,০০০
১৫.	„	৫০,২০,০০,০০০	৯৩,২২,০০,০০০
১৬.	„	৯৩,০০,০০০(!)	৮৪,৪১,৯০,০০০
১৭.	„	৭৭,২০,০০,০০০	৯৩,৪৮,০০,০০০
১৮.	১৬৪৬-৫৬	৭৮,২৮,০০,০০০	৯৩,৭৮,০০,০০০
১৯.	আনু. ১৬৫৬	১,৫৫,৮৮,৩৯,১২৭	১,০৮,৯৭,৫৯,৭৭৬
২০.	আনু. ১৬৬৭	১,১৬,৮৩,৯৮,২৬৯	৯০,৭০,১৬,১২৫
২১.	১৬৮৭-আনু.১৬৯১	১,২২,২৯,৫০,১৭৭	৮৯,৮৯,৩২,১৭০
২২.	১৬৮৭-আনু.১৬৯৫	১,২২,২৯,৫০,১৩৭	৮৯,৮১,৩২,১৭০
২৩.	১৬৮৭-?	১,২২,২৯,৫০,১৩৭	৮৯,৮১,৩২,১৭০
২৪.	আনু. ১৭০৯	১,২২,২৯,৫০,৬৫৮	৮৯,৮১,৩২,১০৭

মুলতান ও থাট্টা (অবিভক্ত)

উৎস	বছর	'দাম'
১.	১৫৯৫-৬	২৬,৭১,২৭,৮১১[৩২]
২.	১৬০৫	২৫,৩৯,৬৪,১৭৩
৩.	প্রাক্-১৬২৭	৪০,০০,০০,০০০

৩১. 'দাম'-এ দেওয়া অঙ্কটিকে তারই তলায় দেওয়া সম-মূল্যের টাকার অঙ্ক দিয়ে শুধরে নেওয়া হয়েছে।

৩২. এটি হলো মুলতান প্রদেশের সবকটি 'সরকার'-এর মোট ফল। 'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫০-এর মূলপাঠে প্রদেশটির ক্ষেত্রে 'জমা' দেওয়া আছে মাত্র ১৫,১৪,০৩,৬১৯ 'দাম'।

উৎস	বছর	মুলতান 'দাম'	থাট্টা 'দাম'
১.	১৫৯৫-৬	২১,৬৫,২২,২২৬[৩৩]	৫,০৬,০৫,৫৮৫[৩৪]
৪.	১৬২৮-৩৬	২৫,৩৯,৯৭,৮৫৫	৪১,৫১,৭০,৭৯০(!)
৫.	১৬৩৩-৩৮	২৪,২৭,০০,০০০[৩৫]	৯,৩০,২৮,০০০[৩৬]
৬.	১৬৪৬-৪৭	২৫,৪৬,০৪,৪৯৯	৯,২৩,৪০,০০০
৭.	"	২৮,০০,০০,০০০	৮,০০,০০,০০০
৮.	"	২৮,০০,০০,০০০	৮,০০,০০,০০০
৯.	১৬৩৮-৫৬	৪৭,৭৬,২০,০০০	৯,২৮,০০,০০০
১০.	"	৪৬,৭২,৫০,০০০	৯,০৭,৮০,০০০
১১.	"	২৪,৪৭,০০,০০০	৯,২০,০০,০০০
১২.	"	২২,৫৫,০০,০০০	৯,২৮,০০,০০০
১৩.	"	২৪,৪৭,০০,০০০	৯,২০,০০,০০০
১৪.	"	২৪,৪৬,৫৫,০০০	৯,৪৯,৭০,০০০
১৫.	"	২৯,৭০,০০,০০০[৩৭]	২৪,০৪,৮০,০০০(!)
১৬.	"	২৪,৪৮,৪৭,০০০	৯,২০,০০,০০০
১৭.	"	২৬,৫৬,০০,০০০	৯,১৮,০০,০০০
১৮.	১৬৪৬-৫৬	২৬,৫৬,০০,০০০	৯,২৮,০০,০০০
১৯.	আনু. ১৬৫৬	৩৩,৮৪,২১,১৭৮	৮,৯২,৩০,০০০
২০.	আনু. ১৬৬৭	২৪,৫৩,১৮,৫০৫	৭,৪৯,৮৬,৯০০
২১.	১৬৮৭-আনু. ১৬৯১	২১,৪৩,৪৯,৮৯৬	৬,৮৮,১৬,৮১০
২২.	১৬৮৭-আনু. ১৬৯৫	১১,৪৩,৪২,৮৯৬	৬,৮৮,১৬,৮১০
২৩.	আনু. ১৭০৯	২২,৪৩,৪৯,৮৯৩	৬,৮৮,১৬,৮০০

উৎস	বছর	আজমীর 'দাম'	কাশ্মীর 'দাম'
'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭০-৭১	১৫৯২-৩		৭,৪৬,৭০,৪১১
ঐ	১৫৯৪-৫		{ ৭,৬৩,৭২,১৬৫$\frac{৩}{৪}$ { ৬,২২,০২,২০৩$\frac{১}{৪}$[৩৮]

৩৩. এটি হলো থাট্টা 'সরকার' বাদে মুলতান প্রদেশের বাকি সব 'সরকার'-এর মোট ফল। কিন্তু দর-'সরকার' সিবিস্তান এর মধ্যে পড়েছে।

৩৪. 'আইন' এ সিবিস্তান বাদে থাট্টা 'সরকার' এর ক্ষেত্রে এই অঙ্কটিই দেওয়া আছে।

৩৫. টাকায় দেওয়া পরিমাণটি ২৪,৪৭,০০,০০০ 'দাম'-এর সমান।

৩৬. টাকায় দেওয়া পরিমাণটি ৯,০১,২০,০০০ 'দাম'-এর সমান।

৩৭. মুলতান এবং ভাক্করের জন্য আলাদা করে দেওয়া অঙ্কগুলো থেকে তৈরি।

৩৮. এ দুটি 'জমা'-র অঙ্ক আসফ খান হিসেব করে বার করেছিলেন ; ১৫৯২-৩-এর অঙ্কগুলো স্থির করেছিলেন কাজী আলী বাগদাদী। কাশ্মীরের 'জমা' স্থির করা হয়েছিল চালের 'খরওয়ার'

উৎস	বছর	আজমীর ('দাম')	কাশ্মীর ('দাম')
১.	১৫৯৫-৬	২৮,৮৪,০১,৫৫৭	৬,২১,১৩,০৩৫
২.	১৬০৫	৩০ ৯৯,১৭,৭২৪	
৩.	প্রাক্-১৬২৭	৪২,০৫,০০,০০০	
৪.	১৬২৮-৩৬	৩০,৯৯,৩৭,৭০৪	
৫.	১৬৩৩-৩৮	৫৪,০০,৫০,০০০	১১,৯৩,৮০,০০০[৩৯]
৬.	১৬৪৬-৪৭	৫৬,৬৬,২১,৩১০	১৩,৬৪,১২,০৩৯
৭.	„	৬০,০০,০০,০০০	১৫,০০,০০,০০০
৮.	„		১৫,০০,০০,০০০
৯.	১৬৩৮-৫৬	৮৭,৮৮,০০,০০০	১৪,০০,০০,০০০[৪০]
১০.	„	৮৬,৭৭,৫০,০০০	১৪,৬৮,৫০,০০০[৪১]
১১.	„	৫৪,০০,৫০,০০০	১১,৪৩,৮০,০০০
১২.	„	৮৭,৬৮,০০,০০০	১৪,০২,০০,০০০
১৩.	„	৫৪,০০.৫০,০০০	১১,৭১,৮০,০০০
১৪.	„	৫৫,৫৩,৬০,০০০	১২,৬২,৮৫,০০০
১৫.	„	৫৪,০০,০০,০০০	১১,৪৩,৮০,০০০
১৭.	„	৮৭,৬৮,০০,০০০	১৪,০২,০১,৯০০
১৮.	১৬৪৬-৫৬	৯৮,৬৮,০০,০০০	১৪,০২,০০,০০০
১৯.	আনু. ১৬৫৬	৬৪,৮৭,৬১,৬৮৫	১১,৪৩,৯০,০০০
২০.	আনু. ১৬৬৭	৬৩,৬৮,৯৪,৮৮৩	২১,৩০,৭৪,৮২৬
২১.	১৬৮৭-আনু. ১৬৯১	৬৫,২৬,৪৫,৬০২[৪২]	২২,৪৯,১১,৬৮৭[৪৩]

(গাধা বোঝাই)-এর হিসেবে, তারপর সেগুলোকে 'দাম'-এ নিয়ে আসা হয়। কাজী আলী যে-হারে এটি করেছিলেন, সেই অনুযায়ী আসফ খানের 'জমা হওয়া উচিত ৭,৬৩,৭২,১৬৫¾ 'দাম'। 'বাজ' এবং 'তমগা' (পথকর এবং উপকর)-বাবদ ছাড় দেওয়ার দরুন এর থেকে ৮,৯৮,৪০০ 'দাম' কমে গিয়েছিল। শস্য মারফৎ রাজস্ব দাখিল করলে 'খরওয়ার'-এর সমান 'দাম'-এর পরিমাণ (এ পর্যন্ত ২৯-এ ১) ৫ করে বাদ যেত। এই ধরনের ছাড় ও কর মকুবের ফলে 'জমা' নেমে যেত ৬,২২,০২,২০৩¼ 'দাম'-এ। আবুল ফজল যে কী করে বললেন এইসব ছাড় দেওয়ার পরেও আসফ খানের 'জমা' কাজী আলীর 'জমা'র চেয়ে মাত্র ৮,৬০,৩০৪½ 'দাম' কম হয়েছিল, সে কথা স্পষ্ট নয়।

৩৯. টাকায় দেওয়া পরিমাণটি ১১,৪৩,৮০,০০০ দামের সমান।

৪০. মূলের অঙ্কটি আসলে ১,৪০,০০,০০০ দামের সমান।

৪১. মূলের অঙ্কটি মাত্র ১,৪৬,৮৫০ 'দাম'-এর সমান।

৪২. পাণ্ডুলিপির পাঠভেদ : ৮৫,২৬,৪৫,৭০২।

৪৩. পাণ্ডুলিপির পাঠভেদ : ২৭,৯৯,২১,৩৯৭।

২২.	১৬৮৭-আনু. ১৬৯৫	৬৫,২৩,৪৫,৩৮২	২২.৯৯,১১,৩৯৭
২৩.	১৬৮৭-?	৬৫,৫৩,৪৫,৭০২	২২,৯৯,১১,৩৯৭
২৪.	আনু. ১৭০৯	৬৫,৩৩,৪৫,৭০২	২২,৯৯,১১,৩০০

উৎস	বছর	মালব ('দাম')	গুজরাট ('দাম')
১.	১৫৯৫-৬	২৪,০৬,৯৫,০৫২	৪৩,৬৮,২২,৩০১
২.	১৬০৫	২৫,৭৩,৭৮,২০১	৪৬,৯১,৫৯,৪২৪
৩.	প্রাক্-১৬২৭	২৮,০০,০০,০০০	৫০,৬৪,০০,০০০
৪.	১৬২৮-৩৬	২৫,৭৮,৭৮,৩৬১	৪৬.৯৯.৫৯,৪২১
৫.	১৬৩৩-৩৮	৩৬,২৫,১০,০০০	৪৬,৩২,৮০,০০০
৬.	১৬৪৬-৪৭	৩৯,৮১,৫৩,৭৪৯	৫৩,৩৭,৯১,৪৮৫
৭.	„	৪০,০০,০০,০০০	৫৩,০০,০০,০০০
৮.	„	৪০,০০,০০,০০০	৫৩,০০,০০,০০০
৯.	১৬৩৮-৫৬	৩৬.৬৫,০০,০০০	৫৩,৫৮,০০,০০০
১০.	„	৩৭,৩৮,০০,০০০	৫৪,৭৩,৫০,০০০
১১.	„	৩৬,২৫,১০,০০০	৪৬,৩২,৮০,০০০
১২.	„	৩৯,৮৫,০০,০০০	৫০,০০,০০,০০০
১৩.	„	৩৬.৩৫,১০,০০০	৪৬,৩২,৬০,০০০
১৪.	„	৩৬,৯০,৭০,০০০	৫৮,৩৭,৯০,০০০
১৫.	„	৩৯,৬২,৫০,০০০	৯৩,৫৮,০০,০০০
১৬.	„		৪৬,৩২,৬০,০০০
১৭.	„	৩৯,৮৫,০০,০০০	৫৩,৫৮,০০,০০০
১৮.	১৬৪৬-৫৬	৩৯,৮৫,০০,০০০	৫৩,৫৮,০০,০০০
১৯.	আনু. ১৬৫৬	৫৫,৭৩,১৭,৩২০	৮৬,৯২,৮৮,০৬৯
২০.	আনু ১৬৬৭	৪২,৫৪,৭৬,৬৭০	৪৪,৮৮.৮৩,০৯৬
২১.	১৬৮৭-আনু ১৬৯১	৪০,৩৯,৮০,৬৫৮	৪৫,৪৭,৪৯,১৩৫
২২.	১৬৮৭-আনু. ১৬৯৫	৪০,৩৯.০১,৬৫৮	৪৫,৪৭,৪৯,১৩৫
২৩.	১৬৮৭-?	৪০,৩৯,৮০,৬৫৩	৪৫,৪৭,৪৯,১৩৫
২৪.	আনু. ১৭০৯	৪০,৩৯,৮০,৬৫৮	৪৫,৪৭,৪৪,১৩৫
'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫	আনু. ১৭১৯		৭৯,৯৬,৪৫,২১৩

দখিন

(তারকাচিহ্ন দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে তথ্যসূত্রে অঙ্কগুলো সরাসরি দেওয়া নেই, দখিন-এর বিভিন্ন প্রদেশের যে-অঙ্ক দেওয়া আছে এগুলো তার যোগফল।)

উৎস	বছর	'দাম'
১.	১৫৯৫-৬	৮৪,৪৯,৫৬,২৬৪*[৪৪]
২.	১৬০৫	১,১০,০৮,১৬,৫৪৭*
৩.	প্রাক্-১৬২৭	১,১৫,৬৭,০০,০০০*
৪.	১৬২৮-৩৬	১,২৫,০৮,০৫,৯৫৫*
৫.	১৬৩৩-৩৮	১,৭৩,০৪,৭২,০০০*
লাহোরী, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ ৬২-৬৩	১৬৩৫	২,১২,০০,০০,০০০*
ঐ, পৃ ১২২	১৬৩৬	২,০০,০০,০০,০০০
৬.	১৬৪৬-৪৭	২,১৯,০০,৮৭,৭৯৮
৭.	"	১,৮২,০০,০০,০০০*
৮.	"	১,৭৮,০০,০০,০০০*
'আদাব-এ আলমগীরী', পৃ ৪০ খ ; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', ১২১-২	১৬৫৩-৫৪	১,৪৪,৯০,০০,০০০
৯.	১৬৫৮-৫৬	২,০৬,১৫,০০,০০০*
১০.	"	২,৩৯,৬৩,২৫,০০০*
১১.	"	১,৫৭,৭৭,৯০,০০০*
১২.	"	২,৫৬,৫৫,০০,০০০*
১৩.	"	২,১৩,৬২,৭০,০০০*
১৪.	"	১,৫৬,৭১,৬৯,০০০*

৪৪. এটি হলো বেরার এবং খান্দেশের 'জমা'র যোগফল। দু জায়গার 'জমা'ই দেওয়া আছে 'তঙ্কা-এ বরারী'-তে, যেটি ছিল ১৬ 'দাম'-এর সমান ('আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৮)। এই হার অনুযায়ী খান্দেশের জমা হয় ২০,২৩,৫২,৯৯২ 'দাম'। এখানে মোট 'জমা' বার করার জন্য এই অঙ্কটিই ব্যবহার করা হয়েছে। আবুল ফজল আরও বলেছেন যে আসীরগড় দখল হওয়ার পর ২৪ 'দাম' হিসেবে স্থানীয় টাকার পুনর্মূল্যায়ন করে আকবর খান্দেশের 'জমা' বাড়িয়ে দিয়েছিলেন শতকরা ৫০ ভাগ ('আইন', ১ম খণ্ড, ৪৭৪)। ১৬০১-এ আসীরগড় দখল হয়েছিল, সুতরাং আবুল ফজল নিশ্চয়ই তাঁর বই শেষ হয়ে যাওয়ার পর এর কথা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। তাছাড়া, ১৫৯৫-৬-এর 'জমা' বার করার জন্য এই বৃদ্ধিকে কখনোই হিসেবে ধরা যায় না।

উৎস	বছর	'দাম'
১৫.	"	২,১৪,০০,৯০,০০০*[৪৫]
১৬.	"	১.৫২,৫৬,৪০,০০০*
১৭.	"	২,৪২,৫১,০০,০০০*
১৮.	১৬৪৬-৫৬	২,০৬,৫৫,০০,০০০*
১৯.	আনু, ১৬৫৬	১,৮৫,৬৪,৪৮,০০০*
২০.	আনু. ১৬৬৭	২,৯৬,৭০,০০,০০০
২১.	১৬৮১-আনু. ১৬৯১	৬,০০,২২,২২,১৪০
২২.	১৬৮১-আনু. ১৬৯৫	৫,৮৬,৯৯,৯৪,৩০৭*
২৩.	১৬৮৭-?	৫,৯১,৭২,৩৬,১৪০*
২৪.	আনু. ১৭০৯	৬,০৩,৭৩,৭৪,০০০

ওপরের ২১-২৪ নং-এ যে সংখ্যাগুলো দেওয়া আছে, তা বিজাপুর এবং হায়দ্রাবাদ সমেত। তুলনার সুবিধার জন্য যদি এগুলো বাদ দেওয়া যায়, তাহলে এ সারণিতে মুঘল দখিনের নীট সংখ্যা দাঁড়াবে এই :

২১.	২,৬৫,৪৫,৩০,০০০*
২২.	২,৫৬,৬৯,৭৪,৩০৭*
২৩.	২,৫৭,০৫,৭৪,০০০
২৪.	২,৫৭.০৫,৭৪,০০০*

২. 'ওয়াসিল'

আগের অংশে আমরা দেখেছি যে, গোড়ার দিকের কয়েকটি রচনায় আসলে 'জমা' পরিসংখ্যানকেই 'ওয়াসিল' লেখা হয়েছে। আলোচ্য পর্বের শেষ দুই দশকের তিনটি মাত্র তথ্যসূত্রে 'জমা-দামী' পরিসংখ্যানের পাশাপাশি 'ওয়াসিল'-এর যে-অঙ্ক দেওয়া আছে তাদের ওপর আস্থা রাখা যায়। অঙ্কগুলোর মধ্যে একটি দলের নাম দেওয়া হয়েছে 'ওয়াসিল-এ সন-এ কামিল' বা শুধু 'ওয়াসিল-এ কামিল' অর্থাৎ 'সবচেয়ে ভালো' বছরের সংগ্রহ। 'ওয়াসিল'-এর অন্যান্য অঙ্ক বিশেষ বিশেষ বছরের ক্ষেত্রে দেওয়া আছে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারিখ বা সময়ের কোন উল্লেখই নেই। সব অঙ্কই টাকায় লেখা।

এই তিনটি সূত্র হলো: 'জওয়াবিৎ-এ আলমগীরী', Fraser 86 এবং জগজ্জীবনদাস। আগের অংশেই আমরা পরিসংখ্যানগুলো উদ্ধৃত করেছি ও তার কাল নির্ণয় করেছি। নীচে এগুলোকে যথাক্রমে 'ক', 'খ' ও 'গ' বলে উপস্থিত করা হলো।

৪৫. বিজাপুর এবং হায়দ্রাবাদের ক্ষেত্রে মামুচির অঙ্কগুলো এর থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

ওয়াসিল-এ (সন-এ) কামিল

	ক	খ	গ
মুঘল সাম্রাজ্য, বিজাপুর হায়দ্রাবাদ বাদে		১৭ ৫১,০২,০৩৯	১৭,৫১,০২,০৩৯
দিল্লী	৩,১০,১২,১৫৪	৩,১০,১২,১৫৪	৬৮,৪৯,১১০(!)[4]
আগ্রা	২,০৬ ৯৭,৩৭১	২,০০,৭১,১০৩	১,৩০,৯৭,৩৭১
আজমীর	১.০৬,৯৬,৩৯৩	৬,০০,৯৭,৩৪১(!)	১,০৬,৯৭,৩৭১
পাঞ্জাব	১,৬৭,০৬,৩৮৬	১,৮৭,০৪,৩৮৩	৮৭,০৪,৩৮৩
মুলতান	৫১,৫৯.৬৯৯[1]	৫১,৬৯,৩৯৯	৫১,৬৯,৩৮৯
থাট্টা	৯১.২৫,৫৫১	১৩,৬৫,৩৯৭(!)	৯৩,৬৫,৩৯৭
কাশ্মীর	২৪ ৫৮.৩৮৪	২৪,৩১,৩৩৯	২৪.৬২,৫৯৩
এলাহাবাদ	১,০৫.৯৭ ৬৭১	১,০৫,৯৭,৩৪১	১,০৫,৯৮,৩৭১
অযোধ্যা	৯১,২৫.৫১১	৯২,২৫,৫৯১	৯১,২৫,৬৫১
বিহার	৯৩,০৫.৪৩১	৯৩,২৫,৫৫১	৯৩,০৫,৪৩১
বাংলা	৮৬,১৯,২৪৭[2]	৮৬,১৯,২৪৭[3]	৮৬,১৯,২৬৭[4]
ওড়িশা	১৬,৫৮,১১৬[2]	১৬,৫৮,৮৫৬[3]	১৬,৫৭,৮২৬
মালব	৮৪,৭২,২৯৯	৮৪,৭২,২৯৯	৮৪,৭২,২৯১
গুজরাট[5]	৮৩,৪৯,১০৩	৮৯,৬২,৮৩০	৮৯,৬৫,৮০৬
দখিন প্রদেশ :			
আওরঙ্গাবাদ		১,০০,৫০,০০০	১,০০,৫০,০০০
বেরার		৯৬,১৬,৩০৯	৯০,১৬,৩০৯
বিদর		৩১,০০,০০০	
খান্দেশ		৪০,৮৬,৭১৯	৪০,৮০,০১৯

১. মূলে শুধু 'ওয়াসিল' বলা হয়েছে।

২. মূলে শুধু 'ওয়াসিল' আছে।

৩. (আওরঙ্গজেবের ?) (আমলের) নবম বছরের 'ওয়াসিল-এ কামিল' বলে বর্ণিত।

৪. মূলে 'ওয়াসিল-এ আখির' বলে বর্ণিত।

৫. 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬-এ লেখা আছে যে, গুজরাটের 'ওয়াসিল-এ সাল-এ আকমল' ছিল ১,২৩,৫৬,০০০ টাকা আর 'সাল-এ কামিল' ছিল ১,০০,০০,০০০ টাকা। 'সন' এবং 'সাল' সমার্থক, আর 'আকমল' বলতে বোধহয় আগের সর্বশ্রেষ্ঠ বছরের চেয়েও ভালো বছর বোঝায়।

অন্যান্য 'ওয়াসিল' পরিসংখ্যান

(বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যা কোন্ রাজত্বের বছরের (বোঝাই যায়, আওরঙ্গজেবের) ওয়াসিল হিসেবে নির্দিষ্ট হয়েছে তার নির্দেশ দিচ্ছে। গ-এর অঙ্কগুলোকে সর্বদাই বলা হয়েছে 'ওয়াসিল-এ আখির', বা শেষতম 'ওয়াসিল'। সুতরাং ১৭০৮-৯ নাগাদ বলে সনাক্ত করা যায়।)

	ক	খ	গ
মুঘল সাম্রাজ্য	২৩,২৪,১৮,৮৯০	২৪,১৪,০১.৩৯১	২৬,১৭,৭২,০২৯
দিল্লী		২,২২ ৫৬,৪০০ (১৮)	৯৪,০৪,০৩০
আগ্রা		১,৮২,৬৭,০০০ („)	৬৮,৯২,৮৯৭
আজমীর		৬৮,৯২,৮৭৭ („)	৬৮,৯২.৮৯৫
পাঞ্জাব		১,৩০,৪২,৩২৭ („)	৩০,৪২,৩২৭
মুলতান		২৪,৭৫,৩৪৯ („)	২৪,৭৫,৬৪৯
থাট্টা		৪,৪৯,৬৭৫ („)	৩৪,৪৯,৬৫৭
কাশ্মীর		১৭,১১,৩২৪ („)	২৪,০৮,৩৮৯
এলাহাবাদ		৬৮,৮২,৮৯৭ („)	৬৮,৯২,৮৯০
অযোধ্যা		৯৮,৮৫,৭৭১ („)	৪৭,৮৫,৮৭১
বিহার		৪৮,৮৫,৫৭১ („)	৫৭,১৪,৮৭৩
বাংলা ও ওড়িশা		—	—
মালব		৪৮,১৩,২৮৩ („)	৪৮,১৩,২৮৩
গুজরাট[৬]		৭১,৮৪,৬৮৫ („)	৭১,৮৪,৬৮৫
দখিন প্রদেশ[৭]	৮,৩৯,৬৮,৬৪৮	—	১১,২৬,২০,২২৩
আওরঙ্গাবাদ	১,২৮ ৩৬,০৪৩	৯৬.৯৯,০০০ („)	৯৬,৯৯,০০৫
বেরার	১,০৯,৪৬.৬৪১	৭৫,৮৯,২২০ („)	৭৫,৮৯,২২০
বিদর	৬৬,৫৯,৮১১	৩১,০০,০০০ (১৬)	৪৬,৪২,৭৩২
		৪২,৪২,৩৩২ (১৯)	—
খান্দেশ	৪৭,৩৯,৫৬২	৪১,১৯,০৬৭ (১৮)	৩১,১৯,০১৭
বিজাপুর	৩.৩৩,৯৪,৭৭১	৪ ৫৭,৪৬,০০০	৫,৮৮,৮৭ ৫০০
হায়দ্রাবাদ	২,০০,৯৪,৪৭৮	২,০৫,৫৩,৩৫২	২,৪৭,৮২,৫০০

৬. তুলনীয় 'মিরাৎ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬। সেখানে বলা হয়েছে যে "বিগত বছরগুলো"তে আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ কখনও ৬০ ০০ ০০০ টাকাও হতো।

৭. আওরঙ্গজেবের কথা অনুযায়ী শাহ্জাহানের রাজত্বের ২৭-তম বছরে (১৬৫৩-৪) বিজাপুর, হায়দ্রাবাদ এবং বিদরের বৃহত্তর অংশ বাদে দখিন প্রদেশগুলোয় আদায়ের পরিমাণ ১,০০,০০,০০০ টাকার ওপর হয়নি ('আদাব-এ আলমগীরী', পৃ. ৪০ খ; 'রুকাৎ-এ আলমগীর', পৃ. ১২১-২)।

গ্রন্থসূচি

সূত্র উল্লেখের সুবিধার জন্য রচনাগুলো ক্রমিকসংখ্যা অনুযায়ী পরপর দেওয়া হলো। যখন ক্রমিক সংখ্যাটির পরে বন্ধনীর মধ্যে আরেকটি সংখ্যা (বড় হাতের S দিয়ে শুরু) দেওয়া আছে, সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট রচনাটি C. A. Storey-র *Persian Literature—a Bio-bibliographical Survey*-তে ঐ সংখ্যায় উল্লিখিত হয়েছে।

পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে সাধারণত প্রেসমার্ক (গ্রন্থাগারের তাকের সঙ্কেতচিহ্ন) দিয়ে সনাক্ত করা হয়েছে। Additional ও Oriental ছাড়া বৃটিশ মিউজিয়ামের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের পুঁথিকে সংক্ষিপ্ত সঙ্কেতচিহ্ন 'Br. M' (সংগ্রহের নাম ও প্রেস-মার্কের আগে) দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, যেসব পাণ্ডুলিপি শুধুমাত্র Add ও Or হিসেবে দেখানো হয়েছে, সেক্ষেত্রে বৃটিশ মিউজিয়ামের Additional ও Oriental সংগ্রহকে বুঝতে হবে। 'Aligarh' বলতে মৌলানা আজাদ লাইব্রেরী (আরবী ও ফার্সী পাণ্ডুলিপি বিভাগ), আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় বোঝাবে, যেমন Bodl. বলতে The Bodleian Library, Oxford ; 'Edinburgh', the Edinburgh University Library, ফার্সী সংগ্রহ ; 'I.O.,' the Indian Office Library, London ; John Rylands Library, Manchester সংগ্রহ Lindesiana নামে এবং লণ্ডনের Royal Asiatic Society-র গ্রন্থাগার R.A.S. বলে উল্লেখ করা হয়েছে। India Office Library এবং Bodleian সংগ্রহের কয়েকটি পাণ্ডুলিপিকে ছাপা গ্রন্থতালিকার ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে, প্রেসমার্ক দিয়ে নয়। ইণ্ডিয়া অফিস-এর পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে, গ্রন্থ তালিকার ক্রমিক সংখ্যা Ethe দিয়ে শুরু হয়েছে ; কিন্তু Bodleian পাণ্ডুলিপির বেলায় প্রতিটি ক্রমিক সংখ্যার আগে Bodl. এই সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত দিয়ে আলাদা করা হয়েছে (কোন সংগ্রহের নাম দেওয়া হয়নি)।

গ্রন্থসূচিতে তালিকাভুক্ত আছে এমন কোন রচনার একাধিক পাণ্ডুলিপি ও সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ পাদটীকায় এগুলোর মধ্যে একটি মাত্র উল্লেখ করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে ব্যবহৃত সূত্রের নির্দেশ করা হয়েছে তারকাচিহ্ন দিয়ে। যদি এরকম দুই বা ততোধিক সূত্র পাদটীকায় উল্লেখ করা থাকে, তাহলে সব কটিতেই তারকাচিহ্ন দেওয়া হয়েছে। পাদটীকায় ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত ও প্রতীক উল্লিখিত পাণ্ডুলিপি এবং সংস্করণের পর বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হলো। যেখানে তারকাচিহ্নিত পাণ্ডুলিপি ও সংস্করণের পর কোন রকম সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত বা প্রতীক দেওয়া নেই, সেখানে ধরে নিতে হবে যে, পাণ্ডুলিপি বা মুদ্রিত সংস্করণের শিরোনাম বা তার সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত (পৃষ্ঠসংখ্যা সহ) পাদটীকায় দেওয়া আছে। এক্ষেত্রে ঐ বিশেষ পাণ্ডুলিপি ও সংস্করণের জন্য আলাদাভাবে কোন সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত ও প্রতীক দেওয়া হয়নি।

সমসাময়িক সূত্র

ক. কৃষি

১. *Nuskha dar Fan-i Falāhat*, I.O. 4702* ; Or. 1741, ff 25a-48a ; Aligarh, Lytton : Fārsiya 'Ulūm, 51. I.O. এবং Br. M. পাণ্ডুলিপির মূলপাঠের গোড়ার শব্দগুলো থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, এখানে একটি বড় রচনার একাদশ অধ্যায়টি ('আমল') পাওয়া যাচ্ছে। আলীগড় পাণ্ডুলিপির পুষ্পিকায় (Colophon) (১৭৯৩-এর অনুলিপি) বলা হয়েছে যে এটি দারা শুকোর *Ganj-i Bādāvard*-র অংশবিশেষ। এর প্রথম ও শেষাংশ অসম্পূর্ণ। ১৭৯০-৯১-তে লেখা *Risāla-i Nakhlbandiya* (Add. 16,662, f 95b)-তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এটি বাস্তবিকই ঐ সন্দর্ভের অনুলিপি। মূল রচনাটিরও শিরোনাম এক। কিন্তু, লেখক হিসেবে আমানুল্লা খান হুসেনীর নাম দেওয়া আছে। এই নামই সম্ভবত সঠিক, কেননা আমানুল্লা খান হুসেনী জাহাঙ্গীরের সময়ের বিরাট খানদানী লোক মহাবৎ খানের ছেলে, তিনি বাস্তবিকই *Ganj-i Bādāvard* এই নামে একটি 'মঞ্জুষা' লিখেছিলেন বলে কথিত আছে। (Rieu's British Museum Catalogue, ii, 509b).

Kitāb-i Shajaratu-n Nihāl নামে একটি রচনার কথা উল্লেখ করে আমাদের লেখক তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। প্রায় নিশ্চিতই বলা যায় যে Lindesiana 484, Add. 23,542 (অংশবিশেষ) এবং Add. 1771-এ রক্ষিত দুটি পাণ্ডুলিপিও এই রচনারই। পরের রচনাটি অবশ্যই পারস্যে বসে লেখা। আমানুল্লা এটি পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করে ভারতের উৎপন্ন ফল ও শস্যাদির তথ্য সংযোজন করেছিলেন বলে মনে হয়।

খ. প্রশাসনিক রচনা

সাধারণ রচনা

২. (S. 702 : 2) Abū-l Fazl, *Ā'īn-i Akbari*, Ed. Blochmann, Bib. Ind., Calcutta, 1867-77*. পূর্ববর্তী দুটি সংস্করণ (সৈয়দ আহমেদ সম্পা., দিল্লী, ১৮৫৫ এবং নবল কিশোর সম্পা., লখনউ, ১৮৬৯ ; নবল কিশোর সম্পাদিত ১৮৮২-র সংস্করণটি ব্লখমান সংস্করণেরই হুবহু পুনর্মুদ্রণ) থেকে ব্লখমান-এর সম্পাদনা অনেক উন্নত ও খুঁটিয়ে করা হলেও দুর্ভাগ্যবশত সেরা লভ্য পাণ্ডুলিপিগুলোর ভিত্তিতে এটি সম্পাদনা করা হয়নি। সুতরাং, যে দুটি ১৭ শতকের পাণ্ডুলিপি, Add. 7652 এবং Add. 6552 সবচেয়ে নিখুঁত, তার ভিত্তিতে আমি ব্লখমান-সম্পাদিত পাঠ মিলিয়ে নিয়েছি। বেশ পুরনো পাণ্ডুলিপি I.O.6-ও আমি দেখেছি। এটি Add. 7652-র অনুলিপি মাত্র। মাঝে মধ্যে Add. 6546 (১৭১৮ খৃস্টাব্দ) ব্যবহার করেছি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, R.A.S. Persian 121 (Morley 161)-এ

যদিও তারিখ আছে ১৬৫৬, কিন্তু এটি অত্যন্ত অযত্নে লেখা। Lindesiana-র গ্রন্থতালিকায় 'আইন'-এর পাণ্ডুলিপিগুলোর তারিখ বিভ্রান্তিকর। Lindesiana, 170 কপিটি লেখানো হয়েছিল ১৬৮০ খৃস্টাব্দে, ১৬২৬-৭এ নয় (অনুলিপিটি অবশ্য একেবারেই অকেজো), ১৬২৭-৮-র কপিতে যে-নম্বর (800) দেওয়া হয়েছে, তার কোন ভিত্তিই নেই। Lindesiana 223 'আইন'-এর অনুলিপিই নয়। Browne-এর *Supplementary Handlist of Muhammadan MSS in Cambridge*, পৃ. ১৬-য় মনে হয় ইঙ্গিত করা হয়েছে যে King College Or. MSS. No. 31 'আইন'-এর অনেক আগেকার একটি অনুলিপি (১৫৯৮-৯৯)। কিন্তু এই সংগ্রহের Palmer-কৃত গ্রন্থ তালিকায় (*JRAS*, 1867, p.108) আভাস দেওয়া হয়েছে যে, এটি হলো তিন খণ্ডে বাঁধানো 'আকবরনামা'র অনুলিপির অংশ মাত্র।

বিশেষত 'আইন'-এর পরিসংখ্যান অংশ থেকে কাজ করার সময় কোথায় এবং কী কারণে ব্লখমান-এর পাঠ থেকে সরে এসেছি সর্বদা তা উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। সাধারণত, আমি সর্বদাই Add. 7652 ও Add. 6552 পাণ্ডুলিপির পাঠ পছন্দ করেছি, যা ব্লখমান-এর সঙ্গে মেলে। অনুবাদের ক্ষেত্রে যখন ব্লখমান থেকে উদ্ধৃত করেছি, তখন তা Phillott-র সংশোধিত ও সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯২৭ এবং ১৯৩৯ এবং Jarrett-এর ক্ষেত্রে যদুনাথ সরকার সংশোধিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৪৯ ও ১৯৪৮ থেকে নেওয়া।

৩. Yūsuf Mīrak (আবুল কাশিম নামকীন-এর পুত্র), *Mazhar-i Shāhjahānī*, A.D. 1634, Vol. II, Karachi, 1961 (?). যে বছরে এটি লেখা হয়, সেই পর্যন্ত এটি মুঘল আমলে সিন্ধু প্রদেশের প্রশাসনিক ইতিহাসের স্মৃতিকথা। লেখক এখানে আলাদাভাবে ভাক্কর, থাট্টা এবং সেহ্ওয়ান অঞ্চলের বিবরণ দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর মনোযোগ সেহ্ওয়ানের ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীভূত। সিন্ধী আদাবী বোর্ড, করাচী-র পীর হুসামুদ্দীন রশীদী, বর্তমান গ্রন্থটির সটীক সম্পাদক আমাকে প্রেস কপিটি ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন বলে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

৪ (S. 730). Rāi Chandrabhān, *Chār Chaman-i Barhaman*, c. 1656. Add. 18,863*('ক'), Or.1892*('খ').

প্রশাসনিক এবং হিসাব সংক্রান্ত পুস্তিকা, পরিসংখ্যান সারণি ইত্যাদি

এই বিশেষ শ্রেণীর রচনা সম্পর্কে বোধহয় কিছু বলা দরকার। যাঁরা হিসাবশাস্ত্র ('সিয়াক') ও কেরানীর কাজ ('নাভিসন্দগী') এবং প্রশাসনিক কার্যধারার খুঁটিনাটি জ্ঞান ('দস্তুর-আল আমল') সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করতে চান, এমন লোকদের পথ দেখানোর জন্য অনেক বই লেখা হয়েছিল। এগুলো ছিল প্রশাসনে কর্মপ্রার্থীদের এক ধরনের পাঠ্য বই। এর মধ্যে আবার কয়েকটি এতই সবিস্তারে লেখা যে, সাম্রাজ্যের যে-কোন বিভাগীয় কর্মচারীর সেগুলো কাজে লাগত। এসব বইএর বিষয়বস্তুর বিরাট অংশ জুড়ে ছিল নানা ধরনের রাজকর্মচারীদের কাজের বিবরণ, তাদের লেখা সরকারী দলিল, ব্যবহৃত শব্দাবলির ব্যাখ্যা, মনসবদারদের বেতন হারের সারণি এবং দায়দায়িত্ব,

জরিমানা ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ বিবরণ। এছাড়া নানাবিধ বিষয়ে, যেমন রাজস্ব-পরিসংখ্যান, বাণিজ্য পথের সারণি, অভিজাতদের খেতাবের তালিকা ইত্যাদি খবর পাওয়া যায়। মনে রাখা দরকার যে, এগুলো সরকারী পুস্তিকা নয়। যেসব রাজকর্মচারী চাকরি করছিলেন এবং আগে করতেন এগুলো প্রায়শই তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে লেখা। কিন্তু দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁরা প্রায়ই সরকারী কাগজপত্র উদ্ধৃত করেছেন এবং কখনও কখনও মামুলি রীতিনীতি দেখানোর জন্য বিস্তারিতভাবে সরকারী নিয়মকানুনের হুবহু অনুলিপিও উদ্ধৃত করেছেন বলে মনে হয়।

প্রশাসনিক ও রাজস্ব-ইতিহাসের উৎস হিসেবে এসব রচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ [১৯৬২] থেকে আশি বছর আগে মুদ্রিত ১৫ নং গ্রন্থটি ছাড়া আর কোনটিই এযাবৎ ছাপা হয়নি।

৫. *Yād-dāsht-i Mujmil-i Jama'*, *&c.*, c. 1646-47, Add. 16,863.

৬. *Dastūr-al 'Amal-i Navīsindagī*, শাহ্‌জাহান-এর আমলের শেষ দিক। Add. 6641, ff 150-195.

৭. রাজস্ব পরিসংখ্যানের সারণি ইত্যাদি। Bodl. Ouseley 390. শিরোনামে এদের আওরঙ্গজেবের রাজত্বের পরিসংখ্যান বলা হয়েছে, কিন্তু অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে মনে হয়, এগুলোর কালসীমা ১৬৩৮-৫৬।

৮. *Dastūr-al 'Amal-i 'Ālamgīrī*, c. 1659. Add. 6598, ff 1a-128b* ; Add. 6599. এর তারিখ নিয়ে কিছু অসুবিধা আছে। মূল পাঠ অনুসারে এটির রচনাকাল আওরঙ্গজেবের "তৃতীয় শাসন-বছর", যাকে ১০৬৯ 'ফস্‌লী' এবং হিজরী ১০৬৫ বলে ধরা হয়। কিন্তু 'সিহ্‌-এ জুলূস' এই উৎকট বাক্যাংশটি নিঃসন্দেহে লিপিকার-প্রমাদ, 'সন-এ জুলূস' (তখ্‌তে বসার বছর)-এর বদলে এটি লেখা হয়েছে। ১০৬৯ 'ফস্‌লী' এবং ১০৬৫ হিজরী আওরঙ্গজেবের তৃতীয় শাসন-বছর বা পরস্পরের সঙ্গেও মেলে না। ধরে নিতে হবে যে, ১০৬৯ এবং ১০৬৫ অব্দ দুটির অদল বদল ঘটেছে। আসলে এটি লেখা হয় আওরঙ্গজেবের প্রথম শাসন-বছরে, ১০৬৯ হিজরী এবং ১০৬৫ 'ফস্‌লী'তে। তা হলে সবকটিই মেলে।

৯. *Dastūr-al 'Amal-i Mumālik-i Maḥrūsa-i Hindūstan*, Aurangzeb : post-1671. Or. 1840, ff 133a-144b.

১০. *Dastūr-al 'Amal-i Navīsindagī*, Aurangzeb : post-1676, Add. 6599, ff 133b-185a.

১১. Jagat Rā'i Shujā'i Kāyath Saksena, *Farhang-i Kārdānī*, A.D. 1679. Aligarh, Abdus Salam, Fārsiya 85/315.

১২. *Intikhāb-i Dastūr-al 'Amal-i Pādshāhī*, Aurangzeb : post-1686. Edinburgh 224.

১৩. *Zawābit-i Ālamgīrī*, Aurangzeb : post-1691. Add. 6598 ; Or. 1641 ; Ethe 432 ; Ethe 415, ff 161a, ff. (অসমাপ্ত)।

১৪. *Dastūr-al 'Amal*. Aurangzeb : post-1696. Bodl. Fraser 86.

১৫. Munshī Nand Rām Kāyasth Shrīvāstavya, *Siyāqnāma*, A.D. 1694-6. Lithograph, Nawal Kishor, Lucknow, 1879.

১৬. Udai Chand, *Farhang-i Kārdānī o Kār-āmozī*, A.D. 1699. Edinburgh 83 বইটি অংশত ১১নং রচনার ভিত্তিতে লেখা।

১৭. *Khulāṣatu-s Siyāq*, A.D. 1703, Add. 6588, ff 64a-94a (সামান্য ত্রুটি আছে)* ; Aligarh, Sir S. Sulaiman 410/143* ('Aligarh MS').

১৮. *Dastūr-al 'Amal*, Aurangzeb : post-1703. Or. 2026. আসলে এটি ১৭ নং রচনার নকল, কিন্তু কোথাও স্বীকার করা হয়নি।

১৯. *Dastūr-al 'Amal-i Shāhjahānī*, &c. আওরঙ্গজেবের আমলের শেষ দিক (?)। Ethe 415, ff 23b-109b : Add. 6588, ff 15a-47b ; Aligarh, Sir S. Sulaiman 675/53.

২০. আজমীর প্রদেশের 'মহাল'-ওয়ারি পরিসংখ্যানসহ মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তারিত রাজস্ব-পরিসংখ্যান। আওরঙ্গজেবের আমল (?)। R.A.S. Persian 173.

২১. 'আইন' ও আওরঙ্গজেবের আমলে গ্রাম ও এলাকা-পরিসংখ্যান থেকে নিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের এলাকা, আঞ্চলিক বিভাগ ও প্রদেশগুলোর রাজস্ব বিষয়ক পরিসংখ্যান-গত বিবরণ। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সঙ্কলিত। Or. 1286, ff 310b-343a.

২২. Hidāyatullāh Bihārī, *Hidāyat-al Qawā'id*, A.D. 1714. I.O. 3996A* ; Aligarh, Abdus Salam, 149/339* ('Aligarh MS'). দুটি পাণ্ডুলিপির পাঠে অনেক হেরফের আছে এবং আলীগড় পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তু আরও ব্যাপক।

২৩. Jawāhar Nāth 'Bekas' Sahaswānī, *Dastūr-al 'Amal*, A.D. 1732. Aligarh, Subhanulla 954/4.

২৪. *Risāla-i Zirā'at*, c. 1750, Edinburgh 144. ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, বইটি বাংলা 'সুবা'য় লেখা, রচনাকাল সম্ভবত বৃটিশ বিজয়ের কিছু আগে।

২৫. Braj Rā'i, *Dastūr-al 'Amal-i Shāhanshāhī*, c. 1727, enlarged by Thākur Lāl, 1776. Add. 22,831.

প্রশাসনিক নথিপত্র, প্রকৃত ও নমুনা কাগজপত্রের সংগ্রহ সমেত

এই অংশটিকে পূর্ণাঙ্গ করার কোন চেষ্টাই করা হয়নি। যে সব নথির শুধু অনুবাদ, বিশ্লেষণ বা বর্ণনা দেখেছি, মূলপাঠ দেখিনি, সেগুলো বর্জিত হয়েছে।

২৬. নভসরি, গুজরাটের এক পার্সী চিকিৎসক পরিবারকে যে জমি ও নগদ ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছিল, সে সংক্রান্ত ফার্সী নথিপত্র, ১৫১৭-১৬৭১ খৃস্টাব্দ ; ১৬ ও ১৭ শতকে নভসরির অন্য এক পার্সী পরিবারের সম্পত্তি ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত

গুজরাটীতে লেখা কাগজপত্র। এগুলোর তাৎপর্য বিষয়ক আলোচনা এবং বইএর শেষে অনেকগুলো দলিলের আলোকচিত্র-প্রতিলিপি সহ S. H. Hodivala' *Studies in Parsi History*, Bombay, 1920, pp. 149-253-এ প্রকাশিত ও অনূদিত।

২৭ ফরমান, পরওয়ানা ও অন্যান্য কাগজপত্র, মুখ্যত বতালা পরগনা (পাঞ্জাব)-এর 'মদদ-এ মআশ' অনুদান সংক্রান্ত, ১৫২৭-১৭৫৮ খৃস্টাব্দ। I.O. 4438 (Nos. 1-70). এই নথিপত্র সংগ্রহের প্রথমটি বাবুরে 'সুয়ুরগাল' মঞ্জুরির একটি ফরমান, Dr. Muhiuddin Momin কর্তৃক আলোকচিত্র-প্রতিলিপি সহ *IHRC*,

২৮. বাবুর, শেরশাহ্, হুমায়ুন-এর ফরমান, Maulvi Muhammad Shafi কর্তৃক *Oriental College Magazine*, Lahore, Vol. IX, No. 3, May 1933, pp. 115-28-এ মুদ্রিত।

২৯. সেন্ট্রাল রেকর্ড অফিস (উত্তর প্রদেশ)-এ দুটি সিরিজে বিন্যস্ত এলাহাবাদের দলিলপত্র : (১) ১৯৫৮-র ৩১ মার্চ পর্যন্ত Regional Records Survey Committee-র Accession Register-এ নথিভুক্ত দলিল* ; (২) ১৯৫৮-র ১ এপ্রিল থেকে কমিটির রেজিস্টারে নথিভুক্ত দলিল*।

দুটি সংগ্রহেরই ফার্সী নথিপত্রগুলো বেশির ভাগই ফরমান, বাকি সব ভূমি-অনুদান, বিক্রয়-কোবালা, এজাহার, রায়, রাজস্ব-সংক্রান্ত কাগজপত্র ইত্যাদি। ১৬ শতক থেকে এগুলো শুরু। প্রথমেই আছে শের শাহের একটি ফরমান (সিরিজ ১ : নং ৩১৮)। নিম্নোক্ত নথিপত্রগুলো আমি ব্যবহার করেছি : সিরিজ ১ : ১, ৫, ৮, ২৪, ৩৬, ১৫৪, ১৭৯-৮০, ২২৪, ২৭৯-৮০, ২৯৪-৯৬, ২৯৯, ৩১৫, ৩১৭-১৮, ৩২৩, ৩২৯, ৩৫৯, ৩৬২, ৩৭০, ৩৭৫, ৪১৪, ৪২১, ৪২৪, ৪৩৫, ৪৫৭, ৪৬৪, ৭৮২, ৭৮৬, ৭৮৯, ৮১০, ৮৫১, ৮৬৯, ৮৭৩-৭৪, ৮৭৯, ৮৮১, ৮৮৪-৯৪, ৮৯৬-৯৭, ১১৭৭, ১১৮০, ১১৮৩, ১১৮৫-৮৭, ১১৮৯-৯২, ১১৯৪ ৯৮, ১২০০-০৬, ১২০৮, ১২১০-১৭, ১২১৯-২৫, ১২২৭-২৮, ১২৩১-৩২ এবং ১২৩৪।

সিরিজ ২ : ২৩, ৫৩, ৫৫, ৫৬ এবং ২৮৪।

৩০. আকবরের 'ফরমান', 'মদদ-এ মআশ' মঞ্জুরি সংক্রান্ত, ১৫৫৮-৫৯ খৃ., বহালের অনুমোদনসহ, ১৫৭৫ খৃস্টাব্দ, Allahabad II, 23 (মূল); Or. 1757, ff 39-51 (নকল)।

৩১. আকবরের 'ফরমান', নতুন জমিতে 'মদদ-এ মআশ' বদলি সংক্রান্ত। ১৫৬৭-৬৮ খৃস্টাব্দ। আলীগড়ে প্রদর্শনের জন্য রাখা আছে।

৩২. আকবরের 'ফরমান', 'মদদ-এ মআশ' মঞ্জুরি, ১৫৭৫ খৃ.। মূল ফরমানটি মহম্মদ আকবর আলীর (উকীল, গোরক্ষপুর) কাছে আছে। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে এটি ধার করে এনে পরীক্ষা করা হয়। বর্তমানে এর একটি প্রতিলিপি সেখানে আছে।

৩৩. *Imperial Farmans (A.D. 1577 to A.D. 1805) granted to the Ancestors of...the Tikayat Maharaj.* আলোকচিত্র-প্রতিলিপি এবং

ইংরেজি, হিন্দী ও গুজরাটী অনুবাদ ও টীকাসহ প্রকাশ করেন K. M. Jhaveri, Bombay, 1928.

৩৪. ১৫৮০ খৃস্টাব্দে ভূমিরাজস্ব অনুদান সংক্রান্ত 'পরওয়ানচা'। I.O. 4433.

৩৫. আকবরের আমলে গুজরাটে 'মদদ-এ মআশ' অনুদান সংক্রান্ত ফরমান ও অন্যান্য দলিলপত্র। মূল পাঠের অবিকল প্রতিলিপি সহ অনুবাদ ও বিশদ টীকা Jivanji Jamshedji Modi-র *The Parsees at the Court of Akbar*, Bombay, 1903, pp. 91 ff.

৩৬. Maryam Zamānī, *Ḥukm*. জাহাঙ্গীরের আমলে একজন অবাধ্য জমিনদারের জমি দখলের হাত থেকে জনৈক জাগীরদারের স্বার্থরক্ষা করার জন্য সরকারী কর্মচারীদের ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। Zafar Hasan কর্তৃক *IHRC*, VIII, 1925, pp. 167-69-এ আলোকচিত্র-প্রতিলিপি ও মূলপাঠ মুদ্রিত।

৩৭. ১৬১৮ খৃস্টাব্দে জমিনদারী ও 'চৌধুরাই' মঞ্জুরি সংক্রান্ত জাহাঙ্গীরের ফরমান। মাখনলাল রায়চৌধুরী কর্তৃক *IHRC*, XVIII, 1942, pp. 188-96-এ মূলপাঠ মুদ্রিত।

৩৮. Har Karan, *Inshā'-i Har Karan*, জাহাঙ্গীরের আমলে। Ed. & tr. Francis Balfour, Calcutta, 1781* ; reprinted 1881. শেষ অংশের পাঠে পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে বিস্তর হেরফের আছে।

৩৯. শাহ্‌জাহান, ১৬২৯ খৃস্টাব্দে 'মদদ-এ মআশ' অনুদান সহ কাজী নিয়োগের ফরমান। Or. 11,697 (মূল)।

৪০. *Persian Sources of Indian History*, G. H. Khare কর্তৃক সম্পাদিত, সঙ্কলিত এবং মরাঠীতে অনূদিত। দ্বিতীয় খণ্ড, পুণা, ১৯৩৭। পৃ. ১-১৯-এ মুঘল নথিপত্র পাওয়া যাবে। এই খণ্ড এবং তৃতীয় খণ্ডের (পুণা, ১৯৩৯) বেশির ভাগ নথিই আদিলশাহী প্রশাসনের। প্রথম খণ্ডটি আমি দেখিনি।

৪১. *Selected Documents of Shah Jahan's Reign*, দফ্‌তর-এ দিওয়ানী, হায়দ্রাবাদ-ডেকান, কর্তৃক ১৯৫০-এ প্রকাশিত। অত্যন্ত চমৎকারভাবে দলিলগুলোর পাঠোদ্ধার করে ছাপা হয়েছে। কয়েকটি আলোকচিত্র-প্রতিলিপিও দেওয়া আছে।

৪২. *Daftar-i Dīwānī o Māl o Mulkī-i Sarkār-i A'lā*, Hyderabad, 1939. উর্দু ও ফার্সী দলিলগুলো বিপরীত কালানুক্রমে বিন্যস্ত ; শাহ্‌জাহান (পৃ. ২৫৩-৮১) এবং আওরঙ্গজেব (পৃ. ১৫৫-২৫১)-এর আমলের দলিলপত্র সহ। মূলপাঠ ও অবিকল প্রতিলিপি।

৪৩. কয়েকজন মহাজনের সপক্ষে শাহ্‌জাহানের ফরমান। ডঃ এ. হালিম কৃত অনুবাদ ও মূলপাঠ সমেত *IHRC*, Dec. 1942, pp. 59-60-তে মুদ্রিত।

৪৪. লস্কর খান। ১৬৫৮-৫৯-এ শিকদার নিয়োগের পরওয়ানা। I.O. 4434.

৪৫. *Akhbārāt-i Darbār-i Mu'allā*. আওরঙ্গজেবের আমলে বাদশাহী দরবারে বার্তা-লিপি। R.A.S. Case 47-এ ৯ খণ্ডে। উল্লেখ করা যেতে পারে

যে, এগুলোর মধ্যে বাহাদুর শাহের রাজত্বের কয়েকটি 'অখবারাৎ' আছে, যদিও রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি-র পাণ্ডুলিপির তালিকাকার মোর্লি বোধহয় এ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। আওরঙ্গজেবের গোড়ার দিকের অখবারাতের সঙ্গে প্রথম খণ্ডেই এগুলো বাঁধানো আছে। 'অখবারাৎ'গুলো উল্লেখ করা হয়েছে তাদের বছর এবং রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগারে তাদের যে ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেই অনুযায়ী। একটি খণ্ডে গুজরাটে শাহজাদা আজমের কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলোর বার্তা-লিপি আছে। সেগুলো 'অখবারাৎ ক' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৬. *Selected Documents of Aurangzeb's Reign, 1659-1706*, ed. Dr. Yusuf Husain Khan, Hyderabad, 1958. হায়দ্রাবাদ মহাফেজ-খানার এসব দলিলপত্রের সম্পূর্ণ পাঠ সমেত কয়েকটি আলোকচিত্র-প্রতিলিপি দেওয়া আছে।

৪৭. *Selected Waqai of the Deccan (1660-1671)*, ed. Y. H. Khan, Central Records Office, Hyderabad, 1953. ভূমিকাসহ মূলপাঠ ও ইংরেজিতে নথিপত্রের তারিখ-পঞ্জি এবং টীকা সহ মুদ্রিত।

৪৮. আওরঙ্গজেবের রাজত্বের অষ্টম বছরে রসিকদাসের উদ্দেশে ফরমান। বার্লিনে রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপি ও তাঁর নিজের সংগ্রহ থেকে যদুনাথ সরকার কর্তৃক *JASB*, N.S. II (1906), পৃষ্ঠা ২২৩-৫৫-য় মূলপাঠটি প্রকাশিত। নিম্নলিখিত পাণ্ডুলিপিগুলোতে ধৃত পাঠের সঙ্গে আমি এর তুলনা করেছি : I.O. 1146 ; I.O. 1566 ; I.O. 4014, ff 8a-11b ; Add. 19,503, ff 62a-63b ; *Nigār-nāma-i Munshī*, Or. 1735, ff 162b-164b, 129a-132b (নবল কিশোর সম্পাদিত, পৃ. ১২৩-৪, ৯৯-১০২)। বিভিন্ন পাঠের উল্লেখ না করে শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদ (বা প্রস্তাবনা) উদ্ধৃত হয়েছে।

৪৯. আওরঙ্গজেব, মহম্মদ হাসিমের উদ্দেশে 'ফরমান', ১৬৬৮-৬৯ খৃস্টাব্দ। আমি *JASB*, N.S. II (1906), পৃ. ২৩৮-২৪৯-এ যদুনাথ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত মূল পাঠটির সঙ্গে *Durr-al'Ulūm*, ff 139b-149b ও *Mirāt-i Aḥmadī*, ed. Nawab Ali, Vol. I, pp. 268-72 (MSS : I.O. 222, ff 172b-175b ; ও I. O. p. 3597, ff 156a-159a)-র তুলনা করে ব্যবহার করেছি। ৪৮ নং সূত্রের মতো এই 'ফরমান'টিতে ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী অনুচ্ছেদ আছে। সচরাচর তা-ই উল্লেখ করা হয়েছে।

৫০. আওরঙ্গজেব, 'মদদ-এ মআশ' মঞ্জুরি সংক্রান্ত ফরমান, ১৬৭৭-৭৮ খৃস্টাব্দ। I.O. 4436.

৫১. আওঙ্গরজেব, 'মদদ-এ মআশ' মঞ্জুরি সহ কাজী নিয়োগের ফরমান, ১৬৭৭-৭৮ খৃস্টাব্দ। I.O. 4370.

৫২. *Waqa'ī* of Ajmer, &c., A.D. 1678-80. Asafiya Library, Hyderabad, Fan-i Tā'rīkh, 2242. আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের গবেষণা গ্রন্থাগারে, ১৫ ও ১৬নং পুঁথিতে (২ খণ্ডে)* এগুলোর

প্রতিলিপি আছে। গোড়ায় রনথম্ভোর থেকে পাঠানো কয়েকটি প্রতিবেদন আছে। লেখক তখন আজমীরের ওয়কাই-নবীশ নিযুক্ত হয়েছিলেন, অবশেষে বাদশাহ্ কুলী খানের সেনাবাহিনীতে রাজপুত যুদ্ধের সময় বার্তা-লেখকরূপে যোগ দেন।

৫৩ 'Malikzāda', *Nigarnāma-i Munshī*, প্রশাসনিক দলিল, চিঠিপত্র ইত্যাদির সংগ্রহ, ১৬৮৪ খৃ. Or. 1735* ; Or. 2018 ; Bodl. M.S. Pers. e-1* ('Bodl') ; লিথোগ্রাফ সংস্করণ, নবল কিশোর সম্পাদিত, লখনউ, ১৮৮২* ('Ed').

৫৪. *Durr-al 'Ulūm*, মুন্শী গোপাল রায় সুরদাজের পত্রাদির সংগ্রহ ; শাহীব রায় সুরদাজ কর্তৃক বিন্যস্ত, ১৬৮৮-৮৯ খৃ.। Bodl. Walker 104.

৫৫. আওরঙ্গজেব, 'মদদ-এ মআশ' মঞ্জুরি সহ কাজী নিয়োগের 'ফরমান', ১৬৯২ খৃস্টাব্দ। Or. 11,698.

৫৬. ১৭ শতকে কর্নাটকের ঘটনাবলী বিষয়ে সরকারী চিঠিপত্র ও ফরমানের নকল। দু খণ্ডে, Br. M. Sloane, 4092 & 3582.

৫৭. মুয়াজ্জম, 'মদদ-এ মআশ' মঞ্জুরি সংক্রান্ত 'নিশান', ১৬৯৬-৯৭। *IHRC*, XVIII, 1942, 236-45 পৃষ্ঠায় মুদ্রিত।

৫৮. ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানিকে জারি করা ফরমান, নিশান ও পরওয়ানার নকল, ১৬৩৩-১৭১২। Add. 24,039.

৫৯. বাহাদুর শাহ, 'আল-তমঘা' মঞ্জুরি সংক্রান্ত 'ফরমান', ১৭১০ খৃ.। Or. 2285.

গ. চিঠিপত্রের সংগ্রহ

ওপরের ৩৮, ৫৩ ও ৫৪ নং সূত্রকে চিঠিপত্রের সংগ্রহ হিসেবে ধরা যেতে পারে।

৬০. (S.709) Abū-l Faẓl, *Inshā'-i Abu-l Faẓl*. আবদুস সামাদ কর্তৃক সংগৃহীত। নবল কিশোর সম্পাদিত, লিথোগ্রাফ সংস্করণ, কানপুর, ১৮৭২।

৬১. Khānazād Khān, *Insha'-i Khānazād Khān*, জাহাঙ্গীরের আমল। Or. 1410.

৬২. সইফ খানের বকলমে লেখা চিঠিপত্র, ১৬৪১ সালে সঙ্কলিত। আলীগড়, সুভনুল্লাহ্, Fārsiya 891,5528/15.

৬৩. জাহানারা, শাহজাহানের ১৩-২১ শাসন বছরে সিরমুরের রাজা বুধ প্রকাশকে লেখা চিঠিপত্র। *JASB*, N.S., VII, 1911, পৃ. ৪৪৯-৫৮-য় মুদ্রিত।

৬৪. Khān Jahān Saiyid Muzaffar Khān Bārha, *Arzdāsht-hā-i Muzaffar*, শাহ্জাহানের আমল : ১৬৫৬-র আগে। Add. 16,859, ff 1a-25a এবং 109b-122b. সংগ্রহটিতে জাহাঙ্গীরকে লেখা খান-এ আজম আজিজ কোকা-র একটি চিঠি আছে, ff. 17a-19b.

৬৫. বালকৃষণ ব্রাহ্মণ, শাহজাহানের শেষদিকের বছরে ও আওরঙ্গজেবের গোড়ার বছরগুলোতে শেখ জালাল হিসারী ও তাঁর নিজের লেখা চিঠি। Add. 16,859, ff 27a-109b & 122b-127a. Rieu (ii, 837) এ চিঠিগুলো যথাযথভাবে চিহ্নিত করতে বা ৬৪নং সূত্র থেকে আলাদা করতে পারেননি। জালাল হিসারী ছিলেন খানজাহান বারহা-র সেবক; এবং বালকৃষণ ব্রাহ্মণ ছিলেন জালাল হিসারীর ছাত্র।

৬৬. আওরঙ্গজেব, *Ādāb-i 'Ālamgīrī*. সিংহাসনে বসার আগে আওরঙ্গ-জেবের বকলমে চিঠিগুলো লেখেন আবুল ফতহ্ কাবিল খান। এই সংগ্রহের মধ্যে বাদশাজাদা আকবরের (আনু. ১৬৮০) বকলমে মহম্মদ সাদিকের চিঠিপত্র সংগ্রহও আছে। সমগ্র সংগ্রহটি তিনি পরে, ১৭০৩-৪ সালে, সম্পাদনা করেন। Or. 177* ; Add. 16,847.

৬৭. আওরঙ্গজেব, *Ruq'āt-i'Ālamgīr* : তখ্‌তে বসার আগে শাহ্‌জাহান, জাহানারা ও অন্যান্য শাহ্‌জাদাদের সঙ্গে আওরঙ্গজেবের চিঠিপত্র। বেশির ভাগই ৬৬ সংখ্যক সূত্র থেকে সঙ্কলিত। সৈঈদ নাজিব আসরাফ নাদভী, ১ম খণ্ড, আজমগড়, ১৯৩০, সম্পাদিত। পরিকল্পিত অন্যান্য খণ্ডগুলো প্রকাশিত হয় নি।

৬৮. জয়সিংহ, দরবার ও শাহ্‌জাদাদের কাছে 'আর্জদশ্‌ৎ' (আবেদন) ১৬৫৫-৫৮ খৃস্টাব্দ ইত্যাদি। R.A.S. Pers. Cat. 173, পৃ. ৮-৭৬-এ সংগ্রহটিতে আওরঙ্গজেবের আমলের অন্যান্য কয়েকটি অভিজাতদের কয়েকটি 'আর্জদশ্‌ৎ' আছে।

৬৯. Munshī Bhāgchand, *Jāmi'-al Inshā'*, চিঠিপত্রের সংগ্রহ। জয়সিংহের লেখা চিঠিপত্র ও মুঘল এবং পারস্য দরবারের মধ্যে পত্রালাপের সংগ্রহ। আওরঙ্গজেবের আমলে সম্পাদিত। Or. 1702.

৭০. Hādiqī, নমুনা চিঠিপত্রের সংগ্রহ। ১৬৬১ খৃস্টাব্দ। Br. M. Royal 16, B XXIII.

৭১. (S. 738) Muḥammad Ṣāliḥ Kanbū Lāhorī, *Bahār-i Sukhun*, 1663-64. Add. 5557; Or. 178.

৭২. *Khulāṣātu-l Inshā'*, A.D. 1691-92. Or. 1750, ff 107b-162a (অংশবিশেষ)।

৭৩. Izid Bakhsh 'Rasā', *Riyāẓ-al Wadād*, A.D. 1673-95. Or. 1725.

৭৪. 'বয়াজ', ঈজিদ বখশ্‌ 'রসা'র নামে প্রচলিত। I.O. 4014.

৭৫. সুরাটের ইংরেজ কুঠি, ফার্সী চিঠিপত্র, ১৬৯৫-৯৭। I.O. 150.

৭৬. Chathmal 'Hindū', *Kārnāma*, লুৎফুল্লা মুতাবর খানের বকলমে লেখা চিঠিপত্রের সংগ্রহ, আনু. ১৬৮৮-৯৮ খৃস্টাব্দ। I.O. 2007. অখবারাৎ ৪৩/১৯১ ও ৪৬/১৫৪-য় কল্যাণের 'থানাদার' হিসেবে মুতাবর খানের উল্লেখ আছে।

৭৭. Bhūpat Ra'i, *Inshā-i Roshan Kalām*, বৈসওয়ারার ফৌজদার রদ আন্দাজ খান ও তার ছেলে এবং সহকারী শের আন্দাজ খানের বকলমে লেখা চিঠিপত্র, ১৬৯৮-১৭০২। I.O. 4011*; Aligarh, Abdus Salam, 109/339;

Aligarh, Sir S. Sulaiman, 394/82. চিঠিগুলোতে তারিখ নেই, কিন্তু সমসাময়িক ঘটনা এবং 'অখবারাৎ' ৪৫/২৩২ ও ২৬৭-তে রাদ-অন্দাজ খানের উল্লেখ থেকে আলোচ্য সময়টা বোঝা যায়।

৭৮. আওরঙ্গজেব, *Raqā'im-i Karā'im*, আমীর খানকে লেখা চিঠিপত্র (১৬৯৮)। Bodl. Ouseley 168 & 330; Add. 26,239.

৭৯. আওরঙ্গজেব, *Kalimāt-i Taiyabāt*, ইনায়াতুল্লা খান সংগৃহীত চিঠিপত্র ও আদেশনামা, ১৭১৯ খৃস্টাব্দ। Bodl. Fraser 157.

৮০. আওরঙ্গজেব, *Aḥkām-i Ālamgīrī*, ইনায়াতুল্লা খান সংগৃহীত চিঠিপত্র ও আদেশনামা (১৭২৫ খৃ.)। I.O. 3887. *Aḥkām-i 'Alamgīrī*, এই একই নামে I.O. 4071-এ রক্ষিত, এবং যদুনাথ সরকার কর্তৃক হামিউদ্দীন খান 'নিমৃচা-এ আলমগীরী'র নামে আরোপিত আওরঙ্গজেব বিষয়ক অনির্ভরযোগ্য গালগপ্পের সংগ্রহ থেকে এটিকে আলাদা করতে হবে। Anecdotes of Aurangzib নাম দিয়ে যদুনাথ সরকার এই পরবর্তী বইটি সম্পাদনা ও অনুবাদ করেন, কলকাতা, ১৯১২ ইত্যাদি (S. 754)।

৮১. আওরঙ্গজেব, *Ramz o Ishāra-hā-i 'Ālamgīrī*, সবদমল (?) কর্তৃক সংগৃহীত চিঠিপত্র ও আদেশনামা, ১৭৩৯-৪০। Add. 26,240.

৮২. Aurangzeb, *Dastūr-al 'Āmal-i Āgahī*, ১৭৪৩-৪৪ সালে সংগৃহীত চিঠিপত্র ও আদেশনামা। Add. 26,237*; Add. 18,422.

৮৩. Aurangzeb, *Ruqāt-i 'Ālamgir*, চিঠিপত্র ও আদেশনামা। এটি একটি বহুল প্রচলিত সংগ্রহ। এর উপকরণ ৭৮ এবং ৮১ নং সূত্র থেকে নেওয়া, কিন্তু অন্য কোথাও পাওয়া যায়নি এমন কয়েকটি চিঠিও আছে। Add. 18,881-র অন্তর্গত এই সংগ্রহটির গোড়ার অংশে কয়েকটি পাতা ৮২ নং সূত্রেরই অনুসারী। কানপুর, লিথোগ্রাফ, হিজরী ১২৬৭।*

৮৪. Muḥammad Ja'far Qādirī, *Inshā'-i 'Ajīb*, সঙ্কলকের নিজের এবং তাঁর ভাই ও অন্যান্যদের লেখা ব্যক্তিগত বিষয়ে চিঠিপত্রের সংগ্রহ, ১৭০৬-৭। লিথোগ্রাফ সংস্করণ, নবল কিশোর, কানপুর, ১৯১২।

৮৫. *Lekhrāj Munshī, Matīn-i Inshā'* or *Mufid-al Inshā'*, কামগার খান ও (প্রায় পুরোটাই) আলী কুলী খানের বকলমে লেখা চিঠিপত্র। কাললেখ (chronogram) অনুযায়ী ১৭০০-০১-এ চম্পত রায় কর্তৃক সংগৃহীত, কিন্তু পরবর্তীকালের চিঠিও আছে। Bodl. 679. আলী কুলী খান ছিলেন কোচবিহারের ফৌজদার, 'অখবারাৎ' ৪৬/৯৩-এ তাঁর উল্লেখ আছে।

৮৬. আকবর থেকে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল পর্যন্ত বিবিধ চিঠিপত্রের সংগ্রহ। I.O. 2678. হরিদয়ারাম 'রাম' মুন্শীর চিঠিপত্র, পৃ. ৭৭ক, ১৭ শতকের গোড়ার দিকের এসব চিঠিপত্র বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। সংগ্রহটিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে না পারার জন্য আমি দুঃখিত।

৮৭. শিবাজীর পাঁচটি চিঠি সমেত, আওরঙ্গজেব এবং বাহাদুর শাহের রাজত্বকালের বিবিধ চিঠিপত্রের সংগ্রহ। R.A.S. Morley 81 (Pers. Cat. 71).

৮৮. *Faiyāz-al Qawānīn*, মুঘল বাদশাহ্, শাহজাদা, অভিজাতবর্গ এবং অন্যান্য শাসকদের চিঠিপত্র, ১৭২৩-২৪-এ ইবাদুল্লাহ্ ফৈয়াজ কর্তৃক সংগৃহীত। Or. 9617 (দু খণ্ডে)।

৮৯. Shāh Walī-ullāh, রাজনৈতিক চিঠিপত্র, আনু. ১৭৬১ পর্যন্ত। উর্দু অনুবাদ সহ *Shāh Walī-ullāh ke Siyāsī Maktūbāt* নামে কে. এ. নিজামী কর্তৃক সম্পাদিত, আলীগড়, ১৯৫০।

ঘ. ঐতিহাসিক রচনা

৯০. (S. 698) Babur, *Babur-nāma* : তুর্কী পাঠ, হায়দ্রাবাদ পুঁথি, হুবহু প্রতিলিপি, ed. A.S. Beveridge, Leiden & London, 1905 ; Abdur Rahim Khān-i Khānān কৃত ফার্সী অনুবাদ, Or. 3174 ; A. S. Beveridge-কৃত ইংরেজি অনুবাদ, London, 1921. শ্রীমতী বিভারিজ-কৃত মূল তুর্কী পাঠ থেকে অনুবাদ Leyden ও Erskine-এর পুরনো অনুবাদকে অনেকাংশেই অতিক্রম করে গেছে। দুর্ভাগ্যবশত কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রীমতী বিভারিজ-এর ফার্সী শব্দ ও পরিভাষার অনুবাদ পুরনো তর্জমাটির মতো যথাযথ নয়। শুধুমাত্র মাঝে মাঝে বাবুরের ব্যবহৃত ফার্সী শব্দ থেকে সামান্য যা নির্দেশ পাওয়া যায়, তা বাদে তুর্কী না জানার দরুন সরাসরি হায়দ্রাবাদ পুঁথিটি আমি ব্যবহার করতে পারিনি। ফলে, পুরোপুরিই আবদুর রহিম-কৃত আক্ষরিক অনুবাদের (Or. 3714-এ রক্ষিত) ওপর নির্ভর করেছি। এটি একটি অসাধারণ পাণ্ডুলিপি, আকবরের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী কর্তৃক চিত্রিত।

৯১. (S. 698 : 1) Shaikh Zain 'Wafā'ī' Khwāfī, *Tabaqāt-i Bāburī*. Or. 1999.

৯২. Ḥasan Alī Khan, *Tawārīkh-i Daulat-i Sher Shāhī*. মূল পাঠের অংশবিশেষ এবং এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না এমন একটি মূল অংশের Dr. R. P. Tripathi-কৃত অনুবাদ, Prof. S. A. Rashid কর্তৃক *Medieval India Quarterly*, ১ম খণ্ড, সংখ্যা ১ (১৯৫০)-এ প্রকাশিত। অবশিষ্ট অংশের প্রথম সাদা-পাতার পৃষ্ঠলেখ পরবর্তী সময়ের জালিয়াতি, কিন্তু রচনাটির অকৃত্রিমতার বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নেই। এর লেখক দাবি করেছেন যে তিনি শের শাহের আযৌবন সহচর ছিলেন।

৯৩. (S. 671) Rizqullāh 'Mushtāqī', *Wāqi'āt-i Mushtāqī*. Add. 11,633* ; Or. 1929.

৯৪. (S. 672) 'Abbās Khān Sarwānī, *Tuḥfa-i Akbar Shāhī*. I.O. 218.

৯৫. (S. 701) Mihtar Jauhar, *Tazkirat-al Wāqi'āt*. Add. 16,711.

৯৬. (S. 702) Bāyazid Bayāt, *Tazkira-i Humāyūn o Akbar*. Ed. M. Hidayat Hosain, Bib. Ind., Calcutta, 1941.

৯৭. (S. 707) Ārif Qandahārī, *Tā'rīkh-i Akbarī.* Transcript of MS Raza Library, Rampur, in Research Library, Dept. of History, Aligarh Muslim University.

৯৮. (S. 613) Nizāmu-ddīn Aḥmad, *Tabaqāt-i Akbarī.* Ed. B. De, Bib. Ind. 3 Vols. (তৃতীয় খণ্ডটি M. Hidayat Hosain কর্তৃক পরিমার্জিত ও অংশত সম্পাদিত), Calcutta, 1913, 1927, 1931 & 1935.

৯৯. (S. 614) Abdu-l Qādir Badā'unī, *Muntakhabu-t Tawārikh*, ed. Ali, Ahmad and Lees, Bib. Ind., Calcutta, 1864-69.

১০০. (S. 709 : 1) Abu-l Fazl, *Akbarnāma*, Bib. Ind., 3 Vols., Calcutta, 1873-87*. বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা-র মূলপাঠটি আগেকার একটি পাণ্ডুলিপি Add. 26,207-এর সঙ্গে ব্যাপকভাবে মিলিয়ে নিয়েছি—কবি শায়দা ১৬২৮-২৯ সালে এখানে-ওখানে এটি 'সংশোধন' করেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর হাতের লেখা বেশ স্পষ্ট। বিভারিজ তাঁর Bib. Ind. Calcutta, 1897-1921-র অনুবাদের জন্য কয়েকটি পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে দেখেছিলেন, পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন পাঠ সম্পর্কে তাঁর টীকাগুলো প্রায়ই খুব কাজে লাগে।

Add. 27,247-এ আমরা সম্ভবত 'আকবরনামা'র প্রথম খসড়ার পাঠটি পাই। যদিও অনেক সময় চূড়ান্ত পাঠের সঙ্গে এর ভাষা হুবহু এক, তবু খসড়াটির ভাষা কম মার্জিত এবং অনেক ফাঁক আছে। অন্যদিকে, কোন কোন ক্ষেত্রে এটি পূর্ণাঙ্গ। ২৭-তম বছরে ভূমিরাজস্ব প্রশাসন সম্পর্কে তোডর মলের সুপারিশ ও আকবরের মন্তব্যের মূল পাঠ এতে দেওয়া আছে (পৃ. ৩৩১ খ-৩৩২ খ)। এতে আরেকটি আকর্ষণীয় নথি আছে যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না : মনসবদার ইত্যাদি নিযুক্ত করার প্রশ্নের উত্তরে আকবরের আদেশনামা (পৃ. ৪০১ খ)। তোডর মলের সুপারিশের ক্ষেত্রে আমি সাধারণত Add. 27,247-ই উদ্ধৃত করেছি। অন্যান্য জায়গাতে চূড়ান্ত পাঠের সঙ্গে কোন গুরুত্বপূর্ণ হেরফের দেখা গেলে তবেই এর থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

১০১. (S. 824) Mīr Ma'ṣūm, *Tarīkh-i Sind*, ed. U. M. Daudpota, Poona, 1938.

১০২. (S. 710) Ilāh-dād Faizī Sirhindī, *Akbarnāma*. Or. 169.

১০৩. (S. 712) Asad Beg Qazwīnī, Memoirs. Or. 1996.

১০৪. (S. 673) Abdullāh, *Tārīkh-i Dāūdī*, ed. Prof. S. A. Rashid, Aligarh, 1954.

১০৫. (S. 674) Ahmad Yādgār, *Tā'rīkh-i Salāṭīn-i Afāghina*, ed. M. Hidayat Hosain, Bib. Ind. Calcutta, 1939.

১০৬. (S. 826) Mīr Ṭāhir Muḥammad Nisyānī, *Tā'rikh-i Ṭāhiri*, Or. 1685.

১০৭. (S. 711) Abdu-l Bāqi Nihāwāndī, *Maāṣir-i Raḥīmī*, ed. H. Hosain, Bib. Ind., 3 Vols, Calcutta, 1910-31.

১০৮. (S. 616) Nūr-al Haqq Dihlawī, *Zubdatu-t Tawārīkh*. Add. 10,580. ১৬০১-এর আগে আকবরের রাজত্বের ঘটনাবলি সম্পর্কে এর বেশির ভাগই ১০২ নং সূত্রের ভিত্তিতে লেখা।

১০৯. (S. 715) Jahangir, *Jahangir-nāma* or *Tuzuk-i Jahāngīrī*. Edited by Saiyid Ahmad, Ghazipur & Aligarh, 1863-64.* সৈঈদ আহ্মদের সংস্করণটির সবচেয়ে বড় গুণ এই যে স্মৃতিকথাটি যথাযথভাবে হাজির করা হয়েছে; অন্যথায় এটি ভুলে ভরা। কিছু ভুলভ্রান্তি Rogers এবং Beveridge, ২ খণ্ড, লণ্ডন, ১৯০৯-১৪-এর অনুবাদে সংশোধিত হয়েছে। কিন্তু তাতেও খুঁত রয়েছে, বিশেষত অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে।

১১০. (S. 955) Alā'u-ddīn Ghaibī Iṣfahānī 'Mirzā Nathan', *Bahāristān-i Ghaibī*, tr. Borah, 2 Vols., Gauhati, 1936. প্যারীর জাতীয় গ্রন্থাগারের রক্ষিত এর একমাত্র পাণ্ডুলিপিটি ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি বলে দুঃখিত।

১১১. (S. 717) Mu'tamad Khān, *Iqbālnāma-i Jahāngīrī*. প্রথম দু খণ্ডের জন্য (আকবরের মৃত্যুকাল পর্যন্ত) নবল কিশোর, লখনউ, লিথোগ্রাফ সংস্করণ, ১৮৭০, এবং তৃতীয়টির জন্য Abdul Hai ও Ahmed Ali সম্পাদিত Bib. Ind., কলকাতা, ১৮৬৫ ব্যবহার করেছি। জায়গায় জায়গায় আমি Or. 1768 ও Or. 1834 পাণ্ডুলিপি দুটির সঙ্গে লখনউ সংস্করণটি মিলিয়ে দেখেছি। Or. 1834 পাণ্ডুলিপিটি সম্ভবত উনিশ শতকের গোড়ার দিকের প্রতিলিপি করা হয়। আকবরের মৃত্যুকালীন রাজস্ব পরিসংখ্যান, মনসবদারদের বেতন ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্রোড়পত্র দ্বিতীয় খণ্ডে সংযুক্ত হয়েছে। লখনউ সংস্করণ বা আমার দেখা কোন পুঁথিতে এগুলো পাওয়া যায় না (Or. 1768, Ethe 312 & Ethe 313)।

১১২. (S. 619) Muḥammad Sarīf Najafī, *Majālisu-s Salāṭīn*, Or. 1903.

১১৩. (S. 718) Kāmgār Ḥusainī, *Ma'āsīr-i Jahāngīrī*. Or. 171.

১১৪. (S. 720) অজ্ঞাত, *Intikhāb-i Jahāngīr Shāhī*. Or. 1648, ff. 181b-201b (অংশবিশেষ)। আমাদের পক্ষে আকর্ষণীয় কিছু উপাদান এই রচনাটিতে আছে; যেমন, 'মদদ-এ মআশ' মঞ্জুরি বিষয়ে জাহাঙ্গীরের উদারতা। যদিও

এটিকে জনৈক সমসাময়িকের রচনা বলে চালানো হয়, সম্ভবত এটি ১৮ শতকের জালিয়াতি।

১১৫. (S. 274) Amin Qazwīnī, *Pāshāhnāma*, Or. 173* ; Add. 20,734 ; রাজা লাইব্রেরী, রামপুর-এর পুঁথির নকল, আলীগড় মুসলিম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের গবেষণা গ্রন্থাগারে রক্ষিত (১৯-২১ নং)।

১১৬. (S. 734) 'Abdu-l Hamīd Lāhorī, *Pādshāhnāma*, Bib. Ind., Calcutta, 1866-72.

১১৭. (S. 734) 'Muhammad Wāriṣ, ১১৬ নং সূত্রের অনুবৃত্তি। Add. 6556* ('ক') ; Or. 1675* ('খ')

১১৮. (S. 735) Muhammad Khān, *Shāhjāhān-nāma*. Or. 174 ; Or. 1671. ছদ্মনামের আড়ালে লেখক নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন এবং আত্মজীবনী-মূলক যে তথ্যাদি দিয়েছেন, মনে হয় তা কাল্পনিক। তবুও এটি যথেষ্ট ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন সমসাময়িক রচনা।

১১৯. (S. 738 : 1) Ṣāliḥ Kanbū Lāhorī, *'Amal-i Ṣāliḥ*, ed. G. Yazdani, 4 Vols. (Vol. IV : index), Bib. Ind., Calcutta, 1912-46.

১২০. (S. 743) Shihābu-ddīn Ṭālish, *Fatḥiya-i 'Ibriya*. Bodl. Or. 589*. একটি অনন্য পাণ্ডুলিপি, কারণ এটির পাঠ ১৬৬৬-তে এসে থেমেছে। এই রচনার প্রথম অংশ নানা পুঁথিতে রক্ষিত আছে এবং *Tārikh-i Mulk-i Āshām* এই নামে ছাপা হয়েছে (কলকাতা, ১৮৪৭)।

১২১. (S. 745)Muḥammad Kāẓim, *'Ālamgīrnāma*, ed. Khadim Husain and Abdu-l Hai, Bib. Ind., Calcutta, 1865-73.

১২২. (S. 151 : 2) Shaikh Muḥammad Baqā 'Baqā', *Mirāt-al 'Ālam*. Add. 7657*, Aligarh, Abdus Salam, 84/314.

১২৩. (S. 748) Mehta Īsardās Nāgar, *Futūḥat-i 'Ālamgīrī*. Add. 23,884.

১২৪. (S. 622) Sujān Rā'i Bhandārī, *Khudāṣatu-l Tawārīkh*. Ed. Zafar Hasan, Delhi, 1918*. Add. 16,680* ('ক'), Add. 18,407 ('খ') পাণ্ডুলিপি দুটিও আমি ব্যবহার করেছি এবং মুদ্রিত পাঠের অস্পষ্টতার ক্ষেত্রে Or. 1625* ('গ') উদ্ধৃত করেছি।

১২৫. (S. 753) Abū-l Faẓl Ma'mūrī, ১১৮ নং সূত্রের অনুবৃত্তি। Or. 1671.

১২৬. (S. 750) Bhīmsen, *Nuskha-i Dilkushā*. Or. 23.

১২৭. (S. 752) Sāqī Musta'idd Khān, *Ma'āsir-i Ālamgīrī*. Bib. Ind. ed , Calcutta, 1870-73*. Add. 19,495 পাণ্ডুলিপিটিও আমি মিলিয়ে দেখেছি।

১২৮. (S. 623) Jagjīvandās Gujrātī, *Muntakhabu-t Tawārīkh*. Add. 26,253.

১২৯. (S. 627) Muḥmmad Hāshim Khāfī Khan, *Muntakhab-al Lubāb*. ২য় খণ্ড এবং দখিনের সম্পর্কিত অংশবিশেষ, K. D. Ahmad and Haig, ed., Bib. Ind., Calcutta, 1860-74, 1909-25*. খাফী খান ১১৮ নং ও ১২৫ নং সূত্র থেকে পুরোটাই নিজের লেখায় বিনা স্বীকৃতিতে ব্যবহার করেছেন। Add. 6573 এবং 6574-এ সম্ভবত তাঁর রচনার প্রথম খসড়া রক্ষিত আছে। এদের পাঠও ১১৮ ও ১২৫ নং সূত্রের অবিকল এক।

১৩০. (S. 629) Yaḥyā Khan, *Tazkirat-al Mulūk*. I.O. 1147.

১৩১. (S. 984) 'Alī Muhammad Khan, *Mir'āt-i Aḥmadī*. Ed. Nawab Ali, 2 Vols. & Supplement, Baroda, 1927-28, 1930*. নবাব আলীর সংস্করণের ভিত্তি লেখকের নিজের পাণ্ডুলিপি, প্রতিলিপি করেছিলেন তাঁর সচিব। সংস্করণটি কিন্তু মুদ্রণপ্রমাদমুক্ত নয়। আমি I.O. 222 এবং I.O. 2597-9 পুঁথিগুলোর সঙ্গে কয়েকটি পাতা মিলিয়ে নিয়েছি।

১৩২. (S. 1471) Shāh Nawāz Khān, *Ma'āṣir-al Umarā'*, 'Abdu-l Ḥai's recension. Ed. Abdu-r Rahim & Ashraf Alī, Bib. Ind. 3 Vols., Calcutta, 1888-91.

১৩৩. (S. 1162 : 17) Mīr Ghulām 'Alī Āzād Ḥusainī Bilgrāmī, *Khizāna-i 'Āmira*, Nawal Kishor, Kanpur, 1871.

মুঘল সাম্রাজ্য (এবং লোদী রাজত্ব)-এর আগের পর্বের জন্য আমি যে দুটি মুখ্য ঐতিহাসিক রচনা ব্যবহার করেছি, সে দুটি হলো :

১৩৪. (S. 666) Ziyā'u-ddīn Baranī, *Tā'rīkh-i Fīrūz-Shāhī*. Ed. Sayid Ahmad Khan, Bib. Ind., Calcutta, 1862. Prof. S. A. Rashid কৃত এর একটি নতুন সংস্করণ আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশের পথে [১৯৬২]।

১৩৫. (S. 669) Shams Sirāj 'Afīf, *Tā'rīkh-i Fīrūz-shāhī*. Ed. Wilayat Husain, Bib. Ind., Calcutta, 1891.

ঙ. স্থানবিবরণ সংক্রান্ত রচনা

১৩৬. (S. 1649) Amīn Aḥmad Rāzī, *Haft Iqlīm*. Or. 204; Add. 16,734. Ed. Ross, Harley & Haqq (Partavī of Shiraz পর্যন্ত তিনটি খণ্ডাংশ প্রকাশিত), Calcutta, 1918, 1927, 1939.

১৩৭. 'Abdu-l Latif, *Journey to Bengal, 1608-9. Bengal Past & Present*, XXXV, Part II (1928 : April-June), pp. 143-46-এ যদুনাথ সরকার কর্তৃক অংশবিশেষের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

১৩৮. Amīnu-ddīn Khān, *Mālūmāt-al Āfāq*, A.D. 1707-13. Aligarh, Subhanullah, 362/124 ; চমৎকার পাণ্ডুলিপি। ১৭১৩-য় লেখক নিজেই এটির প্রতিলিপি করেন। আধুনিক ফাউন্টেনপেন-এর বর্বরতায় কিছুটা নষ্ট হয়েছে।

১৩৯. (S. 780 : 9 : 3) Ānand Rām 'Mukhliṣ', *Safarnāma-i Mukhlis*, ed. S. Azhar Ali, Rampur, 1946.

১৪০. (S. 631) Rā'i Chaturman Saksena, *Chahār Gulshan* or *Akhbar-i Nawādīr*. Bodl. Elliot 366*. *India of Aurangzib*, Calcutta, 1901* ('সরকার')-এ যদুনাথ সরকার-কৃত আংশিক অনুবাদ।

চ. অভিধান

১৪১. Jamālu-ddīn Ḥusain Injū, *Farhang-i Jahāngīrī*, A.D. 1608-9. Pub. Samar-i Hind Press, Lucknow, 1876.

১৪২. 'Abdu-r Rashīd al-Tattawī, *Farhang-i Rashīdī*, A.D. 1653-54. Ed. Abu Tahir Zulfiqar 'Ali Murshidabadi, Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1872.

১৪৩. Munshi Tek Chand 'Bahār', *Bahār-i 'Ajam*, A. D. 1739-40. Lithographed edition, Nawal Kishor, 1916. পুরনো ফার্সী অভিধানগুলোর মধ্যে এর শব্দসম্ভার সম্ভবত সর্বাধিক।

১৪৪. (S. 780 : 2) Ānand Rām 'Mukhliṣ', *Mirāt-al Iṣṭilāḥ*, প্রবাদ ও পরিভাষা কোষ। A.D. 1745. Or. 1813.

ছ. অন্যান্য রচনা

১৪৫. *Bayāz-i Khushbū'ī*. I.O. 828. খানদানী লোকের গৃহস্থালী ও প্রয়োজনীয় সব উপকরণই রচনাটির বিষয়বস্তু। রন্ধন-প্রণালী ও চিকিৎসা-পথ্যাদি থেকে ঘোড়াশাল ও বাগান তৈরির নকশা এবং সুগন্ধির বর্ণনা থেকে কাগজ-কলম সংক্রান্ত নির্দেশ পর্যন্ত দেওয়া আছে। রাজস্ব-পরিসংখ্যানের একটি সারণিও আছে। পুঁথিটি লেখা হয়েছিল ১৬৯৭-৯৮তে, কিন্তু অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে রচনাটিকে শাহ্জাহানের রাজত্বের প্রথম দুই দশকের মধ্যে লেখা বলে নিঃসন্দেহে সনাক্ত করা যায়।

১৪৬. *Dabistān-i Mazāhib*, বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ক বিখ্যাত রচনা, ১৬৫৩ থেকে ১৬৫৬ সালের মধ্যে লেখা শেষ হয়েছিল। লেখক অজ্ঞাত। Ed. Nazar Ashraf, Calcutta, 1809*. Shea and Troyer (London, 1843, 3 Vols.) কৃত ইংরেজি অনুবাদটি সন্তোষজনক নয়।

১৪৭. সৎনামী ধর্মগ্রন্থ, *Satnām Sahā'ī*. MS. R.A.S. Hindustani 1-এ নাগরী ও ফার্সী দু হরফেই ব্রজভাষায় মূলপাঠ দেওয়া আছে।

জ. ইউরোপীয় সূত্র

১৪৮. Caesar Fredrick (Caesar de Frederici), "Extracts of...his eighteen years Indian Observations". A.D. 1563-81, *Purchas his Pilgrimes*, pub. MacLehose, Glasgow 1905, X, pp. 88-143.

১৪৯. Fr. A. Monserrate, 'Information de los X'pianos de S. Thome', 1579. *JASB*, N.S, XVIII, 1922, pp. 349-69-য় H. Hosten-কৃত অংশবিশেষের অনুবাদ।

১৫০. Fr. A. Monserrate, *Commentary* on his Journey to the Court of Akbar, tr. J.S. Hoyland & annotated by S. N. Banerjee, Cuttack, 1922.

১৫১. C. H. Payne, *Akbar and the Jesuits*, London, 1926. আকবরের দরবারে জেসুইট মিশনারীদের বিষয়ে Du Jarric-এর বিবরণের অনুবাদ।

১৫২. J. H. van Linschoten, *The Voyage of John Huyghen van Linschoten to the East Indies*, from the old English translation of 1598, ed. A. C. Burnell (Vol. I) and P. A. Tiele (Vol. II), Hakluyt Society, Vols. 70-71, London, 1885.

১৫৩. Ralph Fitch, Narrative, ed. J. H. Ryley, *Ralph Fitch, England's Pioneer to India and Burma*, London, 1899*. ১৫৪ নং সূত্রেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৫৪. *Early Travels in India (1583-1619)*. Ed. W. Foster, London, 1927. Fitch (pp. 1-47), Mildenhall (pp. 48-59), Hawkins (pp. 60-121), Finch (pp. 122-87), Withington (pp. 188-233) Coryat (pp. 234-87), and Terry (pp. 288-332)—এঁদের বিবরণের সংগ্রহ।

১৫৫. Fr. J. Xavier, Letters, 1593-1617, tr. Hosten, *JASB, NS*, XXIII, 1927, pp. 109-30.

১৫৬. *A Supplementary Calender of Documents in the India Office relating to India or to the Home Affairs of the East India Company*, 1600-1640, Ed. by W. Foster, London, 1928.

১৫৭. *Letters Received by the East India Company from its Servants in the East*, 1602-17. 6 vols. : vol. I. ed. Danvers ; vols. II-VI, ed. Foster, London, 1896-1902.

১৫৮. Fernao Guerreiro, *Relations*. C. H. Payne-কৃত অংশত অনূদিত, *Jahangir and the Jesuits*, London, 1930.

১৫৯. *Relations of Golconda to the Early Seventeenth Century*. Ed. & tr. W. H. Moreland, Hakluyt Society, London, 1931.

Methwold (pp. 1-50), Schorer (pp. 51-65) এবং একজন অজ্ঞাত ওলন্দাজ কুঠিয়ালের (পৃ. ৬৭-৯৫) বিবরণের সংগ্রহ।

১৬০. John Jourdain, *Journal*, 1608-17. Ed. Foster, Hakluyt Society, 2nd Series, No. XVI, Cambridge, 1905.

১৬১. Joseph Salbancke, 'Voyage', 1609, *Purchas his Pilgrimes*, MacLehose, III, pp. 82-89.

১৬২. Manuel Godinho de Eredia, 'Discourse on the Province of Indostan', &c. 1611. Tr. Hosten, *JASB*, Letters, IV, 1938, pp. 533-66.

১৬৩. Peter Floris, *His Voyage to the East Indies in the 'Globe'* 1611-15. ফ্লোরিস-এর দিনলিপির সাম্প্রতিক অনুবাদ, ed. Moreland, Hakluyt Society, 2nd Series, LXXIV, London, 1934.

১৬৪. Thomas Roe, *The Embassy of Sir Thomas Roe*, 1615-19, as narrated in his Journal & Correspondence, ed. W. Foster, London, 1926.

১৬৫. Richard Steel and John Crowther, 'Journall', 1615-16, *Purchas his Pilgrimes*, MacLehose, IV, pp. 266-80.

১৬৬. Edward Terry, *A Voyage to East India, &c., 1616-19*, London 1665; reprinted, 1777. *Purchas his Pilgrimes*-থেকে পূর্ববর্তী তর্জমা ১৫৪ নং সূত্রে মুদ্রিত।

১৬৭. *The English Factories in India*, 1618-69. ed. W. Foster, 13 Vols., Oxford 1906-27. খণ্ডগুলোর কোন ক্রমিক সংখ্যা নেই। সুতরাং মলাটের পাতায় শিরোনামের নীচে যে-বছর ছাপা আছে সেই বছরের নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬৮. Pietro Della Valle. *The Travels of Pietro Della Valle in India*, tr. Edward Grey, Hakluyt Society, 2 vols., London, 1892.

১৬৯. Pieter Van Den Broeke, Surat 'Diary'. 1620-29, tr. Moreland, *JIH*, X, pp. 235-50 ; XI, pp. 1-16, 203-18.

১৭০. Francisco Pelsaert, 'Remonstrantie' c. 1626, tr. Moreland and Geyl, *Jahangir's India*, Cambridge, 1925.

১৭১. Wellebrand Geleynssen de Jongh, 'Verclaringe ende Bevinding, &c.', *JIH*, IV (1925-26), pp. 69-83-তে Moreland-কৃত নির্বাচিত অংশের অনুবাদ।

১৭২. Joannes De Laet, 'De Imperio Magni, Mogolis, &c'., 1631. J. S. Hoyland-কৃত অনুবাদ এবং S. N. Banerjee কৃত টীকাভাষ্য, *The Empire of the Great Mogol*, Bombay, 1928-এ প্রকাশিত। রচনাটির

অতি সামান্যই মৌলিক এবং এর উৎসগুলোর অধিকাংশই আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়ে যাওয়ায় এর পুরনো প্রামাণিকতা আর নেই।

১৭৩. Peter Mundy, *Travels*, vol. II : Travels in Asia, 1630-34, ed. Sir R. C. Temple, Hakluyt Society, 2nd Series, XXXV, London, 1914.

১৭৪. Fray Sebastian Manrique, *Travels*, 1629-43, tr. C. E. Luard, assisted by Hosten, 2 vols. Hakluyt Society, 1927.

১৭৫. John van Twist, 'A General Description of India', c. 1638. *JIH*, XVI (1937), pp. 63-77-এ Moreland-কৃত নির্বাচিত অংশের অনুবাদ।

১৭৬. Jean Baptiste Tavernier, *Travels in India*, 1640-67. tr. V. Ball, 2nd edition revised by W. Crooke, London, 1925.

১৭৭. Francois Bernier, *Travels in the Mogul Empire 1656-68*. Irving Brock-এর পাঠের ভিত্তিতে A. Constable-কৃত সটীক অনুবাদ, V. A. Smith কর্তৃক পরিমার্জিত ২য় সংস্করণ, লণ্ডন, ১৯১৬।

১৭৮. Jean de Thevenot, 'Relation de l'Indostan &c'., 1666-67. Lovell-এর ১৬৮৭-র অনুবাদটি S. N. Sen কর্তৃক সংশোধিত, টীকা ও ভূমিকা সহ *The Indian Travels of Thevenot and Careri*, New Delhi, 1949-এ পুনর্মুদ্রিত।

১৭৯. John Marshall, 'Notes & Observations on East India', ed. S. A. Khan, *John Marshall in India—Notes & Observations in Bengal. 1668-72*. London, 1927.

১৮০. Thomas Bowrey, *A Geographical Account of Countries Round the Bay of Bengal, 1669 to 1679*, ed. R. C. Temple, Cambridge, 1905.

১৮১. John Fryer, *A New Account of East India and Persia being Nine Years' Travels, 1672-81*, ed. W. Crooke, 3 Vols., Hakluyt Society, 2nd Series, XIX, XX & XXXIX, London, 1909, 1912 & 1915.

১৮২. Streynsham Master, *The Diaries of Streynsham Master, 1675-80 & other Contemporary Papers relating thereto*, ed. R. C. Temple, Indian Records Series, 2 vols. London, 1911.

১৮৩. 'Maulda Diary and Consultation Booke' & 'Maulda and Englezavad Diary', 1680-82, ed. Walter K. Firminger, *JASB*, NS, XIV (1918), pp. 1-241.

১৮৪ Willam, Hedges, *The Diary of William Hedges, Esq., during his Agency in Bengal, &c.* R. Barlow-কৃত প্রতিলিপি ও টীকা

এবং Col Henry Yule-কৃত অপ্রকাশিত নথিপত্র থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি সহ মুদ্রিত। 3 vols., Hakluyt Society, Nos. 74, 75 & 78, London, 1887-89. আমি শুধুমাত্র প্রথম খণ্ডটি (যাতে Hedges-এর দিনপঞ্জি আছে) উল্লেখ করেছি। ২য় ও ৩য় খণ্ডে বেশির ভাগই জীবনী সংক্রান্ত তথ্য আছে।

১৮৫. J. Ovington, *A Voyage to Surat in the Year 1689*, ed. H. G. Rawlinson, London, 1929.

১৮৬. Giovanni Francesco Gamelli Careri, 'Giro del Mondo'. কারেরি ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন ১৬৯৫-এ। ভারতবর্ষ বিষয়ে তাঁর রচনার অংশ-বিশেষের 'গোড়ার দিকের তর্জমা' *The Indian Travels of Thevenot and Careri*, ed. S. N. Sen, New Delhi, 1949-এ পুনর্মুদ্রিত।

১৮৭. Nicolao Manuchy, '*Storia do Mogor*, 1656-1712, tr. W. Irvine, 4 vols., Indian Texts Series, Government of India, London, 1907-8. লেখকের নামের উচ্চারণ ক্ষেত্রে আমি পাণ্ডিচেরীতে রক্ষিত তাঁর সইগুলোর বানান অনুসরণ করেছি (*IHRC*, 1925, p. 175)। Irvine-এর অনুবাদ উল্লেখ করার সময় 'Manucci'-এই রূপটি ব্যবহার করেছি, কারণ Irvine এই বানানটিই গ্রহণ করেছেন। [বাংলায় সর্বত্রই 'মানুচি' লেখা হয়েছে]।

আধুনিক রচনা

ক. কৃষি, কৃষিজ উৎপন্ন এবং পরিসংখ্যান

১৮৮. Watt, *The Dictionary of Economic Products of India*, 6 vols.

১৮৯. *The Agricultural Statistics of India*, ভারত সরকারের রাজস্ব ও কৃষি ইত্যাদি বিভাগের একটি অনিয়মিত প্রকাশনা। ১৮৮৪-৮৫।

১৯০. John Augustus Voelcker, *Report on the Improvement of Indian Agriculture*, London, 1893.

১৯১. N. G. Mukherji, *Handbook of Indian Agriculture*, Calcutta, 1915.

১৯২. W. H. Moreland, *Notes on the Agricultural Conditions of the United Provinces and of its Districts*, Allahabad, 1913. জেলাগুলোর উপর টীকার পৃষ্ঠাসংখ্যা আলাদা ভাবে দেওয়া আছে।

১৯৩. The Royal Commission on Agriculture in India. *Report*, London, 1928.

খ. ভূমি ব্যবস্থা ও ভূমিরাজস্ব প্রশাসন

১৯৪. দিল্লীর খাজা ইয়াসিন, ফার্সীতে লেখা রাজস্ব এবং প্রশাসনিক পরিভাষা-কোষ। Add. 6603, ff. 40-84. তারিখ দেওয়া নেই। সম্ভবত ১৮ শতকের শেষদিকে সঙ্কলিত। লেখক দাবি করেছেন যে তিনি দিল্লীতে রাজস্ব প্রশাসনে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং বৃটিশ কর্মচারীদের সুবিধার্থে দিল্লী ও বাংলার ব্যবহৃত পরিভাষাগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

১৯৫. বাংলায় বৃটিশ পূর্ব-প্রশাসন ব্যবস্থার বিবরণী (ফার্সীতে), গভর্নর জেনারেল এবং কাউন্সিলের নির্দেশে রায় রায়ান এবং কানুনগো-রা এটি তৈরি করেন, জানুয়ারি ৪, ১৭৭৭। Add. 6592, ff. 75b-114b ; Add. 6586, ff. 53a-72b.

১৯৬. *Dastūr-al ‘Amal-i Khāliṣa-i Sharīfa*, ১৮ শতকের শেষদিকের রচনা, সঙ্গে প্রশাসনিক ও রাজস্ব-পরিভাষাকোষ আছে। Edinburgh 230.

১৯৭-৯৯. ১৮ শতকের শেষদিকে মুখ্যত বাংলার রাজস্ব প্রশাসন সংক্রান্ত বিবিধ নথিপত্র, অধিকাংশ ফার্সীতে। Add. 6586 এবং Add 19,503-04.

২০০. *The Fifth Report* from the Select Committee on the Affairs on the East India Company, together with the Appendix, Vol. I : Bengal Presidency, Reprinted, Madras, 1883.

২০১. H. M. Elliot, *Memoirs on the...Races of the North-Western Provinces of India*, being an amplified edition of the Original *Supplemental Glossary*, revised by John Beams, 2 Vols, London, 1869.

২০২. H. H. Wilson, *A Glossary of Judicial & Revenue Terms, &c, of British India*, London, 1875.

২০৩. Baden-Powell, *Land Systems of British India*, 3 vols., Oxford, 1892.

গ. কৃষি-সমাজ

২০৪. (S. 688) Col. James Skinner, *Tashrīh-al Aqwām*, A. D. 1825. MS. Add. 27, 255 (লেখকের নির্দেশ অনুসারে আঁকা চমৎকার ছবিও আছে)।

২০৫. W. Crooke, *The Tribes and Castes of the North-Western Provinces and Oudh*, 4 vols., Calcutta, 1896.

২০৬. Baden-Powell, *The Indian Village Community*, London, 1896.

২০৭. D. Ibbetson, *Punjab Castes*, Lahore, 1916.

২০৮. Surendra J. Patel, *Agricultural Labourers in Modern India and Pakistan*, Bombay, 1952.

ঘ. স্থানীয় ইতিহাস

২০৯. (S. 926) Mufti Ghulām Hazarat, *Kawā'if-i Zila'-i Gorakhpūr*, A.D. 1810. I.O. 4540*; Aligarh, Subhanullah 954/12* ('Aligarh MS.'). আলীগড় পাণ্ডুলিপিতে কিছু অংশ আছে, যা I.O. 4540-তে নেই।

২১০. (S. 927) Girdhārī, *Intizām-i Rāj-i Azamgarh*, ১৯ শতকের গোড়ার দিকের। Edinburgh 237.

২১১. Charles Elliot, *Chronicles of Oonao*, Allahabad, 1862.

২১২. W. C. Benett, *A Report on the Family History of the Chief Clans of Roy Bareilly District*, Lucknow, 1870.

২১৩. (S. 928) Saiyid Amir 'Ali Rizawī, *Sorguzasht-i Rāja-hā-i Azamgarh*, 1872, Edinburgh 138.

২১৪. Kuar Lachman Singh, *Memoir of Zila Bulandshahar*, Allahabad, 1874.

২১৫. *District Gazetteers*, প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত। আমি বিশেষ করে উত্তর প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের জেলা গেজেটিয়ারগুলো ব্যবহার করেছি।

ঙ. মুঘল ভারত

উৎসগ্রন্থগুলো সম্পর্কে ভাষ্য

২১৬. Najaf 'Alī Khān, *Sharh-i Ā'īn-ī Akbarī*, A.D. 1851. Or. 1667.

২১৭. Elliot & Dowson, *History of India as told by its own Historians*, 8 vols., London, 1867 &c.

২১৮. S. Commissariat, *Mandelslo's Travels in Western India* (A. D. 1638-9)

অর্থনৈতিক ইতিহাস

২১৯. Edward Thomas, *Revenue Resources of the Mughal Empire in India, from* A.D. *1593-1707)*, London, 1871.

২২০. W. H. Moreland, *India at the Death of Akbar*, London, 1920.

২২১. W. H. Moreland, *From Akbar to Aurangzeb*, London, 1923.

২২২. S. H. Hodivala, *Historical Studies in Mughal Numismatics.*

২২৩. Radhakamal Mukherjee, *The Economic History of India, 1600-1800, Journal of the U.P. Historical Society*, XIV, Part i, pp. 40 ff-এ প্রকাশিত।

২২৪. K. M. Ashraf, *Life and Conditions of the People of Hindustan* (under the Sultans before Akbar), 2nd edition, Delhi, 1959.

২২৫. Sir Charles Fawcett, *The English Factories in India : New Series*, 4 vols.

২২৬. T. Raychaudhuri, 'The Dutch in Coromandel'. ডঃ রায়চৌধুরী তাঁর অপ্রকাশিত গবেষণাপত্রের টাইপ-কপি পড়ার অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন।

প্রশাসনিক ইতিহাস

২২৭. W. Irvine, *The Army of the Indian Moghuls : Its Organisation and Administration*, London, 1903.

২২৮. J. Sarkar, *Mughal Administration*, Calcutta, 1920.

২২৯. W. H. Moreland, *The Agrarian System of Moslem India*, Cambridge, 1929*, reprinted, Allahabad.

২৩০. R. P. Tripathi, *Some Aspects of Muslim Administration*, Allahabad, 1936* ; reprinted, Allahabad, 1956.

২৩১. Ibn Hasan, *The Central Structure of the Mughal Empire and its Practical Working up to the year 1657.*

২৩২. P. Saran, *The Provincial Government of the Mughals (1526-1658)*, Allahabad, 1941.

২৩৩. I. H. Qureshi, *The Administration of the Sultanate of Delhi*, 2nd edition (revised), Lahore, 1944.

২৩৪. Abdul Aziz, *The Mansabdari System and the Mughal Army.*

২৩৫. S. N. Sen, *The Military System of the Marathas*, Bombay, 1958.

১৮ শতক

২৩৬. W. Francklin, *The History of the Reign of Shah-Aulum, the present emperor of Hindostan*, London, 1798.

২৩৭. (S. 938) Saiyid Ghulām 'Alī Naqavī, *'Imādu-s Sa'ādat*, completed A.D. 1808. Lithographed edition, Nawal Kishor, Lucknow, 1897.

২৩৮. S. Chandra, *Parties and Politics at the Mughal Court, 1707-40*, Aligarh, 1959.

আঞ্চলিক ইতিহাস

২৩৯. (S 963) Ghulām Ḥusain Salīm Zaidpūrī, *Riyāẓu-s Salatin*, a history of Bengal, written A.D. 1786-88. Bib. Ind., Calcutta, 1890.

২৪০. James Tod, *Annals and Antiquities of Rajasthan.* Popular ed., 2 vols. London, 1914.

২৪১. Grant Duff, *History of Mahrattas*, London, 1826.

২৪২. Sir John Malcolm, *A Memoir of Central India, including Malwa*, &c., 2 vols., London, 1832.

২৪৩. Kavirāj Shyāmaldās, *Vīr Vinod*, 4 vols. হিন্দীতে লেখা মেবারের বিরাট এই ইতিহাসটি অনেকখানিই উদয়পুর নথিপত্রের ভিত্তিতে লেখা, এছাড়া ফার্সী ও রাজস্থানী সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে। রচনাটির একটি বিশেষ গুণ এই যে, উদয়পুর মহাফেজখানার দলিলের পুরো অনুবাদ এবং সময়ে সময়ে মূল পাঠও দেওয়া আছে, সাধারণত যেগুলো পাওয়া যায় না।

২৪৪. T. Raychaudhuri, *Bengal under Akbar and Jahangir*, Calcutta, 1953.

অন্যান্য রচনা

২৪৫. C. M. Villiers Stuart, *Gardens of the Great Mughals*, London, 1913.

২৪৬. P. Saran, *Studies in Medieval Indian History.*

২৪৭. Sri Ram Sharma, *Studies in Medieval Indian History*, Sholapur, 1956.

. মধ্য-প্রাচ্যের কৃষি ইতিহাস

২৪৮. F. Lokkegaard, *Islamic Taxation in the Classic Period*, Copenhagen, 1950.

২৪৯. A. K. S. Lambton, *Landlord and Peasant in Persia*, London, 1953.

ছ. সাময়িকপত্রের রচনা

নীচে কেবলমাত্র নির্বাচিত প্রবন্ধের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। যেসব প্রবন্ধে ফার্সী দলিলের মূল পাঠ বা ইউরোপীয় সূত্রের অনুবাদ দেওয়া আছে, সেগুলো আগেই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, সুতরাং এখানে বাদ দেওয়া হলো।

২৫০. *Journal of the (Royal) Asiatic Society of Bengal,* Calcutta. XLII (1873), pp. 209-310 ; XLIII (1874), pp. 280-309 ; XLIV (1875), pp. 275-306 ; Blochmann, 'Contributions to the Geography and History of Bengal (Muhammadan Period)'.
LIII (1884), pp. 215-32 & LIV (1885), pp. 162-82 : John Beames, 'On the Geography of India in the Reign of Akbar', 2 parts : Awadh and Bihar.
N.S., XII (1916), pp. 29-56 : Rai Manmohan Chakravarti Bahadur, 'Notes on the Geography of Orissa in the Sixteenth Century'.
N.S. XV (1919), pp. 197-262 ; C. U. Wills, 'The Territorial System of the Rajput Kingdoms of Chhattisgarh'.

২৫১. *Journal of the Royal Asiatic Saciety*, London.
1843, pp, 42-53 : J. A. Hodgson, 'Memoir on the Length of the Illahee Guz, Or Imperial Land Measures of Hindoostan'.

1896, pp 83-136, 743-65. John Beames, 'Notes on Akbar's Subahs with reference to the Aīn-i Akbari' : Bengal and Orissa.
1906, pp. 349-53 : H. Beveridge, 'Aurangzeb's Revenues'.
1917, pp. 815-25 : W. H. Moreland, 'Prices and Wages under Akbar'.

1918, pp. 1-42 : Moreland and A. Yusuf Ali, Akbar's Land Revenue System as described by the *Ain-i Akbari*'.

1918, pp. 375-85 : Moreland, 'Value of Money at the Court of Akbar'.

1922, pp. 19-35 : Moreland, 'The Development of the Land Revenue System of the Mogul Empire'.

1926, pp. 43-56 : Moreland, 'Akbar's Land Revenue Arrangements in Bengal.'

1926, pp. 447-59 : Moreland, 'Sher Shah's Revenue System.'
1936, pp. 641-65 ; Moreland, 'Rank (*Mansab*) in the Mogul State Service'.

1938, pp. 511-21 : Moreland, 'The Pargana Headman (Chaudhri) of the Mogul Empire'.

২৫২. *Indian Journal of Economics*, Allahabad.

I, 1916, pp. 44-53 : Moreland, 'The *Ain-i Akbari*—A Possible Base-line the for the Economic History of Modern India'.

২৫৩. *Journal of Indian History*, Allahabad, Madras, Trivandrum.

VIII, Part i, pp. 1-8 ; Moreland, 'Feudalism (?) in the Moslem Kingdom of Delhi.'

২৫৪. *Journal of the U.P. Historical Society*, Lucknow.

II. Part i, pp. 1-39 : Moreland, 'The Agricultural Statistics of Akbar's Empire'.

২৫৫. *Proceedings of the Indian Historical Records Commission.* 1929, pp. 81-87 : Y. K. Deshpande, 'Revenue Administration of Berar in the Reign of Aurangzeb (1679 A.D.)'.

XXVI, Part ii, pp. 1-7 : S. Hasan Askari, 'Documents relating to an Old Family of Sufi Saints of Bihar'.

XXVIII (1951), Part ii, pp. 1-7. S. H. Askari, Gleanings from Miscellaneous Collection of Village Amathua in Gaya'.

XXXI (1955), Part ii, pp. 142-47 : Qeymuddin Ahmad, 'Public Opinion as a Factor in the Government Appointments in the Mughal State'.

1961, pp. 55-60 : B.R. Grover, 'Raqba-bandi Documents of Akbar's Reign'.

২৫৬. *Muslim University Journal*, Aligarh.

I, No. 1, pp. 93-118, No. 2, pp. 156-88, No 3, pp.—435, No 4. pp. 563-95 ; II, No. 1, pp 29-51 : Ibadur Rahman Khan, Historical Geography of the Panjab and Sind'.

২৫৭. *Islamic Culture*, Hyderabad.

1938, pp. 61-75 : M. Sadiq Khan, 'A Study in Mughal Land Revenue System'.

1944, pp. 349-63 : W. C. Smith, 'The Mughal Empire and the Middle Classes'.

1946, pp. 21-40 : W. C. Smith, 'Lower Class Uprisings in the Mughal Empire'.

বর্তমান গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে এমন সব প্রবন্ধ অন্যান্য যে পত্রপত্রিকা থেকে নেওয়া হয়েছে, সেগুলো হলো :

Bengal Past & Present, Calcutta.
Journal of the Pakistan Historical Society, Karachi.
Journal of the Sind Historical Society, Karachi.
Ma'arif, Azamgarh.
Medieval India Quarterly, Aligarh.
Proceedings of the Indian History Congress, Annual Sessions.
The Oriental College Magazine, Lahore.

সংক্ষেপসূচি

সংক্ষিপ্ত রূপের পাশে যে-সংখ্যাগুলো দেওয়া আছে সেগুলি গ্রন্থসূচির ক্রমিক সংখ্যা। সুতরাং যে-রচনার ক্ষেত্রে নামের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করা হয়েছে সেটিকে গ্রন্থসূচির সংখ্যা দেখে বার করতে হবে। যেসব পুঁথি বা একই রচনার বিভিন্ন সংস্করণের সংক্ষিপ্ত রূপ এ বইএ একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে, গ্রন্থসূচিতে প্রত্যেকটির পাশে বন্ধনীর মধ্যে তা দেওয়া আছে। এই তালিকায় তাই সেগুলোর নাম দেওয়া হলো না।

সংক্ষিপ্ত রূপ	সংখ্যা
'অখবারাৎ'	৪৫
'আইন'	২
'আকবরনামা'	১০০
'আকবর অ্যাণ্ড দা জেসুইটস্'	১৫১
'আকবর টু আওরঙ্গজেব'	২২১
'আদাব-এ আলমগীরী'	৬৬
আব্বাস খান	৯৪
'আমল-এ সালিহ্'	১১৯
আরিফ কান্দাহারী	৯৭
'আর্জদশ্‌ৎ-হা-এ মুজফ্‌ফর'	৬৪
'আর্লি ট্রাভেলস'	১৫৪
'আলমগীরনামা'	১২১
আসাদ বেগ	১০৩
'আহ্‌কম-এ আলমগীরী'	৮০
আহ্‌মদ ইয়াদগার	১০৫
'ইকবালনামা'	১১১
'ইণ্ডিয়া অফ আকবর'	২২০
'ইন্‌শা-এ আবুল ফজল'	৬০
'ইন্‌শা-এ রোশন কলম'	৭৭
ইশরদাস	১২৩
ইয়াসিন-এর শব্দকোষ	১৯৪
উইলসন 'গ্লসারি' উইলসনের 'গ্লসারি'	২০২
'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম'	২২৯
এলিয়ট, 'মেমোয়ার্স'	২০১
ওভিংটন	১৮৫
'ওয়কাই-এ আজমীর'	৫২
'ওয়কাই দখিন'	৪৭
ওয়াট	১৮৮
'ওয়ারিস'	১১৭
কমিশারিয়ট, মানদেল্‌সলো	২১৮
'কলিমৎ-এ তৈয়াবৎ'	৭৯
কাজবিনী	১১৫
'কারনামা'	৭৬
কারেরি	১৮৬
'কোয়াইফ-এ জিলা-এ গোরখপুর'	২০৯
'ক্রনিকলস্ অফ উনাও'	২১১
খাফী খান	১২৯
'খিজানা-এ আমীরা'	১৩৩
'খুলাসতুল সিয়াক'	১৭
'খুলাসতুস ইন্‌শা'	৭২
চার চমন চার চমন-এ বরহামান	৪
'চাহার গুলশন'	১৪০
'জমাই আল ইনশা'	৬৯
'জাওয়াবিৎ-এ আলমগীরী'	১৩
জাভেরী	৩৩
জুরদ্যা	১৬০
'ট্র্যাক্ট অন এগ্রিকালচার'	১
'ডকুমেন্টস্ অফ আওরঙ্গজেবস্ রেন'	৪৬
'তবাকৎ-এ আকবরী'	৯৮
'তশরিহ্-আল আকোয়াম'	২০৪
তাভার্নিয়ে	১৭৬
'তারিখ-এ তাহিরী'	১০৬
'তারিখ-এ দাউদী'	১০৪
তেভেনো	১৭৮

সংযোজন ও সংশোধন

পৃ. ১৩ : পাদটীকা ৩৫-এর শেষে আরেকটি অনুচ্ছেদ যোগ হবে :

এই অঞ্চলে তরাই অরণ্যের বিরাট বিস্তৃতির ব্যাপারে অন্যান্য সব উৎসের সাক্ষ্যের সমর্থন মেলে রেনেল-এর 'অযোধ্যা, এলাহাবাদ ও আগ্রার অংশবিশেষ'-এর মানচিত্র থেকে। সেখানে দেখা যায় গোরখপুর ও গণ্ডক নদীর মধ্যবর্তী পুরো জায়গাটাই জঙ্গল (দুই বাঁকের মধ্যবর্তী এলাকার নিম্নভাগে ক্ষুদে গণ্ডকের দু তীরে হাসিল-করা একটা জায়গা ছাড়া)। রাপ্তী নদীর দু পাড়ে গোরখপুরের দক্ষিণে আবার একটা 'ছোট জঙ্গল' দেখানো হয়েছে। গোরখপুরের উত্তর-পশ্চিমে বনশী-ও ছিল জঙ্গলে ঘেরা। বলরামপুরের নীচে রাপ্তী নদীর ঠিক দক্ষিণে ছিল ব্যাপক জঙ্গল, হাসিল-করা এক টুকরো এলাকা একে তরাই-অরণ্য থেকে আলাদা করে রেখেছিল।

পৃ. ১৩ : পাদটীকা ৩৬-এর শেষে :

রেনেল-এর মানচিত্রে (পূর্বোক্ত সূত্র) দেখা যায় যে ১৭৮০ নাগাদ আর এখানে জঙ্গল ছিল না, যদিও গোরখপুরের দক্ষিণে 'ছোট জঙ্গল'টি তখনও আজমগড়ের কাছে ঘর্ঘরাকে ছুঁয়ে যেত।

পৃ. ৩০ : পাদটীকা ৩১ পংক্তি ৩, ৬, ৯ :

'আইন', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৭-এ আবুল ফজল 'বেথ-জলন্ধর' এই বানান দিয়েছেন। কিন্তু 'আইন'-এর পরিসংখ্যান সারণিতে 'বেৎ-জলন্ধর' বানানটিই গ্রাহ্য হয়েছে।

পৃ. ৪০ : গমের একর পিছু উৎপন্নের মূল্যের অঙ্কে গোঁদুলার মূল্যও কমে গিয়েছিল—এই বক্তব্যটি বাদ দিতে হবে। আধুনিক কৃষি-পরিসংখ্যানে গোঁদুলার একর পিছু উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় না; তাই দু-এর মধ্যে তুলনার চেষ্টা করা গেল না। এ বিষয়ে মোরল্যাণ্ডের বক্তব্য ('ইণ্ডিয়া…অফ আকবর', ১০৩) আমি ভুল বুঝেছিলাম মনে হয়।

পাদটীকা ৩২-এর শেষে আরেকটি অনুচ্ছেদ যোগ হবে :

'আইন'-এর সময়ে ও হাল আমলে বিভিন্ন শস্যের একর প্রতি উৎপাদন-মূল্যের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন মোরল্যাণ্ড। তার সঙ্গে 'মিরাট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার', ১৯২২, পৃ. ৪২ ইত্যাদিতে ঐ জেলার বিভিন্ন শস্যের একর পিছু উৎপাদন-মূল্য সম্পর্কে যে-তথ্য দেওয়া আছে তা মিলিয়ে দেখা যায়। এই তথ্যের ভিত্তিতে খাদ্যশস্যের তুলনামূলক মূল্যের (গম = ১০০ ধরে) পাশাপাশি ঐ একই খাদ্যশস্যের (আবার গমকেই ভিত্তি ধরে = ১০০) ওপর মিরাট 'দস্তুর'-মণ্ডলে রাজস্ব-হারের তুলনামূলক অঙ্কগুলো ('আইন' থেকে নিয়ে) রাখা যেতে পারে।

শস্য	'আইন'	'মিরাট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার'
গম	১০০'০	১০০'০
চাল	৮২'৫	৬৬'৬ থেকে ৭৭'৭
বার্লি	৬৫'৩	৫৫'৫

শস্য	'আইন'	'মিরাট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার'
জওয়ার	৫৭ ৭	৪৪'৪ থেকে ৬৬'৬
বাজরা	৩৮'৪	৪৪'৪
চানা (সাধারণ)	৬৯'২	৬৬'০
মটর	৪২'৩	৫৫'৫
উরদ্	৫৯'৬	৪৪'৪
মোঠ	৩৮'৪	৩৩'৩

সারণি থেকে দেখা যায় মোরল্যাণ্ড-এর সিদ্ধান্তই ঠিক : বাজরা বাদে বেশির ভাগ খাদ্যশস্যের একর পিছু আপেক্ষিক উৎপাদন একই রয়ে গেছে। 'আইন'-এর সময়ে বাজরার একর পিছু উৎপাদন আরও কম ছিল। 'মিরাট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার' এ বার্লির উৎপাদন-মূল্য বোধহয় কম ধরা হয়েছে, কারণ ১৯৫০-৫১-র হিসেবে উত্তর প্রদেশে বার্লির একর পিছু মূল্যের অঙ্ক গমের তুলনায় শতকরা ৭২'৫ ভাগ ছিল। সারণিতে দুটি ডালের (মটর ও উরদ্) ক্ষেত্রে মূল্যের এক আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা যায়। মটরের (এবং উরদের) মূল্য 'আইন'-এর সময়ের চেয়ে বেড়ে গেছে।

পৃ. ৪২ : পাদটীকা ৪১-এর শেষে যোগ হবে :

'মিরাট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার'-এ একর পিছু তুলো উৎপাদনের মূল্য গমের তুলনায় শতকরা মাত্র ৬৬'৬ থেকে ৭৭'৭ ভাগ, অথচ মিরাটের 'দস্তুর'-মণ্ডলে তুলো-বোনা বিঘার রাজস্ব-হার ছিল গম-বোনা বিঘার হারের শতকরা ১৫৩ ভাগ ('আইন'-এ যা দেওয়া আছে)। এর থেকেই বোঝা যায়, তুলোর আপেক্ষিক মূল্য অর্ধেকেরও বেশি পড়ে গিয়েছিল।

পৃ ৪৩ : পাদটীকা ৪৬-র শেষে যোগ হবে :

বাদাম থেকেও তেল পাওয়া যায়, কিন্তু মুঘল আমলে তার চাষ হতো না।

পাদটীকা ৪৯-এর শেষে যোগ হবে :

'মিরাট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার'-এর তথ্য ও 'আইন'-এ মিরাট 'দস্তুর'-মণ্ডলের হারের সঙ্গে তুলনা করলেও এ কথাই বেরিয়ে আসে। গমের উৎপাদন দু ক্ষেত্রেই ১০০ ধরলে, 'আইন'-এ তিল-এর হার ৭৬'৯, কিন্তু 'মিরাট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার'-এ মাত্র ৪৪'৪।

পৃ. ৪৭ : নীচ থেকে পংক্তি ৫-এর শেষে যোগ হবে : কুসুমফুল থেকে লালচে রং পাওয়া যেত। তার চাষও যথেষ্ট পরিমাণে কমে গিয়েছিল।[৬৪ক]

পাদটীকা ৬৩-র শেষে যোগ হবে :

ম্যালকম-এর মতে ('মেমোয়ার অফ সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া', ১৮২৪, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৭) মালবে "আউল"-এরও চাষ হতো এবং সেখান থেকে যথেষ্ট পরিমাণ রপ্তানিও হতো।

পাদটীকা ৬৪-র শেষে যোগ হবে :

৬৪ক : রংটির নাম 'কুসুম', ফুল থেকে এটি বার করা হয়। কুসুম ফুলের চাষ কমে যাওয়ার ব্যাপারে 'মিরাট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার', পৃ. ৪৭ ও 'বুলন্দশহর ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার', পৃ. ৩৭ দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৪৮ : পাদটীকা ৭৬-র শেষে যোগ হবে :

'মজহার-এ শাহজাহানী', পৃ. ১৮৪ থেকে অতি দ্রুত তামাক চাষের প্রসার সম্পর্কে আরও আগের সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে, দীনদার খানের কার্যকালে সেহ্‌ওয়ান অঞ্চলে তামাক চাষ শুরু হয়। ১৬২৮-এ তখ্‌তে বসার অল্পদিনের মধ্যেই শাহ্‌জাহান তাঁকে জাগীরদার নিযুক্ত করেছিলেন। 'মজহার-এ শাহজাহানী' যখন লেখা হচ্ছে তখনই, ১৬৩৪-এর একটু আগে, তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়।

পৃ. ৫৭ : পাদটীকা ১৩১ : আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস বিভাগের গবেষণা গ্রন্থাগারে মূল দলিলটির আলোকচিত্র আছে। সেটি দেখে আমি 'সিলেকটেড ডকুমেণ্টস'-এর মুদ্রিত পাঠ মিলিয়ে নিতে পেরেছি। সর্বমোট সংখ্যাটি সম্পাদক ঠিকই পড়েছিলেন, কিন্তু পারনীর পরগনার ক্ষেত্রে বলদের সংখ্যাটি 'পড়া যায় না' বলা হয়েছে। আসলে মূল পাঠে ঐ জায়গায় 'শূন্য'-সূচক প্রতীক দেওয়া আছে। এই পরগনায় বলদের সংখ্যা দেওয়া নেই—এর থেকেই বোঝা যায় কেন বলদের মোট সংখ্যা এত কম। পারনীর ও অন্য দুটি পরগনা বাদে (সংখ্যা পড়া যায়নি) মানুষ ও বলদের সর্বমোট অঙ্ক হবে যথাক্রমে ১৫০ ও ২৯৮ (পাদটীকার পংক্তি ৬-এ দেওয়া আছে ১৫৮ ও ২৯০)।

পৃ. ১৫৯ : পাদটীকা ৪৩-এর শেষে আরেকটি অনুচ্ছেদ যোগ হবে :

ম্যালকম-এর 'মেমোয়ার অফ সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া', লণ্ডন, ১৮২৪, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৮-১০ থেকে 'গিরাস'-এর তাৎপর্য (বিশেষত জমিনদারী স্বত্বের সঙ্গে তার সম্পর্ক ও পার্থক্য) সুস্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে। তিনি বলেছেন, "লুঠতরাজ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার শর্তে" গ্রামগুলো "গ্রাসিয়া"-কে যে টাকাকড়ি দিত তারই নাম "গ্রাস"। মালবের সব "গ্রাসিয়া"-ই ছিল রাজপুত। অনেক ক্ষেত্রেই তারা ছিল নিজেদের দখলের জমি থেকে বিতাড়িত প্রধান। তবুও ম্যালকম যথার্থ রাজপুত প্রধানদের থেকে সাবধানে তাদের আলাদা করেছেন। যথার্থ প্রধানরা কখনও লুঠতরাজ থেকে নিজেদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেনি।

পৃ. ২৭২ : পাদটীকা ১ : পংক্তি ৮-এ '···সংজ্ঞা দেওয়া আছে'-র পর ১০ম পংক্তির শেষে 'যাই হোক না কেন'-র বদলে হবে :

"'জাগীর', 'জাইগীর', কোন ভূখণ্ড, বাদশাহ্‌, ওমরাহ্‌ (অভিজাত), মনসবদার ও ঐ ধরনের (লোকে) যা দিয়ে থাকেন যাতে (প্রাপক) সেখানে যাই চাষ হোক তার রাজস্ব ('মাহ্‌সূল') নিজের দখলে রাখতে পারে ; হিন্দুস্তানের রাজ করণিকদের পরিভাষায় এটি 'তুয়ুল' (-এর সমার্থক), মাইনের ('মাহানা') বদলে তনখা ('তনখ-ওয়াহ্‌') বাবদ গ্রামাঞ্চলের একটা অংশ বরাত থাকে। যদিও পারস্যের হাল আমলের কিছু কবির রচনায় শব্দটি পাওয়া যায়, এটি তাদের ভাষার শব্দ নয়। আরবীতে একে বলা হয় 'ইক্তা'।" (নবল কিশোর, সম্পা. পৃ. ২৭৬ ; এবং পৃ. ২৮৩)।

পৃ. ৩১৮ : পংক্তি ৫ : 'অমলাক'-এর পরে 'বা ইমলাক'।

নির্দেশিকা